যাঁর স্নেহ আমার সকল কাজের প্রেরণা
সেই মাতৃদেবী
সুহাসিনী সেনের করকমলে

ভূমিকা

ডক্টর শ্রীমতী গৌরী সেনের গবেষণাগ্রন্থের ভূমিকা রচনাপ্রসঙ্গে দু'একটি কথা নিবেদন করতে চাই। তাঁর অনুসন্ধানের বিষয়— 'বাংলা ও হিন্দী বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে বাৎসল্য রস'। তাঁর আলোচনার মৌলিকতায় আকৃষ্ট হয়ে গ্রন্থটির আদ্যন্ত পড়তে উৎসাহিত হই এবং অত্যন্ত খুঁটিয়ে পড়ার পর একটি নিবিড় মানসিক তৃপ্তি লাভ করি। সেইজন্য ভূমিকা লিখবার তাগিদ বোধ করেছি।

একালে উচ্চ মঞ্চ থেকে রাজনৈতিক নেতারা প্রায়শই তারকণ্ঠে 'জাতীয় সংহতি', অর্থাৎ national integration-এর কথা বলছেন। যতই ভাষা, ধর্ম ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঞ্চলিকতা নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি হচ্ছে, ততই নেতৃবৃন্দ জাতীয় সংহতি নিয়ে বিস্তর 'আহা-উহু' করছেন। কিন্তু তাতে ফাটল রোধ করা যাচ্ছে না। কারণ রাজনৈতিক অভিসন্ধি মনের তলায় চাপা রেখে 'সবাই আমরা ভাই-ভাই', 'সকলে এক হও'— একথা বললেই ভ্রাতৃত্ববোধ ও ঐক্য স্থাপিত হয় না। রাজনৈতিক দিক থেকে সাম্প্রতিক বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিরোধ গড়ে তোলা যাবে না, তা আমরা উত্তর-স্বাধীনতা পর্বে মর্মে মর্মে বুঝছি। ড. সেনের বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি পড়তে পড়তে আমার মনে হয়েছে, রাজনীতির 'আড়াই প্যাঁচে' জাতীয় বিচ্ছিন্নতাকে বাঁধা যাবে না। সাহিত্য ও সংস্কৃতিই একমাত্র আয়ুধ, যার সাহায্যে ভগ্নোন্মুখ এদেশকে আবার ঐক্যের মধ্যে আনা যায়। তার জন্য প্রয়োজন ভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষীর মধ্যে নিবিড় আত্মীয়তার বন্ধন সৃষ্টি করা। ড. সেন তাঁর গবেষণাগ্রন্থে চারটি সুবিস্তৃত অধ্যায়ে হিন্দী ও বাংলা বৈষ্ণব সাহিত্যের বাৎসল্যরসের পদের তুলনামূলক আলোচনা করে দুই ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক পরিচয় ঘনিষ্ঠতর করেছেন। গ্রন্থটি বহু তথ্যসমৃদ্ধ গবেষণাগ্রন্থ-রূপেই রচিত হয়েছে। সুতরাং এতে ভূরিপরিমাণ তথ্য ও তত্ত্বের সমাবেশ হবে তা সহজেই বোঝা যাচ্ছে। লেখিকা বাংলা ছাড়াও সংস্কৃত, হিন্দী, ব্রজভাখা প্রভৃতি ভাষা-তেও দক্ষ এবং এই তিনভাষায় প্রচলিত বাৎসল্যলীলা-সংক্রান্ত লোকগীতি ও গাথা এবং শিষ্ট সাহিত্য সম্বন্ধে অতিশয় অভিজ্ঞ। এই দুরূহ কাজে তাঁর ভাষাজ্ঞান তাঁকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। বহুভাষী ভারতবর্ষের প্রাণরহস্য আবিষ্কার করতে হলে গবেষকের একাধিক ভাষায় কিছু অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। মাতৃভাষা-ব্যতিরিক্ত আরো দুটি আধুনিক ভারতীয় ভাষায় শ্রীমতী সেনের পরিচয় থাকার জন্য এই তুলনামূলক গবেষণায় তিনি যথোপযুক্ত কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পেরেছেন।

শ্রীকৃষ্ণের বাৎসল্যলীলা-সংক্রান্ত যে-সমস্ত ভক্তিরসের পদ ও রচনা সারা ভারত-বর্ষেই প্রচলিত আছে, এই গবেষক তার মধ্যে হিন্দী ও বাংলা পদাবলীর তুলনামূলক আলোচনা করে এই বিষয়ে একটি যুক্তিপ্রধান তত্ত্বগ্রন্থ রচনার প্রয়াস পেয়েছেন।

প্রসংগক্রমে তিনি ব্রজ্ভাখা থেকেও অনুরূপ পদসাহিত্যের প্রাসংগিক নমুনা উদ্ধার করে সমগ্র বিষয়টির আলোচনায় প্রাদেশিক ভাষার সীমা সম্প্রসারিত করেছেন। এ-জন্য জাতীয়-সংহতি প্রসংগে স্লোগানসর্বস্ব রাজনৈতিক সংঘর্ষবিবাদের চেয়ে তাঁর এই গবেষণাগ্রন্থের প্রাসংগিকতা অনেক বেশী যুক্তিসংগত।

ড. সেন মোট চারটি বিস্তারিত অধ্যায়ে বাংলা ও হিন্দী ভাষায় মধ্যযুগে রচিত শ্রীকৃষ্ণবাৎসল্যলীলা-সংক্রান্ত পদ ও অন্যান্য রচনাসমূহের তত্ত্ববিচার, রস বিশ্লেষণ ও তুলনামূলক স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে বস্তু-উপস্থাপনা, অর্থাৎ বৈষ্ণব ধর্ম ও সাহিত্যে ভক্তিরসের বিকাশ ও বিবর্তন, ভক্তিকে কেন নবরসের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, এ-বিষয়ে গৌড়ীয় ও বহির্গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধক, দার্শনিক ও ভক্তদের সিদ্ধান্তসমূহের পুনর্বিচার, প্রাগ্‌বৈষ্ণব সাহিত্যে বৈষ্ণব রসের, বিশেষতঃ বাৎসল্য-ভাবের প্রচ্ছন্ন প্রভাব, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধ্যসাধন তত্ত্বের প্রস্থানভূমি এবং রসতত্ত্বের মৌলিক বৈশিষ্ট্যের পুংখানুপুংখ আলোচনা— এগুলি মৌল তত্ত্ববাদের সাহায্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বস্তুতঃ প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় হচ্ছে সমস্ত আলোচনার পীঠিকাস্বরূপ। এই ভিত্তির উপরেই তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ের বক্তব্য ও সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে পাঁচজন বাঙালি এবং পাঁচজন অবাঙালি পদকর্তার বাৎসল্যলীলার পদ আলোচনা করা হয়েছে। চণ্ডীদাস, বাসুঘোষ, বলরাম-দাস, জ্ঞানদাস ও রায়শেখর, এই পাঁচজন মধ্যযুগীয় 'মহাজন' এবং কুম্ভনদাস, সুর-দাস, পরমানন্দ দাস, নন্দদাস ও রসখান— এই পাঁচজন গৌড়মণ্ডলের বহির্ভূত হিন্দী অঞ্চলের কবি ও সাধক। তার মধ্যে প্রথম তিনজন (কুম্ভনদাস, সুরদাস, পরমানন্দ-দাস) 'অষ্টছাপ'-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং প্রধানতঃ ব্রজ্ভাখাকেই আত্ম-প্রকাশের বাহন হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাঁদের সম্প্রদায়ের গুরু প্রসিদ্ধ ভক্ত ও সাধক বল্লভাচার্য বালগোপালের মূর্তির প্রতিষ্ঠা ও উপাসনার প্রবর্তন করেন। তাঁরই কাছে 'অষ্টছাপ'-এর চারজন (সুরদাস, কৃষ্ণদাস, পরমানন্দদাস, কুম্ভনদাস) এবং বল্লভা-চার্যের পুত্র, বিট্‌ঠলদাস গুরুপদে অভিষিক্ত হলে তাঁর চারজন শিষ্য (নন্দদাস, চতু-র্ভুজদাস, ছীত্‌স্বামী, গোবিন্দস্বামী)— এই নিয়ে 'অষ্টছাপ'-এর শিষ্য-পরম্পরা। এঁরা মথুরা-বৃন্দাবনের আঞ্চলিক ভাষা ব্রজ্-ভাখায় কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক বহু গান রচনা করেন। এঁরা খুব সম্ভব ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এই প্রসংগে স্মরণীয়, বৃন্দাবনের রূপগোস্বামীর শিষ্য মাধুরীজী বৈষ্ণবপদ রচনাকালে বার বার শ্রীগৌরাঙ্গের বন্দনা করেছেন। এখনো গৌড়ীয় বৈষ্ণব আদর্শ ও শ্রীচৈতন্যের বিশেষ প্রভাব ব্রজ্ভাখার কাব্য-কবিতায় প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কৃষ্ণলীলারসিক ব্রজ্ভাখার কবি এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদকারগণ একই নৌকার যাত্রী, একই ভাবের ভাবুক। অবশ্য ব্রজমণ্ডলের কবিরা কৃষ্ণের বাল্যলীলার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বাৎসল্য তাঁদের মূল আলম্বনবিভাব। অপরদিকে গৌড়ীয় 'মহাজনগণ' মধুররস অর্থাৎ কান্তাপ্রেমকেই সাধ্য-সাধনরূপে আশ্রয় করেছেন। উত্তরভারতে কিন্তু কৃষ্ণের পরকীয়া প্রেম ততটা স্বীকৃতি লাভ করেনি— হিন্দুর স্মার্তসংস্কারই তাঁদের

বাধা দিয়েছে। বৃন্দাবনের প্রধান তিন গোস্বামী (সনাতন, রূপ, জীব) সম্ভবতঃ শ্রীকৃষ্ণ-রাধার পরকীয়া সম্পর্ক সম্বন্ধে কিছু সংকুচিত ছিলেন। সেইজন্য রূপ-গোস্বামী তাঁর নাটকে প্রকারান্তরে কৃষ্ণের স্বকীয়া নায়িকাই সমর্থন করেছেন। এই বাংলাদেশে একবার রাধাকৃষ্ণের স্বকীয়া না পরকীয়া নায়িকা (অর্থাৎ অন্যের বিবাহিতা স্ত্রী) এই নিয়ে একটি বিচিত্র বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা গোড়া থেকেই পরকীয়া মতে আসক্ত ছিলেন। কিন্তু গৌড়ভূমির বাইরে অনেক বৈষ্ণব পণ্ডিত ও ভক্ত এ মতবাদ স্বীকার করতেন না। কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য নামক জয়পুর-রাজ সওয়াই জয়-সিংহের সভাপণ্ডিত স্বকীয়া মতের প্রধান প্রবক্তা ছিলেন। তাঁর নাম থেকে তাঁকে গৌড়ীয় বলে মনে হচ্ছে। ব্রজধামে তাত্ত্বিকমহলে স্বকীয়া মত প্রতিষ্ঠিত ছিল, কৃষ্ণদেব সেই মতের প্রধান প্রচারক ছিলেন। তাঁর যুক্তির কাছে পরাভূত হয়ে ব্রজধামবাসী কিছু কিছু গৌড়ীয় বৈষ্ণব পরকীয়া মত পরিত্যাগ করে স্বকীয়া মত গ্রহণ করেন। কৃষ্ণদেব উত্তরাপথের পরকীয়াপন্থী সমস্ত বৈষ্ণবকে পরাভূত করে পরকীয়া মতের দুর্গস্বরূপ গৌড়ে আবির্ভূত হয়ে পরকীয়াপন্থীদের তর্কযুদ্ধে আহ্বান করেন। মুর্শিদাবাদের নিকট মালিহাটি গ্রামে 'পদামৃত-সমুদ্রে'র সংকলক ও টীকাকার রাধামোহন ঠাকুরের সভাপতিত্বে এই বিচিত্র বিতর্কসভা অনুষ্ঠিত হয়। দুপক্ষেই পণ্ডিত ও আচার্যগণ বহু পুঁথিপত্র নজির হিসেবে উপস্থিত করেন। প্রায় ছ'মাস ধরে এই বিতর্ক চলেছিল। ব্যাপারটি এতই গুরুত্বপূর্ণ ও কৌতূহল-জনক ছিল যে, সুবাদার মুর্শিদকুলি খাঁ এটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কয়েকজন উচ্চপদস্থ মুসলমান কর্মচারীকেও নিয়োগ করেন। সাক্ষী হিসেবে তাঁদের নামও পাওয়া যায়। দীর্ঘদিন ধরে এই বিতর্ক চলার পর স্বকীয়া মতের পরিপোষক কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য পরকীয়া মতের সমর্থক গৌড়ীয় বৈষ্ণব তাত্ত্বিক রাধামোহন ঠাকুরের কাছে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হন এবং নিজ স্বকীয়া মত পরিত্যাগ করে পরকীয়া মত গ্রহণ করেন। রাধামোহনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে এই মর্মে 'অজয় পত্র' লিখে দেন, "মালিহাটি মোকামে তোমার (অর্থাৎ রাধামোহন ঠাকুর) নিকট স্বকীয় পরকীয় ধর্ম্ম-বিচার অনেক মত করিলাম এবং শ্রীমৎ ভাগবত এবং পুরাণ এবং শ্রীশ্রী৺ গোস্বামীদিগের ভক্তিশাস্ত্র লইয়া সিদ্ধান্তমতে স্বকীয় ধর্মের স্থাপন হইল না (।) ইহাতে পরাভূত হইয়া অজয়পত্র লিখিয়া দিলাম এবং শিষ্য হইলাম (।) ইতি সন ১১১৭ সাল নি বাং সাং ১১১৮ সাল মাহ বৈশাখ।" এই ঘটনা থেকে দেখা যাচ্ছে বাংলার বৈষ্ণবদের পরকীয়া তত্ত্ব সুদৃঢ় যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু যুক্তির চেয়ে সংস্কার বড়ো। তাই উত্তরা-পথে পরকীয়া তত্ত্বের চেয়ে স্বকীয়া তত্ত্বের প্রাধান্য। এই সমস্ত দ্বান্দ্বিক ও বিতর্কমূলক ব্যাপারের জন্যই কি হিন্দী ও হিন্দীর উপভাষায় শ্রীকৃষ্ণের বাৎসল্যলীলার প্রতি অধিকতর গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে, এবং বাংলা পদাবলী সাহিত্যে পরকীয়া প্রেমের এত প্রাধান্য থাকলেও বাৎসল্যলীলার উৎকৃষ্ট পদ আঙুলে গণনা করা যায়? অবশ্য কৃষ্ণের বাৎসল্যলীলাও একদিক থেকে পরকীয়া লীলা। কারণ জননী যশোদা তাঁর পালয়িত্রী, গর্ভধারিণী নন। তাই কি বাৎসল্য রসের পদে তাঁর মনে এত 'হারাই-হারাই' ভয়? সে

যাই হোক, শ্রীমতী গৌরী সেন কৃষ্ণের বাল্যলীলা-সংক্রান্ত পদসাহিত্যের বিশ্লেষণে ও তুলনামূলক আলোচনায় অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছেন।

বালগোপাল ও যিশুর বাল্যজীবন সংক্রান্ত রচনা ও শিল্পনিদর্শন সম্বন্ধে তাঁর আলোচনা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত হয়েছে। এ-বিষয়ে তিনি মনগড়া থিয়োরীর উপর নির্ভর না করে উপযুক্ত তথ্যের উপর বেশী নির্ভর করেছেন, তাই তাঁর সিদ্ধান্ত তর্কাতীত।

তাঁর এই আলোচনায় বহু সংস্কৃত ও হিন্দী রচনা উদ্ধৃত হয়েছে, অধিকাংশ-স্থলেই তিনি তার সরল অনুবাদ দিয়েছেন এবং সে অনুবাদ মূলের মতোই স্বচ্ছ হয়েছে। ফলে যে-কোনো বাঙালী পাঠকের পক্ষেই তার তাৎপর্য অনুধাবন করা সহজ হবে। তাঁর ভাষাভঙ্গী অত্যন্ত সুগম ও স্বচ্ছন্দ। তাঁকে রসতত্ত্ব নিয়ে বহু বুদ্ধি-গ্রাহ্য আলোচনা করতে হয়েছে, কিন্তু ভাষার স্বাদু গুণের জন্য তাঁর বক্তব্য কোথাও অস্পষ্ট অথবা দুর্বোধ্য হয়নি। বাংলা গবেষণা-গ্রন্থ বলতেই যাঁরা শঙ্কিত হন, তাঁদের আশ্বাসের জন্য বলা যেতে পারে যে, ড. গৌরী সেনের এ গ্রন্থ নীরস, নিষ্প্রাণ ও তথ্যভারমন্থর নয়। এটি অতিশয় সুখপাঠ্য হয়েছে। আশা করি বাঙালি ও অবাঙালি পাঠক, উভয়েই এই গ্রন্থ থেকে হৃদ্যতর মানসিক ভোজ্য লাভ করবেন। লেখিকাকে এই জন্য অভিনন্দিত করি।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবেশক

বাৎসল্যের অনুভূতি মূলতঃ একটি জৈবানুভূতি। এ অনুভূতি সকল নর-নারীর মধ্যেই কমবেশি বিদ্যমান। এমন কি, প্রাণী-জগতেও সন্তান-বাৎসল্যের অস্তিত্ব সুপ্রমাণিত। বলা যেতে পারে, যত প্রকার মানবিক সম্বন্ধ আছে তার মধ্যে বাৎসল্য সবচেয়ে ব্যাপক। মধুররসাশ্রিত সম্পর্ক গভীরতর কিন্তু বাৎসল্যের মতো ব্যাপক নয়, হওয়া সম্ভবও নয়। স্বামী-স্ত্রী বা প্রণয়ী-প্রণয়িনীর গভীর অনুভূতি অবলম্বন করেই মধুর ভাবের উদ্ভব ও বিকাশ। সুতরাং মধুর রসের বিচরণক্ষেত্র অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ।

মধুর ভাবের অনুভূতি কেন্দ্র করে আমাদের সকল প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যে অসংখ্য কাব্য ও কাহিনী রচিত হয়েছে; প্রাচীন আলংকারিকেরা হৃদয়ের মধুর অনুভূতি ব্যাখ্যা করে সংস্কৃত রসশাস্ত্র সমৃদ্ধ করেছেন। অথচ মানব মনের যে অনুভূতি ব্যাপকতর সেই বাৎসল্যকে তাঁরা উপেক্ষা করেছেন। এই উপেক্ষার জন্য বিস্ময় প্রকাশ করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র।

বাৎসল্য প্রথম মর্যাদা লাভ করে মধ্যযুগীয় বৈষ্ণব অলংকারশাস্ত্রে এবং বৈষ্ণব পদাবলীতে। বৈষ্ণব সাধকেরা ঈশ্বরের সঙ্গে মানবিক সম্পর্ক স্থাপন করে তাঁকে দৈনন্দিন জীবনের পরিবেশে গভীরভাবে উপলব্ধি করবার জন্য উৎসুক ছিলেন। তাই তাঁরা ঈশ্বরকে আরাধনা করেছেন সখা, সন্তান, প্রিয়তম ইত্যাদি হিসাবে। ভক্ত যখন ভগবানকে সন্তান হিসাবে আরাধনা করেন তখন তাঁর ঐশ্বর্যরূপ অবসৃত হয়, ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হবার পথে কোনো অন্তরায় থাকে না। সন্তান হিসাবে ভক্ত ভগবানকে লালন, পালন, শাসন ইত্যাদির ভাবে ভাবিত হয়ে উপাসনা করেন। সন্তানের প্রতি মা'র স্নেহ স্বার্থলেশহীন। বৈষ্ণব-পদাবলীতে, বিশেষ করে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের ভক্তি-সাহিত্যে, পরকীয়া তত্ত্বের প্রাধান্য। মধুররসের এই পরকীয়া তত্ত্বের ভাবনা বাৎসল্যের ক্ষেত্রেও প্রসারিত হয়েছে। তাই পদাবলী সাহিত্যে দেবকী ও বসুদেবের ভূমিকা নগণ্য; পদকর্তারা কৃষ্ণের যথার্থ মাতা দেবকীকে পশ্চাতে রেখে পালনকর্ত্রী যশোদাকে অবলম্বন করে বাৎসল্যরসের বিস্তার দেখিয়েছেন। বাঙালী বৈষ্ণব কবিদের এই পরকীয়া বাৎসল্যের ঐতিহ্য পরবর্তীকালের লেখকদেরও হয়ত প্রভাবান্বিত করেছে। বাংলা কথাসাহিত্যের অনেক নারী চরিত্র পরকীয়া মাতৃত্বের দীপ্তিতে উজ্জ্বল। এই প্রসঙ্গে আমাদের প্রথমেই মনে পড়ে গোরার আনন্দময়ী এবং পল্লীসমাজের জ্যাঠাইমাকে।

গৌড়ীয় বাৎসল্যরসাশ্রিত পদাবলী একমাত্র কৃষ্ণ-নির্ভর নয়। গৌরাঙ্গের প্রতি শচীমাতার বাৎসল্য কৃষ্ণ-বাৎসল্যের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে। বাঙালী পদকর্তারা

শচীর বাৎসল্য অবলম্বনে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট পদ রচনা করেছেন। এই বিশেষ সুযোগ অন্য ভাষার কবিরা পাননি। তাঁদের একমাত্র অবলম্বন ভাগবত-বর্ণিত কৃষ্ণ-কাহিনী।

কৃষ্ণকেন্দ্রিক বাৎসল্যের স্থিতি যদি অলৌকিক স্তরেই নিবদ্ধ থাকত তাহলে বাৎসল্য-রসাশ্রিত পদাবলী মানবিক গুণে সমৃদ্ধ হবার সুযোগ পেত না এবং তা নিয়ে আলোচনা হত অসার্থক। কিন্তু পদকর্তারা দেবতার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন মানুষের কথা, তাঁদের ঘর-সংসারের কথা। কৃষ্ণের প্রতি ভক্তের বাৎসল্য রূপান্তরিত হয়েছে আমাদের চিরপরিচিত পুত্রের প্রতি মাতার স্নেহে। অলৌকিক কৃষ্ণ কবির মানবিক স্পর্শে ঘরের শিশুরূপে আমাদের হৃদয়ের প্রতিবেশী হয়ে উঠেছেন। বাৎসল্যরসের পদাবলীতে এই মানবিক গুণ থাকার জন্যই আমাদের সাহিত্যে, শিল্পে, সংগীতে এবং বৈষ্ণবেতর ধর্ম-সাধনাতেও এর প্রভাব পড়েছে। অথচ হিন্দীতে থাকলেও, যতদূর জানা যায়, বাংলায় বাৎসল্যরসের বৈষ্ণব পদাবলী সম্বন্ধে পৃথক কোন বিস্তৃত আলোচনা নেই। বর্তমান নিবন্ধে বাৎসল্য রসাশ্রিত বাংলা ও হিন্দী বৈষ্ণব পদাবলীর স্বরূপ, বৈশিষ্ট্য, বিবর্তন এবং অন্যান্য রসের সঙ্গে সম্বন্ধ ইত্যাদি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ইতিপূর্বে বাংলায় বাৎসল্যরসের পদাবলী নিয়ে এরূপ বিস্তৃত আলোচনা হয়নি বলেই আমাদের বিশ্বাস। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে রচিত বাংলা ও হিন্দী বাৎসল্যরসের বৈষ্ণব পদাবলী ভিত্তি করেই আমাদের বর্তমান আলোচনা। এই কালখণ্ড পদাবলী সাহিত্যের স্বর্ণযুগ। আসাম থেকে গুজরাট পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বৈষ্ণব পদকর্তারা ভক্তিরসে আপ্লুত হয়ে অসংখ্য প্রথম শ্রেণীর পদ রচনা করেছেন। শংকরদেব, চণ্ডীদাস(দীন), জ্ঞানদাস, গোবিন্দ দাস ও সুরদাস প্রমুখ অষ্টছাপের কবি-গোষ্ঠী, মীরা, নরসিংহ, পোতনা, এড়ুওচ্ছন প্রভৃতি সাধক কবিরা আলোচ্য দুই শতাব্দীর মধ্যে আবির্ভূত হয়ে কৃষ্ণের বাল্য এবং অন্যান্য লীলা অবলম্বনে উৎকৃষ্ট পদ রচনা করেছেন। এর পূর্বেও অবশ্য কৃষ্ণবিষয়ক বাৎসল্যের কিছু কিছু পদ রচনা করেছেন তামিলভাষী আড়বার সম্প্রদায় এবং অন্যান্য সাধকরা। কিন্তু অনুভূতির গভীরতায় এবং গুণগত উৎকর্ষে এই সব পদ সুরদাস প্রভৃতির রচনার সমকক্ষ নয়।

কৃষ্ণ-ভক্তির বন্যার সমান্তরালে উত্তর ভারতে চলছিল রাম-উপাসনার ধারা। রাম-ভক্তি প্রচারের পুরোধা তুলসীদাস এই কালখণ্ডেরই সাধক কবি। তাঁর কাব্যেও বাৎসল্যরসের উদাহরণ পাওয়া যায়।

নিজেরা পদ রচনা না করলেও চৈতন্যদেব এবং বল্লভাচার্যের জীবন ও বাণী বৈষ্ণব কবিদের পদ রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছে। বল্লভাচার্য বালগোপালের পূজার প্রবর্তন করে অষ্টছাপের কবিদের প্রত্যক্ষ প্রেরণা দিয়েছেন বাৎসল্যরসের পদ রচনায়। ঠিক তেমনি গৌরাঙ্গের জন্য শচীমাতার স্নেহ বাঙালী পদকর্তাদের নিকট ছিল বাৎসল্যানুভূতির মূর্ত প্রকাশ।

বৈষ্ণব ভক্তিরসশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ আলংকারিক রূপগোস্বামী বাৎসল্য এবং অন্যান্য রসের সংজ্ঞা নির্দেশ করে, বিভিন্ন স্তরের ব্যাখ্যা করে কাব্যরসের সঙ্গে ভক্তিরসের সমন্বয় সাধনের পন্থা নির্দেশ করে পদকর্তাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে সহায়তা করেছেন।

চেতন্য, বল্লভাচার্য, রূপগোস্বামী এবং আরও বহু মহাজন আলোচ্য দুই শতাব্দী-কালেই আবির্ভূত হয়েছিলেন। এই সব কারণেই বর্তমান নিবন্ধে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের পদাবলী সাহিত্য আলোচনার জন্য গ্রহণ করা হয়েছে। পরবর্তী কালের পদাবলী পুনরাবৃত্তি মাত্র, তাতে মৌলিকতা কমই আছে।

আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়টিকে মূল বক্তব্যের ভূমিকা হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। বৈষ্ণব ধর্ম ও পদাবলী সাহিত্যের গোড়ার কথা এখানে সংক্ষেপে বলা হয়েছে। বৈষ্ণব ধর্ম বৃহত্তর ভক্তিধর্মের অন্যতম প্রধান শাখা। সুতরাং প্রথমেই ভক্তিবাদের বিকাশের ধারাটি অনুধাবন করে বলা হয়েছে বৈষ্ণব ধর্ম প্রসারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। বৈষ্ণব ধর্মের প্রাণপুরুষ কৃষ্ণের বিবর্তনের ধারাটিও এই সঙ্গে অনুসরণ করা হয়েছে বেদের যুগ থেকে পুরাণের কাল পর্যন্ত। মধ্বাচার্য, বিষ্ণু-স্বামী, নিম্বার্ক, রামানুজ প্রভৃতি আচার্যগণ বৈষ্ণব ধর্মকে নিছক ভাবাবেগের আরাধনা থেকে উদ্ধার করে দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এঁদের দার্শনিক মতবাদের মূল তত্ত্বটি উল্লেখ করে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। চৈতন্যদেব কর্তৃক উজ্জীবিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করা হয়েছে একটি পৃথক অনুচ্ছেদে।

পদাবলীর পূর্বে ছিল কৃষ্ণলীলার নাট্যরূপ ও কাব্য-কাহিনী। পুরাণে ও সাহিত্যে কৃষ্ণলীলার সূত্রপাত কিভাবে ঘটেছে তার কিছু পরিচয়ও এই অধ্যায়েই দেওয়া হয়েছে। আধুনিক ভারতীয় ভাষায় পদাবলীর আবির্ভাব হঠাৎ হয়নি। পালি ও প্রাকৃত সাহিত্যের প্রকীর্ণ গীতিকবিতায় পদাবলীর পূর্বাভাস যে পাওয়া যায় তা দৃষ্টান্তসহ দেখানো হয়েছে। পদাবলীর সাধারণ লক্ষণগুলি উল্লেখ করবার পর যথাক্রমে বাংলা পদাবলী ও হিন্দী কৃষ্ণকাব্যের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করে পরবর্তী দু'টি অনুচ্ছেদে দেখানো হয়েছে কৃষ্ণযাত্রা, ধামালী প্রভৃতি লৌকিক অনুষ্ঠান কি ভাবে পদাবলী সাহিত্যকে প্রভাবান্বিত করেছে এবং কি ভাবে অন্যদিকে পদাবলী সাহিত্যের প্রভাব পড়েছে শিল্পে, কাব্যে ও সংগীতে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথমার্ধে আছে রসের আলোচনা। আমাদের মুখ্য বিষয় বাৎসল্যরস, যা নয়টি ভক্তিরসের একটি। সুতরাং প্রথমেই রসের পরিচয় নেওয়া প্রয়োজন। প্রাচীন আলংকারিকেরা ভক্তি ও বাৎসল্যকে রস হিসাবে স্বীকৃতি দেননি। গৌড়ীয় রসশাস্ত্রে এদের যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। গৌড়ীয় বা বৈষ্ণবীয় রস-শাস্ত্র প্রাচীন আলংকারিকদের নিকট ঋণী। কিছু বর্জন, সংযোজন ও নতুন ব্যাখ্যার দ্বারা বৈষ্ণব আলংকারিকেরা সংস্কৃত রসশাস্ত্রকে ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে প্রসারিত করেছেন। তাই বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের মর্মার্থ সম্যক উপলব্ধি করবার জন্য সংস্কৃত রসশাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেওয়া হয়েছে। তা থেকে মুখ্য ও গৌণ রস এবং মুখ্য ও গৌণ রতি, স্থায়ী ও সঞ্চারীভাব, ইত্যাদি সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করা যাবে। সংস্কৃত ও বৈষ্ণবীয় রস-শাস্ত্রের মধ্যে মূল পার্থক্য কি তা সংক্ষেপে বলা হয়েছে। বৈষ্ণবীয় রসশাস্ত্রের রচয়িতারা প্রায় সকলেই বাঙালী আচার্য। এঁদের রচিত রসশাস্ত্র হিন্দী কৃষ্ণকাব্যের কবিরা

কি গ্রহণ করেছেন ? এই প্রশ্নের একটা উত্তরও জানবার চেষ্টা করা হয়েছে এ প্রসঙ্গে।

দ্বিতীয়ার্ধে আছে বাৎসল্যরসের বিস্তৃত বিশ্লেষণ। ঋগ্বেদ থেকে ভাগবত পুরাণ পর্যন্ত বিভিন্ন ধর্ম ও সাহিত্য গ্রন্থে বাৎসল্যের উল্লেখ দৃষ্টান্তসহ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অলংকারশাস্ত্রে বাৎসল্যরসের স্থান কি তারও আলোচনা পাওয়া যাবে। ডঃ ভাণ্ডারকর প্রমুখ কয়েকজন পণ্ডিত বলেছেন, বালগোপালের উপাসনা বালক যীশুর আরাধনার দ্বারা প্রভাবান্বিত। হয়ত বিদেশী বণিকরা এই আরাধনা-পদ্ধতি এদেশে আনবার ফলে বালগোপাল উপাসনার সূচনা হয়েছে। কিন্তু এ তত্ত্ব যে যুক্তিসহ নয় তার প্রমাণ পাওয়া যায় বেদ এবং অন্যান্য খ্রীস্টপূর্বাব্দে রচিত ধর্মগ্রন্থে। এই সব ধর্মগ্রন্থে দেবতাকে সন্তান হিসাবে গণ্য করবার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে।

বরং বিপরীতটাও সত্য হতে পারে। হয়ত বালগোপালের কাহিনী পৌঁছেছিল জেরুজালেম এবং য়ুরোপে, এবং তার ফলেই বালক যীশুর আরাধনার সূত্রপাত হয়। প্রাচ্যদেশীয় পণ্ডিতরা প্রাচ্যদেশীয় জিনিসের উপঢৌকন নিয়ে সদ্যোজাত যীশুকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন। ইতালিতে বালক যীশুর যে কাষ্ঠমূর্তি নিয়ে শোভাযাত্রা প্রতি বৎসর রাজপথ পরিক্রমা করে সে মূর্তির রঙ্ কালো। শ্বেতকায় মানুষের কৃষ্ণবর্ণের দেবতা আরাধ্য হওয়া বিশেষ ইঙ্গিতপূর্ণ। এ-বিষয়ে একটু বিস্তৃত আলোচনাই করা হয়েছে এ অধ্যায়ে।

তৃতীয় অধ্যায়ে দশজন বাৎসল্যরসের মুখ্য পদকর্তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। পাঁচ-জন আলোচিত বাঙালী কবি হলেন চণ্ডীদাস, বাসুদেব ঘোষ, বলরাম দাস, জ্ঞানদাস এবং রায়শেখর। হিন্দী পদকর্তাদের মধ্যে আছেন সূরদাস, কুম্ভনদাস, পরমানন্দ দাস, নন্দদাস এবং রসখান। এই সব মহাজনদের সংক্ষিপ্ত জীবনী ব্যতীত তাঁদের রচিত বাৎসল্যরসের পদাবলীর বৈশিষ্ট্য উদ্ধৃতি সহযোগে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এঁদের মধ্যে অনেকেই মধুররসের উৎকৃষ্ট পদ রচনা করেছেন। কিন্তু সে বিষয়ে উল্লখ করা হলেও বিস্তৃত আলোচনা করা হয়নি, কারণ বর্তমান আলোচনায় তা প্রায় অবান্তর।

চতুর্থ ও শেষ অধ্যায়ের বিষয় হল বাংলা ও হিন্দী বাৎসল্য রসের পদাবলীর তুলনামূলক বিস্তৃত আলোচনা। দেখা যায় উভয় ভাষার কবিরাই ভাগবতবর্ণিত কৃষ্ণ কাহিনীর নানা প্রসঙ্গ অবলম্বন করে পদ রচনা করেছেন। কিন্তু হিন্দী কবিরা ভাগ-বতের প্রতি অধিকতর বিশ্বস্ততার প্রমাণ দিয়েছেন। তবে কোন ভাষার কবিরাই ভাগ-বতের অন্ধ অনুকরণ করেননি। প্রসঙ্গটি এক হলেও প্রত্যেক কবিই তাঁদের নিজস্ব প্রতিভা দিয়ে পুরনোকে নতুন করে তুলেছেন। বালগোপালের উপাসক বল্লভাচার্য হিন্দী বাৎসল্যের পদ রচনায় প্রেরণা দিয়েছেন ; চৈতন্যদেবের জীবনকাহিনী অবলম্বনে পদ রচনায় বাঙালী কবিরা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। অনেক ক্ষেত্রে ভাগবতের কৃষ্ণ-প্রসঙ্গ চৈতন্যের উপর আরোপিত করে বাৎসল্যের পদ রচনা করেছেন বাঙালী কবিরা।

নিবন্ধ রচনা-প্রসঙ্গে : নিবন্ধ রচনা প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা প্রথমেই বলে দেওয়া উচিত। তা হল :

অনুবাদ— সংস্কৃত, হিন্দী এবং অন্য দু'একটি ভাষার অংশ বিশেষের অনুবাদ

নিবন্ধে দেওয়া হয়েছে। এ সব অনুবাদ আক্ষরিক নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মূল ভাবটি বাংলায় বলা হয়েছে। আক্ষরিক অনুবাদ অনেক ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি করে। যেমন, একজন গোপিনী যশোদাকে বলছেন, "বড়ে বাপ কি বেটী, পূত হি ভলী পঢ়রাতি বানী।" এর আক্ষরিক অনুবাদ হবে : "বড়লোক বাপের মেয়ে তুমি ছেলেকে ভাল কথা পড়াচ্ছ।" আমাদের অনুবাদ হবে : "বড়লোকের মেয়ে, তুমি তো ছেলেকে ভালো কাজ শেখাচ্ছ!" গোপিনী কৃষ্ণের ঘরে ঘরে মাখন চুরি প্রসঙ্গে এই কথা বলেছিল। সমগ্র পদটি প্রায়ই উদ্ধৃত করা হয়নি। তাই পূর্বসূত্র বুঝতে অসুবিধা না হয় ভাবানুবাদ সেই দিকে দৃষ্টি রেখে করা হয়েছে।

প্রতিবর্ণীকরণ— ঙ, ঞ, ন, ম প্রভৃতি অন্য বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যে যুক্তবর্ণ সৃষ্টি করে তার জটিলতা দূর করবার জন্য আধুনিক হিন্দীতে উপরে একটি বিন্দু বসিয়ে ঙ বা ন-এর অস্তিত্ব নির্দেশ করা হয়, যেমন নংদ (নন্দ), সদেংসা (সন্দেশ—সংবাদ), কুংভনদাস (কুম্ভনদাস) সংগ (সঙ্গ) ইত্যাদি। অর্থাৎ বর্গের পঞ্চম বর্ণ সাধারণতঃ বিন্দু দিয়ে বোঝানো হয়। বাংলায় এই রীতি অনুসরণ করলে বাঙালী পাঠকের পক্ষে মূল শব্দটিকে যথার্থরূপে অনুধাবন করা কঠিন হবে। তাই আমরা নংদ না লিখে বাংলা রীতিতে নন্দই লিখেছি।

কবি নির্বাচন— তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা দশজন বাৎসল্য রসের পদাবলীর কবি নির্বাচন করেছি কাব্যগুণ এবং পদসংখ্যার ভিত্তিতে। গোবিন্দদাসকে নেওয়া হয়নি এই কারণে যে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার গোবিন্দদাস নামাংকিত বাৎসল্যের পদগুলি প্রসিদ্ধ কবির রচনা কিনা সে বিষয়ে নিঃসংশয় নন। অবশ্য তাঁর কিছু পদ আমরা চতুর্থ অধ্যায়ে ব্যবহার করেছি। বাংলা বাৎসল্য রসের পদাবলীর সংখ্যা সীমিত এবং তাতে বৈচিত্র্য কম। এই অভাব পূরণের জন্য তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত পাঁচজন বাঙালী কবির বহির্ভূত দু'একজন পদকর্তার রচনা গ্রহণ করতে হয়েছে। হিন্দীর ক্ষেত্রে এ প্রয়োজন অনুভূত হয়নি।

পুনরুক্তি— অনেক ক্ষেত্রে একই পদ একাধিকবার উদ্ধৃত করতে হয়েছে। যেমন, তৃতীয় অধ্যায়ে সূরদাসের আলোচনায় যে পদটি ব্যবহার করা হয়েছে চতুর্থ অধ্যায়েও হয়ত সেই পদটিই পাওয়া যাবে। একটি বিষয়ের উপর খুব অল্পসংখ্যক পদ থাকায় এরূপ পুনরুক্তি অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।

কয়েকটি শব্দ— এ নিবন্ধে আমরা কয়েকটি হিন্দী শব্দ ব্যবহার করেছি যাদের সঠিক বাংলা প্রতিশব্দ নেই। সেই জন্য সংক্ষিপ্ত টীকা দেওয়া হল।

অচ্ছদ— আতপ চাল, হলুদ, রোলি বা কোন রঙিন চূর্ণ, দূর্বা, চন্দন ইত্যাদি এক সঙ্গে পিষ্ট করে উৎসব অনুষ্ঠানে কপালে তিলক বা ফোঁটা পরানো হয়। অমঙ্গল থেকে রক্ষা করাই এর উদ্দেশ্য।

উবটন— ব্যসন, হলুদ, কোন গন্ধদ্রব্য ও তেল মিশ্রিত করে স্নানের পূর্বে গায়ে মাখানো হয়।

বলি জাউঁ— I offer myself.

বলেয়া লেউ— স্নেহের নিদর্শন স্বরূপে আপনজনের অমঙ্গল নিজে গ্রহণ করা।
বারি— বালাই বা অমঙ্গল নেওয়া।

গ্রন্থপঞ্জী— পাদটীকায় যে-সব গ্রন্থের উল্লেখ করা হয়েছে নিবন্ধের শেষে সংযোজিত গ্রন্থপঞ্জীতে তাদের পূর্ণতর বিবরণ পাওয়া যাবে। এ ছাড়া যে-সব বই পড়ে বিশেষ উপকৃত হয়েছি তাদেরও গ্রন্থপঞ্জীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পঞ্জীটি ভাষা হিসাবে বিন্যস্ত। লেখক ও বইয়ের নাম, প্রকাশের স্থান ও কাল, সংস্করণ ও পৃষ্ঠা-সংখ্যা প্রভৃতির বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এই শ্রেণীর নিবন্ধের গ্রন্থপঞ্জীতে সাধারণতঃ বইয়ের পৃষ্ঠা সংখ্যা দেওয়া হয় না। বইটি সঠিক রূপে চিহ্নিতকরণে পৃষ্ঠাসংখ্যার বিশেষ প্রয়োজন আছে। তাছাড়া নিবন্ধকারের সঙ্গে বইটির প্রত্যক্ষ পরিচয়ের এটি প্রমাণ। তবে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী একাধিক খণ্ডের বইয়ের পৃষ্ঠাসংখ্যা দেওয়া হয়নি।

বাংলায় বর্গীয় 'ব' ও অন্তঃস্থ 'ব' আকৃতিতে ও উচ্চারণে অভিন্ন। কিন্তু দেবনাগরীতে এই দুই 'ব'-এব আকৃতিও এর উচ্চারণে প্রভেদ আছে। পেটকাটা দেবনগরী 'ব'-এর উচ্চাবণ বাংলা 'ব'-মত। কিন্তু অন্তঃস্থ 'ব'-এর উচ্চারণ ইংরাজী 'W' বা উআ-র মত। হিন্দী উদ্ধৃতিগুলি বাংলা লিপিতে দেওয়ায় দুই ব-এ আকৃতি ও উচ্চারণগত পার্থক্য নির্দেশ করবার জন্য অন্তঃস্থ 'ব'-কে নিম্নরেখিত করা হয়েছে। যেমন— দেব়কী, হলরাবৈ ইত্যাদি।

উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা বেষ্ণব সাধনার এবং বৈষ্ণব পদাবলীর একটি অনালোচিত দিকের উপর আলোকপাত করতে চেষ্টা করা হয়েছে।

বর্তমান গ্রন্থটি পরলোকগত ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের তত্ত্বাবধানে কলকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের গবেষণা নিবন্ধ হিসাবে রচিত। নিবন্ধটি ১৯৭২ খ্রীস্টাব্দে ডি. ফিল উপাধি লাভের যোগ্য বিবেচিত হয়। আচার্য নীহাররঞ্জনের সস্নেহ উপদেশ এই কাজে আমাকে নিরন্তর উৎসাহিত কবেছে। গ্রন্থটির প্রকাশ তিনি দেখে যেতে পারলেন না, এজন্য গভীর বেদনা বোধ করছি।

তথ্য সংকলনেব জন্য আমি অনেকের নিকট ঋণী। সকলের নাম এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয় বলে আমি দুঃখিত। যাঁদের নিকট আমি বিশেষরূপে কৃতজ্ঞ তাঁদের মধ্যে অন্যতম বিশ্বভাবতীর অধ্যাপিকা ডঃ কণিকা তোমর ও কলকাতার সংস্কৃতি জগতে সুপরিচিতা ডঃ প্রতিভা অগ্রবাল। যখন যে প্রশ্ন নিয়ে এঁদের নিকট উপস্থিত হয়েছি তাঁরা সাগ্রহে তার সমাধান করে দিয়েছেন। সাহেবগঞ্জ কলেজে আমার সহকর্মী ডঃ রাধাকৃষ্ণ গোস্বামী তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত, হিন্দী ও বাংলা বই দিয়ে সহায়তা করেছেন। জাতীয় গ্রন্থাগারের কয়েকজন কর্মী সহৃদয়তার সঙ্গে আমার অধ্যয়নে সহায়তা করেছেন। তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

নিবন্ধের পাণ্ডুলিপি রচনায় এবং মুদ্রণের কাজে আমাকে সাহায্য করেছেন অনুজ-প্রতিম শ্রীসুনীল দাস ও শ্রীবিমলকুমার পাল। প্রকৃতপক্ষে এঁদের সানন্দ সহযোগিতা না পেলে নিবন্ধটির প্রকাশ সম্ভব হত না।

সবশেষে প্রণাম জানাই শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে, তাঁর ঋণ অপরিশোধ্য।

আমার কর্মক্ষেত্র বাংলার বাইরে। সুতরাং আমার পক্ষে প্রুফ দেখা সম্ভব হয়নি। তাই বেশ কিছু মুদ্রণ প্রমাদ রয়ে গেছে। এজন্য আমি পাঠকদের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী। সংযোজিত শুদ্ধিপত্র থেকে ভুলগুলি সংশোধন করে নিলে বাধিত হব।

বিভ্রান্তি ঘটেছে হ্রস্ব ও দীর্ঘ 'উ' নিয়ে। বিশেষ করে হিন্দী ও বাংলায় যে সব শব্দ প্রচলিত সেখানে হিন্দীর দীর্ঘ 'ঊ' বাংলা হ্রস্ব 'উ'-তে পরিণত হয়েছে। যেমন দুধ, ফুল, মুখ প্রভৃতি শব্দ হিন্দী উদ্ধৃতির মধ্যে বাংলা রূপেই ছাপা হয়েছে। এই ভুলগুলি শুদ্ধিপত্রে দেওয়া হল না।

বাংলা বিভাগ
সাহেবগঞ্জ কলেজ
বিহার

গৌরী সেন

সূচী

প্রথম অধ্যায়

বৈষ্ণব ধর্ম ও পদাবলী সাহিত্য

দ্বিতীয় অধ্যায়

বৈষ্ণব সাহিত্যে রস

তৃতীয় অধ্যায়

বাৎসল্যরসের মুখ্য পদকর্তাগণ

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলা ও হিন্দী বাৎসল্যরসের পদাবলী

মুখ্য পঞ্চ ভক্তিরস

শান্ত | দাস্য বা প্রীত | সখ্য বা শ্রেয়ঃ | বাৎসল্য | মধুর বা উজ্জ্বল

স্থায়ীভাব	গুণ	বিষয়ালম্বন	আশ্রয়ালম্বন	উদ্দীপন	অনুভাব	সাত্ত্বিকভাব	সঞ্চারীভাব
বাৎসল্য	স্নেহ	বাল গোপাল রূপে শ্রীকৃষ্ণ	নন্দ, যশোদা, রোহিনী, দেবকী, বসুদেব, জ্যেষ্ঠ গোপ ও গোপী-গণ, ইঃ	কৌমারাদি বয়স, রূপ, বেশ, চাপল্য, হাস্য, ননী খাবার লোভ, ইঃ	মস্তকাঘ্রাণ, আশীর্বাদ, লালনপালন, চুম্বন, আলিংগন, ইঃ	স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ প্রভৃতি ৮টি সাধারণ সাত্ত্বিকভাবের সঙ্গে অতিরিক্ত স্তন্যক্ষরণ	বাৎসল্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সকল ব্যভিচারী এবং অপস্মার

প্রথম অধ্যায়

বৈষ্ণবধর্ম ও পদাবলী-সাহিত্য

খ্রীস্টীয় ষোড়শ শতাব্দী ভারতীয় ভক্তিধর্মের স্বর্ণযুগ। ভারতবর্ষে, বিশেষভাবে সমগ্র উত্তরভারতে, ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠা, প্রচার এবং প্রসার হিন্দুমানসে যে প্রবল ভয়-ভাবনা, চিন্তায় যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, মনে হয়, তারই ফলশ্রুতিরূপে দেখা দিল নতুন এক ভক্তিধর্মের প্রাদুর্ভাব। এই ভক্তিধর্মের একদিকে সমন্বয়ের সাধনা ইসলামী-ভক্তিবাদ তথা সুফীবাদের সঙ্গে হিন্দু-ভক্তিবাদের সমন্বয়, অন্যদিকে হিন্দুসমাজের বর্ণ ও জাতিভেদের প্রাচীর অগ্রাহ্য করে বিভিন্ন বর্ণ ও জাতির সমন্বয়। এই সমন্বয় সাধনার নেতৃত্ব যাঁরা গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের নাম মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। কবীর, নানক, দাদু, শঙ্করদেব, বল্লভাচার্য, চৈতন্যদেব, তুকারাম, তুলসীদাস এবং আরো অনেকে ইতিহাসের এই যুগটিকে [ষোড়শ ও সপ্তদশ শতক] একটি নতুন ধর্ম ও মননের আলোকে আলোকিত করে রেখেছিলেন। কাব্যে, গানে, দোঁহায়, বিচিত্র বাণীর ভিতর দিয়ে হিন্দু জনমানসে এঁরা এক নতুন প্রেরণা সঞ্চার করেছিলেন। ধর্মীয়, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ওলট-পালটের অনিশ্চয়তার মধ্যে এইসব সাধক, কবি এবং সন্তদের বাণী ও দান হিন্দুমানসকে একটি নিশ্চিত ও নিশ্চিন্ত আশ্রয় দিয়েছিল। যে নামে এই আশ্রয়টি ইতিহাসে পরিচিত সে হল ভক্তিধর্ম।

ভক্তিবাদের বিকাশ

ভক্তিবাদ ও ভক্তিধর্ম ভারতবর্ষের ইতিহাসে নতুন কিছু নয়। কিন্তু নতুন কিছু না হলেও মধ্যযুগীয় ভক্তিধর্ম আর পূর্বতন ভক্তিধর্ম— এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য বিস্তর। ভারতেতিহাসে ভক্তিবাদের দুটি ধারা, একটি শৈব-শাক্ত অন্যটি বৈষ্ণব।

আমাদের আলোচনার নির্দিষ্ট কালখণ্ডে বৈষ্ণব ভক্তিধর্মের ছিল অবিসংবাদী প্রাধান্য; আলোচ্য বিষয় মধ্যযুগীয় ভক্তিবাদ। সুতরাং বৈষ্ণব ভক্তিবাদই আমাদের আলোচনার ক্ষেত্র। তবে, '...আরম্ভের পূর্বেও আরম্ভ আছে। সন্ধ্যাবেলায় দীপ জ্বালার আগে সকালবেলায় সলতে পাকানো।'[১] ভক্তিবাদের কথা বলবার পূর্বে তাই সকালবেলার সলতে পাকানোর কাজটুকু করে নিতেই হয়।

ঋগ্‌বেদে 'ভক্তি' শব্দের প্রয়োগ না থাকলেও অনেকগুলি সূক্তে ভক্তির ভাব প্রকাশ করা হয়েছে দেখা যায়। ইন্দ্র ও অগ্নির প্রতি মাতা পিতা এবং অন্যান্য মানবিক সম্পর্ক আরোপ করা হয়েছে [৩।১।৬]। অন্যত্র বলা হয়েছে, স্ত্রী যেমন স্বামীকে আলিঙ্গন করে তেমনি আমার স্তুতি তোমাকে [ইন্দ্রকে] আলিঙ্গন করে [১০।৪৩।১-২]।

বরুণসূক্তে ভক্তের ব্যাকুলতা অধিকতর পরিস্ফুট [ঋগ্‌বেদ, ৭।৮৩।২-৪]। কিন্তু উপনিষদেই আরাধ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার আকাঙ্ক্ষা তীব্রতর। বৃহদারণ্যক উপনিষদে ঋগ্‌বেদের স্বামী-স্ত্রীর আলিঙ্গনের উপমাটি গ্রহণ করে পুরুষ ও আত্মার নিবিড় মিলনের অনুভূতি গভীরতর রূপে প্রকাশ পেয়েছে [৪।৩।২১]। মুণ্ডক উপনিষদেও বলা হয়েছে যে, বেদ অধ্যয়নের দ্বারা মেধার সাহায্যে বা শাস্ত্রবাণী শ্রবণে তাঁকে পাওয়া যায় না; আত্মা যাঁকে বরণ করেন, তিনিই তাঁকে লাভ করেন [৩।২।৩]। ভক্তির প্রধান বৈশিষ্ট্য আত্মনিবেদন এবং অনুগ্রহ ভিক্ষা এখানে পরিস্ফুট হয়েছে।

যতদূর জানা যায়, 'ভক্তি' শব্দের প্রথম উল্লেখ করা হয়েছে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে :

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥ ইঃ৬।২৩।

অর্থাৎ, যাঁর পরমেশ্বর ও গুরুর প্রতি অচলা ভক্তি আছে কেবল তিনিই উপনিষদ বর্ণিত ঈশ্বর কথা উপলব্ধি করতে পারেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে পণ্ডিতদের মতে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ বৈদিক উপনিষদ সমূহের মধ্যে সর্বশেষে রচিত। এইজন্যই এখানে 'ভক্তি' শব্দটির প্রথম আবির্ভাব ভক্তিবাদের ক্রমবিবর্তনের ধারানুসারী হয়েছে।

শাণ্ডিল্যসূত্রই বোধহয় প্রথম প্রচলিত অর্থে ভক্তির স্বরূপ নির্দিষ্ট করে দেয়— 'সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।' অর্থাৎ, ঈশ্বরে ঐকান্তিক অনুরাগই ভক্তি।[২]

পরবর্তীকালের ভক্তিবাদে ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে যে নিবিড় একাত্মতার অনুভূতি দেখা যায় বেদ ও উপনিষদের যুগে তা ছিল না। ভক্তের হৃদয়ে সান্নিধ্যের আকাঙ্ক্ষা থাকলেও তখন পর্যন্ত আরাধ্য দেবতার অধিষ্ঠান ছিল মহিমার উচ্চ আসনে। ভক্তিবাদ ক্রমবিকাশের এই দুটি স্তর বিশ্লেষণ করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : 'দেবতারা যখন বাহিরে থাকেন, যখন মানুষের আত্মার সঙ্গে তাঁহাদের আত্মীয়তার সম্বন্ধ অনুভূত না হয়, তখন তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের কেবল কামনার সম্বন্ধ ও ভয়ের সম্বন্ধ। তখন

তাঁহাদিগকে স্তবে বশ করিয়া আমরা হিরণ্য চাই, গো চাই, আয়ু চাই, শত্রু পরাভব চাই ; যাগযজ্ঞ-অনুষ্ঠানের ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতায় তাঁহারা অপ্রসন্ন হইলে আমাদের অনিষ্ট করিবেন এই আশঙ্কা তখন আমাদিগকে অভিভূত করিয়া রাখে। এই কামনা এবং ভয়ের পূজা বাহ্য পূজা ; ইহা পরের পূজা। দেবতা যখন অন্তরের ধন হইয়া ওঠেন তখনই অন্তরের পূজা আরম্ভ হয়, সেই পূজাই ভক্তির পূজা।'[৩]

রবীন্দ্রনাথ উপরোক্ত নিবন্ধে আরো বলেছেন, 'এই ভক্তিধর্মের দেবতাই বিষ্ণু।' বিষ্ণু বৈদিক দেবতা, কিন্তু তিনি প্রধানতম দেবতা ছিলেন না। তাঁকে উদ্দেশ্য করে ঋগ্বেদে চার-পাঁচটির বেশি সূক্ত রচিত হয়নি। তবে বিভিন্ন প্রসঙ্গে তাঁর উল্লেখ আছে অনেকবার এবং তিনি যে পরাক্রমশালী দেবতা তারও পরিচয় পাওয়া যায়। বিষ্ণু গৃহসুখের কারণ [৬।৪৯।১৩] এবং গর্ভস্থ ভ্রূণের রক্ষাকর্তা হিসাবে [৭।৩৬।৯] ভক্তদের নিকট বিশেষ প্রিয় ছিলেন।

বেদের পরবর্তী ব্রাহ্মণ সাহিত্যে বিষ্ণুর প্রাধান্য স্বীকৃতি লাভ করে। তিনি অসুরদের পর্যুদস্ত করে পৃথিবীকে রক্ষা করেছেন।[৪] বিষ্ণুর এই রক্ষাকর্তার রূপটি সহজেই ভক্তদের আকৃষ্ট করেছে। কঠোপনিষদে বিষ্ণু শ্রেষ্ঠ দেবতা। সংসারজীবনের পরপারে বিষ্ণুর পাদপদ্মই একমাত্র আশ্রয়স্থল [১।৩।৯]।

ভক্তের পূজা পেলেও বিষ্ণু 'অন্তরের ধন' হয়ে উঠে 'অন্তরের পূজা' যে পাননি তা পরবর্তী ইতিহাস থেকে প্রমাণিত হয়। অন্তরের ধন হিসাবে পূজা পেয়েছেন তাঁরই অবতার কৃষ্ণ। কৃষ্ণ নামটিও প্রাচীন। ঋগ্বেদে দুজন কৃষ্ণের অস্তিত্ব জানা যায়। একজন ছিলেন ঋষি ; ঋগ্বেদের অষ্টম ও দশম মণ্ডলের কয়েকটি সূক্ত তাঁরই রচনা।

ঋগ্বেদে উল্লিখিত দ্বিতীয় কৃষ্ণ পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার প্রভৃতির মতে এক অনার্য বীর, যিনি দশ হাজার সৈন্য নিয়ে ইন্দ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন এবং অনিবার্যরূপেই পরাস্ত হয়েছিলেন।

দেবকীর পুত্র কৃষ্ণের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ছান্দোগ্য উপনিষদে। কৃষ্ণ এখানে ঋষি আঙ্গিরসের শিষ্য [৩।১৭।৬]। আঙ্গিরস কৃষ্ণের সঙ্গে যেসব আলোচনা করেছেন তার সঙ্গে গীতায় কৃষ্ণের উপদেশের মিল দেখা যায়। সুতরাং সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, ছান্দোগ্য উপনিষদের এবং গীতার কৃষ্ণ অভিন্ন। প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার দেখিয়েছেন কৃষ্ণকে আঙ্গিরসের শিষ্য হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে উপনিষদের সংশ্লিষ্ট শ্লোকের ভুল ব্যাখ্যার জন্য।[৫] প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণ যে তখন শিক্ষার্থীর স্তর অতিক্রম করেছেন তার প্রমাণ ঐ উপনিষদের পাঠের মধ্যেই রয়েছে।

পাণিনির ব্যাকরণে [৪।৩।৯৮ সংখ্যক সূত্রে][৬] এবং ভগবদ্গীতা, মহাভারত প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থে কৃষ্ণ বাসুদেবের উল্লেখ পাওয়া যায়। এইসব উল্লেখ থেকে প্রমাণিত হয় যে, বাসুদেবকে কেন্দ্র করে বৈষ্ণবধর্মের আদিরূপ ভাগবতধর্ম বুদ্ধদেবের জন্মের

পূর্বে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল। এ ছাড়া ঐতিহাসিক নিদর্শন থেকেও ভাগবতধর্মের প্রভাব সম্বন্ধে নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিক কুইন্টাস কার্টিয়াস আলেকজাণ্ডারের জীবনীতে লিখেছেন যে, পুরুর সৈন্যেরা দেবতা 'হেরাক্লিসের' মূর্তি নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যেত প্রেরণালাভের জন্য। ডঃ ভাণ্ডারকর 'হেরাক্লিস'-কে বাসুদেব কৃষ্ণ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

মেগাস্থিনিসের বিবরণেও পাওয়া যায় সমতলভূমির ভারতবাসীরা, বিশেষ করে শৌরসেন বা মথুরা অঞ্চলের অধিবাসীরা, হেরাক্লিসের পূজা করত।

গ্রীক রাষ্ট্রদূত হেলিওডোরাস (Heliodorus) গোয়ালিয়রের নিকটবর্তী ভিলসার সন্নিহিত বেসনগরে একটি স্তম্ভ নির্মাণ করে বাসুদেবের নামে উৎসর্গ করেছিলেন।

স্তম্ভের গাত্রের লেখমালা থেকে জানা যায় বাসুদেব 'দেবদেব' অর্থাৎ দেবতাশ্রেষ্ঠ। হেলিওডোরাস নিজেও ছিলেন বাসুদেবের পূজারী। এই স্তম্ভ আনুমানিক ১৮০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে নির্মিত হয়েছিল।[৮]

দেবতাদের মধ্যে শিব ছিলেন বিষ্ণুর প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বী। বিষ্ণু কতকগুলি বিশেষ গুণের জন্য জনচিত্তে অবিসংবাদী অধিকার স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই সম্বন্ধে অধ্যাপক ড্যানিয়েল ইংগলস্ বলেছেন : 'By late Classical times Visnu had so grown by the absorption of other Gods and cults that one may almost say that he was all things to all men....One can distinguish Visnu from Siva only by certain general tendencies. In general, the elements of terror is lacking in the concepts of Visnu. To this statement only the man-lion incarnation furnishes an exception. On the other hand, kindly human traits, which are rare in Saiva imagery, abound in Vaisnava. The personal incarnations of Visnu were more important in his worship than the cosmic force from which they were said to emanate. Visnu, not Siva, was worshipped as a child, a youth a, lover.'[৯]

বিষ্ণু এবং তাঁর অবতার কৃষ্ণকেই যদি ধর্মগ্রন্থে পাওয়া যেত, তবে হয়ত কৃষ্ণের স্বরূপ নির্ণয়ে এত সমস্যার সম্মুখীন হতে হত না। বৈদিক সাহিত্যে বিষ্ণুর আবির্ভাবের কিছুকাল পরে অনুরূপ গুণসম্পন্ন এবং শক্তিধর দেবতা নারায়ণের উল্লেখ পাওয়া যায়। বিষ্ণু ও নারায়ণ কী দুই পৃথক দেবতা ছিলেন, পরে এক হয়েছেন, না প্রথম থেকেই একই দেবতার দুই নাম? বাসুদেব ও কৃষ্ণ কী গোড়ায় ভিন্ন ছিলেন, পরে এক হয়েছেন? কৃষ্ণ কী বিষ্ণুর অবতার না কোনো ঐতিহাসিক বিরাট পুরুষ যাঁর কীর্তিকলাপে মুগ্ধ হয়ে ভক্তরা তাঁকে দেবত্বে উন্নীত করেছে? কোথায় পুরাণ শেষ এবং কোথায় ইতিহাসের শুরু? কৃষ্ণ অনার্য সভ্যতার ও সংস্কৃতির প্রতীক কিনা সে প্রশ্নও উঠেছে। পরবর্তীকালে রাধাকৃষ্ণের মধ্যে মিলনের যে আর্তি তা কী

আর্য অনার্য সভ্যতার মিলনের ব্যাকুলতা ? ডঃ ভাণ্ডারকর অন্য এক মৌলিক প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি বলেছেন, বহিরাগত আভীর জাতি আনীত খ্রীস্টের জীবনকথা কৃষ্ণ-কাহিনীর উৎস। যীশুর জীবনের সঙ্গে কৃষ্ণের অনেক সাদৃশ্য তিনি দেখিয়েছেন।[১০] কিন্তু হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী ও দীনেশচন্দ্র সরকারের মতে এই সাদৃশ্য যুক্তিসহ নয়। বিষ্ণুর আর-এক অবতার রামের সঙ্গে কৃষ্ণের যোগ আছে কিনা এবং উত্তর ভারতের এক বিস্তৃত অঞ্চলে কী করে কৃষ্ণের আধিপত্য দূর হয়ে ধীরে ধীরে রামের প্রভাব বিস্তার লাভ করল ?

এইসব প্রশ্ন ও সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান পণ্ডিতরা এখনো করতে পারেননি। সমস্যার জটে জড়িয়ে পড়বার প্রয়োজন আমাদেরও নেই। যে কৃষ্ণ কোটি কোটি ভক্তের হৃদয়ে বহু শতাব্দী যাবৎ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার আসনে প্রতিষ্ঠিত, যাঁর জীবন-কথা বিভিন্ন ভাষার কবিদের কাব্য রচনার প্রেরণা, যিনি অসংখ্য নরনারীকে মুক্তির পথ দেখিয়েছেন, ভক্তের নিকট সেই কৃষ্ণের সত্তা কোনো সমস্যার দ্বারা আচ্ছন্ন নয়।

বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার

মথুরার ক্ষুদ্র জনপদে বৃষ্ণি বা সাত্বতদের প্রবর্তিত কৃষ্ণ উপাসনা খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক নাগাদ প্রায় সর্বভারতীয় ধর্মের মর্যাদা লাভ করবার পথে অগ্রসর হয়। পুরু রাজার আমলে এবং তার পরবর্তী কয়েক শতাব্দীতে বাসুদেবের পূজা যে প্রচলিত ছিল তা পূর্বে বলা হয়েছে। এই কালখণ্ড খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ থেকে প্রথম শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত। বৌদ্ধযুগে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে খ্রীস্টজন্মের পরবর্তী কয়েক শতাব্দী উত্তর ভারতে ভাগবতধর্মের ক্রমবর্ধমান প্রভাব অনেকটা ক্ষীণ হয়ে পড়েছিল।

গুপ্তযুগে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে ভক্তিবাদ রাজকীয় স্বীকৃতি লাভ করল। গুপ্ত সম্রাটরা ছিলেন বৈষ্ণব। তাঁরা নিজেদের 'পরম ভাগবত' আখ্যায় ভূষিত করতেন। গুপ্ত সম্রাটদের রাজত্বকালে [৩২০ আঃ ৫০০ খ্রীঃ] বৈষ্ণবধর্ম সর্বপ্রথম একটা সংহত রূপ লাভ করে। খুব সম্ভব এই সময়ই কৃষ্ণ-বিষ্ণুর অভিন্নত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

পাঞ্জাব, পশ্চিমভারত এবং বাংলা পর্যন্ত সমগ্র উত্তরভারতে গুপ্ত সম্রাটদের রাজত্বকালে যে বৈষ্ণবধর্ম বিস্তার লাভ করেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় সমকালীন মুদ্রায়, শিলালেখে এবং বিষ্ণু অধিষ্ঠিত মন্দিরের প্রাচুর্যে। পরাক্রমশালী গুপ্ত সম্রাটদের আদর্শ অনুসরণ করে অনেক ছোটো ছোটো রাজ্যের রাজারাও বৈষ্ণবধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন।

শুধু উত্তরভারতে নয়, দক্ষিণভারতেও বৈষ্ণবধর্ম প্রসারলাভ করেছে। 'The Bhagavata Purana refers to South India, particularly the Tamil country, as a special resort of devotees of Visnu.'[১১]

শ্রীশ্রীমদ্‌ভক্তিবিলাস তীর্থমহারাজ দাক্ষিণাত্যে বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব সম্বন্ধে এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন: "পরম্পরাগত প্রবাদ হইতে জানা যায় যে বিষ্ণুস্বামী খ্রীষ্টপূর্ব শতাব্দীতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সেই সময় দক্ষিণ ভারতেই বৈষ্ণবধর্ম প্রচলিত ছিল। তিনি বিষ্ণুর নরসিংহ অবতারের উপাসক ছিলেন। খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর নানাঘাট শিলালিপি হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বৈষ্ণবধর্ম খ্রীস্টপূর্ব যুগে দাক্ষিণাত্যে অনুপ্রবেশ করিয়াছিল। খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে দক্ষিণভারতে কৃষ্ণা জেলায় যে চৈন শিলালিপি আবিষ্কৃত হয় তাহাতে দেখা যায় ঐ সময় রাজা ছিলেন যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণী এবং ঐ শিলালিপিতে ভগবান বাসুদেবের স্তব দেখতে পাওয়া যায়। খ্রীস্টীয় যুগের প্রথমভাগে দাক্ষিণাত্যে মন্দিরসমূহে কৃষ্ণবলরামের উপাসনা প্রচলিত ছিল।...যদিও গোঁড়া মতবাদিগণ বলিয়া থাকেন যে, আলোয়াড়গণ অতি প্রাচীনকালে জীবিত ছিলেন, তথাপি মনে হয় তাঁহারা খ্রীস্টযুগের প্রথম শতাব্দীতেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই আলোয়াড়গণ কৃষ্ণ নারায়ণের পরম ভক্ত ছিলেন এবং "প্রবন্ধম্"-নামক কবিতাবলীতে তাঁহাদের ভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন।"[১২]

বৈষ্ণব সাধকদের ভাবাবেগই একমাত্র সম্বল ছিল না। দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণবাচার্যগণ বৈষ্ণবধর্মকে দার্শনিক ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রামানুজ ও মধ্ব। তঁাদের মতবাদ মধ্যযুগের ধর্মসাধনাকে গভীর-ভাবে প্রভাবান্বিত করেছে।

গুপ্তসাম্রাজ্য পতনের পর হর্ষবর্ধনই [৬০৬-৪৭ খ্রীঃ] উত্তরভারতের সর্বশেষ পরাক্রমশালী হিন্দু নৃপতি। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন শৈব, পরে বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী হন। তাঁর পরে সমগ্র আর্যাবর্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সর্বদা যুদ্ধে লিপ্ত রাজ্যে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে পড়ে। এর কিছুকাল পরে মুসলমান আক্রমণ হিন্দুধর্ম ও সমাজে নতুন বিপর্যয় সৃষ্টি করল। সেই অবস্থায় আত্মরক্ষার সমস্যাই মুখ্য হয়ে উঠেছিল, ধর্মচর্চার প্রশ্ন ছিল গৌণ। সুতরাং উত্তরভারতে বৈষ্ণব সাধনার যে প্রচার ও প্রসার শুরু হয়েছিল তা কয়েক শতাব্দীর জন্য ক্ষীণ হয়ে পড়ল। মুসলমান রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পর যখন অরাজকতা দূর হয়ে শান্তি ফিরে এল তখন নতুন উদ্যমে বৈষ্ণব সাধকরা তাঁদের মতবাদ প্রচার করতে আরম্ভ করলেন।

দক্ষিণভারতে মুসলমান রাজত্বের বিস্তার ঘটেছে অনেক পরে। তা ছাড়া উত্তরাঞ্চলের মতো দক্ষিণাঞ্চলের বিজয় কখনো তেমন সম্পূর্ণ হয়নি। তাই দাক্ষিণাত্যে বৈষ্ণব ভক্তদের সাধনায় ছেদ পড়েনি। এই কারণেই উত্তরভারতে যখন বৈষ্ণবধর্মের পুনরভ্যুত্থান ঘটল তখন পূর্ব ইতিহাস বিস্মৃত হয়ে লোকের মনে এই ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল যে, বৈষ্ণব সাধনার আবির্ভাব ও বিকাশ দাক্ষিণাত্য থেকেই হয়েছে। একটি প্রচলিত শ্লোকে এ কথাটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে:

> 'উৎপন্না দ্রাবিড়ে ভক্তির্বৃদ্ধিং কর্ণাটকে গতা।
> অন্ধ্রদেশে ক্কচিৎ ক্কচিদ্ গুর্জরে বিলয়ং নীতা॥'[১৩]

অর্থাৎ, দ্রাবিড়দেশে উৎপন্ন হয়ে কর্ণাটক ও অন্ধ্রদেশে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে, ভক্তিবাদ যখন গুজরাটে পৌঁছল তখন তার অনেক বিকৃতি ও বিনাশ ঘটে গেছে।

মুসলমান রাজত্ব একটু স্থিতিলাভ করার পর উত্তরভারতে ভক্তিধর্মের পুনরভ্যুত্থান লক্ষ্য করা যায়। হিন্দুধর্মের উপর অত্যাচার কম হয়নি। মন্দির ধ্বংস হয়েছে, শাস্ত্রগ্রন্থের বহ্ন্যুৎসব হয়েছে, পুরোহিত ও পণ্ডিতদের প্রাণ দিতে হয়েছে। লাঞ্ছনার হাত থেকে মুক্তি পায়নি দেববিগ্রহ। ভক্তদের প্রকাশ্য দৃষ্টি থেকে বিগ্রহকে সরানো হল অন্ধকার গর্ভগৃহে। পাছে লোভীর দৃষ্টি পড়ে তাই অলংকার খুলে নিয়ে বিগ্রহকে করা হল রিক্ত। সেই পরিচিত ঐশ্বর্যময় মূর্তি গেল হারিয়ে। যেখানে দেবতা নিজেই বিপন্ন, সেখানে বড়ো বড়ো মন্দিরে পুরোহিতের সাহায্যে আচার-অনুষ্ঠান করে দেবতার কাছে প্রার্থনা জানানো অর্থহীন মনে হয়েছিল।

সেদিনকার পরিস্থিতিতে বিপদ আসতে পারত যে কোনো মুহূর্তে। যিনি সর্বদার সঙ্গী হবেন, যাঁকে প্রার্থনা জানাতে মন্দিরে যাবার দরকার নেই, পুরোহিত দিয়ে মন্ত্র পাঠ করাবার প্রয়োজন নেই, অন্তরে যাঁর বাস, বিপদে যিনি ভক্তকে রক্ষা করবেন, রবীন্দ্রনাথ যাঁকে বলেছেন 'অন্তরের ধন'— তেমন দেবতাই ছিলেন ভক্তের কাম্য। কৃষ্ণ ও রাম ছিলেন তেমনি অন্তরের ধন। তাই অতি সহজেই তাঁরা অসংখ্য ভক্তের হৃদয় অধিকার করতে পেরেছিলেন।

মুসলমান ধর্মের সংস্পর্শে এসে ভক্তিধর্ম কিছু নতুন প্রেরণা যে লাভ করেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রথমত নবাগত মুসলমানদের মধ্যে জাতিভেদের সংকীর্ণতা ছিল না। এই উদারতার সুযোগ নিয়ে তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর অনেক হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করা সহজ হয়েছিল। মধ্যযুগের ভক্তিধর্ম ইসলামের উদারতা গ্রহণ করেছে। জাতিবর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেকেই নিজের আরাধ্য দেবতাকে ভালোবাসবার ও আরাধনা করবার অধিকারী। ভক্তিবাদীরা 'জাতির দোহাই' দিয়ে পরস্পরের মধ্যে বিভেদের প্রাচীর তোলেননি। চৈতন্যদেব চণ্ডালকে কোল দিয়েছিলেন। উত্তরভারতে কয়েকজন ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব ভক্তিসাধক জাতির বাধাকে অগ্রাহ্য করে সমাজের সকল শ্রেণীর লোককে শিষ্যমণ্ডলীতে গ্রহণ করেছিলেন। গুজরাটের ভক্ত কবি নরসিংহ মেহ্‌তা [১৫০০-১৫৮৫] গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবার থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন হরিজনদের সঙ্গে মিলিতভাবে কৃষ্ণের সাধন ভজন করবার অপরাধে। গুরু রামানন্দ [চতুর্দশ শতাব্দী] ব্রাহ্মণ হলেও আচারের ধর্ম ত্যাগ করে হরিজন সম্প্রদায় থেকে অনেককে শিষ্য হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। এই শিষ্যদের মধ্যে কবীর, পীপা, রবিদাস প্রভৃতি বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। আবার তথাকথিত হরিজন সাধকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে উচ্চবর্ণের হিন্দুরাও কুণ্ঠিত হতেন না।

দ্বিতীয়তঃ, সুফী সম্প্রদায়ের সাধনপদ্ধতি বৈষ্ণব সাধকদের সমর্থন পেল। সুফী সাধকরাও বিশ্বাস করতেন ভগবানের সঙ্গে মানুষের মিলন প্রেমিক-প্রেমিকার মিলনের মতই মধুর ও রহস্যময়। তাঁদের গীতিকবিতায় মানবিক প্রেম ভগবদ্‌প্রেমে রূপান্তরিত হয়। তাঁরাও উপলব্ধি করেছিলেন, আমাদের পদাবলী

কীর্তনের মত ঈশ্বরানুরক্তিমূলক গীতিকবিতার সংগীত শ্রবণ ভগবদ্‌প্রেম উপলব্ধির সহায়ক।[১৪]

ভক্তিবাদের দার্শনিক ভিত্তি

ভক্তিবাদের আবেদন শুধু জনসাধারণের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল না। শিক্ষিত সমাজেও এর প্রচার ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ভাগবত ধর্মের আবির্ভাব হয়েছে খ্রীস্টজন্মের পূর্বে। বিষ্ণুর মহিমা বেদে, উপনিষদে এবং অন্যান্য গ্রন্থে কীর্তিত হয়েছে; ভক্তির ব্যাখ্যাও হয়েছে বিভিন্ন গ্রন্থে নানা দিক থেকে। কিন্তু ভক্তিবাদের বিভিন্ন চিন্তাধারাকে সংহত করে দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করবার উদ্যোগ একাদশ শতাব্দীর পূর্বে হয়নি।

ভক্তিবাদের কয়েকজন আচার্য দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধমুক্ত পরিবেশে এই কাজটি সম্পন্ন করলেন খ্রীস্টীয় একাদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে। এইসব আচার্যদের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ মূলতঃ ভক্তিবাদের আলোকে বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যা। কারণ, তাঁরা জানতেন, শাস্ত্রের অনুমোদন আছে দেখাতে পারলেই ভক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা সুদৃঢ় এবং দ্রুততর হবে। একটা দার্শনিক ভিত্তি পেয়ে সংশয়বাদী বুদ্ধিজীবীরাও ধীরে ধীরে ভক্তিবাদের প্রতি আকৃষ্ট হতে লাগলেন।

পদ্মপুরাণে চারটি প্রধান বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে

> অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ।
> শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকাঃ বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ॥[১৫]

অর্থাৎ, কলিকালে শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক এই চারটি পৃথিবী পবিত্রকারী বৈষ্ণব [সম্প্রদায়] থাকবে। এইসব সম্প্রদায়ের দার্শনিক মতবাদ ব্যাখ্যা করেছেন অনেক আচার্য। তাঁদের মধ্যে রামানুজ শ্রী-সম্প্রদায়ের, মধ্ব ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের, বিষ্ণুস্বামী রুদ্র-সম্প্রদায়ের এবং নিম্বার্ক সনক-সম্প্রদায়ের প্রধান।

রামানুজের দান সম্বন্ধে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন: 'আচার্য রামানুজ তাহার পূর্ববর্তীকালে প্রচারিত প্রসিদ্ধ প্রায় সকল বৈষ্ণব মতই গ্রহণ করিয়াছেন; তিনি এই সকলকে উপাদান-স্বরূপে ব্যবহার করিয়া স্বীয় লোকোত্তর দার্শনিক প্রতিভার স্পর্শে তাহাকে একটি দৃঢ় এবং সুস্পষ্ট মতবাদে রূপায়িত করেন। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন, ভারতবর্ষের ধর্মের ইতিহাসে প্রথমে বৈষ্ণবমতের জাগরণ ঘটিয়াছিল বৌদ্ধধর্মের প্রবল নাস্তিক্যবাদের প্রতিক্রিয়ায়। পরবর্তীকালে আবার দেখিতে পাই, আচার্য শংকরের অদ্বৈতবাদ সমগ্র ভারতবর্ষে এক প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল; এই আলোড়ন ভারতবর্ষের শক্তিবাদের ভিত্তিতে যে নাড়া দিয়াছিল তাহাকে রোধ করিবার ক্ষমতা বিভিন্ন পুরাণ-তন্ত্র-সংহিতাদির ছিল না; শংকরের ক্ষুরধার তর্কবুদ্ধির সম্মুখীন হইতে অনুরূপ বলিষ্ঠ প্রতিভার একান্ত প্রয়োজন ছিল; সেই

প্রয়োজনেই আবির্ভাব রামানুজাচার্যের। আচার্য রামানুজের পর হইতেই দার্শনিক বৈষ্ণব মত নানাভাবে গড়িয়া উঠিতে লাগিল ; এই সকল মতবাদেরই মুখ্য প্রতিপক্ষ আচার্য শংকর। বেদান্তের অদ্বৈতবাদের খণ্ডনের উপরেই মধ্ব, নিম্বার্ক, বল্লভাচার্য প্রভৃতি পরবর্তী সকল প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্যগণের দার্শনিক মতের প্রতিষ্ঠা।'[১৬]

অদ্বৈতবাদী শংকরাচার্য নির্গুণ ব্রহ্ম ব্যতীত সব কিছুকেই মায়া বলেছেন। ভক্তিমার্গের চার প্রধান শাখার দ্বৈতবাদী তাত্ত্বিকরা জগৎ-সংসারকে মায়া বলে উড়িয়ে দেননি। তাঁদের ব্রহ্ম নির্গুণ নন, সগুণ। নির্গুণ ব্রহ্ম অন্তরের ধন বা personal God হতে পারেন না। আর যদি শুধু ব্রহ্মকে স্বীকার করে অন্য সব মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়া হয় তা হলে ভক্তের স্থান কোথায় ? ভক্তিমার্গের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়ে। শ্রী সম্প্রদায়ের পুরোধা ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের মুখ্য প্রবক্তা রামানুজাচার্য [খ্রীষ্টীয় ১১শ শতাব্দী]। তাঁর পূর্ববর্তী বোধায়ন, দ্রমিড় গুহদেব, শঠকদমন, নাথমুনি, যমুনা প্রভৃতি আচার্যগণও এই মতবাদ উপস্থাপন করেছিলেন। কিন্তু যুক্তি, প্রমাণ ও বিশ্লেষণ দ্বারা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করবার কৃতিত্ব রামানুজের। শংকরাচার্য নির্গুণ ব্রহ্ম ব্যতীত সবই মায়া বলেছেন ; রামানুজাচার্যের মতে ব্রহ্ম সগুণ, তাঁকে বিশেষ বিশেষ গুণ দ্বারা বিশিষ্ট করা যায়। জীব ও জগৎ মায়া নয়, ব্রহ্মের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। সে যোগ কেমন ? অগ্নির সঙ্গে উত্তাপের যেমন যোগ। উভয়ে এক নয়, অথচ পৃথক অস্তিত্বও অকল্পনীয়। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের মূল তত্ত্বটি এই : 'Its most striking feature is the attempt which it makes to unite personal theism with the philosophy of the Absolute. Two lines of thought, both of which can be traced far back into antiquity, meet here and in this lies the explanation of a great part of its appeal to the cultured as well as the common people.'[১৭]

ভক্তবৎসল বিষ্ণুকে রামানুজ ব্রহ্মরূপে গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতবাদ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বৈষ্ণবদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে।

রামানুজের পরেই তেলুগু ব্রাহ্মণ নিম্বার্কাচার্য [১০১৪-৬২ খ্রীঃ] উল্লেখযোগ্য বৈষ্ণবগুরু। ইনি বাস করতেন বৃন্দাবন অঞ্চলে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত দার্শনিক মতবাদ দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বা ভেদভেদবাদ নামে পরিচিত। কারণ, নিম্বার্কাচার্য জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে ভেদ ও অভেদ দুই-ই স্বীকার করেছেন। ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে একদিকে যেমন প্রভেদ আছে, তেমনি অন্য দিকে আছে একাত্মতা। এই জন্যই সনক সম্প্রদায়ের দার্শনিক মতবাদ দ্বৈতাদ্বৈত বা ভেদাভেদবাদ নামে পরিচিত। ব্রহ্ম, বিষ্ণু ও বিষ্ণুর অবতার শ্রীকৃষ্ণ এই সম্প্রদায়ের মতে অভিন্ন। পরবর্তীকালে নিম্বার্কের অনুগামীরা রাধাকৃষ্ণের আরাধনাকে সাধনার প্রধান অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করেন।

তৃতীয় বৈষ্ণবগুরু মধ্বাচার্য [১২৩৮—১৩১৭ খ্রীঃ] দ্বৈতবাদী হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে পার্থক্য আছে—তাঁরা অভিন্ন নন, এই

হল দ্বৈতবাদের মূলতত্ত্ব। পরমেশ্বর যে জীব থেকে ভিন্ন এটা স্বাভাবিক, কারণ ভক্ত হিসাবে জীব পরমেশ্বরের আরাধনা কি করে করবেন— যদি পার্থক্য না থাকে? প্রভু ও ভৃত্যের মধ্যে যে ভেদ, পরমাত্মা ও জীবাত্মার মধ্যেও সেই ভেদ। তবে দ্বৈতবাদীদের প্রভু করুণাময়— তাঁর করুণা লাভ করলে সংসারের দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। হরি ও বিষ্ণু মধ্বাচার্যের অনুগামীদের উপাস্য দেবতা।

রুদ্র সম্প্রদায়ের প্রথম আচার্য বিষ্ণুস্বামী। কিন্তু বল্লভাচার্য [১৪৭৮-১৫৩০ খ্রীঃ] এই সম্প্রদায়কে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচার করে। কেবলাদ্বৈতবাদী শংকর ব্রহ্মকে নির্ধর্মক, নির্বিশেষ, নিরাকার ও নির্গুণ প্রমাণ করতে চেয়েছেন। ব্রহ্মসূত্রের কয়েকটি সূত্রের ব্যাখ্যা করে বল্লভাচার্য দেখালেন এই মতবাদ অশুদ্ধ। শংকর বলেছেন জগৎ মিথ্যা, কিন্তু শুদ্ধাদ্বৈতাবাদে জগৎ সত্য; পরম ব্রহ্ম সগুণ ও নির্গুণ দুই-ই; তিনি সচ্চিদানন্দ এবং ভক্তির দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণরূপ ব্রহ্মকে লাভ করা সম্ভব।

জন্মসূত্রে দক্ষিণভারতীয় হলেও বল্লভাচার্য উত্তরভারতকে তাঁর সাধনক্ষেত্র করেছিলেন। ব্রজধামে তিনি কৃষ্ণের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে পূজা আরম্ভ করেন। বৈষ্ণব গুরুদের মধ্যে তিনি সম্ভবত আনুষ্ঠানিকরূপে কৃষ্ণপূজার প্রবর্তক। উত্তর-ভারতে কৃষ্ণের আরাধনা জনপ্রিয় করার মূলে বল্লভাচার্য এবং তঁর পুত্র বিঠ্‌ঠলনাথের [১৫১৫-৮৫ খ্রীঃ] দান বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। হিন্দী কৃষ্ণকাব্য রচনার পশ্চাতেও ছিল তাঁদেরই প্রেরণা।

চৈতন্যদেব ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম

উপরোক্ত চার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সঙ্গে চৈতন্যদেবের [১৪৮৬-১৫৩৩ খ্রীঃ] নাম উল্লেখ করা হয়নি সঙ্গত কারণেই। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের উপর রামানুজ, মধ্বাচার্য, বল্লভাচার্য প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্যদের মতবাদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বল্লভাচার্য চৈতন্যদেবের সঙ্গে শাস্ত্রালোচনার জন্য এসেছিলেন। এই সাক্ষাৎকারের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাবে 'চৈতন্যচরিতামৃতে'। বিবিধ শাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও চৈতন্যদেব শাস্ত্রের ব্যাখ্যা দিয়ে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে আগ্রহী ছিলেন না। তাই পূর্বোক্ত বৈষ্ণবাচার্যদের মতো তিনি নিজে কোন ভাষ্য রচনা করেননি। কারণ চৈতন্যদেব মনে করতেন শ্রীমদ্‌ভাগবতই ব্রহ্মসূত্রের একমাত্র নির্ভরযোগ্য ভাষ্য। তথাপি পণ্ডিতদের সঙ্গে আলোচনায় চৈতন্যদেব বেদান্তের যে ব্যাখ্যা করেছেন তার সংগ্রহ ও সম্পাদনা করে প্রধানত 'ষট্‌সন্দর্ভ' ও 'সর্বসংবাদিনী' নামক দুটি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন জীব গোস্বামী। প্রকৃতপক্ষে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের তত্ত্ব-প্রতিষ্ঠাতা সনাতন, রূপ, জীব গোস্বামী এবং 'গোবিন্দভাষ্য' রচয়িতা বলদেব বিদ্যাভূষণ।

কিন্তু দার্শনিক তত্ত্ব বাংলার বৈষ্ণব ভক্তদের নিকট কোনোদিনই বড়ো হয়ে দেখা দেয়

নি। চৈতন্যদেব নিজের কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদ জীবন দিয়ে ভক্তিধর্মের এমন ব্যাখ্যা করেছেন যা কোনো পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষ্যের সাহায্যে সম্ভব নয়। রাগানুগা ভক্তির কথা পূর্বেও শাস্ত্রগ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছিল। কিন্তু চৈতন্যদেব রাগানুগা ভক্তিকে সাধনার মূলমন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করে ভক্তদের মধ্যে এর প্রচারের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। রাগানুগা ভক্তির আবেশে ঈশ্বরকে মনে হয় আনন্দস্বরূপ ও প্রেমস্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণই ভক্তের একমাত্র আরাধ্যদেবতা। তিনি প্রেমময়, সুতরাং ভক্তকেও প্রেমিক হতে হবে। প্রচলিত ঈশ্বর ভাবনার বশবর্তী হয়ে কৃষ্ণকে আরাধনা করলে তাঁকে দূরে সরিয়ে রাখা হবে, আপনজনের মতো ভালোবাসা সম্ভব নয়। বিপিনচন্দ্র পাল এই প্রসঙ্গে বলেছেন: 'শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা মানুষই হউন আর ঈশ্বরই হউন বৈষ্ণব পদকর্তাগণ ইহাদিগকে মানুষরূপেই আঁকিয়াছেন। আর বৈষ্ণব সিদ্ধান্তেও শ্রীকৃষ্ণকে মানুষরূপেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে; ইহাই আমাদের [বাংলার] বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের বিশেষত্ব…মহাপ্রভু যে সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন তাহাতে শ্রীকৃষ্ণকে মানুষরূপেই দেখিতে পাই।…নররূপ যেমন শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সিদ্ধরূপ, নরধর্ম ও মানব প্রকৃতিও সেইরূপ তাঁর নিত্যসিদ্ধ। রূপে ও গুণে সকল দিক দিয়া তিনি মানুষ। তবে এই মানুষ অপূর্ণ, তিনি পূর্ণ। এই মানবরূপ ও মানুষী প্রকৃতি বিকাশধারাতে তিলে তিলে ফুটিতেছে, তাঁর মধ্যে এ সকল নিত্যকাল প্রস্ফুট হইয়া আছে।'[১৮]

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনার পাঁচটি রস। ভারতের অন্য কোনো বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে এই প্রকার সাধনার কথা নেই। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচটি রস-সম্পর্কের সাহায্যে ভক্ত কৃষ্ণের সান্নিধ্যলাভ করতে পারেন। 'এই পঞ্চরস গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মূল কথা। বৈষ্ণবেরা নীতিশাস্ত্র, জ্ঞান ও কর্ম মানেন না— তাঁহারা বলেন— রসই সর্বপ্রধান— যাঁহার চিত্তে সেই অনুরাগ জন্মিয়াছে, তিনি নীতিবিগর্হিত কোন কর্ম করিতে পারেন না, তাঁহার পক্ষে তাহা অসম্ভব— সুতরাং নীতিকথা নীচেকার কথা।'[১৯]

এই পঞ্চরসের মধ্যে মধুর রসই সর্বোত্তম। তাই রাধাকৃষ্ণের প্রেম বৈষ্ণবের নিকট আদর্শস্থানীয়। ঈশ্বর ও ভক্তের মধ্যে সম্পর্ক হবে রাধাকৃষ্ণের সম্পর্কের মতো।

এই সম্পর্কের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, রাধা সর্বশক্তির আধার কৃষ্ণের হ্লাদিনী বা আনন্দদায়িনী শক্তি। শক্তি ও শক্তিধর অভিন্ন, রাধা ও কৃষ্ণ তাই অভিন্ন। কিন্তু দুই ভিন্নরূপ গ্রহণ না করলে ঈশ্বরের লীলা প্রকট হয় না। সেইজন্য রাধা-কৃষ্ণের, ভক্ত-ভগবানের, পৃথক অস্তিত্ব অনুভব করা প্রয়োজন। সুতরাং পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার ভেদ ও অভেদ দুই-ই আছে। এর প্রয়োজন এবং ভেদ ও অভেদ কল্পনা অচিন্ত্য বা অজ্ঞাত। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের এই হল দার্শনিক ভিত্তি— অচিন্ত্য-ভেদাভেদ নামে যা পরিচিত। কিন্তু তত্ত্ব অপেক্ষা রস ও প্রেমই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে প্রাধান্য লাভ করেছে।

চৈতন্যদেবের মতবাদ সংক্ষেপে একটি শ্লোকের মধ্যে বলেছেন ভাগবতের টীকাকার শ্রীনাথ চক্রবর্তী:

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শাস্ত্রং ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমথো মহান্
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভোর্মতামিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

অর্থাৎ ভগবান কৃষ্ণই আরাধ্য, তাঁহার ধাম শ্রীবৃন্দাবন, ব্রজবধূদের গৃহীত উপাসনা পদ্ধতিই ভালো, ভাগবতই শাস্ত্র, প্রেমই সাধনার কাম্য অর্থ, এই হইল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মত, আমাদেরও তাহাতেই পরম শ্রদ্ধা। (ক্ষিতিমোহন সেনের ভাবানুবাদ) [২০]

চৈতন্যদেবের অনেক পূর্বেই বাংলাদেশে বৈষ্ণবধর্মের প্রবর্তন হয়েছিল। বিষ্ণুপূজার প্রাচীনতম ঐতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া যায় বাঁকুড়া শহরের নিকটবর্তী শুশুনিয়া পাহাড়ের গুহায় উৎকীর্ণ রাজা চন্দ্রবর্মার এক শিলালেখ থেকে।[২১] চন্দ্রবর্মার রাজত্বকাল চতুর্থ শতাব্দী। তিনি চক্রস্বামী বা বিষ্ণুর ভক্ত বলে শিলালেখে উল্লেখ করা হয়েছে। পঞ্চম শতাব্দীতে বগুড়া জেলায় গোবিন্দস্বামীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ঐ শতকেরই সমাপ্তির সময় অথবা পরবর্তী শতকের প্রথমে হিমালয়ের অরণ্যসমাচ্ছন্ন পাদদেশে শ্বেতবরাহস্বামী ও কোকামুখস্বামীর মন্দির স্থাপিত হয়। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার অনুমান করেন এই দুটি বিষ্ণুমন্দির।[২২]

সপ্তম শতাব্দীর একটি শিলালেখে বাংলার পূর্বপ্রান্তে অনন্তনারায়ণের মন্দির প্রতিষ্ঠা ও তাঁর পূজার উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং বাংলার পশ্চিম, উত্তর ও পূর্বপ্রান্ত পর্যন্ত সর্বত্র বিষ্ণু বা কৃষ্ণের পূজা সপ্তম শতাব্দীর মধ্যেই বিস্তারলাভ করেছিল।

পূর্বেই বলা হয়েছে গুপ্ত সম্রাটরা নিজেরা ছিলেন পরম বৈষ্ণব এবং বৈষ্ণবধর্মের পৃষ্ঠপোষক। সুতরাং গুপ্তযুগে বাংলা দেশে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের প্রেরণা এসেছিল। পালরাজগণ বেষ্ণব না হলেও বৈষ্ণবমন্দির, স্তম্ভ ইত্যাদি নির্মাণে যে সহায়তা করেছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

লক্ষ্মণ সেন ছিলেন পরম বৈষ্ণব। তাঁর আমলে বিষ্ণুস্তবের পর রাজকার্য শুরু হত। লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি জয়দেব রচিত 'গীতগোবিন্দ' [১২শ শতক] বৈষ্ণব সাহিত্যে এক যুগান্তকারী গ্রন্থ। 'গীতগোবিন্দে' বর্ণিত রাধাকৃষ্ণলীলা বহু কবির ভক্তিমিশ্রিত কল্পনা উদ্দীপ্ত করেছিল, এবং অসংখ্য ভক্ত বৈষ্ণবের ধ্যান ও কীর্তনের বিষয় হয়েছিল।

বর্তমানে বিষ্ণুর দশাবতার সম্পর্কে যে ধারণা প্রচলিত আছে, জয়দেবের পূর্বে ঠিক তেমনটি ছিল না। গীতগোবিন্দে বিধৃত দশাবতারের বর্ণনা এখন ভারতের সর্বত্র বৈষ্ণব সমাজে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

বাংলার ধর্মে কৃষ্ণলীলার প্রাধান্য যে ষষ্ঠ শতাব্দী বা তার পূর্ব থেকেই ছিল তার আর-এক প্রমাণ পাহাড়পুরের মন্দিরগাত্রের ভাস্কর্য। কৃষ্ণলীলার নানা দৃশ্য মন্দির-গাত্রে উৎকীর্ণ আছে। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে এক নারীমূর্তি একটি প্রস্তরে খোদিত দেখা

যায়। অনেকের ধারণা এই নারী রাধা। তা যদি সত্য হয় তা হলে এইটি রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি রূপে আত্মপ্রকাশের প্রাচীনতম নিদর্শন। অবশ্য মূর্তিটি রাধার নয় রুক্মিণী বা সত্যভামার— এমন অভিমতও শোনা যায়।

জয়দেবের 'গীতগোবিন্দের' পর রাধাকে আমরা পাই বিদ্যাপতির পদাবলীতে এবং বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে।' চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বেই রাধা-কৃষ্ণের লীলাকাহিনী এইসব গ্রন্থের রচনামাধুর্যের গুণে ভক্তসমাজে প্রচারলাভ করেছিল।

এর পূর্বে মাধবেন্দ্র পুরী [খ্রীঃ ১৪শ শতক] ভাগবতে বর্ণিত কৃষ্ণলীলা ভিত্তি করে ভক্তিমার্গের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করেন। তাঁর শিষ্য ঈশ্বরপুরী ছিলেন চৈতন্যদেবের গুরু। চৈতন্যদেব শুধু বাংলাদেশে নয়, উড়িষ্যা, দাক্ষিণাত্য এবং অন্যান্য অঞ্চলে রাগাত্মিকা ভক্তির বাণী প্রচার করে বৈষ্ণব সাধনায় এক যুগান্তকারী উদ্দীপনার সৃষ্টি করেন। তাছাড়া তাঁরই দূরদর্শিতায় শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবতীর্থ বৃন্দাবন নতুন গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হয়। রূপ, সনাতন, জীব গোস্বামী এবং অন্যান্য বাঙালী বৈষ্ণবাচার্যগণের ঐকান্তিক সাধনায় বৃন্দাবন কৃষ্ণপ্রেমের উন্মাদনায় মুখর হয়ে ওঠে। চৈতন্যদেব-পরবর্তী গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় বৃন্দাবনের বৈষ্ণবাচার্যগণের নির্দেশের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল ছিলেন।

চৈতন্যদেবের তিরোধানের প্রায় তিন শতাব্দী পরেও বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব বাংলাদেশে কত বিস্তৃত ছিল ও গভীর ছিল তা জানা যায় বিদেশীদের বিবরণ থেকে: 'The Vaisnava Cult is one of the most important among the beliefs of the Province. Ward in 1815 stated that six out of ten of the whole Hindu Population were worshippers of Krishna (Hindoos ii, 158); in 1828 Wilson (Religious sects, 1, 152) calculated them at one-fifth; and in 1872 Hunter (Orissa, 1, 144) at from one-fifth one-third of the whole number of Hindus. Wise…from a catalogue of the Temples in the Dacca District found that 74 percent belonged to Krishna in one or other of his numerous forms…'[২৩]

কৃষ্ণলীলার সূত্রপাত : পুরাণে ও সাহিত্যে

কৃষ্ণকাব্য এবং পদাবলী সাহিত্যের রসাস্বাদনের জন্য বৈষ্ণবধর্ম ও দর্শনের যতটুকু পটভূমি একান্ত আবশ্যক উপরে ততটুকুই বিবৃত করা হয়েছে। আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যে কৃষ্ণলীলার আবির্ভাব আকস্মিক নয়। বেদ-উপনিষদ যুগের বিষ্ণু-নারায়ণ-কৃষ্ণ একেবারে পাঠকদের চমকিত করে লীলাকাহিনীর নায়করূপে আত্মপ্রকাশ করেননি। বিভিন্ন পুরাণ এবং সংস্কৃত ও অপভ্রংশ সাহিত্যের মধ্য দিয়ে কৃষ্ণের লীলাকাহিনী

বিবর্তিত হয়ে হিন্দী, বাংলা এবং অন্যান্য ভাষায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। কৃষ্ণের কাহিনী বলতে গিয়ে পরবর্তী কবিরা স্বভাবতই সংস্কৃত ও অপভ্রংশ সাহিত্যের ঐতিহ্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছেন।

কৃষ্ণলীলার কাহিনী খানিকটা সুসংবদ্ধরূপে প্রথম পাওয়া যায় পুরাণে। প্রধান পুরাণ আঠারোটি। পুরাণগুলিকে সাত্ত্বিক, রাজস্‌ ও তামস্‌ এই তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সাত্ত্বিক শ্রেণীর বিষ্ণু, ভাগবত, নারদীয়, গরুড়, পদ্ম ও বরাহ-পুরাণে কীর্তন করা হয়েছে বিষ্ণুর মহিমা। রাজস্‌ ও তামস্‌ শ্রেণীভুক্ত পুরাণ যথাক্রমে ব্রহ্মা ও শিবের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছে।

হিন্দী ও বাংলা রাধাকৃষ্ণ-সাহিত্যের উপর পুরাণের প্রভাব সুদূরপ্রসারী। ডঃ সুশীলকুমার দে বৈষ্ণবধর্মের উপর পুরাণের প্রভাব সম্বন্ধে যা বলেছেন, সাহিত্যে পুরাণের প্রভাব সম্বন্ধে তা প্রযোজ্য। তিনি বলেছেন : 'In spite of much learned writing, the mediaeval expansion of the faith was essentially popular in character and appeal. After the epics and the philosophics came the popular Puranas, which set forth the Krisna-legend against the exuberant and luscious background of myth, theology and mystical eroticism.'[২৪]

বিষ্ণুকেন্দ্রিক পুরাণগুলির মধ্যে ভাগবতই ভক্তিধর্মের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এই গ্রন্থ আঠারো হাজার শ্লোকে সম্পূর্ণ, বারোটি স্কন্ধে এবং বত্রিশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। দশম স্কন্ধে কৃষ্ণের বাল্য, কৈশোর ও যৌবনলীলার বিবরণ আছে। গোপিনীদের সঙ্গে কৃষ্ণের প্রেমসম্পর্ক যে নারী-পুরুষের সাধারণ আকর্ষণ নয়, তার মধ্যে যে রহস্যময়তা আছে, লোকোত্তর ইঙ্গিত আছে, তা ভাগবতের বর্ণনা থেকে উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু রাধা নামটি ভাগবতে উল্লেখ করা হয়নি। 'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্‌ [১৩।২৮],' একথা বলা হলেও ভাগবতই বেদ-উপনিষদের বিষ্ণু-কৃষ্ণকে ভক্তের অন্তরের ধন করে তুলেছে। বাসুদেব-কৃষ্ণের নরলীলার কাহিনী এখানে পরিবেশন করা হয়েছে। ভগবান নেমে এসেছেন ভক্তের কাছে মানুষের রূপ নিয়ে। তিনি মানুষ হলেও নরোত্তম, সকল মানবিক গুণের পূর্ণতার প্রতীক।

পদ্ম ও বিষ্ণুপুরাণেও কৃষ্ণের লীলাকাহিনী আছে। কিন্তু ভাগবতের বিবরণের মতো তা ভক্তের হৃদয়ে স্থান পায়নি। তথাপি পদ্মপুরাণের কোনো কোনো ভাবধারা বৈষ্ণবধর্ম ও কাব্যকে যে প্রভাবিত করেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ভগবানকে নারীরূপে ভজনা করা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের একটি মূল তত্ত্ব। কয়েকটি উপাখ্যানের সাহায্যে এই তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডে। অনেক মুনি শ্রীকৃষ্ণের শৃঙ্গাররসের মূর্তি ধ্যান করতে করতে গোপীরূপে রূপান্তরিত হয়ে পরমাত্মায় লীন হয়ে গিয়েছেন।

পাতালখণ্ডে রাধাকৃষ্ণের অষ্টপ্রাহরিক লীলার যে বিশদ বর্ণনা আছে তা পরবর্তী কবিদের অনুপ্রাণিত করেছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত গোবিন্দলীলামৃত এর

প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

অন্যান্য শ্রেণীর কয়েকটি পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের কথা আছে। এদের মধ্যে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ অন্যতম। এই পুরাণের চতুর্থ খণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন, মথুরা ও দ্বারকার বিভিন্ন লীলাকাহিনী স্থান পেয়েছে। পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ বলেছেন: '...the Brahmavaivarta Purana is the chief authority on the new school of Vaishnavism or Radha-Krishna cult."[২৫]

তাঁর মতে এই পুরাণ 'erotic Vaishnavism'-এর অগ্রদূত। রাধার জন্মের এক কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী পাওয়া যায় ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে।

আদমের পাঁজরের অস্থি থেকে ইভের সৃষ্টির অনুরূপ রাধার আবির্ভাব হয়েছে শ্রীকৃষ্ণের বক্ষপিঞ্জরের বাঁ দিক থেকে। অবশ্য অনেকের মতে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ অর্বাচীন রচনা। সুতরাং এর প্রভাবের মূল্য অপেক্ষাকৃত কম।

পরবর্তীকালের ভক্তিধর্মে, ভক্তিসাহিত্যে এবং কাব্যসাহিত্যে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রভাব সর্বাপেক্ষা বেশি। অনেক হিন্দী ও বাংলা কৃষ্ণকাব্য ভাগবতের লীলা বর্ণনার ছায়ানুসরণ মাত্র। ভাগবত বা বিষ্ণুপুরাণের কৃষ্ণলীলা কেন্দ্র করেই বড়ু চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচনা করেছেন। মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধের ভাবানুবাদ, কোথাও কোথাও বা হুবহু অনুবাদ। কবিশেখরের গোপাল বিজয় এবং রঘু পণ্ডিতের [ভাগবতাচার্য] কৃষ্ণ প্রেমতরঙ্গিণী একান্তরূপে ভাগবত-নির্ভর কাব্য। এই প্রসঙ্গে ডঃ সুশীলকুমার দে বলেছেন: 'The Srimad Bhagavata is indeed the one great purana which appears to have exercised an enormous influence on the development of Bhakti ideas in mediaeval time.'[২৬]

পুরাণের অনেক পূর্বে মহাভারতে কৃষ্ণের অন্য রূপ পাওয়া যায়। এখানে গোপিনীদের সঙ্গে তাঁর লীলাখেলার কথা নেই। মহাভারতের কৃষ্ণ কর্মবীর এবং বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ্। দেশের সামাজিক অবস্থা পরিবর্তিত হবার ফলে একই কৃষ্ণের দুই যুগে দুই রূপ পাই। বঙ্কিমচন্দ্র মহাভারতের কৃষ্ণের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।[২৭]

মহাভারতের সম্পূরক অংশ খিল হরিবংশে শ্রীকৃষ্ণের লীলাকাহিনী আছে। বিশেষজ্ঞদের মতে হরিবংশ অনেক পরে রচিত হয়েছিল এবং এটি মহাভারতের প্রক্ষিপ্ত অংশ। প্রকৃতপক্ষে হরিবংশ একটি পুরাণ।

সংস্কৃত কৃষ্ণকাহিনী-নির্ভর কাব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মাঘের শিশুপালবধ। কৃষ্ণের জীবনকথা এই প্রসিদ্ধ কাব্যের বিষয়বস্তু।

কীথ সাহেবের মতে সংস্কৃত নাটকের সূত্রপাত হয়েছিল কৃষ্ণলীলা কাহিনী অবলম্বন করে।[২৮] পতঞ্জলির মহাভাষ্যে কৃষ্ণ কর্তৃক কংসবধের নাট্যরূপ উপস্থিত করবার কথা আছে। খ্রীস্টপূর্ব ১৫০/২০০ বছরে এরূপ অভিনয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। বিখ্যাত নাট্যকার ভাস কংসবধ পর্যন্ত কৃষ্ণের বাল্যলীলাকে বিষয়বস্তু করে বালচরিত

রচনা করেছেন।

সংস্কৃতে লিখিত কৃষ্ণ-বিষয়ক স্তোত্রকাব্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দক্ষিণ-ভারতের সাধক বিল্বমঙ্গল বা কৃষ্ণলীলাশুক রচিত কৃষ্ণকর্ণামৃত। রচনার সময় নবম হতে চতুর্দশ শতক। এই কাব্যের ভাষা সুমধুর, ভাব অতীব উচ্চ। ভাষা ও ছন্দের দিক দিয়ে জয়দেবের গীতগোবিন্দকে স্মরণ করিয়ে দেয়। বিল্বমঙ্গল মধুর রসের কবি। চৈতন্যদেব ভাগবত-নির্ভর কাব্য কৃষ্ণকর্ণামৃতের পাঠ শুনে আনন্দলাভ করতেন :

চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক-গীতি, কর্ণামৃত, শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ-রামানন্দ-সনে মহাপ্রভু রাত্রি-দিনে, গায়, শুনে পরম আনন্দে।[২৯]

জয়দেব ছিলেন লক্ষ্মণ সেনের অন্যতম সভাকবি। তাঁর গীতগোবিন্দের রচনাকাল খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতক। বিশুদ্ধ গীতিকবিতা ও গীতিনাট্যের লক্ষণ এই কাব্যে যুগপৎ পাওয়া যায়। রাধা-কৃষ্ণের মিলনলীলা কবি দ্বাদশ সর্গে বর্ণনা করেছেন। বসন্ত সমাগমে শ্রীকৃষ্ণকে গোপীদের সঙ্গে রাসলীলায় মত্ত দেখে রাধার অভিমান হল, কৃষ্ণ তাঁর মান ভাঙালেন অনেক অনুনয়-বিনয় করে। শেষ সর্গে কবি এঁকেছেন পূর্ণ মিলনের চিত্র।

ভারতীয় সাহিত্যে গীতগোবিন্দের প্রভাব অপরিসীম। ভাষা, ছন্দ, অলংকার, ইত্যাদির প্রভাব পড়েছে পরবর্তী যুগের পদাবলী সাহিত্যে। বহু কবি গীতগোবিন্দের অনুকরণে কাব্য রচনা করেছেন। বিদ্যাপতির মত প্রতিভাবান কবিও নিজেকে "অভিনব জয়দেব" আখ্যায় ভূষিত করে গৌরববোধ করতেন। রাধা-কৃষ্ণলীলা কাহিনী জনপ্রিয় করতে এই গেয় নাট্যরসাশ্রিত কাব্যের দান অসামান্য।

ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার বলেছেন ঃ "জয়দেবের গীতগোবিন্দ রাধাকৃষ্ণের লীলা-কীর্তনের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে একটি আলোকস্তম্ভ। ইহাতে আমরা রাধাকৃষ্ণের কেবলমাত্র বিহার নহে—উপাসনারও প্রকৃষ্ট পরিচয় পাই।"[৩০]

পরবর্তীকালের সাহিত্যের উপর গীতগোবিন্দের প্রভাব সম্বন্ধে ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন ঃ "It would not be an exaggeration to say that the middle Bengali-nay, even to a large extent, modern Bengali lyrics of Vaishnava inspiration are based on the songs of the Gitago-vinda."[৩১]

জয়দেবের প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে কাশ্মীরের কবি ক্ষেমেন্দ্র দশাবতার-চরিত কাব্য রচনা করেছিলেন। বিষ্ণুর দশ অবতারের বর্ণনা করেছেন কবি। নবম অবতার বুদ্ধ। রচনাশৈলীতে জয়দেবের পূর্বাভাস পাওয়া যায়।

প্রকীর্ণ গীতিকবিতায় পদাবলীর পূর্বাভাস

কৃষ্ণ-বিষয়ক এমন একটি গ্রন্থের উল্লেখ করা হল যাদের কমবেশি প্রভাব আধুনিক-

ভারতীয় সাহিত্যের প্রথম পর্বের কৃষ্ণকাব্যের উপর পড়েছে। এ ছাড়া পদাবলী সাহিত্য প্রভাবান্বিত হয়েছে সংস্কৃত ও অপভ্রংশে রচিত বহু সংখ্যক বহুল প্রচারিত প্রকীর্ণ গীতিকবিতার দ্বারা। ছন্দ, রূপকল্প ও মেজাজের দিক থেকে বিচার করলে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। এই সব প্রকীর্ণ গীতিকবিতার বিষয়বস্তু সকল ক্ষেত্রে রাধাকৃষ্ণের লীলার উপর নির্ভরশীল নয়। প্রাত্যহিক জীবনের, পরিচিত নিসর্গ বর্ণনার এবং লৌকিক প্রেমের চিত্র বৈষ্ণব কবিরা এখান থেকে গ্রহণ করে অলৌকিক ভগবৎ প্রেমে রূপান্তরিত করেছেন। নানাদিক থেকে এই প্রকীর্ণ সংস্কৃত ও প্রাকৃত কবিতাবলী বৈষ্ণব গীতিকবিতার যথার্থ পূর্বসূরী। উভয় শ্রেণীর গীতিকবিতা আলোচনা করলে স্পষ্টই উপলব্ধি করা যায় যে, বৈষ্ণব কবিতা ভারতীয় কাব্যধারার ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। লৌকিক ভাবানুভূতির কবিতাকে বৈষ্ণব কবিরা অলৌকিক স্তরে উন্নীত করেছেন। তাঁদের নবত্ব ও কৃতিত্বের অন্যতম কারণ এই।

প্রকীর্ণ গীতিকবিতাগুলি বিভিন্ন কোষগ্রন্থে নিবন্ধ হয়েছে। তা থেকেই এঁদের জনপ্রিয়তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সাতবাহন নৃপতি হাল কর্তৃক সংকলিত গাথা-সপ্তশতী কালানুক্রমিকতার দিক থেকে প্রাচীনতম কোষগ্রন্থ। হাল খ্রীস্টীয় প্রথম শতকে জীবিত ছিলেন বলে ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাক মনে করেন।[৩১] মহারাষ্ট্রীয় প্রাকৃতে রচিত সাতশত শ্লোক হাল সংকলন করেছেন; এর মধ্যে তাঁর নিজের রচনা চুয়াল্লিশটি। হাল বলেছেন, তিনি এক কোটি প্রাকৃত শ্লোক থেকে নির্বাচন করেছেন মাত্র সাতশত।[৩২] প্রাকৃত কাব্য সাহিত্যের প্রাচুর্যে বিস্মিত হতে হয়। আনন্দবর্ধন, মম্মটভট্ট, প্রভৃতি আলংকারিকরা গাথাসপ্তশতী থেকে দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করেছেন।

গাথাসপ্তশতীতে আদিরসাত্মক প্রেমের প্রাধান্য। পরকীয়া প্রেমের শ্লোক আছে চব্বিশ-পঁচিশটি। এক অজ্ঞাতনামা কবি বলেছেন: অমৃততুল্য প্রাকৃত কাব্য (গাথা-সপ্তশতী) না পড়ে অথবা না শুনে প্রেমের তত্ত্ব আলোচনা করতে লজ্জাবোধ হয় না কেন ?[৩৩]

রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক শ্লোক অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কয়েকটি। এখানেই রাধার নাম যে প্রথম পাওয়া যায় শুধু তাই নয়, তিনি যে কৃষ্ণের সর্বাধিক প্রিয়পাত্রী তারও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পোট্টিস্ নামক কবি লিখছেন:

মুহ-মারুএণ তং কন্হ গো রঅং রাহিআএ অবণে স্তো।
এতাণ বল্লবীণং অন্নাণ বি গোর অং হরসি॥ ১।৮৯

—হে কৃষ্ণ, তুমি ফুঁ দিয়ে রাধিকার মুখের ধুলা অপসারণ করে এই গোপীদের এবং অন্যান্য রমণীদের গৌরব অপহরণ করেছ।

চণ্ডীদাসের পদাবলীতেও যে গাথাসপ্তশতীর প্রভাব পড়েছিল তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন:

কালি বলি কালা গেল মধুপুরে
সে কালের কত বাকি।

ন দৃষ্টো ভাণ্ডীরে তটভুবি ন গোবর্ধনগিরের্
ন কালিন্দ্যাঃ কূলে ন চ নিচুলকুঞ্জে মুররিপুঃ ॥ ১৯ নং ॥

সখী রাধাকে জানাচ্ছে, কৃষ্ণকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। সারা রাত ধূর্ত কৃষ্ণকে এখানে ওখানে খুঁজেছি ; অন্য কোনো নারীর সঙ্গে রাত কাটাচ্ছে কিনা তাও দেখেছি। বটগাছের নীচে, গোবর্ধনগিরির সানুদেশে, কালিন্দীর কূলে, বেতস-কুঞ্জে— কোথাও তাঁকে পাওয়া গেল না।

শ্রীধরদাস সংকলিত সদুক্তিকর্ণামৃতে (১২০৬ খ্রীঃ) ২৪০০ নির্বাচিত সংস্কৃত শ্লোক পাওয়া যায়। লেখকদের মধ্যে বাঙালী কবির সংখ্যা প্রায় তিন শত। সদুক্তি-কর্ণামৃতে পার্থিব ও কৃষ্ণপ্রেমের কবিতা ছাড়াও সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কতকগুলি চিত্তগ্রাহী চিত্র পাওয়া যায়। সুভট রচিত এই কবিতায় অভিসারিকার উন্মাদনার বর্ণনা পাই :

অবলোক্য নর্তিত শিখণ্ডি মণ্ডলৈ-
র্নবনীরদৈ র্নিচলিন্ত নভস্তলম্।
দিবসেঽপি বঞ্জুলনিকুঞ্জমন্তরী-
বিশতিস্ম বল্লভবতংসিতং রসাৎ ॥ ২।৬৩।১।

অর্থাৎ, যে নবীন মেঘ ময়ূরদের নৃত্যশীল করে, সেই মেঘ আকাশ ঢেকে ফেলেছে দেখে অভিসারিকা দিনের বেলাতেই রসাবিষ্ট হয়ে বল্লভভূষিত বঞ্জুলকুঞ্জে প্রবেশ করল।

দিবাভিসারের এই তন্ময়তা গোবিন্দদাসের রাধার মধ্যেও দেখা যায়—

গগনহি নিমগন দিনমণি-কাঁতি।
লখই না পারিয়ে কিয়ে দিন রাতি ॥
ঐছন জলদ কয়ল আঁধিয়ার।
নিয়ড়হি কোই লখই নাহি পার ॥
চলু গজগামিনি হরি অভিসার।
গমন নিরঙ্কুশ মদন বিথার ॥[৩৭]

লক্ষ্মণসেনের একটি সুন্দর শ্লোকে রাধাকৃষ্ণের গোপন মিলনের কথা কেমন করে প্রকাশ হয়ে পড়ল তার বর্ণনা আছে। এক সরল রাখাল বালক সকলের সামনে কৃষ্ণের হাতে একটি মালা দিয়ে বলল, কৃষ্ণ, দেখ কোন গোপীর কেশগুচ্ছ তোমার মালার সঙ্গে জড়িয়ে আছে। আমি কুঞ্জে পেয়েছি। বালকের কথা শুনে রাধা ও কৃষ্ণ লজ্জায় মাথা নিচু করে রইলেন।

দ্বাদশ শতকের পূর্ববর্তী কবিরা রাধাকৃষ্ণের নাম উল্লেখ না করেও পূর্বরাগ, অভিসার, মিলন, বিরহ ইত্যাদি বিভিন্ন পর্যায়ের প্রেমের কবিতা রচনা করেছেন। শ্রীধরদাস এই সব বিভিন্ন কবিতাগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করে সাজিয়েছেন। যেমন সদুক্তি-কর্ণামৃতে অভিসারিকাকে চার শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে : দিবসাভিসারিকা ; তিমিরাভিসারিকা ; জ্যোৎস্নাভিসারিকা এবং দুর্দিনাভিসারিকা।[৩৮] এই শ্রেণী বিভাগের রীতি মোটামুটিরূপে বৈষ্ণব কবিরাও গ্রহণ করেছিলেন।

আর-একটি উল্লেখযোগ্য প্রাকৃত কবিতার সংকলন, প্রাকৃতপৈঙ্গল। আনুমানিক চতুর্দশ শতকে এই সংকলনটি সম্পূর্ণ হয়। পৈঙ্গলের লৌকিক অনুভূতির কবিতা ছায়া ফেলেছে বৈষ্ণব কাব্যে। চার লাইনের ছোট্ট একটি কবিতায় বিরহের সুর কেমন সুন্দরভাবে ধ্বনিত হয়েছে :

সো মহ কন্তা
দূর দিগন্তা।
পাউস আ-এ
চেউ চলাএ ॥[৩৯]

অর্থাৎ, আমার প্রিয়তম এখন দিগন্তশায়ী দূর দেশে ; বর্ষা আসে। চিত্ত চঞ্চল হয়।

রাধিকার সঙ্গে কৃষ্ণের ছলা-কলা সম্বন্ধীয় একটি শ্লোক :

'অরে রে বাহহি কনহ, ণাব ছোড়ি ডগমগ কুগতি ণ দেহি।
তই ইথি ণই হি সন্তার দেই, জো চাহহি সো লেহি ॥'[৪০]

হে কৃষ্ণ, নৌকা বেয়ে চলো ; ছোটো নৌকা টলমল করছে, আমাকে কোনো দুর্বিপাকে ফেলো না, নদী পার করে দাও, তারপর যা চাইবে তাই নিও।

এই শ্লোকটির প্রায় ভাবানুবাদ পাওয়া যায় বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে :

দশনেত তৃণ ধরি বোলোঁ মো তোমারে। ·
যেই চাহ সেই দিবোঁ কর মোরে পারে ॥[৪১]

উপরে শুধু কয়েকটি কোষগ্রন্থে বিধৃত কয়েকজন কবির রচনা থেকে দৃষ্টান্ত দেওয়া হল। এইসব দৃষ্টান্ত থেকে উপলব্ধি করা যাবে যে ত্রয়োদশ শতকের প্রকীর্ণ কবিতাগুলি হিন্দী কৃষ্ণকাব্যের এবং বাংলা পদাবলী সাহিত্যের ভূমিকা রচনা করেছিল। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সদুক্তিকর্ণামৃত সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন তা সাধারণভাবে সকল সংস্কৃত ও প্রাকৃত প্রকীর্ণ কবিতা সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। তিনি বলেছেন : 'We find quite an anticipation of Middle Bengali poetic literature and even of modern Bengali poetry, in a number of these Slokas. For the study of the poetic literature of Bengali, the Sadukti-Karnamrita can certainly be considered as one of its basic sources although it is couched in the Sanskrit language.'[৪২]

পদাবলী

বৈদিক যুগ থেকে পুরাণ পর্যন্ত কৃষ্ণকাহিনীর বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জীবনের বিচিত্র কাব্যরূপও বিবর্তিত হয়েছে। সংস্কৃত, প্রাকৃত, প্রাচীন তামিল প্রভৃতি ভাষার কবিদের রচনায় রাধার আবির্ভাব অনেক পরে হলেও ভারতীয় সাহিত্যে তাঁর আগমন আকস্মিক নয়। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার যথার্থই বলেছেন : 'দ্বাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে সহসা জয়দেব অজ্ঞাত অখ্যাত রাধাকে লইয়া কাব্য রচনা করেন নাই ইহা

বুঝা প্রয়োজন। শ্রীরাধার অভিসার, মান, রাস, কুঞ্জভঙ্গ, বিরহ প্রভৃতি লইয়া তামিল, প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষায় বহু কবি বহু পদ ও শ্লোক জয়দেবের পূর্বে ও সমসময়ে লিখিয়াছিলেন।'[৪৩]

ভারতের পূর্বাঞ্চলে নতুন ধারায় পদাবলী রচনার গুরু জয়দেব। কিন্তু তাঁর পূর্বেও কৃষ্ণকাব্য প্রচলিত ছিল। যদিও পদাবলী বলতে আমাদের প্রথমেই মনে পড়ে বিশেষ কিছু গুণসম্পন্ন বাংলা বৈষ্ণবকাব্য, বৃহত্তর অর্থে ভারতের সকল ভাষাতেই বিভিন্নরূপে ও নামে কৃষ্ণ-বিষয়ক পদাবলী রচিত হয়েছে। আড়বার ভক্তগণ তামিল ভাষায় যে গেয় কাব্য রচনা করেছেন তা 'প্রবন্ধম্' নামে পরিচিত। হিন্দীতে পদাবলীর পরিবর্তে সাধারণত বলা হয় কৃষ্ণকাব্য। পশ্চিম ভারতে এ ধরনের ভক্তিগীতি 'বাণী' নামে পরিচিত। গদাধর ভট্টের একটি গীতি-সংকলনের নাম 'মোহিনীবাণী'।

পদাবলীর উৎকর্ষ এসেছে ধীরে ধীরে ক্রমবিবর্তনের পথে। সংস্কৃত ও প্রাকৃত প্রকীর্ণ কবিতা যে এর ভূমিকা রচনা করেছে তা পূর্বেই দেখানো হয়েছে। বাংলা পদাবলীর উপর গীতগোবিন্দের সরাসরি প্রভাব অনস্বীকার্য। মৈথিলী ভাষায় রচিত হলেও বিদ্যাপতির কৃষ্ণগীতি বাংলার বৈষ্ণব কবিদের নানা দিক থেকে প্রভাবান্বিত করেছে। চর্যাপদ, মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়, পৌরাণিক কাহিনীর লৌকিক গাথারূপ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পদাবলী রচনার পথ প্রশস্ত করেছে। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের মধ্যে বাংলা পদাবলী সাহিত্যের প্রথম নির্দেশিকা পাওয়া যায়।

পদাবলী (স্ত্রী) শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল পদসমুচ্চয় বা পদের শ্রেণী (পদানাং আবলী)। এখন পদ শব্দের অর্থ কি দেখা দরকার। ঋগ্‌বেদের আমল থেকেই পদ শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। 'পদ' শব্দের গান বা গীতিকাব্য অর্থটি বোধ হয় ঋগ্‌বেদের পরে এসেছে। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ বলেন: '...পদের অর্থই গান। খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতকে রচিত ভরতের নাট্যশাস্ত্রে 'পদ' শব্দে গান বা গীতিকেই লক্ষ্য করা হয়েছে। খ্রীস্টীয় চারশো-দুশো শতকের মহাকাব্য রামায়ণ মহাভারত ও হরিবংশে এবং এমনকি খ্রীস্টীয় শতকের প্রথম ভাগের পঞ্চরাত্র সংহিতা ও পুরাণ-সংহিতাগুলিতে গান বা গীতির দ্যোতক 'পদ' ব্যবহার দেখা যায়। রামায়ণে (বালকাণ্ডে, ৪র্থ সর্গ) 'বিচিত্রার্থপদং সম্যগ গায়কৌ সমচোদয়ৎ' বা 'অবগায়তাং মার্গবিধানসম্পদা' শ্লোকাংশে 'পদ' শব্দে গান বুঝিয়েছে।'[৪৪]

ভরত (আনুমানিক খ্রীঃ চতুর্থ-পঞ্চম শতক) নাট্যশাস্ত্রে 'গান্ধর্বমিতিবিজ্ঞেয় স্বরতালপদাশ্রয়ম্' (২৮।৮) এবং 'গান্ধর্বং ত্রিবিধং বিদ্যাৎ স্বরতালপদাত্মকম্' (২৮।১২) শ্লোকাংশ দুটিতে গান বা সংগীত অর্থেই 'পদ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

কালিদাসের (খ্রীস্টীয় ১ম-৪র্থ শতক) রচনাবলীর অনেক জায়গায় এরূপ গান বা সংগীত অর্থে 'পদ' শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়। মেঘদূতের নিম্নলিখিত শ্লোকে এই অর্থে 'পদ' শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে:

'উৎসঙ্গে বা মলিনবসনে সৌম্যঃ নিক্ষিপ্য বীণাং
মদ্‌গোত্রাঙ্কং বিরচিতপদং গেয়মুদ্‌গাতুকামা।

আর-একটি উল্লেখযোগ্য প্রাকৃত কবিতার সংকলন, প্রাকৃতপৈঙ্গল। আনুমানিক চতুর্দশ শতকে এই সংকলনটি সম্পূর্ণ হয়। পৈঙ্গলের লৌকিক অনুভূতির কবিতা ছায়া ফেলেছে বৈষ্ণব কাব্যে। চার লাইনের ছোট্ট একটি কবিতায় বিরহের সুর কেমন সুন্দরভাবে ধ্বনিত হয়েছে :

সো মহ কন্তা
দূর দিগন্তা।
পাউস আ-এ
চেউ চলাএ ॥[৩৯]

অর্থাৎ, আমার প্রিয়তম এখন দিগন্তশায়ী দূর দেশে ; বর্ষা আসে। চিত্ত চঞ্চল হয়।

রাধিকার সঙ্গে কৃষ্ণের ছলা-কলা সম্বন্ধীয় একটি শ্লোক :

'অরে রে বাহহি কনহ, ণাব ছোড়ি ডগমগ কুগতি ণ দেহি।
তই ইথি ণই হি সন্তার দেই, জো চাহহি সো লেহি ॥'[৪০]

হে কৃষ্ণ, নৌকা বেয়ে চলো ; ছোটো নৌকা টলমল করছে, আমাকে কোনো দুর্বিপাকে ফেলো না, নদী পার করে দাও, তারপর যা চাইবে তাই নিও।

এই শ্লোকটির প্রায় ভাবানুবাদ পাওয়া যায় বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে :

দশনেত তৃণ ধরি বোলোঁ মো তোমারে। ·
যেই চাহ সেই দিবোঁ কর মোরে পারে ॥[৪১]

উপরে শুধু কয়েকটি কোষগ্রন্থে বিধৃত কয়েকজন কবির রচনা থেকে দৃষ্টান্ত দেওয়া হল। এইসব দৃষ্টান্ত থেকে উপলব্ধি করা যাবে যে ত্রয়োদশ শতকের প্রকীর্ণ কবিতাগুলি হিন্দী কৃষ্ণকাব্যের এবং বাংলা পদাবলী সাহিত্যের ভূমিকা রচনা করেছিল। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সদুক্তিকর্ণামৃত সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন তা সাধারণভাবে সকল সংস্কৃত ও প্রাকৃত প্রকীর্ণ কবিতা সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। তিনি বলেছেন : 'We find quite an anticipation of Middle Bengali poetic literature and even of modern Bengali poetry, in a number of these Slokas. For the study of the poetic literature of Bengali, the Sadukti-Karnamrita can certainly be considered as one of its basic sources although it is couched in the Sanskrit language.'[৪২]

পদাবলী

বৈদিক যুগ থেকে পুরাণ পর্যন্ত কৃষ্ণকাহিনীর বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জীবনের বিচিত্র কাব্যরূপও বিবর্তিত হয়েছে। সংস্কৃত, প্রাকৃত, প্রাচীন তামিল প্রভৃতি ভাষার কবিদের রচনায় রাধার আবির্ভাব অনেক পরে হলেও ভারতীয় সাহিত্যে তাঁর আগমন আকস্মিক নয়। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার যথার্থই বলেছেন : 'দ্বাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে সহসা জয়দেব অজ্ঞাত অখ্যাত রাধাকে লইয়া কাব্য রচনা করেন নাই ইহা

বুঝা প্রয়োজন। শ্রীরাধার অভিসার, মান, রাস, কুঞ্জভঙ্গ, বিরহ প্রভৃতি লইয়া তামিল, প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষায় বহু কবি বহু পদ ও শ্লোক জয়দেবের পূর্বে ও সমসময়ে লিখিয়াছিলেন।'[৪৩]

ভারতের পূর্বাঞ্চলে নতুন ধারায় পদাবলী রচনার গুরু জয়দেব। কিন্তু তাঁর পূর্বেও কৃষ্ণকাব্য প্রচলিত ছিল। যদিও পদাবলী বলতে আমাদের প্রথমেই মনে পড়ে বিশেষ কিছু গুণসম্পন্ন বাংলা বৈষ্ণবকাব্য, বৃহত্তর অর্থে ভারতের সকল ভাষাতেই বিভিন্নরূপে ও নামে কৃষ্ণ-বিষয়ক পদাবলী রচিত হয়েছে। আড়বার ভক্তগণ তামিল ভাষায় যে গেয় কাব্য রচনা করেছেন তা 'প্রবন্ধম্' নামে পরিচিত। হিন্দীতে পদাবলীর পরিবর্তে সাধারণত বলা হয় কৃষ্ণকাব্য। পশ্চিম ভারতে এ ধরনের ভক্তিগীতি 'বাণী' নামে পরিচিত। গদাধর ভট্টের একটি গীতি-সংকলনের নাম 'মোহিনীবাণী'।

পদাবলীব উৎকর্ষ এসেছে ধীরে ধীরে ক্রমবিবর্তনেব পথে। সংস্কৃত ও প্রাকৃত প্রকীর্ণ কবিতা যে এর ভূমিকা রচনা করেছে তা পূর্বেই দেখানো হয়েছে। বাংলা পদাবলীর উপর গীতগোবিন্দের সরাসরি প্রভাব অনস্বীকার্য। মৈথিলী ভাষায় রচিত হলেও বিদ্যাপতির কৃষ্ণগীতি বাংলার বৈষ্ণব কবিদের নানা দিক থেকে প্রভাবান্বিত করেছে। চর্যাপদ, মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়, পৌরাণিক কাহিনীর লৌকিক গাথারূপ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পদাবলী রচনার পথ প্রশস্ত করেছে। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের মধ্যে বাংলা পদাবলী সাহিত্যের প্রথম নির্দেশিকা পাওয়া যায়।

পদাবলী (স্ত্রী) শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল পদসমুচ্চয় বা পদের শ্রেণী (পদানাং আবলী)। এখন পদ শব্দের অর্থ কি দেখা দরকার। ঋগ্‌বেদের আমল থেকেই পদ শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। 'পদ' শব্দের গান বা গীতিকাব্য অর্থটি বোধ হয় ঋগ্‌বেদের পরে এসেছে। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ বলেন: '..পদের অর্থই গান। খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতকে রচিত ভরতের নাট্যশাস্ত্রে 'পদ' শব্দে গান বা গীতিকেই লক্ষ্য করা হয়েছে। খ্রীস্টীয় চারশো-দুশো শতকের মহাকাব্য রামায়ণ মহাভারত ও হরিবংশে এবং এমনকি খ্রীস্টীয় শতকের প্রথম ভাগের পঞ্চরাত্র সংহিতা ও পুরাণ-সংহিতাগুলিতে গান বা গীতির দ্যোতক 'পদ' ব্যবহার দেখা যায়। রামায়ণে (বালকাণ্ডে, ৪র্থ সর্গ) 'বিচিত্রার্থপদং সম্যগ গায়কৌ সমচোদয়ৎ' বা 'অবগায়তাং মার্গবিধানসম্পদা' শ্লোকাংশে 'পদ' শব্দে গান বুঝিয়েছে।'[৪৪]

ভরত (আনুমানিক খ্রীঃ চতুর্থ-পঞ্চম শতক) নাট্যশাস্ত্রে 'গান্ধর্বমিতিবিজ্ঞেয় স্বরতালপদাশ্রয়ম্' (২৮।৮) এবং 'গান্ধর্বং ত্রিবিধং বিদ্যাৎ স্বরতালপদাত্মকম্' (২৮।১২) শ্লোকাংশ দুটিতে গান বা সংগীত অর্থেই 'পদ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

কালিদাসের (খ্রীস্টীয় ১ম-৪র্থ শতক) রচনাবলীর অনেক জায়গায় এরূপ গান বা সংগীত অর্থে 'পদ' শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়। মেঘদূতের নিম্নলিখিত শ্লোকে এই অর্থে 'পদ' শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে:

'উৎসঙ্গে বা মলিনবসনে সৌম্যঃ নিক্ষিপ্য বীণাং
মদ্‌গোত্রাঙ্কং বিরচিতপদং গেয়মুদ্‌গাতুকামা।

তন্ত্রীমার্দ্রাং নয়ন সলিলৈঃ সারয়িত্বা কথঞ্চিদ্
ভূয়োভূয়ঃ স্বয়মপি কৃতাং মূর্চ্ছনাং বিস্মরন্তী ॥'[৪৫]

অর্থাৎ, মলিনবসনা বিরহিনী কোলের উপর বীণা রেখে গান করছে। তার নিজের রচিত সেই গান আমারই কথায় পূর্ণ। গাইতে গিয়ে চোখের জলে বীণার তার বারবার সিক্ত হয়ে সুর ভুল হয়ে যায়।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালে বৌদ্ধ চর্যাগানের যে পুঁথি আবিষ্কার করেন তার উল্লেখ আছে 'চর্যাপদ' হিসাবে। সুতরাং বাংলা ভাষাতেও গান অর্থে 'পদ' শব্দের ব্যবহার হাজার বারোশ বছর আগে থেকে চলে আসছে। পদাবলী শব্দটির বিশেষ অর্থে প্রচলন হয় ৯ম-১২শ শতকে— এমন অনুমান করা যেতে পারে। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাবে ঐ সময় পর্যন্ত পদ বলতে প্রায়ই বোঝাত গানের দুটি লাইন বা couplet।

যতদূর জানা যায়, 'পদসমুচ্চয়' অর্থে পদাবলীর প্রথম ব্যবহার করেছেন অষ্টম শতকের প্রথমার্ধের আলংকারিক দণ্ডী তাঁর কাব্যাদর্শে : 'শরীরং তাবদিষ্টার্থব্যবচ্ছিন্ন পদাবলী' (১।১০)। কিন্তু এখানে পদ শব্দের অর্থ 'শব্দ', গান কিংবা গীতিকবিতা নয়। শার্ঙ্গদেব (১৩শ শতকের প্রথমার্ধ) নিজে সংগীতজ্ঞ হলেও পদ যে শব্দ অর্থেও ব্যবহার হতে পারে তা স্বীকার করেছেন : 'তাতাহন্যবাচকং পদম্।'[৪৬] মল্লিনাথ সমর্থন করে বলেছেন : 'অর্থপ্রকাশকং পদং', অর্থাৎ, যা অর্থ প্রকাশ করে তা-ই পদ। অবশ্য অন্যান্য টীকাকারেরা সংগীতরত্নাকরের পরিপ্রেক্ষিতে 'পদ' শব্দকে গীত অর্থেই গ্রহণ করেছেন।

সংস্কৃতে লিখিত হলেও জয়দেবের গীতগোবিন্দ বাংলা বৈষ্ণব পদাবলীর প্রেরণাস্থল। বাঙালী কবি রচিত পদাবলীর যে বৈশিষ্ট্য আমাদের মুগ্ধ করে তার সূচনা জয়দেব করেছিলেন নিম্নলিখিত শ্লোকে :

যদি হরি স্মরণে সরসং মনো
যদি বিলাস কলাসু কুতূহলম্।
মধুর কোমল কান্ত পদাবলীং
শৃণু তদা জয়দেব সরস্বতীম্ ॥[৪৭]

যদি হরি স্মরণ করে মন সরস করবার আকাঙ্ক্ষা থাকে, যদি তাঁর লীলাকলাদি সম্বন্ধে জানবার কৌতূহল থাকে, তবে জয়দেব রচিত এই মধুর কোমলকান্ত পদাবলী শ্রবণ করুন। 'মধুর কোমলকান্ত' এই হল পদাবলীর বৈশিষ্ট্য। মধুর কোমল এবং হৃদয়গ্রাহী পদাবলীর প্রথম রচয়িতা জয়দেব। এমন সংগীতময় মর্মস্পর্শী শ্লোক পূর্বে রচিত হয়নি।

বাংলা বৈষ্ণব পদাবলী

ভারতের সকল আঞ্চলিক ভাষার সাহিত্যেই পদাবলীর ভাষা অন্য শ্রেণীর কবিতার ভাষা থেকে পৃথক। ভক্তিরসাপ্লুত ভাবের স্নিগ্ধতাই এই পার্থক্যের প্রধান কারণ।

বাঙালী কবির রচিত পদাবলীর ভাষা মোটামুটি দুটি— বাংলা ও ব্রজবুলি। পদাবলী ব্যতীত অন্যত্র ব্রজবুলির ব্যবহার নেই। সুতরাং ব্রজবুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

ব্রজবুলি কথাটির প্রচলন ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে হয়নি। বৈষ্ণব পদাবলীর ভাষা স্বভাবতই ব্রজবুলির ভাষা হবে এই রকম ধারণার বশবর্তী হয়ে নাম দেওয়া হয়েছিল ব্রজবুলি। ষোড়শ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ব্রজবুলি পদাবলী রচনায় ব্যবহৃত হয়েছে।

ব্রজবুলির সর্বশেষ সার্থক প্রয়োগ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। বঙ্কিমচন্দ্র এবং মধুসূদনও ব্রজবুলিতে পদ রচনা করেছিলেন।

অধ্যাপক সুকুমার সেন বলেন 'ব্রজবুলির বীজ লৌকিকের (অর্বাচীন অবহট্‌ঠের), অঙ্কুরোদ্‌গম মিথিলায় এবং প্রতিরোপণ বাংলায়।'[৪৮]

উমাপতির ও বিদ্যাপতির পদাবলী বাঙালী, অসমীয়া ও ওড়িয়া বৈষ্ণব কবিদের বিশেষরূপে প্রভাবিত করেছিল। সেই সূত্রে প্রাচীন মৈথিল ও বাংলার সঙ্গে কিছু হিন্দী শব্দের মিশ্রণের ফলে ব্রজবুলির সৃষ্টি হয়েছে।

অসমীয়া ও ওড়িয়া কবিরা স্থানীয় শব্দও কিছু কিছু ব্যবহার করেছেন। তৎসম শব্দের প্রাচুর্য ব্রজবুলির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। ব্রজবুলির প্রাচীনতম কবি যশোরাজ খাঁ। ব্রজবুলিতে রচিত তাঁর 'এক পয়োধর চন্দন লেপিত' পদটির রচনাকাল আনুমানিক ১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীস্টাব্দ।

বৈষ্ণব কবিরা ব্রজবুলি কেন ব্যবহার করেছেন এ প্রশ্ন উঠতে পারে। প্রথমত, কৃত্রিম ভাষার একটা নিজস্ব আকর্ষণ আছে। পালি, প্রাকৃত ও অপভ্রংশও মিশ্রিত কৃত্রিম ভাষা। আমাদের সাহিত্যে এদের প্রয়োগ আছে। দ্বিতীয়ত, দৈনন্দিন ব্যবহারে ক্ষয়ে যাওয়া ভাষা অপেক্ষা একটি নতুন অপরিচিত ভাষায় অতীন্দ্রিয় অনুভূতির প্রকাশ অধিকতর ইঙ্গিতময় হয়ে ওঠে। তৃতীয়ত ব্রজবুলির লালিত্য মধুর কোমলকান্ত পদাবলী রচনার পক্ষে বিশেষ উপযোগী।[৪৯]

কয়েকজন বাঙালী কবি ব্রজধামের ভাষা ব্রজভাখাতেও পদ রচনা করেছেন। পরমানন্দ ও কৃষ্ণানন্দ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। বৈষ্ণব পদাবলীর প্রাচীন সংকলনগ্রন্থে বাঙালী ও অবাঙালী কবি রচিত ব্রজভাখার পদাবলী অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।[৫০]

বিহার, বাংলা, আসাম ও উড়িষ্যার বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যকে যে ব্রজবুলি ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করেছিল তাতে ভুল নেই। ছন্দ, অলংকার, বাক্‌প্রতিমা প্রভৃতির জন্য বৈষ্ণব কবিরা সংস্কৃত সাহিত্যের নিকট সর্বাধিক ঋণী। রাধাকৃষ্ণের লীলাকাহিনী এবং ভক্তিধর্মের সারতত্ত্ব সর্বভারতীয়। সুতরাং বাংলা পদাবলী ও হিন্দী কৃষ্ণকাব্য সর্বভারতীয় কাব্যধারা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও আঞ্চলিক ভাষার পদাবলী সাহিত্য স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল।

ভারতীয় ভক্তিসাহিত্যে ও রসসাহিত্যে বাংলা ভাষার পদাবলী এক বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন, চৈতন্যদেবের প্রত্যক্ষ প্রভাব, বাংলা ভাষার লালিত্য এবং বাঙালী কবিদের রসানুভূতির প্রাবল্য মিলিতভাবে এই বৈশিষ্ট্য সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে।

বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনে বৈষ্ণব পদাবলীর এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। সাহিত্য, ধর্ম ও সংগীতের অপূর্ব সামঞ্জস্যপূর্ণ মিলন ঘটেছে বৈষ্ণব পদাবলীতে। ধর্মের গণ্ডী অতিক্রম করে বাঙালীর বৃহত্তর সাংস্কৃতিক জীবনে পদাবলী আপন স্থান করে নিয়েছে। অন্য ভাষার পদাবলী সাধক ও ভক্তদের নিকট মুখ্যত ভজন হিসাবে সমাদৃত। কিন্তু বাংলা পদাবলী বাঙালীর জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রায় পাঁচশত বৎসর যাবৎ পদাবলী বাঙালীর সাহিত্য সংগীত ও অধ্যাত্মরসের পিপাসা তৃপ্ত করে এসেছে। বর্তমানে পদাবলীর প্রভাব ক্ষীণ হলেও শতাধিক বৎসর পূর্ব পর্যন্ত বৈষ্ণব কবিদের রচিত গীতিকবিতা ছিল আমাদের ধর্ম ও সংস্কৃতির অন্যতম নিদর্শন।

বৈষ্ণব পদাবলী বৈষ্ণব সাধনার বিশিষ্ট অঙ্গ। কবিরা ছিলেন সাধক এবং বিভিন্ন শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। সুতরাং পদাবলীর সাহিত্যমূল্য যাই থাক না কেন, বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনই এর মূল ভিত্তি। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতাদর্শের সঙ্গে পরিচয় না থাকলে পদাবলীর রস সম্যক আস্বাদন করা সম্ভব নয়। পদাবলীর রচয়িতারা শুধু কবিত্বশক্তির অধিকারী ছিলেন না, তাঁরা সাধক এবং শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন— এজন্য এঁদের মহাজনও বলা হত।

ভক্ত ভগবানের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপন করে তাঁকে অন্তরের ধন করে তোলেন। এই সম্পর্ক পাঁচ প্রকারের এবং তা থেকে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর— এই পাঁচটি রসের সৃষ্টি হয়। এদের মধ্যে শেষোক্ত তিনটি রসই প্রধানত পদাবলীর উপজীব্য। বৈষ্ণব দর্শনে প্রেমের স্থান ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের উপরে। তাই পদাবলীতে শৃঙ্গার রসের প্রাধান্য। আর এই প্রাধান্য বিশেষ করে বাংলার পদাবলীতে। চৈতন্যদেবের জীবন-সাধনার প্রভাবেই তা হয়েছে। দক্ষিণ ভারতের আড়বার সম্প্রদায়ের অন্যতম কবি অণ্ডাল, বিখ্যাত সাধিকা মীরাবাঈ ও অন্যান্য বহু সাধক কবি নিজেদের আরাধ্য দেবতার প্রিয়তমা হিসাবে কল্পনা করে পদ রচনা করেছেন। কিন্তু বাংলার মহাজনেরা চৈতন্যদেবকে রাধার আসনে বসিয়ে নিজেরা সখীরূপে ভক্তিরসাপ্লুত চিত্তে রাধাকৃষ্ণের লীলা প্রত্যক্ষ করেছেন, কখনও বা সেই লীলা সম্বর্ধনে সহায়তা করেছেন।

পদাবলীর মুখ্য বিষয়বস্তু শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা ও বৃন্দাবনলীলা। এর মধ্যে বৃন্দাবনলীলাই প্রাধান্য লাভ করেছে। চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণের পরে তাঁর পুণ্য জীবনলীলা নিয়েও পদাবলী রচিত হতে থাকে। চৈতন্যবিষয়ক পদাবলী এই কটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে : (১) চৈতন্য বন্দনা ; (২) বাল্যকাল থেকে সন্ন্যাস গ্রহণ পর্যন্ত জীবনলীলা ; (৩) চৈতন্যের ভাবোন্মাদ।

এই তো গেল পদাবলীর ধর্মের দিক। সাহিত্য হিসাবে পদাবলী গীতিকবিতার মর্যাদা পেতে পারে। কস্তুতপক্ষে পদাবলী আধুনিক বাংলা গীতিকবিতার উৎস-স্বরূপ। সুষ্ঠু শব্দ নির্বাচন, ছন্দের লালিত্য, বাক্‌প্রতিমার চমৎকারিত্ব এবং অনুভূতির গভীরতায় সাহিত্য-রসিকের মনে পদাবলীর আবেদন আলোড়ন সৃষ্টি করে। তবে আধুনিক গীতিকবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য যে আত্মমুখীনতা, পদাবলীতে তার অভাব আছে। পদাবলী কবির নিজস্ব সুখদুঃখ-সঞ্জাত অনুভূতির প্রতিফলন নয়। গোষ্ঠীগত ধর্মসাধনার ব্যক্তিনিরপেক্ষতা পদাবলীর বৈশিষ্ট্য।

সীমিত বিষয়বস্তু উপজীব্য বলে পদাবলী সাহিত্যে পুনরুক্তি দোষ ঘটেছে। একই ভাব, দৃশ্য, ঘটনাসংস্থান, উপমা ইত্যাদি বারবার ফিরে এসেছে বিভিন্ন পদে। তার ফলে চৈতন্যদেবের তিরোধানের শতাব্দীকালের মধ্যেই পদাবলী প্রাণহীন পুনরাবৃত্তিতে পরিণত হয়েছিল।

লৌকিকের আধারে অলৌকিককে ধরে রাখবার তীব্র ব্যাকুলতা পদাবলীর মধ্যে একটি রোমান্টিক আর্তির সুর এনেছে। সুদূরের জন্য এই রোমান্টিক পিপাসা গীতিকবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

পদাবলীর কবিরা ছিলেন সংস্কৃত সাহিত্যে ও অলংকারশাস্ত্রে পণ্ডিত। তাই অনেক ক্ষেত্রে সংস্কৃত ছন্দের অনুকরণ পাওয়া যায় পদাবলীতে। সাধারণত অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত এবং মিশ্র ছন্দে বৈষ্ণব কবিরা পদাবলী রচনা করেছেন।

পৃথিবীর সকল ধর্মের সাধন পদ্ধতিতেই সংগীতের প্রয়োগ দেখা যায়। আমরাও ঋগ্‌বেদের যুগ থেকে ভগবানের বন্দনায় ও আরাধনায় সংগীতের সহায়তা নিয়েছি। পদাবলীও ভজন হিসাবে রচিত, গীত হলেই তার রস সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা যায়। ভগবানের মহিমা ভক্তের হৃদয়ে মুদ্রিত করবার উদ্দেশ্যে যখন গান করা হয় তখন তাকে বলা হয় কীর্তন। কীর্তন-বিশারদ খগেন্দ্রনাথ মিত্র বলেছেন: 'ভগবদ্‌-ভক্তির জন্য যে গুণকথন, লীলাবর্ণন প্রভৃতির প্রয়োজন তাহা হইতেই সংগীতের নাম হইয়াছে কীর্তন। সুতরাং ভগবদ্‌ বিষয়ক সংগীত ব্যতীত অন্য সংগীতকে কীর্তন নামে অভিহিত করা যায় না।'[৫১]

রূপগোস্বামীর সংজ্ঞা অনুসারে কীর্তন তিন প্রকার: নামকীর্তন, গুণকীর্তন এবং লীলাকীর্তন। নামকীর্তন ও গুণকীর্তন শুনে শুনে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অচলা ভক্তি জাগ্রত হলেই লীলাকীর্তন শোনবার অধিকার জন্মে। লীলাকীর্তন অনধিকারীর পক্ষে চিত্তচাঞ্চল্যের কারণ হতে পারে।

কীর্তনের জন্যই পদাবলীর এমন জনপ্রিয়তা সম্ভব হয়েছে। পদাবলীর অনুভূতি সুরের মধ্য দিয়ে ভক্তের হৃদয় যেমনভাবে আপ্লুত করতে পারে শুধু কাব্যপাঠে বা শ্রবণে তা সম্ভব নয়। বিচ্ছিন্ন পদগুলিকে কৃষ্ণের বাল্য, গোষ্ঠ, রাস, প্রভৃতি লীলা হিসাবে গ্রথিত করে পালাকীর্তন সংকলন করায় শ্রোতাদের আগ্রহ বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে এক-একটি লীলাকে কেন্দ্র করে রসের সাবলীল বিস্তার সহজ হয়। রূপ-গোস্বামীর উজ্জ্বলনীলমণিতে নির্দেশিত রীতি অনুসারে রাধা-কৃষ্ণলীলাকে পালা-

কীর্তন হিসাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

বিবর্তনের ধারা অনুসারে পদাবলীর ইতিহাস তিনটি স্তরে বিভক্ত করা যায় : (১) চৈতন্যপূর্ববর্তী পদাবলী ; (২) চৈতন্যসমকালীন পদাবলী ; (৩) চৈতন্য-পরবর্তী পদাবলী।

ষোড়শ শতাব্দী বাংলা পদাবলী সাহিত্যের স্বর্ণযুগ। এই স্বর্ণযুগের মূলে উৎস চৈতন্যদেব। দিব্যোন্মাদের পর থেকে তিনিও পদাবলীর বিষয় হিসাবে বৈষ্ণব কবিদের নিকট সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি পেলেন। সুতরাং পূর্বেকার রাধা-কৃষ্ণের লীলার সঙ্গে পদাবলীতে যোগ হল চৈতন্যলীলা। বাংলা পদাবলীর এই বৈশিষ্ট্য অন্যান্য আঞ্চলিক সাহিত্যের কৃষ্ণকাব্যে স্বভাবতই অনুপস্থিত।

প্রাক্-চৈতন্য যুগ পদাবলী সাহিত্যের প্রস্তুতির যুগ। জয়দেবের গীতগোবিন্দ এবং বিদ্যাপতির মৈথিল পদাবলী যে ভূমিকা রচনা করেছিল, বড়ু চণ্ডীদাস এবং মালাধর বসু তাকে সার্থক পদাবলী রচনার পথে অনেক দূর এগিয়ে নিয়েছিলেন। তার পূর্বে অবশ্য আমরা পেয়েছি খ্রীস্টীয় দশম-দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত চর্যাপদ। প্রথম যুগের বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গে চর্যাপদের গঠনগত মিল কিছু থাকলেও আত্মিক মিল কম।

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচনাকাল আনুমানিক চতুর্দশ শতাব্দী। চণ্ডীদাস নামধারী পদকর্তা কয়জন ছিলেন সেই বিতর্কে আমাদের প্রয়োজন নেই। নানা প্রমাণ উল্লেখ করে পণ্ডিতরা সিদ্ধান্ত করেছেন বড়ু চণ্ডীদাস চৈতন্যদেবের পূর্ববর্তী এবং 'দীন' ও 'দ্বিজ' চণ্ডীদাস চৈতন্যের সমসাময়িক অথবা পরবর্তীকালের পদকর্তা।

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পদের সংগ্রহ নয়। রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়লীলার কাহিনী অবলম্বন করে কবি গীতগোবিন্দের মতো গীতিনাট্য রচনা করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম থেকে কংসবধের জন্য মথুরা গমন এবং রাধার বিরহ-বিলাপ পর্যন্ত কাহিনী পাওয়া গেছে। এর পরে পুঁথি খণ্ডিত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন জন্ম, দান, নৌকা, বৃন্দাবন বংশী, রাধাবিরহ প্রভৃতি তেরোটি খণ্ডে বিভক্ত। কৃষ্ণ, রাধা ও বড়াই-এর উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়ে কাহিনী অগ্রসর হয়েছে এবং এর ফলে সৃষ্টি হয়েছে নাট্যরস। পরবর্তী-কালের পদাবলীর সুর অনেক উক্তির মধ্যেই পাওয়া যায়। বিশেষ করে বিরহক্লিষ্টা রাধার বিলাপ পদাবলীর মাধুর্যে পূর্ণ। বংশীখণ্ডের এমনি কয়েকটি পংক্তি বিলাপোক্তির দৃষ্টান্ত হিসাবে উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

'কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নইকুলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে॥
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন্ জনা।
দাসী হুআঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা॥

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি চিত্তের হরিষে।
তার পাএ বড়ায়ি মোঁ কৈলোঁ কোন দোষে ॥
আঝর ঝরএ মোর নয়নের পানী।
বাঁশীর শবদেঁ বড়ায়ি হারায়িলোঁ পরাণী ॥
আকুল করিতেঁ কিবা আহ্মার মন।
বাজাএ সুসর বাঁশী নান্দের নন্দন ॥
পাখি নহোঁ তার ঠাঁই উড়ী পড়ি জাওঁ।
মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ ॥
বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জাণী।
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী ॥[৫২]

গীতিনাট্য হিসাবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নানাবিধ গুণ আছে। কিন্তু কবি রাধিকার বিরহের আর্তি প্রকাশেই আশ্চর্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। পদাবলী সাহিত্যেরও প্রধান সুর বিরহের। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধাবিরহের অংশগুলি পরবর্তীকালের মাথুর পদাবলীর উপর ছায়াপাত করেছে।

চৈতন্যচরিতামৃতে বলা হয়েছে, চৈতন্য চণ্ডীদাসের পদাবলীর রসাস্বাদন করতেন। চরিতামৃতের আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলায় চারবার এই বিষয়ের উল্লেখ আছে। আদি লীলার ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে—

বিদ্যাপতি জয়দেব চণ্ডীদাসের গীত।
আস্বাদেন রামানন্দ-স্বরূপ-সহিত ॥[৫৩]

চৈতন্যদেব যে চন্ডীদাসের পদ আস্বাদন করতেন তিনি তাঁর পূর্ববর্তী অথবা সমসাময়িক। কিন্তু নানা কারণে পূর্ববর্তী হওয়াই অধিকতর যুক্তিযুক্ত মনে হয়। তবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি বড়ু চণ্ডীদাসের পদ যে গৌরাঙ্গ আস্বাদন করতেন না তা একপ্রকার নিশ্চিত রূপেই বলা যেতে পারে। কারণ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অনেক অংশে এমন রুচির পরিচয় পাওয়া যায় যে চৈতন্যের পক্ষে এই কাব্য আস্বাদন করা সম্ভব নয়। তা ছাড়া শ্রীকৃষ্ণকীর্তন যদি তাঁর সমাদর লাভ করত তা হলে এই গ্রন্থ এমন করে বিস্মৃতির গর্ভে হারিয়ে যেত না। সুতরাং মনে হয় পদাবলীর কবি দ্বিতীয় চণ্ডীদাসের রচনা চৈতন্য আস্বাদন করতেন।

পদকর্তা চণ্ডীদাসের যথার্থ কালনিরূপণে যত মতভেদই থাক, তিনি চৈতন্যের পূর্ববর্তী অথবা সমকালীন হন, তাঁর কাব্যের উৎকর্ষ সম্বন্ধে কিন্তু দ্বিমত নেই। বিদ্যাপতির মতো চণ্ডীদাসের পদাবলী হয়ত ছন্দ, উপমা, বাক্প্রতিমা ও শব্দ-সম্ভারে সমৃদ্ধ নয়। কিন্তু সহজ অথচ প্রাণস্পর্শী ভাষায় চণ্ডীদাস আধ্যাত্মিক প্রেমের যে রহস্যানুভূতি সৃষ্টি করেছেন তার তুলনা নেই। চণ্ডীদাসের ভাবসম্মেলনের পদাবলী সম্বন্ধে দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন যে এদের 'স্তোত্ররূপে পাঠ করা যায়,' এরা 'প্রেমের সুগভীর মন্ত্র'।[৫৪]

চণ্ডীদাসের রাধা যোগিনী, তাঁর প্রেম কাম ও স্বার্থবোধের ঊর্ধ্বে। যোগিনী

রাধার চিত্র পাই এই পদটিতে—

আগো রাধার কি হলো অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকই একলে
না শুনে কাহার কথা ॥
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে
না চলে নয়নের তারা।
বিরতি আহারে রাঙ্গা বাস পরে
যেন যোগিনীর পারা ॥
এলাইয়া বেণী খুলয়ে গাঁথনি
দেখয়ে আপন চুলি।
হসিত বয়ানে চাহে মেঘ পানে
কি কহে দুহাত তুলি ॥[৫৫]

সন্ন্যাসবেশী চৈতন্যদেবের কৃষ্ণের জন্য ব্যাকুলতা দেখেই কি লেখা, না তাঁর আবির্ভাবের পূর্বাভাস কবির রচনায় ধরা পড়েছে? কৃষ্ণকে ভালোবেসে রাধা সকল গঞ্জনা হাসিমুখে সইতে পারেন :

কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোক—
তাহাতে নাহিক দুখ।
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ ॥[৫৬]

রাধার এই নিঃশেষে আত্মনিবেদনমূলক প্রেমই জনমানসে পদাবলীর সঙ্গে চণ্ডীদাসের নাম অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত করেছে।

বর্ধমান জেলার কুলীনগ্রাম নিবাসী মালাধর বসু রচিত শ্রীকৃষ্ণবিজয় প্রাক্-চৈতন্য যুগের কৃষ্ণলীলা বিষয়ক একটি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। মালাধর সুলতান রুকনুদ্দীন বারবাক শাহের কাছ থেকে 'গুণরাজ খান' উপাধি পেয়েছিলেন। ১৪৮০ খ্রীস্টাব্দে শ্রীকৃষ্ণবিজয় সম্পূর্ণ হয়। কাব্যটি যথেষ্ট জনসমাদর লাভ করেছিল। চৈতন্যদেব স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের রসাস্বাদন করতেন। মালাধর বসুর পুত্রদের নিকট তিনি এই কাব্যের গুণকীর্তন করেছেন— বিশেষ করে 'নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ' অংশটির।

বাংলায় ভাগবতের রসসমৃদ্ধ অনুবাদের অন্যতম পথিকৃৎ মালাধর বসু। শ্রীকৃষ্ণবিজয় ভাগবতের কয়েকটি স্কন্ধের অনুসরণে রচিত হলেও কোথাও কোথাও মৌলিক কবিত্বের সুর সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে এবং ঐ সব অংশগুলিতে বৈষ্ণব পদাবলীর পূর্বাভাস পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে :

কৃষ্ণ গেলে মরিব সখী তাহে কিবা কাজ।
কৃষ্ণের সাক্ষাতে মৈলে কৃষ্ণ পাবে লাজ ॥
অল্প ধনলোভ লোকে এড়াইতে পারে।
কানু হেন ধন সখী ছাড়ি দিব কারে ॥[৫৭]

চৈতন্যদেবের সমসাময়িক পদকর্তাদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় যশোরাজ খানের। ইনি ছিলেন হোসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯) সভাসদ। ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন যশোরাজ খান কৃষ্ণলীলা বিষয়ক একটি পাঁচালী রচনা করেছিলেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না। যশোরাজ খান পদাবলী সাহিত্যে স্থান লাভ করেছেন ব্রজবুলিতে রচিত তাঁর একটিমাত্র পদের জন্য। সেই বিখ্যাত পদটি হল

এক পয়োধর চন্দন লেপিত
আরে সহজই গোর। ইত্যাদি

মুরারি গুপ্ত বয়সে কয়েক বছরের বড়ো হলেও চৈতন্যদেবের সহপাঠী ছিলেন। তিনি সংস্কৃতে প্রাচীনতম চেতন্য-জীবনী শ্রীকৃষ্ণচেতন্যচরিতামৃতম্ রচনা করেছেন।

'গৌরনাগর' তত্ত্বের প্রবক্তা নরহরি সরকার ছিলেন চৈতন্যের ভক্ত। শ্রীখণ্ডনিবাসী বৈদ্যবংশোদ্ভূত এই কবির পদেব সঙ্গে অষ্টাদশ শতকের কবি নরহরি চক্রবর্তীর পদ মিশে যাওয়ায় কিছু বিভ্রান্তির সৃষ্টি হযেছে। চেতন্যদেবের রাধাভাব এবং কৃষ্ণভাব অবলম্বন করে তিনি কয়েকটি আবেগাপ্লুত পদ রচনা করেছেন। নরহরি সরকার পঞ্চদশ শতকের শেষভাগ থেকে ষোড়শ শতকের প্রথম পাদ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন বলে অনুমান করা হয়।

শিবানন্দ সেন ও তাঁর পুত্র পরমানন্দ কয়েকটি করে পদ রচনা করেছেন। পরমানন্দ অবশ্য কবি কর্ণপুর হিসাবেই পরিচিত এবং তিনখানি সংস্কৃত গ্রন্থের জন্যই তাঁর খ্যাতি। এদের মধ্যে চেতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের প্রসিদ্ধি সবচেয়ে বেশি। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে কবি কর্ণপুর জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৫২৪ খ্রীষ্টাব্দে।[৫৮]

গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ এবং বাসুদেব ঘোষ তিন ভাই ছিলেন চেতন্যের ভক্ত। গোবিন্দ ও মাধব কয়েকটি পদ রচনা করেছেন; সাধন-ভজন-কীর্তনেই ছিল তাঁদের অনুরক্তি। তাঁদের সুমধুর কীর্তন সম্বন্ধে চৈতন্যচরিতামৃতে এবং অন্যত্র উল্লেখ পাওয়া যায়। বাসুদেব প্রায় ১১৮টি পদ রচনা করেছিলেন। চেতন্যেব সমসাময়িক কবিদের মধ্যে এত অধিক সংখ্যক পদ আর কেউ রচনা করেননি। তিনি কৃষ্ণলীলা এবং গৌরাঙ্গলীলা— এই উভয় বিষয় সম্বন্ধে পদ লিখেছেন। প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে গৌরাঙ্গলীলার পদগুলি তাঁর হাতে অধিকতর উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বাসুদেব বাংলা বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য বাৎসল্যরসের কবি।

অন্যান্য পদকর্তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য যদুনন্দন, যদুনাথ দাস, গোবিন্দ আচার্য, মাধব দাস, বংশীবদন, অনন্তদাস, শিবরাম প্রভৃতি। 'চৈতন্যের অন্তরঙ্গ বন্ধু'[৫৯] রায় রামানন্দ ছিলেন উড়িষ্যাবাসী; কিন্তু ব্রজবুলিতে তাঁর পদ 'পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল। অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল' বাংলাদেশে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

চৈতন্যের সমকালীন পদাবলী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় পদকর্তাদের নিকট কৃষ্ণ-

অপেক্ষা চৈতন্য প্রাধান্য লাভ করেছেন। চৈতন্যের লীলা প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ পাওয়াতেই এটা সম্ভব হয়েছে। বিশ্বম্ভর সন্ন্যাস গ্রহণ করায় শচীর মাতৃহৃদয়ের যে বেদনা তা বৈষ্ণব কবিদের মন গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। এই সূত্র ধরেই বাংলা বৈষ্ণব পদাবলীতে বাৎসল্যরসের শুরু হয় বলা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। আধুনিক ভারতীয় ভাষায় শ্রীচৈতন্যই প্রথম ঐতিহাসিক মহামানব যিনি কাব্যের বিষয়বস্তু হয়েছিলেন। তাঁর পূর্ববর্তী সাহিত্যের নায়ক-নায়িকারা ছিলেন পৌরাণিক চরিত্র। চৈতন্যচরিত-গ্রন্থ বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য-ভাগবতে প্রথম একজন মহামানবের জীবনকথা বর্ণনা করা হয়েছে। এদিক থেকে বিচার করলে বলা যায় চৈতন্যের সমকালীন কবিরা মর্তের মানবকে মর্যাদা দিয়ে আধুনিক সাহিত্যের সূত্রপাত করেছিলেন।

১৫৩৩ খ্রীস্টাব্দে চৈতন্যদেবের তিরোধানের পর থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাপ্তি পর্যন্ত, এমনকি রবীন্দ্রনাথের ভানুসিংহের পদাবলীর প্রকাশকাল পর্যন্ত (১৮৮৪ খ্রীঃ) চৈতন্য-পরবর্তী পদাবলীর যুগ বিস্তৃত। এই কালখণ্ডের মধ্যে বহু কবি অসংখ্য পদ রচনা করেছেন। এই সময়ের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কবি জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরামদাস প্রভৃতি।

জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস চৈতন্য-পরবর্তী যুগের পদাবলী সাহিত্যের স্তম্ভস্বরূপ। বর্ধমান জেলার কাঁদরা গ্রামে জ্ঞানদাসের জন্ম হয়। জন্মের তারিখ ঠিক জানা যায় না, তবে বিভিন্ন সূত্র থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, ষোড়শ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে অষ্টম দশক পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। জ্ঞানদাস ছিলেন চৈতন্যের গুণমুগ্ধ ভক্ত এবং নিত্যানন্দের শিষ্য। তিনি বাংলা এবং ব্রজবুলি এই উভয় ভাষাতেই পদ রচনা করেছেন। তাঁর পূর্বরাগ ও আক্ষেপানুরাগ সম্বন্ধীয় পদগুলিই রচনাসৌকর্যে উৎকৃষ্ট। জ্ঞানদাস চণ্ডীদাসের যোগ্য উত্তরাধিকারী। ভাব, ভাষা ও মেজাজের দিক দিয়ে উভয়ের রচনায় যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। তবে জ্ঞানদাসের শিল্পবোধ যে সদা সচেতন তা তাঁর পদ অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করলেই উপলব্ধি করা যায়। চণ্ডীদাসের মধ্যে সাধকসত্তাই প্রাধান্য লাভ করেছে।

জ্ঞানদাসের—

'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥'

এবং

'তোমার গরবে গরবিনী হাম রূপসী তোমার রূপে।
হেন মনে লয় ও দুটি চরণ সদা লয়্যা রাখি বুকে॥'

প্রভৃতি বহু পদের অপূর্ব ভাবব্যঞ্জনা আজও বাঙালীর চিত্ত মুগ্ধ করে, এখনও এই সব পদগুলি লোকের মুখে মুখে শোনা যায়।

গোবিন্দদাস বহু উৎকৃষ্ট পদ রচনা করেছেন। ব্রজবুলির কবি হিসাবে তিনি যে

শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করতে পারেন সে বিষয়ে অনেকেই একমত। বর্ধমান জেলার বৃন্দাবনগরে তাঁর জন্ম। জন্মের সময় ঠিক জানা যায় না, তবে আনুমানিক ১৫২০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৬১০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে তিনি জীবিত ছিলেন।

ভাব ও আঙ্গিকের দিক থেকে বিদ্যাপতির সঙ্গে তাঁর অনেক মিল দেখা যায়। তাই তাঁকে কেউ কেউ 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি' আখ্যা দিয়েছেন। গোবিন্দদাস সচেতন শিল্পী। তাঁর ছন্দজ্ঞান নিখুঁত, আঙ্গিক সযত্ন-রচিত, শব্দঝংকারে তিনি অতুলনীয়। অভিসারের, বিশেষ করে বর্ষাভিসারের পদ রচনায় তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। অল্প কয়েকটি কথায় পরিবেশ রচনায় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন গোবিন্দদাস। বর্ষার এই ছবিটি মাত্র দুটি পংক্তিতে কেমন সুন্দর ফুটেছে :

চৌদিশে অথির পবন ভোরু দোল।
জগভাব শীকর নিকর হিলোল ॥[৬০]

বাৎসল্য রসের উৎকৃষ্ট পদকর্তা হিসাবে বলরাম দাস এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। বলরাম দাসের হাতে এই শ্রেণীর পদ বিচিত্ররূপে বিকাশলাভ করেছে। চণ্ডীদাসের মতো বলরাম দাসের সংখ্যা নিয়েও সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। বাৎসল্য রসের পদকর্তা বলরাম দাসের জন্মস্থান কৃষ্ণনগরের নিকটবর্তী দোগাছিয়া। ষোড়শ শতকের শেষভাগে তিনি জীবিত ছিলেন বলে অনুমান করা হয়।

আরো অনেক কবি উৎকৃষ্ট পদ রচনা করেছেন। খ্যাত-অখ্যাত সকল ভক্ত কবির রচনা বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করেছে।

আমরা পূর্বেই বলেছি ষোড়শ শতাব্দী পদাবলী সাহিত্যের স্বর্ণযুগ। শ্রীচৈতন্যের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি ছিল মূল প্রেরণা। তাঁর তিরোধানের পর বৈষ্ণব সমাজে যে শূন্যতা সৃষ্টি হল তা কিছুটা পূর্ণ করেছিলেন বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামীরা তাঁদের রচিত বৈষ্ণব শাস্ত্রগ্রন্থাদি প্রচার করে। এঁরা 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের দার্শনিক ভিত্তি গঠন করে আবেগের ধর্মকে সুদৃঢ় মননের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন।'[৬১] বৃন্দাবনের গোস্বামীদের প্রভাব বৈষ্ণব সমাজের উপর পড়তে আরম্ভ করে ষোড়শ শতকের শেষভাগে। এই সম্পর্কে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার বলেন, 'ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে গোপাল ভট্ট গোস্বামীর শিষ্য শ্রীনিবাস আচার্য এবং শ্রীচৈতন্যের সহচর লোকনাথ গোস্বামীর শিষ্য নরোত্তম ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন হইতে গোস্বামীদের রচিত কাব্য, নাটক, অলংকারাদি অধ্যয়ন করিয়া আসিলেন। তাঁহারা বাংলাদেশে এসব গ্রন্থের প্রচার করেন। তাহার ফলে পদাবলী উজ্জ্বলনীলমণি ও স্তবাবলীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়।'[৬২]

ধর্মের ক্ষেত্রে শাস্ত্রগ্রন্থ আবেগ রুদ্ধ করল, সহজ স্বতঃস্ফূর্ত ঈশ্বরোপাসনার স্থান অধিকার করল শাস্ত্রনির্দিষ্ট অনুষ্ঠান। তেমনি পদাবলীও বাধা পড়ল উজ্জ্বলনীলমণি ও ভক্তিরসামৃতসিন্ধু নির্দেশিত রীতি ও রসশাস্ত্রের গণ্ডীর মধ্যে। এই বন্ধন পদাবলীর কাব্যধর্ম বিকাশের সহায়ক হয়নি। পরিণামে সপ্তদশ শতকের প্রথম থেকেই পদাবলী সাহিত্যে প্রাণরসের দৈন্য অনুভব করা যায়। স্বতঃস্ফূর্ত আবেগের সারল্য

ও সাবলীলতা হারিয়ে প্রথাসিদ্ধ পথে পুনরাবৃত্তি করাই পদাবলী রচনার রীতি হয়ে দাঁড়াল।

চৈতন্যের সমকালীন পদকর্তারা তাঁর জীবনলীলাকে পদাবলীর বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। চৈতন্য-পরবর্তী কালের কবিদের রচনায় রাধা-কৃষ্ণ লীলা বড়ো হয়ে উঠেছে। তথাপি চৈতন্যের ছায়া পড়েছে রাধার কৃষ্ণের জন্য আকুলতার মধ্যে। চৈতন্য-পরবর্তীকালের কোনো কোনো কবি সর্বপ্রথম বাৎসল্য রসের পদ রচনা করেছেন। পূর্বে এই রসের পদ ছিল না বলা যায়। পুত্রের জন্য শচীমাতার আর্তির যে বর্ণনা পাওয়া যায় বিভিন্ন চরিতগ্রন্থে, সেই অনুভূতিই হয়ত কবিদের বাৎসল্য রসের পদাবলী রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছে।

সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে পদাবলী সাহিত্যের গুণগত উৎকর্ষ ক্রমশই হ্রাস পেতে আরম্ভ করলেও প্রচার বৃদ্ধি পেতে থাকে কীর্তনের জনপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে।

হিন্দী কৃষ্ণকাব্য

প্রাচীন হিন্দী সাহিত্যের নিদর্শনগুলি মুখ্যত দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথমত, নাথ সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে রচিত সাহিত্য; দ্বিতীয়ত, চারণ-সাহিত্য। খ্রীস্টীয় দশম-একাদশ শতকে ছিল গোরক্ষনাথ এবং অন্যান্য নাথ-সাধকদের কাহিনী অবলম্বনে রচিত নাথ-সাহিত্যের প্রাধান্য। দ্বাদশ শতাব্দী থেকে শুরু হল চারণ কবিদের যুগ। বিভিন্ন রাজবংশের শৌর্যবীর্যের গৌরবগাথা রচনা করে চারণ কবিরা ঘুরে ঘুরে তা গেয়ে বেড়াত। এই ধরনের চারণ গাথার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য চাঁদ কবির পৃথ্বীরাজ রাসো।

উত্তর ভারতে মুসলমান আধিপত্য সম্পূর্ণ হবার পর হিন্দু রাজাদের বীরত্ব প্রকাশের সুযোগ যখন আর রইল না তখন প্রেরণার অভাবে চারণ কবিদের কণ্ঠও স্তব্ধ হয়ে গেল। এর পর থেকে প্রায় আড়াইশ' বছর হিন্দী সাহিত্যের বন্ধ্যা পর্ব।

পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধে ভক্তিধর্মের প্রবল বন্যা হিন্দী সাহিত্যে নতুন প্রাণের সঞ্চার করে। ভক্তিবাদের যাঁরা গুরু তাঁরা ধনী দরিদ্রের পার্থক্য, জাতিভেদ, শিক্ষিত অশিক্ষিতের প্রভেদ বড়ো করে দেখেননি। সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোকেরাও আমন্ত্রণ পেল এই নতুন ধর্মে উজ্জীবিত হয়ে উঠতে। সুতরাং ধর্মব্যাখ্যানের ভাষা সংস্কৃতের পরিবর্তে হল হিন্দী। ভক্তিবাদের গুরুদের মধ্যে রামানন্দ (১৪০০-১৪৭০) প্রথম হিন্দী ব্যবহারের উপর জোর দেন। সংস্কৃতের পরিবর্তে হিন্দীতে ধর্মোপদেশ দেওয়া তিনিই আরম্ভ করেন। অবশ্য তাঁর লেখা হিন্দী গ্রন্থের কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না। গ্রন্থসাহেবে তাঁর রচিত 'কত জাঈ ঐ রে ঘর লাগো রঙ্গু' পদটি পাওয়া যায়। হয়ত আরও পদ তিনি রচনা করেছিলেন, এখন সেগুলি হারিয়ে গেছে।

মারাঠী সাধক নামদেব (১২৭০-১৩৫০ খ্রীঃ) হিন্দী কৃষ্ণকাব্যের পথিকৃৎ বললে

অত্যুক্তি হয় না। তিনি দীর্ঘকাল উত্তর ভারতে বসবাস করেছেন এবং নিজে খড়ীবোলী ও ব্রজভাষায় অনেক পদ রচনা করেছেন। নিগুর্ণ ভক্তির পদ লিখেছেন সধুক্কড়ী খড়ীবোলীতে ; আর সগুণ ভক্তির পদ রচনা করেছেন ব্রজভাষায়। রামানন্দ ছিলেন রামের সাধক ; নামদেব কৃষ্ণভক্ত। নিম্নলিখিত কৃষ্ণের বন্দনাগীতিটি তাঁর রচনা :

ধনি ধনি মেঘা রোমাবলী। ধনি ধনি ক্রিসন ওঢ়ে কাঁবলী।
ধনি ধনি তু' মাতা দেবকী। জিহ গ্রিহ রমঈআ কঁবলাপতি ॥
ধনি ধনি বনখণ্ড বিন্দ্রাবনা। জহ' খেলৈ শ্রীনারায়ণা।
বেনু বজাবৈ গোধনু চরৈ। নামেকা সুআমী মানন্দু করৈ ॥[৬৩]

বল্লভ-সম্প্রদায়ের গুরু বল্লভাচার্য নিজে হিন্দীতে কিছু না লিখলেও তাঁর প্রেরণায় অষ্টছাপের কবিরা হিন্দী কৃষ্ণকাব্যের ধারাকে বিশেষরূপে পুষ্ট করেছেন। গুজরাটের ভক্তকবি নরসিংহ মেহতা (১৫০০-১৫৮০) কয়েকটি ভক্তিমূলক গীতিকবিতা রচনা করেছেন হিন্দীতে।

দেখা যাচ্ছে রামানন্দ, নামদেব, বল্লভাচার্য, নরসিংহ মেহতা প্রভৃতি যাঁরা হিন্দী রচনার সূত্রপাত করেছিলেন তাঁরা মূলতঃ কেউ হিন্দীভাষী ছিলেন না। অবশ্য ব্রজভাষায় সগুণ কৃষ্ণভক্তির কাব্যরচনা শুরু হয়েছিল বল্লভাচার্য বৃন্দাবনে আসবার পঞ্চাশ ষাট বছর আগে। কবি বিষ্ণুদাস বৃন্দাবনলীলাব মধুর রস অবলম্বন করে ঐ সময় রচনা করেছিলেন 'রুক্মিণী মঙ্গল'।

এই প্রসঙ্গে মিথিলার কবি বিদ্যাপতিব নাম উল্লেখ করতে হয়। মৈথিল সাহিত্যের ইতিহাসকার ডঃ জয়কান্ত মিশ্রের মতে বিদ্যাপতির জন্ম ১৩৬০ খ্রীস্টাব্দে এবং মৃত্যু ১৪৩৭ খ্রীস্টাব্দে। মৈথিল ভাষায় বিদ্যাপতি মধুর রসের অনেকগুলি অপূর্ব পদ রচনা করেন। বিদ্যাপতির অনেক পদে রাধাকৃষ্ণেব উল্লেখ নেই ; লৌকিক প্রেমের অনুভূতিই প্রকাশ পেয়েছে সেই সব কবিতায়।

বাঙালী পদকর্তাদের উপর বিদ্যাপতিব গভীর প্রভাব পড়েছে। বাংলাদেশেই তাঁর রচনাবলী সমাদৃত এবং সংরক্ষিত হয়েছে এবং বিদ্যাপতির ভাষাও বাংলার কাছাকাছি। যেমন

চিকুর নিকুর তম সম পুনু আনন পুনিব সসী।
নঅন-পংকজ কে পতি আওল এক ঠাম রহু বসী ॥[৬৪]

অর্থাৎ, রাধার কেশগুচ্ছে অন্ধকার জমাট বেঁধেছে, মুখ পূর্ণিমার চন্দ্রের মতো। চোখ কমলের ন্যায়। আশ্চর্য, রাত্রির অন্ধকার, পূর্ণিমার চন্দ্র এবং কমল একসঙ্গে মিলিত হয়েছে।

ব্রজভূমির কৃষ্ণকাব্যের কবিদের উপর বিদ্যাপতির প্রভাব নিশ্চয়ই খানিকটা পড়েছে। কিন্তু সংস্কৃতে রচিত হলেও জয়দেবের গীতগোবিন্দের প্রভাব এঁদের উপর অপেক্ষাকৃত বেশি লক্ষ্য করা যায়। জয়দেবের 'মেঘৈমেদুরমম্বরম্...'[৬৫] ইত্যাদি পদের প্রভাব অষ্টছাপের বিশিষ্ট কবি সূরদাসের নিম্নলিখিত রচনায় স্পষ্টই ধরা পড়ে :

গগন ঘহরাই জুরী ঘটা কারী।
পবন-ঝকঝোর, চপলা চমক চহুঁওর,
সুবন-তনচিতৈ নন্দ ডরত ভারী।
কহ্যো বৃষভানু কী কুঁবরি সোঁ বোলি কৈ,
রাধিকা কাহ্ন ঘর লিএ জা রী॥
দোউ ঘর জহু সংগ গগন ভয়োঁ স্যাম রংগ,
কুবর-কর গহ্যো বৃষভানু-বারী॥[৬৬]

হিন্দী কৃষ্ণকাব্যের কবিদের বৈষ্ণব সম্প্রদায় ও উপ-সম্প্রদায় হিসাবে শ্রেণীবন্ধ করা চলে। কারণ, তাঁরা প্রত্যেকেই নিজস্ব সম্প্রদায়ের সাধন পদ্ধতি এবং মতবাদের পরিপ্রেক্ষিতে কাব্য রচনা করেছেন। সম্প্রদায় বহির্ভূত কবির সংখ্যা অল্প। বাঙালী পদকর্তাদের এভাবে চিহ্নিত করা যায় না। বৈষ্ণব হিসাবেই তাঁদের প্রধান পরিচিতি।

কৃষ্ণকাব্যে বল্লভ সম্প্রদায়ের দান সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। সম্প্রদায়ের গুরু বল্লভাচার্য বালগোপালের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে পূজার প্রবর্তন করেন। তিনি নিজে হিন্দীতে কিছু না লিখলেও প্রথম সারির কয়েকজন হিন্দী কবি তাঁর মতবাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে কাব্য রচনার প্রেরণা লাভ করেছেন। বল্লভাচার্যের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বিট্ঠলনাথ (১৫১৫-১৫৮৫) গুরুপদে অধিষ্ঠিত হন। বিট্ঠলনাথ নিজে কবি ছিলেন। পিতার চার জন এবং তাঁর নিজের চার জন কবিশিষ্য নিয়ে আট জন কবির অষ্টছাপ কবিগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আট জন কবির কৃষ্ণকাব্য আদর্শস্থানীয়। সেইজন্য অষ্টছাপ (ছাপ = সীল, মোহর) নামটি ব্যবহার করা হয়েছে।

বল্লভাচার্যের চার জন কবিশিষ্য হলেন সুরদাস, কৃষ্ণদাস, পরমানন্দদাস এবং কুম্ভনদাস। বিট্ঠলনাথের শিষ্যদের নাম— নন্দদাস, চতুর্ভুজদাস, ছীতস্বামী এবং গোবিন্দস্বামী। এঁরা প্রায় সকলেই ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ থেকে সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। এই কবিরা পশ্চিমা হিন্দী বা মথুরা-বৃন্দাবন অঞ্চলের ভাষাকে সাহিত্যিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ঐ অঞ্চলের নাম অনুযায়ী এই ভাষার নাম হল ব্রজভাষা। কৃষ্ণকাব্যের প্রায় সকল কবিই ব্রজভাষা ব্যবহার করেছেন। ব্রজভাষা যে অষ্টছাপের কবিদের পূর্বে কেউ ব্যবহার করেননি তা নয়; কিন্তু তার সমৃদ্ধির কৃতিত্ব সুরদাস প্রমুখ কবিদেরই প্রাপ্য। তুলসীদাস এবং অধিকাংশ রামকাব্যের কবিরা সমৃদ্ধ করেছেন পূর্বী হিন্দীকে।

বল্লভাচার্য বালগোপালের ভক্ত হওয়ায় অষ্টছাপের কবিরা বাৎসল্য রসের অনেক পদ রচনা করেছেন। সুরদাসের বাৎসল্যরসের রচনাগুলি উৎকর্ষের দিক থেকে শ্রেষ্ঠ। ভারতীয় আর কোনো সাহিত্যে বাৎসল্যের এমন মধুর অনুভূতির স্পন্দন উপলব্ধি করা যায় না। অষ্টছাপের কবিরা বাৎসল্য ব্যতীত রাধা-কৃষ্ণের লীলা নিয়ে অনেক মধুর রসের পদও রচনা করেছেন। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব কবিদের মতো বল্লভী সম্প্রদায় রাধাপ্রেমকে পরকীয়া হিসেবে দেখেননি, গ্রহণ করেছেন স্বকীয়ারূপে।

চৈতন্যদেব বৃন্দাবনের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য তাঁর কয়েকজন বিশিষ্ট

ভক্তকে বৃন্দাবন পাঠিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে রূপ, সনাতন, জীব, বলদেব গোস্বামী প্রভৃতি অন্যতম। ব্রজভূমিতে গৌড়ীয় সম্প্রদায় এঁরাই প্রতিষ্ঠা করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের বৈশিষ্ট্যগুলি এই সম্প্রদায়ের হিন্দীভাষী ভক্তরা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতেন। এই সম্প্রদায়ের কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গদাধর ভট্ট, সুরদাস মদনমোহন এবং মাধুরীজী। গদাধর ভট্ট মোহিনীবাণীর রচয়িতা। এঁর রচনায় শব্দালংকার ও অর্থালংকারের আধিক্য দেখা যায়। 'মোহিনীবাণীর' যে সংস্করণ এখন পাওয়া যায় তাতে পদগুলি সাজানো হয়েছে এইভাবে: জন্মলীলা, নামমাহাত্ম্য; যমুনা, বংশী, স্মরণ বন্দনা; অনুরাগ; রূপমাধুরী; শ্রীরাধাবদন শোভা; মান; দান; রাস; বিবাহ; ভোজন; বসন্ত; শ্রীরাধাগোবিন্দের হোরী; বর্ষা; ঝুলন ইত্যাদি। চৈতন্যদেবের হোলিলীলার উপরও পদ আছে। জীব গোস্বামী গদাধর ভট্টের পদাবলীর অনুরাগী ছিলেন।

সনাতন গোস্বামীর শিষ্য সুরদাস মদনমোহন (প্রকৃত নাম সুরধ্বজ) আকবরের রাজত্বকালে আমিন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু রাজকার্য অপেক্ষা কৃষ্ণের ভজনা এবং পদরচনাতেই ছিল তাঁর অধিকতর আগ্রহ। তাঁর পদাবলীর সংখ্যা বেশি নয়। কিন্তু কৃষ্ণানুভূতির তন্ময়তা পাঠকের চিত্ত স্পর্শ করে। জন্মলীলা, প্রভাতী, মুরলী, অনুরাগ, রাস, খণ্ডিতা, বসন্ত, ফুলদোল প্রভৃতি লীলাপ্রসঙ্গে তিনি পদাবলী রচনা করেছেন।

রূপ গোস্বামীর শিষ্য মাধুরীজী মথুরার নিকটবর্তী এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পদাবলী ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত: (১) বংশীবটবিলাস, (২) উৎকণ্ঠা, (৩) কেলি (৪) বৃন্দাবনবিহার, (৫) দান, (৬) মান। এঁর রচনার বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রত্যেক শ্রেণীর পদাবলীর প্রথমেই শ্রীগৌরাঙ্গের বন্দনা করা হয়েছে।[৬৭] যেমন 'উৎকণ্ঠা'র প্রথমেই আছে:

> শ্রীচেতন্য স্বরূপকো মন বচ করোঁ প্রণাম।
> সদা সনাতন পাইয়ে শ্রীবৃন্দাবন ধাম॥
> গৌরনাম ঔব গৌরতনু অন্তর কৃষ্ণস্বরূপ।
> গৌর সাঁবরে দুহুন কো প্রগট একহি রূপ॥
> তিনকে চরণ প্রণামতে, সব সুলভ জগ হোঈ।
> গৌর সাঁবরে পাঈ য়হ, আপ অপনো খোঈ॥

হিন্দী ও বাংলা কৃষ্ণকাব্যের কবিদের মধ্যে এই সম্প্রদায়ের কবিরা সেতুবন্ধনের কাজ করেছেন।

নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কবি শ্রীভট্ট। গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মতো নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের ভক্তরাও মধুর রসকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি রাধিকার উপাসনা এঁদের ধর্মানুষ্ঠানের অন্যতম অঙ্গ।

শ্রীভট্ট ১৫০০ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পদাবলী সহজ চলিত ভাষায় লেখা। তাঁর যুগলশতক নামক একশত পদের সংকলনটি ভক্ত পাঠকদের নিকট

বিশেষরূপে সমাদৃত। এই সম্প্রদায়ের সমকালীন আর-একজন কবি পরশুরাম।

রাধাবল্লভী সম্প্রদায়ের প্রবর্তক স্বামী হিতহরিবংশজী। এই সম্প্রদায় রাধা-কৃষ্ণের যুগল উপাসনা করলেও রাধার আরাধনাই প্রাধান্য লাভ করেছে। কুঞ্জলীলা এবং শৃঙ্গারকেলিতে রাধাকে কেন্দ্রচরিত্র হিসাবে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হিতহরিবংশ মথুরা অঞ্চলে আনুমানিক ১৫০২ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। কিংবদন্তী এই যে, রাধা তাঁকে স্বপ্নে দীক্ষা দেন এবং তারপর থেকে রাধাবাদ প্রচারের জন্য এই নতুন সম্প্রদায় স্থাপিত করেন। তিনি শুধু সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা গুরু নন, ভক্ত কবি হিসাবেও সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁর রাধা-সুধানিধি ১৭০টি শ্লোকের সংকলন। হিতহরিবংশের ব্রজভাষায় রচিত পদগুলি সরস ও হৃদয়গ্রাহী; এগুলি হিতচোরাসী নামে প্রসিদ্ধ।

হরীরাম ব্যাস রাধাবল্লভী সম্প্রদায়ের একজন জনপ্রিয় পদকর্তা। তিনি মূলত শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা এবং শৃঙ্গারলীলার কবি। বিশুদ্ধ ভগবদ্‌প্রেমের ভজনা তাঁর পদাবলীতে আবেগাপ্লুত ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে।

এই সম্প্রদায়ের আর-একজন কবি বৃন্দাবনবাসী ধ্রুবদাস। এঁর রচনা বহুল প্রচারিত। ছন্দের বৈচিত্র্য এঁর রচনার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ছোটোবড়ো সব মিলিয়ে তিনি প্রায় চল্লিশটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এদের মধ্যে রসহীরাবলী, ব্রজলীলা, দানলীলা, অনুরাগলতা প্রভৃতি কৃষ্ণভক্তের নিকট সমাদৃত।

হরিদাসী সম্প্রদায়ের প্রবর্তক আসধীরজী। কিন্তু এই সম্প্রদায়ের মতবাদকে নবরূপ দেন আলিগড়ের নিকটবর্তী হরিদাসপুর নিবাসী স্বামী হরিদাস। তিনি অষ্টছাপ কবিদের সমসাময়িক। এই সম্প্রদায়ের বিধি অনুযায়ী রাধাকৃষ্ণের যুগল উপাসনা সখীভাবে ভাবিত হয়ে করতে হয়। বিট্‌ঠলবিপুল এবং বিহারিনদাস তাঁদের কাব্যে সম্প্রদায়ের বিধি ও বিশ্বাসকে সুন্দরভাবে রূপায়িত করেছেন।

এইসব সম্প্রদায়ের বাইরে যারা কৃষ্ণকাব্য রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মীরাবাঈ। কৃষ্ণকাব্যের সার্থক কবিদের মধ্যেও তাঁর স্থান প্রথম শ্রেণীতে। তিনি যোধপুরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন; উদয়পুরের মহারাণা কুমার ভোজরাজের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। আনুমানিক ১৫০০-১৫৫০ খ্রীস্টাব্দে তিনি জীবিত ছিলেন। অল্প বয়স থেকেই তিনি ছিলেন কৃষ্ণের একনিষ্ঠ ভক্ত। বিবাহের কিছুকাল পরে স্বামীর মৃত্যু হলে তাঁর কৃষ্ণপ্রেমের উন্মাদনা আরও বৃদ্ধি পেল। শ্বশুরকুল এই ভগবদ্‌প্রেমের ব্যাকুলতা সুনজরে না দেখায় তিনি চলে আসেন বৃন্দাবনে। সেখানে তখন বল্লভ সম্প্রদায়ের খুব প্রভাব। কিন্তু মীরা সেদিকে আকৃষ্ট হননি। রবিদাস তাঁর শ্রদ্ধা পেয়েছিলেন। বৃন্দাবনে জীবগোস্বামীর সঙ্গে আলোচনার পর চৈতন্যদেবের প্রতি যে মীরার ভক্তি জাগ্রত হয় তা তাঁর রচনা থেকেই পাই :

'স্যামকিসোর ভএ নবগোরা চৈতন্য জাকো নাঁব'...।"[৬৮]

মীরার শেষ জীবন অতিবাহিত হয় দ্বারকায়। তাঁর জীবনের তিন পর্বের ভৌগোলিক পরিবেশ তাঁর রচনার উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। রাজস্থান পর্বে

রাজস্থানী মিশ্রিত ব্রজভাষায় লিখেছেন; বৃন্দাবন পর্বে বিশুদ্ধ ব্রজভাষা ব্যবহার করেছেন, এর পর দ্বারকাপর্বে লিখেছেন গুজরাটিতে।

মীরার রচনায় তিনি নিজেই রাধার ভূমিকা নিয়েছেন। গিরিধর গোপালই তাঁর সকল রচনার বিষয়। শ্রীকৃষ্ণ পতি, তিনি নতুন রাধা। একান্তরূপে আত্মনিবেদনের সুর ধ্বনিত হয় প্রায় প্রত্যেকটি পদে। একটিতে তিনি বলেছেন : হে আমার মোহন প্রিয়তম, তোমার মুখ দেখবার পর থেকে এই সংসার লবণাক্ত (বিস্বাদ) হয়ে গিয়েছে। আমি এখন সংসার থেকে দূরে দূরেই থাকি। সংসারে সুখের আশা মরীচিকার মতোই অলীক। তাই সাংসারিক সুখের আশা ত্যাগ করেছি। তা ছাড়া, প্রিয়তম, সংসারে সুখ তো ক্ষণস্থায়ী। বিয়ের পর বিধবা হবার জ্বালা সইতে হয়। সুতরাং মানুষের ঘরে বউ হয়ে লাভ কি? বিয়ে করতে হলে পরম প্রিয়তমকে বরণ করাই ভালো; তা হলে বিধবা হবার ভয় থাকবে না। তেমন ভাগ্যবতী হবার আশা হৃদয়ে জেগেছে।

মীরা মধুর রসের সাধিকা। তিনি স্বরচিত পদাবলী গান করতে করতে আত্মহারা হয়ে যেতেন। তাঁর রচনা এখনও প্রধানতঃ ভজন হিসাবেই সমাদৃত। কাব্যগুণ অপেক্ষা কৃষ্ণভক্তির অনন্য আন্তরিকতা মীরার পদাবলীর বড়ো সম্পদ।

হিন্দী সাহিত্যের আদিযুগে কৃষ্ণকাব্যের কবিরা বিভিন্ন দিকে যুগান্তর এনেছিলেন। তাঁরা গড়ে তুলেছিলেন সাহিত্যের বাহন হবার উপযোগী একটি ভাষা, যার প্রভাব অতিক্রম করেছিল হিন্দীভাষী অঞ্চলের গণ্ডী। কৃষ্ণকাব্যের কবিরা হিন্দী কাব্যকে দিয়েছিলেন নবরূপ। ছন্দ, অলংকার, উপমা এবং শব্দসম্পদে সমৃদ্ধ হয়েছিল হিন্দী কবিতা। হিন্দী গীতিকবিতাব ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল কৃষ্ণকাব্যের মধ্যে।

বাংলা পদাবলী সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা করলে হিন্দী কৃষ্ণকাব্যের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। অধিকাংশ হিন্দী কবিই শুধু কৃষ্ণভক্ত নন; তাঁরা প্রথমে কোনো সম্প্রদায়ের বা উপসম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত। সুতরাং গোষ্ঠীগত সংকীর্ণ দৃষ্টি-ভঙ্গির মধ্য দিয়ে কৃষ্ণের প্রতি তাঁদের ভক্তির প্রকাশ হয়েছে অনেক ক্ষেত্রেই। বাঙালী পদকর্তারা প্রধানতঃ ছিলেন ভক্তবৈষ্ণব, উপসম্প্রদায়ের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পরিসরে নিজেদের সাধারণত গণ্ডীবদ্ধ করেননি। চৈতন্যদেবের প্রবল ব্যক্তিত্ব ক্ষুদ্র গোষ্ঠী গড়বার পথে ছিল অন্তরায়।

চৈতন্যদেবের কৃষ্ণপ্রেমের উন্মত্ততা দেখে রাধার উন্মত্ততা বাঙালী বৈষ্ণব কবিরা যেরূপ উপলব্ধি করতে পেরেছেন, হিন্দী কবিরা তেমন সুযোগ পাননি। ফলে বাংলা বৈষ্ণব পদাবলীতে শুধু যে মধুর রসের প্রাধান্য তাই নয়, কাব্যগুণেরও অনেক বেশি উজ্জ্বলতা লক্ষণীয়। ঠিক তেমনি হিন্দী কবিদের উপর সর্বাধিক প্রভাব পড়েছে বল্লভাচার্য ও তাঁর পুত্র বিট্‌ঠলনাথের। বল্লভাচার্য বালগোপালের উপাসনার প্রবর্তন করেছিলেন, সুতরাং বল্লভী এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের হিন্দী কবিরা বাৎসল্যরসের উৎকৃষ্ট পদ রচনা করেছেন। বিশেষ করে এদিক থেকে সুরদাসের তুলনা নেই। বাংলা পদাবলীতে এমন সুন্দর বাৎসল্যের চিত্র খুব বেশি পাওয়া যায় না।

পদাবলীর পরিমাণ, পদকর্তার সংখ্যা এবং পদাবলীর জনপ্রিয়তা বাংলাদেশে যত

বেশি অন্যত্র তেমন দেখা যায় না। মুদ্রণ-পূর্ব যুগ থেকেই বাংলা বৈষ্ণব পদাবলীর অসংখ্য সংকলন পাওয়া যায়। হিন্দী কৃষ্ণকাব্যের তেমন সংকলনের সংখ্যা নগণ্য। পদগুলি বিভিন্ন পালা অনুসারে সাজিয়ে কীর্তন করাও বাংলার বৈশিষ্ট্য। চৈতন্যদেব শুধু যে কীর্তন শুনতে ভালোবাসতেন তাই নয়, কীর্তনকে তিনি দৈনন্দিন জীবনচর্যার অংগ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।

হিন্দী কৃষ্ণকাব্যের পূর্ণতর বিকাশ এবং অধিকতর জনপ্রিয়তা কেন সম্ভব হয়নি সে বিষয়ে দুটি প্রধান কারণ নির্দেশ করা যেতে পারে। প্রথমত, চৈতন্যের তিরোধানের পর কৃষ্ণের বামে রাধার মূর্তি পরিকল্পনা করে রাধা-কৃষ্ণের যুগল মূর্তির পূজা আরম্ভ করলেন গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা। রাধাকে কৃষ্ণের সমান মর্যাদা দেওয়ায় অন্যান্য বৈষ্ণব সম্প্রদায় ক্ষুব্ধ হলেন। বিশেষ করে বল্লভী সম্প্রদায়ের সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের মনান্তর ঘটল।[৬৯] হিন্দী ভক্ত কবিরা তাই রাধাকে প্রাধান্য দিয়ে মধুর রসের পদ রচনায় উৎসাহ বোধ করেননি। বল্লভী সম্প্রদায়ের বিরূপতা নিশ্চয়ই তাঁদের মানসিকতার উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। কারণ বল্লভাচার্য এবং তাঁর শিষ্যদের মতামতের মূল্য হিন্দীভাষী বৈষ্ণবদের উপর ছিল খুব বেশি।

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন, রাধাকে কৃষ্ণের সমান মর্যাদা দিয়ে তাঁদের নিয়ে নিরন্তর লীলাবিস্তার বাংলা বৈষ্ণব কাব্যের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু হিন্দী বৈষ্ণব কবিরা মুখ্যতঃ ভাগবত-বর্ণিত কৃষ্ণলীলাকে অবলম্বন করে পদ রচনা করেছেন।[৭০] সুপরিচিত পৌরাণিক কাহিনীর গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকবার ফলে হিন্দী কৃষ্ণকাব্যে বৈচিত্র্যের অভাব ঘটেছে এবং জনচিত্তে এর আবেদন গভীর হতে পারেনি।

কিন্তু এর চেয়ে বড়ো কারণ বিষ্ণু বা নারায়ণের আর-এক অবতার রামের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। অবধীতে রচিত তুলসীদাসের রামচরিতমানস সম্পূর্ণ হয় ১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দে। তুলসীদাসের রচনার গুণে এই অতুলনীয় মহাকাব্য হিন্দীভাষীদের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। কৃষ্ণের বাল্যলীলা ও যৌবনলীলা বৈষ্ণব কবিদের বিষয়বস্তু। সমগ্র জীবনকে, স্ত্রী-পুত্র পরিবৃত সংসারী জীবনকে, আমরা খণ্ডিত কৃষ্ণকাহিনীতে পাই না। রামের জীবনকথায় এই অপূর্ণতা নেই। তা ছাড়া কৃষ্ণ যে দেবতা একথা আমাদের পক্ষে ভুলে থাকা কঠিন। কিন্তু রাম আমাদের পরিচিত চরিত্র। দেবতা অপেক্ষা নরোত্তম হিসাবে তাঁকে গ্রহণ করা সহজ। এই সব কারণে তুলসীদাসের রামায়ণ ভক্ত, কাব্যরসপিপাসু পাঠক এবং গল্পের শ্রোতা সকলেরই মনোরঞ্জন করতে সক্ষম হয়েছিল।

কৃত্তিবাস বাংলা সাহিত্যের আসরে রামকে এনেছিলেন। কিন্তু কবির কল্পনাজাত রাম বেশ কিছুটা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন চৈতন্যদেবের লোকোত্তর ব্যক্তিত্বের প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে।

পূর্বে বলা হয়েছে যে সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষায় রচিত প্রকীর্ণ কবিতা থেকে বৈষ্ণব কবিরা পদাবলী রচনায় যথেষ্ট প্রেরণা লাভ করেছেন। এই প্রেরণা এসেছে দু'রকমে। রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক কিছু সংখ্যক কবিতা ছিল প্রেরণার প্রত্যক্ষ উৎস। কিন্তু নিছক মানবিক প্রেমের প্রকীর্ণ কবিতাও রাধাকৃষ্ণের প্রেমবৈচিত্র্য রূপায়িত করতে বৈষ্ণব কবিদের বিশেষরূপে সহায়তা করেছে। 'কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্বোত্তম নরলীলা'[১১]। এবং ভগবানের প্রেমের লীলা মানবরূপেই প্রকট হয়। সুতরাং ঈশ্বরের প্রতি ভক্তের গভীর আনন্দময় আকর্ষণ উপলব্ধি করা যেতে পারে একমাত্র পৃথিবীর মানব-মানবীর প্রেমানুভূতির মধ্য দিয়ে।

প্রকীর্ণ কবিতার এই প্রভাব ব্যতীত পদাবলী সাহিত্যে লক্ষ্য করা যায় লোক-প্রচলিত রাধাকৃষ্ণলীলা কাহিনীর গভীর প্রভাব। সে প্রভাব এমনই সর্বব্যাপী ছিল যে শিক্ষিত সংস্কৃতজ্ঞ বৈষ্ণব পদকর্তারাও তা এড়াতে পারেননি। বস্তুতঃপক্ষে পদাবলীর প্রথম পর্বে প্রকীর্ণ সংস্কৃত প্রাকৃত কবিতা অপেক্ষা লৌকিক কৃষ্ণকাহিনীর সাহিত্যরূপ ও শিল্পরূপ গভীরতর প্রভাব বিস্তার করেছিল। সাহিত্য ও শিল্পরূপ বলতে কি বুঝি তার একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। রাধা-কৃষ্ণের লীলাকাহিনী অবলম্বনে গ্রাম্যকবি রচিত এবং মুখে মুখে প্রচলিত কৃষ্ণমঙ্গল পাঁচালী ছিল মুখ্য সাহিত্যরূপ। লিখিত কাব্যরচনার প্রচলন তখনও সাধারণ লোকসমাজে ছিল না। আর পাঁচালীর কাহিনীকে ঈষৎ নাট্যরূপ দিয়ে যখন নৃত্য-গীত সহযোগে অভিনয় করা হত তখন তাই হয়ে উঠত কৃষ্ণকাহিনীর শিল্পরূপ। এটা যাত্রার একেবারে গোড়ার কথা।

দেশের জনসাধারণ, যারা সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ, যারা শাস্ত্র পাঠ করতে অক্ষম তারাও কিন্তু কৃষ্ণকাহিনীর সঙ্গে বিশেষরূপে পরিচিত ছিল। বেদ-উপনিষদে-পুরাণে বর্ণিত বিষ্ণু-কৃষ্ণের কাহিনী তারা শুনেছে কথক ঠাকুর ও গ্রামের পুরোহিত ঠাকুরের মুখে। কৃষ্ণের কংসবধ, গোবর্ধন ধারণ, কালীয়দমন, রুক্মিণীহরণ প্রভৃতি ঘটনার মধ্যে কল্পনা উদ্দীপ্ত করবার মতো যথেষ্ট নাটকীয়তা আছে, আবার গোষ্ঠে গোরু চরানো, গোপিনীদের বস্ত্রহরণ এবং তাদের সঙ্গে প্রেমের লীলা ইত্যাদির জন্য কৃষ্ণকে বড়ো কাছের মানুষ বলে মনে হত। তাই পল্লীকবি তাঁকে নিয়ে পালা রচনা করেছেন, গান লিখেছেন। নাটকীয় গুণসম্পন্ন এই পালাগুলিকে নৃত্য ও সংগীত সহযোগে অভিনয় করা হত লোকরঞ্জনের জন্য। আর পটুয়ারা আঁকতেন পট, ছড়া বাঁধতেন, তারপর বাড়ি বাড়ি ছড়া পড়ে কৃষ্ণলীলার পট দেখাতেন। কবি, নাট্যকার ও পটুয়া বেদ-পুরাণের কৃষ্ণকাহিনীকে সর্বত্র যথাযথরূপে গ্রহণ করেননি। শাস্ত্রীয় কৃষ্ণকাহিনীর সঙ্গে যোগ করেছেন নিজেদের কল্পনার ফসল।

এই পালা-গানের কৃষ্ণকাহিনীই হয়ত একদিন নাগরিক রঙ্গমঞ্চে স্থান পেয়েছিল। কীথের বিশ্বাস, কৃষ্ণকাহিনী দিয়েই ভারতে নাটকের সূত্রপাত হয়েছিল। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে[১২] কৃষ্ণকর্তৃক কংসবধের ঘটনা অবলম্বনে যে অভিনয়ের কথা আছে তা-ই হল

এঁর মতে ভারতে নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে প্রাচীনতম উল্লেখ। কীথ তাঁর সংস্কৃত নাটকের ইতিহাসে এই মতবাদ সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেছেন।[৭৩]

উইন্টারনিটস্, ভেবর প্রমুখ পণ্ডিতরা অবশ্য এ সম্বন্ধে ভিন্ন মত পোষণ করেন। কৃষ্ণমচারিয়ার তাঁর সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে বিভিন্ন পণ্ডিতের মতামত নিয়ে আলোচনা করেছেন।[৭৪]

পতঞ্জলির মহাভাষ্যের আনুমানিক রচনাকাল খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক। প্রশ্ন উঠতে পারে কৃষ্ণলীলার সেই উল্লেখের পর কি এ ধরনের অভিনয় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল? ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে মথুরায় একটি শিলালেখ আবিষ্কৃত হওয়ায় প্রমাণ হয় এই অভিনয়ের ধারা অব্যাহত ছিল। জর্জ বুয়েলার এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকায় (১৮৯২) প্রমাণ করেছেন যে, এই শিলালিপি উৎকীর্ণ হয়েছিল প্রথম বা দ্বিতীয় খ্রীস্টাব্দে। এই লিপি থেকে জানা যায় যে, মথুরায় ঐ সময় কৃষ্ণলীলার এমন সব অভিনেতা অভিনেত্রী ছিল যারা অভিনয়কেই জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেছিল। অভিনয়কলা দীর্ঘকাল যাবৎ জনপ্রিয় না থাকলে তাকে অবলম্বন করে জীবিকার্জন সম্ভব হত না।

এই লীলাভিনয়ের ভাষা কি সংস্কৃত ছিল? সংস্কৃতে যে কৃষ্ণলীলার অভিনয় একেবারেই হত না, একথা বলা যায় না। কারণ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভাগবত-পুরাণে বলেছেন[৭৫] যারা আমার প্রতি শ্রদ্ধাশীল তারা আমার জন্মবৃত্তান্ত এবং অন্যান্য লীলার অভিনয় করবে। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতরা যদি এই ধরনের অভিনয় প্রায়ই করতেন তা হলে নিশ্চয়ই লীলানাট্যের লিখিতরূপ কিছু কিছু আমরা পেতাম। কিন্তু কৃষ্ণ-বিষয়ক প্রাচীনতম সংস্কৃত নাটকের নিদর্শন ভাসের 'বালচরিত'। এর পরে এই বিষয় নিয়ে রচিত আরও কয়েকটি সংস্কৃত নাটকের সন্ধান পাওয়া যায়। তা থেকে অনুমান করা যেতে পারে কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক নাটক শিক্ষিত সমাজে বিশেষ সমাদৃত হয়নি। পতঞ্জলিতে যে কৃষ্ণলীলাভিনয়ের কথা আছে তার ভাষা হয়ত সংস্কৃত ছিল না। কারণ সংস্কৃত নাটকের ইতিহাসে কৃষ্ণকাহিনীর ঐতিহ্য অনুপস্থিত। অপর দিকে হরিবংশ পুরাণের প্রমাণ থেকে আমরা জানতে পারি যে জনসাধারণের ভাষায় কৃষ্ণলীলার অভিনয় হত। মনে হয়, দেশের সর্বত্র, বিশেষ করে উত্তর ভারতের গ্রামাঞ্চলে, স্থানীয় ভাষায় ব্যাপকভাবে কৃষ্ণলীলার অভিনয় হত। মথুরায় একদল কৃষ্ণযাত্রার নট-নটীদের অভিনয়ের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, অভিনয়ের ভাষা ছিল 'তদ্দেশ ভাষা'[৭৬] অর্থাৎ মথুরা অঞ্চলের, যেখান থেকে নট-নটীরা এসেছে সেখানকার ভাষা। সংস্কৃত সর্বভারতীয় ভাষা, তাকে শুধু মথুরার ভাষা বলা যায় না।[৭৭]

কৃষ্ণযাত্রার ধারা যে সুপ্রাচীন কাল থেকে মথুরা অঞ্চলে চলে আসছিল তার বাহন যে স্থানীয় ভাষা ছিল, তা নানাভাবে প্রমাণ করেছেন ডঃ নরভিন হেইন তাঁর 'দি মিরাকল প্লেজ অব মথুরা' নামক গ্রন্থে।

জনচিত্তে কৃষ্ণের আসন যে পদাবলী-সাহিত্য রচনার পূর্বেই সুদৃঢ় হয়েছিল, ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তও তা মনে করেন। তিনি অবশ্য কৃষ্ণযাত্রা অভিনয় সম্পর্কে

স্পষ্ট করে কিছু বলেননি। তিনি বলেছেন: 'মনে হয়, ব্রজের রাখাল কৃষ্ণের গোপীগণের সহিত যে প্রেমলীলা তা প্রথমে আভীর জাতির মধ্যে কতকগুলি রাখালিয়া গানরূপে ছড়াইয়া ছিল। চপল আভীরবধূগণ এবং কৃষ্ণের প্রেমলীলার গান দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়াইয়াছিল। প্রতিভাবান কবিরা এই লৌকিক গানগুলির সঙ্গে নানা কল্পনা মিশ্রিত করিয়া বৃন্দাবনলীলার কৃষ্ণকে পুরাণে স্থান দেয়।[৭৮]

মথুরায় কৃষ্ণযাত্রার প্রচলন আজ পর্যন্ত অব্যাহত আছে। রাসলীলার অভিনয় এখনও প্রধান আকর্ষণ। এই রাসলীলার অভিনয় কে প্রবর্তন করেছিলেন তা নিয়ে মতভেদ আছে। নারায়ণ ভট্ট এর প্রবর্তক বলে গৌড়ীয় সম্প্রদায় দাবী করেন। নারায়ণের জন্ম মাদুরায়, ১৫৩১ খ্রীস্টাব্দে। মথুরা এসে তিনি গৌড়ীয় সম্প্রদায়ভুক্ত এক গুরুর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে যে, রাসলীলা অভিনয় প্রবর্তনের পশ্চাতে বাংলাদেশে তৎকালে প্রচলিত কৃষ্ণযাত্রার ঐতিহ্য প্রভাব বিস্তার করেছে। অবশ্য অন্য কয়েকজন লেখক দাবী করেন যে, নিম্বার্ক সম্প্রদায়ভুক্ত কোনো এক সাধু রাসলীলাভিনয় প্রবর্তন করেছিলেন ষোড়শ শতকে।

মথুরা অঞ্চলের কৃষ্ণলীলাভিনয়ের উপর বাংলার কৃষ্ণযাত্রার প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে পড়েছে। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সাজসজ্জায় এবং অভিনয় প্রাঙ্গণের আয়োজন সম্পর্কিত অনেক বিষয়ে বাংলাদেশের রীতিনীতির সঙ্গে মিল রয়েছে। প্রাচীনকালে মথুরার কৃষ্ণযাত্রায় রাধা ও তাঁর সখীদের ভূমিকায় অভিনেত্রীরাই অভিনয় করত। কিন্তু বৃন্দাবনে গৌড়ীয় প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে বালকদের দিয়েই দেবদেবীর ভূমিকা অভিনীত হতে লাগল। বালক অভিনেতাদের সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন আবুল ফজল তাঁর 'আইন-ই-আকবরী'-তে: 'The Kirtaniyas are Brahamans, whose instruments are such as were in use among the ancients. They dress up smooth-faced boys as women and make them perform. singing the praises of Krishna and reciting his acts.'[৭৯]

বাংলার কৃষ্ণলীলায় যে বালকদের দিয়ে অভিনয় করানো হত দীনেশচন্দ্র সেন তার উল্লেখ করেছেন।[৮০]

এখানে আমরা পাই কৃষ্ণগীতি ও অভিনয়ের কথা। কীর্তন ও বালকদের দিয়ে অভিনয় করানোর রীতি বাংলা দেশ থেকে ব্রজভূমি পেয়েছে। আমরা এখনো কৃষ্ণলীলায় বালকদের রাধার ভূমিকায় দেখতে পাই।

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে অনুষ্ঠিত ব্রজভূমির লীলাভিনয়ে বঙ্গদেশীয় রীতি-পদ্ধতির প্রভাব যে দেখা যায় তা পূর্বেই বলা হয়েছে। বাংলার লোকসমাজে অনেক আগে থাকতেই রাধাকৃষ্ণের কাহিনী নানারূপে প্রচলিত না থাকলে অন্যত্র প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব হত না।

ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে এর একটি প্রমাণ উল্লেখ করেছেন ডঃ নীহাররঞ্জন রায়। তিনি বলেছেন: 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে রাধা-কৃষ্ণ কাহিনীর কয়েকটি নাম যে বিবর্তিত রূপে আমাদের গোচর তাহাদের ভাষাতত্ত্বগত ইঙ্গিত খুব সুস্পষ্ট বলিয়াই

মনে হয়। কৃষ্ণ-কাহ্ন-কানু বা কানাই, রাধিকা-রাহী-রাই…প্রভৃতি নামের বিবর্তনের মধ্যে বোধ হয় এ তথ্য লুক্কায়িত যে কৃষ্ণ-রাধিকার কোনো কাহিনী কোনো না কোনো সাহিত্যরূপ আশ্রয় করিয়া কামরূপে ও বাংলাদেশে প্রসার লাভ করিয়াছিল তুর্কী-বিজয়ের বহু আগেই।'[৮১] সংস্কৃত নামের বিশুদ্ধ রূপ লোকমুখে ব্যবহৃত হতে হতে বিকৃত হয়েছে। কৃষ্ণ থেকে কানু বা কানাই, রাধা থেকে রাই। ডঃ রায় যে সাহিত্য-রূপের কথা বলেছেন তা লোকসাহিত্য হওয়াই সম্ভব। সংস্কৃত রচনায় বিধৃত থাকলে নামের এই বিকৃতি ঘটত না। তা ছাড়া শুধু কামরূপ পর্যন্ত নয়, আবুল ফজলের বিবরণ থেকে অনুমান করা যেতে পারে এই সাহিত্য এবং এই সাহিত্যভিত্তিক নাটক পশ্চিমে মথুরা-বৃন্দাবন পর্যন্ত প্রচলিত ছিল।

মানসোল্লাসে (১১২৯ খ্রীস্টাব্দে সংকলিত) কয়েকটি বাংলা গান স্থান পেয়েছে। এই গানগুলি বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শনের অন্যতম। এদের বিষয়বস্তুর মধ্যে আছে রাধা-কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা এবং কৃষ্ণের অবতার বর্ণনা।

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অভিমত সমর্থন করে ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন : 'গীতগোবিন্দের ভাষা, শব্দ ও ব্যাকরণের দিক হইতে সংস্কৃত সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার ছন্দ, রীতি ও ভঙ্গী, ইহার অনুভব, ইহার প্রাণবায়ু সমস্তই যেন লোকায়ত স্থানীয় ভাষার, সে ভাষা প্রাচীনতম বাংলাই হোক বা বাংলাদেশে প্রচলিত শৌরসেনী অপভ্রংশেই হোক্।'[৮২] এই থেকে কেউ কেউ অনুমান করেন যে গীতগোবিন্দ প্রথম রূপ পেয়েছিল লোককবিদের মুখে, পরে জয়দেব তাকে সংস্কৃত পোশাক পরিয়ে সাহিত্যের দরবারে উপস্থিত করেন।

গ্রামের চাষী এবং সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোকেদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচনার অনেক পূর্ব থেকেই রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকাহিনী পালাগান হিসাবে প্রচলিত ছিল। এই গানকে বলা হত কৃষ্ণ ধামালী।

কৃষ্ণ ধামালী কিভাবে পদাবলী সাহিত্যকে প্রভাবান্বিত করেছে তার সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন দীনেশচন্দ্র সেন :

'কৃষ্ণ ধামালীতে কৃষ্ণ চাষার ঘরের ছেলে, রাধা চাষার ঘরের মেয়ে। রাধার দইয়ের ভাঁড় বহিবার বাঁক তৈরি করিবার জন্য বাঁশ চাহিতেছেন। কখনো তাহার মোট বহিতেছেন—সমস্তই রাধার একটি চুম্বন পাইবার প্রত্যাশায়। কৃষ্ণ ধামালীর দৃশ্য অমার্জিত রুচিযুক্ত চাষার ঘরের। এই ধামালী দুই শ্রেণীর : এক শ্রেণীর নাম শুকুল, অপর শ্রেণীর নাম আসল। এই আসল এত অশ্লীল যে তাহা চাষীরা পর্যন্ত নিজের ঘরে গাহে না—স্ত্রীলোক ও শিশুদিগকে দূরে রাখিয়া তাহারা মাঠে যাইয়া গায়— তাহাতে মধ্যে মধ্যে কানে হাত দিতে হয়— চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এই কৃষ্ণ ধামালীরই সংশোধিত সংস্করণ। বৌদ্ধযুগের এই কৃষ্ণচরিত্র আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে চাষাদের দেবতা তাহাদের মাথা ডিঙাইয়া যায় নাই, তাহাদের ঠাকুরকে চাষারা নিজের দলে ভিড়াইয়া নিজস্ব করিয়া লইয়াছে। এই সকল দেবচরিত্রে কৃত্রিমতা, সাজসজ্জা বা আড়ম্বর কিছুই নাই, তাঁহাকে আপনার জন বলিয়া

ভালোবাসিয়াছে। এইভাবে দেবতাকে মনের মানুষ করিয়া লইবার ফলে আমরা উত্তরকালে বৈষ্ণবদের পঞ্চতত্ত্বের অপূর্ব দার্শনিক মহিমা দর্শন করিতে পাই গৃহস্থালীকে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য এই পঞ্চরসের গৌরবে মণ্ডিত করিয়া ইহার আদর্শ বৈষ্ণবেরা ধর্মবেদীতে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সেই উচ্চ আদর্শের ভিত গড়িয়া দিয়াছিল চাষারা।'[৮৩]

ধামালীর তুলনায় একটু উন্নত মানের কৃষ্ণের প্রণয়লীলার গান পূজাপার্বণে গাওয়া রীতিসিদ্ধ ছিল। ব্রজের প্রেমলীলা প্রথমে স্থূল প্রণয়রসের গানের বিষয়বস্তু হিসাবে প্রচলিত হয়েছিল। দেবতাকে সমীহ করে চলবার জন্য অশ্লীলতা বর্জন করবার কথা গ্রাম্য কবিদের মনে হয়নি।[৮৪] কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার হলেও প্রাক্-চৈতন্য যুগের লোক-প্রচলিত ব্রজলীলা গানের সঙ্গে ঈশ্বরভাবনার কোন সম্পর্ক ছিল না। কৃষ্ণের বাল্য ও যৌবনলীলা লোককবিদের কল্পনা এমন আচ্ছন্ন করেছিল যার জন্য বাংলায় প্রবাদ সৃষ্টি হয়েছে: 'কানু বিনা গীত নাই।' '.. বৈষ্ণব ধর্ম ও সাহিত্য অবলম্বনে রাধাকৃষ্ণের নাম বাংলার লোক-সাহিত্যের সকল স্তরেই বিস্তার লাভ করিয়াছে। বৈষ্ণব প্রভাবের পূর্ববর্তী বাংলার সকল প্রেম-সংগীতই প্রত্যক্ষভাবে অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণের মধ্যস্থতা ব্যতীতই ব্যক্ত হইত, রাধাকৃষ্ণের নাম তাহাতে থাকিত না।'[৮৫]

ধামালী জাতীয় কৃষ্ণ-বিষয়ক লীলাকাহিনীর লোকমুখ থেকে প্রথম সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রবেশ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন অবলম্বন করে। লৌকিক কৃষ্ণলীলা ও পদাবলী-সাহিত্যের মধ্যে সংযোগ সাধন করেছে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। চণ্ডীদাস তাঁর কাব্যে শুধু কৃষ্ণের জন্ম এবং কালিয়দমনের কাহিনী পুরাণ থেকে নিয়েছেন; তাম্বুল খণ্ড, দান খণ্ড, নৌকা খণ্ড, ভার খণ্ড, ছত্র খণ্ড, যমুনা খণ্ড, হার খণ্ড, বাণ খণ্ড, বংশী খণ্ড এবং রাধাবিরহ অধ্যায়গুলি লোকপ্রচলিত কৃষ্ণ-কাহিনীর কিছুটা মার্জিত রূপ। বৃন্দাবন খণ্ডের কিছু উপাদান ভাগবতের দশম স্কন্ধে পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে লিখিত পদাবলী সাহিত্যে, বিশেষ করে পালা কীর্তনে পুরাণ-বহির্ভূত অধ্যায়গুলির প্রভাব দেখা যায়। লোকসমাজে প্রচলিত কৃষ্ণকাহিনীর প্রভাব যে কত ব্যাপক ও গভীর ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যে। কবি ভাগবতের অনুসরণে কৃষ্ণ-কথা লিখতে বসেও দানলীলা ও পার খণ্ডে বাংলার নিজস্ব কাহিনী যোগ করেছেন। রাধার সখীদের নাম— যেমন, বৃন্দা, ললিতা, অনুরাধা, বিশাখা এবং কৃষ্ণের সখাদের নাম— শ্রীদাম, সুদাম, সুবল প্রভৃতি বিশেষ করে বাঙালী লোক-কবিদেরই দেওয়া। মালাধরই বোধ হয় প্রথম এই সব নামগুলিকে লিখিত সাহিত্যে ব্যবহার করেছেন।[৮৬]

এই প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র সেনের মন্তব্য বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন: 'দানলীলা ও পার খণ্ডে রাধিকা ও গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে কৌতুক করিতে ও তাঁহাকে মানভরে গালি দিতে শিখিয়াছে; এখানে শ্রীকৃষ্ণ পীতধড়া-পরিহিত বংশীধারী প্রস্তরমূর্তি নহেন; তিনি প্রেমিকশিরোমণি, চতুরচূড়ামণি। ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে প্রেমদান করিয়া অনুগৃহীত করেন; শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের নায়ক প্রেম দিয়া

যেরূপ অনুগৃহীত, প্রেম পাইয়াও সেইরূপ অনুগৃহীত হন।…এইখানে প্রাণের খেলা,—মাধুর্যের এক নব পন্থা যাহা পদকর্তারা সম্পূর্ণ প্রকাশ করিয়াছেন।'[৮৭]

লোকসমাজ থেকে ধীরে ধীরে বিবর্তিত হয়ে কৃষ্ণলীলা কিভাবে সাহিত্যে স্থান লাভ করল তা সংক্ষেপে সুন্দর করে বলেছেন ডঃ সুকুমার সেন: 'কৃষ্ণলীলা প্রথম থেকেই লোক-ব্যবহারে প্রচলিত এবং পরে লোক-ব্যবহার থেকে কালে কালে গৃহীত হয়েছে সাধু সাহিত্যে। প্রথম নেওয়া হয়েছিল শিশু কৃষ্ণের অদ্ভুত লীলা— পুতনাবধ, গোবর্ধন ধারণ, কালিয়দমন, কংসবধ ইত্যাদি। তার পরে নেওয়া হয়েছিল গোপীলীলা। ব্রজগোপীদের সঙ্গে কৃষ্ণের প্রেমকাহিনী সাধুসাহিত্যে গৃহীত হতে অনেকদিন লেগেছে। বলতে পারি নবম শতাব্দী থেকে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত শ্রীচৈতন্যই কৃষ্ণলীলাকে সাহিত্যের আসরে সিংহাসনে বসিয়ে গেছেন। সে সিংহাসন হল পদাবলীর, সিংহাসনের আস্তরণ হল কীর্তনের।'[৮৮]

উপরোক্ত ধামালী গান সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র সেন 'হিস্টরি অব বেঙ্গলী ল্যাংগুয়েজ অ্যাণ্ড লিটারেচার' গ্রন্থে বৌদ্ধ মহাযানীদের সঙ্গে যোগ লক্ষ্য করেছেন সেই গ্রাম্য অশ্লীল সংগীতের। পণ্ডিত হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী এই অভিমত সমর্থন করে আরও বিস্তার করেছেন। তিনি বলেন, বৌদ্ধধর্মের অবনতির পর মুষ্টিমেয় মহাযানী সাধক শূন্যবাদ আঁকড়ে থাকলেও জনসাধারণের মধ্যে তা বেঁচে রইল বিকৃতরূপে। হিন্দুদের মতো দেবদেবীর পূজার প্রচলন হল। প্রজ্ঞাপারমিতা, অবলোকিতেশ্বর, মঞ্জুশ্রী প্রভৃতি দেব-দেবীর মূর্তির সঙ্গে বাসুদেব ও লক্ষ্মীর মূর্তির সাদৃশ্য দেখা যায়। নানা কারণে মনে হয় বৈষ্ণব ভক্তিবাদ মহাযান ভক্তিবাদেরই বিকশিত রূপ।[৮৯] মহাযানীদের মধ্যে নাম-কীর্তন প্রচলিত ছিল, বৈষ্ণব সাধনায়ও নাম-কীর্তনের ভূমিকা অপরিহার্য। কীর্তন যে মহাযানীরাই প্রচলন করেছে তার প্রমাণ চীনে সাধনার অঙ্গ হিসাবে কীর্তনের ব্যবহার। বিকৃতই হোক অথবা অবিকৃতই হোক, বৌদ্ধধর্মই ভারত ও চীনের মধ্যে যোগাযোগের সেতু।

ডঃ দ্বিবেদী মনে করেন, বাংলা, আসাম ও উড়িষ্যায় কৃষ্ণধর্মের বিস্তার ঘটেছে বৌদ্ধধর্মের ধ্বংসস্তূপের উপর। আউল, বাউল, সহজিয়া প্রভৃতি সাধকগোষ্ঠীর বিশেষ শ্রদ্ধাস্পদ ছিলেন নিত্যানন্দ। শ্রীগৌরাঙ্গ বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে তাঁকে সহযোগী করায় নিত্যানন্দের মর্যাদা বৃদ্ধি পেল এবং তার ফলে লৌকিক স্তরে যে কৃষ্ণধর্ম বিকৃত আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে আবদ্ধ ছিল চৈতন্যদেবের প্রেরণায় তা সংস্কৃত হয়ে বিশুদ্ধ রূপ নিয়ে উঠে এল সমাজের উঁচুতলায়।

উত্তর ভারতের কৃষ্ণধর্ম সরাসরি মহাযান সম্প্রদায় থেকে আসেনি। এসেছে নাথ ধর্ম থেকে। এই নাথ ধর্ম অবশ্য ক্ষীয়মাণ মহাযান সম্প্রদায় থেকে উদ্ভূত। সমাজের নিচুতলার মানুষের মধ্যে ছিল এই ধর্মের বিস্তার। লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংগীতের চিহ্ন লক্ষ্য করা যায় হিন্দী কৃষ্ণকাব্যে। সুরদাসের অনেক পদে যে পূর্ববর্তী লোক সাহিত্যের ছায়া উপস্থিত তা অস্বীকার করা যায় না।[৯০]

পদাবলী সাহিত্যের সাংস্কৃতিক প্রভাব

অষ্টাদশ শতকের প্রথম থেকেই পদাবলী সাহিত্যের উৎকর্ষের ক্রমাবনতি দেখা দেয়। অবশ্য ঐ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত কিছু ভালো পদ লেখা হয়েছিল। বৃন্দাবনের গোস্বামীদের রচিত অলংকারশাস্ত্র কাব্য রচনার রীতি পদ্ধতি নির্দিষ্ট করে দেয়। তা ছাড়া ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ক্রমশ প্রাধান্য লাভ করে হৃদয়ের আবেগ ও অনুভূতিকে আচ্ছন্ন করে ফেলছিল। পদাবলীর স্বতোৎসারিত ধারা এইভাবে ক্ষীণ হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল পদাবলীর সংকলন। বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর ক্ষণদা-গীত-চিন্তামণি, রাধামোহন ঠাকুরের পদামৃতসমুদ্র, দীনবন্ধু দাসের সংকীর্তনামৃত, নরহরি চক্রবর্তীর গীতচন্দ্রোদয়, গৌরসুন্দর দাসের কীর্তনানন্দ ও গোকুলানন্দ সেন বা বৈষ্ণবদাসের পদকল্পতরু পরপর সংকলিত হয়। উৎকর্ষ হ্রাস পেলেও পদাবলীর জনপ্রিয়তা কিন্তু বাড়তে লাগল। সংকলন গ্রন্থের প্রচার ও কীর্তনের প্রসার এই জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ। জনসমাজে পদাবলীর ব্যাপক প্রভাবের ফলে আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে তার গভীর ছাপ পড়েছে। বর্তমানে আমরা পদাবলী সাহিত্যের প্রভাব দেখতে পাই প্রধানত (১) কৃষ্ণলীলার অভিনয়ে, (২) সংগীতে, (৩) গীতিকবিতায় এবং (৪) সমালোচনা সাহিত্যে।

কৃষ্ণলীলা অভিনয়ের প্রধান অবলম্বন পদাবলী। সেই সঙ্গে সাজসজ্জা, সংগীত এবং সূত্রধারের কাহিনী বয়ন আকর্ষণ সৃষ্টি করত। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই কৃষ্ণলীলা (এবং চৈতন্যলীলাও) বাংলার সর্বত্র অভিনীত হতে থাকে। কৃষ্ণকমল গোস্বামীর কৃষ্ণলীলা বিষয়ক গীতিনাট্য সমগ্র পূর্ববঙ্গ মাতিয়ে রেখেছিল দীর্ঘকাল। কৃষ্ণলীলার সমাদর এখনও আছে, কিন্তু পুরাতন ধারার সঙ্গে এ যুগের নতুন কোনো ধারার সংমিশ্রণ না ঘটায় কতদিন যে এর জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ থাকবে বলা যায় না। কীর্তনের প্রভাব স্থায়ীভাবে বাংলার নিজস্ব সংগীতকে বিশিষ্ট রূপ দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনবদ্য ভাষায় বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে কীর্তনের দান সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। তিনি কীর্তনের মধ্যে দেখেছেন বাঙালীর আত্মপ্রকাশের পথ। তিনি বলেছেন: 'এক-একটি জাতির আত্মপ্রকাশের এক-একটি বিশেষ পথ থাকে। বাংলাদেশের হৃদয় যেদিন আন্দোলিত হয়েছিল সেদিন সহজেই কীর্তনগানে সে আপন আবেগ সঞ্চারের পথ পেয়েছে; এখনও সেটা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়নি।'[৯১]

কীর্তন জনচিত্তকে এমনই উদ্বেল করেছিল যে হিন্দুস্থানী গানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বেও বাংলা গানের নিজস্ব ধারাটি আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: 'বাংলার রাধা-কৃষ্ণের লীলা গান হিন্দুস্থানী গানের প্রবল অভিযানকে ঠেকিয়ে দিলে। এই লীলারসের আশ্রয় একটি উপাখ্যান। সেই উপাখ্যানের ধারাটিকে নিয়ে কীর্তন গান হয়ে উঠেছিল পালা গান।'[৯২]

বাংলা গানে বিশেষ করে রবীন্দ্র-সংগীতে কথার যে প্রাধান্য তা কীর্তনের দান,

রবীন্দ্রনাথই এদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন : 'বাঙালীর কীর্তনগানে সাহিত্যে সংগীতে মিলে এক অপূর্ব সৃষ্টি হয়েছিল— তাকে প্রিমিটিভ এবং ফোক্ম্যুজিক বলে উড়িয়ে দেওয়া চলবে না। উচ্চ অঙ্গের কীর্তনগানের আঙ্গিক খুব জটিল ও বিচিত্র, তার তাল ব্যাপক ও দুরূহ, তার পরিচয় হিন্দুস্থানী গানের চেয়ে বড়ো।'[৯৩]

অন্যত্র তিনি বলেছেন : 'কীর্তন সংগীত আমি অনেককাল থেকেই ভালোবাসি। ওর মধ্যে ভাবপ্রকাশের যে নিবিড় ও গভীর নাট্যশক্তি আছে সে আর কোনো সংগীতে এমন সহজভাবে আছে বলে আমি জানিনে। সাহিত্যের ভূমিতে ওর উৎপত্তি, তার মধ্যেই ওর শিকড়, কিন্তু ওর শাখায় প্রশাখায় ফলেফুলে পল্লবে সংগীতের আকাশে স্বকীয় মহিমা অধিকার করেছে। কীর্তন সংগীতে বাঙালীর এই অনন্যতন্ত্র প্রতিভায় আমি গৌরব অনুভব করি।'[৯৪]

রবীন্দ্র-সংগীত এবং আধুনিক গীতিকবিদের গান যে পদাবলী কীর্তনের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবান্বিত সে কথা অনস্বীকার্য। কীর্তন ব্যতীত বাংলা গানের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অর্জন করা সম্ভব হত কিনা সন্দেহ।

পদাবলী কীর্তন এখনো আমাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এবং সাংস্কৃতিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সাহিত্যের উপর এর প্রভাবের কথা বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হবে বাংলা লিরিক বা গীতিকবিতার কথা। গীতিকবিতার গোড়ার অর্থ হল গান করবার জন্য রচিত কবিতা। পদাবলীও গান করবার উদ্দেশ্যেই রচিত হয়েছিল। বৈষ্ণব পদাবলী যে শুধুই আধুনিক বাংলা কবিতার মূল উৎসস্বরূপ তাই নয়, পদাবলীর ভাব, ভাষা, ছন্দ, অলংকার ইত্যাদি দীর্ঘকাল যাবৎ বাঙালী কবিরা ব্যবহার করে আসছেন। পদাবলী কীর্তনের প্রভাবের পরিচয় বহন করে ঢপ কীর্তন, পাঁচালী গান, কবিগান প্রভৃতি। অবশ্য একমাত্র কবিগানের কয়েকটি পদ ছাড়া পদাবলী সাহিত্যের গুণগুলি এদের মধ্যে বিশেষ দেখা যায় না। বিকৃতি দেখা যায় বরং বেশি। ভক্তের হৃদয়ের ব্যাকুলতার যে সুর বৈষ্ণব পদাবলীতে আছে তার অনুরণন শাক্ত পদাবলীতেও পাওয়া যায়, বিশেষ করে রামপ্রসাদের গানে।

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা কাব্যসাহিত্যে নবযুগের সূত্রপাত করেন মধুসূদন। তিনি বৈষ্ণব-পদাবলী শ্রদ্ধার সঙ্গে পাঠ করেছিলেন এবং এই অধ্যয়নের ফল আমরা দেখতে পাই তাঁর বিভিন্ন রচনায়। মধুসূদন পদকর্তাদের মত ভক্ত মহাজন ছিলেন না। তাই তিনি পদাবলী থেকে ভক্তির অংশটুকু বাদ দিয়ে শুধু তার সাহিত্য সৌন্দর্যটুকু নিয়েছেন। রাধাকৃষ্ণ লীলার এবং বৃন্দাবনলীলার পরিবেশের উল্লেখ পাওয়া যায় মধুসূদনের তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, বীরাঙ্গনা কাব্য প্রভৃতি রচনায়। ব্রজাঙ্গনা কাব্যে তিনি বিরহব্যাকুল রাধার মর্মবেদনা প্রকাশ করেছেন। তাঁর রাধা অবশ্য বৈষ্ণব কবির মহাভাব-স্বরূপিণী পরমপুরুষের হ্লাদিনী শক্তি নন। মধুসূদন পদাবলীর আঙ্গিক অংশত গ্রহণ করে বিরহক্লিষ্টা মানবী রাধাকে আমাদের নিকট উপস্থিত করেছেন। ব্রজাঙ্গনা কাব্যে বৈষ্ণব কবিদের মতো মধুসূদন ভণিতা ব্যবহার করেছেন, কোথাও বা বিরহবেদনা জর্জরিতা রাধাকে প্রাচীন মহাজনদের

মতোই সান্ত্বনা দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের মতো মধুসূদন বৈষ্ণব কবিদের ভাষা অনুকরণ করতে চেষ্টা করেননি। বৈষ্ণব কবিতার প্রাণরসকে বাংলা কাব্যের নবরূপ দিতে উদ্যোগী হয়েছিলেন মধুসূদন।

বঙ্কিমচন্দ্র যে বৈষ্ণব তত্ত্ব ও সাহিত্য সুগভীরভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন তার প্রমাণ তাঁর রচনাবলী থেকেই পাই। তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের দিক থেকে কৃষ্ণচরিত্র এক অদ্বিতীয় গ্রন্থ। ধর্মতত্ত্বে বঙ্কিম ভক্তিবাদের ব্যাখ্যা করেছেন। বিদ্যাপতি ও জয়দেব প্রবন্ধে এবং অন্যান্য নিবন্ধে বৈষ্ণব সাহিত্য সম্পর্কিত উল্লেখ থেকে এই বিষয়ে তাঁর গভীর অধ্যয়নের কথা জানা যায়। তাঁর 'আকাঙ্ক্ষা' এবং অন্যান্য কবিতায় বৈষ্ণব কাব্যের প্রভাব সুস্পষ্টরূপে ধরা পড়ে।

নবীনচন্দ্র সেনের 'ত্রয়ী কাব্য' রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস— পৌরাণিক আখ্যায়িকা এবং কল্পনার মিশ্রণে রচিত। পদাবলীর প্রভাব এই ধরনের কাব্যের উপরে পড়বার সুযোগ কম, কিন্তু একেবারে অনুপস্থিত নয়।

রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব পদাবলীর ভাব, ভাষা, অলংকার, উপমা ইত্যাদি যে গ্রহণ করেছেন তার প্রমাণ তাঁর সমগ্র রচনাবলীতে ছড়িয়ে আছে। নিজের রচনাকে পদাবলীর রসে ও সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ করেই রবীন্দ্রনাথ সন্তুষ্ট ছিলেন না; তিনি শিক্ষিত সমাজে পদাবলীর পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য নানাভাবে কাজ করেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষভাগ পর্যন্ত পদাবলী কীর্তন এমন এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল যে ইংরেজি শিক্ষিত সমাজ কীর্তনের পশ্চাদ্‌বর্তী পদাবলীর সাহিত্যমূল্য উপলব্ধি করতে আগ্রহ বোধ করেননি। কালীপ্রসন্ন সিংহ সেকালের কীর্তনীয়াদের সমাজ ও চরিত্র লক্ষ্য করেই হুতোম প্যাঁচার নকশায় পদাবলী কীর্তন সম্বন্ধে বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করেছেন।

পদাবলীর ঈশ্বর-ভজনার দিক বাদ দিলেও বিশুদ্ধ সাহিত্যমূল্যে যে অপরিসীম তা শিক্ষিত সমাজকে অবহিত করাবার জন্য বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সহিত রবীন্দ্রনাথ নির্বাচিত পদাবলী পদরত্নাবলী নামে সম্পাদনা করেছিলেন ১২৯২ সালে। পদাবলী যে বাঙালীর নিজস্ব সম্পদ, তা যে আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ভিত্তিভূমি, সে কথা তিনি অননুকরণীয় ভাষায় প্রকাশ করেছেন :

'...প্রেমের শক্তিতে বলীয়সী হইয়া আনন্দ ও ভাবের এক অপূর্ব স্বাধীনতা প্রবল বেগে বাংলা সাহিত্যকে এমন এক জায়গায় উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে যাহা পূর্বাপরের তুলনা করিয়া দেখিলে হঠাৎ খাপছাড়া বলিয়া বোধ হয়। তাহার ভাষা, ছন্দ, ভাব, তুলনা, উপমা ও আবেগের প্রবলতা, সমস্ত বিচিত্র ও নতুন। তাহার পূর্ববর্তী বঙ্গভাষা বঙ্গসাহিত্যের সমস্ত দীনতা কেমন করিয়া এক মুহূর্তে দূর হইল, অলংকারশাস্ত্রের পাষাণবন্ধনসকল কেমন করিয়া এক মুহূর্তে বিদীর্ণ হইল, ভাষা এত শক্তি পাইল কোথায়, ছন্দ এত সংগীত কোথা হইতে আহরণ করিল? বিদেশী সাহিত্যের অনুকরণে নহে, প্রবীণ সমালোচকের অনুশাসনে নহে— দেশ আপনার বীণায় আপনি সুর বাঁধিয়া আপনার গান ধরিল।'[৯৫]

রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন তেরো চোদ্দ তখন থেকেই তিনি বৈষ্ণব পদাবলী পাঠ করতে আরম্ভ করেন। পদাবলীর ছন্দ, রস, ভাষা, ভাব সমস্তই তাঁকে মুগ্ধ করত।[১৬] পদাবলীর ভাব ও ভাষায় যখন হৃদয়-মন আচ্ছন্ন সেই অবস্থায় তিনি ব্রজবুলিতে রচনা করেছিলেন কয়েকটি পদ— যা পরে 'ভানুসিংহের পদাবলী' (১৮৮৪) নামে প্রকাশিত হয়েছিল। ভাব ও ভাষায় এই পদগুলি বৈষ্ণব কবিদের এমনই সার্থক অনুকরণ হয়ে উঠেছিল যে পাঠকের পক্ষে ধারণা করা কঠিন ছিল প্রকৃত কবি সেই যুগের এক নবীন যুবক। বৈষ্ণব কবিদের ভাব অবলম্বনে মধুসূদন এবং আরও বহু কবি কাব্য রচনা করেছিলেন। কিন্তু ব্রজবুলির এরূপ সার্থক প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথের মতো কেউ করতে পারেননি। তাঁর পূর্বে একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্র 'মৃণালিনী' উপন্যাসে ভিখারিণী গিরিজায়ার মুখের দুটি গানে ব্রজবুলি ব্যবহার করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলি এবং অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের বহু কবিতায় পদাবলীর ভাবধারাকে নবরূপে প্রকাশ করেছেন। তাঁর কাব্যের উপর পদাবলী-সাহিত্যের গভীর প্রভাবের কথা কবি স্বীকার করেছেন মানুষের ধর্ম বক্তৃতামালায়।[১৭]

গিরিশচন্দ্র ঘোষের ভক্তিরসের দুই নাটক 'চৈতন্যলীলা' ও 'বিল্বমঙ্গলে'ও পদাবলীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

বর্তমানকালের কবিদের মধ্যে কালিদাস রায়ের উপর পদাবলীর প্রভাব বোধ হয় সর্বাপেক্ষা বেশি পড়েছে। তাঁর 'বৃন্দাবন অন্ধকার', 'বৃন্দাবন শয়নে' প্রভৃতি রচনায় বৈষ্ণব কবিদের ছায়া লক্ষণীয়। এই ধারার আর-একজন কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক। তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রাইকমল' উপন্যাস হলেও একটি বৈষ্ণব পদের মতোই করুণ-মধুর রসে স্নিগ্ধ।

দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকজন লেখক ও গ্রন্থের নাম শুধু উল্লেখ করা হল। বিস্তৃত আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। কিন্তু একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি যেসব লেখক শ্রদ্ধাশীল তাঁরা কেউ পদাবলী সাহিত্যকে এড়িয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেননি। প্রভাবটা কোথাও প্রত্যক্ষ; আবার কোথাও তা অন্তরালবর্তী।

পদাবলী সাহিত্যের উপর প্রতি বৎসরই উৎকৃষ্ট সমালোচনা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এর ফলে আমাদের সমালোচনা সাহিত্য বিশেষরূপে সমৃদ্ধ হয়েছে। পদাবলী এখনও পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত এবং পদাবলীর নতুন নতুন সুসম্পাদিত সংকলন গ্রন্থও প্রকাশিত হয়। ভারতের অন্য কোনো আঞ্চলিক ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলী নিয়ে এখনো এমন চর্চা হয় বলে আমরা জানি না।

বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনে আজো পদাবলী সাহিত্য গৌরবের আসন অধিকার করে আছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বৈষ্ণব-পরবর্তী যুগের বাংলা সাহিত্যে পদাবলীর প্রভাব নির্দেশ করা চলল না। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের শব্দ-সম্ভারে, ছন্দে, সংগীতে, রূপকল্পে, উপমায়— সকল ক্ষেত্রেই পদাবলীর গভীর প্রভাব ওতঃপ্রোতভাবে ছড়িয়ে আছে।

হিন্দী কৃষ্ণকাব্য সম্বন্ধে এমন কথা বলা চলে না। বল্লভাচার্যের নেতৃত্বে যে কাব্যধারা বিকাশ লাভ করেছিল তাকে অক্ষুণ্ণ রেখে আরো প্রবল করে তোলবার মতো কোনো প্রেরণার আবির্ভাব হিন্দী সাহিত্যে ঘটেনি। বরং হিন্দী কাব্যে রামের মর্যাদা বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষ্ণের প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়ল। হিন্দী সাহিত্যে ভক্তিযুগের পরে কৃষ্ণ ক্রমশ একটু একটু করে দূরে সরেছেন, তাঁর স্থান অধিকার করতে এগিয়ে এসেছেন রাম।

ভক্তিযুগের কবিরা গোপী-কৃষ্ণের মিলনাকাঙ্ক্ষার মধ্যে জীবাত্মা-পরমাত্মার মিলনের চিরন্তন ব্যাকুলতা উপলব্ধি করেছিলেন। এই দার্শনিকতা রীতিযুগে অনেকটা ম্লান হয়ে গেল। কৃষ্ণকাব্যেব কবিদের নিকট কৃষ্ণ শৃঙ্গাব রসের নায়ক হিসাবে প্রাধান্য লাভ করলেন। অলৌকিক ভক্তিময় প্রেমরসেব স্থানে এল কৃষ্ণনামাঙ্কিত পার্থিব শৃঙ্গার রস। রীতিযুগেব অধিকাংশ কবি শব্দ-সম্পদে, ছন্দে এবং উপমা-প্রয়োগে ক্ষমতার পরিচয় দিলেও কৃষ্ণকাব্যের আত্মাকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হননি। নাগরীদাস, ব্রজবাসীদাস, ঘনানন্দ, রত্নকুঁওারী বিবি প্রভৃতি কয়েকজন কবি বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছেন এবং তাঁদের রচনায় কোথাও কোথাও অকৃত্রিম ভক্তির সুর ধ্বনিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে কবি ঘনানন্দেব কথা বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য। তিনি মীর মুন্সীর পদ ত্যাগ কবে কৃষ্ণোপাসক হন। তিনি লিখলেন,

জান ঘন আনন্দ আনোখো য়হু প্রেম-পন্থ,
ভুলে তে চলত রহৈঁ সুধি কে থকিত হ্বৈ।[৯৮]

অর্থাৎ, কবি জানেন অমূল্য এই প্রেম বিষয়াসক্তি ভুলিয়ে কৃষ্ণপ্রেমে মগ্ন করে তোলে। সতর্ক বিষয়ী ব্যক্তি প্রেমহীন জীবন-পথে চলতে গিয়ে সহজেই ক্লান্ত হয়ে পড়েন।

গৌড়ীয় সম্প্রদায়ভুক্ত প্রিয়াদাসের নামও উল্লেখযোগ্য। তিনি নাভাদাসের ভক্তমাল গ্রন্থের ভক্তিরসবোধিনী নামক টীকা রচনা করেন। চৈতন্যদেবের স্তুতি এই টীকাগ্রন্থের এক বিশেষ আকর্ষণ।[৯৯]

রীতিযুগে ভজন ও কীর্তনের প্রাধান্য দেখা যায়। এদের মাধ্যমে কৃষ্ণকাব্যের রচয়িতারা তাঁদের কলাকৌশল-প্রকাশে সচেষ্ট ছিলেন। কাব্যের আঙ্গিক অতিক্রম করে তাঁরা নানা রাগ, তাল ইত্যাদির সাধনাও করতেন।[১০০]

সাহিত্যের কোনো ধারার প্রভাব কত গভীর তার বিচার করা যায় সেই ভাষার লোকসাহিত্য আলোচনা করলে। কারণ সাহিত্যের ভিত্তি লোকমানসে। এই ভিত্তি রচিত হয় দুটি উপায়ে। এক, লোকমানসে সৃষ্ট লোকসাহিত্যের প্রভাব; দুই, সমাজের উপরতলায় রচিত সাহিত্যের লোকমানসের উপর প্রভাবের ফলে সৃষ্ট সাহিত্য। পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন সূরদাসের পদাবলী সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন এই প্রসঙ্গে তা প্রণিধানযোগ্য: 'সূর কে পদো মে ঐসে অনেক স্থল হৈ জো ব্রজপ্রদেশ কী লোকসংস্কৃতি কী ঔর সংকেত করতে হৈ। সূর-সাগর মে লোকোক্তিয়োঁ ঔর মুহাবরো কা সহজ প্রয়োগ দেখকর য়হ স্পষ্ট প্রতীত হোতা হৈ কি সূরদাস নে ভাষা

কো গঢ়নে কা প্রযত্ন নহী কিয়া হৈ, বল্কি লোক মে প্রচলিত টকসালী ভাষা কো জ্যোঁ কা ত্যোঁ উঠাকর রখ দিয়া হৈ।'[১০১] অর্থাৎ, সূরদাসের পদে অনেক স্থানেই ব্রজ-প্রদেশের সংস্কৃতির সংকেত পাওয়া যায়। তা ছাড়া সূরসাগরে এমন সব বাগ্‌ধারা ও প্রবাদবাক্য ব্যবহার করা হয়েছে, যা দেখে স্পষ্টই মনে হয়, সূরদাস ভাষাকে নতুন করে গড়ে তোলার চেণ্টা করেননি, বরং সে যুগে লোকপ্রচলিত ভাষা যে ভাবে ছিল সে ভাবেই ব্যবহার করেছেন। আচার্য রামচন্দ্র শুক্ল বলেছেন যে, সূরদাসের পদাবলী হয়ত কোনো প্রচলিত গীতিকাব্যধারার পূর্ণতম বিকশিত রূপ।[১০২] রাহুলও এ-সিদ্ধান্ত সমর্থন করেছেন।

পরবর্তীকালে হিন্দীর বিভিন্ন উপভাষায় আমরা যেমন কিছু মৌলিক কৃষ্ণ কাহিনীর সন্ধান পাই, তেমনি ভক্তিযুগের ভক্ত কবিদের অনুকরণে লোকগীতি রচনারও প্রমাণ মেলে। মৈথিল লোকসাহিত্যে ঝুমর, শ্রমগীত, ঋতুগীত, বারহমাসা, মধুশ্রাবণী, ছট্‌গীত, বিবাহগীত ইত্যাদি বহুবিধ লোকসঙ্গীতের প্রচলন আছে। এই বহুবিধ লোকগীতের অন্যতম গদালরি। গদালরি-গীতের বৈশিষ্ট্য হল শ্রীকৃষ্ণের বালক্রীড়ার সুচারু চিত্রণ।

যুমনা তীর বসথি বৃন্দাবন,
সঙ্গহি গেলেঁ নহায়
কে এহনি কয়লন্হি অন্যায়,
বংশী লেলন্হি চোরায়।[১০৩]

অর্থাৎ যমুনার তীরে বৃন্দাবন। কৃষ্ণ যশোদাকে বলছেন, মা, আমি নিজের বন্ধুদের সঙ্গে স্নান করতে গিয়েছিলাম। না জানি কে এমন অন্যায় কাজ করেছে, আমার বাঁশী চুরি করে নিয়েছে।

কৃষ্ণের বাঁশী চুরির ব্যাপারটি ভক্তিযুগের কবিদের রচনাতেও পাওয়া যায়। সূরদাসের একটি পদে আছে কৃষ্ণ যশোদাকে সতর্ক করে দিচ্ছেন রাধা যেন তাঁর বাঁশি চুরি করে নিয়ে যেতে না পারেন।[১০৪]

ভোজপুরী লোকগীতে গোপীকৃষ্ণের প্রেমলীলার এমন সব চিত্র পাওয়া যায় যা ভক্তিযুগের কবিরাও অংকিত করেছেন।

লোকগীতি ব্যতীত লোকনাট্যের মধ্যেও কৃষ্ণকাহিনী এক মুখ্য ভূমিকা অধিকার করেছিল। রুক্মিণী হরণ, গোপীকৃষ্ণ নাটক ইত্যাদি এই শ্রেণীর নাটকের দৃষ্টান্ত। এখনও পল্লী অঞ্চলে মেলায় ও নানাবিধ উৎসব উপলক্ষে লোকনাট্যের অভিনয় হয় তার মধ্যে কৃষ্ণকাহিনীর স্থান উপেক্ষণীয় নয়। ভক্তিযুগের বিভিন্ন কবিদের রচনার মাধ্যমে কৃষ্ণ-কেন্দ্রিক যেসব পৌরাণিক কাহিনীর প্রচলন হয়েছিল সেসব কাহিনীই গ্রামাঞ্চলের লোকনাট্যে স্থান লাভ করে।

মধ্যযুগীয় হিন্দী বৈষ্ণব ভক্তিধারা বস্তুবাদী আধুনিক যুগের রূঢ় বাস্তবতার মধ্যেও লুপ্ত হয়ে যায়নি। হিন্দী সাহিত্যে আধুনিক যুগের আরম্ভ সং ১৯০০ বিক্রমাব্দ থেকে। ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রকে যুগসন্ধির কবি বলা যেতে পারে। তাঁর

রচনায় প্রাচীন ও নবীনযুগের সংমিশ্রণ পরিস্ফুট। তিনি তাঁর পূর্বসূরিদের কৃষ্ণকাব্যে অবগাহন করে আধুনিক ধ্যানধারণার সঙ্গে তাকে মিলিত করে নতুন কৃষ্ণচরিত্র সৃষ্ট করলেন। তবে বল্লভ-ভক্তিবাদের প্রতি অনুরক্ত হওয়ায় তাঁর রচনায় বাল্যলীলার প্রত্যেকটি প্রসংগ প্রাধান্য লাভ করেছে। কৃষ্ণের জন্ম, দোলায় দোলা, চলতে শেখা ইত্যাদি প্রসংগ ভক্তিযুগের কবিদের বারবাব স্মরণ করিয়ে দেয়।

সখী রী দেখহু বাল-বিনোদ।
খেলত রাম কৃষ্ণ দোউ আঁগন কিলকত হঁসত প্রমোদ॥
কবহুঁ ঘুটরুঅন দৌরত দোউ, মিসি ধুলধুসরিত গাত।
দেখি দেখি য়হ্ বাল-চরিত-ছবি, জননী বলি বলি জাত॥[১০৫]

অর্থাৎ, শিশু কৃষ্ণ অংগনে হামা দিয়ে ছুটে ছুটে বলরামের সংগে খেলা করছেন, কখনও দুজনে আনন্দে হাসছেন। ধূলিধূসরিত শিশু কৃষ্ণের এই খেলা দেখে জননী যশোদা মুগ্ধ হচ্ছেন এবং তাঁব বালাই নিচেছন।

ভাবতেন্দু বৈষ্ণব কবিদেব ভাষাব বৈশিষ্ট্য যথাসম্ভব রক্ষা করেছেন। তা ছাড়া কৃষ্ণলীলাব পদগুলিতে সূরদাস, পরমানন্দ দাসের মতো কৃষ্ণজীবনের ক্রমবিবর্তনের ছবিটিও সযত্নে চিত্রিত হয়েছে। তাঁর কৃষ্ণলীলায় ভক্তহৃদয়ের তন্ময়তা যেমন দেখি তেমনি একালেব কবি হিসাবে তিনি কৃষ্ণকে রাষ্ট্রনায়ক হিসাবে পাঠকেব নিকট উপস্থিত কবেছেন। কিন্তু এখানে কৃষ্ণ রামরূপে পরিচিত। ভারতেন্দু রাম এবং কৃষ্ণকে একসঙ্গে মিলিত কবেছেন।

এছাড়া তাঁর গীতিনাট্য চন্দ্রাবলীতে প্রাচীন ও নবীন কৃষ্ণ একান্ত হয়ে এক নব-যুগেব সূচনা কবেছে।

আধুনিক যুগেব প্রারম্ভেই আর-একজনকে স্মরণ করা যেতে পারে, তিনি অযোধ্যা-সিংহ উপাধ্যায় (হরিঔধ)। হিন্দী সাহিত্যে ভক্তি ও বৈষ্ণবানুরাগের উজ্জ্বল নিদর্শন হরিঔধের প্রিয়-প্রবাস গ্রন্থ। এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু কৃষ্ণের বৃন্দাবন ত্যাগ ও মথুরা গমন। কৃষ্ণবিরহে ব্রজবাসী, নন্দ-যশোদা ও পশুপক্ষীদের হৃদয়বিদারক বেদনা কবির রচনায় রূপায়িত হযেছে।

ডঃ ধর্মবীর ভারতীর অন্যতম গ্রন্থ কানুপ্রিয়া আঙ্গিকের দিক থেকে পূর্বসূরিদের বিশেষ রূপে স্মরণ করিযে দেয়। তবে প্রেমলীলা, মঞ্জুরীপরিণয়, রাধা বিরহ ইত্যাদির মধ্যে ভক্তিযুগের কবিদের আত্মস্থ ভাবটি খোঁজা ব্যর্থ চেষ্টা মাত্র।

হিন্দী সাহিত্যের আধুনিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি মৈথিলীশরণ গুপ্ত। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ বিষ্ণুপ্রিয়া। এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু চৈতন্যের সন্ন্যাস ও গৃহত্যাগ। কবি বিষ্ণুপ্রিয়ার বেদনার চিত্র অংকনের সংগে সংগে শচীমাতার বেদনাকেও তুলে ধরতে ভোলেননি। অবশ্য নিছক বিষয়বস্তুর দিক থেকে কৃষ্ণকাহিনীর সংগে এ কাব্যের হয়ত যোগ নেই। কিন্তু ভাবের দিক থেকে একগোত্রীয়। এছাড়া দ্বারকা-প্রসাদ মিশ্রের কৃষ্ণায়ণ সাম্প্রতিক হিন্দী সাহিত্যে কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ একথা বলা যেতে পারে। তুলসীদাসের অনুকরণে দোহা ও চৌপাইয়ের রীতিতে

লেখা কৃষ্ণজীবনের প্রত্যেকটি ঘটনা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ডঃ রাজেন্দ্র-প্রসাদ 'কৃষ্ণায়ণ' গ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করেছেন সেটিও এখানে গ্রহণ করা যেতে পারে, 'কৃষ্ণায়ণ মে জন্ম সে স্বর্গারোহণ তক কী সভী ঘটনাওঁ কো ক্রম-বন্ধ করকে দর্শায়া গয়া হৈ'।[১০৬] অর্থাৎ, কৃষ্ণায়ণ গ্রন্থে কৃষ্ণের জন্ম থেকে স্বর্গারোহণ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা ক্রমবন্ধ ভাবে দেখানো হয়েছে। কবির উপর সূরদাসের প্রভাব নিঃসন্দেহে প্রবল। এটি লক্ষ্য করে ডঃ শ্রীনিবাস শর্মা 'আধুনিক হিন্দী কাব্য মেঁ বাৎসল্য রস' গ্রন্থে বলেছেন, 'য়হ উল্লেখনীয় হৈ কি জো বাল চরিত কৃষ্ণায়ণ মে বর্ণিত হৈ উস পর সূর কা স্পষ্টতঃ প্রভাব হৈ ঔর উসকে লিয়ে কবি নে স্বয়ং ভী গ্রন্থকে প্রারম্ভ মে সংকেত কর দিয়া হৈ।'[১০৭] এটি উল্লেখনীয় যে কৃষ্ণায়ণ গ্রন্থে বাল্য লীলার বর্ণনায় কবির উপর সূরদাসের প্রভাব স্পষ্ট। স্বয়ং কবিও এই গ্রন্থের আরম্ভে তার ইঙ্গিত দিয়েছেন।

সূরদাস পদজ্যোতি সহারে,
বরণে বাল-চরিত মৈ সারে।[১০৮]

অর্থাৎ সূরদাসের পদজ্যোতির সাহায্যে আমি কৃষ্ণের বাল্যলীলার বর্ণনা করছি।

কাব্য ব্যতীত হিন্দী সাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রেও অল্পবিস্তর বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এই প্রসঙ্গে উদয়শংকর ভট্টের রাধা গীতিনাট্যটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

বৈষ্ণব কাব্যের যে প্রভাব আজ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে লক্ষ্য করা যায় হিন্দী সাহিত্যে তেমন প্রভাব লক্ষণীয় নয় দুটি কারণে। প্রথমত, পূর্বেই বলা হয়েছে ভক্তিযুগের পরে রাম সমগ্র হিন্দীভাষী অঞ্চলে প্রাধান্য লাভ করে কৃষ্ণকে অনেকটা আচ্ছন্ন করেছেন। বৈষ্ণব ধর্ম ও সাহিত্য চৈতন্যদেবের জীবন ও বাণী থেকে যে প্রেরণাধারা বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে তেমন কোনো ব্যক্তিত্ব হিন্দী কৃষ্ণ-কাব্যকে প্রেরণা দান করেনি। দ্বিতীয়ত, বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখবার পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়েছে বাংলার কীর্তন গান। মহাজন পদাবলী সুর সহযোগে বিভিন্ন উপলক্ষে গীত হয়ে জনচিত্তে স্থায়ী আসন লাভ করেছে। কীর্তন হিন্দীভাষী অঞ্চলে এরূপ জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি। সেখানে কীর্তনের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল এবং এখনও আছে রাগসংগীত, যে সংগীতের প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল মোগল সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায়। সূরদাস, মীরা প্রভৃতি ভক্তকবিদের যেসব পদাবলী গীত হয় সে ভজন রাগসংগীতেরই অন্তর্ভুক্ত। বাংলার কীর্তনের মতো তার বিশেষ রূপ বা বিশেষ আবেদন নেই।

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যোগাযোগ, রবীন্দ্ররচনাবলী, ৯ম খণ্ড, পৃ ১৮৩

২. শাণ্ডিল্যভক্তিসূত্রম্, প্রথম আহ্নিক, ২

৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধাবা, রবীন্দ্ররচনালী, ১৮শ খণ্ড, পৃ ৪২৮

৪. শতপথ ব্রাহ্মণ, প্রথম কাণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়, পঞ্চম ব্রাহ্মণ।

৫. Majumdar, B.B., *Krisna in History and Legend.*

৬. পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী, 'বাসুদেবার্জুনাভ্যাং ধূন্'।

৭. Rufus Quintus Curtius, *The History of Alexander the Great,* p. 293

('The image of Hercules was carried before the infantry; their Supreme incitement to heroic acts.')

৮. Archaeological Survey of India, Annual Report for 1908-1909.

৯. *An Anthology of Sanskrit Court Poetry*, p. 93.

১০. পববর্তী অধ্যায়ে এই প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

১১. Majumdar, R. C., and others, *An Advanced History of India,* p. 205

১২. গৌড়ীয় দর্শনে পরমার্থের আলোক, পৃ ১৫৬-৫৭

১৩. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সাংস্কৃতিকী, ২য় খণ্ড, ২০৫ পৃ উদ্ধৃত। একটু ভিন্ন রূপ পাওয়া যায় পদ্মপুরাণের (উত্তর খণ্ড) 'ভক্তিনারদসমাগম' অধ্যায়ে। যমুনাতীরে তরুণীরূপী ভক্তি নারদমুনিকে এই শ্লোকে বলেছেন তাঁর জীবনের কথা।

১৪. 'বৈষ্ণবের ক্ষেত্রে এই সাধন-সঙ্গীত রচনা শ্রীরূপ গোস্বামীর প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফল। কিন্তু হুসেন শাহের অন্যতম মন্ত্রী আরবী-ফারসীতে পারঙ্গম শ্রীরূপ এ বিষয়ে অন্তত অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন সূফী সাধকের দ্বারা। এই প্রসঙ্গে বিশ্ববরেণ্য মনীষী অধ্যাপক ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—Divine worship by means of songs and chants and with music was nothing new in India. But an almost frenzied worship through singing, music and dancing seems to have been a new thing in the mediaeval religious life of India, particularly in Vaishnava Bengal; and although I do not insist that herein we have an incidence of influence from Sufism on Bengal Vaishnavism, yet it appears quite reasonable to assume that a form of Sufi worship through a sort of frenzied singing or repetition of a divine name (Sikror Zikr) which raised religious

emotion to the highest pitch, acted as a stimulus upon a similar path or line of Vaishnava religious Sadhan in Mediaeval India. (*Islamic Mysticism, Iran and India, Indo-Iranica* ; Vol. I, Oct. 1946.)'

শুকদেব সিংহ, শ্রীরূপ ও পদাবলী সাহিত্য, পৃ. ১৪

১৫. কবি কর্ণপুরের রচিত বলে প্রসিদ্ধ 'শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়' পদ্ম-পুরাণের শ্লোক হিসাবে উদ্ধৃত। কিন্তু পদ্মপুরাণের কোনো মুদ্রিত সংস্করণে শ্লোকটি পাওয়া যায় না। হয় এটি প্রক্ষিপ্ত অথবা পদ্মপুরাণের এমন কোনো পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্তব্য যা মুদ্রিত হয়নি। দ্রঃ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ, পৃ ১৯৪

১৬. শশিভূষণ দাশগুপ্ত, শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ, দর্শনে ও সাহিত্যে ; ৩য় সংস্করণ, পৃ ৮৬

১৭. Hiriyanna, M., *Outlines of Indian Philosophy*, p. 383.

১৮. বিপিনচন্দ্র পাল, সাহিত্য ও সাধনা, পৃ ১৩৮-৩৯

১৯. দীনেশচন্দ্র সেন, বৃহৎ বঙ্গ, ২য় খণ্ড, পৃ ৬৯০

২০. ক্ষিতিমোহন সেন, চিন্ময় বঙ্গ, পৃ ১৮৬

২১. অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি, ২য় সং, পৃ ১১৮ দ্রষ্টব্য।

২২. রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলা দেশের ইতিহাস, প্রাচীন যুগ, ৩য় সং, পৃ ১৪৩

২৩. *Encyclopaedia of Religion and Ethics*, Vol. II, p. 493.

২৪. De, S. K., *Early History of the Vaisnava Faith and Movement in Bengal* (2nd ed.) p. 5.

২৫. Tattvabhusan, Sitanath, *Krishna and the Puranas*, p.67.

২৬. De, S. K., *op. cit.*, p. 6.

২৭. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণচরিত্র।

২৮. Keith, A. B., *Sanscrit Drama*, p. 45.

২৯, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য ২।৭৭

৩০. বিমানবিহারী মজুমদার, ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য, পৃ ১৮১

৩১. Chatterji, Suniti Kumar, *Jayadeva*, p. 40.

৩১ক. *Gatha-Saptasati*, Ed. by R. G. Basak, p. 5.

৩২. তদেব, ১ম শতক, ৩য় শ্লোক।

৩৩. তদেব, ১ম শতক, ২য় শ্লোক।

৩৪. নীলরতন মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক। চণ্ডীদাসের পদাবলী, পৃ ৩০২

৩৫. *Op. cit.*, Ed. by R. G. Basak, ১ম শতক, ৪৫শ শ্লোক।

৩৬. *Subhashitaratnakosha*, Ed. by Daniel H. H. Ingalls, Introduction.

৩৭. বিমানবিহারী মজুমদার, গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ, পদ নং ৩৬১, পৃ. ১৮৬-৮৭।

৩৮. বিমানবিহারী মজুমদার, ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য, পৃ. ১৮৪

৩৯. প্রাকৃতপৈঙ্গল, পদনং ৩৮, পৃ. ৩৫৮

৪০. তদেব, পদ নং ৯, পৃ. ১২

৪১. বড়ু চণ্ডীদাস, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, পদ নং ১৬, পৃ. ১৫৭

৪২. Chatterji, S. K., *Jayadeva*, P. 11.

৪৩. বিমানবিহারী মজুমদার, ষোড়শ শতকের পদাবলী সাহিত্য, পৃ. ১৭১

৪৪. স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, পদাবলী কীর্তনের ইতিহাস, ১ম ভাগ, পৃ. ৬

৪৫. কালিদাস, মেঘদূতম্, উত্তরমেঘ, ২৫

৪৬. শার্ঙ্গদেব, সংগীতরত্নাকর, ৪।৬

৪৭. জয়দেব, গীতগোবিন্দম্, ১।৩

৪৮. সুকুমার সেন, ভাষার ইতিবৃত্ত, ৪র্থ সংস্করণ, পৃ. ২০১

৪৯. Sen, Sukumar., *A History of Brajabuli Literature*, Ch. 1.

৫০. *Ibid*, Ch. 14.

৫১. খগেন্দ্রনাথ মিত্র, কীর্তন, পৃ. ৪

৫২. বড়ু চণ্ডীদাস, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (বংশীখণ্ড), পৃ. ২৯৪

৫৩. কৃষ্ণদাস কবিরাজ, চৈতন্যচরিতামৃত, ১।১৩।৪২, পৃ. ২৪৬

৫৪. দীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৮ম সং, পৃ. ১৩০

৫৫. নীলরতন মুখোপাধ্যায়, চণ্ডীদাসের পদাবলী, পৃ. ৩০

৫৬. দীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৮ম সং, পৃ. ১৩১ হইতে উদ্ধৃত।

৫৭. মালাধর বসু, শ্রীকৃষ্ণবিজয়, খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত, পৃ. ১৮৯

৫৮. সুখময় মুখোপাধ্যায়, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম, পৃ. ৭২

৫৯. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড (পূর্বার্ধ), পৃ. ৩৯৭

৬০. বিমানবিহারী মজুমদার, গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ, পদ ৩৬১, পৃ. ১৮৭

৬১. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, পৃ. ১০৭

৬২. বিমানবিহারী মজুমদার, ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য, পৃ. ৫০

৬৩. নামদেব, সন্ত নামদেব কী হিন্দী পদাবলী, পদ নং ২১০, পৃ. ৯৯

৬৪. বিদ্যাপতি, বিদ্যাপতির পদাবলী, পদ নং ৩২, পৃ. ২৭

৬৫. জয়দেব, গীতগোবিন্দম্, ১।১

৬৬. সুরদাস, সুর সাগর, পদ নং ৬৮৪, পৃ. ৫০০

৬৭. প্রভুদয়াল মীতল, চৈতন্য মত ঔর ব্রজসাহিত্য, পৃ. ১৯৭

৬৮. মীরাবাঈ, মীরা-মাধুরী, পদ নং ৮, পৃ ৪

৬৯. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড (পূর্বার্ধ), পৃ ৩১৮

৭০. শশিভূষণ দাশগুপ্ত, শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ,দর্শনে ও সাহিত্যে, চতুর্দশ অধ্যায়

৭১. চৈ. চ, মধ্যলীলা ২১।১০১

৭২. *Bombay Sanskrit Series*, II, 36.

৭৩. Keith, A. B., *History of Sanskrit Drama*, J. R. A. S., for 1911, 1912, 1916.

৭৪. Krishnamachariar, M., *History of Classical Sanskrit Literature*, pp. 525-42.

৭৫. ভাগবত, ১১।১১।২৩

৭৬. Keith, A. B., *Sanskrit Drama*, p. 47.

৭৭. Hein, Norvin., *The Miracle Plays of Mathura*, p. 238.

৭৮. শশিভূষণ দাশগুপ্ত, শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ, দর্শনে ও সাহিত্যে, পৃ ১১০

৭৯. Abul Fazl, *Ain-i-Akbari*. Tr. by Col. H. S. Jarret., Rev. Ed., 1948, V. 3. p. 272.

৮০. Sen, D. C., *History of Bengali Language and Literature*, p. 324.

৮১. নীহাররঞ্জন রায়. বাঙগালীর ইতিহাস, পৃ ৭৩৩

৮২. তদেব, পৃ ৭৩৩

৮৩. দীনেশচন্দ্র সেন, বৃহৎ বঙগ, ২য় খণ্ড, পৃ ৯৭২

৮৪. সুকুমার সেন, বাঙগালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড (পূর্বার্ধ), পৃ ৪০৩

৮৫. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোক-সাহিত্য, ১ম খণ্ড, ২য় অধ্যায়।

৮৬. রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলা দেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ, পৃ ৩৭২

৮৭. দীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৮ম সং, পৃ ১০২

৮৮. সুকুমার সেন বৈষ্ণবীয় নিবন্ধ. পৃ ৫১

৮৯. Kern J. H. K., *Manual of Indian Buddhism*. p. 124

৯০. হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী, উস যুগ কী সাধনা ঔর তাৎকালিক সমাজ, হরবংশলাল শর্মা সম্পাদিত 'সুরদাস' সংকলন-গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

৯১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জাভাযাত্রীর পত্র, রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৯শ খণ্ড, পৃ ৪৯০

৯২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সংগীতচিন্তা, পৃ ১১০

৯৩. তদেব, পৃ ২৩৮

৯৪. তদেব, পৃ ২৩৮

৯৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত', রবীন্দ্ররচনাবলী, ৮ম খণ্ড, পৃ ৪৪৩-৪৪

৯৬. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী, ১ম খণ্ড, পৃ ৬১

৯৭. বিমানবিহারী মজুমদার, রবীন্দ্র সাহিত্যে পদাবলীর স্থান, পৃ ৩-৪,

৯৮. ঘনানন্দ, ঘনানন্দ গ্রন্থাবলী, পদ ২৯৬, পৃ ৯৫

৯৯. ভগীরথ মিশ্র, সম্পাদক, হিন্দী সাহিত্য কা বৃহৎ ইতিহাস, ৭ম ভাগ, পৃ ২৩৪

১০০. তদেব, পৃ ২৬৪

১০১. রাহুল সাংকৃত্যায়ন, সম্পাদক, হিন্দী সাহিত্য কা বৃহৎ ইতিহাস, ১৬শ ভাগ, পৃ ১৪

১০২. রামচন্দ্র শুক্ল, হিন্দী সাহিত্য কা ইতিহাস পৃ ১৬০

১০৩, রামইকবাল সিংহ রাকেশ, সম্পাদক, মৈথিলী লোকগীত, পদ ২, পৃ ৩৩৯

১০৪. দ্রষ্টব্য : সুরসাগর, পদ ৩৪৪১, ৪০৫৯, পৃ ১৩০৯

১০৫. ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র, ভারতেন্দু গ্রন্থাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ ৪৭

১০৬. ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ কৃষ্ণায়ণের ভূমিকা, পৃ ২

১০৭. ডঃ শ্রীনিবাস শর্মা, আধুনিক হিন্দী কাব্য মেঁ বাৎসল্য রস, পৃ ২১৪

১০৮. দ্বারকাপ্রসাদ মিশ্র, কৃষ্ণায়ণ, ১।৩।৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

বৈষ্ণব সাহিত্যে রস

রসের সংজ্ঞা

সাহিত্য, নাটক, চিত্রকলা, সংগীত প্রভৃতির গুণ ও প্রকৃতি বিচারে রসের প্রসঙ্গ উল্লেখ অপরিহার্য। সুতরাং বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য আলোচনায়ও রসের কথা না তুলে উপায় নেই। শুধু পদাবলী সাহিত্যের মর্ম আস্বাদনের জন্য নয়, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের তাত্ত্বিক কাঠামোর স্বরূপ উপলব্ধি করবার জন্যও রস কী, সে সম্বন্ধে ধারণা থাকা প্রয়োজন। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে ব্যাখ্যাত রসের প্রয়োগকে ধর্মের ক্ষেত্রে প্রসারিত করে গৌড়ীয় শাখার তাত্ত্বিকরা বৈষ্ণব ধর্মের ব্যাখ্যা করেছেন। এই ধর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, ধর্মের ভাব ও অনুভূতিকে শিল্প সাহিত্যের রসানুভূতির মতো বিচার বিশ্লেষণ করা। রসানুভূতির লক্ষণ, ক্রমপর্যায় এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি ধর্মানুভূতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন রূপ গোস্বামী প্রমুখ ভক্ত ও তাত্ত্বিক পণ্ডিতরা। পদাবলীতে সাহিত্য ও ধর্ম অঙ্গাঙ্গি যুক্ত। বাংলার বৈষ্ণব শাস্ত্রানুযায়ী রসের ব্যাকরণ এই উভয় শাখাতেই সমান প্রযোজ্য।

রস শব্দের আভিধানিক অর্থ হল 'রসেন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তু।' 'বিশ্বকোষ'কার এর ব্যাখ্যা করে লিখেছেন, 'রসনেন্দ্রিয় দ্বারা যে বস্তুর আস্বাদ গ্রহণ করা যায় তাহার নাম রস।' মনিয়ার উইলিয়াম্স্ সংকলিত সংস্কৃত-ইংরেজী অভিধানেও রস ধাতুর মূল অর্থের উপরে জোর দেওয়া হয়েছে। ঐ অভিধানে 'রস' শব্দের অর্থ পাওয়া যায়: 'to taste, relish.' 'বঙ্গীয় শব্দকোষে' হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যান্য অর্থের সঙ্গে আস্বাদ গ্রহণের উপরেই জোর দিয়েছেন।

রসের প্রাচীনতম ব্যাখ্যাতা ভরতমুনিও আস্বাদনকেই প্রাধান্য দিয়ে বলেছেন,

'অত্রাহ রস ইতি কঃ পদার্থ ? আস্বাদ্যত্বাৎ।'[১] অর্থাৎ, রস কোন পদার্থকে বলা হয় ? যা আস্বাদিত হয় তা-ই 'রস'।

রস শব্দের এই মৌলিক অর্থের উপর ভিত্তি করেই দর্শনশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত এবং আলংকারিকেরা শিল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রে অর্থের বিস্তার ঘটিয়েছেন এবং মূল অর্থকে সমৃদ্ধ ও প্রসারিত করেছেন নব নব ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে। নতুন নতুন ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের ফলে রস আমাদের সমালোচনা সাহিত্যে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করতে পেরেছে।

অধ্যাপক রাধাগোবিন্দ নাথ গোড়ার অর্থ উল্লেখ করে বলেছেন, 'রস শব্দের দুইটি অর্থ— আস্বাদ্য বস্তু এবং রস আস্বাদক বা রসিক। রস শব্দের একরকম সাধারণ অর্থে (রস্যতে আস্বাদ্যতে ইতি রসঃ— এই অর্থে) আস্বাদ্য বস্তুমাত্রকে রস বলিলেও যে আস্বাদ্য বস্তুর আস্বাদনে চমৎকারিত্ব জন্মে তাহাকেই রস-শাস্ত্রে রস বলা হয়। অননুভূতপূর্ব বস্তুর অনুভবে, অনাস্বাদিতপূর্ব বস্তুর আস্বাদনে, চিত্তের স্ফারতা জন্মে, তাহাকেই বলা হয় চমৎকৃতি। এই চমৎকৃতিই হইতেছে রসের সার যা প্রাণ-বস্তু। এই চমৎকৃতি না থাকিলে কোনও আস্বাদ্য বস্তুকেই রস বলা হয় না।'[২]

আনন্দ বা সুখই প্রকৃতপক্ষে আস্বাদ্য বস্তু। 'চমৎকারি সুখং রস।' (অলংকারকৌস্তুভ ৬।৫।৫) অর্থাৎ, আনন্দ বা সুখ যখন চমৎকারিত্ব লাভ করে তখন তা রসে পরিণত হয়।

ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত রস ও কাব্যের স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে লিখেছেন, 'রস শব্দের একটি সাধারণ আর-একটি পারিভাষিক অর্থ আছে। সাধারণ অর্থে রস শব্দে স্বাদ, পারিভাষিক অর্থে রস শব্দে শৃঙ্গার, হাস্য, করুণা প্রভৃতি চিত্তবৃত্তি বুঝায়।'[৩]

অন্যত্র তিনি বলেছেন, 'আলংকারিকেরা বলেন যে, আমাদের চিত্তের মধ্যে কয়েকটি ভাব বা emotions অন্তরের গূঢ় প্রদেশ দিয়া প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে (যেমন রতি, হাস, করুণ ইত্যাদি)।···যখন লৌকিক কারণে ঐ সমস্ত ভাব উৎপন্ন না হইয়া কাব্য বা নাট্যশিল্পের দ্বারা উহা অভিব্যক্ত হয়, তখন ঐগুলিকে রস কহে। রস অর্থে সাধারণ emotion বুঝায় না। শিল্পের দ্বারা অভিব্যক্ত emotion বা ভাবকেই রস কহে।'[৪]

রসের অন্য একটি ব্যাখ্যায় ডঃ দাশগুপ্তের বক্তব্য স্পষ্টতর হয়েছে : 'সংক্ষেপে বলা যায় রস এক প্রকার আনন্দময় মানসিক অবস্থা মাত্র। কাব্যপাঠ, সহৃদয় লোকের মনে কাব্যের অনুরূপ ভাব সঞ্চারিত করিয়া তাঁহাকে এমন এক নৈর্ব্যক্তিক ও আদর্শ জগতে লইয়া যায় যে, তিনি তখন তদ্‌গত হইয়া পড়েন ; ফলে কাব্যের ভাবানুভূতির সহিত তাঁহার একাত্মতা সৃষ্টি হয় অথবা নাটক ইত্যাদির নায়ক নায়িকার মধ্যে তাঁহার আত্মবিলোপ ঘটে। এই আত্মবিলুপ্তির মধ্য দিয়া তিনি যে নির্মল আনন্দময় মানসিক অবস্থায় উপনীত হন, সেই অবস্থাকে রস বলে।'[৫]

বৈষ্ণব রসশাস্ত্রজ্ঞ খগেন্দ্রনাথ মিত্র সরল ভাষায় রসের মূল কথাটি বুঝিয়ে বলেছেন।

তিনি লিখেছেন : 'রস বলিতে আমরা সাধারণত বুঝি আনন্দ ; জড় জগতের রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শের মধ্যে দ্বিতীয়টি আমরা জিহ্বার দ্বারা আস্বাদন করিতে পারি। এইজন্য ইহার এক নাম রসনা। কটু তিক্ত কষায় লবণ অম্ল মধুর এই ছয়টি রসনেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য রস। আবার যাহা মনের আস্বাদ্য তাহাও রস নামে পরিচিত। কোনও বস্তু দর্শন করিলে বা কোনও চিন্তা চিত্তে উদিত হইলে যে অনির্বচনীয় আনন্দ অন্তঃকরণে অনুভূত হয়, তাহাকেও রস বলা হয়। কাব্যপাঠে বা অভিনয়-দর্শনেও এইরূপ আনন্দ মনোমধ্যে উদিত হয়। সেইজন্য অলংকারশাস্ত্রে নয় প্রকার রসের উল্লেখ আছে···।'[৬]

ডঃ সুধীরকুমার দাশগুপ্ত রসের এক সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা দিয়েছেন। সেই সংজ্ঞাটি হল এই : 'শব্দার্থজাত ভাব-তন্ময় চিত্তে আনন্দ-স্বরূপের প্রকাশই রস।'[৭] ডঃ দাশগুপ্তের সংজ্ঞা অনুসারে রস কেবলমাত্র শব্দার্থের আশ্রয়ে নাট্য বা কাব্য প্রভৃতিতে নিষ্পন্ন হতে পারে। কারণ তাঁর মতে সংগীত ও সুকুমার কলায় রসশাস্ত্রের প্রয়োগ লাক্ষণিক মাত্র।

এই প্রসঙ্গে দার্শনিকপ্রবর কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের সংজ্ঞা প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে রসের মোটামুটি দুটি অর্থ : 'এক, রস হল একটা সারাৎসার, যাকে বলে নির্যাস বা এসেন্স, অর্থাৎ কিনা একটা নির্যাসিত সত্ত্ব। দুই, রস হল একটা অনুভবের বিষয়, একটা আস্বাদ্য জিনিস। নন্দনতত্ত্বে এই দু'টো অর্থই রস কথাটার মধ্যে একসঙ্গে মিশে আছে। এইরকম মিশ্রণের ফলে রস মানে দাঁড়িয়েছে অনুভূতির সারাৎসার—অনুভূতি—নির্যাস।'[৮]

অনুভূতির প্রাধান্য স্বীকার করেছেন রবীন্দ্রনাথও। সাহিত্যতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, 'আমাদের অলংকারশাস্ত্রে বলেছে, বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্। সৌন্দর্যের রস আছে, কিন্তু একথা বলা চলে না যে, সব রসেরই সৌন্দর্য আছে। সৌন্দর্যরসের সঙ্গে অন্য সকল রসেরই মিল হচ্ছে ঐখানে, যেখানে সে আমাদের অনুভূতির সামগ্রী। অনুভূতির বাইরে রসের কোনো অর্থই নেই। রস মাত্রই তথ্যকে অধিকার করে তাকে অনির্বচনীয় ভাবে অতিক্রম করে। রসপদার্থ বস্তুর অতীত এমন একটি ঐক্যবোধ যা আমাদের চৈতন্যে মিলিত হতে বিলম্ব করে না। এখানে তার প্রকাশ আমার প্রকাশ একই কথা।'[৯]

এইসব সংজ্ঞায় রসের স্বরূপকে যথাসাধ্য স্পষ্ট করে তুললেও সম্পূর্ণরূপে তার রহস্য উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব হয়নি। কেননা, রসের উৎপত্তি হয় মনের গভীর গোপন অন্ধকার গহ্বরে। অতুলচন্দ্র গুপ্ত এই প্রসঙ্গে বলেছেন, 'কাব্যরসের আধার কাব্যও নয়, কবিও নয়— সহৃদয় কাব্যপাঠকের মন।'[১০] সহৃদয় সামাজিকের আস্বাদনের প্রকৃতির উপরেই রসের প্রকৃতিও নির্ভর করে। আস্বাদন-ক্রিয়া ব্যক্তির মনের সঙ্গে এমনই অচ্ছেদ্যরূপে যুক্ত যে তাকে বাইরে এনে শব্দের সাহায্যে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা যায় না। রস অনুভবের জিনিস ; তাই সংজ্ঞার বন্ধন সে অনেকটাই এড়িয়ে যায়।

রসের যে-সব ব্যাখ্যা উপরে উদ্ধৃত করা হয়েছে, তাদের মূল ভিত্তি সংস্কৃত আলংকারিকদের বহু শতাব্দী ব্যাপী রস-সম্পর্কিত বিচার-বিশ্লেষণ। ভরতমুনির প্রাথমিক সংজ্ঞা নানা আলংকারিকের বিচারে সংশোধিত, পরিবর্তিত ও নবীকৃত হয়েছে। এঁদের সকলের মিলিত ভাবনার নির্যাস পাই রসের উপরোদ্ধৃত ব্যাখ্যার মধ্যে।

রস সম্বন্ধে সুসম্বদ্ধ আলোচনা সর্বপ্রথম পাওয়া যায় ভরতমুনি-রচিত নাট্যশাস্ত্রে। পণ্ডিতদের মতে খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতকের মধ্যে কোনো এক সময়ে তিনি জীবিত ছিলেন। তাঁর কাল নিরূপণে কিছু অনিশ্চয়তা থাকলেও এটা সুনিশ্চিত যে তাঁর আবির্ভাবের পূর্বেই যথেষ্ট সংখ্যক কাব্য-নাটক প্রভৃতি রচিত হয়েছিল এবং সেই জন্যই রচনারীতি ও অভিনয়রীতি নিয়ে সোৎসাহ আলোচনা সম্ভব হয়েছে।

ভরত নাটক সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে নাট্যরস এবং সংশ্লিষ্ট ভাবগুলির ব্যাখ্যা করেছেন নাট্যশাস্ত্রের ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে। ষোড়শ অধ্যায়ে তিনি বিচার করেছেন অলংকার, দোষ, গুণ, লক্ষণ প্রভৃতি। অলংকারশাস্ত্র সম্বন্ধে একটি সার্বিক ধারণা, তা অসম্পূর্ণ হলেও, এখানেই প্রথম পাওয়া যায়। অবশ্য তাই বলে একথা বলা চলে না যে ভরতই অলংকারশাস্ত্রের প্রবর্তক। তাঁর পূর্বেও যে রসশাস্ত্রের অস্তিত্ব ছিল ডঃ সুশীলকুমার দে তা বলেছেন 'That the Rasa-doctrine was older than Bharata is apparent from Bharata's own citation of several verses in the Arya and the Anustubh metres in support of or in supplement to his own statements, and in one place, he appears to quote two Arya-Verses from a unknown work on Rasa.'[১১]

ভরত অলংকার, গুণ, দোষ লক্ষণ ইত্যাদির আলোচনা করেছেন নাট্যরস সৃষ্টির উপাদান হিসাবে। রসকে প্রাধান্য দিয়ে ভরত বলেছেন, 'ন হি রসাদৃতে কশ্চিদর্থঃ প্রবর্ততে।' [নাট্যশাস্ত্র, ১।২৭৩]। অর্থাৎ, রস ব্যতীত কোনো অর্থেরই প্রবৃত্তি সম্ভব হতে পারে না। অন্যত্র ভরত বলেছেন :

যথা বীজাদ্ ভবেদ্ বৃক্ষো বৃক্ষাৎ পুষ্পং ফলং তথা।
তথা মূলং রসাঃ সর্বে তেভ্যো ভাবা ব্যবস্থিতাঃ॥ ৩।৪২

অর্থাৎ, যেমন বীজ থেকে গাছ, গাছ থেকে ফুল ও ফল হয়, তেমনি রসই সব কিছুর মূল তত্ত্ব, আর সবই বাহ্য। রসই কাব্যের বীজ ও ফল।

এখন প্রশ্ন হল, রসের উৎপত্তি হয় কিভাবে? ভরতমুনি বলেছেন, 'বিভানু-ভাবানুভাব-ব্যভিচারি-সংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তিঃ'। (১।২৭৪) অর্থাৎ, বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের সংযোগে রসের সৃষ্টি হয়। যে কারণে চিত্তের অনুভূতি জাগ্রত হয় তাকে বলা হয় বিভাব। বিভাব দুই প্রকার— আলম্বন ও উদ্দীপন বিভাব।

যাকে আলম্বন বা আশ্রয় করে চিত্তে কোনো ভাবের উদয় হয় তাকে বলে আলম্বন বিভাব। যেমন, দুষ্যন্তের রতিভাবের আলম্বন বিভাব শকুন্তলা। এই চিত্তবৃত্তিকে সংরক্ষণ ও বিবর্ধনে যা সহায়তা করে তা হল উদ্দীপন বিভাব। সাজসজ্জা, সুগন্ধি, সংগীত, বসন্ত ঋতুর পরিবেশ ইত্যাদি রতিভাবের উদ্দীপন বিভাব।

চিত্তবৃত্তির আবেগ শারীরবিক্রিয়ায় বাহিরে যা প্রকাশ পায় তাকে বলে অনুভাব। রতিভাবের অনুভাব হল স্তম্ভ, ঘর্ম, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ প্রভৃতি; তেমনি ক্রন্দন, অশ্রুপাত, মূর্ছা প্রভৃতি শোকভাবের অনুভাব।

ভরত আমাদের চিত্তবৃত্তিগুলিকে দুই প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করেছেন— স্থায়িভাব ও অস্থায়ী বা ব্যভিচারিভাব। সহৃদয় সামাজিক চিত্তে বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারি-ভাবের সংযোগে রসের নিষ্পত্তি হয়। একমাত্র স্থায়িভাবের সঙ্গে উপরোক্ত তিনটি উপাদানের সংযোগ ঘটলেই রস সৃষ্টি হতে পারে।

নাট্যশাস্ত্রকারের মতে রস আট প্রকার:

শৃঙ্গার-হাস্য-করুণা-রৌদ্র-বীর-ভয়ানকাঃ।
বীভৎসাদ্ভুত সংজ্ঞৌ চেত্যষ্টৌ নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ॥ ৬।১৬

অর্থাৎ, নাট্যশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতরা যে আটটি রসকে স্মরণ করেন তারা হল— শৃঙ্গার, হাস, করুণা, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভুত। এই আটটি রসের জন্য আটটি স্থায়িভাব নির্দেশ করেছেন ভরত— রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয় জুগুপ্সা ও বিস্ময়। এছাড়া আছে নির্বেদ, গ্লানি, শংকা, অসূয়া, মদ, শ্রম প্রভৃতি তেত্রিশটি ব্যভিচারী ভাব।

আটটি স্থায়িভাবকে রসসৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেবার কারণ কী? অভিনবগুপ্ত ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, প্রাণীমাত্রের মনেই উপরোক্ত আটটি ভাবের প্রথমাবধি প্রাধান্য থাকে। কিন্তু ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাবের ঐরূপ সর্বদাব্যাপী প্রাধান্য থাকে না। এই সব ভাব সাময়িক জাগ্রত হয়ে স্থায়িভাবসমূহকে পুষ্ট ও প্রবল করে তোলে মাত্র।[১২]

সামাজিকের চিত্তে স্থায়িভাবগুলি সুপ্ত অবস্থায় সততই বিদ্যমান থাকে। কাব্য পাঠ করে, আবৃত্তি শুনে, অভিনয় দেখে সেই সুপ্ত ভাব উদ্দীপ্ত হয়ে সামাজিক চিত্ত আচ্ছন্ন করে। বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাবের সহায়তায় অন্তরশায়ী স্থায়িভাব অভিব্যক্তি লাভ করলেই তা রসরূপ পায়।

এই প্রসঙ্গে ষোড়শ শতকের মধুসূদন সরস্বতীর অভিমত উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন, মানুষের হৃদয় লাক্ষার মতো যা উত্তাপের সংস্পর্শে এলে দ্রবীভূত হয়। কাম, ক্রোধ, ভয় স্নেহ, হর্ষ, শোক প্রভৃতি সেই উত্তাপ— যার সংস্পর্শে এসে আমাদের চিত্ত গলে যায়। এই দ্রবীভূত চিত্তে অনুভূতির (কাম, ক্রোধ ইত্যাদি) বিষয় বা আলম্বন প্রতিবিম্বিত হয়। এই সব প্রতিবিম্বকেই বলা হয় বাসনা, সংস্কার, ভাব ভাবনা ইত্যাদি। চিত্ত ক্রমে কঠিন হয় কিন্তু প্রতিবিম্ব থেকেই যায়। প্রতিবিম্ব কখনো হারিয়ে যায় না। বস্তুবিশেষের এই স্থায়ী প্রতিবিম্বই স্থায়িভাব।

বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের সহযোগে চিত্তে প্রতিবিম্বিত বিষয় পরমানন্দরূপে প্রকাশ পেলে রসনিষ্পত্তি ঘটে।[১৩]

মধুসূদনের এই মতবাদ আধুনিক মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্বের কাছাকাছি। অলংকার-শাস্ত্রে রসপ্রস্থানের প্রবর্তক ভরতমুনি। তিনি কিন্তু নাট্যশাস্ত্রে নাট্যরসেরই ব্যাখ্যান করেছেন। পরবর্তীকালের আলংকারিকেরা নাট্যরসের বিশ্লেষণরীতিকে কাব্যবিচারের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করেছেন। নাট্যশাস্ত্রের অভিনব-ভারতী ভাষ্যে অভিনবগুপ্ত এর সমর্থন করতে গিয়ে বলেছেন, নাট্যরস ও কাব্যরস মূলত অভিন্ন। 'ন নাট্যে এব চ রসাঃ, কাব্যেঽপি...'[১৪] অর্থাৎ, রস শুধু নাটকে নয়, কাব্যেও বিদ্যমান।

অভিনবগুপ্ত ব্যতীত লোল্লট, উদ্ভট, শংকুক, ভট্টনায়ক প্রভৃতি অনেক সাহিত্য-মীমাংসক নাট্যশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করেছেন। ভরতোক্ত রসবাদের বিখ্যাত সূত্র 'বিভাবানুভাব ব্যভিচারিসংযোগাদ্রসনিষ্পত্তিঃ' ভাষ্যকারদের আলোচনা, বিশ্লেষণ ও বিতর্কের প্রধান বিষয়। কিন্তু নবম শতাব্দীতে আনন্দবর্ধন ধ্বনিবাদ প্রতিষ্ঠিত করবার পূর্বে আলংকারিকেরা রসবাদকে উপযুক্ত মর্যাদা দেননি।

ভরতের পরেই যে আলংকারিকদের গ্রন্থ পাওয়া যায় তাঁরা হলেন ভামহ ও দণ্ডী। এঁদের উভয়েরই কাল আনুমানিক সপ্তম শতাব্দী। ভরত ও ভামহের মধ্যবর্তীকালের অলংকারশাস্ত্রের ধারাটি লুপ্ত হয়ে গেছে। পরবর্তী যুগের আলংকারিকদের রচনায় এই অন্ধকার অধ্যায়ে রচিত গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া গেলেও তাঁদের সন্ধান পাওয়া যায় না।

ভামহ অলংকারপ্রস্থানের প্রবর্তক। সুতরাং স্বরচিত অলংকারগ্রন্থ কাব্যালংকারে স্বভাবতই কাব্যকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করবার জন্য যে অলংকারের ব্যবহার অপরিহার্য সে কথাই বলেছেন। অলংকারে সজ্জিত না হলে নারীর রূপ যেমন উদ্ভাসিত হয় না তেমনি নিরলংকার কাব্যের দীপ্তি থাকাও সম্ভব নয়। ভামহ রসবাদকে স্বীকার বা অস্বীকারের প্রশ্ন তোলেননি। তিনি কাব্যরসের উল্লেখ করেছেন (৫।৩)। মহাকাব্যে যে সকল রসই থাকা উচিত তা-ও বলেছেন [১।২১]। ভামহ রসের কথা সবচেয়ে স্পষ্ট করে বলেছেন এই সংজ্ঞাটিতে: 'রসবদ্ দর্শিতস্পষ্টশৃঙ্গারাদিরসম্।'[১৫] ভরতের মতে রসনিষ্পত্তি হয় বিভাব, অনুভাব প্রভৃতির দ্বারা। ভামহ রসনিষ্পত্তির এই পর্যায়গুলির কথা উল্লেখও করেননি।[১৬] তিনি অলংকারকেই প্রাধান্য দিয়েছেন, কাব্যে রসের অস্তিত্ব থাকলেও তা অলংকারকে অতিক্রম করতে পারে না। রস অলংকারকে শোভন ও উজ্জ্বল করে তুলতে সহায়তা করে মাত্র।

ভামহের সমসাময়িক রীতিপ্রস্থানের আলংকারিক দণ্ডী কাব্যে রসের স্থান আর একটু স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন এবং রসকে অধিকতর মর্যাদা দিয়েছেন। দণ্ডীর মতে কাব্যের একটি অন্যতম গুণ মাধুর্য এবং রস তার বিশিষ্ট উপাদান।[১৭] দণ্ডী যে রসবাদের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন তা ভরতোক্ত অষ্টরসের উল্লেখ থেকে উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু দণ্ডী রসকে বিশেষ পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার করেন নি, এবং অলংকারের অধিক প্রাধান্য নির্দেশ করতেও পারেননি।

এর পরে অষ্টম-নবম শতকের রীতি প্রস্থানের আলংকারিক বামনাচার্য কাব্যের স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করেছেন। কোন বৈশিষ্ট্যের জন্য কতকগুলি শব্দ ও বাক্যের সমষ্টি কাব্য হয়ে ওঠে, এই প্রশ্ন আলোচনা করে বামন সিদ্ধান্ত করলেন, 'রীতিরাত্মা কাব্যস্য।' (কাব্যালংকার সূত্রবৃত্তি, ১।২।৬)। শব্দবিন্যাসের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পদ্ধতিকেই বলা হয় রীতি। এই বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে দশটি গুণের উপর। অন্যতম গুণ কান্তির সঙ্গে রসের আছে অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ। বামনাচার্য তাই বলেছেন, 'দীপ্তরসত্বং কান্তিঃ।' (কাব্যালংকার সূত্রবৃত্তি, ৩।২।১৫) অর্থাৎ, কান্তিগুণে রস উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হয়।

অলংকারপ্রস্থানের আর-একজন আলংকারিক উদ্ভট। তিনি অলংকারের প্রাধান্য স্বীকার করলেও কাব্যে রসের বিশিষ্ট স্থান সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। পূর্বস্বীকৃত কাব্যের শ্রেণীসমূহের সঙ্গে তিনি দুটি নতুন বিভাগ যোগ করেন— ভাবকাব্য ও রসবৎকাব্য। রতি, ভয়, গর্ব, চিন্তা প্রভৃতি ভাব অবলম্বন করে যে কাব্য রচিত হয় তাই ভাবকাব্য। ভাবের সঙ্গে রসের সংযোগ ঘটলে রসবৎ কাব্যের সৃষ্টি হয়।

উদ্ভট ভাব ও অনুভাব শব্দ দুটির পারিভাষিক অর্থের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং তাদের ব্যবহারও করেছেন। তা ছাড়া তিনি ভরত-ব্যাখ্যাত অষ্টরস সম্বন্ধেও অবহিত ছিলেন। বোধ হয় তিনিই প্রথম অষ্টরসের অতিরিক্ত শান্তরসকে স্বীকৃতি দেন।[১৮]

খ্রীস্টীয় নবম শতাব্দীর অলংকারপ্রস্থানের আলংকারিক রুদ্রট রস সম্বন্ধে সর্বাধিক আলোচনা করলেও শেষ পর্যন্ত কাব্যে অলংকারের প্রাধান্য প্রতিপাদনেরই প্রয়াস করেছেন। ভরতোক্ত আটটি নাট্যরসের সঙ্গে শান্ত ও প্রেয়ঃ এই দুটি রস যুক্ত করেছেন রুদ্রট। কাব্যে রসের বৈচিত্র্য না থাকলে তা শাস্ত্রের মতোই শুষ্ক হবে, পাঠক কাব্যপাঠে আকৃষ্ট হবে না— রুদ্রটের মতে রসের মূল্য এই কারণেই। তিনি কাব্যের দুই উপাদান— শব্দ ও অর্থ, এবং তাদের দীপ্তি বর্ধনকারী অলংকারের কথা বলেছেন বিস্তারিতভাবে। অর্থ-শব্দ-অলংকারের সঙ্গে রসের কি সম্বন্ধ তা রুদ্রট তাঁর গ্রন্থ কাব্যালংকারে আলোচনা করেননি। এজন্য কেউ কেউ মনে করেন রস সম্পর্কিত বক্তব্যগুলি হয়ত প্রক্ষিপ্ত।[১৯]

উপরে বিভিন্ন সংপ্রদায়ের মুখ্য আলংকারিকেরা রস সম্পর্কে যা বলেছেন তার শুধু ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য বিষয়ে তাঁদের দান বর্তমান প্রসঙ্গে বিচার্য নয়।

ভরত থেকে রুদ্রট পর্যন্ত অলংকারশাস্ত্রের প্রাচীন যুগ। ভরতের পরে অনেকেই রসের উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তাঁরা কাব্যের বহিরঙ্গের শোভা বিচারের উপরেই বিশেষ প্রাধান্য দিয়েছেন। আনন্দবর্ধনের ধ্বন্যালোক রচিত হবার পর, বিশেষ করে অভিনবগুপ্তের লোচন টীকা প্রচারিত হবার পর থেকে, অলংকারশাস্ত্রে নবযুগের সূচনা হল এবং প্রতিষ্ঠিত হল রসবাদের প্রাধান্য।

ধ্বনিপ্রস্থানের মুখ্য প্রবক্তা আনন্দবর্ধন খ্রীস্টীয় নবম শতকের মধ্যভাগে

কাশ্মীরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বাহ্যত তিনি ধ্বনিবাদী হলেও প্রকৃতপক্ষে কাব্যে রসের প্রাধান্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'ধ্বন্যালোকে'। ধ্বন্যালোকের দুটি বিভাগ— কারিকা ও বৃত্তি। কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে আনন্দবর্ধন শুধু বৃত্তির অংশ রচনা করেছেন।[২০] কারিকা রচনা করেছেন তাঁর পূর্ববর্তী অন্য কোনো আলংকারিক। আবার সংস্কৃত আলংকারিকেরা এবং কোনো কোনো আধুনিক পণ্ডিত এই মতবাদ খণ্ডন করে দেখিয়েছেন যে কারিকা ও বৃত্তি উভয়ই আনন্দবর্ধনের রচনা। এই বিতর্ক নিয়ে এখানে আলোচনা করবার প্রয়োজন নেই। শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, আনন্দবর্ধন কেবলমাত্র বৃত্তিকার হলেও তাঁর কৃতিত্ব হ্রাস পায় না। কেন না, সূত্রাকারে রচিত কারিকার মর্মার্থ বৃত্তিতে যদি এমন প্রাঞ্জল করে ব্যাখ্যা করা না হত তাহলে অলংকার শাস্ত্রে ধ্বনিবাদের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হত কিনা সন্দেহ।[২১]

আনন্দবর্ধন সাহিত্যের উৎকর্ষ-অপকর্ষ বিচারের জন্য এক সুসংবদ্ধ এবং যুক্তিবাদী পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। তিনি নিজে ধ্বনিপ্রস্থানের আলংকারিক হলেও তাঁর বিচারধারায় কোনো সংকীর্ণতা নেই। পূর্ববর্তী আলংকারিকেরা অলংকারপ্রস্থান রীতিপ্রস্থান প্রভৃতি সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন কাব্য ও নাটকের দোষ-গুণ। আনন্দবর্ধন সমালোচনারীতিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এক বৃহত্তর পট-ভূমিকায়। তাই উত্তরসূরিদের নিকট তাঁর মতবাদ সহজেই গ্রহণযোগ্য হয়েছে। নানা প্রস্থানের দ্বন্দ্বে সাহিত্য মীমাংসকরা যখন বিভ্রান্ত তখন অনন্দবর্ধন তাঁদের দিলেন এক সুনির্দিষ্ট নির্ভরযোগ্য মানদণ্ড। পণ্ডিত জগন্নাথ তাঁর রসগঙ্গাধরে যথার্থই বলেছেন, আলংকারিকেরা সাহিত্য বিচারে কোন রীতি অনুসরণ করবেন তার নিষ্পত্তি করে দিয়েছে ধ্বন্যালোক।

প্রাসাদ নির্মাণের মূল উপাদান যেমন ইট তেমনি শব্দ হল কাব্যদেহ গঠনের মৌলিক উপাদান। শব্দের ত্রিবিধ শক্তি (অভিধা, লক্ষণা ও তাৎপর্য) পূর্ববর্তী কোনো কোনো আলংকারিক উল্লেখ করেছেন। আনন্দবর্ধন দেখিয়েছেন এই তিন শক্তির অতিরিক্ত আর-একটি শক্তি আছে যাকে বলা যায় শব্দশক্তি। শব্দের বাচ্যার্থ বা অভিধেয়ার্থ দীর্ঘকাল ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে বিবর্ণ হয়ে যায়। চিত্রকল্প রচনায় কিংবা অর্থবিস্তারে পাঠকের মনে চমৎকৃতি সৃষ্টি করবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। অথচ কাব্যরস বা নাট্যরস এই চমৎকৃতি ব্যতীত ঘনীভূত হতে পারে না। বহু ব্যবহারে বাচ্যার্থ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে এমন শব্দ কবি তাঁর রচনায় যত কৌশলেই বিন্যস্ত করুন না কেন তা পাঠককে আকৃষ্ট করতে অক্ষম। পুরাতন শব্দে যিনি নতুন ব্যঞ্জনা বা Suggestion-এর সৃষ্টি করতে পারেন তিনিই সার্থক শিল্পী। যেমন পুরনো গাছ বসন্তকালে নতুন রূপে বিকশিত হয় তেমনি কাব্যে রসপরিগ্রহ করে পুরনো বাচ্যার্থ নবরূপে প্রতিভাত হয়:

> দৃষ্ট পূর্বা অপি হ্যর্থাঃ কাব্যে রসপরিগ্রহাৎ।
> সর্বে নবা ইবাভান্তি মধুমাস ইব দ্রুমাঃ ॥[২২]

পুরনো বাচ্যার্থকে নবরূপে উদ্ভাসিত করা ব্যঞ্জনা দ্বারাই সম্ভব। আনন্দবর্ধন

বলেছেন, মহাকবিদের রচনার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ব্যঞ্জনা বা প্রতীয়মানার্থের প্রয়োগ। রমণীর লাবণ্য যেমন তার পরিচিত অংগসৌষ্ঠব থেকে আলাদাভাবে চোখে পড়ে তেমনি কাব্যে প্রতীয়মানার্থ বাচ্যার্থের অতীত এক ইংগিত—

প্রতীয়মানং পুনরণ্যদেব বস্ত্বস্তি বাণীষু মহাকবীণাম্।
যত্তৎপ্রসিদ্ধাবয়বাতিরিক্তং বিভাতি লাবণ্যমিবাঙ্গনাসু ॥[২৩]

শব্দের ত্রিবিধ শক্তির অতীত যে শব্দশক্তি, যার সাহায্যে কবি ইংগিতময় চমৎকৃতি সৃষ্টি করেন, তাকেই আনন্দবর্ধন বলেছেন ধ্বনি, ব্যঞ্জনা বা প্রত্যায়ন ; এবং ধ্বনির দ্বারা শব্দার্থের যে দ্যোতনা ইংগিতে প্রকাশ পায় তা-ই হল ব্যংগার্থ। আনন্দবর্ধন বলেছেন :

যত্রার্থঃ শব্দো বা তমর্থম্ উপসর্জনীকৃত-স্বার্থৌ।
ব্যংগক্তঃ কাব্যবিশেষঃ স ধ্বনিরিতি সূরিভিঃ কথিয়তঃ ॥[২৪]

অর্থাৎ, যেখানে কাব্যের অর্থ ও শব্দ স্ব স্ব প্রাধান্য ত্যাগ করে ব্যঞ্জিত অর্থকে প্রকাশ করে, বিজ্ঞেরা তাকেই ধ্বনি বলেছেন।

এই ধ্বনি তিন প্রকার— বস্তুধ্বনি, অলংকারধ্বনি ও রসধ্বনি। এদের মধ্যে রসধ্বনিই শ্রেষ্ঠ। বস্তু ও অলংকারধ্বনি কখনো কখনো অভিধাশক্তির প্রকাশ হতে পারে, কিন্তু রসধ্বনি সর্বদাই ব্যংগার্থ-সঞ্জাত। রসধ্বনিই সাধারণ শব্দসমষ্টিকে কাব্যের অলৌকিক জগতে নিয়ে যায়। তাই ধ্বনিকার বলেছেন, 'কাব্যস্যাত্মাধ্বনিরিতি ...।'[২৫] যেহেতু কাব্যের আত্মা ধ্বনি এবং ত্রিবিধ ধ্বনির মধ্যে রসধ্বনিই শ্রেষ্ঠ, সেই হেতু কাব্যের প্রাণ যে রস, ধ্বনিবাদীর এই প্রতীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সরাসরি না হলেও, ধ্বনিবাদ প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে আনন্দবর্ধন প্রকৃতপক্ষে রসবাদকেই মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। পরবর্তীকালেও এই মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থেকেছে।

নাটকে রসের প্রাধান্য পূর্বেই স্বীকৃতি পেয়েছিল। কাব্যে রসকে প্রাধান্য দিলেন আনন্দবর্ধন। তিনি বললেন, রসই কাব্যের প্রাণ। ভামহ, দণ্ডী, উদ্ভট প্রভৃতি পূর্বসূরীরা যা অলংকার্য তাকেই অলংকার বলে কল্পনা করেছেন। এই ভ্রমাত্মক ধারণার ফলে কাব্যবিচারে তাঁরা শব্দার্থালংকারকে (উপমা, অনুপ্রাস ইত্যাদি) প্রাধান্য দিয়েছেন। আনন্দবর্ধন দেখালেন কাব্যদেহে রসরূপ প্রাণ না থাকলে শুধু অলংকার প্রয়োগে উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায় না। বরং মৃত রমণীর দেহ অলংকৃত করলে যেমন বীভৎস দেখায় তেমনি রসবিবর্জিত অলংকারভূষিত কাব্য পাঠকের মনে বিরূপতার সৃষ্টি করে। অলংকার কাব্যদেহের বাহ্যিক উপকরণ মাত্র। কাব্যের প্রাণভূত রসের বিকাশে সহায়তা করাতেই অলংকারের একমাত্র সার্থকতা। আনন্দবর্ধন প্রথম দৃঢ় প্রত্যয়ের সংগে ঘোষণা করলেন যে, অলংকারবিহীন কাব্যও সার্থক হতে পারে যদি থাকে রসপ্রাণতা।

ধ্বন্যালোকের টীকাকার অভিনবগুপ্ত (দশম শতকের শেষ পাদ), রসের প্রাধান্য স্পষ্টতররূপে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর 'লোচন' টীকা ধ্বন্যালোক সমাদৃত হবার পথ প্রশস্ত করেছে। ত্রিবিধ ধ্বনির মধ্যে রসধ্বনিই যে শ্রেষ্ঠ তা অভিনবগুপ্ত যত জোরের

সঙ্গে বলেছেন আনন্দবর্ধন তেমন করে বলেননি। তিনি রসকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে বলেছেন : 'রসেনৈব-সর্ব্বং জীবতি কাব্যম্।' আরো বলেছেন, 'ন হি তচ্ছূন্যং কাব্যং কিঞ্চিদস্তি।' (ধ্বন্যালোক টীকা ২।৩) অর্থাৎ, রসশূন্য কোনো রচনা কাব্য হতে পারে না। আনন্দবর্ধন সূত্রাকারে যা বলেছেন, অভিনবগুপ্ত তা ব্যাখ্যা করে প্রচার করায় রসবাদ প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়েছে।

অভিনবগুপ্ত ভরতের নাট্যশাস্ত্রের অভিনব-ভারতী নামক এক টীকা রচনা করেছেন। ভরতের রসসূত্রের এক মৌলিক ব্যাখ্যা তিনি করেছেন, যা অভিব্যক্তিবাদ নামে পরিচিত। তাঁর মতে রসের সৃষ্টি আকস্মিক নয়; বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হয়ে রস পূর্ণতা লাভ করে। ভাব, বিভাব ইত্যাদির বিবর্তনের এই ধারণাই অভিব্যক্তিবাদের মূল কথা।

অভিনবগুপ্তের পরে রসবাদ সম্বন্ধে কোনো মৌলিক আলোচনা পাওয়া যায় না। মম্মটভট্ট (১১শ-১২শ শতক), বিশ্বনাথ কবিরাজ (১৪শ শতক) ও জগন্নাথ (১৭শ শতক) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য আলংকারিকেরা ধ্বনিবাদ তথা রসবাদের সমর্থক ছিলেন। সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ ধ্বনিবাদের আড়াল থেকে নয়, সরাসরি রসকে কাব্যের আত্মা বলে ঘোষণা করেছেন : 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্।'[২৬]

এই প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। অগ্নিপুরাণে অলংকারশাস্ত্র নিয়ে কিছু আলোচনা আছে। অগ্নিপুরাণ রচনার কাল আনুমানিক খ্রীস্টীয় নবম শতাব্দী, অর্থাৎ আনন্দবর্ধনের সমসাময়িক। অগ্নিপুরাণেও পাই, রসই কাব্যের আত্মা :

'বাগ্‌বৈদগ্ধ্যপ্রধানেঽপি রস এবাত্র জীবিতম্।' (অগ্নিপুরাণ) ৩৩৬।৩৩

গৌড়ীয় ভক্তিরস

যে রস সম্বন্ধে আলোচনা করা হল তা প্রাকৃত বা লৌকিক, পৃথিবীর নরনারীর প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতিকে উপজীব্য করে এই রসের উদ্ভব ও বিকাশ। দুষ্যন্ত-শকুন্তলার কাহিনী বয়ন করে কালিদাস তাঁর নাটকে যে রস সৃষ্টি করেছেন তা প্রাকৃত।

লৌকিক সাহিত্যে যেমন রস আছে তেমনি আছে ভক্তিবাদী সাহিত্যেও। সগুণ ভগবান যখন ভক্তের নিকট সর্বোত্তম নররূপে আবির্ভূত হন তখন উভয়ের সম্পর্ক কমবেশি রসাপ্লুত হয়। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি ধর্মসম্প্রদায় আরাধ্য দেবতাকে 'পার্সোন্যাল গড' বা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'অন্তরের ধন' হিসাবে আরাধনা করেন বলে ভক্তের হৃদয়ে স্বতঃই আবেগ সঞ্চারিত হয়। ঈশ্বর-কেন্দ্রিক আবেগের গভীরতা ধর্মীয় সাহিত্যকে রসসিক্ত করে।

ধর্মীয় সাহিত্যের রস অলৌকিক, কেননা ঈশ্বরাসক্তি এই রসের উৎস। বৈষ্ণবের ধর্মসাধনায় ঈশ্বরানুরক্তির তীব্রতা বোধ হয় সবচেয়ে বেশি। বিপুল পরিমাণ বৈষ্ণব-সাহিত্যে ভগবদ্-প্রেমের যে বিচিত্র প্রকাশ দেখা যায় অন্য সম্প্রদায়ের সাহিত্যে তা নেই।

অবশ্য সকল শ্রেণীর বিষ্ণু-ভক্তের মধ্যেই প্রবল আবেগময় ঈশ্বরাসক্তির প্রকাশ নেই, যেমন, রামানুজ ও মধ্ব ব্রহ্মকে বিষ্ণুর সমার্থক মনে করলেও তাঁরা মূলত জ্ঞানবাদী, তাই এই দুই গোষ্ঠীর বৈষ্ণবদের সাধনায় আবেগাপ্লুত ভক্তির অবকাশ ছিল কম। অপরপক্ষে দাক্ষিণাত্যের আড়বার, উত্তর ভারতের বল্লভাচার্য সম্প্রদায় এবং চৈতন্য ও তাঁর অনুগামীদের সাধনায় আবেগময় ভক্তির প্রাধান্য। এই আবেগময়তার বৈচিত্র্য ও গভীরতা বাংলা বৈষ্ণব-সাহিত্যের মূল বৈশিষ্ট্য। এর পূর্ণ বিকাশ চৈতন্যের দিব্যোন্মাদে। রূপ-সনাতন-জীব গোস্বামীদের মতো ভক্ত তাত্ত্বিক পণ্ডিতরা বৈষ্ণবীয় রসের অলংকারশাস্ত্র বিধিবদ্ধ করেছিলেন। স্বভাবতই রসশাস্ত্র প্রণয়নে বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্য তাঁদের বিশেষরূপে প্রভাবান্বিত করেছে। এই জন্যই বৈষ্ণবীয় রসের আলোচনায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য প্রাধান্য লাভ করেছে। ভক্তিধর্ম ও তার বিবর্তন সম্পর্কে প্রথম অধ্যায়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। বহু ধর্মসম্প্রদায় ভক্তিবাদকে ঈশ্বর আরাধনার অন্যতম পন্থা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় শুধু স্বীকৃতি দিয়ে সন্তুষ্ট নয়; ভক্তিকে রসের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন বাঙালী বৈষ্ণব আচার্যেরা। তাঁদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভক্তিরসই একমাত্র রস। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনার মূল বৈশিষ্ট্য হল এই।

কিন্তু রস হিসাবে ভক্তির প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব একমাত্র গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রাপ্য, এ কথা বলা চলে না। কারণ বহু শতাব্দী যাবৎ ভক্তির সঙ্গে রসের একটা অদৃশ্য যোগসূত্র উপলব্ধি করা যায়। ঔপনিষদিক সাহিত্যে ভক্তির বিক্ষিপ্ত উল্লেখ লক্ষ্য করেই হয়ত রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'ব্রহ্মবিদ্যার আনুষঙ্গিক রূপেই ভারতবর্ষে প্রেম-ভক্তির ধর্ম আরম্ভ হয়।'[২৭] 'প্রেম-ভক্তি' কথাটির মধ্যে রসের ইঙ্গিত আছে। যেখানে প্রেম সেখানেই আছে রস।

অবশ্য পৌরাণিক যুগের পূর্বে জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন কোনো নামধারী অবতার বা দেবতাকে কেন্দ্র করে হয়নি। ঔপনিষদিক ভক্তি মূলত ঈশ্বর বা পরমাত্মার জন্য ভক্তের নির্বিশেষ ব্যাকুলতা, সুতরাং নির্গুণ ভক্তি। ভক্তির এই নির্গুণস্বরূপতা প্রথম অবসিত হয় ভগবদ্‌গীতায়, যেখানে বিশেষ দেবতা এবং বিশেষ ভক্ত প্রাধান্য লাভ করে ভক্তিকে সগুণাত্মক করে তুলেছে।

রামায়ণ, মহাভারত এবং অন্যান্য বহু কাব্য ও নাটকে ভক্তির কথা আছে এবং তার পশ্চাদবর্তী রসের ফল্গুধারাটি সহজেই অনুভব করতে পারা যায়। কিন্তু ভাগবতপুরাণই রসযুক্ত ভক্তিতত্ত্বের সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করেছে। পরবর্তীকালের সকল ভক্তিবাদী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ই ভাগবতকে তাঁদের মুখ্য শাস্ত্রগ্রন্থ হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

অনুমান করা হয়, ভাগবতের রচনাকাল খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ থেকে নবম শতকের মধ্যে। দশম কিংবা একাদশ শতকে অভিনবগুপ্ত ভক্তিরসের উল্লেখ করলেও তাকে পৃথক মর্যাদা দিতে পারেননি; ভক্তিরস শান্তরসেরই অন্তর্ভুক্ত বলে তিনি মনে করেছেন (নাট্যশাস্ত্র, ৬।১০৯, ভাষ্য), অথচ অন্যত্র তিনিই বলেছেন, রসের আস্বাদ পরব্রহ্ম

আস্বাদের মতো— 'পরব্রহ্মাস্বাদ সচিবঃ।'[২৮] এই রস গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মতে ভক্তিরস। রস বা আনন্দের মধ্য দিয়ে তাঁরা ভগবানকে পাবার জন্য সাধনা করেন। সুতরাং পরোক্ষে অভিনবগুপ্ত ভক্তিরসকে মর্যাদা দিয়েছেন বলা যায়।

মুগ্ধবোধ রচয়িতা বৈয়াকরণ বোপদেব (ত্রয়োদশ শতক) প্রথম সুস্পষ্টরূপে ভক্তিরসের প্রাধান্য স্বীকার করেন। তাঁর সংকলিত ভাগবতমূলক গ্রন্থ 'মুক্তাফলের' একাদশ অধ্যায়ে ভক্তি ও ভক্ত সম্বন্ধে আলোচনা আছে। বোপদেবের মতে যাঁর হৃদয়ে ভক্তিরস জাগ্রত হয়েছে তিনিই ভক্ত। হাস্য, করুণ, শৃঙ্গার, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, শান্ত ও অদ্ভুত— এই নয়টি রূপে ভক্তিরস উপলব্ধি করা যায়; সুতরাং ভক্ত নয় প্রকার। ভাগবতের নির্দেশ— 'তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ'[২৯] অনুসরণ করে বোপদেবও বলেছেন, যে-কোনো উপায়ে কৃষ্ণের প্রতি চিত্ত নিবিষ্ট করাই ভক্তি। হাস্য, শৃঙ্গার প্রভৃতি দ্বারা এই আকর্ষণ সৃষ্টি হতে পারে। ভক্তিরসই মূল রস, শৃঙ্গার প্রভৃতি এরই ভিন্ন প্রকাশ মাত্র।

বোপদেবের ভক্তিবাদ মূলত ভাগবতানুসারী, তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মতো ভক্তিরসকে লৌকিক সম্পর্কচ্যুত করে অলৌকিক স্তরে নিয়ে যেতে পারেননি। তবে একথা অনস্বীকার্য যে বোপদেব ভক্তিকে প্রতিষ্ঠার পথে অনেক দূর এগিয়ে দেওয়ায় বৈষ্ণব আচার্যদের কাজ অনেকটা সহজ হয়েছিল।

যিনি অবাঙ্‌মনসগোচর, অলৌকিক এবং অতীন্দ্রিয়, সেই ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হবার আকাঙ্ক্ষায় এই পৃথিবীর কোনো ভক্তের পক্ষে আত্মহারা হওয়া সম্ভব, এ কথা প্রাচীন আলংকারিকেরা সম্যক উপলব্ধি করতে পারেননি। লৌকিক জগতে এই ব্যাকুলতার শ্রেষ্ঠ প্রতীক দয়িতের সঙ্গে দয়িতার মিলনাকাঙ্ক্ষার উন্মাদনা। কিন্তু প্রাকৃতজনের মনে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যাতীত অপ্রাকৃত পরমব্রহ্মের জন্য তেমন মিলনাকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হওয়া কি সম্ভব? চৈতন্যদেবের অভূতপূর্ব দিব্যোন্মাদ যাঁরা প্রত্যক্ষ করলেন তাঁদের স্বীকার করতে দ্বিধা রইলো না যে, গভীর ঈশ্বরাসক্তি ভক্তের হৃদয় এমন এক অলৌকিক আনন্দরসে অভিভূত করতে সক্ষম যা পৃথিবীর প্রাকৃত দয়িত-দয়িতার মিলনাকাঙ্ক্ষাকে সহজেই অতিক্রম করতে পারে। ঈশ্বর-প্রণয়িনীর রূপ মূর্ত হয়ে উঠেছিল চৈতন্যের জীবনে। তাঁর রচিত 'শিক্ষাষ্টকের' চতুর্থ পঙ্‌ক্তিতে এই আত্মনিবেদন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে :

> ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
> কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
> মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
> ভবতাদ্ভক্তির হৈতুকী ত্বয়ি॥

অর্থাৎ, হে জগদীশ্বর, ধন চাই না, জন চাই না, কামিনী চাই না, চাই না কবিত্ব অথবা পাণ্ডিত্য; হে ঈশ্বর, তোমাতে যেন জন্মে জন্মে আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে।

চৈতন্যদেবের লীলা যাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন অথবা চৈতন্য পরিমণ্ডলের সংস্পর্শে

আসবার সুযোগ পেয়েছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভক্ত ও গ্রন্থকার সনাতন গোস্বামী (জন্ম পঞ্চদশ শতকের শেষ পাদে, মৃত্যু ১৫৫৮); রূপ গোস্বামী (১৪৮৯-১৫৬৪); জীব গোস্বামী (আনু. ১৫১০-১৬০০); মধুসূদন সরস্বতী (১৫২৫-১৬৩২); পরমানন্দ সেন বা কবি কর্ণপুর (১৫২৫- ?) প্রভৃতি। এঁদের মিলিত সাধনার ফলে বৈষ্ণব রসশাস্ত্র বিশেষ করে ভক্তিরস, প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এই তত্ত্বগত প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন ছিল। পদাবলী সাহিত্যের প্রাণ ভক্তির অনুভূতি। সুতরাং বৈষ্ণব কবিতার উৎকর্ষ তখনই স্বীকৃতি পাবে যখন এই ভক্তি, রস হিসাবে গণ্য হবে। ভক্তির রসপ্রাণতা স্বীকৃতি পেলেই পদাবলী সাহিত্যকে সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের নিরিখে বিচার-বিশ্লেষণ করা সম্ভব। বৈষ্ণব সাহিত্যকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য এই বিচার-বিশ্লেষণ তো আবশ্যকই, তা ছাড়া ভক্তি-সাহিত্যের রীতি অনুযায়ী কবিরা লিখছেন কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখাও ছিল প্রয়োজন। কারণ ভক্ত বৈষ্ণবের দিনচর্যাকে বিধিবন্ধ করবার উদ্যোগ শুরু হয় চৈতন্যের মহাপ্রয়াণের কিছুকাল পরে। বৃন্দাবনের আচার্যেরা এ কাজের প্রধান উদ্যোক্তা। পদাবলী কীর্তন বৈষ্ণবের দিনচর্যার অন্যতম অংগ; অতএব ভক্তিরস প্রচারের কাব্যিক দায়িত্বটা অসংখ্য কবির ব্যক্তিগত রুচি ও প্রবণতার উপর ছেড়ে দেওয়া যায় না। রসশাস্ত্রের বিধান দিয়ে পদাবলীকে নিয়ন্ত্রণ করা তাই আবশ্যক ছিল।

ভক্তিরস সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যাবে মধুসূদন সরস্বতীর 'ভগবদ্-ভক্তিরসায়নে', জীব গোস্বামীর 'প্রীতি-সন্দর্ভে' এবং রূপ গোস্বামীর 'ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু' ও 'উজ্জ্বলনীলমণি'তে। বৈদান্তিক মধুসূদনের জীবনে ঘটেছিল জ্ঞান ও ভক্তির অপূর্ব সংমিশ্রণ। তিনি ভক্তিরসকে শ্রেষ্ঠ রস হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। 'শ্রীমধুসূদন সরস্বতী কিন্তু, ভক্তিরসকেই শ্রেষ্ঠ রস বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।··· ইহার স্থায়িভাব চিত্তের ভগবদ্‌কারকতা। মনের মধ্যে প্রতিবিম্বিত পরমানন্দরূপী যখন ভক্তিরসের স্থায়িভাব, তখন ভক্তিরস যে পরমানন্দস্বরূপ হইবে ইহাতে আর বিস্ময়ের কারণ কি? পক্ষান্তরে পরমানন্দস্বরূপ বলিয়াই ভক্তিরস রসসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।'[৩০]

ষট্‌সন্দর্ভের শেষ খণ্ড 'প্রীতিসন্দর্ভে' জীব গোস্বামী ভক্তিরস, ঈশ্বরপ্রীতি, কৃষ্ণ-গোপী সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রীতির দ্বারা ভক্তের চিত্তশুদ্ধি না হলে ঈশ্বর লাভ হয় না। সুতরাং ভক্তিরসের মূল উপাদান প্রীতি।

শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী বিরচিত মহাগ্রন্থ 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের আকর-গ্রন্থ। শুধু গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে নয়, ভারতের সর্বত্র ভক্তিবাদী সাধনার ক্ষেত্রে এই গ্রন্থের প্রভাব লক্ষণীয়। রূপ ও তাঁর অগ্রজ সনাতন সংসারজীবনে ছিলেন আলাউদ্দীন হুসেন শাহের (১৪৯৪-১৫২১) উজীর। চৈতন্যদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সংসার ত্যাগ করেন এবং তাঁর আদেশে বৃন্দাবনে বৈষ্ণবগ্রন্থ রচনায় জীবন উৎসর্গ করেন। সংস্কৃত সাহিত্য ও অলংকারশাস্ত্রে ছিল তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য। আরবী-ফার্সী ভাষাতেও দক্ষতা অর্জন করেছিলেন তিনি। রাজদরবারে থাকাকালীন রূপ সুফী মতবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, এমন অনুমান অসংগত নয়, হয়ত এই,

প্রভাব পরবর্তী জীবনে তাঁকে অপ্রাকৃত ঈশ্বরাসক্তিকে শ্রেষ্ঠ রস হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করেছে।[৩১]

শ্রীরূপ ২১৪১ শ্লোক-সম্বলিত 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' সমাপ্ত করেন ১৫৪১ খ্রীস্টাব্দে। এই গ্রন্থ বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের একমাত্র বিধিবন্ধ দিগ্‌দেশনী। বিষয়বস্তু সংক্ষেপে এই, 'সাধনার প্রথমে কি প্রকারে অসংযত চিত্তবৃত্তিগুলিকে সংযত করিয়া বৈধী ভক্তির সাহায্যে শ্রীভগবচ্চরণে সমাকৃষ্ট করিতে হয়, বৈধীর সুবিধানে কি প্রকারে চিত্ত সুনির্মল হইয়া শ্রীভগবানে রতির উদয় হয় এবং সেই রতিই বা কি প্রকারে রাগানুগায় পরিণত হইয়া সংসার-সুখে বিতৃষ্ণা জন্মাইয়া শ্রীকৃষ্ণভজনকেই একমাত্র সুখকররূপে প্রতিভাত করায়— এই গ্রন্থরত্নে তাহারই বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে। রাগানুগা ভক্তি কি প্রকারে ভাবভক্ত্যাদিতে সঞ্চারিত হয়, কি প্রকারে সাধক ব্রজভাবলাভের অধিকার প্রাপ্ত হয়; ভাব, অনুভাব, বিভাবাদির স্বরূপ— এই সকল বিষয় সাহিত্যিক রসশাস্ত্রে দৃষ্ট হইলেও কি প্রকারে আমরা স্বয়ং অখিল-রসামৃতমূর্তি শ্রীভগবানের ভজনপথে এই সকল রসশাস্ত্রের বিষয় লইয়া অগ্রসর হইতে পারি, সেই আনন্দলীলাময় বিগ্রহের স্বরূপ, গুণাদি বহু বহু বিষয় আমরা এই গ্রন্থে জানিতে পারি।'[৩২]

গৌড়ীয় রসশাস্ত্রানুযায়ী পঞ্চবিধ মুখ্যরসের মধ্যে মধুর বা উজ্জ্বল রস শ্রেষ্ঠ। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে সাধারণভাবে এই রসের আলোচনা করা হয়েছে। শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবীয় রসের এই সাধারণ আলোচনা যথেষ্ট নয়, তাই 'উজ্জ্বলনীলমণিতে' মধুর রসের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছেন রূপ গোস্বামী। নায়ক নায়িকার লক্ষণ, পরকীয়াতত্ত্ব, বিপ্রলম্ভ, মহাভাব ইত্যাদি। রাধা-কৃষ্ণলীলা সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রসঙ্গের আলোচনা দ্বারা উজ্জ্বলরসের স্বরূপ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পঞ্চদশ প্রকরণে সমাপ্ত গদ্য-পদ্যে রচিত এই গ্রন্থ মধুর রসের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাকরণ, যেমন ভক্তিরসামৃতসিন্ধু সাধারণভাবে বৈষ্ণবীয় রসের একমাত্র নির্ভরযোগ্য অলংকারগ্রন্থ।

উপরে বাঙালী বৈষ্ণবাচার্যগণের রচিত যে সব রসশাস্ত্র গ্রন্থের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাঁদের ভাষা সংস্কৃত এবং রচনার স্থান বাংলার বাহিরে বৃন্দাবনে। ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু সম্পূর্ণ হবার প্রায় অর্ধ শতাব্দী পরে কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের রচনা সমাপ্ত হয়। বাঙালী বৈষ্ণবের নিকট অতি অল্পকালের মধ্যেই রসশাস্ত্রের আকর রূপে এই গ্রন্থ গৃহীত হল। 'রূপ গোস্বামী যে রসশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন তাহার পূর্ণ অনুবাদের প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই। সে শাস্ত্রের সার সংগ্রহ করিয়া তাহার তাৎপর্য সমেত কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃত-সম্পুটে ভরিয়া দিয়াছিলেন।'[৩৩]

কৃষ্ণদাসের বৈশিষ্ট্য, তিনি চৈতন্য-জীবনের পটভূমিকায় রসশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করেছেন। পূর্বাচার্যগণের মতো ভক্তিরসের নিছক তাত্ত্বিক আলোচনা তিনি করেননি। 'তাঁহার পূর্বে চৈতন্যদেবের অন্তত তিনখানি বাংলা জীবনীকাব্য এবং তিনখানি সংস্কৃত জীবনী (কাব্য ও নাটক) রচিত হইয়াছিল। তিনি প্রচলিত কাহিনীর পুনরাবৃত্তি না করিয়া চৈতন্য-জীবনাদর্শ, ভক্তিবাদ, দ্বৈতবাদী দার্শনিক চিন্তার

গৌড়ীয় ভাষ্য এবং বৈষ্ণব মতাদর্শকে সংহত, দূরাভিসারী ও মননিষ্ঠ আকার দিয়া বাঙালী মনীষার এক উজ্জ্বলতম স্মারক চরিত্র হইয়া আছেন।'[৩৪]

ভরত ও গৌড়ীয় মতের বিভিন্নত্ব

ভরতমুনি যে আটটি রস নির্দিষ্ট করেছেন তার মধ্যে ভক্তিরস অনুপস্থিত। প্রাচীন আলংকারিকদের মতে দেবতার প্রতি ভক্তের যে রতি তা ব্যভিচারী ভাবমাত্র, রসের মর্যাদা তাকে দেওয়া যায় না। মম্মটভট্ট তাঁর 'কাব্যপ্রকাশে' বলেছেন, 'রতির্দেবাদিবিষয়া ব্যভিচারী তথাঽঞ্জিতঃ। ভাবঃ প্রোক্তঃ' (৪।৪৮)। অর্থাৎ, দেবাদি সম্পর্কিত রতিকে ও ব্যঞ্জিত ব্যভিচারীকে বলা হয় ভাব, রস নয়। ভক্তি যে ভাবমাত্র, রস নয়, তা 'সাহিত্যদর্পণ', 'সরস্বতীকণ্ঠাভরণ' প্রভৃতি অলংকার গ্রন্থেও বলা হয়েছে।

'দেবাদিবিষয়া' রতি ভক্তিরস হিসাবে গণ্য হতে পারে না— প্রাকৃত আলংকারিকদের এই অভিমত মধুসূদন সরস্বতী এবং জীব গোস্বামী খণ্ডন করেছেন। মধুসূদন বলেছেন, মম্মটের উক্তি ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাদের পক্ষে প্রযোজ্য হতে পারে, পরমানন্দ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে নয়।[৩৫] জীবগোস্বামীও বলেছেন, প্রাকৃত রসকোবিদ্‌গণের ভক্তিরসকে স্বীকৃতি দিতে আপত্তি 'প্রাকৃতদেবাদিবিষয়মেব সন্তবেৎ...।'[৩৬]

লৌকিক এবং অলৌকিক এই উভয়বিধ রসেরই প্রাথমিক স্তর ভাব। বিভাব, অনুভাব ইত্যাদির সঙ্গে মিলিত হয়ে ভাব রসে পরিণত হয়। শ্রুতিতে ও পুরাণে বর্ণিত অখিলরসামৃতমূর্তি আনন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ যে ভাবের উৎস তার রসে পরিণত হবার যোগ্যতা নেই, একথা বৈষ্ণব রসশাস্ত্রকারগণ স্বীকার করেন না, অবশ্য এখানেই প্রশ্ন ওঠে এমন মহিমময় ভগবানের সঙ্গে একজন সামান্য ভক্ত মানবের কি এমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠা সম্ভব যা থেকে রসের সৃষ্টি হতে পারে? কারণ মধুর সম্পর্ক সমপর্যায়ের লৌকিক বা অলৌকিক ব্যক্তিত্বের মধ্যেই গড়ে ওঠা সম্ভব।

এ প্রশ্নের উত্তর বৈষ্ণব রসশাস্ত্রেই আছে। ভগবান ও ভক্তের মধ্যে ব্যবধান দূর করা হয় দুই উপায়ে। এক, ভগবানকে মানবীয় গুণে ভূষিত করা। গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যের রূপে তেমন মুগ্ধ হননি, যে-কৃষ্ণ কংস ও পুতনাবধের নায়ক, শক্তিধর যে-কৃষ্ণ গোবর্ধন পর্বত ধারণ করেছিলেন, তাঁকে আমাদের বৈষ্ণব সাধকরা হৃদয়ের ধন হিসাবে গ্রহণ করেননি। কারণ ঐশ্বর্যবোধ দূরত্বকে প্রসারিত করে প্রেমানুভূতিকে শিথিল করে—

ঐশ্বর্য-শিথিল-প্রেমে নাহি মোর প্রীত।[৩৭]

শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের কাছাকাছি এসেছেন তাঁর মানবিক গুণাবলী, প্রসাধনপ্রিয়তা এবং অন্যান্য মানব-সুলভ বৈশিষ্ট্যের জন্য। এই সব মানবিক গুণাবলীর বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাবে বৈষ্ণব শাস্ত্রগ্রন্থে, তা ছাড়া ভক্তের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক মানবিক বন্ধনের দ্বারা চিহ্নিত। প্রভু, সখা, পুত্র এবং পতিরূপে তাঁকে ভজনা করা হয়। চৈতন্য-

চরিতামৃতকার বলেছেন :

মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণপতি।
এই ভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধভক্তি ॥
আপনারে বড় মানে আমারে সম-হীন।
সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন ॥[৩৮]

ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে পার্থক্য দূরীকরণের দ্বিতীয় উপায় হল ভক্তকে আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত করা। শ্রীকৃষ্ণ অলৌকিক মাধুর্যের অধিকারী হলেও সীমিত শক্তি লৌকিক জীব ভক্ত সেই মাধুর্য কি উপায়ে আস্বাদন করবে? প্রাকৃত আলংকারিকদের এই অভিযোগের উত্তরে বলা চলে, ভজন, কীর্তন প্রভৃতির দ্বারা ভক্তের প্রাকৃত মনোবৃত্তি সচ্চিদানন্দরূপ ভক্তির সঙ্গে মিলিত হয়ে চিন্ময়ত্ব লাভ করে। এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন :

প্রভু-কহে, বৈষ্ণব-দেহ 'প্রাকৃত' কভু নয়।
'অপ্রাকৃত' দেহ ভক্তের চিদানন্দময় ॥[৩৯]

এমন-কি, ভজন কীর্তনাদি সাধনায় অসমর্থ ব্যক্তিও শুধু শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হলেই সিদ্ধিলাভ করতে পারেন :

শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ।
কৃষ্ণ তাঁরে করে তৎকালে আত্মসম ॥[৪০]

সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের অমেয় মাধুর্যের রসাস্বাদন শরণাগত সামান্য মানুষের পক্ষে অসম্ভব নয়।

বৈষ্ণব রসকোবিদ্‌গণ পক্ষান্তরে বলেন, প্রাকৃত রস প্রকৃত মর্যাদা লাভের অধিকারী নয়। কারণ যে সুখানুভূতি ও পরমানন্দ রসের প্রাণ তা লৌকিক রসের বিষয়াবলম্বনে ক্ষুদ্র পরিসরে সীমাবদ্ধ করা যায় না। ভূমাতেই সুখ, অল্পে সুখ নেই, রসও নেই। প্রাকৃত রসের সামাজিক মায়াবদ্ধ জীব, সুতরাং তার পক্ষে ভূমাকে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। জীব গোস্বামী বলেছেন, 'কিঞ্চ, লৌকিকস্য রত্যাদেঃ সুখরূপত্বং যথাকথঞ্চিদেব। বস্তুবিচারে দুঃখপর্যবসায়িত্বাৎ ॥'[৪১]

অর্থাৎ, লৌকিক রত্যাদির সুখরূপতা খুবই অল্প ; অর্থাৎ, বস্তুবিচারে (রসের আলম্বন ও রতির প্রকৃত বিচারে) তাহা দুঃখেই পরিসমাপ্ত হয়।

মধুসূদন সরস্বতী এই প্রসঙ্গটি ব্যাখ্যা করে বলেছেন :

কান্তাদিবিষয়া বা যে রসাদ্যাস্তত্র নেদৃশম্।
রসত্বং পুষ্যতে পূর্ণসুখাস্পর্শিত্বকারণাৎ ॥
পরিপূর্ণরসা ক্ষুদ্ররসেভ্যো ভগবদ্রতিঃ।
খদ্যোতেভ্য ইবাদিত্য-প্রভেব বলবত্তরা ॥[৪২]

অর্থাৎ, কান্তাদি-বিষয়ক রস ভক্তিরসের তুল্য নয়। পূর্ণ সুখ লাভ না হলেও সেখানে নাকি রসের পুষ্টি হয়ে থাকে। শৃঙ্গারাদি ক্ষুদ্র রসের তুলনায় ভগবদ্‌বিষয়ক রতি পরিপূর্ণ রস ; সূর্যকিরণের সঙ্গে জোনাকির আলোর যে প্রভেদ, প্রাকৃত ও

অপ্রাকৃত রসের মধ্যে তেমনই পার্থক্য।

ভক্তিরসের অলৌকিকত্ব সম্বন্ধে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণের অভিমত সংক্ষেপে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন ভক্তিভূষণ রাধাগোবিন্দ নাথ। তিনি বলেছেন, 'তাঁহাদের (গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যদের) অলৌকিকত্ব হইতেছে অপ্রাকৃতত্ব, মায়াতীতত্ব। কৃষ্ণরতি বা ভক্তি স্বরূপশক্তির বৃত্তি বলিয়া মায়াতীত— চিৎস্বরূপা। বিষয়ালম্বন-বিভাব শ্রীকৃষ্ণ, আশ্রয়ালম্বন বিভাব শ্রীকৃষ্ণ পরিকরগণ ও অপ্রাকৃত, মায়াতীত চিদ্‌বস্তু; অনুভাব-ব্যভিচারী-ভাবাদিও চিৎস্বরূপ বা চিদ্রূপতাপ্রাপ্ত। এই সমস্তের সংযোগে উদ্ভূত ভক্তিরসও হইবে অপ্রাকৃত, মায়াতীত চিদ্‌বস্তু— সুতরাং অলৌকিক। ইহা বস্তুবিচারেই অলৌকিক; কেননা, ইহা অপ্রাকৃত।'[৪৩]

প্রাকৃত আলংকারিকরা ভক্তিরসকে অস্বীকার করেছেন, আবার বৈষ্ণব আচার্যেরা লৌকিক রসকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছেন। এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের কথা বলেছেন কবি কর্ণপুর এবং মধুসূদন সরস্বতী। কর্ণপুর ভক্তিরসকে মুখ্য স্থান দিলেও প্রাকৃত রসকে উপেক্ষা করেননি। 'অলংকারকৌস্তুভে' তিনি লৌকিক ও অলৌকিক, এই উভয় রসেরই আলোচনা করেছেন, লৌকিক রসই বিবর্তিত হয়ে অলৌকিকে পরিণত হয় তাঁর হয়ত এই বিশ্বাস ছিল। মধুসূদন 'ভক্তিরসায়নে' বলেছেন, 'কান্তাদিবিষয়েঽপ্যস্তি কারণং সুখচিদ্‌ঘনম্।' (১।১১)। অর্থাৎ, কান্তাদিবিষয়ক লৌকিক শৃঙ্গার রসে যে আনন্দ লাভ করা যায় তার মূলে রয়েছেন চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম। তবে প্রাকৃতজন এবং তাদের সুখানুভূতি মায়ায় আচ্ছন্ন থাকে বলে পরমানন্দের স্ফূর্তি ঘটে না। সুতরাং বলা উচিত প্রাকৃত ও অলৌকিক রসের মধ্যে স্তরপর্যায়ের পার্থক্য থাকতে পারে; কিন্তু তাই বলে কোনোটিকেই অস্বীকার করা যায় না। আরো একটি কথা বিশেষরূপে উল্লেখ করতে হয়। উভয় শ্রেণীর রসশাস্ত্রেরই মূল কাঠামোটি প্রায় এক।

ধর্মসাধনার একটি সাধারণ অঙ্গ হিসাবেই ভক্তির স্বীকৃতি ছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণ কিন্তু ভক্তিকেই ঈশ্বরপ্রাপ্তির একমাত্র উপায় হিসাবে গ্রহণ করেছেন। রূপ গোস্বামী প্রথম বৈষ্ণব ভক্তিবাদের গভীর আবেগ ও রসময়তার দিকটি আলোচনার জন্য নির্বাচন করেন। ভক্তের মনে ভক্তিরসের ক্রমবিকাশের স্তর এবং বিকাশের ধারায় একটি সুনির্দিষ্ট বিধি বা অলংকারশাস্ত্র এমন করে ব্যাখ্যা করেছেন যা প্রামাণিক বলে বৈষ্ণব সম্প্রদায় গ্রহণ করতে দ্বিধা করেননি। লেখকের বক্তব্যের মধ্যে পাণ্ডিত্য এবং শ্রদ্ধার মিলন না ঘটলে বোধ হয় এমন সহজে এই নতুন ব্যাখ্যা গৃহীত হত না।

রূপ মহৎ সাহিত্য আস্বাদনের শ্রেষ্ঠ আনন্দানুভূতির সঙ্গে সমভাবে বিচার করেছেন ভক্তির ধর্মীয় অনুভূতিকে। সংস্কৃত আলংকারিকেরা সাহিত্যে উপভোগের বিশুদ্ধ আনন্দকে বলেছেন 'রস'। তাঁরা ওই রসের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে স্তরপর্যায় নির্দেশ করেছেন অলংকারশাস্ত্রে। অনুরূপভাবে রূপ গোস্বামী ভক্তের মনে ঈশ্বরানুভূতির অতীন্দ্রিয় আনন্দ থেকে যে রসের সৃষ্টি হয় তাকে প্রাকৃত আলংকারিক-দের মতো ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে ভক্তিরসশাস্ত্র বিধিবদ্ধ করেছেন। প্রাকৃত

আলংকারিকদের রসতত্ত্বের কাঠামো হাতের কাছে প্রস্তুত ছিল, সুতরাং তাকে অবলম্বন করেই রূপ ভক্তিরসশাস্ত্র বিধিবন্ধ করেছেন। এমন-কি, বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে প্রাচীন অলংকারশাস্ত্রের পরিভাষাও গ্রহণ করা হয়েছে। অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই সব পরিভাষার নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন রূপ। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের সঙ্গে বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের মূল পার্থক্য এই :

১. মৌলিক ভিন্নতা হল রসের লৌকিকত্ব ও অলৌকিকত্ব নিয়ে। প্রাচীন আলংকারিকেরা যে রসের ব্যাখ্যান দিয়েছেন তা পৃথিবীর নরনারীকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত। অলৌকিক বৈষ্ণবীয় রস সৃষ্টি হয় অখিলরসামৃতসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণকে অবলম্বন করে।

২. প্রাচীন অলংকারশাস্ত্রে নয়টি রস স্বীকার করা হয়েছে; রূপ স্বীকৃতি দিয়েছেন বারোটি রস। এই বারোটির মধ্যে সাতটি গৌণরস, মুখ্য রস তাঁর মতে মাত্র পাঁচটি। এই পাঁচটির মধ্যে আবার শৃঙ্গার রসকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

৩. বৈষ্ণব রসশাস্ত্রানুযায়ী একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই নায়ক হতে পারেন এবং রাধা নায়িকা। কিন্তু লৌকিক কাব্য বা নাটকে এরূপ নির্দিষ্ট নায়ক নায়িকা নেই। লেখকের পাত্র পাত্রী নির্বাচনের অবাধ অধিকার আছে। একই নায়ক, একই নায়িকা অবলম্বন করবার ফলে বৈষ্ণব সাহিত্যে একঘেঁয়েমি এসে গেল। তা দূর করবার উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণের নতুন নতুন লীলাকাহিনী যোগ করে বৈষ্ণব কবি শ্রোতা ও পাঠককে আকৃষ্ট করেছেন। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দের' সঙ্গে পরবর্তীকালের কৃষ্ণকাব্যের তুলনা করলে এ কথার সত্যতা উপলব্ধি করা যাবে। দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড ইত্যাদি লীলাকথা পরে যোগ করা হয়েছে।

৪. প্রাচীন অলংকারশাস্ত্রে রস আস্বাদক সহৃদয় সামাজিকের স্থান বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে অধিকার করেছে 'ভক্ত'। অর্থাৎ, শুধু বোদ্ধা হলে চলবে না, হতে হবে ঈশ্বর-প্রেমিক সাধক।

৫. প্রাকৃত রসশাস্ত্রকারগণের মোটামুটি সিদ্ধান্ত এই যে অনুকার্য এবং অনুকর্তাদের রসাস্বাদন হয় না;[৪৪] সহৃদয় সামাজিকই রস আস্বাদনের অধিকারী। কারণ সামাজিক একাগ্রচিত্তে তন্ময় হয়ে দর্শন, পঠন বা শ্রবণে নিবিষ্ট হন। অনুকর্তা বা অভিনেতা যদি রসাবিষ্ট হয়ে আবেগে অভিভূত হয়ে পড়ে তা হলে অভিনয় করা সম্ভব হয় না। আর অনুকার্য তো সকল আবেগের অতীত।

অপ্রাকৃত রসকোবিদ্‌গণের মতে অনুকার্য, অনুকর্তা এবং সামাজিক রসাবিষ্ট হবেন এটাই স্বাভাবিক। জীব গোস্বামী বলেছেন, অনুকার্য বা শ্রীভগবান এবং তাঁর পরিকরগণের মধ্যে রসবস্তু পূর্ণরূপে বিরাজ করে; সুতরাং তাঁদের হৃদয়স্থ রস অনুকর্তাগণের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়ে থাকে।[৪৫]

অলৌকিক রসে অভিভূত হয়ে অনুকর্তা যে প্রাণ পর্যন্ত ত্যাগ করতে পারে তা বলেছেন বৃন্দাবন দাস :

পূর্বে দশরথ ভাবে এক নটবর।

রাম বনবাসী শুনি তেজে কলেবর ॥[৪৬]

অর্থাৎ, প্রাচীনকালে দশরথের চরিত্র অভিনয়কারী কোনো এক নট রামচন্দ্র বনবাসে গেছেন শুনে দেহত্যাগ করেছিলেন।

অনুকর্তা রসে অভিভূত হওয়ায় অভিনয় যদি বিঘ্নিত হয় অলৌকিক পরিবেশে তা কোনো বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে না। বরং অভিনেতা অভিভূত রূপ রসের গাঢ়তা বৃদ্ধি করে। লৌকিক ক্ষেত্রে অভিনয়ে এরূপ বিঘ্ন পার্থিব কারণেই বাঞ্ছনীয় নয়।

রাধাকৃষ্ণের লীলাপাঠ শ্রবণ অথবা অভিনয় দর্শন করলেও সামাজিকের চিত্তে রসের সঞ্চার হয়। গীতা পাঠকের রসাবেশের বর্ণনা দিতে গিয়ে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন :

'পুলকাশ্রু, কম্প, স্বেদ, যাবৎ পঠন।'[৪৭]

৬. আর-একটি বড়ো পার্থক্য স্বকীয়া ও পরকীয়া নায়িকার মর্যাদা সম্পর্কিত। প্রাচীন আলংকারিকদের মতে নায়িকা তিন প্রকার : স্বকীয়া, পরকীয়া এবং সামান্যা বা সাধারণী। তৃতীয় শ্রেণীর নায়িকারা রূপোপজীবিনী, অর্থ উপার্জনই তাদের লক্ষ্য, সুতরাং তাদের কেন্দ্র করে রসসৃষ্টির অবকাশ নেই। স্বকীয়া শ্রেষ্ঠ মর্যাদা লাভ করেছে। সীতা-সাবিত্রীর মতো একনিষ্ঠ সতী নারী ভারতের আদর্শ। যে সকল বিবাহিতা নারী সমাজ ও ধর্মের রীতিনীতি অগ্রাহ্য করে পরপুরুষে আসক্ত হয় তারাই পরকীয়া নায়িকা। লৌকিক রসশাস্ত্রকারগণ বলেন, এই শ্রেণীর নায়িকা রসসৃষ্টির কারণ হতে পারে না, তাদের প্রেমের পরিণাম হতে পারে শুধু রসাভাস। তাই বিশ্বনাথ বলেছেন :

পরোঢ়াং বর্জয়িত্বা তু বেশ্যাঞ্চাননুরাগিনীম্।
আলম্বনং নায়িকাঃ সুর্দক্ষিণাদ্যাশ্চ নায়কাঃ ॥[৪৮]

অর্থাৎ (মধুর রসে) পরোঢ়া নায়িকা এবং প্রকৃত অনুরাগহীন বেশ্যাকে বর্জন করে অন্য (স্বকীয়া) নায়িকা এবং দক্ষিণাদি নায়ক হবেন আলম্বন। বিশ্বনাথের প্রায় পাঁচ শতাব্দী পূর্বে আলংকারিক রুদ্রট বলেছেন : 'নহি কবিনা পরদারা এষ্টব্যা নাপিচোপদেষ্টব্যাঃ।'[৪৯] অর্থাৎ, কবি পরদার অভিলাষ করবেন না এবং এ বিষয়ে অন্যের কর্তব্য নির্দেশ করবেন না। পরে তিনি অবশ্য বলেছেন, বিদ্বজ্জনের তৃপ্তির জন্য কবি পরকীয়া সম্বন্ধে কাব্য রচনা করতে পারেন।

বিবাহ বহির্ভূত প্রেম যে অধিকতর মধুর এবং উন্মাদনাময় তার সুন্দর দৃষ্টান্ত 'য়ঃ কৌমারহরঃ' প্রকীর্ণ কবিতাটি। এখানে নায়িকা তার সখীকে আক্ষেপ করে বলছে যিনি আমার কুমারীত্ব হরণ করেছিলেন, এখন তিনিই আমাকে বিবাহ করেছেন। বিবাহপূর্ব প্রথম মিলনের দিনটির মতো আজও চৈত্রমাসের মধুযামিনী উপস্থিত, সেদিনের মতো আজও মালতী ফুলের গন্ধ বাতাসে ভেসে আসছে, আমিও প্রিয়তমকে গ্রহণ করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছি। কিন্তু তবু রেবা নদীর তীরবর্তী কুঞ্জবনে প্রথম মিলনের সুরতক্রীড়ায় উন্মাদনাকর আনন্দানুভূতির জন্য আমার চিত্ত উন্মুখ।

চৈতন্যদেব প্রাকৃত নায়িকার এই উক্তি পাঠ করে ব্রজরস আস্বাদন করতেন।[৫০]

গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্যগণ পরকীয়া রতিকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছেন। অবশ্য তাঁদের অনেক পূর্বে শ্রীমদ্‌ভাগবত পরিণীতা গোপী ও শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়লীলা বর্ণনা করেছেন। সুতরাং পরকীয়া প্রেমকে যে শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হয়েছে তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

ভক্ত বৈষ্ণব ঈশ্বরকে কান্তাভাবে সাধনা করে। কারণ পৃথিবীর যত প্রকার মানবিক সম্পর্ক আছে তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা মধুর এবং আর্তিপূর্ণ পতি-পত্নীর সম্বন্ধ। কিন্তু এর চেয়েও বেশি ব্যাকুলতা প্রকাশ পায় পরকীয়া নায়িকার উপপতির জন্য ; যদিও তাদের সম্পর্ক সমাজ-স্বীকৃত নয়। পত্নী স্বামীর করায়ত্তা, কিন্তু পরকীয়া নারী অন্যায়ত্তা। সহজলভ্যা নয় বলেই তার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়। আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা আকর্ষণকে চিরনবীন রাখে। পরকীয়া নায়িকা ধর্ম সমাজ নিন্দা সব কিছু অগ্রাহ্য করে কলঙ্কের ডালি মাথায় নিয়ে দয়িতের জন্য অভিসারে বাহির হয়। নিয়মনিষ্ঠ দাম্পত্যপ্রেমে এরূপ আত্মত্যাগ ও দুঃখবরণ নেই। 'পরকীয়াতে প্রেমের সর্বাধিক স্ফুরণ। এই জন্য প্রেমের ভিতরে শ্রেষ্ঠ যে কান্তাপ্রেম তাহার ভিতরেও শ্রেষ্ঠ হইতেছে পরকীয়া রতি, রাধাপ্রেমেই এই পরকীয়া রতির পর্যবসান। পরকীয়া প্রেমই হইল নিকষিত হেম, কারণ, এ-প্রেম সর্বত্যাগী প্রেম, সর্বসংস্কারবিমুক্ত প্রেম, সর্ব-লজ্জা-ভয়-বাধা-নির্মুক্ত প্রেম ; ইহা শুধুমাত্র প্রেমের জন্যই প্রেম, সুতরাং ইহাই হইল বিশুদ্ধ রাগাত্মিকা রতি।'[৫১]

এই সর্বোত্তম প্রেমের পথই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধকরা গ্রহণ করেছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজও বলেছেন এই কথাই :

> অতএব মধুর রস কহি তার নাম।
> স্বকীয়া-পরকীয়া-রূপে দ্বিবিধ সংস্থান॥
> পরকীয়া-ভাবে অতি রসের উল্লাস।
> ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥[৫২]

রূপ গোস্বামী বলেন, পরকীয়া প্রেমে অনৌচিত্য দোষ ঘটে না, কারণ ইহাতে কামগন্ধ নেই, রাধাকৃষ্ণ জীবাত্মা-পরমাত্মার প্রতীক। পরমাত্মার জন্য জীবাত্মার যে আকুতি তাই কৃষ্ণ-রাধার রূপকের মধ্য দিয়ে ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। চৈতন্যচরিতামৃতে এই প্রসঙ্গটি ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে :

> কাম, প্রেম-দোঁহাকার বিভিন্ন-লক্ষণ।
> লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ॥
> আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা তারে বলি কাম।
> কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
> কামের তাৎপর্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
> কৃষ্ণ সুখ-তাৎপর্য মাত্র প্রেমে ত প্রবল॥[৫৩]

এই ভিন্নতার সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে। এই প্রসঙ্গে আরো দু একটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা প্রয়োজন। গৌড়ীয়

ভক্তিরসের মূল উৎস ভাগবতপুরাণ। রামানুজ, নিম্বার্ক, মধ্ব ও বল্লভ সম্প্রদায়ের ভিত্তি ব্রহ্মসূত্রের উপরে। প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে ব্রহ্ম বা বেদান্ত-সূত্রের ভাষ্য রচনা করেছেন এবং সেই ভাষ্য-নির্দেশিত পথেই তাঁদের সাধনা। গৌড়ীয় সম্প্রদায় নিজস্ব ভাষ্যের প্রয়োজন বোধ করেননি। তাঁদের মতে ভাগবতপুরাণই বেদান্তসূত্রের ভাষ্য, ভাষ্যকার স্বয়ং বেদব্যাস। সুতরাং অন্য ভাষ্যের প্রয়োজন কি? গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের ধর্মচিন্তা এবং রসভাবনা— এই উভয়েরই উৎস ভাগবত। শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান। তিনি শুধু অবতার নন, বলেছেন ভাগবতপুরাণ। তবে ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যময় রূপের প্রাধান্য ; বাংলার বৈষ্ণবরা তাঁর মাধুর্যময় মানবিক রূপের পূজারী। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন,

কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্বোত্তম নরলীলা,
নরবপু তাহার স্বরূপ
গোপবেশ, বেণুকর, নবকিশোর, নটবর,
নরলীলার হয় অনুরূপ।[৫৪]

আর সেই জন্যই শ্রীকৃষ্ণরূপী ভগবানের সঙ্গে ভক্ত মানবিক সম্পর্কে আবদ্ধ। (চৈ. চ. ১।৪।২১-২২)

শ্রীকৃষ্ণের ভাগবতানুসারী ঐশ্বর্যময় মূর্তি বাংলা বৈষ্ণব পদাবলীতে আচ্ছন্ন হয়েছে মাধুর্যরসে। শান্ত প্রভৃতি দ্বাদশ রস যাঁর মধ্যে স্ফূর্ত যিনি 'অখিল-রসামৃতমূর্তিঃ', সেই আনন্দঘন ভগবানের নিকট ভক্ত কিসের জন্য প্রার্থনা করবে? সাধারণ মানুষের যা পাবার আকাঙ্ক্ষা, বৈষ্ণবের নিকট সেই চতুর্বর্গের কোনোটিই কাম্য নয়। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ— এই চার বর্গ চেয়ে যারা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করে তারা কৈতব বা বঞ্চক ; বঞ্চনা করে নিজেদেরই :

অজ্ঞানতামর নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম-অর্থ-কাম-বাঞ্ছা আদি এই সব॥
তার মধ্যে মোক্ষ বাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান॥[৫৫]

ঈশ্বর-সাধকদের প্রধান লক্ষ্যই মোক্ষপ্রাপ্তি, পরমাত্মার মধ্যে লীন হয়ে যাওয়া। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা পেতে চান পঞ্চমবর্গ— 'প্রেম-মহাধর্ম'

পঞ্চম পুরুষার্থ সেই প্রেম মহাধন।
কৃষ্ণের মাধুর্য রস করায় আস্বাদন॥
প্রেমা হৈতে কৃষ্ণ হয় নিজ ভক্তবশ।
প্রেমা হৈতে পায় কৃষ্ণের সেবা-সুখরস॥[৫৬]

মোক্ষ অর্থ নির্বাণ, সব কিছুর সমাপ্তি। ভক্ত বৈষ্ণব প্রেমাস্পদের সঙ্গে লীলা খেলার পরমানন্দ উপলব্ধি করতে চায়। মোক্ষপ্রাপ্তির ফলে পরমাত্মায় লীন হয়ে গেলে লীলাখেলার এই আনন্দ উপভোগ করা যাবে না। শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যরস আস্বাদনের তুলনায় মোক্ষ তৃণবৎ তুচ্ছ।

শুধু যে ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যরস আস্বাদন করে অলৌকিক আনন্দানুভূতিতে আবিষ্ট হন, তাই নয়; স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ নিজের মাধুর্যরস আস্বাদন করবার জন্য ব্যাকুল:

আপন মাধুর্যে হরে আপনার মন।
আপনা আপনি চাহে করিতে আলিঙ্গন॥[৫৭]

শ্রীকৃষ্ণ আপন মাধুর্যে আপনি কেন মুগ্ধ হন তারও ব্যাখ্যা আছে। তাঁর পূর্ণ-স্বরূপের তিনটি ধর্ম— সৎ, চিৎ ও আনন্দ। এরই ভিত্তিতে ভগবানের স্বরূপশক্তি তিনটি স্তরে বিভক্ত: সন্ধিনী, সংবিৎ ও হ্লাদিনী। শেষোক্তটি তিন শক্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই হ্লাদিনী শক্তি ভগবানকে রসময় করে, রসাস্বাদনে উন্মুখ করে। রস আত্মজ হতে পারে অথবা ভক্তের হৃদয়জাতও হতে পারে। নিজের মাধুর্যরস তো কৃষ্ণ উপভোগ করেনই, লীলা ছলে ভক্তহৃদয়ের রসাস্বাদনের জন্যও তিনি উন্মুখ। রস সৃষ্টিতে এবং রস আস্বাদনে হ্লাদিনী শক্তির মুখ্য ভূমিকা রয়েছে। এই শক্তি একদিকে কৃষ্ণকে যেমন আহ্লাদিত করে তেমনি অন্যদিকে ভক্তবৃন্দকেও হ্লাদ দান করে। হ্লাদিনী শক্তি পরমাত্মা, জীবাত্মা এই উভয়ের মধ্যে বর্তমান এবং উভয়ের মধ্যে যোগসূত্রের কারণ। কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই কথাটি সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন:

হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন।
হ্লাদিনীর দ্বারা করে ভক্তের পোষণ॥[৫৮]

জীব জগতে রাধার মধ্যে হ্লাদিনী শক্তির শ্রেষ্ঠ বিকাশ। তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণের লীলা খেলার মুখ্যা সঙ্গিনী। ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে ভেদ এবং অভে এই দুই-ই যে বর্তমান তারও সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাধাকৃষ্ণের লীলা খেলা। জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে ভেদ তো থাকবেই। কিন্তু হ্লাদিনীশক্তি সঞ্জাত আনন্দময় মধুররস উভয়ের মধ্যে একান্ততার অনুভূতি জাগ্রত করেছে। প্রমাণ করেছে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যদের অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ। কৃষ্ণদাসের কথায়—

রাধা-পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ-পূর্ণ শক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাহি, শাস্ত্র-পরমাণ॥
মৃগমদ, তার গন্ধ— যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে, যৈছে কভু নাহি ভেদ॥
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥[৫৯]

ভক্তের নিকটে যে ভগবান নেমে আসেন, ভক্তের সঙ্গে লীলারস সমরূপে আস্বাদন করেন এবং ভক্তের হৃদয়ে যে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম[৬০]— এই তত্ত্ব ভাগবতানুসারী হলেও তা প্রচার ও প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যদের।

সংক্ষেপে বৈষ্ণবীয় রসের স্বরূপ যথার্থরূপে নির্ণয় করা সহজ নয়। কারণ ধর্মানুভূতি, রসানুভূতি, মনস্তত্ত্ব, নন্দনতত্ত্ব, সাহিত্যভাবনা প্রভৃতির মিশ্রণ এই রসশাস্ত্রকে জটিল করে তুলেছে। ডঃ সুশীলকুমার দে এই জটিলতার কথা উল্লেখ

করে বলেছেন : 'The attitude is a curious mixture of the literary, the erotic and the religious, and the entire scheme as such is an extremely complicated one.'[৬১]

প্রাচীন আলংকারিকদের রসশাস্ত্রের সঙ্গে তুলনা করবার পর এবং বৈষ্ণবীয় রসশাস্ত্রের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আলোচনার পর প্রশ্ন জাগে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের রসশাস্ত্রের দান কতটুকু ? ডঃ সুধীরকুমার দাশগুপ্ত কোনো মৌলিক দান স্বীকার না করে বলেছেন : 'কাব্যগত রসতত্ত্বে বৈষ্ণবগণের মৌলিক দান কিছুই নাই, তাঁহারাই বরং আলংকারিকগণের রসতত্ত্ব অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণব ভক্তিতত্ত্বকে রসায়িত ও সঞ্জীবিত করিয়াছেন।'[৬২]

বৈষ্ণব রসকোবিদগণের কৃতিত্বের কথা বোধ হয় এ ভাবে অস্বীকার করা চলে না। সংস্কৃত আলংকারিকরা কাব্য নাটকাশ্রিত যে রসের ব্যাখ্যা করেছেন, বৈষ্ণব রস-শাস্ত্রকারগণ তাকে প্রসারিত করে এনেছেন ধর্মানুভূতির ক্ষেত্রে ; আবেগময় ধর্মানুভূতিতে যে অলৌকিক রসের জন্ম তার উদ্ভব ও বিকাশের ধারা বিধিবদ্ধ করাতেই তাঁদের কৃতিত্ব। ভক্তিরসের প্রাধান্য স্থাপনেই ঘটেছে বৈষ্ণব আলংকারিকদের মনীষার পূর্ণ বিকাশ। কাঠামো ও পরিভাষা পূর্বসূরিদের নিকট হতে গ্রহণ করা হলেও ধর্মকেন্দ্রিক অভিনব রস-পরিকল্পনা রচনাতেই তাঁদের মৌলিকত্বের নিদর্শন।

রসনিষ্পত্তি

ভক্তের হৃদয়ে ভক্তিভাব সততই বিরাজ করে। এই ভক্তিভাব কি উপায়ে ভক্তিরসে পরিণত হয় সে সম্বন্ধে রূপ গোস্বামী সাধারণভাবে ভরতমুনির অভিমত গ্রহণ করেছেন। পার্থক্য এই যে, ভরত মূলত লৌকিক ভাবের রসতা প্রাপ্তির পদ্ধতি ব্যাখ্যা করেছেন, রূপ বলেছেন শুধু ভক্তিভাবের কথা। ভরতমুনির মতে 'বিভাবানু-ভাব ব্যভিচারি সংযোগাদ্রসনিষ্পত্তিঃ।'[৬৩] অর্থাৎ, বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাব, —এই তিন উপাদানের মিশ্রণে ভাব রসে পরিণত হয়।

রূপ গোস্বামী রসনিষ্পত্তির অনুরূপ পদ্ধতির কথা বলেছেন :

বিভাবৈরনুভাবৈশ্চ সাত্ত্বিকৈর্ব্যভিচারিভিঃ।
স্বাদ্যত্বং হৃদি ভক্তানামানীতা শ্রবণাদিভিঃ।
এষা কৃষ্ণরতিঃ স্থায়ী ভাবো ভক্তিরসো ভবেৎ ॥[৬৪]

এর সরলার্থ হল : শ্রবণ-স্মরণ-কীর্তন প্রভৃতির দ্বারা উদ্বোধিত স্থায়ীভাব কৃষ্ণরতি বিভাব ইত্যাদির সহযোগে ভক্তহৃদয়ে আস্বাদ্য হয়ে উঠলে ভক্তিরসের সৃষ্টি হয়।

রূপ গোস্বামীর রসনিষ্পত্তির সংজ্ঞায় দুটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। প্রথমত, সংস্কৃত আলংকারিকেরা বলেন, প্রিয়বস্তুর প্রতি অনুরাগই রতি।[৬৫] কিন্তু বৈষ্ণবরসশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ একমাত্র রতি। দ্বিতীয়ত, শ্রীকৃষ্ণরতি অলৌকিক, সুতরাং

বিভাব ইত্যাদির সঙ্গে সাত্ত্বিকভাব অচ্ছেদ্যরূপে যুক্ত। ভরতমুনি আটটি সাত্ত্বিক-ভাবের উল্লেখ করলেও রসনিষ্পত্তির ক্ষেত্রে তাদের প্রাধান্য দেননি।[৬৬]

রতির সঙ্গে যে সব সামগ্রীর মিলন ঘটলে রসের সৃষ্টি হয় 'বিভাব' তাদের অন্যতম। ভক্তের হৃদয়স্থিত রতিকে উদ্বোধিত করবার হেতুকে বলা হয় বিভাব। ভগবান বা শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পরিকরগণের নাম, রূপ, গুণ, লীলা প্রভৃতির দ্বারা ভক্তের হৃদয়কে বিভাবিত বা বিশেষরূপে জাগরিত করে এবং এর ফলে স্থায়ীভাবের প্রতিষ্ঠা ত্বরান্বিত হয়।

বিভাব দুরকম, আলম্বন এবং উদ্দীপন। আলম্বন বিভাবকে আবার দু' শ্রেণীতে ভাগ করা যায়,— বিষয়ালম্বন ও আশ্রয়ালম্বন। কৃষ্ণরতির বিষয়ালম্বন হলেন শ্রীকৃষ্ণ ; কারণ, তাঁকে অবলম্বন করেই রতির অস্তিত্ব। এই কৃষ্ণরতির অবস্থান কৃষ্ণভক্তের হৃদয়ে। ভক্তের আশ্রয়ে থেকেই রতি বিকাশ ও গাঢ়তা লাভ করে। সুতরাং কৃষ্ণরতির আলম্বনের দুটি দিক, একটি তার বিষয় শ্রীকৃষ্ণ অপরটি তার আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণভক্ত :

কৃষ্ণশ্চ কৃষ্ণভক্তাশ্চ বুধৈরালম্বনা মতাঃ।
রত্যাদের্বিষয়ত্বেন তথাধারতয়াপি চ ॥ (ভ. র. সি ২।১।১৫)

যার সাহায্যে হৃদয়স্থিত শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক ভাব উদ্দীপ্ত হয় তা উদ্দীপন বিভাব। শ্রীকৃষ্ণের মৃদু হাসি, দেহের সুগন্ধ, বংশীধ্বনি, নূপুর, শঙ্খ, পদচিহ্ন প্রভৃতি ভক্তকে উদ্দীপ্ত করে, তাই শ্রীকৃষ্ণ-সংশ্লিষ্ট এ সব বস্তু ও ভাব উদ্দীপন বিভাব।

বিভাবের পরে (অনু) যে ভাবের জন্ম, তা অনুভাব,— 'অনুভাবস্তু চিত্ত-স্থভাবানামববোধকাঃ' (ভ. র. সি ২।২।১). অর্থাৎ, বিভাবের সাহায্যে কৃষ্ণরতি জাগ্রত হলে যে সব পরিচায়ক লক্ষণ বাহিরে প্রকাশ পায় তা হল অনুভাব। হৃদয়ে কৃষ্ণরতি বিক্ষুব্ধ হলে তা বাহিরে স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ পায় নৃত্য, গীত, চীৎকার, দীর্ঘশ্বাস ইত্যাদির মধ্য দিয়ে। হৃদয়স্থিত কৃষ্ণরতির বাহ্যিক প্রকাশে এই মাধ্যমগুলিই অনুভাব।

অনুভাবের সঙ্গে সাত্ত্বিক ভাবের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। কৃষ্ণরতি দ্বারা চিত্ত প্রভাবান্বিত হলে সেই চিত্তকে বলা হয় 'সত্ত্ব'। সত্ত্বগুণান্বিত চিত্তে যে সব ভাবের উদ্রেক হয় তাহারা সাত্ত্বিকভাব। সাত্ত্বিকভাব আটটি : স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, কম্প, বৈবর্ণ, অশ্রু ও প্রলয় বা মূর্ছা। ভরতমুনিও ঠিক এই কটি সাত্ত্বিক ভাবের উল্লেখ করেছেন।

রসসৃষ্টির আর একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় সামগ্রী হল ব্যভিচারীভাব। এর অন্য নাম সঞ্চারীভাব। ব্যভিচারী কথাটির সঙ্গে একটি নিন্দাসূচক ধারণা যুক্ত। কিন্তু অলংকারশাস্ত্রে পারিভাষিক শব্দ হিসাবে বিশেষ অর্থে এটি ব্যবহৃত হয়েছে। যে ভাবের গতি স্থায়ীভাবের অভিমুখে বিশেষরূপে নির্দিষ্ট তা ব্যভিচারীভাব— 'বিশেষণাভি মুখ্যেন চরন্তি স্থায়িনং প্রতি' (ভ. র. সি ২।৪।১)। স্থায়ীভাবকে সঞ্চারী বা ব্যভিচারীভাব উদ্দীপ্ত করে এবং স্থায়ীভাবের মধ্যে লীন হয়ে যায়।

রূপ গোস্বামী এই দুটি ভাবের পারস্পরিক সম্বন্ধ সমুদ্র ও তরঙ্গের সম্পর্কের সঙ্গে তুলনা করেছেন (ভ. র. সি ২।৪।৩)। স্থায়ীভাবরূপ সমুদ্রে উত্থিত হয়ে পরমুহূর্তে লীন হয়ে যায় যে ভাব তাকে বলা হয় ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাব। রসশাস্ত্রে ব্যভিচারী ভাবকে নির্বেদ, দৈন্য, হর্ষ, বিষাদ, গর্ব, ত্রাস প্রভৃতি তেত্রিশটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। বৃহত্তর অর্থে ব্যভিচারী অনুভাবের সগোত্র।

এসব সামগ্রীর মিলনে রসের উৎপত্তি হয়। প্রত্যেকটি সামগ্রীর নিজস্ব গুণ ও বৈশিষ্ট্য আছে। কিন্তু সুমিশ্রিত হবার পর তাদের পৃথক অস্তিত্ব লুপ্ত হয়। সৃষ্টি হয় এক নতুন বস্তুর এবং রসিকজনের আস্বাদনযোগ্য এই বস্তুই হল রস। ভরতমুনি বিভিন্ন সামগ্রীর সহযোগে রসসৃষ্টির প্রক্রিয়া বোঝাতে ব্যঞ্জনের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, রূপ গোস্বামী দিয়েছেন রসালার উদাহরণ। দধি, সীতা (মিষ্ট দ্রব্য), ঘৃত, মধু, মরীচ, বিট্‌লবণ, কর্পূর ইত্যাদির মিশ্রণে রসালা নামক সুস্বাদু রসযুক্ত পানীয় হয়। সামগ্রীগুলির মিশ্রণের ফলে রসের উৎপত্তি হয়। এবং এক অনাস্বাদিতপূর্ব স্বাদ অনুভূত হয়।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ রসনিষ্পত্তির এই পদ্ধতির কথা বলেছেন—

> বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ব্যভিচারী।
> স্থায়ীভাব রস হয় এই চারি মিলি ॥
> দধি যেন খণ্ড-মরিচ-কর্পূর মিলনে।
> রসালাখ্য রস হয় অপূর্বা স্বাদনে ॥ (চৈ. চ. ২।২৩।৪১-৪৫)

স্থায়ীভাব

বিভাব, অনুভাব ইত্যাদির সহযোগে স্থায়ীভাব রসে পরিণত হয়। মানব হৃদয়স্থিত ভাব তিন প্রকার— স্থায়ী, ব্যভিচারী ও সাত্ত্বিক। স্থায়ী ও সাত্ত্বিক ভাবের সংখ্যা আটটি করে। ব্যভিচারী ভাবের সংখ্যা তেত্রিশ। কোনো কোনো প্রাচীন আলংকারিক শান্তভাবকে স্থায়ীভাবের মর্যাদা দিয়েছেন। সুতরাং সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রানুযায়ী ভাবের সংখ্যা পঞ্চাশ। এদের মধ্যে কেবল আটটি, মতান্তরে নয়টি, স্থায়ীভাবেরই রসে পরিণত হবার যোগ্যতা আছে।

আটটি বা নয়টি ভাবকেই কেন স্থায়ী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়? স্থায়িত্বের অর্থই বা এখানে কি? স্থায়িত্ব দু'রকমের হতে পারে: মানব হৃদয়ে অবিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব; অথবা, ভাবটি এমন যার কখনও রূপান্তর ঘটে না। স্থায়ীর দ্বিতীয় ব্যাখ্যা যে এখানে প্রযোজ্য নয় তা আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে বোঝা যাবে। কারণ, বিভাব, অনুভাব প্রভৃতির দ্বারা হৃদয় উদ্বেলিত হলেই স্থায়ীভাব রসে পরিণত হওয়া সম্ভব।[১১]

অলংকারশাস্ত্রে রূপান্তর ঘটবে না অথচ রসে পরিণত হবে এমন কোনো ভাবের কথা আলোচিত হয়নি। তাহলে আমাদের মনে যে কয়টি ভাব অবিচ্ছিন্নরূপে অবস্থান

করে তারাই স্থায়ীভাব। অভিনবগুপ্ত বলেছেন, জন্মের সঙ্গে সঙ্গে জীব এই সব চিত্তবৃত্তিদ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ে এবং সেই প্রভাবের অস্তিত্ব নিরন্তর উপলব্ধি করা যায়। এই ভাবগুলি জীবের অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ তাই তারা স্থায়ী— 'স্থায়িত্বং চ এতাবতামেব। জাত এব হি জন্তুরিয়তীভিঃ সংবিদ্ভিঃ পরীতো ভবতি' (১।২৮৪)।

অবশ্য সব কটি স্থায়ীভাব হৃদয়ে একসঙ্গে অবস্থান করলেও এক এক সময় কোনো একটি বিশেষ ভাব অনুকূল বিভাব, অনুভাব প্রভৃতির প্রভাবে প্রাধান্য লাভ করে। তাই দেখা যায় কোনো নাটকে করুণ রসের, কোথাও হাস্য রসের, আবার অন্যত্র হয়ত বীর রসের প্রাধান্য। একটি স্থায়ীভাব প্রধান হলে অন্য ভাবগুলি, এমন কি স্থায়ী ভাবও ব্যভিচারীভাবের মতো গণ্য হয়।

ব্যভিচারীভাবের সঙ্গে স্থায়ীভাবের সম্পর্ক দু'টি দৃষ্টান্ত দিয়ে ভরতমুনি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। মনুষ্য সমাজে রাজার যে স্থান, শিষ্যদের মধ্যে গুরুর যে আসন, ব্যভিচারী ভাবসমূহের মধ্যে স্থায়ী ভাবের সেই মর্যাদা। প্রজা এবং শিষ্য যেমন রাজা ও গুরুর শক্তি বৃদ্ধি করে তেত্রিশটি ব্যভিচারীভাব তেমনি স্থায়ীভাবকে উদ্বেলিত করে।

' স্থায়ীভাবের সঙ্গে নৃপতির তুলনা রূপগোস্বামীও গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন :

অবিরুদ্ধান্ বিরুদ্ধাংশ্চ ভাবান্ যো
বশতাং নয়ন।
সুরাজেব বিরাজেত স স্থায়ীভাব উচ্যতে॥[৬৮]

অর্থাৎ, অবিরুদ্ধ [মিত্র] এবং বিরুদ্ধ [শত্রু] ভাব সমূহকে বশীভূত করে যে ভাব সুদক্ষ রাজার ন্যায় আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে তাহাকে 'স্থায়ীভাব' বলে। হাস্য, লজ্জা, উৎসাহ ইত্যাদি অবিরুদ্ধ বা মিত্রভাব ; ক্রোধ, শোক, বিষাদ প্রভৃতি বিরুদ্ধ বা শত্রুভাব।

রূপগোস্বামী স্থায়ীভাব সম্বন্ধে মোটামুটি রূপে সংস্কৃত আলংকারিকদের ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন। মূল পার্থক্য এই যে, রূপ একমাত্র কৃষ্ণরতিকেই স্থায়ীভাব বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন :

'স্থায়ী ভাবোঽত্র স প্রোক্তঃ শ্রীকৃষ্ণবিষয়া রতিঃ'।[৬৯]

অর্থাৎ, ভক্তিরসশাস্ত্রে কৃষ্ণবিষয়ক রতিকেই স্থায়ীভাব বলা হয়।

ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণরতি নিরবচ্ছিন্ন অবস্থিতির জন্য বৈষ্ণবাচার্যগণ একে বলেছেন স্থায়ীভাব।

মুখ্য ও গৌণরতি এবং রস

রূপগোস্বামী কৃষ্ণরতিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছেন—মুখ্য ও গৌণ।[৭০] মুখ্যরতি পাঁচটি, 'মুখ্যস্থ পঞ্চধা[৭১]...।' শান্ত [বা জ্ঞান], দাস্য [বা প্রীত],

সখ্য [বা প্রেয়], বাৎসল্য এবং মধুর [বা উজ্জ্বল]। এই পাঁচটি মুখ্যরতি বিভাব অনুভাব প্রভৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে শান্তরস, দাস্যরস, সখ্যরস, বাৎসল্যরস এবং মধুর বা উজ্জ্বলরসের নিষ্পত্তি করে।

এছাড়া আছে সাতটি গৌণ রতি এবং গৌণ রস— হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক এবং বীভৎস।[৭২] এই সাতটি গৌণ রতি থেকে সৃষ্টি হয় অনুরূপ সাতটি গৌণরস।

এই মুখ্য ও গৌণরসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ :

'শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর রস নাম।
কৃষ্ণ ভক্তিরস মধ্যে এ পঞ্চ প্রধান॥
... ...
হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, বীভৎস, ভয়।
পঞ্চবিধ ভক্তে গৌণ সপ্তরস হয়॥'[৭৩]

মুখ্য ও গৌণ রস ও রতি উভয়েরই একমাত্র অবলম্বন কৃষ্ণভক্তি। মুখ্যরতি ও রসের ক্ষেত্রে কৃষ্ণভক্তির উপলব্ধি স্পষ্ট। মুখ্য রতিসমূহের বিকাশ ও রসের পরিণতি শ্রীকৃষ্ণের সহিত ভক্তের পাঁচটি সম্পর্ক কেন্দ্র করে হয়। যে ভক্তের মনে শান্তরস জাগ্রত হয় তিনি শ্রীকৃষ্ণকে পরব্রহ্ম-পরমাত্মা হিসাবে গণ্য করে তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেন। অন্যান্য চারটি সম্পর্ক অতি পরিচিত মানবিক বন্ধন ; যথা দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর।

গৌণরতির উদ্ভবের কারণ এত স্পষ্ট নয়। সাতটি গৌণরতির মধ্যে প্রথমটির কথাই ধরা যাক। শ্রীকৃষ্ণ অথবা তাঁর পরিকরগণের বাক্য, বেশ ও চেষ্টাদির বিকৃতি ঘটলে ভক্তের মনে যে হাসির উদ্রেক হয় তা হাস্যরতি। ভক্তের হাসির পশ্চাতে থাকে ভগবানের প্রতি প্রীতি, যেমন, মা ছেলের বা স্ত্রী স্বামীর পোশাকের বিকৃতি দেখলে হাসেন। এই হাস্যরতি উপযুক্ত বিভাবাদির দ্বারা পরিপোষিত হলে হাস্য ভক্তিরসে পরিণত হয়।

শান্তাদি পঞ্চবিধ মুখ্যরতি ভক্তের হৃদয়ে সতত বিরাজমান থাকে। কিন্তু সাতটি গৌণরতি 'অনিয়তধারা' অর্থাৎ ভক্তের হৃদয়ে সর্বদা উপস্থিত থাকে না। কোনো কারণ উপস্থিত হলে তারা আগন্তুক রূপে উদয় হয় এবং সেই কারণ দূর হলেই অন্তর্হিত হয়ে যায়।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাই বলেছেন,—

পঞ্চরস 'স্থায়ী' ব্যাপি রহে ভক্তমনে।
সপ্তগৌণ আগন্তুক পাইয়ে কারণে॥[৭৪]

মুখ্যরতির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, শান্ত থেকে দাস্য, দাস্য থেকে সখ্য, সখ্য থেকে বাৎসল্য এবং বাৎসল্য থেকে মধুর রতিতে ক্রমশ রসাস্বাদের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়। রূপ বলেছেন—

'যথোত্তরমসৌ স্বাদবিশেষোল্লাসময্যপি।

রতির্বাসনয়া স্বাদ্বী ভাসতে কাপি কস্যচিৎ ॥'[৭৫]

অর্থাৎ পঞ্চবিধ মুখ্য রতির উত্তরোত্তর স্বাদ বিশেষ রূপে আনন্দময় হয়ে ওঠে। প্রাক্তন বাসনা অনুযায়ী ভক্তের নিকট কোনো একটি রতি রুচিকর হয়। কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই তত্ত্বটি সহজ করে বলেছেন :

পূর্ব পূর্ব রসের গুণ পরে পরে হয়।
এক দুই গণনে পঞ্চ পর্যন্ত বাড়য় ॥
গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্যে বাড়ে প্রতি রসে।
শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে ॥[৭৬]

মুখ্য ও গৌণ রসের স্থায়ীভাব

পূর্বে স্থায়ীভাব সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। স্থায়ীভাব রসের ভিত্তিস্বরূপ। সুতরাং মুখ্য বা গৌণ সব রসেরই একটি করে স্থায়ীভাব অবশ্যই থাকবে। যে রতি বিভাবাদি চারটি ভাবের সংযোগে বিকাশ লাভ করে ও আনন্দ চমৎকারিতা সৃষ্টি দ্বারা রসরূপে পরিণত হয় এবং প্রতিনিয়ত সেই রসে যার প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ থাকে, সেই রতিকে ঐ রসের স্থায়ীভাব বলা হয়। প্রত্যেক রসের নিজস্ব স্থায়ীভাবই হল সেই রসের ভিত্তি।

পূর্বে বলা হয়েছে বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে রতি বলতে একমাত্র কৃষ্ণরতিকে বোঝায়। ব্যাপক অর্থে রতি শ্রীকৃষ্ণবিষয়িনী প্রেমকে বোঝায়; যেমন শান্তরতি, দাস্যরতি, ইত্যাদি। এখানে রতিকে একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। কৃষ্ণবিষয়িনী প্রীতির প্রথম আবির্ভাবকেই এখানে রতি বলে নির্দেশ করা হয়েছে। এই প্রীত্যাঙ্কুর বিভাবাদির সঙ্গে মিলিত হয়ে রসের সৃষ্টি করে।

ভক্তির অধিকার ভেদে মুখ্যরতি পাঁচপ্রকার, শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। এই পাঁচটি রতি শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর— এই পঞ্চরসের স্থায়ীভাব। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন :

ভক্ত ভেদে রতি ভেদ পঞ্চ পরকার।
শান্ত রতি, দাস্য রতি, সখ্য রতি আর ॥
বাৎসল্য রতি, মধুর রতি— এ পঞ্চ বিভেদ।
রতি ভেদে কৃষ্ণভক্তি রসে পঞ্চভেদ ॥

পাঁচটি মুখ্যরসের ভিত্তিস্বরূপ পাঁচটি রতিকেও বলা হয় মুখ্যরতি। রূপগোস্বামী মুখ্যরতির সংজ্ঞা দিয়েছেন :

'শুদ্ধ সত্ত্বাবিশেষাত্মা রতির্মুখ্যেতি কীর্তিতা।'[৭৭]

অর্থাৎ হ্লাদিনীবোধে উদ্দীপ্ত কৃষ্ণের স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষকে বলা হয় মুখ্য রতি। কৃষ্ণবিষয়ক প্রীতি বলেই তা স্বভাবতই 'শুদ্ধসত্ত্ব বিশেষাত্মক' বা স্বরূপ লক্ষণ যুক্ত।

প্রকৃতপক্ষে মুখ্য রতি একটি, কৃষ্ণবিষয়িনী প্রীতি। পাঁচটি রতি কৃষ্ণপ্রীতিরই স্তরভেদ মাত্র। রূপগোস্বামী প্রাচীন আলংকারিকদের মত উদ্ধার করে সমর্থন জানিয়েছেন :

অষ্টানামেব ভাবানাং সংস্কারাধায়িতা মতা।
তত্তিরস্কৃত সংস্কারাঃ পরে ন স্থায়িতোচিতাঃ ॥[৭৮]

এর ভাবার্থ হল এই যে, এক মুখ্য রতি এবং হাসাদি সাত গৌণ রতি— এই আটটি ভাবেরই সংস্কারের প্রতিষ্ঠা স্বীকৃত হয়েছে। বিরুদ্ধভাব দ্বারা যাদের সংস্কার পর্যন্ত লোপ পায়, সেই সব ব্যভিচারীভাবের স্থায়িত্ব লাভের যোগ্যতা নেই।

এই ব্যাখ্যা থেকে গৌণরতির স্বরূপ সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্টতর হয়। হাসাদি সাতটি গৌণ রতি হল আগন্তুক এবং বিশেষ পরিস্থিতে তারা লুপ্ত হয়ে যায়। তা হলে গৌণ রতির স্থায়িভাবত্ব কি করে সম্ভব ?

এই প্রশ্নের দুটি উত্তর দেওয়া যেতে পারে। প্রথমত, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুর টীকায় বলেছেন, কোনো প্রবলতর ভাবের (মুখ্যরতির) সংস্পর্শে গৌণ রতির লয় হলেও সংস্কার থেকেই যায়, তার লুপ্তি ঘটে না। অতএব সংস্কারের স্থায়িত্বকে অবলম্বন করে হাসাদি গৌণ রতির স্থায়িভাবের প্রতিষ্ঠা হয়।

দ্বিতীয়ত, মুখ্য রতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল অন্য ভাবকে আশ্রয় দেওয়া। হাসাদির নিজগুণে রতি হিসাবে মর্যাদা লাভের যোগ্যতা নেই।[৭৯] মুখ্য রতির দ্বারা অনুগৃহীত হলেই এরা রতি হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সুতরাং সংশ্লিষ্ট মুখ্য রতির স্থায়িভাবই গৌণরতিকে স্থায়িভাবত্ব দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করে।

বাৎসল্য রস

পাঁচটি মুখ্যরসের মধ্যে মধুররসই সর্বপ্রধান। গৌড়ীয় রসশাস্ত্রে মধুররসের স্থান সকলের উপরে, কারণ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্ত তাঁর আরাধ্য দেবতাকে কান্তাভাবে ভজনা করাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হিসাবে স্বীকার করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কান্ত এবং রাধা বা ভক্ত তাঁর কান্তা। খ্রীস্টান মরমী ভক্তরাও এই সাধন পদ্ধতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। নিউম্যান বলেছেন, 'If thy soul is to go on to higher spiritual blessedness, it must become woman— yes, however manly you may be among men.'[৮০]

ভক্ত বলেন, শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রিয়, আমি তাঁর অনুরাগিনী কান্তা। এই লৌকিক জগতে যে মানবিক সম্বন্ধ সর্বাপেক্ষা মধুর তার সাহায্যে ভক্ত ও ভগবানের প্রগাঢ় প্রীতির বন্ধনকে উপলব্ধি করা যায়। মধুর রসের ভিত্তি মধুর রতি। এই মধুর রতি এবং মধুররস কোনো ভক্ত একেবারেই আয়ত্ত করতে পারেন না। মধুর রতিতে শান্তরতির কৃষ্ণনিষ্ঠা, দাস্যরতির সেবা, সখ্যরতির সম্ভ্রমহীন প্রীতির সম্পর্ক এবং বাৎসল্যরতির সপ্রেম কল্যাণ কামনা ও পরিচর্যা একই সঙ্গে মিলিত হয়েছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাই বলেছেন :

মধুররসে কৃষ্ণনিষ্ঠা, সেবা অতিশয়।
সখ্যের অসংকোচ, লালন মমতাধিক হয়॥
কান্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন।
অতএব মধুররসের হয় পঞ্চগুণ॥[৮১]

সাধন পথে ভক্তের প্রথম প্রাপ্তি শান্তরতি। এই রতি সাধনায় অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শান্তরসে পরিণত হয়। ভরতমুনি শান্তরসকে তাঁর উল্লেখিত আটটি রসের মধ্যে স্থান দেননি। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণ শান্তরতি ও শান্তরসকে প্রেমভক্তির সর্বনিম্ন স্তর হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। ধর্ম সাধনায় সর্বপ্রথম দরকার চিত্তকে সকল পার্থিব আকর্ষণ ও বিক্ষোভ থেকে মুক্ত করে প্রশান্তি লাভ করা। এই অবস্থায় ভক্তের হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রতি মমতাবোধ জাগ্রত হয় না। শুধু শ্রীকৃষ্ণে নিষ্ঠা ও পরমাত্মজ্ঞানের উপলব্ধি ভক্তকে পরবর্তী সাধন স্তরের জন্য প্রস্তুত করে। কৃষ্ণদাস কবিরাজের কথায়:

শান্তের স্বভাব-কৃষ্ণে মমতা-গন্ধহীন।
পরংব্রহ্ম-পরমাত্মা-জ্ঞান-প্রবীণ॥[৮২]

রাগভক্তির দ্বিতীয় পর্ব দাস্যরতি বা দাস্য ভাব। রতি যোগ্য বিভাবাদির সঙ্গে মিলিত হয়ে দাস্যরসে পরিণত হয়। দাসোচিত সেবার সঙ্গে থাকে প্রীতি। প্রকৃতপক্ষে দাস্যরতিতেই শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির প্রথম প্রকাশ। প্রেমভিত্তিক সাধনার সূত্রপাত দাস্যরসে। দাস্যরসে ভক্তের মনোভাব অনেকটা এইরূপ: 'তুমি প্রভু আমি দাস। আমি সেবা না করলে তোমার তৃপ্তি হয় না।' আমার সেবা ছাড়া চলে না এই ভাবের মধ্যে রয়েছে প্রীতির অংকুর। শান্তের নিষ্ঠা ও দাস্যের সেবাবৃত্তি এই উভয়ের মিলন দাস্যরসকে পূর্ণ করে। দাস্যভাবাবিষ্ট ভক্তের মন থেকে সম্ভ্রম বা সংকোচ দূর হয়ে যায় না, তাই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নিজের পার্থক্য সম্বন্ধে সচেতনতাসঞ্জাত দূরত্বের অনুভূতি থেকে যায়। হনুমান, নারদ, প্রহ্লাদ প্রভৃতি দাস্যরসাস্থিত ভক্ত। কৃষ্ণসাধনার তৃতীয় স্তর সখ্যরতি, যা ক্রমে সখ্যরসে পরিণত হয়। সখ্যপ্রেমে শ্রীকৃষ্ণ ও ভক্তের মধ্যে সংকোচ দূর হয়ে যায়, উভয়ের মধ্যে পার্থক্যবোধ থাকে না। সখা শ্রীকৃষ্ণের সহিত একত্র শয়ন, ভোজন ও খেলা করেন। ভক্তসখা রূপে কৃষ্ণের প্রতি মমতাবুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে ব্যবহার করেন সমকক্ষের মতো। শান্ত ও দাস্যভাবে ভক্ত শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা যে হীন এই অনুভূতি থাকে। কিন্তু সখ্যভাবে শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব অনুপস্থিত। সখ্য প্রেমে শান্তের নিষ্ঠা, দাস্যের সেবা ও সখ্যভাবের সমস্তরের বন্ধুত্বের অসংকোচ প্রীতির অনুভূতি মিশ্রিত দেখা যায়। আদর্শ সখ্যপ্রেমের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় সুবল, মধুমঙ্গল প্রভৃতি ব্রজকিশোরগণের বন্ধুপ্রীতির মধ্যে।

সখ্যরসের সুন্দর ব্যাখ্যা পাওয়া যায় চৈতন্যচরিতামৃতে:

শান্তের গুণ, দাস্যের সেবন— সখ্যে দুই হয়।
দাস্যের সম্ভ্রম-গৌরব-সেবা, সখ্যে বিশ্বাসময়॥

বিশ্রম্ভ-প্রধান সখ্য— গৌরব-সম্ভ্রম-হীন।
অতএব সখ্যরসের তিনগুণ-চিহ্ন॥
'মমতা' অধিক, কৃষ্ণে আত্মসম জ্ঞান।
অতএব সখ্যরসের বশ ভগবান্॥[৮৩]

রাগভক্তির চতুর্থ পর্ব বাৎসল্য ভাব। ভক্তের হৃদয়ে এই ভাবের উদয় হলে মমতা বৃদ্ধি এত অধিক হয় যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে ছোটো ও অসহায় বলে ধারণা জন্মে। মনে হয় বালক শ্রীকৃষ্ণকে সপ্রেমে পালন করা, উপদেশ দেওয়া, বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করা ইত্যাদি নন্দ-যশোদার ন্যায় ভক্তেরও কর্তব্য। শ্রীকৃষ্ণ নিজেও ভক্তের গুরুজনসুলভ আচরণ মাথা পেতে স্বীকার করে নেন।

বাৎসল্য রসের বিস্তৃত আলোচনা আরম্ভ করার আগে অন্য চারটি মুখ্য রতি ও রসের সামান্য পরিচয় দেওয়া হল। শান্ত, দাস্য, সখ্য ও মধুর ভাবের সবিস্তার আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তবে এদের সাধারণ পরিচয় দেওয়ায় রাগভক্তির সাধন পরিকল্পনায় বাৎসল্যরসের স্থান নিরূপণ সহজতর হতে পারে।

বাৎসল্য ভাবের ব্যাপকতা : মধুরভাব গভীর হতে পারে, গুণে শ্রেষ্ঠ স্বীকার করা যায়, কিন্তু বাৎসল্য ভাবের মতো তা ব্যাপক নয়। প্রাণীজগৎ ও মানব জগতের সর্বত্র বাৎসল্য সহজাত প্রবল বৃত্তি। সুতরাং ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে, আরাধ্য দেবতার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে এবং লৌকিক ও ধর্মভিত্তিক সাহিত্য রচনায় স্বাভাবিকরূপেই বাৎসল্যভাবের সুদূর প্রসারী প্রভাব লক্ষণীয়। আরাধ্য দেবতার সঙ্গে যখন রসসিক্ত সম্পর্ক গড়ে ওঠে তখন ভক্তের আকাঙ্ক্ষা হয় সেই সম্পর্ককে কোনো পার্থিব বাস্তব বন্ধন দিয়ে চিহ্নিত করতে। বৈষ্ণব সাধন-পদ্ধতি যেরূপ প্রগাঢ় রসানুভূতিশীল তেমন আর কোনো ধর্মের আরাধন রীতিতে নেই। বালক পুত্র ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত ভক্ত কিংবা ঈশ্বর বিমুখ ব্যক্তি, প্রত্যেকের নিকটই একান্ত প্রিয়। সেজন্য আরাধ্য দেবতাকে পুত্ররূপে কল্পনা করায় অনির্বচনীয় আনন্দরসের সৃষ্টি হয়। পুত্রকে আদর করা যায়, সেবা করা যায়, ভর্ৎসনা করা যায়, নিজের রুচি ও ইচ্ছাকে তার উপর আরোপ করবারও একটা সুযোগ থাকে। মধুরভাব শুধু দয়িত ও দয়িতার মধ্যে সীমাবদ্ধ; বাৎসল্যভাবের ক্ষেত্র পিতামাতা ও সন্তানের মধ্যে নিবদ্ধ নয়। অগ্রজ-অগ্রজা, অন্যান্য গুরুজন এবং প্রতিবেশী সকলের মনেই বাৎসল্য রস জাগ্রত হতে পারে। বৈষ্ণবের নিকট তাই বালগোপালের আরাধনা এত প্রিয়।

অন্য ধর্মসম্প্রদায়েও বাৎসল্যভাবে আরাধনা করা হয়। শাক্ত সম্প্রদায় উমাকে কন্যারূপে দেখেছে। রামপ্রসাদ প্রভৃতি মাতৃসাধকদের মধ্যে রয়েছে প্রতিবাৎসল্য। অর্থাৎ, ভক্ত আরাধ্যা দেবীকে মাতৃরূপে কল্পনা করেন। তবে শাক্তসাধনায় বৈষ্ণবীয় বাৎসল্যভাবের মতো আবেগের গভীরতা নেই।

যীশুখ্রীস্ট ও বালগোপাল

আমাদের সামাজিক জীবনে বাৎসল্যরসের ব্যাপক অস্তিত্বের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। পৃথিবীর সকল দেশের সাহিত্যেই মানব মনের এই সুগভীর বৃত্তির অল্পাবিস্তর প্রতিফলন দেখা যায়। কিন্তু বাৎসল্যভাবকে দেবত্বে প্রতিষ্ঠা করবার বৈশিষ্ট্য বিশেষরূপে লক্ষণীয় বৈষ্ণব ও রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের মধ্যে। যীশুখ্রীস্ট এবং বালগোপাল উভয়েই বাৎসল্য রসের প্রতীক। বাৎসল্যরসে ভাবিত হয়ে বৈষ্ণব ও খ্রীস্টান ভক্তরা কৃষ্ণ ও যীশুর আরাধনা করেন। কৃষ্ণ ও যীশুর বাল্য জীবনে অনেক ক্ষেত্রে সাদৃশ্য দেখা যায়। দুজনেই বড়ো হয়েছেন মাতৃসমা স্নেহময়ী রমণীর কাছে, নিজের মার কাছে নন। অবশ্য ধর্মপ্রাণ খ্রীস্টানরা বিশ্বাস করেন কুমারী মারীই যীশুর প্রকৃত মাতা। কিন্তু বর্তমান যুক্তিশাসিত যুগে বিশ্বাস করা কঠিন যে, এক কুমারী নারী সন্তানের জননী হয়েছিলেন। প্রকৃত ঘটনা হয়ত এই যে, কুমারী মারী অন্য কারো পুত্রকে নিজের পুত্রের মতো সযত্নে মানুষ করেছিলেন। নন্দ ও জোসেফও আপন পুত্রের মতোই যথাক্রমে কৃষ্ণ ও যীশুকে ভালোবেসেছেন, লালন পালন করেছেন। কংস কৃষ্ণকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন; বসুদেব তাই তাঁকে কারাগার থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন যশোদার কোলে। রাজা হেরোদ যীশুকে হত্যা করার জন্য তাঁর সন্ধান করছেন, এই দৈববাণী শুনে জোসেফ ও মারী পুত্রকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন মিশরে। কংস আত্মরক্ষার জন্য মথুরার দশ দিবস বয়স্ক সকল শিশুকে হত্যা করবার পরিকল্পনা করেছিলেন। তেমনি রাজা হেরোদও নিজেকে বিপন্মুক্ত করবার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন দু'বছর বয়স পর্যন্ত সকল বালককে হত্যা করবার। বালক কৃষ্ণের অনেক অলৌকিক ক্ষমতার কাহিনী লেখা আছে নানা পুঁথিতে। যীশুর বাল্যজীবনের কিছু কিছু অলৌকিক ঘটনার কথাও জানা যায়। বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য দীক্ষাস্নানের সময় আকাশ হঠাৎ উন্মুক্ত হয়ে যাওয়া, শয়তানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া এবং মাত্র বারো বৎসর বয়সে দিক্‌পাল সব পণ্ডিতদের সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা করা ইত্যাদি। যীশুর রাখালদের সঙ্গে যোগাযোগ, বনে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ানো প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে কৃষ্ণের জীবন-কথার অনেক মিল অস্বীকার করা যায় না। এছাড়া আরো একটি আশ্চর্যজনক মিল আছে যীশুর সঙ্গে কৃষ্ণের। হিন্দু দেবতাদের মধ্যে একমাত্র কৃষ্ণেরই জন্মোৎসব সাড়ম্বরে পালিত হয়, যীশুখ্রীস্টের জন্মোৎসবেরই মতো।

কিন্তু এসব সাদৃশ্য বাহ্যিক। বালগোপালের আরাধনার কথা আমরা জানি। বালক যীশুকে কিভাবে পুজা করা হত এবং এখনও হয়ে থাকে তা সংক্ষেপে বলা দরকার।

মারী ও জোসেফ দৈববাণী থেকে জেনেছেন যীশু মুক্তিদাতা ঈশ্বরপুত্র। তখন যীশুর মাত্র জন্ম হয়েছে, তখনও তিনি জাব-দানের (manger) মধ্যে শুয়ে। দৈববাণীর দ্বারা নির্দেশিত হয়ে রাখালের দল এসে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে গেল।

তারপর এল প্রাচ্যদেশীয় পণ্ডিতের দল। তাঁরা যীশুকে বন্দনা করে বলে গেলেন, ইনি ঈশ্বরের পুত্র, মানুষের ত্রাণকর্তা। তারপর থেকে ঈশ্বরের পুত্র এবং মুক্তিদাতা হিসাবে বালক যীশু পূজিত হয়ে আসছেন। এই বন্দনা স্থায়িত্ব লাভ করেছে বিশেষ করে ইতালীর 'ব্যাম্বিনো'[৮৪] প্রতিমা রূপের মধ্যে। 'ব্যাম্বিনো' শব্দের অর্থ বেবি বা শিশু। মারীর কোলে কাঁথা জড়ানো একটি শিশুর প্রতিমা শিল্পীদের বিষয়। এই বিষয় অবলম্বন করে রেনেসাঁস যুগে অনেক উৎকৃষ্ট চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতকের একটি ফ্রেস্কো (রোমের সেণ্ট প্রিসিলা গীর্জায়) এই রীতির প্রাচীনতম চিত্র। রোম শহরে খ্রীস্টান পর্ব উপলক্ষে আজও দুফুট উঁচু 'পবিত্রতম শিশুর' প্রতিমূর্তি নিয়ে শোভাযাত্রা বের করা হয়; মূর্তিটি তৈরি জলপাই কাঠের। এই শিশুর মূর্তিকে পরানো হয় 'সোয়াডলিং ক্লোদস'[৮৫], মাথায় পরানো হয় মণিমুক্তাখচিত সোনার মুকুট। রথে বসিয়ে রাস্তা দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হয় বালক যীশুর মূর্তি। রথের দুপাশে থাকেন পাদ্রি ও ভক্তের দল। তাঁরা ধর্মসংগীত গাইতে গাইতে পথ চলেন। অনুরূপ শোভাযাত্রা বেথেলহেমেও বার করা হয়। তবে সেখানকার বালক যীশুর মূর্তি কাঠের নয়, মোমের তৈরি।[৮৬]

বালক যীশুর ও বালক কৃষ্ণের আরাধনার মধ্যে দুটি প্রধান পার্থক্য দেখা যায়। প্রথমত, যে কৃষ্ণকে পূজা করা হয় তাঁর কিশোর মূর্তিই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। শ্রীরামকৃষ্ণ কৃষ্ণের মূর্তি এইরূপে কল্পনা করেছিলেন: 'It is a tender female face that Krishna has; in it is the fullness of boyish delicacy and girlish grace.'[৮৭] অপরপক্ষে যে যীশুকে পূজা করা হয় তিনি একেবারে মায়ের কোলের শিশু।

দ্বিতীয়ত, বালক যীশুর আরাধনার মধ্যে বাৎসল্য ভাবের উপস্থিতি সামান্যই উপলব্ধি করা যায়। একবার পথ চলতে মারী যীশুকে হারিয়ে ফেললেন। অনেক পরে তাঁকে ফিরে পেয়ে মারীর উদ্বেগ প্রকাশের মধ্যে একটু বাৎসল্যরসের আবির্ভাবের সম্ভাবনা দেখা দিতে না দিতেই তা দূর হয়ে গেল যীশুর উত্তরে। তিনি দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, 'কেন চিন্তা করছিলে। তুমি কি জান না, পিতার গৃহেই (অর্থাৎ মন্দিরেই) আমি থাকব?'[৮৮]

যীশু যে ঈশ্বরের পুত্র, সাধারণ মানব পুত্র নন, তা ভুলে থাকা যায় না। জন্মের পর থেকেই তিনি দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত। তাই এ ক্ষেত্রে বাৎসল্যভাব জাগ্রত হবার অবকাশ কম। কৃষ্ণও যশোদার কোলে বসেই মুখের মধ্যে তাঁকে বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন, সুতরাং যশোদা ও অন্য অনেকেই অবহিত ছিলেন কৃষ্ণের দেবত্ব সম্বন্ধে। কিন্তু বৈষ্ণব কাব্যে আমরা দেখতে পাই যশোদা, কবি এবং পাঠক বা শ্রোতা, সকলেই তাঁর দেবত্ব বিস্মৃত হয়ে বাৎসল্যরসে আবিষ্ট। কৃষ্ণ এক্ষেত্রে একান্তই মানবপুত্র, স্নেহের বন্ধনে ধরা দেবার জন্য যিনি সর্বদা উন্মুখ।

সংসারের সকল মালিন্যমুক্ত শিশু দেবতার ঘনিষ্ঠতম। হয়ত এইজন্যই শিশুকে দেবতার স্থলাভিষিক্ত করে পূজা করা হয়। জার্মান মরমী সাধক হেনরী সুসো[৮৯]

একদিন সাধনা-নিমগ্ন অবস্থায় মারীর কোল থেকে শিশু যীশুকে কোলে নিয়েছেন। বালক যীশুর অঙ্গ স্পর্শের সুখানুভূতিতে তিনি, 'Uttered a cry of amazement that He who bears up the heavens is so great and yet so small, so beautiful in heaven and so childlike on earth'[১০]

মরমী সাধকের দৃষ্টিতে বালক দেবতার আরাধনার এটি সুন্দর ব্যাখ্যা।

উনবিংশ শতকের শেষার্ধ থেকে কয়েকজন ভারতবিদ্যাবিদ্ প্রমাণ করতে উদ্যোগী হলেন যীশুর বাল্যজীবন কেন্দ্র করে যে ধর্মচর্যার উদ্ভব হয়েছিল তা বালগোপালের কিংবদন্তীকে বিশেষরূপে প্রভাবান্বিত করেছে। এমনকি, হয়ত বালক যীশুই বালগোপাল কাহিনীর উৎস। বিতর্কের সূত্রপাত করেন ভেবর,[১১] ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণজন্মাষ্টমীর উৎস অনুসন্ধানবিষয়ক একটি প্রবন্ধ লিখে।[১২] এই সূত্র অবলম্বনে হপকিনস,[১৩] কেনেডি,[১৪] ম্যাকনিকল,[১৫] প্রভৃতি বেশ কয়েকজন নানা যুক্তি উত্থাপন করেন, কৃষ্ণকাহিনীর উৎপত্তি যে খ্রীস্টান ধর্মীয় ঐতিহ্যে নিহিত তা সমর্থন করে। ম্যাকনিকলের ধারণা যে, নেস্টোরিয়ান[১৬] মিশনারীরা যখন খ্রীস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ভারতে আসেন তখন কৃষ্ণকিংবদন্তীর সঙ্গে যীশুকথা মিলিত হয়ে বালগোপাল কাহিনী ধীরে ধীরে বর্তমান রূপ লাভ করে।

কেনেডি এক দীর্ঘ প্রবন্ধে বলেছেন, দ্বারকার কৃষ্ণ এবং মথুরার বালগোপাল অভিন্ন হতে পারেন না। তাঁর বক্তব্য এই যে, পৌরাণিক উপখ্যান আলোচনা করলে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় একই নামধারী দেবতা বিভিন্ন অঞ্চলে ও বিভিন্ন যুগে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য নিয়ে আবির্ভূত হন। পরবর্তীকালে এই সব ছোটো ছোটো দেবতাদের দেখা যায় সকল বৈশিষ্ট্য ও কিংবদন্তীর সমন্বয় সহ এক মহান পরাক্রান্ত দেবতায় রূপান্তরিত হতে। কৃষ্ণ এমনই এক দেবতা। কিন্তু তাঁর বালগোপাল রূপটি যেন হঠাৎ দ্বারকার কৃষ্ণকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে। খ্রীস্টীয় সপ্তম শতকে তাঁকে প্রথমেই প্রভাবশালী দেবতা হিসাবে দেখা যায়, পৌরাণিক অন্যান্য দেবতার মতো তাঁর ক্রমবিবর্তন নেই। এই জন্যই মনে হয় বালগোপালের রূপকল্পনার উৎস বিদেশে নিহিত এবং তা যীশুর বালরূপকে কেন্দ্র করে বিকাশ লাভ করেছে। অবশ্য এই বিদেশাগত দেবকল্পনার সঙ্গে হিন্দু ধর্মের কিছু ধ্যানধারণা যুক্ত হওয়াতে বালগোপাল এদেশে সহজেই গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছেন।[১৭] এই নতুন দেবতার আগমন হল কোন উপায়ে? কেউ কেউ বলেন শক গোষ্ঠীর যাযাবর উপজাতি গুর্জররা খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতকে যখন মথুরার নিকটে বসবাস আরম্ভ করে তখন থেকে বালগোপালের আবির্ভাব। গ্রীস, জেরুজেলাম ও সন্নিহিত অঞ্চলের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এসেছিল গুর্জরদের সঙ্গে। সে ঐতিহ্যের মধ্যমণি ছিলেন যীশু।

একদা বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রাক্তন কেন্দ্র মথুরায় তখন এই দুই ধর্মের প্রভাব অনেকটা ম্লান হয়ে এসেছে; স্মার্ত—পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম তখন সুপ্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। এই পরিবেশে এক নতুন বালক দেবতার রূপ-কল্পনা আত্মস্থ করে নিতে হিন্দুদের পক্ষে কোনো দ্বিধা হয়নি। কেনেডির বক্তব্যের এই হচ্ছে সামান্য সংক্ষিপ্তসার।

তিনি আরো বলতে পারতেন, এই মথুরা অঞ্চলেই পরবর্তীকালে বল্লভাচার্য বালগোপালের পূজা যেমন জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন দেশের অন্যত্র তা হয়নি।

রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরও[৯৮] বালগোপাল উপাসনার উপর খ্রীস্টান ধর্মের প্রভাব স্বীকার করেছেন। কৃষ্ণ নামটি খ্রীস্ট থেকে আসতে পারে এখন সম্ভাবনাও তিনি দেখেছেন। বাঙালীরা কৃষ্ণকে 'কিস্ট' বা 'কেষ্ট' উচ্চারণ করে, যা খ্রীস্টর কাছাকাছি। তাঁর মতে গুর্জররা নয়, আভীর জাতির লোকরাই বালক যীশুর পূজার কাহিনী প্রচার করেছে। ব্রজগোপীদের সঙ্গে। কৃষ্ণের লীলাখেলার কাহিনীও এসেছে আভীর সমাজ থেকেই।

একালের ঐতিহাসিক বাশম বলেন, বালক কৃষ্ণের আবির্ভাবের ইতিহাস সম্পূর্ণ অজানা। এটা অসম্ভব নয় যে ভারতের পশ্চিম উপকূলে যাতায়াতকারী খ্রীস্টান বণিকরা এবং নেস্টোরিয়ান পাদ্রিরা যীশুকথা এদেশে প্রচার করেছিলেন। তা থেকে বালগোপালের ধারণা কিছুটা প্রভাবিত হওয়া সম্ভব।[৯৯]

আর্থার বেরিডেল কীথ বিগত শতকের পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের সঙ্গে একমত হতে পারেননি। তিনি বলেছেন, কৃষ্ণ বালগোপালের কথা ষষ্ঠ শতকের অনেক আগেই পাওয়া যায়। যে সব খ্রীস্টানশাস্ত্র প্রমাণ হিসাবে কেনেডি প্রমুখ পণ্ডিতরা উল্লেখ করেছেন, তাদের রচনাকাল অনিশ্চিত। তাছাড়া প্রভাবটা তো পারস্পরিকও হতে পারে। হয়তো কৃষ্ণ কিংবদন্তীই শিশু যীশুর আরাধনাকে প্রভাবিত করেছে।[১০০]

কীথের অভিমত ভেবে দেখবার মতো। তিনি বলেছেন, হয়ত কৃষ্ণকিংবদন্তীই বালক যীশুর আরাধনাকে প্রভাবিত করেছে। তার কারণও যে একেবারে নেই তা বলা যায় না। প্রথমত যীশুর জন্মের অব্যবহিত পর প্রাচ্যদেশের পণ্ডিতরা তাঁকে সোনা ধুনো ও গুগ্‌গুল ইত্যাদি দিয়ে বন্দনা করেন। ধুনো ও গুগ্‌গুল ভারত থেকেই রপ্তানী করা হত। কৃষ্ণকাহিনী হয়ত এই পণ্ডিতরাই বেথেলহেমে নিয়ে গিয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত, রোমে জলপাই কাঠের যে বালক যীশুর মূর্তি নিয়ে শোভাযাত্রা বের করা হয় সেই মূর্তির রঙ কালো। শ্বেতকায়দের দেশে কৃষ্ণমূর্তির পূজা তাৎপর্যপূর্ণ।

ডঃ ভাণ্ডারকর কৃষ্ণ ও খ্রীস্ট নামের মধ্যে ঘনিষ্ঠতার উল্লেখ করে ইঙ্গিত করেছেন যে খ্রীস্টই ভারতে এসে কৃষ্ণ হয়েছেন। কিন্তু আমরা প্রথম অধ্যায়ে দেখিয়েছি যে ঋগ্‌বেদেও কৃষ্ণ নাম পাওয়া যায়। ঋগ্‌বেদ নিঃসন্দেহে যীশুর জন্মের পূর্বে রচিত। সুতরাং ডঃ ভাণ্ডারকরের খ্রীস্টান প্রভাবের এই দৃষ্টান্তটি যুক্তিসহ নয় বলেই মনে হয়।[১০১]

গৌড়ীয় রস-তত্ত্ব ও হিন্দী-কৃষ্ণকাব্য

গৌড়ীয় রসশাস্ত্রের প্রভাব বাংলা পদাবলী সাহিত্যেই নিবদ্ধ ছিল না; হিন্দী কৃষ্ণ-কাব্যেও তার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কয়েকটি কারণে এই প্রভাব ছিল স্বাভাবিক।

বাঙালী বৈষ্ণবাচার্যেরা বৈষ্ণবীয় রসশাস্ত্র সম্পর্কিত প্রায় সকল গ্রন্থ বৃন্দাবনে রচনা করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা সেখানে করতেন বৈষ্ণবধর্মের সাধনা। সুতরাং ষড়গোস্বামীর এবং অন্যান্য আচার্যদের ভৌগোলিক সান্নিধ্য হিন্দী কৃষ্ণকাব্যের কবিদের গৌড়ীয় রসশাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট করবার পক্ষে বিশেষরূপে সহায়ক হয়েছে। আরও একটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন : বাঙালী আচার্যেরা তাঁদের মৌলিক গ্রন্থগুলি [ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বলনীলমণি, প্রীতিসন্দর্ভ প্রভৃতি] লিখেছেন সংস্কৃতে, যা ছিল ভক্তিবাদের অন্তঃরাজ্যিক ভাষা। উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম সর্বত্র সংস্কৃতের প্রচলন ছিল। সুতরাং গৌড়ীয় বৈষ্ণব-তত্ত্ব উপলব্ধি করবার পথে ভাষা কখনও অন্তরায় হয়নি।

তাছাড়া ভাবের দিক থেকে বিচার করলেও দেখা যাবে গৌড়ীয় রস-তাত্ত্বিকরা সম্পূর্ণ অপরিচিত বিষয় পরিবেশন করেননি। শিক্ষিত সমাজ সংস্কৃত অলংকার এবং রসশাস্ত্রের কাঠামোর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। রূপগোস্বামী প্রমুখ আচার্যেরা সাহিত্যের রসশাস্ত্রকে ধর্মের ক্ষেত্রে প্রসারিত করেছেন এবং ধর্মীয় সাধনার সঙ্গে মিলিয়ে নেবার জন্য কোথাও কোথাও নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। প্রাচীন আলংকারিকদের রচিত কাঠামোটি সম্পূর্ণ পালটে দিলে হিন্দী ভক্ত কবিরা হয়ত একে গ্রহণ করতে দ্বিধা করতেন। আর একটি কারণ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু প্রভৃতির মতো প্রামাণিক নির্দেশক গ্রন্থ হিন্দীতে ছিল না। হিন্দীভাষী কোনো বৈষ্ণবাচার্য ধর্মচর্যার অথবা রসশাস্ত্রের নতুন কোনো তত্ত্ব বিধিবদ্ধ না করায় বৃন্দাবনে গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্রগ্রন্থের উপরই হিন্দী কৃষ্ণকাব্যের কবিদের নির্ভর করতে হয়েছিল।

বল্লভাচার্য হিন্দী কৃষ্ণকাব্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বললে অত্যুক্তি হবে না। তারই প্রেরণায় অষ্টছাপের কবিরা কৃষ্ণকাব্য সমৃদ্ধ করেছেন। বল্লভাচার্য নিজে ভক্তি রসশাস্ত্র বিধিবদ্ধ করে এমন কোনো গ্রন্থ রচনা করেননি যা হিন্দী সাহিত্যের ভক্ত কবিদের পদ রচনায় পথ-নির্দেশ করতে পারে। জনশ্রুতি এই যে বল্লভাচার্য ৮৪টি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। কিন্তু ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর ন্যায় কোনো গ্রন্থ রচনায় তিনি উদ্যোগী হননি। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর অধিকাংশই এখন অপ্রাপ্য। প্রাপ্তব্য গ্রন্থাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্রীব্রহ্মসূত্রাণুভাষ্য, জৈমিণীসূত্রভাষ্য এবং শ্রীমদ্‌ভাগবত-টীকা শ্রীসুবোধিনী। এই সব কটিই তিনি অসম্পূর্ণ রেখে গেছেন। পুত্র বিঠলনাথ অণুভাষ্যের অবশিষ্টাংশ রচনা করে গ্রন্থটি সম্পূর্ণ করেছেন।

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের অধিকাংশ কৃষ্ণ ভাবিত হিন্দী কবিদের অবিসংবাদী গুরু ছিলেন বল্লভাচার্য। তাঁর মতবাদের সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতবাদের মৌলিক পার্থক্য থাকলে বাঙালী আচার্যদের রসশাস্ত্রের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা হিন্দী কৃষ্ণকাব্যের কবিদের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হত না। বাহ্যিক কিছু পার্থক্য দেখা গেলেও মূলত বল্লভাচার্য ও গৌড়ীয় দার্শনিক তত্ত্বের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই বলা যায়। বল্লভাচার্য যে চৈতন্যদেবের গুণমুগ্ধ ছিলেন, ত্রিবেণী সঙ্গমে ও অন্যত্র তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে যে গ্রহণ করেছেন, তার উল্লেখ বিভিন্ন গ্রন্থে পাওয়া যায়।[১০২] অপরদিকে সনাতন গোস্বামী

তাঁর বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণীতে বল্লভাচার্যের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। চৈতন্য-দেব ও বল্লভাচার্য— এই দুই গুরুর পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতির সম্পর্ক বাঙালী ও হিন্দী ভক্ত কবিদের এক সূত্রে, এক রসাদর্শে, মিলিত করতে যথেষ্ট সহায়তা করেছিল।

এর চেয়েও বড়ো কথা ধর্ম সাধনায় তাঁদের মতৈক্য। বল্লভাচার্যের মতে ভক্তি দুই প্রকার। মর্যাদাভক্তি ও পুষ্টিভক্তি। প্রথমোক্ত ভক্তি বিধিনির্দিষ্ট রীতি অনুশীলনপূর্বক ভক্তকে ঈশ্বর প্রাপ্তির পথে অগ্রসর করিয়ে দেয়। এই শ্রেণীর ভক্তের লক্ষ্য ভগবানের সঙ্গে একান্ত হয়ে মোক্ষ লাভ করা। মর্যাদাভক্তি অনেকটা বাংলার বৈষ্ণবাচার্যগণ কথিত বৈধীভক্তির ন্যায়। পুষ্টিভক্তি আচার অনুষ্ঠান পালনের উপর নির্ভর করে না, ভগবানের অনুগ্রহ লাভই সেখানে ঈশ্বর প্রাপ্তির অন্যতম পন্থা। পুষ্টি বা পোষণের অর্থ অনুগ্রহ। বল্লভাচার্যের মতে পুষ্টিমার্গ বা রসমার্গই শ্রেষ্ঠ। রূপগোস্বামী একেই বলেছেন রাগানুগা ভক্তি। পুষ্টিমার্গীরা শ্রীকৃষ্ণের সালোক্য প্রাপ্তি লাভ করে তাঁর সঙ্গে গোপ-গোপী, পশু পক্ষী, বৃক্ষ নদী প্রভৃতি নানারূপে অখিলরসামৃতমূর্তি ভগবানের সঙ্গে বিবিধ লীলার সাহায্যে অপরিসীম রসের উল্লাস আস্বাদন করেন।

উপরোক্ত পুষ্টিবাদের ব্যাখ্যা থেকে প্রমাণিত হয় যে বল্লভাচার্যের মতবাদের সঙ্গে বঙ্গীয় বৈষ্ণব সমাজের অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। বাংলার বৈষ্ণব সাধকরাও মোক্ষ কামনা করেন না। তাঁরাও শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে লীলারস আস্বাদনকেই শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি বলে বিশ্বাস করেন।

শ্রীরূপগোস্বামী বলেছেন বল্লভাচার্য ব্যাখ্যাত মর্যাদাভক্তি ও পুষ্টিভক্তি গৌড়ীয় আচার্যগণ কথিত যথাক্রমে বৈধী ও রাগানুগাভক্তি।[১০৩]

পরবর্তীকালের হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাসকার ও সমালোচক বঙ্গ ও ব্রজের পারস্পরিক সম্পর্ক ও প্রভাব স্বীকার করেছেন। বৈষ্ণব সাহিত্যের বিখ্যাত সমালোচক প্রভুদয়াল মীতল বলেছেন, মধ্যযুগে উত্তর ভারতের সকল সাহিত্যের উপর চৈতন্যের প্রবল প্রভাব। এই সময়কার সংস্কৃত, বাংলা, ওড়িয়া, অসমীয়া এবং ব্রজভূমির সাহিত্যের উপর এই প্রভাব স্পষ্টই অনুভূত হয়।[১০৪]

তিনি আরও বলেছেন, রূপগোস্বামীর ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও 'উজ্জ্বলনীলমণি মহান গ্রন্থ। 'উনকী রচনাওঁ নে ব্রজ ঔর বঙ্গকে ভক্তি-সাহিত্য কো অত্যাধিক প্রভাবিত কিয়া হৈ। উনকা ধার্মিক ঔর সাহিত্যিক দোনোঁ দৃষ্টিয়োঁ সে বিশেষ মহত্ত্ব হৈ। উনকে কারণ চৈতন্য মত কা প্রভাব ব্রজ সে ব্রজ তক ব্যাপক রূপ মেঁ হো গয়া থা।'[১০৫] অর্থাৎ, তাঁর [রূপগোস্বামীর] রচনা ব্রজ ও বঙ্গ অঞ্চলের ভক্তি সাহিত্যকে বিশেষরূপে প্রভাবিত করেছে। ধর্ম ও সাহিত্য, এই উভয় দিক দিয়েই তাঁর গ্রন্থের প্রভাব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এর কারণ চৈতন্য-মতবাদের প্রবাহ বঙ্গ থেকে ব্রজ পর্যন্ত ব্যাপক রূপ নিয়েছিল।

ডঃ হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী 'চৈতন্য মত ঔর ব্রজ সাহিত্য' গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের প্রেরণায় কেবল সংস্কৃত ও বাংলায় নয়, হিন্দীতেও অনেক মহত্ত্বপূর্ণ সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে।[১০৬]

দীনদয়াল, গুপ্ত সম্পাদিত 'হিন্দী সাহিত্য কা বৃহৎ ইতিহাসে' বলা হয়েছে যে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু অষ্টছাপের কবিদের প্রেরণার অন্যতম উৎস ছিল।[১০৭]

আর একজন সমালোচক উল্লেখ করেছেন যে, মধ্যযুগের বৈষ্ণব সাহিত্যে বিশেষ করে হিন্দী সাহিত্যের ভাব ও বিষয়বস্তুর উপর বাংলা সাহিত্যের প্রবল প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।[১০৮]

ডঃ বলদেব উপাধ্যায় সুস্পষ্টরূপে বলেছেন, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় সর্বপ্রথম ভক্তিরসের অবতারণা করেন এবং সাহিত্যে তাকে প্রতিষ্ঠিত করেন।[১০৯]

ডঃ হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী হিন্দী কৃষ্ণকাব্যে রূপগোস্বামীর প্রভাব সম্বন্ধে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি দেখিয়েছেন, উজ্জ্বলনীলমণি রচিত হবার পূর্বে, ১৫৪১ খ্রীস্টাব্দে, কৃপারাম হিততরঙ্গিনী লিখেছিলেন। 'ইসমে' রসোঁ কা বিষয় বহুত হী বিস্তার পূর্বক ঔর মনোহর ছন্দোঁ দ্বারা কহা গয়া হৈ। ইস কবি কী ভাষা সুষ্ঠু ব্রজ ভাষা হৈ।' তিনি আরও বলেছেন, এই গ্রন্থে সর্বপ্রথম রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলার লিখিত উদাহরণ পাওয়া যায়।[১১০] এই প্রবন্ধেই ডঃ দ্বিবেদী বলেছেন, বাংলাদেশে রূপগোস্বামী সর্বপ্রথম সংস্কৃতে রচিত উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে এই প্রকার রসের আলোচনা করেছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে এই গ্রন্থেই প্রথম ভক্তি এবং অলংকারশাস্ত্র একই সংগে আলোচিত হয়েছে।

রামচন্দ্র শুক্ল[১১১] এবং হিন্দী সাহিত্য কা বৃহৎ ইতিহাসে[১১২] কৃপারামের গ্রন্থের কথা উল্লেখ করা হলেও তাঁকে হিন্দী কৃষ্ণকাব্যে ভক্তিরস প্রচলনের পথিকৃৎ হিসাবে বলা হয়নি।

উজ্জ্বলনীলমণি হিততরঙ্গিনীর দশ এগারো বছর পরে সম্পূর্ণ হয়েছে সত্য। কিন্তু ভক্তিরসামৃতসিন্ধু হিততরঙ্গিনীর সঙ্গে একই বৎসরে অর্থাৎ ১৫৪১ খ্রীস্টাব্দে সমাপ্ত হয়েছিল। উজ্জ্বলনীলমণির মূল বক্তব্য সংক্ষেপে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বলা হয়েছে। ডঃ হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর কথা উল্লেখ করেননি। শুধু কালানুক্রমিকতায় অগ্রবর্তী হলেই যে সাহিত্যে প্রভাব সৃষ্টি করা যায় না তার বহু দৃষ্টান্ত ইতিহাসে পাওয়া যায়। হিন্দী সাহিত্যের ভক্ত কবি ও ইতিহাসকাররা রূপগোস্বামীর দানের কথাই বারবার উল্লেখ করেছেন; কৃপারামের নয়।

হিন্দী ও বাংলা ভক্তি সাহিত্যে পার্থক্যের কথাও উল্লেখ করা উচিত। হিন্দীতে তুলসীদাসের প্রভাবে দাস্যভাব প্রাধান্য লাভ করেছে; বাংলায় প্রাধান্য মাধুর্যরসের। পরকীয়া নায়িকাকে হিন্দী ভক্ত কবিরা উচ্চ মর্যাদা দেননি; বাংলায় পরকীয়া নারী শ্রেষ্ঠ নায়িকা। বালগোপালের আরাধনা হিন্দী ভক্ত কবিদের বৈশিষ্ট্য। এজন্য হিন্দীতে বাৎসল্যরসের অনেক উৎকৃষ্ট পদ রচিত হয়েছে। বালগোপালের সাধনার প্রবর্তক বল্লভাচার্য। পরে বল্লভাচার্য গদাধর পণ্ডিতের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করে কিশোর কৃষ্ণের [অর্থাৎ মাধুর্যভাবের] পূজারী হন।[১১৩] বল্লভাচার্যের এই দুই কৃষ্ণের সাধনার প্রতিফলন বিশেষ করে দেখা যায় সুরদাসের পদাবলীতে। বাৎসল্য এবং মধুর—এই উভয় রসেরই উৎকৃষ্ট পদ তিনি রচনা করেছেন।

সন্তানের জন্য ব্যাকুলতা হিন্দু সমাজে যত প্রবল এমন আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। জন্মের অনেক আগে থেকেই সন্তানের শুভ কামনায় নানা আচার অনুষ্ঠান শুরু হয়ে যায়। নানাবিধ উৎসবের মধ্য দিয়ে শিশুর জন্ম হবার পর ষষ্ঠী, অন্নপ্রাশন, হাতে খড়ি, উপনয়ন ইত্যাদি আনন্দানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পুত্রকে সংসারে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। দশরথ পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করে রামকে লাভ করেছিলেন। পুত্র শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল পিতাকে যে পবিত্র করে, পুৎ নামক নরক থেকে যে উদ্ধার করে। তাই দেবদেবীর কাছে পুত্রের জন্য প্রার্থনার অন্ত ছিল না। ঋগ্বেদে বারবার দেখা যায় পুত্রসন্তানের জন্য ব্যাকুল প্রার্থনা। দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট ভক্তের আবেদন :

ইমাং ত্বমিন্দ্র মীঢ্বঃ সুপুত্রাং কৃণু।
দশাস্যাং পুত্রানা ধেহি পতিমেকাদশং কৃধি ॥[১১৪]

অর্থাৎ, হে বৃষ্টিবর্ষণকারী ইন্দ্র; এই নারীকে তুমি উৎকৃষ্ট পুত্রবতী ও সৌভাগ্যবতী কর। এঁর গর্ভে দশ পুত্র সংস্থাপন কর, পতিকে নিয়ে একাদশ ব্যক্তি কর।

পতিপ্রেমের সঙ্গে বাৎসল্যভাব যে অলক্ষ্যে মিশ্রিত থাকে এখানে তারই সুন্দর ইঙ্গিত। সাহিত্যে বাৎসল্যভাবের প্রাচীনতম দৃষ্টান্ত পাই ঋগ্বেদে। দেবতাদের পুত্রের মতো, শিশুর মতো সস্নেহ দৃষ্টিতে দেখবার উদাহরণ বেশ কয়েকটি পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলেই আছে :

পুত্রো ন জাতো রণ্বো দুরোণে বাজী ন প্রীতো বিশো বিতারীৎ।
বিশো যদহ্বে নৃভিঃ সনীলা অগ্নির্দেবত্বা বিশ্বান্যশ্যাঃ।[১১৫]

অর্থাৎ অগ্নি পুত্রের ন্যায় জন্মগ্রহণ করে গৃহ আনন্দময় করেন এবং অশ্বের ন্যায় হর্ষযুক্ত হয়ে সংগ্রামে শত্রুগণকে পরাস্ত করেন।

দশম মণ্ডলে (৮৫।১৮) মিত্র ও বরুণকে শিশু বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই মণ্ডলেই (১২৩।১) দেখতে পাই পূজার্থী বৃষ্টিবর্ষণকারী দেবতাকে বালকের ন্যায় মিষ্ট কথায় তুষ্ট করেন।

সুতরাং দেবতাকে পুত্রের মতো করে দেখা এবং বাৎসল্য ভাবে ভাবিত হয়ে আরাধনা করবার বীজ আমাদের দেশে বহু পূর্ব থেকেই ছিল, বালগোপালের আরাধনায় তার পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে। তাই যীশুর জীবন থেকে বাৎসল্যরসসিক্ত পূজা পদ্ধতি নতুন করে গ্রহণ করা হয়েছে কিনা এ নিয়ে বিতর্ক জরুরি নয়। ঋগ্বেদের পরে ব্রাহ্মণ ও ঔপনিষদিক সাহিত্যে বাৎসল্যের উল্লেখ পাওয়া গেলেও তা অধিকতর পরিস্ফুট হয়নি। রামায়ণে লৌকিক স্তরে বাৎসল্যের প্রথম প্রকাশ দেখা যায়। অযোধ্যাকাণ্ডে বনবাসে যাত্রায় উদ্যত পুত্রের জন্য কৌশল্যার ব্যাকুলতা হৃদয়

স্পর্শ করে। যাত্রার পূর্বে রাম কৌশল্যার কাছে এসেছেন বিদায় নিতে। কৌশল্যা তখনও জানেন না রামকে বনে যেতে হবে। যখন দুঃসংবাদ জানতে পারলেন তখন মাতৃহৃদয়ের বেদনার উৎস উন্মুক্ত হয়ে গেল। নানা রূপে সেই বেদনার প্রকাশ হয়েছে। শোকার্ত কৌশল্যা বলছেন, বন্ধ্যা নারীর পুত্রহীনতার দুঃখের চেয়ে বহুগুণ বেশী যন্ত্রণাদায়ক এই বেদনা। স্বামীর রাজত্বে সুখ পাইনি; আশা ছিল পুত্রের পৌরুষে সুখ পাব। সে আশা মিথ্যা হয়ে গেল। বেদনার্ত কণ্ঠে তিনি বললেন:

যদি হ্যকালে মরণং যদৃচ্ছয়া
লভেত কশ্চিদ্‌গুরু দুঃখকর্ষিতঃ।
গতাহমদ্যৈব পরেতসংসদং
বিনা ত্বয়া ধেনুরিবা ত্যজেন বে॥[১১৬]

অর্থাৎ, যদি কেউ গুরুতর দুঃখে স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ করতে পারত তাহলে তোমার বিরহে বৎসবিহীন ধেনুর ন্যায় আমি আজই প্রাণত্যাগ করতাম।

এর পরে আছে সন্তানের জন্য মা'র স্বাভাবিক খেদোক্তি। রাজপ্রাসাদের ভৃত্যদের যা খাদ্য, বনে রামের তা-ও জুটবে না। ছেলে কি খাবে তাই নিয়ে কৌশল্যার ভাবনা। আর ভাবনা অরণ্যচারী পিশাচ, দৈত্য, রাক্ষস, হিংস্র পশু ইত্যাদিকে। যশোদাও এমনি উদ্বিগ্ন থাকতেন কৃষ্ণ বেনু চরাতে গেলে।

দশরথের শোকের মধ্য দিয়ে তাঁর পুত্রবৎসল হৃদয়কে উন্মোচন করেছেন বাল্মীকি। অযোধ্যাকাণ্ডের চত্বারিংশ থেকে ত্রিচত্বারিংশ সর্গে দশরথের শোকখিন্ন বাৎসল্যের চিত্র বিশেষরূপে পরিস্ফুট। একটি মর্মস্পর্শী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক: দশরথের চোখে ঘুম নেই। মধ্য রাত্রিতে তিনি কৌশল্যাকে ডেকে বললেন:

ন ত্বাং পশ্যামি কৌসল্যে সাধু মাং পাণিনা স্পৃশ।
রামং মেহনুগতা দৃষ্টিরদ্যাপি ন নিবর্ততে॥[১১৭]

অর্থাৎ, রামকে দেখবার ব্যাকুলতায় আমার চোখের দৃষ্টি তার সঙ্গে সঙ্গে গেছে—সে দৃষ্টি এখনও ফিরে আসেনি। তোমাকে তাই দেখতে পাচ্ছি না। আমাকে তোমার হাত দিয়ে স্পর্শ কর।

বাৎসল্যভাব মহাভারতে বিশেষরূপে প্রাধান্য লাভ করেছে। পুত্রস্নেহে ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ। তাঁর বিচারবুদ্ধি স্নেহ যদি আচ্ছন্ন না করত তাহলে হয়ত কৌরব বংশের ভাগ্য অন্য রকম হত। দুর্যোধনের জন্মের পরমুহূর্তে বিদুর প্রভৃতি শুভার্থীরা ধৃতরাষ্ট্রকে বলেছিলেন, এ পুত্র নিজ বংশ ধ্বংস করবে। এখনই একে ত্যাগ করলে ধ্বংস থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে। ধৃতরাষ্ট্র এ উপদেশ শুনলেন না: 'ন চকার তথা রাজা পুত্রস্নেহসমান্বিতঃ॥'[১১৮] পরে ধৃতরাষ্ট্র স্বীকার করেছেন, পুত্রস্নেহাতুর আমার জন্যই কৌরবদের পতন ঘটেছে।[১১৯]

গান্ধারী কুমারী জীবনেই শত পুত্রের কামনা করেছিলেন। স্নেহে হৃদয় পূর্ণ থাকলেও গান্ধারী কখনো সত্য ও ধর্মের ঊর্ধ্বে পুত্রবাৎসল্যকে স্থান দেননি। সভাপর্বে তিনি স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেছেন, পুত্রস্নেহে বিচারশূন্য তুমি

দুর্যোধনকে ত্যাগ করতে পারেনি বলেই এই দুর্দশা।[১২০]

অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতে [১১] গৌতমীর পুত্রের জন্য দুর্ভাবনা কৌশল্যার আক্ষেপোক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যে গৌতম স্বর্ণশয্যায় শয়ন করতেন, তূর্য-নিনাদে সকালে জেগে উঠতেন, আজ তিনি পরিহিত বস্ত্রের একাংশ মাত্র মাটির উপর বিছিয়ে কিভাবে নিদ্রা যাবেন।[১২২]

গৌতমকে বনে রেখে তাঁর প্রিয় অশ্ব কন্থক একা প্রাসাদে ফিরে এসেছে। আরোহী-বিহীন কন্থককে দেখে রাজধানী শোকমগ্ন হয়ে পড়ল। অষ্টম সর্গ বিশেষ করে রাজপরিবারের ভাব-গম্ভীর শোক-কাহিনী। পিতা শুদ্ধোদন ও মাতা গৌতমীর গৃহত্যাগী পুত্রের জন্য বেদনাকে কবি মর্মস্পর্শী ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন।

আনুমানিক খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতকে রচিত কালিদাসের কাব্যে ও নাটকে বাৎসল্য-ভাবের কয়েকটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। উমার প্রতি হিমালয়ের গভীর স্নেহের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে কালিদাস বলেছেন: পুত্র থাকা সত্ত্বেও এই কন্যার প্রতি হিমালয়ের স্নেহদৃষ্টি যেন কিছুতেই তৃপ্তি লাভ করত না। বসন্তকালে কত রকমের ফুল ফোটে, কিন্তু ভ্রমরকুল আম্রমুকুলের কাছেই যায়। পর্বতরাজ হিমালয়ও তেমনি অন্য সন্তান থাকা সত্ত্বেও উমার প্রতি বিশেষরূপে আকৃষ্ট।[১২৩]

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে লৌকিক বাৎসল্যরসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাওয়া যায় কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলম্-এ। সর্বদমন তপোবনে সিংহশিশুর সংগে খেলা করছে। প্রথম দর্শনেই বালক হস্তিনাপুররাজের মন কেড়ে নিল। দুষ্যন্ত বালকের দিকে চেয়ে স্বগতোক্তি করলেন:

আলক্ষ্যদন্তমুকুলাননিমিত্তহাসৈরব্যক্তবর্ণরমণীয়বচঃ প্রবৃত্তীন্।
অঙ্কাশ্রয়প্রণয়িন স্তনয়ান্ বহন্তো ধন্যা স্তদঙ্গরজসা মলিনী ভবন্তি।[১২৪]

অর্থাৎ, যাদের দাঁত অল্প অল্প দেখা দিয়েছে, অকারণে যারা হেসে ওঠে, যারা মধুবর্ষণকারী আধো আধো কথা বলে, যারা কোলে উঠতে পেলে আনন্দিত হয়, যে এমন ধূলিমলিন বালককে কোলে তুলে নিজের দেহ মলিন করবার সুযোগ পায় সে ধন্য।

তাপসীর অনুরোধে দুষ্যন্ত সিংহশিশুকে মুক্ত করতে গিয়ে সর্বদমনের স্পর্শ সুখে অভিভূত হয়ে পড়লেন। তিনি মনে মনে বললেন, আমারই যদি এত সুখ, তাহলে এই বালক যাঁর পুত্র তাঁর না জানি কী গভীর পরিতৃপ্তি।[১২৫]

পুত্রের অঙ্গস্পর্শে পিতার হৃদয়ে অনুরূপ অনির্বচনীয় সুখানুভূতির কথা রঘু-বংশেও আছে।[১২৬]

জনচিত্তে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল পুরাণের যুগে। খ্রীস্টীয় সপ্তম থেকে চতুর্দশ শতক পর্যন্ত পুরাণের কাল বলা যায়। এর মধ্যে অষ্টাদশ প্রধান পুরাণ রচিত হয়েছিল। এদের মধ্যে কৃষ্ণ কথা আছে এই সব পুরাণে: ব্রহ্মপুরাণ; পদ্ম-পুরাণ; বিষ্ণুপুরাণ; বায়ুপুরাণ; ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ; স্কন্ধপুরাণ; বামনপুরাণ; কূর্মপুরাণ ও ভাগবতপুরাণ। এছাড়া মহাভারত ও হরিবংশে কৃষ্ণ কথা আছে।

হরিবংশ মহাভারতের পরিশিষ্ট হিসাবে বিবেচিত হয়— অবশ্য কেউ কেউ পৃথক পুরাণ বলেও গণ্য করেন।

মহাভারতের কৃষ্ণ প্রাপ্তবয়স্ক এবং সর্বদা কর্মতৎপর। সেখানে কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে বাৎসল্য রস সৃষ্টির অবকাশ নেই। যে সব পুরাণে কৃষ্ণকথা আছে তাদের কাহিনী অলৌকিক বিবরণে এমনই ভারাক্রান্ত যে কোমল মানবিক অনুভূতিগুলির বিকাশ লাভের সুযোগ অল্প। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ থেকে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।[১২৭] নন্দ কৃষ্ণকে সঙ্গে করে বৃন্দাবনের ভাণ্ডারী বনে গোরু চরাতে গিয়েছেন। হঠাৎ ঘন অন্ধকার নেমে এলো, এবং সেই সঙ্গে প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি। কৃষ্ণ ভয় পেয়ে নন্দর গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে আরম্ভ করলেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগে পিতা পুত্রকে ঘনিষ্ঠ করে বাৎসল্যরস সৃষ্টির যে সুযোগ ছিল তার সদ্ব্যবহার করা যায়নি। কারণ, পুরাণকার আমাদের বলে দিয়েছেন, অকস্মাৎ এই ঝড় বৃষ্টি দেখা দিয়েছে কৃষ্ণেরই দৈব্য মায়ায়।

যশোদার বাৎসল্যের একটি রূপই কয়েকটি পুরাণে বর্ণিত হয়েছে। বালক কৃষ্ণ অনেক অলৌকিক ঘটনার নায়ক। শকটবিপর্যয়, যমলার্জুনভঙ্গ, তৃণাবর্ত, বৎসাসুর, বকাসুর, অঘাসুর বধ, কালীয়দমন, পুতনাবধ প্রভৃতি অলৌকিক ঘটনার সংবাদ পেয়ে যশোদা উদ্বিগ্ন হয়ে ছুটে আসেন, কৃষ্ণের কোনো অনিষ্ট হয়নি তো! কৃষ্ণকে কোলে করে স্তন্য পান করান, গায়ে হাত বুলিয়ে দেন, পুত্রের কোনো আঘাত লেগেছে কিনা বারবার তা জিজ্ঞাসা করেন। নন্দও পুত্রের জন্য ব্যাকুল। একই ঘটনার এবং একই অনুভূতির পুনরাবৃত্তি ঘটেছে বিভিন্ন পুরাণে। তবে এসব ক্ষেত্রে বাৎসল্য রসের যেটুকু প্রকাশ তা হৃদয়কে তেমন স্পর্শ করে না। কেননা, বালক কৃষ্ণ ঐশী শক্তি সম্পন্ন এবং নন্দ যশোদা সাধারণ মানব মাত্র।

একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতে এর কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায়। রচয়িতার লিপিকুশলতার জন্য কৃষ্ণের অলৌকিক ব্যক্তিত্ব আচ্ছন্ন হয়ে লৌকিক বাৎসল্যরসের স্নিগ্ধ অনুভূতি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। অবশ্য শ্রীকৃষ্ণ নিজেই যশোদাকে তাঁর জন্ম কাহিনী শুনিয়ে দেবার ফলে মানবিক মাধুর্য অনেকটাই ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়েছে। যশোদাকে কৃষ্ণ বললেন, দীর্ঘকাল তোমরা আমাব ধ্যান কবে আমার মতো পুত্র কামনা করেছিলে। আমি বর দিয়েছিলাম।[১২৮] তাই তোমাদের ঘরে জন্ম নিয়েছি।

শকট ওল্টানোর কাহিনী অন্যান্য পুরাণের মতো এখানেও বিবৃত হয়েছে। ক্ষুধা নিবৃত্ত না হতেই যশোদা কৃষ্ণকে স্তনচ্যুত করে কোল থেকে নামিয়ে দেওয়ায় তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে পদাঘাতে দধি, দুগ্ধ ইত্যাদি বহন করবার শকট উল্টে দিলেন। শব্দ শুনে সবাই ছুটে এল; এতটুকু বালক যে গাড়ি উল্টে দিতে পারে তা কেউ ধারণা করতে পারল না। যশোদা আশঙ্কা করলেন কোন দুষ্ট গ্রহ কৃষ্ণকে আক্রমণ করেছে। গ্রহদোষ প্রশমনের জন্য ব্রাহ্মণদের দিয়ে বেদমন্ত্র পাঠ করানো হল। যশোদা ছেলেকে কোলে করে দুধ খাওয়াতে লাগলেন।[১২৯]

প্রতিবেশীরা কৃষ্ণের নানা দুষ্টুমির কথা বলে যশোদাকে। বাড়ী বাড়ী ঘুরে খাবার জিনিস খেয়ে ফেলেন, ভেঙ্গে দেন বাসনপত্র; ঘরে মলমূত্র ত্যাগ করেন,—

এমনি সব কত অভিযোগ। কিন্তু স্নেহান্ধ জননী এ সব কথা কানে তোলেন না, শুধু হাসেন। পুত্রকে ভর্ৎসনা করতে ইচ্ছা হয় না।[১৩০]

আর একটি ঘটনা : শ্রীকৃষ্ণ যশোদার উপর ক্রুদ্ধ হয়ে ঢিল ছুঁড়ে দধির ভাঁড় ভেঙে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি উপলব্ধি করলেন, কাজটা ভালো হয়নি। মা'র শাস্তি এড়াবার জন্য তিনি উদূখলের উপরে উঠে ননী খেতে লাগলেন। দইয়ের হাঁড়ি ভাঙা দেখে যশোদার বুঝতে বাকী রইলো না এটা কার কাজ। তিনি লাঠি হাতে করে খুঁজতে খুঁজতে শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে পেলেন উদূখলের উপরে। মা'র হাতে লাঠি দেখে ভয়ে কৃষ্ণ নেমে এলেন। যশোদা তাঁকে ধরে ফেলায় শ্রীকৃষ্ণ কাঁদতে লাগলেন। তাঁর চোখ দুটি ভয়ে বিহ্বল; হাত দিয়ে চোখের জল মুছতে গিয়ে মুখমণ্ডল কাজলের কালিতে লিপ্ত হয়ে গেল। পুত্রের ভয় দেখে যশোদা লাঠি ফেলে দিলেন। কিন্তু শাস্তি দেবার জন্য তাঁকে বেঁধে রাখলেন উদূখলের সঙ্গে। শ্রীকৃষ্ণ কি উপায়ে এই বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করেছিলেন এবং যমলার্জুন ভেঙেছিলেন— সে কাহিনী সুপরিচিত।

বাৎসল্য দুই শ্রেণীর : ঐশ্বর্যজ্ঞানমিশ্রিত বাৎসল্যরতি এবং কেবলা বাৎসল্যরতি।[১৩১] বসুদেব— দেবকীর এবং অংশতঃ নন্দেরও, বাৎসল্যভাব কৃষ্ণের ঐশ্বর্যজ্ঞানকে অতিক্রম করতে পারেনি। যশোদা কৃষ্ণের অলৌকিক ব্যক্তিত্বের কথা জেনেও প্রগাঢ় মানবিক পুত্রস্নেহে উদ্বেলিত। সেই পুত্রস্নেহ এতই প্রবল যে কৃষ্ণ সান্নিধ্যে থাকলেই তাঁর স্তনযুগল থেকে দুগ্ধ ক্ষরিত হয়।[১৩১] স্বয়ম্ভু রচিত অপভ্রংশ মহাকাব্য রিট্ঠেণেমিচরিউ স্নেহ প্রকাশের এই লক্ষণটিকে আরেকটু এগিয়ে নিয়েছে। কবি বলছেন, যশোদার স্নেহের আবেগ এতই প্রবল যে হৃদয়ে আবদ্ধ থাকতে পারে না, বেরিয়ে আসে স্তনদুগ্ধের ধারার রূপ নিয়ে।[১৩২]

যশোদা কৃষ্ণের দেবত্ব এড়িয়ে যেতে চাইলেও ভাগবতকার সেই দেবত্ব প্রতিষ্ঠার কথা পাঠক বা শ্রোতাকে ভুলতে দেন না। তাই মাতৃহৃদয়ের বাৎসল্যের পূর্ণ উপলব্ধি এখানে হয় না। যশোদার মাতৃস্নেহ পূর্ণ রূপ লাভ করেছে পদাবলীর যুগে। তথাপি একথা স্বীকার করতেই হয় যে, ভক্তি সাহিত্যে এমন সুন্দর বাৎসল্যরসের ছবি ভাগবতের পূর্বে দেখা যায় না। সেজন্য ভারতের সকল আঞ্চলিক সাহিত্যে ভাগবতের গভীর প্রভাব দেখা যায়। কৃষ্ণ যশোদার কাহিনী নানা ভাষায় পদাবলীতে ও ভক্তিসাহিত্যে স্থান পেয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে এ সব কাহিনীর আক্ষরিক অনুবাদ পাওয়া যায়।

আঞ্চলিক ভাষা সমূহের মধ্যে তামিলেই ভক্তি-সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায়। সবচেয়ে পুরনো আড়বার [বা প্রেম পরবশ ভক্ত] কবিদের রচিত পদাবলী। পণ্ডিতদের মতে আড়বার সম্প্রদায়ের আবির্ভাব খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় থেকে অষ্টম শতকের মধ্যে।[১৩৩] নম্মাড়বার প্রমুখ দ্বাদশ বিখ্যাত আড়বার ভাগবত পুরাণ রচনার পূর্বেই আবির্ভূত হয়েছিলেন বলে মনে করা হয়। কারণ ভাগবতে বর্ণিত নদীতীরবর্তী অঞ্চলে তাঁদের জন্ম।[১৩৪] এই সব সাধক কবিদের জন্যই ঐ সব স্থান প্রসিদ্ধি লাভ

করায় ক্রমে ভাগবতে স্থান পেয়েছে। শ্রীমদ্‌ভাগবত হয়ত তামিল ভূমিতেই রচিত হয়েছিল।[১৩৫]

আড়বার কবিরা রাগাত্মিকা ভক্তির সাধক হলেও তাঁরা বাৎসল্যরসের বেশ কিছু সুন্দর পদ রচনা করেছেন। আচার্য যতীন্দ্র রামানুজদাস সহস্র পদাবলীতে যে কটি বাৎসল্যের পদ অন্তর্ভুক্ত করেছেন তাদের মধ্যে ঐশ্বর্যভাবের প্রাধান্য দেখা যায়।[১৩৬] বাৎসল্যরসের গভীরতা পরিস্ফুট হয়েছে কুলশেখর আড়বারের কয়েকটি পদে।

আড়বার সম্প্রদায়ের বাৎসল্যরসের ভাবনায় দুটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। এঁরা বৈষ্ণব হলেও শুধু যশোদার বাৎসল্য বর্ণনা করে নিরস্ত থাকেন নি। বসুদেব, দেবকী, কৌশল্যা, দশরথ প্রভৃতির বাৎসল্যরসে অভিষিক্ত হৃদয়ের আর্তিকেও প্রকাশ করেছেন। তাছাড়া এঁরা শুধু যশোদার কৃষ্ণ স্নেহের মহিমা কীর্তন করেই তৃপ্ত নন ; কবি এবং ভক্ত নিজেকে যশোদা, দেবকী, কৌশল্যা, দশরথ বা বসুদেব — ভাবে ভাবিত করে বা রামের আরাধনা করতেন। রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের তৃতীয় সর্গে দশরথ রামকে দেখে দেখে যেন তৃপ্তি পান না। তেমনি ভক্ত কবি বলছেন, বালকৃষ্ণকে দিন, মাস, বৎসর অনুক্ষণ দেখেও আশ মেটে না। এই অতৃপ্তি অমৃতের মতোই উপভোগ্য। কৃষ্ণকে উদূখলে বন্ধন এবং তাঁর যমলার্জুন ভাঙ্গাব কাহিনী আড়বার কবিরাও গীতবন্ধ করেছেন। আড়বার সাধকরা যদি ভাগবত রচনাব পূর্বে পদ রচনা করে থাকেন তাহলে ভাগবতকার শুধু এটি নয়, আরও অনেক ঘটনার জন্য এঁদের কাছে ঋণী।

বাৎস্যরসের পদগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দেবকীর আক্ষেপ। নিজের ছেলে হলেও কৃষ্ণ মা'কে জানবার সুযোগ পেলেন না। গোপীরা যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করে, "কৃষ্ণ, তোমার বাবা কে ?" তখন তিনি নন্দ গোপকেই দেখিয়ে দেন। ছেলেকে মানুষ করবার যে আনন্দ তা থেকে দেবকী বঞ্চিত। নিজের সন্তানকে খাওয়ানো, স্নান করানো, কোলে করে আদর করা, বিছানায় শুয়ে গাযে হাত বুলিয়ে গান গেয়ে ঘুম পাড়ানো, এসবের মধ্যে মায়ের কত সুখ, কত তৃপ্তি ! দেবকীর ভাগ্যে সে সুখ হল না নিজের ছেলে থাকা সত্বেও।

আড়বার কবিদের মধ্যে পেরিয়াড়বার বাৎসল্যরসের ভক্ত হিসাবে পরিচিত। তাঁর একটি পদে আছে : গোপাল ধূলায় গড়াগড়ি দিয়ে খেলা করছেন। অলংকার ভূষিত ভুলুণ্ঠিত কৃষ্ণের রূপে কবি মুগ্ধ। তিনি আকাশের চাঁদকে ডেকে বলছেন, তোমার চোখ থাকলে আর এক চাঁদের খেলা দেখে যাও।

কুলশেখর রচিত একটি পদে যশোদার বাৎসল্য সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। কবি বলছেন, মুদিত পদ্মের মতো সুন্দর কোমল হাত দিয়ে কৃষ্ণ মাখন চুরি করে খাচ্ছেন। তাঁর রক্তিম মুখ দই দিয়ে মাখা। পাছে মা চুরি ধরে ফেলেন এই ভয়ে চোখের দৃষ্টি সন্ত্রস্ত। যশোদা শাস্তি দিতে এসে ছেলের এই অপরূপ মূর্তি দেখে অপরিসীম আনন্দ পেলেন।

দক্ষিণ ভারতীয় সাহিত্যে শৈব ভক্তি সাহিত্যের প্রাধান্য এবং সে সাহিত্যে

বাৎসল্যরসের বিকাশ বিশেষ হয়নি। আড়বার কবিরা বহু বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করেছিলেন, যার মধ্যে বেশ কিছু পদ বাৎসল্যভাবের। কন্নড় এবং অন্যান্য পাশ্চিমণী সাহিত্যে দাস্য ভাবের প্রাধান্য। কন্নড় সাধক কবি পুরন্দর দাসের কয়েকটি পদে বাৎসল্যের কিছু প্রকাশ আছে। এমনি একটিতে আছে : যশোদা সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন, কৃষ্ণ কেঁদো না, ঘুমাও। আমি গান গেয়ে তোমাকে ঘুম পাড়াব। এখন তোমাকে কোলে নিলে ঘরের কাজ করব কি করে ?

আর একটি পদে কৃষ্ণ যশোদার কাছে কেঁদে অভিযোগ করছেন : মা, বন্ধুরা বলে আমি নাকি বাড়ী বাড়ী মাখন চুরি করে খাই। বলে, আমার বাবা বসুদেব, মা দেবকী ; তোমরা আমার কেউ নও। মামা পাছে হত্যা করে সেই ভয়ে নাকি মা বাবা আমাকে তোমাদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। সুরদাসও অনেকটা এরূপ একটি পদ লিখেছেন। শ্রীপদ রায়ের একটি পদের সঙ্গে সাদৃশ্য দেখা যায় হিন্দী একটি পদের : গোপীরা যশোদার কাছে কৃষ্ণের বিরুদ্ধে নানা নালিশ করতে এসেছে। পাড়াগাঁয়ের স্নেহান্ধ জননীর মতো যশোদা ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, আমার ছোট্ট গোপাল এখনও চার পা চলতে পারে না, সে দড়ি খুলে তোমাদের বাছুর ছেড়ে দিয়েছে ? আমার বাড়ী দুধ ক্ষীরের অভাব নেই, তবে সে কেন তোমাদের বাড়ী চুরি করে খেতে যাবে ?

তেলেগু ভক্তিসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বমোর পোতন [পঞ্চদশ শতাব্দী] মূলতঃ দাস্যরসের ভাবুক। তেলেগু ভাষায় ভাগবতের অনুবাদ তাঁর এক বিরাট কীর্তি। তাঁর রচনায় বালগোপাল এসেছেন বেশ কয়েকবার। কিন্তু দু'একটি পদ ছাড়া অন্যত্র বাৎসল্যরস উজ্জ্বল হয়নি। এমনি একটিতে কবি পুত্র বিচ্ছেদ কাতর যশোদার মাতৃহৃদয়ের ব্যাকুলতা সার্থকরূপে প্রকাশ করেছেন। নন্দ যখন উদ্ধবের নিকট কৃষ্ণের গুণকীর্তন করছিলেন তখন যশোদা নীরবে বেদনাদীর্ণ হৃদয়ে সে সব শুনছিলেন। শুনতে শুনতে শরীর বিবশ হয়ে পড়ল, কৃষ্ণের গুণের কথা তিনিও তো জানেন। কিন্তু কিছুই বলতে পারলেন না। শুধু তাঁর দুই চোখ দিয়ে জলের ধারা আর দুই স্তন থেকে দুধের ধারা নেমে আসতে লাগল।

কেরলে বৈষ্ণবীয় ভক্তি সাহিত্যের প্রাধান্য। রামায়ণ, ভাগবত প্রভৃতি মালয়ালামে রূপান্তর শুধু হয়নি, ভক্ত কবিরা তাঁদের আবেগমিশ্রিত কল্পনা যোগ করে কাহিনীকে অনেক ক্ষেত্রে নবরূপ দিয়েছেন। লীলাশুকের বিখ্যাত কাব্য কৃষ্ণকর্ণামৃত কেরল অঞ্চলেই রচিত। পুন্তানম্ নম্বুতিরি, চেরুশ্শেরি এবং এড়ুভচ্ছন— এই তিন ভক্ত-কবির নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। এঁরা এবং অন্যান্য ভক্ত কবিরা মধুররসে ভাবিত, সুতরাং বাৎসল্যের পরিচায়ক পদের সংখ্যা খুবই কম। পুন্তানমের একটি পদে বাৎসল্যরসের চমৎকার প্রকাশ ঘটেছে। কবি বলছেন, একটি দুষ্টু বালক ব্রজে ঘুরে বেড়াচ্ছে ; তার গোল পেটের উপরে মাটির দাগ, হাতে ছোট্ট বাঁশী, দুহাতে ধরে আছে এক তাল মাখন। এমন বালকৃষ্ণ যখন আমার হৃদয়ে নিরন্তর খেলা করছেন তখন অন্য পুত্র সন্তানের আমার প্রয়োজন কি ?

ভক্তিসাহিত্যে মারাঠী বিশেষরূপে সমৃদ্ধ। চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে জ্ঞানেশ্বর, নামদেব, একনাথ, তুকারাম, রামদাস প্রভৃতি সাধকরা আবির্ভূত হয়েছিলেন। নামদেবের দুটি পদ শিখদের আদি গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। মহারাষ্ট্রে কৃষ্ণ ও বিষ্ণুর আরাধনা হত বিট্টলনাথ নামে। কিন্তু সে আরাধনার মূল কথা ছিল ভক্তের দাস্যভাব। তাই বাৎসল্য রসের পদ বিশেষ রচিত হয়নি। একনাথের একটি পদে নিরুদ্দিষ্ট বালকৃষ্ণের জন্য ব্যাকুল হয়েছেন যশোদা। যশোদা বলছেন, এই তো এখানেই ছিল। হাতে ফুল নিয়ে আঙিনায় হামাগুড়ি দিচ্ছিল। আমি রান্নাঘরে উনান নিকোচ্ছিলাম গোবর দিয়ে। এর মধ্যে কোথায় চলে গেল? আমার খোকা সর্বদা গোপবালকদের সঙ্গে থাকে; তাছাড়া নিজে নিজে আপন মনেও খেলা করে।

যশোদা ঘরে ঘরে খুঁজে বেড়াচ্ছেন, কোথায় আমার ছেলে?[১৩৭]

পঞ্চদশ শতকের কবি নরসিংহ মেহ্‌তা গুজরাটী সাহিত্যে ভক্তিবাদের প্রবর্তক। এঁর পরে ভক্তিবাদী সাহিত্য রচনা করেছেন মীরা, ভালণ প্রভৃতি কবিরা। মীরা মধুর রসের ভক্ত, বাৎসল্য রসের পদ তিনি রচনা করেননি। নরসিংহ মধুর এবং বাৎসল্য. এই উভয় রসেরই কবি। ভাগবতের দশম স্কন্ধের অনুসরণে নরসিং কৃষ্ণের বাল্য-লীলায় বিভিন্ন কাহিনী নিয়ে পদ রচনা করেছেন। কৃষ্ণ যশোদার নিকট আবদার করছেন: মা, আকাশ থেকে চাদ এনে দাও। কৃষ্ণ নেচে নেচে মা'কে পুলকিত করছেন; ইত্যাদি হল বাললীলার পদাবলীর বিষয়বস্তু। একটি পদে আছে কৃষ্ণের দৌরাত্ম্যে তিক্ত বিরক্ত হয়ে গোপিনীরা নালিশ করায় যশোদা ক্রুদ্ধ হয়ে কৃষ্ণকে প্রহার করলেন কিন্তু পরমুহূর্তেই পরম স্নেহে পুত্রকে কোলে তুলে নিলেন। স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বলতে লাগলেন, গোপাল আমাকে খুব ভালবাসে। আর কখনও তোমাকে কোথাও যেতে দেব না।

তারপর কোলে বসিয়ে কৃষ্ণকে দুধ খাওয়াতে খাওয়াতে পরম তৃপ্তিতে যশোদার মন পূর্ণ হয়ে যায়।[১৩৮]

পাঞ্জাবী সাহিত্যে পদাবলী রচনায় গুরু নানক পথিকৃতের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। ষোড়শ থেকে সপ্তদশ শতকের পাঞ্জাবী সাহিত্যে ভক্তিবাদমূলক ভজনাবলীর প্রাধান্য ছিল। বাৎসল্যরসের পদাবলী পাওয়া যায় না।

ওড়িয়া সাহিত্যে ১৫০০ থেকে ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রামানন্দ রায়, বলরাম দাস, জগন্নাথ, যশোবন্ত, অনন্ত, অচ্যুতানন্দ, দিনকৃষ্ণ প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণব কবি পদাবলী রচনা করেছেন। ভাগবত ছিল তাঁদের প্রেরণার উৎস। বাৎসল্যরসের উজ্জ্বল পদ বড় একটা পাওয়া যায় না। ওড়িয়া সাহিত্যে বাৎসল্যরসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাওয়া যায় চতুর্দশ শতকের কবি মার্কণ্ড দাসের কেশব কোইলীতে। কোকিল দূতের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। যশোদা অন্তরের বেদনার কথা বলছেন কোকিলকে; শীগ্‌গীর ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কৃষ্ণ গেছেন মথুরায়। কিন্তু নিজের মা বাবার সঙ্গে দেখা হবার পর সব ভুল হয়ে গেছে, আর ফিরবেন না। বেদনার্ত হৃদয়ে

যশোদা কোকিলকে জিজ্ঞাসা করছেন, কোন্ দুষ্টু লোকের কথায় কৃষ্ণ ফিরছে না? দুগ্ধ শর্করা এখন কাকে খেতে দেব আমি? বুকের দুধ খাইয়ে যাকে এত বড় করেছি, এখন সেই কৃষ্ণ আমাকে দেখতে চায় না। বৃদ্ধ বয়সে এ কি যাতনা। যে দেবকী ছেলের জন্য কিছুই করে নি, কৃষ্ণ এখন তাকে দেখে ভুলে গেল? একি অদ্ভুত বিচার?[১৩৯]

কবিরাজ মাধব কন্দলী [১৪শ শতক] অসমীয়া সাহিত্যের প্রথম মহৎ কবি। তিনি রামায়ণের অনুবাদ করেছেন এবং কৃষ্ণকাহিনী অবলম্বনে রচনা করেছেন দেবজিৎ কাব্য। শংকরদেব [১৫।১৬শ শতক] অসমীয়া সাহিত্যে ভক্তি আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা। শংকরদেবের শ্রেষ্ঠ রচনা রামবিজয়, কালীয়দমন, পারিজাত হরণ, রুক্মিণী-হরণ, পত্নী প্রসাদ প্রভৃতি। ভাগবত অনুসরণে তিনি কৃষ্ণকাহিনী রচনা করেছেন। তিনি নিজেকে কৃষ্ণের কিংকর হিসাবে প্রচার করেছেন, তাই তাঁর কাব্যে ও নাটকে দাস্য ভাবই প্রবল। কবি মাধব দেবের রচনায় ছোট ছোট বাৎসল্যের চিত্র আছে এবং এই সব চিত্র ভাগবতকারের অনুসরণে আঁকা। চোর ধরা ঝুমুরায় তিনি লিখছেন, কৃষ্ণ ননী চুরী করতে গিয়ে ধরা পড়লেন। "চোর" "চোর" বলে চীৎকার করতে করতে গোপীরা কৃষ্ণকে দেখতে পেল। কৃষ্ণ তখন নিজেকে বাঁচাবার জন্য বললেন, আমাকে মেরে চোর পালিয়ে গেছে: 'হামাকু মারি চোর পলাই।'[১৪০]

মাধবদেবের অংকীয়ানাটে এবং কৃষ্ণ বিষয়ক অন্যান্য রচনায় কৃষ্ণ প্রধান চরিত্র হিসাবে স্থান পেলেও বাৎসল্যের সুন্দর ছবি পাওয়া যায় না। যশোদা কোথাও কৃষ্ণকে গোষ্ঠে যাবার জন্য প্রত্যূষে সস্নেহে ঘুম ভাঙ্গাচ্ছেন, কোথাও বা কোলে বসিয়ে আদর করে খাওয়াচ্ছেন,— এমনি কিছু বাৎসল্য ভাবের ছবি পাওয়া যায়। শ্রীধর কন্দলির [১৬।১৭শ শতক] একটি পদে দেখা যায় যশোদা ভয় দেখিয়ে কৃষ্ণকে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করছেন। যশোদা বলছেন, এক কান খেকো দৈত্য এসেছে, দুষ্টু ছেলেদের কান কামড়ে খেয়ে ফেলে। কিন্তু ঘুমিয়ে পড়লে খায় না। শীগ্‌গীর ঘুমো। দাস্যভাবের প্রাধান্যের জন্য অসমীয়া সাহিত্যে বাৎসল্য রসের সুষ্ঠু বিকাশ ঘটতে পারেনি।

পরবর্তী দু'টি অধ্যায়ে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের হিন্দী ও বাংলা সাহিত্যে বাৎসল্যরসের বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। এই কালখণ্ডের পূর্ববর্তী হিন্দী সাহিত্যে বাৎসল্যভাবের প্রকাশের সুযোগ ছিল সামান্য। কারণ কবীর প্রভৃতি সন্তরা ভগবানকে ভজনা করেছেন সেবক হিসাবে, দাস্যভাব তাঁদের ভজনাবলীতে প্রাধান্য লাভ করেছে। পরবর্তী সময়ে রচিত হিন্দী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কাব্য রামচরিত-মানসেও বাৎসল্য ভাবনার অবকাশ ছিল স্বল্প। কারণ তুলসীদাস ছিলেন দাস্যভাবের সাধক।

বাংলা সাহিত্যে আমরা বাৎসল্যরসের অংকুর দেখতে পাই চর্যাপদেই। তরুণী মা দুঃখ করে বলছে:

পহিল বিষাণ মোর বাসনপূড়।
নাড়ি বিআরন্তে সেব বায়ুড়া॥[১৪১]

আমার প্রথম প্রসবকে কেন্দ্র করে কত কামনা-বাসনার সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু

নাড়ী কাটা মাত্র সে সব হাওয়ায় মিলিয়ে গেল [সন্তানের মৃত্যু হল]। এর গূঢ়ার্থ যা-ই হোক না কেন, বাৎসল্যভাবের স্ফুরণ অস্বীকার করা যায় না।

ষোড়শ শতকের পূর্বে বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত, চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল ও মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়। এদের অধিকাংশই সংস্কৃত পুরাণ ও মহাকাব্যের অনুসরণে রচিত। বাৎসল্যের যে সব সামান্য চিত্র পাওয়া যায় তার মধ্যে মৌলিকত্ব নেই এবং তারা হৃদয় স্পর্শ করে না। বাৎসল্যের চিত্র যেটুকু আছে তা প্রায়ই ভাগবতের অনুকরণ। ষোড়শ শতকের চৈতন্য-ভাগবতেও চৈতন্যকে ভাগবতের বালগোপালের মতো করে দেখা হয়েছে। বালগোপালের মতই বালক চৈতন্য আকাশের চাঁদ পেতে চান, না পেলে কেঁদে ধুলোয় গড়াগড়ি যান।[১৪২] মা'র সঙ্গে সন্তানের যে নাড়ীর টান তার একটি অপূর্ব দৃষ্টান্ত আছে মনসামঙ্গল কাব্যে। বেহুলা ঘোর বিপদে পড়েছে; নিছুনি নগরে তার মা বাবা সে খবর পায়নি। তবু সন্তানের অমঙ্গল আশংকায় তাদের মন বিচলিত হয়ে উঠেছে। কারণ :

ছয় মাসের দূরে যদি পুত্র মরি যায়।
সকলে জানিবার আগে— আগে জ নে মায়॥[১৪৩]

কৃত্তিবাসের রামায়ণে বাৎসল্যরসের এমন কিছু দৃষ্টান্ত আছে মূল সংস্কৃত রামায়ণে যা পাওয়া যায় না। আদিকাণ্ডের এই চিত্রটি স্নেহপরায়ণ বাঙালী পিতাকে স্মরণ করিয়ে দেয় :

দশরথ পাইলেন যেন হারানিধি।
আনন্দিত তেমনি হইল তাঁর মন॥
পুত্র পুত্র বলিয়া করেন রামে কোলে।
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দেন বদন কমলে॥[১৪৪]

সাহিত্যে বাৎসল্যের পূর্ণ পরিচয় এখানে উপস্থিত করা সম্ভব নয়। তার প্রয়োজনও নেই। ক্রমবিবর্তনের এই আংশিক পরিচিতি থেকেই দুটি কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রাক ষোড়শ শতকের সাহিত্যে বাৎসল্যের বৈশিষ্ট্য এই দুটি : প্রথমতঃ, এই যুগের সাহিত্য ধর্মকেন্দ্রিক, তাই বাৎসল্যের পাত্র পাত্রীরা দেব দেবী অথবা বালগোপাল বা রামের মতো অবতার কিংবা দেবোপম ব্যক্তিত্ব। এ সব ক্ষেত্রে তাই সহজ মানবিক স্নেহ প্রকাশের সুযোগ নেই। বেদে বাৎসল্যের অংকুরোদ্গম হয়েছে দেবতাদের অবলম্বন করে। রামায়ণ মহাভারতে বাৎসল্য মানব হৃদয়ের নিকটতর হয়েছে। ভাগবত পুরাণের বালগোপাল অনেকটা আমাদেরই ঘরের ছেলে। ঐশী শক্তির পটভূমিকা না থাকলে তাঁকে সম্পূর্ণরূপে আপন করে নিতে হয়ত দ্বিধা হত না। সকল দেশের মতো আমাদের দেশের প্রাচীন সাহিত্যেও দেবদেবী ও বীর বীরাঙ্গনাদের আধিপত্য। সমাজে শিশুদের স্থান ছিল অন্তরালে, সাহিত্যেও তারা তাই যথাযোগ্য স্থানলাভ করেনি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা'; তেমনি আমাদের কবিরা তাঁদের বাৎসল্যানুভূতি দেবতা এবং দেবোপম

ব্যক্তিদের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে কিছুটা তৃপ্তি লাভ করেছেন।

দ্বিতীয় লক্ষণীয় বিষয় হল এই যে, বেদ রামায়ণ মহাভারতের যুগে বাৎসল্যানুভূতিতে যে সংযম ও গাম্ভীর্য দেখা যায় ক্রমশঃ তা শিথিল হয়ে ভাগবত পুরাণে বাৎসল্য আবেগে পরিণত হয়েছে। ভাগবত পুরাণের পরবর্তী কালের আঞ্চলিক সাহিত্যে অনেকক্ষেত্রে এই বাৎসল্য স্নেহে গদ্‌গদ ভাবে রূপান্তরিত হয়েছে এমনও দেখা যায়। আবেগ যে সংযম ও গাম্ভীর্যকে অতিক্রম করেছে তার দৃষ্টান্ত দেখা যাবে সংস্কৃতানুসারী আঞ্চলিক ভাষার কাব্যসমূহে।

বাল্মিকী রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে [২০শ সর্গ] আছে, কৌশল্যা রামের বনবাসের সংবাদ শুনে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। রাম তাঁকে ধরে তুললেন এবং তখন কৌশল্যা নানা বিলাপবাক্য বলতে লাগলেন। কিন্তু কৃত্তিবাসের রামায়ণে আছে—"শুনিয়া পড়িল রাণী মূর্ছিত হইয়া।" রাম মনে করলেন কৌশল্যা বুঝি প্রাণ হারিয়েছেন এবং তিনি ভাবলেন, "মাতৃবধ করি বুঝি ডুবিনু নরকে।"[১৪৫]

মহাভারত থেকেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। গান্ধারী কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে মৃত পুত্রদের দেহ আবিষ্কার করে গভীর শোকে অভিভূত। সেই সময় কৃষ্ণের কথার উত্তর দিয়ে—

এতাবদুক্ত্বা বচনং মুখং প্রচ্ছাদ্য বাসসা।
পুত্র শোকাভিসন্তপ্তা গান্ধারী প্ররুরোদ হ॥[১৪৬]

কিন্তু কাশীরাম দাস স্ত্রীপর্বে এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বলেছেন,

"গান্ধারী এতেক বলি হৈল অচেতন।"[১৪৭]

মূল মহাভারতের গান্ধারী দৃপ্তময়ী তেজস্বিনী। পুত্রশোক তাঁকে গভীর বেদনা দিলেও তাঁর সুদৃঢ় ব্যক্তিত্ব ভূলুণ্ঠিত করতে পারেনি। সংযম ও গাম্ভীর্যে তাঁর বেদনা মহিমাময় ও মর্মস্পর্শী হয়েছে।

ভারতীয় সাহিত্যে বাৎসল্য ভাবনার এই বিবর্তন ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে বৈষ্ণব পদাবলীতে কি রূপ নিয়েছে তার আলোচনা করা হবে চতুর্থ অধ্যায়ে।

অলংকার শাস্ত্রে বাৎসল্য

নর-নারীর মধ্যে যে আকর্ষণ তাকে যৌনতামূলক বলে মোটামুটিভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু বাৎসল্যভাবকে সহজে ব্যাখ্যা করা চলে না। সন্তানকে ভালোবাসে মা—বাবা প্রকৃতপক্ষে নিজেদেরই ভালোবাসে, সন্তানের মধ্যে দেখতে পায় নিজেদেরই প্রতিফলন। কিন্তু এ কথা সর্বতোভাবে যুক্তিসহ নয়। কারণ জীবনে ও সাহিত্যে আমরা দেখতে পাই মাতাপিতা ছাড়া অন্য গুরুজনরাও শিশুকে ভালোবাসে। অনেক ক্ষেত্রে সে ভালোবাসা মা বাবার স্নেহের মতোই গভীর।

কোনো কোনো মনোবিজ্ঞানী বাৎসল্যভাবের কারণ নির্দেশ করতে চেষ্টা করেছেন। বর্তমান শতকের প্রথম দশকে ম্যাকডুগল ও উইলিয়ম জেমস বলেছেন, বাৎসল্য

ইনস্টিংক্‌ট বা সংস্কার। এই সংস্কার নিয়েই আমাদের জন্ম। জন্তুর মধ্যেও এই সংস্কার দেখা যায়।

এই শতকের দ্বিতীয় দশকে ওয়াটসন ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা নিরীক্ষার পর দেখিয়েছেন যে, নবজাত শিশুর মনে ভালোবাসার অঙ্কুর জাগ্রত হতে পারে তার শরীরের স্পর্শকাতর অংশগুলি কারো দ্বারা স্পৃষ্ট হলে। ভয়, ক্রোধ ও ভালোবাসা শিশুর মনে জেগে ওঠে যারা তাকে ঘিরে থাকে তাদের স্নেহস্পর্শে অথবা আচরণে। সন্তানকে পরিচর্যা করবার ফলে এবং প্রতিনিয়ত তার স্পর্শসুখ পাওয়ায় মা'র মনে বাৎসল্যভাব জাগ্রত হয়। সংস্কার-তত্ত্বকে তিনি প্রাধান্য দেন নি।

ফ্রয়েড তাঁর লিবিডোর তত্ত্ব স্নেহ ভালোবাসার ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করেছেন। আদিম জৈবিক এষণার তাড়নায় উদ্দীপ্ত চিত্ত আকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতা যার মধ্যে খুঁজে পায় তাই ভালোবাসার সামগ্রী এবং অবলম্বন। এই সব সামগ্রীর প্রতি অদৃশ্য সতত আকর্ষণই বাৎসল্য, স্নেহ, প্রেম ইত্যাদি।[১৪৮]

বিদেশী মনোবিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যার সাহায্যে আমাদের বাৎসল্য ভাবের স্বরূপ উপলব্ধি সম্ভব নয়। কারণ তাঁরা শুধু মাতৃস্নেহের কথা নিয়েই বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু আমাদের দেশে যৌথ পরিবারের পরিবেশে বাৎসল্যের পরিধি আরও প্রসারিত। তাঁরা মায়ের স্নেহ দেখেছেন, দেখেননি দিদি, জেঠিমা, খুড়িমা, মাসীমা প্রভৃতির ভালোবাসা।

মানব জীবনে ও জন্তুজগতে বাৎসল্যভাবের ব্যাপক অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও প্রাচীন আলংকারিকেরা একে যোগ্য মর্যাদা দেন নি। ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রে বাৎসল্যরসের উল্লেখ নেই। পরবর্তী আলংকারিকেরাও মানবমনের এই গভীর অনুভূতিকে যে যথার্থ গুরুত্ব দিয়েছেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র তাই সংস্কৃত আলংকারিক-দের রস বিচারের দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করে বলেছেন: "নয়টি বৈ রস নয়, কিন্তু মনুষ্য চিত্তবৃত্তি অসংখ্য। রতি, শোক, ক্রোধ, স্থায়ীভাব; হর্ষ অমর্ষ প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাব। স্নেহ, প্রণয়, দয়া, ইহাদের কোথাও স্থান নাই,— না স্থায়ী না ব্যভিচারী— কিন্তু একটি কাব্যানুপযোগী কদর্য মানসিক বৃত্তি আদিরসের আকারস্বরূপ স্থায়ীভাবে প্রথমে স্থান পাইয়াছে। স্নেহ, প্রণয়, দয়াদি পরিজ্ঞাপক রস নাই; কিন্তু শান্তি একটি রস।"[১৪৯]

রসের সংখ্যা সীমিত করা যে অযৌক্তিক তা কোনো কোনো টীকাকারও বলেছেন। রুদ্রটের একটি শ্লোকের [কাব্যালংকার—১২/৪] ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে টীকাকার নমিসাধু বলেছেন যে, এমন কোন চিত্তবৃত্তি নেই যা আস্বাদিত হলে রসে পরিণত হয় না।

কিন্তু অভিনব গুপ্তের মতো মনীষাসম্পন্ন আলংকারিকও সিদ্ধান্ত করেছেন, "এবং তে নব রসাঃ।" রস নয়টি, তার বেশী নয়। অথচ ভরতমুনি— স্বীকৃত আটটি রসের সঙ্গে শান্তরসকে যোগ করে রসের সংখ্যা নয় করতে তাঁর দ্বিধা হয় নি। জৈন এবং বৌদ্ধ ধর্মে শান্তরসকে যে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে তার প্রভাবেই হয়ত শান্ত নবম রস হিসাবে অলংকারশাস্ত্রে স্থান লাভ করেছিল। একবার আটটি রসের নির্দিষ্ট সংখ্যার

অতিরিক্ত শান্ত রস স্বীকৃত পাওয়ায় আলংকারিকেরা নতুন নতুন রস সংযোজনের প্রস্তাব দিলেন। এইসব প্রস্তাবের মধ্যে বাৎসল্য রস অন্যতম।

ডঃ রাঘবন বলেছেন, রুদ্রটের কাল থেকেই "বাৎসল্য" অলংকার শাস্ত্রে স্থান পেয়েছে।[১৫০] রুদ্রট বাৎসল্য শব্দটি কিন্তু ব্যবহার করেন নি। তিনি উল্লেখ করেছেন প্রেয়োরসের, যার স্থায়ীভাব স্নেহ। ডঃ সুধীরকুমার দাশগুপ্ত, ডঃ রাঘবনের বক্তব্য স্বীকার করেন নি। তিনি বলেছেন, প্রেয়োরস বলতে সৌহার্দ্যকেই বুঝিয়েছেন রুদ্রট।[১৫১] কিন্তু অন্যত্র নাট্যশাস্ত্রের [৬।১০৯] অভিনবগুপ্ত-ভাষ্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ডঃ দাশগুপ্ত স্নেহ আর বাৎসল' যে এক তা স্বীকার করেছেন।[১৫২] প্রেয়োরস, স্নেহ ও বাৎসল্য নিয়ে ভিন্ন মতের অবকাশ সৃষ্টি করেছেন রুদ্রট নিজেই। কাব্যালংকারের দ্বাবিংশ অধ্যায়ে প্রেয়োরসের স্থায়ীভাব স্নেহ বললেও পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে স্নেহকে প্রায় রসের মর্যাদা দিয়ে আর্দ্রতাকে নির্দেশ করেছেন তার স্থায়ীভাব হিসাবে। অভিনবগুপ্ত একথা স্বীকার করেন নি।[১৫৩]

রুদ্রট ও অভিনবগুপ্তের মধ্যে অন্ততঃ এক শতাব্দীরও অধিককালের ব্যবধান। এই কালখণ্ডে প্রেয়োরস, স্নেহ বা বাৎসল্যরস সম্বন্ধে আলংকারিকেরা নিশ্চয়ই আলোচনা করেছেন। তাই অভিনবগুপ্ত নাট্যশাস্ত্রের ভাষ্যে স্নেহের প্রকৃতি সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে স্নেহ হল নিছক অভিষঙ্গ বা আসক্তি ভাব সৃষ্টির সহায়ক মাত্র। তার নিজের রসে পরিণত হবার যোগ্যতা নেই ; আসক্তি যখন বিচিত্র পথে রূপান্তর লাভ করে তখনই ভাব এবং রস সৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দেয়। অভিনবগুপ্ত এই প্রসঙ্গে এমন দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যা মেনে নিতে দ্বিধা হয়। মাতাপিতার প্রতি সন্তানের যে স্নেহাসক্তি-তাকে অভিনবগুপ্ত করেছেন ভয়ের অন্তর্ভূত।[১৫৪]

প্রকৃত কথা বোধ হয় এই যে, আলংকারিকেরা রসের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেও রক্ষণশীল মনোবৃত্তির জন্য ভরতের অষ্টম সংখ্যার গণ্ডি অতিক্রম করতে তাঁরা ছিলেন দ্বিধান্বিত। ভামহ, রুদ্রট, দণ্ডী, ভোজদেব, কবিকর্ণপুর প্রভৃতি অনেকেই আটটির বেশী রসের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন, প্রেয়স. বাৎসল্য, প্রীতি, স্নেহ, ভক্তি, শ্রদ্ধা ইত্যাদি রসের প্রস্তাবও তাঁরা দিয়েছেন। কিন্তু শান্তরস প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে অভিনবগুপ্তের যেরূপ দৃঢ় সমর্থন ছিল তেমন সমর্থন অন্য কোন প্রস্তাবিত রস পায় নি। কালিদাস যে শকুন্তলা নাটকে বাৎসল্য রসের চিত্র অংকিত করেছেন তার উল্লেখ পূর্বে করা হয়েছে। তিনি বাৎসল্য রসের অস্তিত্ব অন্তরে উপলব্ধি করে রচনায় স্থান দিয়েছেন। কিন্তু রক্ষণশীলতা ধরা পড়ে বিক্রমোর্বশীয়ম্ নাটকে [২য় অংক, ২৩শ দৃশ্য] সেখানে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী তিনি আটটি রসের কথাই বলেছেন। অর্থাৎ, উপলব্ধি ও চিরাগত ঐতিহ্যের দ্বন্দ্বে কালিদাসের মতো অনেক মনীষী ভরত-নির্দিষ্ট রসগণনাই সুদীর্ঘকাল যাবৎ স্বীকার করে এসেছেন।

বৈষ্ণব আলংকারিকদের পূর্বে চতুর্দশ শতাব্দীতে কবিরাজ বিশ্বনাথ রচিত অলংকারগ্রন্থ সাহিত্যদর্পণই সুস্পষ্টরূপে বাৎসল্যকে দশম রস হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। সেখানে বলা হয়েছে :

অথ মুনীন্দ্র-সম্মতো বৎসলঃ
বৎসলশ্চ রস ইতি ভেন স দশমো রসঃ।
স্ফুটং চমৎকারিতয়া বৎসলং চ রসং বিদুঃ।
স্থায়ী বৎসলতা-স্নেহঃ পুত্রাদ্যালম্বনং মতম্ ॥[১৫৭]

অর্থাৎ, এর পরে উল্লেখ করতে হয় মুনীন্দ্র [ভরত]-সম্মত বাৎসল্যরস। বাৎসল্যও রস, রসপর্যায়ে এর স্থান দশম। চমৎকারিত্ব থাকার বাৎসল্য রস হিসাবে পরিগণিত। বাৎসল্যের স্থায়ীভাব স্নেহ এবং অবলম্বন পুত্রাদি।

বাৎসল্য রসকে মর্যাদা দেবার সমর্থন করতে ভরতমুনির উল্লেখ কেন করা হয়েছে সে বিষয়ে প্রশ্ন হতে পারে। কারণ অধিকাংশ প্রামাণ্য সংস্করণে নাট্যশাস্ত্র আটটি রসের কথাই বলেছে। একমাত্র কাব্যমালা সংস্করণের সপ্তদশ অধ্যায়ের পাঠে "করুণা-বাৎসল্য" ইত্যাদির উল্লেখ আছে। ডঃ সুধীরকুমার দাশগুপ্তের মতে এই পাঠ দেখেই হয়ত বিশ্বনাথ ভরতমুনির নাম বাৎসল্যরসের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। কিন্তু পাঠটি সম্ভবতঃ ভুল। কারণ গাইকোয়াড় ওরিয়েন্টাল সিরিজে প্রকাশিত নাট্যশাস্ত্রের পাঠ "করুণ-বীভৎস" ইত্যাদি।[১৫৮] 'বাৎসল্য' কথা নেই।

বিশ্বনাথের পূর্বে একাদশ শতাব্দীতে ভোজরাজ শৃঙ্গার প্রকাশে দশম রস হিসাবে বৎসল্যের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এই বৎসল বলতে তিনি ঠিক কি বুঝিয়েছেন, প্রেয়োরস না অন্যকিছু, তা স্পষ্ট নয়।[১৫৯] এই জন্যই বিশ্বনাথকেই বাৎসল্য রসের আদি প্রবক্তার মর্যাদা দেওয়া হয়।

সাহিত্যদর্পণে স্থান পেলেও বাৎসল্য রস সংস্কৃত আলংকারিক সমাজে সমাদৃত হয় নি। কবি কর্ণপুর, রূপগোস্বামী, জীবগোস্বামী প্রভৃতি গৌড়ীয় বৈষ্ণব আলংকারিকেরা বাৎসল্যকে পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বল্লভাচার্য বাল-গোপালের পূজা প্রচলন করায় সাহিত্যে এবং বৈষ্ণব সমাজে বাৎসল্য রসের প্রতিষ্ঠা ব্যাপকতর হল। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম মূলতঃ স্নেহ ভালোবাসায় পূর্ণ ঈশ্বর সাধনা। এই প্রেমের ধর্মে জোয়ার এনেছেন চৈতন্যদেব। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত পদ রত্নাবলীর ভূমিকায় বলা হয়েছে : "চৈতন্যদেব জন্মিবার বহু পূর্ব হইতে বৈষ্ণবধর্ম ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, কিন্তু অপূর্ণভাবে। কেননা তখন সে ধর্ম কেবল রাধাকৃষ্ণের যৌন সম্বন্ধের উপর সংস্থাপিত।...... যে সকল মহাজন শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচ ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়াছেন, তাঁহারা গৌরাঙ্গের সম-সাময়িক বা পরবর্তী জয়দেবাদির অনেক পরে .. .. এমত বলিতেছি না যে চৈতন্যের পূর্বেকার বৈষ্ণব ধর্ম কেবল মধুর রসসর্বস্ব-শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্যাদির তখন নাম গন্ধ ছিল না। আমার তর্ক এই যে, মধুর রসের তখন এত বাড়াবাড়ি, যে অন্য রসের ভাবনা ভাবিবার সময় ছিল না।...... যশোদার সেই গোপালময় প্রাণ, অতুল বৎসল ভাব, ব্রজ রাখালের সেই ঢল ঢল বালসুলভ সখ্য, যমুনার কূলে কূলে ব্রজের বনে বনে মধুর সে গোচারণ, সে মোহ যার বলে,—

দুগ্ধ স্রাবি পড়ে বাঁটে,   প্রেমের তরঙ্গ উঠে
স্নেহে গাবী শ্যাম অঙ্গ চাটে।

'সৌন্দর্যের এই সব উপকরণ, ভালোবাসার পঞ্চম যে মধুর রস, তাহার নীচেই এই সব পরদা, তাঁহারা একেবারে ছাড়িয়ে গিয়াছেন।......'[১৫৮]

আমাদের আলোচ্য বাৎসল্য অলৌকিক। সংসার জীবনে সন্তানের প্রতি মাতাপিতার যে স্নেহ তাকেই বৈষ্ণব মহাজনরা প্রয়োগ করেছেন কৃষ্ণ আরাধনার ক্ষেত্রে। ভক্ত মনে করেন তিনি পালক, শ্রীকৃষ্ণ পালনীয়। বাৎসল্য রতি দ্বারা প্রভাবান্বিত ভক্ত নিজেকে শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা বড় বলে মনে করেন; অর্থাৎ, তিনি যেন তাঁর গুরুজন। ভক্ত মনে করেন কৃষ্ণ যে অসহায় বালক, শুধু স্নেহ এবং মমতার পাত্র নন, লালন পালন করাও কর্তব্য। সম্ভ্রমবোধ বাৎসল্যরতিতে সম্পূর্ণ লোপ পায় বলে কৃষ্ণকে একান্তরূপে নিজের করে পাবার পথে কোনো বাধা থাকে না।

মুখ্য রতি পাঁচটি এবং মুখ্য রসও পাঁচটি,— একথা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। বাৎসল্য চতুর্থ রস, অর্থাৎ মধুর রসের ঠিক আগেই তার স্থান। রূপ-গোস্বামীর সংজ্ঞা হল এই :

বিভাবাদ্যৈস্ত বাৎসল্যাং স্থায়ী পুষ্টিমুপগতঃ।
এষ বৎসলনামাত্র প্রোক্তো ভক্তিরসো বুধৈঃ॥[১৫৯]

অর্থাৎ, উপযুক্ত বিভাবাদির সাহায্যে বাৎসল্য নামক স্থায়ীভাব পুষ্টি লাভ করলে তাকে বৎসল ভক্তিরস বলেন পণ্ডিতরা।

বাৎসল্য রতি সম্বন্ধে রূপগোস্বামী বলেছেন :

গুরবো যে হরেরস্য তে পূজ্যা ইতি বিশ্রুতাঃ।
অনুগ্রহময়ী তেষাং রতিবাৎসল্যমুচ্যতে।
ইদং লালনভব্যাশীশ্চিবুকস্পর্শনাদিকৃৎ॥[১৬০]

অর্থাৎ, গুরুস্থানীয়েরা শ্রীহরির পূজ্য। এই গুরুজনদের অনুগ্রহ পুষ্ট রতিকে বলে বাৎসল্য। বাৎসল্যের লক্ষণ হল লালন পালন, মঙ্গলকামনায় নানা ক্রিয়া সম্পাদন, আশীর্বাদ এবং চিবুক স্পর্শাদি।

শ্রীকৃষ্ণ ভগবান। তাঁর পূজনীয় কেহ থাকতে পারে না তথাপি বাৎসল্যরস আস্বাদনের জন্য তিনি বাললীলার আশ্রয় নিয়েছেন। বহু ভক্ত ও পরিকরগণ শ্রীকৃষ্ণকে সন্তানের মতো লালন পালনের, মঙ্গলকামনার এবং স্পর্শসুখে আহ্লাদিত এই সব ভাবে আবিষ্ট হয়ে পড়েন।

অন্যান্য ভাবের মতো বাৎসল্য ভাবও বিভাবাদির সহায়তায় রসতা লাভ করে। বাৎসল্যরসের স্থায়ী ভাব হল বৎসল রতি। কবি কর্ণপুর অলংকারকৌস্তভে বলেছেন, বাৎসল্যের স্থায়ীভাব "মমকার"।[১৬১] ডঃ সুধীরকুমার দাশগুপ্ত এই মমকারকে স্নেহান্ত মমতা হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন।[১৬২] মাতাপিতার সন্তান সম্বন্ধে যে "আমার আমার" ভাব থাকে তাই মমকার। সংস্কৃত আলংকারিকেরা বাৎসল্য রসের বিভিন্ন স্থায়ীভাব নির্দেশ করেছেন। বিশ্বনাথ কবিরাজ বলেছেন, বৎসলতারূপ স্নেহঃ;

মন্দারমরন্দচম্পুর মতে করুণা ; হরিপালদেবের সংগীত সুধাকরে বলা হয়েছে প্রীতি এবং রুদ্রট কোথাও স্নেহ কোথাও আর্দ্রতাকে বলেছেন বাৎসল্যের স্থায়ীভাব।[১৬৩]

বাৎসল ভক্তিরসের আলম্বন হলেন শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর গুরুজন। শ্রীকৃষ্ণই বাৎসল্যের বিষয়, এই জন্য তিনি বিষয়ালম্বন। বাৎসল্য থাকে গুরুজনদের হৃদয়ে, সেখানেই বাৎসল্যের অঙ্কুরোদ্গম এবং বিকাশ। তাই শ্রীকৃষ্ণের গুরুজনরা হলেন বাৎসল্যের আশ্রয়ালম্বন।

শ্রীকৃষ্ণের গুরুজনদের মধ্যে আছেন যশোদা, নন্দ, দেবকী, বসুদেব প্রভৃতি। বৎসলভাবে ভাবিত ভক্তরা শ্রীকৃষ্ণের গুরুজন মনে করে নিজেদের কৃষ্ণ অপেক্ষা বড় বলে মনে করেন।

বাৎসল্য ভক্তিরসের উদ্দীপন বিভাব হল :

কৌমারাদি-বয়ো-রূপ-বেশাঃ শৈশবচাপলম্।
জল্পিত স্মিত-লীলাদ্যা বুধৈরুদ্দীপনা : স্মৃতাঃ ॥[১৬৪]

অর্থাৎ কৃষ্ণের বয়স, রূপ, বেশ, শৈশব চাপল্য, মধুর বাক্য, মৃদু হাসি, লীলাখেলা ইত্যাদি গুরুজনদের মনে [বা ভক্তের হৃদয়ে] বাৎসল্যরস উদ্দীপ্ত করে। বাৎসল্যরসের বিষয়ালম্বন শ্রীকৃষ্ণের বয়স বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ওয়াটসন ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, দৈহিক ঘনিষ্ঠতার ফলেই মা ও সন্তানের মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ জন্মে। সর্বদা মা'র কোলে যে সন্তান থাকে তাকে কেন্দ্র করে বাৎসল্যরসের বিচিত্র রূপ প্রকাশিত হবার সুযোগ নেই। এই জন্যই মারি ও বালক যীশুর বাৎসল্য রসবৈচিত্র্যের বিশিষ্টতা লাভ করে নি এবং তাকে কেন্দ্র করে সাহিত্য সৃষ্টিও হয় নি।

গোড়ীয় বাৎসল্যরসের নায়ক শ্রীকৃষ্ণের বয়স জন্ম থেকে পনেরো বছর পর্যন্ত। এই কাল তিনটি ভাগে বিভক্ত। কৌমার পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত ; পৌগণ্ডের সীমা দশম বর্ষে শেষ ; তারপর পনেরো বছর পর্যন্ত কৈশোর। এই বয়সের বালককে কোলে করা যায়, আদর করা যায়, ভর্ৎসনা করা যায়, প্রয়োজন হলে প্রহারও করা যেতে পারে। যে বালক শয্যায় অথবা মা'র কোলে থাকে তাকে নিয়ে কোন সমস্যা যেমন নেই তেমনি নেই আকর্ষণের তীব্রতা। যে বালক প্রতিবেশীদের বাড়ীতে গিয়ে ননী চুরি করে খায়, নিজের বাড়ীর দধিভাণ্ড ভাঙে, গোপবালকদের সঙ্গে কলহ করে, —তাকেই ভর্ৎসনা করা যায়, শাসন করা যায়। শ্রীকৃষ্ণ গোচারণে গেলে যশোদা সন্তানের অদর্শনে কাতর হবার সুযোগ পান, বাড়ী ফিরতে বিলম্ব হলে মাতৃহৃদয় উৎকণ্ঠিত হয়। এ সমস্তের মধ্য দিয়ে বাৎসল্য প্রকাশের সুযোগ ঘটে।

বৎসল্য ভক্তিরসের অনুভাব হল শ্রীকৃষ্ণের গায়ে হাত বুলানো, মঙ্গলকামনা, মস্তক আঘ্রাণ, স্নান করানো, খাওয়ানো, পোশাক পরানো, নাম ধরে কারণে অকারণে ডাকা, আলিঙ্গন, চুম্বন ইত্যাদি।

অন্যান্য রসের সাত্ত্বিক ভাবের সংখ্যা আট। কিন্তু বাৎসল্য ভক্তিরসের সাত্ত্বিক ভাব নয়টি। বালগোপালের জন্য প্রবল স্নেহে যশোদা এবং গোপরমণীগণ অভিভূত

হয়ে পড়লে তাঁদের বক্ষ থেকে স্বতঃই স্তন্যধারা প্রবাহিত হতে থাকে। এই স্বতঃস্ফূর্ত স্তন্যস্রাবই নবম সাত্ত্বিক ভাব, যা একমাত্র বাৎসল্য ভক্তিরসেরই বৈশিষ্ট্য।

বাৎসল্য ভক্তিরসের স্থায়ী ভাবের কথা উপরে বলা হয়েছে। দাস্যরসের তেত্রিশটি ব্যভিচারী ভাব বাৎসল্য রসের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।[১৬৭] গৌড়ীয় অলংকারশাস্ত্রে বাৎসল্যরসকে যে ভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে তার মোটামুটি পরিচয় দেওয়া হল। এরই সংক্ষিপ্তসার প্রাঞ্জল ভাষায় দিয়েছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ ;

বাৎসল্যে শান্তের গুণ, দাস্যের সেবন।
সেই সেই সেবনের ইহাঁ নাম পালন ॥
সখ্যের গুণ "অসংকোচ" "অগৌরব" সার।
মমতাধিক্যে তাড়ন-ভর্ৎসনা-ব্যবহার ॥
আপনারে "পালক" জ্ঞান, কৃষ্ণে "পাল্য" জ্ঞান।
"চারি" গুণে বাৎসল্য রস অমৃত সমান ॥

মধুর রসের ক্ষেত্রে যেমন পূর্বরাগ, মিলন, বিরহ, শৃঙ্গার প্রভৃতি নানা স্তর আছে বাৎসল্য রসেও তেমনি বৈচিত্র্য দেখা যায়। ঐ বৈচিত্র্য না থাকলে বাৎসল্য ভক্তিরসে ভাবিত ভক্তদের সাধনার পথ হত ক্লান্তিকর এবং বাৎসল্যমূলক পদাবলী পাঠকের মনে আকর্ষণ সৃষ্টি করতে সক্ষম হত না। সংযোগ-বাৎসল্য বাৎসল্যভাবের এমনি একটি বিশেষ অবস্থা। এই অবস্থায় সন্তানকে ঘিরে মাতাপিতার আনন্দ, গর্ব, ভবিষ্যতের স্বপ্ন, অনিষ্টের আশংকা, প্রভৃতি নানা ভাবনা। সুরদাসের একটি পদে এরই খানিকটা ধরা পড়েছে :

নন্দ-ঘরনি আনন্দ ভরী, সুত স্যাম খিলাবৈ।
কবহি ঘুটুরুবনি চলহিঁগে, কহি বিধিহিঁ মনাবৈ
কবহি দঁতুলি দ্বৈ দুধ কী, দেখৌ ইন নৈননি
কবহি কমল-মুখ বোলিহৈঁ, সুনিহৌঁ উন বৈননি।
চূমতি কর-পগ-অধর-ভ্রূ, লটকতি লট চুমতি।
কথা বরনি সুরজ কহৈ, কহঁ পাবৈ সো মতি ॥[১৬৬]

অর্থাৎ, আনন্দিত নন্দরাণী শ্যামসুন্দরের সঙ্গে খেলছেন আর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছেন, 'কবে আমার ছেলে হামা দেবে' কবে ওর দুধের ছোট ছোট দাঁত দুটি দেখতে পাব! কবে ওর সুন্দর কোমল মুখে কথা ফুটবে?" স্নেহাপ্লুত হয়ে তিনি কৃষ্ণের হাত, পা, অধর, ভ্রূ এবং ঝুলে পড়া চুলের গুচ্ছ চুম্বন করতে লাগলেন।

বালগোপালের মধুর নৃত্য দেখে ব্রজরমণীরা বাৎসল্যভাবে আবিষ্ট। বংশীবদন সেই অবস্থার কথা বলেছেন :

হেরইতে পরশিতে লালন করাইতে
স্তন ঘিরে ভীগল বাস ॥

শ্রীকৃষ্ণের বিরহ যশোদা এবং অন্যান্য গোপবধূদের হৃদয় বাৎসল্যরসে উচ্ছ্বসিত হয়ে

ওঠে। এই বিয়োগ-বাৎসল্য নিয়ে অনেক সুন্দর পদ রচিত হয়েছে। বলরাম দাস যশোদার বেদনা উপলব্ধি করে বলেছেন :

এ হেন দুধের বাছা বনেতে বিদায় দিয়া
কেমনে ধরিবে প্রাণ মায় ॥[১৬৭]

দীন চণ্ডীদাস বলেছেন, কৃষ্ণ মথুরা চলে যাবার পর যশোদা—

কানাই কানাই বলিয়া বলিয়া
নিরবধি রাণী কান্দে।

হিন্দী পদকর্তারাও মথুরা-প্রবাসী কৃষ্ণের জন্য যশোদার আর্তি মর্মস্পর্শী ভাষায় রূপায়িত করেছেন।

বৈষ্ণবীয় বাৎসল্যরসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল পরকীয়াকে প্রাধান্য দেওয়া। মধুররসে পরকীয়ার যে গুরুত্ব বাৎসল্যেও তেমনি সমান গুরুত্ব। শ্রীকৃষ্ণের আপন মাতাপিতা দেবকী ও বসুদেব। কিন্তু তাঁর গভীর স্নেহের সম্পর্ক যশোদা নন্দ এবং অন্যান্য ব্রজবাসী গুরুজনদের সঙ্গেই গড়ে উঠেছিল। পরকীয়া প্রেমের ব্যাকুলতা যেমন তটপ্লাবী এবং উন্মাদক, পরকীয়া বাৎসল্যও তদনুরূপ। বৈষ্ণব পদকর্তারা এই পরকীয়া বাৎসল্যের চিত্রই এঁকেছেন।

পদাবলী সাহিত্যে পরকীয়া বাৎসল্যের এই প্রাধান্যই হয়ত পরবর্তীকালের বাংলা সাহিত্যে প্রভাব বিস্তার করেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলীতে বাৎসল্য প্রায় অনুপস্থিত বলা চলে। রবীন্দ্রনাথের গল্পে-উপন্যাসে-নাটকে পরকীয়া বাৎসল্যের দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যায়। গোরার প্রতি আনন্দময়ীর স্নেহ, গোবিন্দমাণিক্যের তাতা ও তার দিদির প্রতি স্নেহ এবং জয়সিংহের জন্য রঘুপতির ভালোবাসা এরই কয়েকটি দৃষ্টান্ত মাত্র। তাঁর অতিথি, আপদ, সম্পত্তি সমর্পণ প্রভৃতি অনেক গল্পে এমনি পরকীয়া বাৎসল্যের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

শরৎচন্দ্রের গল্প উপন্যাসেও এর অনেক উদাহরণ ছড়িয়ে আছে। পল্লীসমাজের বিশ্বেশ্বরী, মেজদিদির হেমাঙ্গিনী, রামের সুমতির নারায়ণী, বিন্দুর ছেলের বিন্দু, পণ্ডিতমশাইয়ের কুসুম প্রভৃতি নায়িকারা অপরের সন্তানকে শুধু প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছে তাই নয়, সেই ভালোবাসার জন্য অনেক দুঃখ ও নির্যাতন বরণ করতে দ্বিধা করে নি। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের এই পরকীয়া বাৎসল্য যেন পদাবলীর পরকীয়া বাৎসল্যের সঙ্গে এক সূত্রে বাঁধা।

নির্দেশিকা

১· নাট্য শাস্ত্র ৬।৩৫

২· রাধাগোবিন্দ নাথ, গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন, ৫ম খণ্ড, পৃ ২৭০৫

৩· সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, কাব্য-বিচার, পৃ ৬৭

৪· তদেব, পৃ ৯১-৯২

৫· সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য, সংস্কৃত সাহিত্যের ভূমিকা, পৃ ৪৮৪

৬· খগেন্দ্রনাথ মিত্র, কীর্তন, পৃ ৫৯

৭· সুধীরকুমার দাশগুপ্ত কাব্যালোক, পৃ ৯৩

৮· কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য, রসতত্ত্ব, শিল্পসম্ভোগ, বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ, ১৩৭৪, পৃ ৮১

৯· রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্যের পথে, রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৩শ খণ্ড, পৃ ৪৩৭

১০· অতুলচন্দ্র গুপ্ত, কাব্য-জিজ্ঞাসা, পৃ ১৭

১১· De, S. K., *History of Sanskrit Poetics*, Vol. II, p. 17. ডঃ পি. ভি. কানে তাঁর সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের ইতিহাসেও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। দ্রষ্টব্য : নাট্যশাস্ত্রের উপর অধ্যায়টি।

১২· "স্থায়িত্বং চ এতাবতামেব। জাত এব হি জন্তরিয়তীভিঃ সংবিদ্ভিঃ পরীতো ভবতি।" [নাট্যশাস্ত্রের অভিনব ভারতী টীকা ১।২৮৪]

১৩· ভক্তিরসায়ন ১।১, পৃ ১

১৪· নাট্যশাস্ত্র ৬।৩৬, ভাষ্য।

১৫· ভামহ, কাব্যলংকার, ৩।৬ পৃ ১৯

১৬· সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ ২৩৫

১৭· মধুরং রসবদ্বাচি বস্তুন্যপি রসস্থিতিঃ, কাব্যাদর্শ, ১।৫১, পৃ ২৭

১৮· সুধীরকুমার দাশগুপ্ত, কাব্যালোক, ৪র্থ সং, পৃ ১৪৮

১৯· সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ ২৩৬

২০· অতুলচন্দ্র গুপ্ত, কাব্য-জিজ্ঞাসা, ভূমিকা, পৃ পাঁচ

২১· Kane, P. V., *History of Sanskrit Poetics*, 3rd Ed. ১৬২-১৯০ পৃষ্ঠায় দুটি মতের বিস্তৃত আলোচনা আছে।

২২· ধ্বন্যালোক, ৪।৪

২৩· তদেব, ১।৪

২৪· তদেব, ১।১৩

২৫· তদেব, ১।১

২৬· সাহিত্যদর্পণ, ১।৩

২৭· রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভরতবর্ষে ইতিহাসের ধারা, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৮ খণ্ড, পৃ ৪২৯

২৮· ধ্বন্যালোক, লোচনটীকা, ২।৪

২৯· শ্রীমদ্ভাগবতম্, ৭।১।৩১

৩০· রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রসসমীক্ষা, পৃ ১৭৩

৩১· Chatterji, S. K., *Islamic Mysticism, Iran and India*, In *Indo-Iranica*, V. I. Oct. 1946.

৩২· শ্রীহরিদাস দাস সম্পাদিত "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু", দ্বিতীয় সংস্করণ ভূমিকা, পৃ ১

৩৩· সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, অপরার্ধ ২য় সং, পৃ ২১

৩৪· অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ২য় খণ্ড, ২য় সং ; পৃ ৪০৫-০৬

৩৫· ভগবদ্ভক্তিরসায়ন, ২।৭৫-৭৬

৩৬· প্রীতিসন্দর্ভঃ, পৃ ৬৭৩-৭৪

৩৭· চৈতন্যচরিতামৃত, আদি ৪।১৭

৩৮· তদেব, ১।৪।২১-২২

৩৯· তদেব, অন্ত্য ৪।১৯১

৪০· তদেব মধ্য ২২।৯৯

৪১· প্রীতিসন্দর্ভঃ, ১১০, পৃ ৫৮০

৪২· ভগবদ্ভক্তিরসায়ন, ২।৭৭-৭৮

৪৩· রাধাগোবিন্দ নাথ, গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন, ৫ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ ১৩

৪৪· সাহিত্যদর্পণ. ১।১৮

৪৫· প্রীতিসন্দর্ভঃ, ১১১

৪৬· চৈতন্যভাগবত আদি, ৮ম সং, পৃ ৫৩

৪৭· চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য ৯।৯৬

৪৮· সাহিত্যদর্পণ, ৩।১৮৩

৪৯· কাব্যালংকার, ১৪।১২, পৃ ১৬০,

৫০· অনন্তদাস ব্যবাজী মহারাজ, রসদর্শন, পৃ ৫৪-৫৫

৫১· শশিভূষণ দাশগুপ্ত, শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ দর্শনে ও সাহিত্যে, পৃ ২৪৮

৫২· চৈতন্যচরিতামৃত, আদি ৪।৪৬-৪৭

৫৩· তদেব, আদি ৪।১৬৪-৬৬

৫৪. তদেব, মধ্য ২১।১০১

৫৫. তদেব, আদি ১।৯০-৯২

৫৬. তদেব, আদি ৮।১৪৪-৪৫

৫৭. তদেব, মধ্য ৮।১৪৭

৫৮. তদেব, আদি ৪।৬০

৫৯. তদেব, আদি ৪।৯৬-৯৮

৬০. তদেব, আদি ১।৬১

৬১. *The Bhakti-Rasa-Sastra of Bengal Vaisnavism.* In the *Indian Historical Quarterly*, December, 1932, p. 646

৬২. কাব্যালোক, ৪র্থ সং পৃ. ২০৯

৬৩. নাট্যশাস্ত্র, ১।২৭৪

৬৪. ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ, ২।১।৫

৬৫. সাহিত্যদর্পণ, ৩।১৭৬ টীকা

৬৬. নাট্যশাস্ত্র, ৬।২৩

৬৭. বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, প্রাচীন ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রের ভূমিকা, পৃ. ৩১ উদ্ধৃত।

৬৮. ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ, ২।৫।১

৬৯. তদেব, ২।৫।২

৭০. "মুখ্যা গৌণী চ সা দ্বেধা রসজ্ঞৈঃ পরিকীর্তিতা", ২।৫।২

৭১. ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ, ২।৫।১১৫

৭২. তদেব, ২।৫।৪০

৭৩. চৈতন্য চরিতামৃত, ২।১৯।১৮৫, ১৮৭

৭৪. তদেব, ২।১৯।১৮৮

৭৫. ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ, ২।৫।৩৮

৭৬. চৈতন্যচরিতামৃত, ২।১৯।১৮৩-৮৪

৭৭. ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ, ২।৫।৩

৭৮. তদেব, ২।৫।৫১

৭৯. রাধাগোবিন্দ নাথ, গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন ; ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৯৪৯

৮০. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রেমধর্ম, পৃ. ৪১৩ উদ্ধৃত।

৮১. চৈতন্যচরিতামৃত, ২।১৯।২৩০-৩১

৮২. তদেব, ২।১৯।২১৭

৮৩. তদেব, ২।১৯।২২১, ২২৩, ২২৪

৮৪. 'ব্যাম্বিনো' শিল্প সম্বন্ধে তথ্য পরিবেশিত হয়েছে, *Encyclopedia of Religion and Ethics*, Vol. II, p. 341-42.

৮৫. Swaddling clothes.

৮৬. Forlong I. G. R., *Encyclopedia of eligions*, Vol. I., Bambino.

৮৭. Majumdar, Pratap Chandra, *Paramahansa Ramakrishna*, 3rd. Ed p. 5.

৮৮. পি, ফালোঁ, অনুবাদক, মুক্তিদাতা, পৃ ১৬-১৭

৮৯. Henry Suso (b. 1295)

৯০. Inge, W. R., *Christian mysticism.* p. 176.

৯১. Weber. A.

৯২. *Indian Antiquary*, 1874.

৯৩. Hopkins, A. W.

৯৪. Kennedy. J.

৯৫. Macnicol, Hiciol.

৯৬ Nestorias-এর শিষ্য সম্প্রদায়।

৯৭. Kennedy, J. *The Child Krishna, Christianity and the Gujars* in *J. R., A. S. Great Britain & Ireland*, 1907. p. 951-991.

৯৮. Bhandarkar R. G , Vaisnavism, Saivism and minor Religions Systems, p. 38.

৯৯. Basham, A. L., The Wonder that was India, p. 308.

১০০. Keith, A. B., *The Child Krishna.* in *J. R. A. S. Great Britain and Ireland*, June 1908 ; p 169-175.

১০১. এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখযোগ্য রমাপ্রসাদ চন্দ একটি শিলালেখে প্রমাণ উদ্ধার করে দেখিয়েছেন যে ‘কৃষ্ণ’ নামটি যীশুখ্রীষ্টের জন্মের প্রায় দুই শতাব্দী পূর্বে প্রচলিত ছিল। দ্রষ্টব্য Chanda, Ramaprasad *Memoirs of the Archaeological Survey of India No. 5 ; Archaeology and Vaishnava Tradition.*

১০২. সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ. পরিশিষ্ট, পৃ ৪৭-৫১

১০৩. ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ. ১।২।২৬৯ ও ৩০৯

১০৪. প্রভুদয়াল মীতল, চৈতন্য মত ঔর ব্রজ সাহিত্য, পৃ ১২

১০৫. তদেব, পৃ ২৯

১০৬. তদেব. ভূমিকা. পৃ ১

১০৭. দীনদয়ালু গুপ্ত, হিন্দী সাহিত্য কা বৃহৎ ইতিহাস, ৫ম ভাগ ; পৃ ৪২

১০৮. হরবংশলাল শর্মা, ভাগবত দর্শন, পৃ ৩৪৪

১০৯. বলদেব উপাধ্যায়, ভাগবত সংপ্রদায়, পৃ ৫২৬

১১০. হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী, উস যুগ কী সাধনা ঔর তৎকালিক সমাজ, হরবংশলাল শর্মা সংপাদিত সুরদাস গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধ, পৃ ৪৯

১১১. রামচন্দ্র শুক্ল, হিন্দী সাহিত্য কা বৃহৎ ইতিহাস, পৃ ১৯১-১৯২

১১২. দীনদয়ালু গুপ্ত, সম্পাদনা, হিন্দী সাহিত্য কা বৃহৎ ইতিহাস, ৫ম ভাগ, পরিশিষ্ট খ, পৃ ৫০০

১১৩. সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ, পরিশিষ্ট, পৃ ৫০-৫১
১১৪. ঋগ্বেদ. ১০।৮৫।৪৫
১১৫. তদেব, ১।৬৯।৩
১১৬. বাল্মীকি রামায়ণম্, অযোধ্যাকাণ্ড ২০।৫৩
১১৭. তদেব, ৪২।৩৪
১১৮ মহাভারতম্, আদি, ১১৫।৩৯
১১৯. তদেব, আশ্রমিক, ৩।১৭-২৫
১২০. তদেব, সভা, ৭৫।৮-৯
১২১. আনুমানিক ১০০।২০০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত
১২২. অশ্বঘোষ, বুদ্ধচরিত. ৮।৫৮
১২৩. কুমারসম্ভবম্, ১।২৭
১২৪. অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, ৭।১৭
১২৫. তদেব, ৭।১৯
১২৬. রঘুবংশ, ৩।২৬
১২৭. ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড, ১৫শ অধ্যায়, ৭ম শ্লোক
১২৮. শ্রীমদ্‌ভাগবতম্, ১০ম স্কন্ধ ; ৩য় অধ্যায়, পৃ ৩৭-৩৮
১২৯. তদেব, ১০।৭।৬-১২
১৩০. তদেব, ১০।৮।২৯-৩১
১৩১. তদেব. ১০।৯।৩
১৩২. স্বয়ম্ভু রিট্ঠেণেমিচরিউ, সন্ধি, ৫।৯-১০
১৩৩. যতীন্দ্র রামানুজদাস, আড়বার, পৃ ৩
১৩৪. বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, ভারতীয় ভক্তিসাহিত্য
১৩৫. Sastri, K. A., Nilakanta. *A History of South India* p. 321
১৩৬. যতীন্দ্র রামানুজদাস, সহস্র পদাবলী, পৃ ৮৫-৮৯
১৩৭. একনাথ, জগন্নাথ শ্যামরাও দেশপাণ্ডে সম্পাদিত নবে নবনীত, পৃ ১৩৮-৩৯
১৩৮. নরসিং মেহ্তা, শ্রীকৃষ্ণ বাললীলা, পদ নং ১৩
১৩৯. Mansinha, Mayadhar. *History of Oriya Leterature*, p. 282.
১৪০. সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, অসমীয়া সাহিত্য, পৃ ৪১
১৪১. নীলরতন সেন সম্পাদিত, চর্যাগীতিকোষ, ২০ নং চর্যা, পৃ ১৩৮
১৪২. বৃন্দাবন দাস, চৈতন্য-ভগবত, ১।৫
১৪৩. দীনেশচন্দ্র সেন, সরল বাঙ্গালা সাহিত্য, ১০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত
১৪৪. কৃত্তিবাস, রামায়ণ (আদিকাণ্ড), পৃ ১০০
১৪৫. তদেব, অযোধ্যাকাণ্ড, পৃ ১১৫
১৪৬. মহাভারতম্, শল্যপর্ব, ৩৬।৬৮
১৪৭. কাশীরাম দাস, মহাভারত (স্ত্রীপর্ব) ২য় খণ্ড, পৃ ১১৯৮

১৪৮. Sills, David L. ed., *Internationol Encyclopedia of the Social Sciences.* Vol-1. p. 121-124.

১৪৯. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিবিধ প্রবন্ধ ১ম খণ্ড, পৃ ১৮৪-১৮৫

১৫০. Raghavan. V., *The Number of Rasas* 2nd ed. p. 63 & 118. আরো দ্রঃ কাব্যালংকার ২২।৩

১৫১. সুধীরকুমার দাশগুপ্ত, কাব্যালোক, ৪র্থ সং, পৃ ১৪৯

১৫২. তদেব, কাব্যালোক, ৪র্থ সং, পৃ ১৪৮

১৫৩. ভরত, নাট্যশাস্ত্র অভিনব ভাষ্য, ৬।১০৯

১৫৪. তদেব, অভিনব ভাষ্য

১৫৫. বিশ্বনাথ কবিরাজ, সাহিত্যদর্পণ, ৩।২১৩

১৫৬. সুধীরকুমার দাশগুপ্ত, কাব্যালোক, ৪র্থ সং, পৃ ১৮৫

১৫৭. তদেব, পৃ ১৮৬

১৫৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, সংকলক 'পদরত্নাবলী' ভূমিকা', পৃ ১৫-১৭

১৫৯. রূপগোস্বামী, ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ, ৩।৪।১

১৬০ তদেব, ২।৫।৩৩

১৬১. কবিকর্ণপুর, অলংকারকৌস্তভ, ৫ম কিরণ

১৬২. সুধীরকুমার দাশগুপ্ত, কাব্যালোক, ৪র্থ সং. পৃ ১৮৭

১৬৩. Raghavan. V. *The Number of Rasas* 2nd ed. p. 118-122.

১৬৪. রূপগোস্বামী, ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ, ৩।৪।১৭

১৬৫. দাস্যরসের ব্যভিচারীভাবের জন্য দ্রঃ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ, ৩।২।৬৯-৭০

১৬৬. সুরদাস, সুর সাগর, ১ম খণ্ড, পৃ ২৮৬, ৭৪।৬৯২

১৬৭. ব্রহ্মচারী অমরচৈতন্য, সম্পাদক, বলরামদাসের পদাবলী, পৃ ৩৯

তৃতীয় অধ্যায়

বাৎসল্যরসের মুখ্য পদকর্তাগণ

এ অধ্যায়ে বাৎসল্যরসের দশজন বিশিষ্ট পদকর্তা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এঁদের মধ্যে পাঁচজন বাঙালী এবং পাঁচজন হিন্দী কবি। এঁরা কেউ একমাত্র বাৎসল্যরসের পদ রচনা করেন নি। পদকর্তারা ছিলেন বৈষ্ণব সাধক। তাঁরা শান্ত, দাস, সখ্য ও বাৎসল্য রস একে একে আস্বাদন করার পর পঞ্চম ও শ্রেষ্ঠ মধুর রস আস্বাদন করে সাধনার শেষ পর্যায়ে উপনীত হন। মধুর রস আস্বাদনেই সাধনার চরম পরিণতি,—এই জন্য বৈষ্ণব পদকর্তারা একে তাঁদের রচনায় প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁদের শ্রেষ্ঠ পদগুলি মধুর রসের হলেও অন্য চারটি রসপর্যায়ের উপরও তাঁরা কিছু কিছু পদ রচনা করেছেন। লক্ষ্য যদিও মধুর রস আস্বাদন করা তবু অন্য রসাস্বাদনের মধ্যে দিয়েই তাঁদের সাধনার পথ এবং সেই যাত্রাপথের কিছু অভিজ্ঞতার নিদর্শন পাওয়া যায় বাৎসল্য ও অন্যান্য রসাশ্রিত পদাবলীতে।

চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাস মূলতঃ মধুররসের কবি। তাঁদের প্রতিভার 'বকাশ এই শ্রেণীর পদাবলীকে কেন্দ্র করে। বাৎসল্যরসের অনেকগুলি পদ যদিও এঁদের নামে প্রচলিত, তবু তাঁদেরই রচিত মধুর রসের পদাবলীর তুলনায় এগুলি বিবর্ণ মনে হতে পারে। অন্যদিকে বাসুদেব ঘোষ ও বলরাম দাস বাৎসল্যের পদাবলীতেই রচনার উৎকর্ষতা প্রমাণ করেছেন। অন্ততঃ বলা যায় তাঁদের রচিত মধুর রসের পদ অপেক্ষা বাৎসল্যের পদ কম উজ্জ্বল নয়। এদিক থেকে বিচার করলে হিন্দী কবি সুরদাস এক অনন্য স্থান অধিকার করে আছেন। তিনি বাৎসল্য ও মধুর— এই উভয় রসের পদেই সমান প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। সুরদাস ভারতের শ্রেষ্ঠ বাৎসল্য রসের কবি। এই জন্য তাঁর সম্বন্ধে একটু বিস্তৃততর আলোচনা করা হয়েছে।

নিম্নে আলোচিত কবিদের সমগ্র রচনার পর্যালোচনা করা হয় নি। তাঁদের রচিত বাৎসল্য রসের পদগুলির সমীক্ষাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া মধ্যযুগের কবিদের স্থান, কাল ও ভণিতা নিয়ে যে অমীমাংসিত বিতর্ক চলে আসছে তার ব্যাখ্যা বা সমাধানের চেষ্টাও করা হয় নি।

বাংলা

চণ্ডীদাস :

বাংলা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে চণ্ডীদাসের নাম আপন মহিমায় ভাস্বর। প্রায় পাঁচশত বৎসর পরেও তাঁর পদাবলীর মাধুর্য ম্লান হয় নি। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাংলার এই জাতীয় কবির সঠিক পরিচয় জানা যায় না। নানা সূত্র থেকে যতটুকু জানা যায় তা নিয়েও পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। চণ্ডীদাস নামে ক'জন কবি ছিলেন, কোন সময়ে তাঁরা জীবিত ছিলেন এই সব প্রশ্ন নিয়েই পণ্ডিতদের সমস্যা।

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত চৈতন্যচরিতামৃতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন :

চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক-গীতি,
কর্ণামৃত, শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ-রামানন্দ-সনে মহাপ্রভু রাত্রি-দিনে,
গায়, শুনে পরম আনন্দে ॥[১]

চণ্ডীদাসের পদ চৈতন্যদেবের যে প্রিয় ছিল তার প্রমাণ এখানে পাওয়া যায়। এর অর্থ এই যে একজন চণ্ডীদাস নিঃসন্দেহে চৈতন্যের পূর্বে অথবা সমসাময়িক কালে পদ রচনা করেছেন। ইনি খুব সম্ভব বড়ু চণ্ডীদাস। বড়ু চণ্ডীদাস ছাড়া দ্বিজ, অনন্ত, দীন ভণিতাযুক্ত চণ্ডীদাসের অনেক পদ পাওয়া যায়। এ সব ভণিতা একই চণ্ডীদাসের অথবা চণ্ডীদাস নামধেয় বিভিন্ন কবির, সে সম্বন্ধে তথ্য প্রমাণাদি সব সুনিশ্চিতরূপে কিছু বলা যায় না। তবে অন্ততঃ এইটুকু নিশ্চিত যে দু'জন চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব ছিল : একজন চৈতন্যের পূর্ববর্তী, অন্যজন সমসাময়িক কিংবা পরবর্তী। ভাব, ভাষা ও রচনারীতির বিচারে এই সিদ্ধান্ত সমর্থিত হয়। দ্বিজ, দীন, আদি, অনন্ত ইত্যাদি বিশেষণ ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব একই কবি বিভিন্ন সময়ে ব্যবহার করতে পারেন। শুধু এই বিশেষণের পার্থক্য ভিন্ন ব্যক্তিত্বের নিঃসংশয় প্রমাণ নয়। এই সমস্যা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের অভিমত স্মর্তব্য : "আমরা এ পর্যন্ত দু'জন চণ্ডীদাসের পরিচয় পাইয়াছি। একজন চৈতন্যদেবের পূর্ববর্তী বড়ু চণ্ডীদাস, অন্যজন শ্রীচৈতন্য-পরবর্তী দীন চণ্ডীদাস। একটু অভিনিবেশ সহকারে আলোচনা করিলেই এই দুইজন কবির পদ পৃথক করা যায়। কিন্তু বড়ু ও দীন চণ্ডীদাস ভিন্ন "চণ্ডীদাস" এই নামের অন্তরালে যে অন্য কবিদের পদ চলিতেছে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে সেগুলিকে চিনিয়া লওয়া একরূপ দুঃসাধ্য ব্যাপার।"[২]

দীনেশচন্দ্র সেন মনে করেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বড়ু চণ্ডীদাস এবং পদাবলীর কবি চণ্ডীদাস অভিন্ন ব্যক্তি। তিনি উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছিলেন যে কালক্রমে লোকের মুখে মুখে কিছু রূপ বদল হলেও চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত বহু প্রচলিত পদাবলীর মূল উৎস বড়ু চণ্ডীদাসের রচনাতেই পাওয়া যায়।[৩] কিন্তু বড়ু চণ্ডীদাসের রচনায় যে দেহ প্রাধান্য লাভ করেছে একথা অস্বীকার করা চলে না। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা নিজেই বিলাপ করছেন :

কি কৈলি কি কৈলি বিধি নিরমিআঁ নারী
আপনার মাঁসে হরিণী জগতের বৈরী ॥[৪]

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এমন সব অশ্লীল উক্তি আছে যা এযুগে একান্তরূপে রুচি বিগর্হিত বলে মনে হবে। চৈতন্যদেব এইরূপ গ্রন্থের পাঠ বা শ্রবণে মুগ্ধ হতেন তা বিশ্বাস করতে দ্বিধা হয়। তিনি সম্ভবতঃ সহজিয়া চণ্ডীদাস বা পদাবলীর চণ্ডীদাসের পদাবলীর রস আস্বাদন করতেন। দুই কবির রাধার তুলনা করলেই মূল পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বড়ু চণ্ডীদাসের রাধা দেহ-সচেতন; পদাবলীর রাধা অপার্থিব অনুভূতিতে আত্মস্থা। এই রাধা "বিরতি আহারে রাঙ্গা বাস পরে যেন যোগিনীর পারা।" পদাবলীর চণ্ডীদাস দেহের জগৎ অতিক্রম করে রাধার অন্তরে প্রবেশ করে মর্মোদ্ঘাটন করতে সক্ষম হয়েছেন। বড়ু চণ্ডীদাস দেহের দ্বারে দাঁড়িয়ে নায়িকার অন্তরলোকের আভাস পাবার ক্ষীণ প্রয়াস করেছেন। বিদ্যাপতির রাধার সঙ্গে এই রাধার সমধিক সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

কাব্যগুণের সামগ্রিক ঐশ্বর্যের জন্য চণ্ডীদাসের পদাবলী এতদিন পরেও আমাদের মুগ্ধ করে। কিন্তু একথা চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত বাৎসল্যরসের পদগুলি সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। মনে হয় এই শ্রেণীর পদগুলি পালাগানের অংশ হিসাবে রচিত হয়েছিল। সুর সহযোগে গীত হলে এগুলি হয়ত শ্রোতার মনে রসের সঞ্চার করতে পারে। কিন্তু পাঠ করে মনে হয় না যে কবি রাধা-কৃষ্ণের লীলা অবলম্বনে মাধুর্যমণ্ডিত অপরূপ পদ রচনা করেছেন, বাৎসল্যের পদগুলি তাঁরই সৃষ্টি। এগুলি হয়ত চৈতন্য পরবর্তী অন্য কোন চণ্ডীদাসের রচনা।

যে চণ্ডীদাসই লিখুন না কেন, তাঁর বাৎসল্যরসের পদ অনেকগুলি। অন্য কোনো বাঙালী বৈষ্ণব কবি এ বিষয়ের উপর এত পদ রচনা করেছেন কিনা সন্দেহ। বাৎসল্যের অধিকাংশ পদ গ্রথিত হয়েছে নীলরতন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত চণ্ডীদাসের পদাবলীতে এবং মণীন্দ্রমোহন বসু সম্পাদিত [কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত] দীন চণ্ডীদাসের পদাবলীতে। অন্যান্য সংকলনে বাৎসল্যের পদ বেশী অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। এই রসাশ্রিত পদগুলি যে দীন চণ্ডীদাসেরই রচনা তার কোনো নিশ্চিত প্রমাণ নেই। প্রথমতঃ দীন চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত পদের সংখ্যা খুবই কম, অধিকাংশের ভণিতায় আছে শুধু চণ্ডীদাসের নাম। দ্বিতীয়তঃ, দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয় ১৩৪১ বঙ্গাব্দে। এর দুই দশক পূর্বে নীলরতন মুখোপাধ্যায়

সংকলিত চণ্ডীদাসের পদাবলী প্রকাশিত হয়। উভয় সংকলনের বাৎসল্য রসের পদগুলি প্রায় অভিন্ন।

তাঁর এই শ্রেণীর পদগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় চণ্ডীদাস ভাগবত কাহিনী থেকে দূরে সরে স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে বাৎসল্যরসের স্বাধীন চিত্র আঁকিতে উৎসাহ বোধ করেননি। ভাগবতই তাঁর মূল উৎস, কিন্তু তাই বলে অনুবাদ বা অনুসৃতি নয়। বাৎসল্যের পদগুলি মোটামুটি নিম্নলিখিত পর্যায়ে বিভক্ত: ১। সূতিকাগৃহে কৃষ্ণকে পেয়ে নন্দ ও যশোদার বাৎসল্যের প্রকাশ, ২। পূতনা ও তৃণাবর্তবধের পৌরাণিক কাহিনীর মধ্য দিয়ে যশোদার মাতৃসুলভ উৎকণ্ঠা, ৩। গোষ্ঠ ও উত্তর-গোষ্ঠ লীলা এবং যশোদার বাৎসল্য, ৪। অক্রূরের সঙ্গে কৃষ্ণের মথুরা যাত্রা। পুত্রের বিচ্ছেদে নন্দ যশোদার বেদনা, ৫। নন্দ মথুরা গেলেন কৃষ্ণ বলরামকে ফিরিয়ে আনতে। ব্যর্থ হওয়ায় নন্দর বেদনা, ৬। নন্দ একা ফিরে আসায় যশোদার বিলাপ। এছাড়া আছে কৃষ্ণ জন্মের পৌরাণিক বৃত্তান্ত, দেবকী ও বসুদেবের পুত্রের নিরাপত্তা ভাবনায় উৎকণ্ঠা, ভাগবত পুরাণে বর্ণিত মৃত্তিকা ভক্ষণ ইত্যাদি কাহিনীর মধ্য দিয়ে কৃষ্ণের ঐশ্বর্যরূপের প্রকাশ ; মথুরা এসে কৃষ্ণ কর্তৃক বসুদেব ও দেবকীর উদ্ধার ;—এ সবই শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা। এসব লীলায় বাৎসল্যরস সামান্যই পাওয়া যায়।

কংসের কারাগারে অষ্টম সন্তান কৃষ্ণের জন্ম হবার পর—

> পুত্রমুখ হেরি দৈবকী সুন্দরী
> কান্দিয়া আকুল বড়।
> "এমত ছাআলে কিরূপে রাখিব
> আমারে হইল পাড়॥"
> ভাবএ অন্তরে দৈবকী সুন্দরী
> দেখিয়া পুত্রের মুখ।
> হরস অন্তর বিকল হইছে
> আন চান করে বুক॥
> "কি বুদ্ধি করিব কেমত উপায়ে
> বাঁচএ এ হেন শিশু।"[১]

পুত্রের অপরূপ মুখের দিকে চেয়ে দেবকীর মন আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। কিন্তু পরমুহূর্তে ভাবনায় ব্যাকুল হন কংসের হাত থেকে কোন্ উপায়ে একে রক্ষা করা যাবে? উপায় নির্দেশ করল দৈববাণী। বসুদেব কৃষ্ণকে নিয়ে এলেন গোকুলে নন্দ গোপের গৃহে।

যশোদা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন। কৃষ্ণময় হয়ে গেল তাঁর জীবন ও জগৎ।

> কর পদ নাড়ি গোলক ঈশ্বর
> করেন আনন্দে খেলা॥
> খেনে গৃহকর্ম করে নন্দরাণী
> খেনেক দেখএ মুখ।

পুত্র হেরি হেরি জসদা সুন্দরী
বাড়এ মনের সুখ ॥[৬]

মাতৃস্নেহের এই সুন্দর ছবিটির মাধুর্য অনেকটা হ্রাস পেয়েছে "গোলক-ঈশ্বর" কথাটি ব্যবহার করায়। এই ঐশ্বর্যরূপ লৌকিক বাৎসল্যের প্রকাশকে ক্ষুণ্ণ করেছে।

অন্যান্য কবির বাৎসল্যরসের পদে নন্দ প্রায় অনুপস্থিত। চণ্ডীদাসের বৈশিষ্ট্য নন্দের বাৎসল্যকে উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়ায়। পুতনাবধের ঘটনা শুনে নন্দ ছুটে এলেন—

শুনি নন্দ ঘোষ ধাইঞা আইল
"পুত্র পুত্র" করি বলে।
ও মোর দুলাল, বাছনি" বলিয়া
তুরিত করিলা কোলে ॥[৭]

কৃষ্ণের এখন গোষ্ঠে যাবার বয়স হয়েছে। যশোদা চিন্তিত, গোষ্ঠে গিয়ে কি বিপদ ঘটে কে জানে। কিন্তু গোপবংশের ছেলেদের ধেনু চরানো অবশ্য কর্তব্য; সুতরাং যেতেই হবে। যশোদা বলরামকে বললেন,—

পুনঃ পুনঃ কহি রে।
শুন বাপু হলধরে ॥
কেবল আঁখির আঁখি।
তারার পুতলি সাথী ॥
তুমি ত প্রবীণ বট।
আমার যাদুয়া ছোট ॥
আপনার ক্ষুধার বেলে।
খাইতে দিও ত ভালে ॥
সম্মুখে রাখিও কানু।
তুমি চরাইবে ধেনু ॥
কানুর ধরাতে বাঁধি।
ক্ষীর ছেনা ননী চাঁছি ॥
যাদুরে করিয়া কোলে।
আপনি খাইবে বলে ॥
দুখিনী অভাগী আমি।
কেবল ভরসা তুমি ॥
তিলে না দেখিলে মরি।
এই নিবেদন করি ॥[৮]

সন্তানের জন্য মা'র সতর্ক ও সযত্ন স্নেহদৃষ্টির সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে কৃষ্ণের ঐশ্বর্যরূপের উল্লেখ করে কবি বাৎসল্যের স্বাভাবিক পরিবেশ ক্ষুণ্ণ করেন নি।

পুত্রকে গোষ্ঠে পাঠিয়ে যশোদা মৃত বৃক্ষের মতো পড়েছিলেন। শিঙ্গা শুনে বুঝতে পারলেন কৃষ্ণ বাড়ী ফিরে আসছেন। যশোদা তখন নতুন জীবন পেলেন, যেমন বর্ষার জলধারায় গ্রীষ্মের দাবদাহে শুষ্ক বৃক্ষ সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে।

সোনার পুতলি বনে পাঠাইয়া
আছিল চেতন হরি।
মরা তরু যেন বরিষ পাইলে
সে যেন মঞ্জরী সরি॥
কতক্ষণ হেরি সে চাঁদ বদন
তবে সে জুড়াই প্রাণ।
আঁখির তারাটি খসিয়া গেছিল
পুন সে বৈঠল ঠাম॥[৯]

কৃষ্ণ যেন যশোদার চোখের মণি; গোষ্ঠে চলে যাওয়ায় চোখের মণিও সঙ্গে সঙ্গে চলে গিয়েছিল। কৃষ্ণ বাড়ী ফিরে আসায় চোখের দৃষ্টি ফিরে পেলেন যশোদা। কত সহজ কথায় কবি মায়ের গভীর স্নেহের কথা বলেছেন। চোখের সঙ্গে পুত্রের তুলনা অন্যত্রও আছে। কৃষ্ণ মথুরা চলে যাবার পর যশোদা বিলাপ করছেন:

আঁখি গেলে তার কি ছার জীবনে
বাঁচিতে কি আর সাধ।[১০]

গোষ্ঠ থেকে ফিরে আসার পর যশোদা পুত্রকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন:

এতক্ষণ কোথা হিয়া দিয়া ব্যথা
গেছলে কোন বা বনে।
এখানে এ ধর গৃহ মাঝে ছিল
পরাণ তোমার সনে॥[১১]

কৃষ্ণ নিকটে না থাকলে চোখের তারা যেমন হারিয়ে যায় তেমনি যশোদার প্রাণও পুত্রের সঙ্গে চলে যায় গোষ্ঠে, দেহ পড়ে থাকে গৃহে।

তুমি মোর প্রাণ পুথলি সমান
যতক্ষণ নাহি দেখি।
হৃদয় বিদরে তোমার অগোচরে
মরমে মরিয়া থাকি॥[১২]

উত্তর-গোষ্ঠের এই পদটিতে গৃহ-প্রত্যাগত কৃষ্ণের মলিন মুখ দেখে যশোদা ব্যাকুল হয়ে উঠলেন—

আহা মরি মরি পরাণ পুথলি
বাছনি কালিয়া সোনা।
কত না পেয়েছ ক্ষুধায় পীড়িত
বনে যেতে কার মানা॥

এ দুঃখে না জীব নন্দে কি বলিব
এ শিশু পাঠায়ে বনে।
এ ঘর কারণে আনল ভেজাব
কি বা সে করয়ে ধনে ॥[১৩]

যশোদা সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকেন—

না জানি কখন কিবা জানি হয়
হেন লয় মোর মনে ॥
বনে ভয়ংকর বৈসে ভয়ংকর
শার্দুল ভুজঙ্গ রহে।
জানিবা কখন করয়ে দংশন
এ বড় বিষম মোহে ॥[১৪]

যশোদার যত রাগ নন্দের উপরে। কারণ নন্দই গোপালকে গোষ্ঠে পাঠাতে ব্যগ্র। তাই যশোদা কৃষ্ণকে বলছেন,

তোমারে লইয়া আন দেশে যাব
না রব নন্দের ঘরে।
তোমা হেন ধন আর কোথা পাই
বিধাতা দিয়াছে মোরে ॥
কত কত বার ছেনা ননী সর
পিয়াই রজনী জাগি।
কটোরা ভরিয়ে রাখিয়ে থালিয়ে
রাখিয়ে যাহার লাগি ॥
এ জন কেমনে এই ধেনু সনে
ফিরিবে বনেতে বনে।
অভাগী মায়ের বিষম অন্তর
ক্ষেণ কত উঠে মনে ॥[১৫]

এর পরে অক্রুর এলেন কৃষ্ণ ও বলরামকে মথুরা নিয়ে যেতে। এই খবর শুনে যশোদা মূর্ছিত হয়ে পড়লেন; সমগ্র গোকুলে পড়ল শোকের ছায়া।

একথা শুনিয়া নন্দ পানে চেয়ে
পড়িল ধরণীতলে।
কি হল কি হল গোকুল নগরে
কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে ॥[১৬]

কৃষ্ণ তখন গোষ্ঠে; মথুরা যাবার খবর তিনি তখনও জানেন না।
যশোদা—

কোলে লয়ে কানু এ ক্ষীর নবনী
পিয়ায় মনের সুখে।

বিবিধ শাকর চিনি ছানা সর
দিছেন ও চাঁদ মুখে ॥[১৭]

বাড়ীর সামনে রথ কেন জিজ্ঞাসা করায় কৃষ্ণ জানতে পারলেন তাঁকে মথুরা যেতে হবে এবং সেই কথা ভেবে যশোদা ব্যাকুল। কৃষ্ণ মাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, ভয় করো না।

কিন্তু কৃষ্ণের আশ্বাসে যশোদা শান্ত হতে পারেন না। তিনি বলেন—

কিবা দেখ নন্দ ঘুচিল আনন্দ
বেড়ল আপদ আসি।
সুখ গেল দূরে দুখ রহে পাশে
কেমনে বঞ্চিব নিশি ॥[১৮]

আসন্ন বিচ্ছেদ-বেদনার কথা মনে করে যশোদার স্নেহ উদ্বেল হয়ে ওঠে। তিনি—

কোলে লয়ে যাদুমণি বদন চুম্বয়ে রাণী
দর দর বহে প্রেমবারি।
ধরিয়া গোপাল করে কাতর হইয়া বলে
দুই বাহু ধরিয়া পসারি ॥
... ...
কে আর করিবে খেলা হইয়া বালকমেলা
কাবে দিব ছেনা ননী সর।
কে আর যাইয়া ঘরে মহটা লইয়া করে
এ সর নবনী দিব মুখে।
এ সব ছাড়িয়ে মায় কোথারে যাইতে চায়
মায়ের অন্তরে দিতে দুখে ॥[১৯]

যশোদা যতই বিলাপ করুন না কেন, কৃষ্ণ বলরামকে মথুরা যেতে হল। নন্দ ঘোষ সঙ্গে গেলেন ; আশা, কৃষ্ণকে ফিরিয়ে আনবেন। মথুরায় কিছুদিন কেটে যাবার পর কৃষ্ণ বলরামের সংগে পরামর্শ করলেন কি উপায়ে নন্দকে বাড়ী পাঠানো যায়। বলরামের সঙ্গে আলোচনার সময় প্রমাণ পাওয়া যায় কৃষ্ণও নন্দ ও যশোদার প্রতি কত আসক্ত।

নন্দ হেন পিতা কি কহিব কথা
যার স্নেহে নাহি সীমা।
বহু সুখ অতি কি আর পীরিতি
যশোমতী অতি সমা ॥
যশোদার স্নেহ কি কহিব এই
এ দেহ পূরিত সুখে।
এ জন বিদায় কেমনে করব
না লয় আমার মুখে ॥[২০]

এরূপ প্রীতি-বাৎসল্যের দৃষ্টান্ত বেশী নেই। কৃষ্ণ যশোদার কথা ভেবে চোখের জলও ফেলেছেন।

নন্দ ঘোষকে ওঁরা বললেন, আপনি বাড়ী যান, আমরা পরে যাব।

দু ভাইকে রেখে বাড়ী ফিরতে নন্দর বুক বেদনায় দীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। কৃষ্ণ বলরাম যাবেন না শুনে নন্দ—

ভূমে গড়ি যায় কান্দে নন্দ রায়
সম্বিত নাহিক চিতে।[২১]

তাঁর ভাবনা—

কেমনে যাইব গোকুল নগরে
কৃষ্ণ বলরাম রাখি।[২২]

নন্দ একা ফিরে আসায় গোকুলে শোকের ছায়া নেমে এল। যশোদা তাঁকে অভিযোগ করে বললেন—

কি লয়ে আইলা তুমি ঘরে।
ছাড়ি মোর কৃষ্ণ হলধরে॥
কান্দে রাণী ভূমে অচেতন।
ধায়ে যত গোপ গোপীগণ॥[২৩]

সহজ সরল ভাষায় উপমা অলংকারে বক্তব্য ভারাক্রান্ত না করে চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলাশ্রিত বাৎসল্যের কথা এমন সরাসরিভাবে প্রকাশ করেছেন যা হৃদয় স্পর্শ করে। এই পদগুলি পালাগানের অংশ হিসাবে রচিত হয়েছিল, তাই সুরারোপিত হলে এদের মাধুর্য অনেক গুণ বৃদ্ধি পাবে। বৈষ্ণব পদকর্তারা সাধারণতঃ যশোদার বাৎসল্যকেই প্রাধান্য দেন। চণ্ডীদাসের বৈশিষ্ট্য তিনি দেবকী, বসুদেব, নন্দ প্রভৃতির বাৎসল্যকেও মর্যাদা দিয়েছেন। এমনকি, শ্রীকৃষ্ণও যে নন্দ ও যশোদার প্রতি আকৃষ্ট তারও পরিচয় পাওয়া যায়। শুধু যশোদার বাৎসল্যের মধ্যে নিবদ্ধ থাকলে বাৎসল্যের এই সামগ্রিক পরিবেশটি প্রকাশ করা সম্ভব হত না।

বাৎসল্যরসাশ্রিত বাংলা বৈষ্ণব পদাবলীতে চণ্ডীদাসের এই পদগুলির বিশেষ মূল্য আছে। কিন্তু রাধা-কৃষ্ণলীলা বর্ণনায় তিনি যে অনন্যসাধারণ রচনাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন সেই তুলনায় বাৎসল্যরসের পদগুলির কাব্যগুণ একটু ম্লান।

বাসুদেব ঘোষ

বাসুদেব ঘোষের জীবনকথা সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য তথ্য বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। যেটুকু পাওয়া যায় সে সম্বন্ধেও ইতিহাসকাররা ভিন্নমত পোষণ করেন। তবে দু'টি বিষয়ে সবাই একমত। প্রথমতঃ, গোবিন্দ, মাধব ও বাসুদেব— এই তিন ভাইয়ের মধ্যে বাসুদেব কনিষ্ঠ। তিনজনই ছিলেন কবিত্বশক্তির অধিকারী এবং সুদক্ষ কীর্তনীয়া। তাঁদের কীর্তনের গুণগান কৃষ্ণদাসও করেছেন:

গোবিন্দ, মাধব, এই বাসু ঘোষ।
তিন ভাই'র কীর্তনে প্রভু পায়েন সন্তোষ ॥[২৪]

বাসুদেব নিজে দুই অগ্রজ সম্বন্ধে লিখেছেন :

গোবিন্দ মাধব ঘোষের গান,
শুনিয়া কেবা ধরয়ে পরাণ।[২৫]

দ্বিতীয়তঃ, এঁরা তিনজনই ছিলেন চৈতন্যদেবের সমসাময়িক। তাঁর লীলা প্রত্যক্ষ করবার সৌভাগ্য এঁদের হয়েছিল। কৌমার্যব্রতধারী তিন ভ্রাতার একান্ত আগ্রহ ছিল চৈতন্যদেবের সঙ্গে থেকে তাঁর পরিচর্যা করা। কিন্তু প্রেমধর্ম প্রচারের জন্য মহাপ্রভু বাংলাদেশে নিত্যানন্দের নিকট তিন ভাইকে নীলাচল থেকে পাঠিয়ে দিলেন। নিত্যানন্দের সহচর হিসাবেই তাঁদের পরবর্তী জীবন কেটেছে।

বাসুদেবের জন্ম ও মৃত্যুর কোন তারিখ পাওয়া যায় না ; তিনি যে চৈতন্যদেবের সমসাময়িক এবং তাঁর তিরোধানের পরেও যে কিছুকাল জীবিত ছিলেন সে বিষয়ে মতদ্বৈধতা নেই।

দীনেশচন্দ্র সেনের মতে বাসুদেবের পূর্ব নিবাস ছিল কুমারহট্ট। শ্রীহট্টের বুড়ন গ্রামে মাতুলালয়ে তাঁর জন্ম হয়েছিল এমন কথাও শোনা যায়।[২৬] সুকুমার সেনও বলেছেন, বাসুদেবরা কুমারহট্ট থেকে নবদ্বীপে এসে বসবাস শুরু করেছিলেন। তাঁদের মাতুলালয় শ্রীহট্টে এবং পিত্রালয় চট্টগ্রামে ছিল বলে তাঁর ধারণা।[২৭] কিন্তু অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, বাসুদেবের পিতা বল্লভ ঘোষ ছিলেন মুর্শিদাবাদের অধিবাসী, পরে তাঁরা নবদ্বীপবাসী হন।[২৮] আবার অনেকে মনে করেন বাসুদেবের আদি নিবাস ছিল বর্ধমান কিংবা মেদিনীপুরে।[২৯]

গোবিন্দ, মাধব ও বাসুদেব— এই তিন ভাই চৈতন্য জীবনীমূলক পদ রচনা করেছেন। বিশেষ করে সন্ন্যাস গ্রহণ বিষয়ক করুণরসের পদগুলি মর্মস্পর্শী। তিনজনের মধ্যে পদকর্তা হিসাবে শ্রেষ্ঠ কনিষ্ঠ বাসুদেব। চৈতন্যের পরবর্তীকালে বাংলা পদাবলী সাহিত্যে একটি নতুন শাখার প্রবর্তন হল। এই শাখার মূল বিষয়বস্তু গৌরাঙ্গের জীবন, সন্ন্যাসগ্রহণ এবং প্রেমধর্মের প্রচার। এই শ্রেণীর পদাবলী রচনায় বাসুদেব শীর্ষস্থানীয় বললে অত্যুক্তি হয় না। কবি চৈতন্যলীলার প্রত্যক্ষদর্শী, সুতরাং তাঁর পদাবলীর ঐতিহাসিক মূল্য অবশ্য স্বীকার্য। সবচেয়ে বড় কথা সেই প্রেমলীলার সাক্ষী হিসাবে কবির উদ্বেলিত হৃদয়ের অনুভূতি তাঁর পদাবলীতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এই আবেগাপ্লুত পদগুলি যখন গীত হত তখন শ্রোতার পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হয়ে যেত। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাই বলেছেন :

বাসুদেব গীতে করে প্রভুর বর্ণনে
কাষ্ঠ-পাষাণ দ্রবে যাহার শ্রবণে ॥[৩০]

বাসুদেব রচিত পদের সংখ্যা আনুমানিক দুই শতাধিক।[৩১] সুকুমার সেনের মতে এই সংখ্যা প্রায় আশী।[৩২] ভণিতার সমস্যা সংখ্যা নির্ণয়ে বাধা হয়ে দেখা দেয়। কারণ বাসুদেবের পদ সংগ্রহে কবি বল্লভ, বাসুদেব, বাসু ঘোষ, বাসু প্রভৃতি

ভণিতা পাওয়া যায়। বাসুদেব বাঙালী বৈষ্ণবদের মধ্যে একটি সাধারণ নাম। একাধিক কবির এই নাম থাকতে পারে। পদগুলির গুণগত বিভিন্নতা লক্ষ্য করেও মনে হয় সংকলিত পদগুলি হয়ত একাধিক কবির রচনা। বাসুদেব ব্রজবুলিতেও বারোটি পদ রচনা করেছিলেন।

তাঁর রচনা প্রধান দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এ দু'টি শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন: "বাসুদেব চৈতন্য-জীবন কথাকে দুইটি পৃথক পর্যায়ে বর্ণনার সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। একটি পর্যায়ে অলংকারশাস্ত্র ও পূর্ব প্রচলিত বৈষ্ণব পদাবলীর শ্রেণী ও পালা অনুসারে চৈতন্যলীলাকে সেই ছাঁচে ঢালিয়া তিনি রাধাকৃষ্ণলীলার পটভূমিকায় চৈতন্যকাহিনী স্থাপন করিয়াছিলেন। আর একটি পর্যায়ে তিনি চৈতন্যদেবের নবদ্বীপের জীবনলীলাকে ঐতিহাসিক ও বাস্তব দৃষ্টিকোণ হইতে অংকন করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে প্রথম পর্যায়টি নিছক কাল্পনিক, বাস্তবের সঙ্গে ইহার ততটা সম্পর্ক নাই; কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ের পদগুলিতে চেতন্যের দৈনন্দিন জীবনের অধিকতর ছায়াপাত হইয়াছে।"[৩৩]

বাসুদেব বৈষ্ণবীয় রীতিসম্মত কিছু বিশুদ্ধ কৃষ্ণলীলার পদ রচনা করেছেন, যে সব পদে আছে গোষ্ঠলীলা, পূর্বরাগ, মিলন, বিরহ, ঝুলন, রাসলীলা, জলকেলি, দানলীলা প্রভৃতির বর্ণনা। বর্ষার রাত্রিতে রাধার অভিসারচিন্তা নিয়ে কবি এই পদটি রচনা করেছেন:

ওহে নব জলধর
বরিষ হরিষ বড় মনে
শ্যামের মিলন মোর সনে।
বরিষ মন্দ ঝিমানি
আজু সুখে বঞ্চিব রজনী
গগনে সঘনে গরজনা
দাদুরি দুন্দুভি-বাজনা।
শিখরে শিখণ্ডিনী বোল
বঞ্চিব সুরনাথ-কোল
দোহার পিরীতি-রস আশে
ডুবল বাসুদেব ঘোষে ॥[৩৪]

কৃষ্ণলীলার পটভূমিকায় গৌরাঙ্গের কৃষ্ণপ্রেমের বিভিন্ন স্তর বর্ণনা করা হয়েছে অনেকগুলি পদে। এ সব ক্ষেত্রে গৌরাঙ্গ রাধার স্থান অধিকার করেছেন, রাধার মতোই তিনি কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত। আবার ভাগবত অনুসরণে যশোদার বাৎসল্যের ছবিও বাসুদেব এঁকেছেন। গোপরমণীরা যমুনায় জল আনতে গেছে; সেই সুযোগে কৃষ্ণ শূন্যগৃহে প্রবেশ করে ননী চুরি করে খেয়েছেন। প্রতিবেশিনীরা নালিশ করায় ছেলেকে শাস্তি দিতে বেঁধে রাখলেন যশোদা। কৃষ্ণের কান্না দেখে তাঁকে বন্ধনমুক্ত

৩৩. ভাই[illegible]
কীর্তন

করতেই তিনি গিয়ে উঠলেন কদম গাছে। যশোদার ভয় হল ছেলে যদি পড়ে যায়। তখন যশোদা লোভ দেখিয়ে বিলাপ করছেন :

যশোদা বলেন, কোলে আয় রে যাদুমণি
দুকর পুরিয়া তোরে দিব রে ননী ॥
কান্দে তখন নন্দরাণী হায় রে বাছা যাদুমণি
আমি ত পাষণ্ডী তোর মাতা।
কি ছার নবনী তরে বান্ধিলাম যুগল করে
পাষাণ হৃদয় তোর পিতা।
... ...
আমার পাষাণ হিয়া যুগল করেতে বান্ধিয়া
প্রহার করিলাম নানা ছলে।
তুমি ভাগ্যবতী রাণী শ্রীকৃষ্ণের চরণ ভাবি
বাসুঘোষ ইহা বলে ॥[৩৫]

বাসুদেবই গৌরাঙ্গের জীবনকাহিনী অবলম্বন করে বাৎসল্যরসের বাংলা পদ প্রথম রচনা করেছিলেন। যশোদা কৃষ্ণকে যতই স্নেহ করুন না কেন, কবিরা সেই স্নেহকে যতই মানবিক রূপ দেবার জন্য প্রয়াস করুন না কেন, আমরা সম্পূর্ণ ভুলতে পারি না যে কৃষ্ণ সংসার-জগতের কেউ নন। তাঁর ঐশ্বর্যরূপ বারবার ভক্তের নিকট আত্মপ্রকাশ করে। তাই যশোদার বাৎসল্যে একটু ফাঁক থেকে যায়,— সেটা মানব-জননী ও ভগবানের মধ্যেকার ব্যবধান। কিন্তু শচীমাতার গৌরাঙ্গের জন্য যে স্নেহের ব্যাকুলতা তা পরিপূর্ণরূপে মানবিক এবং অতি সহজেই তা আমাদের অন্তর গভীরভাবে স্পর্শ করে। পুত্র গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হওয়ায় মায়ের মনের যে বেদনা তা প্রায় পাঁচশত বৎসর যাবৎ বাঙালীর বাৎসল্যভাবনাকে করুণ রসে সিক্ত করছে। এই বেদনাকে কাব্যে রূপায়িত করেছেন বাসুদেব, এক্ষেত্রে তিনিই পথিকৃৎ। বাৎসল্যের পরবর্তী কবিরা তাঁর দ্বারা বিশেষরূপে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বাংলা পদাবলী সাহিত্যে বাৎসল্যরস মর্যাদা পেয়েছে শচীমাতার বিয়োগান্ত স্নেহের বাস্তব দৃষ্টান্ত থেকেই।

চৈতন্যের লীলাসঙ্গী ছিলেন বাসুদেব। তিনি গৌরাঙ্গের সমগ্র জীবনের প্রধান ঘটনাবলীকে বিষয়বস্তু করে পদ রচনা করেছেন। তাঁর গৌরাঙ্গবিষয়ক পদাবলী সম্বন্ধে যথার্থই বলা হয়েছে :

বাসু ঘোষ ঠাকুরের বিচিত্র বর্ণন।
শুনিতেই যুড়ায় শ্রোতার কর্ণ মন ॥
গৌরাঙ্গের জন্ম আদি যত যত লীলা।
বিস্তারি অশীতি পদে সকল বর্ণিলা ॥
কীর্তনের আরম্ভে রসের অনুসারে।
গৌরচন্দ্র সেই পদ গাও সমাদরে।[৩৬]

বাসুদেব বাৎসল্যরসের এমন কতকগুলি অন্তরঙ্গ বাস্তব চিত্র এঁকেছেন যা প্রথাসিদ্ধ কৃষ্ণলীলার পদে অনুপস্থিত। মাতা পুত্রের এমনি একটি কৌতুক-ক্রীড়ার ছবি—

শচীর আঙ্গিনায় নাচে বিশ্বম্ভর রায়।
হাসি হাসি ফিরি ফিরি মায়েরে লুকায় ॥
বয়ানে বসন দিয়া বোলে লুকাইলুঁ ॥
শচী কোলে বিশ্বম্ভর আমি না হেরিনুঁ।
মায়ের অঞ্চল ধরি চঞ্চল-চরণে।
নাচিয়া নাচিয়া যায় খঞ্জন-গমনে ॥
বাসুদেব ঘোষে কহে অপরূপ শোভা।
শিশুরূপে দেখি হয় জগ-মন-লোভা ॥[৩৭]

নিমাই আমাদেরই ঘরের নিত্যপরিচিত দুরন্ত শিশু এবং শচী বাঙালী ঘরের মমতাময়ী মা :

মায়ের অঞ্চল ধরি শিশু গৌরহরি।
হাঁটি হাঁটি পায় পায় যায় গুড়ি গুড়ি।[৩৮]

কখনও গোরা মা'র হাত ধরে দ্রুত হাঁটার চেষ্ট করেন, কখনও 'ঠেকার' দেখিয়ে পড়ে যান ; আবার কখনও "আখুটি করিয়া গোরা ভূমে দেয় গড়ি। শচী তাড়াতাড়ি ছেলেকে কোলে তুলে গায়ে হাত বুলিয়ে দেন, ব্যথা পেয়েছে মনে করে 'আহা' বলে ছেলেকে সান্তনা দেন এবং "চুম্বন দেয় বদন কমলে।"

বাসুদেব অবশ্য ভাগবত-বর্ণিত বাৎসল্যের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করতে পারেননি। নিমাই যখন "চাঁদ দে মা বলি শিশু কাঁদে উভরায়" তখন কৃষ্ণের চাঁদের জন্য এমনি বায়নার কথা মনে পড়ে। শচী যখন দেখলেন চাঁদের জন্য নিমাই "কাঁদিয়া ধূলায় পড়ে হাতে ছিঁড়ে চুল" তখন ঘর থেকে রাধা-কৃষ্ণের ছবি এনে ছেলের হাতে দিলেন তিনি। আর,

চিত্র পাঞা গোরাচাঁদের মনে বড় সুখ।
বাসু কহে পটে পহু হেরে নিজ মুখ ॥[৩৯]

কবি এখানে বাস্তবতার পথ ত্যাগ করে অলৌকিকের আভাস দিয়েছেন।

যশোদা কৃষ্ণ সম্বন্ধে বলেছেন,

দামালিয়া যাদু মোর না মানে আপন পর
ভালমন্দ নাহিক গেয়ান।[৪০]

এর মধ্যে আমরা শচীমাতার দুরন্ত পুত্রকেই দেখতে পাই। আবার শাস্তি পেয়ে ক্ষুব্ধ কৃষ্ণ যখন বলছেন,

পরের ছেলে হয়ে পরের মায়ে মা বলিব
উদর পুরিয়ে আমি নবনী খাইব।[৪১]

এবং তিনি যে যশোদার নিজের ছেলে নন সেই কথা উল্লেখ করে আঘাত দেন—

আপনার মা বিনে বেদনা নাহি জানে।

কৃষ্ণ যদি চলে যান তাহলে যশোদার জীবন কেমন হবে ?

নয়নের তারা তুমি তোমারে হারায়ে আমি
গাভী যেন বাছা হারাইল।[৪২]

বাসুদেবের কৃষ্ণ ও যশোদার পশ্চাতে প্রায়ই দেখতে পাই নিমাই ও শচীমাতাকে।

কবির বাৎসল্যরসের পদাবলীগুলিকে মোটামুটি দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এক, নিমাইয়ের বাল্যলীলা ; দুই, গৃহত্যাগী নিমাইয়ের জন্যে শচীর বেদনা। প্রথম পর্যায়ের পদগুলির সঙ্গে কৃষ্ণলীলার কিছু কিছু সাদৃশ্য অবশ্যই আছে। কিন্তু গৌরাঙ্গের সন্ন্যাসমূলক পদগুলি একাধারে বাস্তব ও মৌলিক রচনা। এগুলি কবির উজ্জ্বলতম সৃষ্টি।

বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখে নিমাইয়ের গৃহত্যাগের কথা শুনে শচী—

আউদড়-কেশে ধায় বসন না রহে গায়
শুনিয়া বধূর মুখের কথা ॥[৪৩]

আলুলায়িত কেশে স্খলিত বসনে ছুটে এলেই বা কি হবে ? নিমাই নিরুদ্দেশ। তখন—

গৌরাঙ্গ গিয়াছে ছাড়ি বিষ্ণুপ্রিয়া আছে পড়ি
শচী কাঁদে বাহির দুয়ারে ॥[৪৪]

এই দুটি ছত্রে শূন্য গৃহ এবং দু'টি নারী হৃদয়ের বেদনার্ত শূন্যতা মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে। অথচ কবি এর জন্য উপমা, অনুপ্রাস বা বাগ্‌বিস্তার কিছুই করেননি। সহজ কথায় হৃদয় স্পর্শ করাতেই বাসুদেবের কৃতিত্ব।

সারাদিন তো শচীদেবী নিমাইয়ের কথা ভেবে ভেবে আকুল। রাত্রিতেও ছেলের স্বপ্ন দেখেন। একদিন দেখলেন, নিমাই আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে তাঁকে 'মা' বলে ডাকছেন ; শচী ব্যাকুল হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই নিমাই পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে মা'র গলা জড়িয়ে কাঁদতে লাগলেন।

কিন্তু হায়, এমন মধুর স্বপ্ন ভেঙে গেল।

আইস মোর বাছা বলি হিয়ার মাঝারে তুলি
হেনকালে নিদ্রাভঙ্গ হৈল।
পুন না দেখিয়া তারে পরাণ কেমন করে
কান্দিয়া রজনী পোহাইল ॥[৪৫]

যখন কল্পনার চোখে দেখেন, কৌপীন পরিহিত নিমাই দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করছেন তখন তা শচীদেবীর কাছে অসহ্য হয়ে ওঠে :

এ ডোর কৌপীন পরি কি লাগিয়া দণ্ডধারী
ঘরে ঘরে খাবে ভিক্ষা মাগি।
জীয়ন্তে থাকিতে মায় ইহা নাকি সহা যায়
কার বোলে হইলা বৈরাগী ॥[৪৬]

চৈতন্যদেব অনেকদিন পর নবদ্বীপে ফিরে এসেছেন। শচীর সঙ্গে দেখা হল। মা'র বেদনা অনুভব করে তিনি প্রবোধ দিতে লাগলেন। কিন্তু শচীর বেদনা পুত্রের উপদেশামৃতে দূর হল না :

প্রভু স্বাতিবাণী কহে শচী নির্বচনে রহে
পড়ে জল নয়ন বহিয়া ॥[৪৭]

ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাসু ঘোষের রচনার যে মূল্যায়ন করেছেন তা আমরা সমর্থন করি। তিনি বলেছেন : 'এই পদগুলির বাস্তবতা ও ঐতিহাসিকতা অতিশয় মূল্যবান, অনেক সময় চৈতন্যজীবনীকাব্যের তথ্য অপেক্ষা এগুলি অধিকতর নির্ভরযোগ্য নহে। কিন্তু বাসু ঘোষের সরল রচনাভঙ্গী ও প্রাণের গভীর বেদনার এমন একটা আকর্ষণ আছে যে, ইহার মানবিক রূপটা আমাদের নিকট অধিকতর উপভোগ্য বোধ হয়। শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার অন্তর্বেদনার এমন মর্মস্পর্শী চিত্র অন্য কোথাও মিলিবে না। অথচ এই পদগুলির ভাষায় কিছুমাত্র রং-রূপের ঐশ্বর্য নাই ; অলংকারের উজ্জ্বলতা নাই, নিতান্ত সরল প্রাণের নিরাভরণ-উক্তি আমাদের মন জয় করিয়াছে। তাই মাঝে মাঝে মনে হয়, গভীর কথা গভীর বেদনার মতোই আভরণহীন। বাসু ঘোষের পদগুলি তাহার প্রধান সাক্ষী।"[৪৮]

বলরামদাস

চৈতন্য পরবর্তীকালের বৈষ্ণব পদকর্তাদের মধ্যে বলরামদাস অন্যতম। শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হয় না। কারণ গুণগত উৎকর্ষে তাঁর বেশ কিছু পদ চণ্ডীদাস-জ্ঞানদাস এবং গোবিন্দদাসের পদাবলীর প্রায় সমকক্ষ। ব্রজবুলিতেও তিনি অনেক পদ রচনা করেছেন, কিন্তু এদের অধিকাংশই দ্বিতীয় শ্রেণীর বলা যায়।

ব্রহ্মচারী অমরচৈতন্য বলরামদাস ভণিতাযুক্ত ২৪৩টি পদ সংগ্রহ করে প্রকাশ করেছেন। অনেক ভণিতায় অবশ্য বলরামদাস নামটির কিছু হেরফের আছে। যেমন 'দাস বলরাম', 'বসু বলরাম', 'দাস বলাই' ইত্যাদি। ভণিতার এই একাধিক রূপ জটিলতার সৃষ্টি করেছে। প্রশ্ন উঠেছে, বলরাম দাস ক'জন ? এরূপ জিজ্ঞাসা চণ্ডীদাস সম্বন্ধেও উঠেছে। জগদ্বন্ধু ভদ্র গৌরপদতরঙ্গিণীর ভূমিকায় উনিশজন বলরাম দাসের কথা উল্লেখ করেছেন। ডঃ সুকুমার সেন এই নামের পাঁচজন কবির কথা বলেছেন।[৪৯] ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন, বলরামদাস নামধেয় কবির সংখ্যা বোধ হয় দুই। একজন জাহ্নবাদেবীর শিষ্য ও নিত্যানন্দের সেবক, অন্যজন পরবর্তীকালের—সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে তিনি হয়ত জীবিত ছিলেন। নিত্যানন্দের পরিকর প্রাচীনতর বলরামই বাৎসল্যরসের পদাবলীর রচয়িতা, যাঁর 'বাৎসল্যরসের পদের সমকক্ষ কোন রচনা সমগ্র পদাবলী সাহিত্যে পাওয়া যায় না…।'[৫০] এই কবি কৃষ্ণনগরের নিকটবর্তী তাঁর দোগাছিয়া গ্রামের বাড়িতে বালগোপালের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সুতরাং বালগোপালের উপাসক হিসাবে তাঁর পক্ষে বাৎসল্যরসের পদ রচনা করা

স্বাভাবিক। অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলরামদাসের জন্ম সময় নির্দেশ করেছেন ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পূর্বে; সতীশচন্দ্র রায় 'পদকল্পতরুতে' জন্ম সন উল্লেখ করেছেন আনুমানিক ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দ। কোনো অব্দের সমর্থনেই সুনির্দিষ্ট প্রমাণ নেই।

বৈষ্ণব পদকর্তারা সচরাচর যে সব প্রসঙ্গ নিয়ে লেখেন বলরামদাসও সেই সব বিষয় অবলম্বন করেছেন। চৈতন্য ও নিত্যানন্দের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ রচনা করেছেন; কৃষ্ণলীলার বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে তাঁর অনেকগুলি পদ আছে। পূর্বরাগ, অভিসার, মিলন, বিরহ, রসোদ্গার, বাসকসজ্জা প্রভৃতি কয়েকটি প্রসঙ্গের উপর কিছু পদ আছে যা প্রকৃতই প্রথম শ্রেণীর। কিন্তু নৌকাবিলাস ও দানলীলার পদগুলি বৈচিত্র্যহীন। তাঁর বাৎসল্যভাবের পদগুলিই বিশেষরূপে সমৃদ্ধ।

সাধারণত বলরামদাসের রচনা সহজ, সরল ও মর্মস্পর্শী। কোথাও কোথাও তিনি ছন্দ ও অলংকারের বৈচিত্র্য আনলেও তাঁর রচনাশৈলী মূলত প্রাঞ্জল ও আভরণ-বর্জিত। কিন্তু তাঁর যে ছন্দ ও অলংকার প্রয়োগে দক্ষতা ছিল সে সম্বন্ধে ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন: 'Like Govindadasa Kaviraj, Balaram was a skilled metrician and could write ornamental poetry.'[৫১]

চৈতন্যদেবের প্রশস্তিমূলক নিম্নোদ্ধৃত পদটিতে বাসুদেব ঘোষের মানুষ গৌরাঙ্গের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না। কৃষ্ণের মতো গৌরাঙ্গের ঐশ্বর্যময় রূপই অধিকতর পরিস্ফুট। তাছাড়া কবিকে এখানে মনে হয় সচেতন শিল্পী, স্বতঃস্ফূর্ত আবেগের কিছু অভাব আছে।

তাল রঙ্গে নাচে মোর শচীর দুলাল।
সব অঙ্গে চন্দন দোলয়ে বনমাল॥
বিশাল হৃদয়ে গজমুকুতার হার।
পদতলে তাল উঠে নূপুর ঝঙ্কার॥
ছন্দ বিছন্দে কত জাগে অঙ্গভঙ্গী।
নদীয় নগরে নাই এত বড় রঙ্গী॥[৫২] ইত্যাদি।

অন্যদিকে অন্তঃপুরবাসিনী রাধার গভীর মনোবেদনা এমন করে প্রকাশ করেছেন যা পাঠকের হৃদয় ভাবাবেগে উদ্বেল করে:

দুখিনীর ব্যথিত বন্ধু শুন দুখের কথা।
কাহারে মরম কব কে জানিবে বেথা॥
কান্দিতে না পাই পাপ ননদীর তাপে।
আঁখির লোর দেখি কহে, কান্দে বন্ধুর ভাবে॥
বসনে মুছিয়া ধারা ঢাকি যদি গায়।
আন ছল করি গুরুজনেরে দেখায়॥
কালা নাম লৈতে না দেয় দারুণ শাশুড়ী।
কাল হার কাড়িয়া লয় কাল পাটের শাড়ী॥

দুখের উপরে বন্ধু অধিক আর দুখ।
দেখিতে না পাই বন্ধু তোমার চাঁদ মুখ॥
দেখা দিয়া যাইতে বন্ধু কিবা ধন লাগে।
না যায় নির্লজ্জ প্রাণ দাঁড়াই তোমার আগে॥[৫৩] ইত্যাদি।

কৃষ্ণ নিকটে নেই, রাধা তাঁর মধুর স্মৃতির দংশন-জ্বালায় কাতর। কৃষ্ণবিহীন গৃহে বাস করতে মনে হয় কে যেন শেল বিঁধছে তাঁর মনে।

এ ঘরে বসতি মোর লাগে যেন শলি।
ঝুরিয়া ঝুরিয়া কাঁদে পরাণ পুতলি॥
যতেক পিরিতি পিয়া করিয়াছে মোরে।
আখরে আখরে লেখা হিয়ার ভিতরে॥
হাসিয়া পাঁজর-কাটা যে বল্যাছে বাণী।
সোঙারিতে চিতে উঠে আগুনের খনি॥
নিরবধি বুকে থুঞা চাহি চোখে চোখে।
এ বড় দারুণ শেল ফুটি রৈল বুকে॥[৫৪]

রাধাকে পেয়েও কৃষ্ণ শংকিত— কখন আবার তাঁকে হারাতে হয়:

হিয়ার ভিতর থুইতে নহে পরতীত।
হারাই হারাই হেন সদা করে চিত॥

বিশ্বের সকল প্রেমিকের অন্তরের ব্যাকুলতা কবি কৃষ্ণের উক্তির মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেছেন।

রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক বহু পদেই বলরামদাসের কবি-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যাবে। বাৎসল্যরস আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয়; সুতরাং অন্য প্রসঙ্গের পদাবলী নিয়ে বিস্তৃত পর্যালোচনার অবকাশ নেই।

বাসুদেব ঘোষ বাৎসল্যরসের পদ রচনা করেছেন চৈতন্যের বাল্যলীলা অবলম্বনে। বলরাম বৈষ্ণবীয় ধারানুযায়ী কৃষ্ণের বাল্যলীলাকেই বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

যশোদা সূতিকা গৃহে প্রথম যখন কৃষ্ণকে দেখতে পেলেন তখনও তিনি প্রকৃত ব্যাপার কি জানেন না। কৃষ্ণ তাঁর নিজের ছেলে মনে করে আনন্দে আত্মহারা হলেন। সবাইকে ডেকে ডেকে ছেলেকে দেখাচ্ছেন তিনি:

দেখসিয়া পুত্রের বদন।
নীল বরণ শশী উদয় করিল আসি
দেখি কর সফল জীবন।[৫৫]

'নীল বরণ শশী' পাঠকের মনে এক চমৎকার ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে।

বলরামদাসের বাৎসল্যের পদগুলি অধিকাংশই গোষ্ঠলীলা-সংক্রান্ত। ছেলেকে গোষ্ঠে পাঠিয়ে যশোদার নানা আশঙ্কা। যদি কোনো বিপদ-আপদ ঘটে! সন্তানের মঙ্গলকামনায় মায়ের মন সর্বদা যে ব্যাকুলতায় আলোড়িত হয় তারই সুন্দর ছবি এঁকেছেন বলরামদাস। গোষ্ঠলীলা ছাড়া কয়েকটি পদে ঘরোয়া ছবি পাওয়া যায়।

বাল্যলীলার একটি পদে আছে, সকালে ঘুম থেকে উঠে যশোদা দধি মন্থন করছেন। এদিকে কৃষ্ণ জেগে উঠে পালঙ্কের উপর বসেই মাকে ডেকে বলছেন, আমার খিধে পেয়েছে, কিছু খেতে দাও। তারপরেই—

মা মা বলিয়া তবে বাহিরে আইলা।
কি খাব বলিয়া কৃষ্ণ কাঁদিতে লাগিলা॥
দেহ দেহ ননী দেহ বলে বারম্বার।
ক্ষুধায় ব্যাকুল প্রাণ হইল আমার॥[৫৬]

আজও নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারে এমন ছবি বিরল নয়। কৃষ্ণ যশোদার উপর অভিমান করে লুকিয়ে আছেন। যশোদা তাকে খুঁজে না পেয়ে গোপ-বালকদের জিজ্ঞাসা করছেন। তোমরা দেখেছ তাকে? আর আক্ষেপ করছেন:

গোপাল না লৈনু কোলে ভুলিনু রোহিণী বোলে
সে কোপে কুপিত যাদুমণি।
কোপিত নয়ন কোণে চাইয়াছিল আমা পানে
আমি কি এমন হবে জানি।[৫৭]

শ্রীকৃষ্ণের যে সব লীলার কথা ভাগবতের দশম স্কন্ধের নবম অধ্যায়ে বিবৃত হয়েছে তার কোন কোনটি অবলম্বন করে বলরামদাস পদ রচনা করেছেন। কিন্তু সর্বত্র হুবহু অনুকরণ নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ ননী চুরির অপরাধে কৃষ্ণকে বাঁধবার সুপরিচিত ঘটনাটি উল্লেখ করা যেতে পারে। ভাগবতে আছে, কৃষ্ণ তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার সাহায্যে বন্ধন মুক্ত হলেন এবং প্রমাণ করলেন তিনি সাধারণ বালক নন, দেবাদিদেব ভগবান কৃষ্ণ।[৫৮] কৃষ্ণের দেবত্ব প্রমাণ করেই ভাগবতকার তুষ্ট; কিন্তু বলরামদাস এই ঘটনার সমাপ্তি দেখিয়েছেন অন্যভাবে। কৃষ্ণের অলৌকিকত্বের পরিবর্তে তিনি এক মানবিক চিত্র দিয়েছেন, যাকে মনে হয় বাস্তব এবং পরিচিত। কৃষ্ণ নন্দের নিকট কাঁদতে কাঁদতে বললেন:

না থাকিব তোমার ঘরে অপযশ দেহ মোরে
মা হইয়া বলে ননি-চোরা॥
ধরিয়া যুগল করে বাঁধিয়া ছান্দন-ডোরে
বাঁধে রাণী নবনী লাগিয়া।
আহীরী রমণী হাসে দাঁড়াইয়া চারি পাশে
হয় নয় দেখ সুধাইয়া॥
অন্যের ছাওয়াল যত তারা ননি খায় কত
মা হইয়া কেবা বান্ধে করে।
যে বল সে বল মোরে না থাকিব তোর ঘরে
এ না দুঃখ সহিতে না পারে॥[৫৯]

কৃষ্ণকে শান্ত করবার জন্য—

যশোদা আসিয়া কাছে গোপালের মুখ মুছে
অপরাধ ক্ষমা কর মোরে॥[৬০]

গোষ্ঠলীলার পদাবলীতে পুত্রের কল্যাণ ভাবনায় যশোদার উৎকণ্ঠা প্রাধান্য লাভ করেছে। ভাগবতের যশোদা কৃষ্ণের অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে সচেতন। বলরামদাসের যশোদা কৃষ্ণের দেবত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। তাই যশোদা আমাদেরই ঘরের মাতৃমূর্তি এবং কৃষ্ণ সাধারণ মানব-শিশু মাত্র।

কৃষ্ণ গোষ্ঠে যাবেন। যশোদার মনে নানা ভাবনা। তাই যাবার আগে—

হের আরে বলরাম হাত দে মায়ের মাথে
দেহ রাখিয়া প্রাণ দিলাম তোমার হাতে॥

যশোদার ভয়—

দণ্ডে দশবার খায় তার নাহি লেখা।
নবনী লোভিত গোপাল পাছে আইসে একা॥[৬১]

ক্ষুধায় কাতর হলে ননী খাবার লোভে যদি একা বাড়ী আসে তবে পথে নানা বিপদ ঘটতে পারে। সুতরাং বলরাম, তুমি লক্ষ্য রেখ।

যশোদা বলরামকে তাঁর দুর্ভাবনার কথা বলছেন :

বলরাম তুমি মোর গোপাল লৈয়া যাইছ।
যারে ঘুমে চিয়াইযে দুগ্ধ পিয়াইতে নারি।
তারে তুমি গোঠে সাজাইছ॥
কত জম্ম ভাগ্য করি আরাধিয়া হর-গৌরী
পাইলাম এ দুখ পসরা।
কেমনে ধৈরজ ধরে মায়ে কি বলিতে পারে
বনে যাও এ দুগ্ধ কোঙরা॥
বসন ধরিয়া হাতে ফিরে গোপাল সাথে সাথে
দণ্ডে দণ্ডে দশবার খায়।
এ হেন দুধের বাছা বনেতে বিদায় দিয়া
কেমনে ধরিবে প্রাণ মায়॥[৬২]

ছেলেকে এত ভালোবাসেন বলেই তাকে ঘিরে এত বেদনা, এত উৎকণ্ঠা। তাই কৃষ্ণ যশোদার কাছে শুধু আনন্দের নন, "দুঃখেরও পসরা"। "বসন ধরিয়া হাতে, ফিরে গোপাল সাথে সাথে" মা ও সন্তানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের এক অপরূপ ঘরোয়া ছবি।

শুধু বলরামের উপর কৃষ্ণের দায়িত্ব দিয়ে যশোদা নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না। তিনি অন্য সঙ্গীদেরও ডেকে বলছেন :

শ্রীদাম সুদাম দাম শুন ওরে বলরাম
মিনতি করিয়ে তো সভারে।
বন কত অতি দূর নব তৃণ কুশাঙ্কুর
গোপাল লইয়া না যাইহ দূরে॥

সখাগণ আগে পাছে গোপাল করিয়া মাঝে
ধীরে ধীরে করিহ গমন।
নব তৃণাঙ্কুর আগে রাঙ্গা পায় জানি লাগে
প্রবোধ না মানে মোর মন॥

গোষ্ঠে যাবার আগে যশোদা বলে দিলেন ঃ

নিকটে গোধন রাখা মা বল্যা শিঙ্গায় ডাকা
ঘরে থাকি শুনি যেন রব॥[৬৩]

শিঙ্গার মধ্য দিয়ে 'মা' ডাক শুনতে পেলে নিশ্চিন্ত হবেন যশোদা॥

পদাবলী সাহিত্যে প্রতিবাৎসল্যের চিত্র খুব কমই পাওয়া যায়। যশোদাই কৃষ্ণকে ভালোবাসেন, কৃষ্ণের তাঁর প্রতি আকর্ষণের দৃষ্টান্ত বিরল। বলরামদাসের কৃষ্ণ আমাদেরই ঘরের বালক, তাই যশোদার প্রতি তাঁর ভালোবাসার প্রকাশ স্বাভাবিক। তাই গোষ্ঠ থেকে বাড়ী ফিরতে বিলম্ব হওয়ায় কৃষ্ণ সখাদের বলছেন ঃ

আজি মাঠে আমাদের বিলম্ব দেখিয়া।
হেন বুঝি কান্দে মায় পথ পানে চাইয়া॥
বেলি অবসান হৈল চল যাই ঘরে।
মায়ে না দেখিয়া প্রাণ কেমন জানি করে॥[৬৪]

বিলম্ব করে কৃষ্ণ যখন বাড়ী ফিরে এলেন তখন—

রতন প্রদীপ লৈয়া আইলা নন্দরাণী।
একদিকে দেখে রাঙ্গা চরণ দুখানি॥
নেতের আঁচলে রাণী মোছে হাত পা।
তোমার মুখের নিছনি লৈয়া মরি যাউক মা॥[৬৫]

প্রদীপের আলোয় যশোদা খুঁটিয়ে দেখেন কৃষ্ণের কোমল দু'টি পায়ে বনের কাঁটা ফুটেছে কিনা। তারপর আঁচলে মুখ মুছিয়ে "চুম্ব দেয় মুখ-সুধাকরে।" তারপর—

ক্ষীর ননী ছেনা সর আনিয়া সে থরে থর
আগে দেই রামের বদনে।
পাছে কানাইয়ের মুখে দেয় রাণী মন সুখে
নিরখয়ে চাঁদমুখ পানে॥[৬৬]

বলরাম দাসের কৃষ্ণ ঐশী শক্তির আবরণ থেকে মুক্ত। এর ফলে যশোদার বাৎসল্যও একান্ত স্বাভাবিক মনে হয়। কৃষ্ণকে মাতৃস্নেহ লোভাতুর চিরপরিচিত বালক হিসাবে সার্থক চিত্রণেই কবির কৃতিত্ব।

জ্ঞানদাস

ষোড়শ শতকের তিনজন প্রধান বৈষ্ণব কবি— বৃন্দাবনদাস, বলরামদাস জ্ঞানদাস ছিলেন নিত্যানন্দ অথবা তাঁর পত্নী জাহ্নবী দেবীর শিষ্য। বৃন্দাবনদাস

চৈতন্যের জীবনীকাব্য চৈতন্য ভাগবত রচনা করে ভক্ত কবি হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। বলরামদাস ও জ্ঞানদাস কৃষ্ণলীলা বর্ণনার কবি। বলরামদাস বাৎসল্যরসের উৎকৃষ্ট পদ রচনা করেছেন ; জ্ঞানদাস কৃতিত্ব দেখিয়েছেন মধুর রসের পদাবলীতে।

জ্ঞানদাসের জীবন সম্বন্ধে সামান্য তথ্যই পাওয়া যায়। চৈতন্যচরিতামৃতে[৬৭] এবং নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নাকর'[৬৮] ও নরোত্তমবিলাসে[৬৯] জ্ঞানদাসের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সব উল্লেখ থেকে জানা যায় যে কবির জন্মস্থান ছিল বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কাঁদরা গ্রামে। সেখানে এখনও জ্ঞানদাস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মঠ বর্তমান। সুতরাং জন্মস্থান নিয়ে মতদ্বৈত নেই।

সমস্যা তাঁর আবির্ভাবের কাল নিয়ে। নরহরি চক্রবর্তীর উল্লেখ থেকে জানা যায় জ্ঞানদাস খেতরী ও কাটোয়ার বৈষ্ণব সমাবেশে যোগ দিয়েছিলেন এবং জাহ্নবী দেবীর সঙ্গে তীর্থ করতে বৃন্দাবন গিয়েছিলেন। নিত্যানন্দ সম্পর্কে যে তিনটি পদ তিনি রচনা করেছেন তাদের বিশ্লেষণ করে পণ্ডিতরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে কবি নিত্যানন্দকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এই সব তথ্য থেকে ধারণা করা যেতে পারে যে ১৫২০ থেকে ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দ কালখণ্ডের মধ্যে জ্ঞানদাস জীবিত ছিলেন। ডঃ সুকুমার সেনের মতে জ্ঞানদাসের জন্ম হয়েছিল আনুমানিক ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে।[৭০] ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের অভিমতও তাই।[৭১]

জ্ঞানদাস বাংলা এবং ব্রজবুলি এই উভয় ভাষাতেই পদ রচনা করেছেন। ব্রজবুলিতে রচিত পদের সংখ্যা শতাধিক। স্বভাবতঃই ব্রজবুলি অপেক্ষা বাংলা পদে জ্ঞানদাসের প্রতিভার পরিচয় অনেক বেশী স্পষ্ট। ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন ঃ "With the exception of Govindadasa Kaviraja, Jnanadasa was the most careful writer of Brajabuli though there are a few poems where Brajabuli is greatly mixed up with Bengali."[৭২]

ব্রজবুলিতে পদ রচনায় দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় নিম্নলিখিত পদটিতে ঃ

লহু লহু মুচকি হাসি চলি আওলি
পুন পুন হের সি ফেরি।
জনু রতিপতি সঙ্গে মিলন রঙ্গভূমে
ঐছন কয়ল পুছেরি ॥[৭৩]

কাব্য রচনার প্রথম পর্বে জ্ঞানদাস বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও বসু রামানন্দের পদাবলীর দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। বিদ্যাপতির প্রভাব বিশেষ করে লক্ষ্য করা যায় তাঁর ব্রজবুলিতে রচিত পদাবলীতে। পরবর্তীকালে এই প্রভাব দূর হয়ে কবির নিজস্ব কাব্যপ্রতিভা প্রস্ফুটিত হলেও চণ্ডীদাসের রচনারীতির প্রভাব থেকে জ্ঞানদাস কখনও সম্পূর্ণ মুক্তি পাননি। চণ্ডীদাসের মতো তিনিও সহজ কথায় হৃদয়ের গভীরতম অনুভূতি প্রকাশ করেছেন। সরল গ্রাম্য ভাষাতেও মিলনের ব্যাকুলতা কেমন মর্মস্পর্শী হয়ে ফুটে উঠেছে "দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা" চরণটিতে। জ্ঞানদাসের রচনা থেকে এমনি অসংখ্য পদ বা পদাংশ উদ্ধার করা যেতে পারে।

জ্ঞানদাসের পদাবলীর ঐশ্বর্য পর্যালোচনা করতে গেলে যে বৈশিষ্ট্য প্রথমেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হল বিষয়-বৈচিত্র্য। তিনি কৃষ্ণ ও রাধার বাল্যলীলা, যশোদার বাৎসল্য, পূর্বরাগ, আক্ষেপানুরাগ, বাসকসজ্জা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, দান, নৌকাবিলাস প্রভৃতি বিষয়বস্তু অবলম্বন করে হৃদয়ের বিচিত্র অনুভূতি শতদল পুষ্পের মতো প্রকাশ করেছেন। এছাড়া কয়েকটি পদে তিনি চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দ প্রভুর প্রতি অন্তরের ভক্তি অর্ঘ নিবেদন করেছেন। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বলেছেন: "পূর্বরাগের পদে শ্রীচৈতন্য-পরবর্তী কবিগণের মধ্যে জ্ঞানদাস সর্বশ্রেষ্ঠ, একথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।"[৭৪]

একথা স্বীকার করেও বলা যায় যে, রাধাকৃষ্ণলীলার অন্যান্য বিভাগেও জ্ঞানদাসের উৎকৃষ্ট পদ পাওয়া যাবে। ভাষার সংযম, ছন্দের লালিত্য, ভাবের গভীরতা, অনুভূতির প্রাখর্য এবং রসের স্নিগ্ধ মাধুর্য জ্ঞানদাসের প্রথম শ্রেণীর পদগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য। জ্ঞানদাস রাধাকে নতুন রূপে উপস্থিত করেছেন। তাঁর পূর্ববর্তী কবিদের, বিশেষ করে চণ্ডীদাসের রাধা কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারা, তিনি আত্মবিস্মৃত হয়ে কৃষ্ণের জন্য যোগিনী। কিন্তু জ্ঞানদাসের রাধা প্রেমিকা হয়েও আত্মহারা নন। কৃষ্ণের জীবনে যে তাঁর বিশেষ ভূমিকা আছে সে সম্বন্ধে তিনি সচেতন। তিনি জানেন, কৃষ্ণেরও তাঁকে প্রয়োজন। কৃষ্ণের প্রেম এবং ব্যক্তিত্বের স্বরূপ উপলব্ধি করবার জন্য জ্ঞানদাসের রাধিকা উৎসুক। তাই তিনি কৃষ্ণের বেশ ধারণ করে দেখতে চান—

তোমার পীতধটি আমারে দেহ পরি।
উভ করি বাঁধ চূড়া আউলাইয়া কবরি।[৭৫]

এই কারণেই জ্ঞানদাসের রাধা বাঁশী বাজাবার কৌশল আয়ত্ত করতে চান। যে বাঁশীর আহ্বান তাঁকে উন্মাদ করে, সমাজ সংসার কুল মান সবকিছু ভুলিয়ে দেয়, তার মধ্যে কি জাদু আছে বুঝতে হবে। কৃষ্ণ বাঁশী শেখাতে শেখাতে এমন অবস্থা হল যখন—

এক রন্ধ্রে ফুঁক তবে দেয় রাধা কানু।
রাধাশ্যাম দুটি নাম বাজে ভিনু ভিনু ॥[৭৬]

জ্ঞানদাসের এই বংশী শিক্ষার পরিকল্পনাটি পদাবলী সাহিত্যে অভিনব।

জ্ঞানদাসের রাধা প্রগলভাও। কৃষ্ণপ্রেমে গরবিনী রাধা তাঁর সৌভাগ্যের কথা সখীদের নিকট বিস্তারিত করে বলতে ভালবাসেন। কৃষ্ণকে আকৃষ্ট করবার জন্য চতুরতার আশ্রয় নিতেও তাঁর দ্বিধা নেই—

ছলে দরশায়ল উরজক ওর
আপনি নেহারি হেরল মোহে থোর ॥[৭৭]

জ্ঞানদাস বাৎসল্যরসের পদও রচনা করেছিলেন সে কথা পূর্বে বলা হয়েছে। "যশোদার বাৎসল্যলীলা" নামক একটি পুঁথি আবিষ্কৃত হবার পর এই শ্রেণীর পদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় সমালোচকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। সুকুমার সেন এই

পুঁথির[৭৮] কুড়িটি পদ সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন ঃ "অত্যন্ত বর্ণহীন।"[৭৯] বাৎসল্যরসের পদগুলিতে ভাব ও ভাষার এমন দৈন্য দেখা যায় যে লীলারসের কবি জ্ঞানদাসকে এদের রচনাকার বলে চিহ্নিত করা কঠিন। কেহ কেহ বলেন হয়ত জ্ঞানদাস নামধারী অন্য কোন কবি এই সব পদের রচয়িতা। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সংশয় সত্ত্বেও "যশোদার বাৎসল্যলীলা" এবং গোষ্ঠলীলার কয়েকটি পদ তাঁর সম্পাদিত জ্ঞানদাসের পদাবলীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[৮০]

ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাৎসল্যরসের পদগুলিতে সাহিত্যগুণের অভাবের জন্য জ্ঞানদাস এদের রচয়িতা বলে স্বীকার করেননি। বিশেষ করে 'যশোদার বাৎসল্যলীলা' পুঁথির অন্তর্গত পদে যে ভণিতা পাওয়া যায় তাতে সংশয় বৃদ্ধি পায়। তিনি দেখিয়েছেন যে, 'জ্ঞানদাস কন' এরূপ ভণিতা কবি নিজে ব্যবহার করতে পারেন না। কারণ 'কন' সম্মানবাচক ; কবির নিজেকে এরূপে সম্মানিত করা রীতিবিরুদ্ধ। সুতবাং 'যশোদাব বাৎসল্যলীলা' অন্য কোন কবির রচনা ; তিনি প্রসিদ্ধ অগ্রজ কবির নাম যুক্ত করে নিজের রচনাকে রসিক সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে আগ্রহী ছিলেন। বাৎসল্যরসেব পদাবলী আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয়। এইজন্য সাহিত্যগুণের স্বল্পতা সত্ত্বেও জ্ঞানদাসেব এই শ্রেণীব পদ নিয়ে একটু আলোচনার প্রয়োজন আছে। অনেকে এগুলি জ্ঞানদাসের রচিত নয় সিদ্ধান্ত করলেও কয়েকটি কারণে এঁদের আলোচনার যোগ্য বলে মনে হয় .

১। দ্বিতীয় জ্ঞানদাসের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এখন পর্যন্ত কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

২। বাৎসল্যরসের পদগুলি হয়ত জ্ঞানদাসের শিক্ষানবিশী যুগের রচনা, তাই কাব্যগুণে সমৃদ্ধ নয়।

৩। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ভণিতার যুক্তি দেখিয়ে জ্ঞানদাসের রচনা নয় বলে যে সিদ্ধান্ত করেছেন তা 'যশোদার বাৎসল্যলীলা' সম্বন্ধে প্রযোজ্য হলেও গোষ্ঠলীলার সমান বর্ণহীন পদগুলি সম্বন্ধে নয়। সে সব পদে 'জ্ঞানদাস কহে' 'জ্ঞানদাসেতে বলে' প্রভৃতি প্রচলিত ধরনের ভণিতাই আছে।

যশোদার বাৎসল্যলীলা পালাপুঁথিতে কিন্তু সর্বত্র 'জ্ঞানদাস কন' ভণিতা নেই। ২, ১৫-১৮ সংখ্যক পদে 'জ্ঞানদাস বলে বা কহে' ইত্যাদি স্বাভাবিক ভণিতাই আছে।

সুতরাং একমাত্র ভণিতাব যুক্তিতে এই পদগুলিকে অগ্রাহ্য করা চলে না।

৪। যশোদাব বাৎসল্যলীলা হয়ত কোন বৃহৎ পালাগানের অংশ, তাই বিচ্ছিন্ন পদের গুণগুলি প্রস্ফুটিত হয়নি এবং কবি নিজেও তার জন্য সচেষ্ট ছিলেন না। পালাগানে কাহিনী প্রাধান্য লাভ করে সঙ্গীতের সহায়তায়, —কখনও বা অভিনয় যুক্ত হয়ে। তাছাড়া বর্ণনাত্মক পালাগানে কাব্যগুণ প্রকাশের সুযোগও সীমিত। জ্ঞানদাসের নৌকাখণ্ডের পদগুলিও কাব্যগুণে উৎকৃষ্ট নয়।

কবি সহজ মানবিক বাৎসল্যরসের অনুভূতিকে প্রায়ই কৃষ্ণের দেবত্ব এবং ঐশ্বর্যের রূপ এনে ক্ষুন্ন করেছেন। একদিন প্রভাতে যশোদা কৃষ্ণকে কোলে করে ননী তৈরীর

জন্য দুগ্ধ মন্থন আরম্ভ করেছেন, তখন—

হেনকালে ধরে কৃষ্ণ মন্থনের ডারি।
নুনী দে মা বল্যা কর পাতএ মুরারি।
জঞ্জাল না কর গোপাল খেল গিঞা নাছে।
হাণ্ডির ভিতরে এক কানা লাগা আছে॥
অসাধনে পানু্য তোমা মরি বালাই লঞা।
হাসিতে মিলায় শশী চাঁদ মুখ দিঞা॥[৮১]

কিন্তু এর পরেই কৃষ্ণের গিরিগোবর্ধন ধারণ এবং দেব দেবীদের কথা উত্থাপন করায় স্বাভাবিক বাৎসল্যের সুরটুকু হারিয়ে যায়।

পরবর্তী পদটি বাৎসল্যের সুন্দর পরিবেশ দিয়ে কবি আরম্ভ করেছেন। যশোদা পুত্রকে বাড়ীর বাইরে পাঠাতে অনিচ্ছুক। এখনও কৃষ্ণ শিশু, বড় হলে তাঁকে গোরু চবাতে পাঠাবেন। ব্রজপুরীর যত গোয়ালিনী আছে তারা কৃষ্ণের মতো রত্ন পেলে গলাব "হার করে" নিয়ে যাবে। সুতরাং যশোদা পুত্রকে ভূতের ভয় দেখাচ্ছেন—

গোকুলের মাঝে এক হৈল্য মহাভয়।
আস্যাছে দারুণ হাঁউ লোকে জনে কয়॥
কৃষ্ণ কহে একথা শুনিলে কার ঠাঁঞি।
হাঁউ কেমন মা যশোদা আমি দেখি নাঞি॥
অবোধ ছাওয়াল মোর কি পুছিস মোকে।
বলবান হাঁউ এক ঝাউবনে থাকে॥[৮২]

গ্রাম্য রমণী সন্তানকে ভয় দেখিয়ে নিবৃত্ত করবার যে কৌশল অবলম্বন করে যশোদা ঠিক সেই পথ অবলম্বন করেছেন। এই পরিচিত চিত্রটিকে "বর্ণহীন" বলে বাতিল করা যায় না। কিন্তু এই সহজ সুন্দর সুরটি অকস্মাৎ ছিন্ন হয়ে যায় যখন শিশু কৃষ্ণ গর্ব করে বলেন, তিনি দেত্য নিধন করেছেন; দৈত্যদের তুলনায় হাঁউ আর কী। বাৎসল্যরসের পদ লিখতে বসেও কবি ভুলতে পারেন না কৃষ্ণের ঐশ্বর্যের রূপ। তাই হৃদয় স্পর্শ করবার মতো বাৎসল্যরসের একটি স্নিগ্ধ পরিমণ্ডল সৃষ্টি হওয়া মাত্র কৃষ্ণেব ঐশ্বর্যরূপ তাকে আচ্ছন্ন করে যেলে। মনে হয় কবি কৃষ্ণকে ভক্ত হিসাবে ভজন করতে অভ্যস্ত, তাঁকে বাৎসল্যের আবেগে একান্ত আপনার করে নিতে পারেন না।

সর্বত্রই কৃষ্ণের ঐশী ক্ষমতা বাৎসল্যরসকে ব্যাহত করেছে দেখা যায়। যশোদা বললেন, "না নাচিলে মোর ঠাঁঞি না পাবে নবনী।"[৮৩] কিন্তু কৃষ্ণ বলছেন, আমি ক্ষুধায় কাতর, নাচতে পারব না। তুমি যদি না দাও ব্রজবাসীদের ঘরে ঘরে যাব, মা বলে ডাকব বাড়ীর মেয়েদের, তাহলে আমার ননীর অভাব থাকবে না। যশোদা ঈর্ষায় "মূর্ছিত" হয়ে তৎক্ষণাৎ ঘরে যত ননী ছিল এনে দিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ তো সাধারণ শিশু নন; ঘরের সব ননী খেয়েও তাঁর ক্ষুধা মেটে না দেখে যশোদা অন্য বাড়ী থেকে ননী চেয়ে আনতে গেলেন। কিন্তু কৃষ্ণের মায়ায় কোথাও এক বিন্দু ননী পাওয়া গেল না। শূন্য হাতে বাড়ী ফিরে যশোদা দেখলেন, কৃষ্ণ বাড়ী নেই। যশোদা উন্মাদিনী,

উম্মাদনার মধ্যেও আছে ঈর্ষা, —এখন না জানি কৃষ্ণ কোন রমণীকে মা বলে ডাকছেন। সাত সংখ্যক পদটিতে পুত্রের জন্য যশোদার আর্তি অনেকটা স্বাভাবিক। এখানে কৃষ্ণ অনুপস্থিত বলে ঐশ্বর্যের চিত্র হৃদয়ের অনুভূতিকে পশ্চাৎপটে ঠেলে দিতে পারে নি।

বলরাম যশোদাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, আমি কৃষ্ণকে ফিরিয়ে আনব, তুমি অস্থির হয়ো না। বলরামের উদ্যোগে কৃষ্ণ বাড়ী ফিরে এলেন। কিন্তু আসবার পূর্বে কৃষ্ণ দেখালেন তাঁর ঐশী ক্ষমতার অনেক প্রমাণ। এই প্রসঙ্গে ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন, "বলরামের ভয়ে কৃষ্ণের যমুনা জল মধ্যে পাষাণ রূপ প্রাপ্তি— এই আখ্যান প্রচলিত পদাবলী বা শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্যে পাই নাই।'[৮৪] আঠারো সংখ্যক পদে অবশ্য ঐশ্বর্যের কোন লীলা নেই, সেখানে কবি এঁকেছেন যশোদার সঙ্গে কৃষ্ণের মিলনের ছবি। যশোদার অভিমানক্ষুব্ধ অভিযোগ— "কেমনে পরের মাকে মা বলিলে তুমি।" অন্যকে মা বলে ডাকলেও সে আমার মতো তোমাকে যত্ন করেনি, তাই "মলিন হয়েছে কেন চাঁদ মুখখানি॥"[৮৫]

যশোদার বাৎসল্যলীলায় বলরামকে যেরূপ প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে অন্য কোন কবির রচনায় তা পাওয়া যায় না। পালার ১০-১৭ পদে কৃষ্ণের সন্ধানরত বলরামের চরিত্রের খানিকটা পরিচয় পাওয়া যায়। বলরামকে প্রাধান্য দেওয়া জ্ঞানদাসের বাৎসল্যরসের পদাবলীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

এই পালার বাইরেও জ্ঞানদাস কয়েকটি বাৎসল্যরসের পদ রচনা করেছেন। সর্বাপেক্ষা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পদ রাধার প্রতি বাৎসল্যের প্রকাশ। রাধার চিরন্তনী প্রিয়ার রূপ বৈষ্ণব কবিদের আকৃষ্ট করেছে, কোনো কবি তাঁর জন্ম বা বাল্যলীলার কথা ভাবেননি। জ্ঞানদাস রাধার সেই উপেক্ষিত বাল্যলীলার কথা বলেছেন। তাঁর জন্মের পর প্রতিবেশিনীরা রাধার মা কীর্তিকাকে বলছে—

ও তোর বালিকা চান্দের কলিকা
দেখিয়া জুড়ায় আঁখি।
হেন মনে লয়ে সদাই হৃদয়ে
পসরা করিয়া রাখি॥[৮৬]

জ্ঞানদাস মায়ের হৃদয়ের গোপন বেদনার কথাও অনুভব করেছেন। মেয়ে যত সুন্দরী ও সুলক্ষণাই হোক, পুত্র সন্তানই অধিক কাম্য। তাই মেয়ে কোলে এলে মা একটু দুঃখিত হয়। কীর্তিকাকে প্রবোধ দিয়ে তাঁর বান্ধবীরা বলছেন, "দুহিতা বলিয়া দুখ না ভাবিহ।"[৮৭] দুঃখ করতে নিষেধ করা হল কেন? কারণ, এই কন্যা মহাপুরুষের প্রেয়সী হবে এবং বংশ উদ্ধার করবে। সেই ঐশ্বর্যভাবের পুনরুক্তি। বাঙালী মায়ের মনের বেদনাকে যথার্থ রূপে ব্যবহার করতে না পারায় কবি এক মৌলিক অনুভূতি সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যশোদার পালায় যেমন, এখানেও তেমনি ঐশ্বর্যবোধ বাৎসল্যরস ঘনীভূত হবার পরিপন্থী হয়েছে।

অন্যত্র কিছুক্ষণের জন্য রাধা অনুপস্থিত থেকে বাড়ী প্রত্যাবর্তন করবার পর কীর্তিকার মাতৃহৃদয়ের ব্যাকুলতা প্রকাশ করে জ্ঞানদাস বলেছেন—

প্রাণ নন্দিনী   রাধা বিনোদিনী
কোথাগিয়াছিলা তুমি।
এ গোপ-নগরে   প্রতি ঘরে ঘরে
খুঁজিয়া ব্যাকুল আমি ॥
বিহান হইতে   কাহার বাটীতে
কোথা গিয়াছিলা বল।
এ ক্ষীর মোদক   চিনি কদলক
কে তোর আঁচরে দিল ॥[৮৮]

এখানে অবশ্য ঐশ্বর্যবোধ মাতৃস্নেহের প্রকাশকে ক্ষুণ্ন করেনি।

মা'র প্রশ্নের উত্তরে রাধিকা জানালেন, যশোদা তাঁকে বাড়ী ডেকে নিয়ে কৃষ্ণের বাম পাশে বসিয়ে—

এক পিঠে রহি   তাঁহার আমার
রূপ নিরীক্ষণ করে ॥[৮৯]

এখানে যশোদার রাধার প্রতি বাৎসল্যের পরিচয় পাওয়া যায় এবং রাধা-কৃষ্ণ দু'জনকে পাশাপাশি বসিয়ে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকার মধ্যে হয়ত একটি গোপন কামনার প্রতি ইঙ্গিতও আছে। হয়ত এই ইঙ্গিতের আভাস কীর্তিকার মনেও কবি দেখতে পান—

ঝিয়ের কাহিনী   শুনি গোয়ালিনী
মুচকি মুচকি হাসে।[৯০]

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত জ্ঞানদাসের পদাবলীতে সাতটি গোষ্ঠলীলার পদ সংকলিত হয়েছে। বাৎসল্যরস এবং সখ্যরসের সামান্য পরিচয়ই এই পদগুলিতে পাওয়া যায়। শ্রীদাম ও অন্যান্য বন্ধুরা গোষ্ঠে যাবার জন্য কৃষ্ণকে ডাকতে এসে যশোদা তাঁকে পাঠাতে চান না। শিশুপুত্রকে দূরে যেতে দিতে মা'র মনে নানা আশংকা। তাই—

রাণী বলে কি বলিলি   না পাঠাইব বনমালী
তোমরা সবাই যাও বনে।
বড় হইলে লালনে   লইয়ে যেও কাননে
পাঠাইব তোমা সভা সনে ॥[৯১]

গোষ্ঠলীলার কয়েকটি পদেও জ্ঞানদাস বলরামকে এনেছেন। কৃষ্ণের জন্য তাঁর স্নেহের প্রকাশও আছে— "না দেখিয়া ঘনশ্যাম প্রেমে ছল ছল দু' নয়ন।"

শেষ করবার পূর্বে একটি কথা বিশেষরূপে উল্লেখ করতে হয়। কৃষ্ণের জন্য দেবকীর স্নেহের প্রকাশের সুযোগ নেই বললেই চলে। জন্মের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কৃষ্ণকে মা'র কাছ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়। তাই বৈষ্ণব পদকর্তারা দেবকীর বাৎসল্যের কথা বলেন নি। জ্ঞানদাস দেবকীর বাৎসল্যের কথা বলেছেন—

দেবকীরে বসুদেব কহয়ে বচন।

'দাও পুত্র' শুনি দেবী ভাসে দু'নয়ন ॥
দেবকী বলয়ে আগে প্রাণ ছাড়ি।
যাউক প্রাণ তবু পুত্র দিতে আমি নারি ॥

অনেক বোঝাবার পর দেবকী কৃষ্ণকে বসুদেবের কোলে তুলে দিলেন।

জ্ঞানদাস মূলত রাধা-কৃষ্ণ লীলার কবি। পূর্বরাগ, মিলন, বিরহ, রসোদ্গার প্রভৃতি পর্যায়ের পদেই তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ। মধুর রসই কবির নিকট শ্রেষ্ঠ রস; গোষ্ঠ বা বাৎসল্যলীলার অল্প কয়েকটি পদ তিনি রচনা করেছেন প্রথানুসারে, অন্তরের তাগিদে নয়। তাই তাঁর বাৎসল্যের পদগুলি মধুর রসের পদের মতো উৎকর্ষ লাভ করতে পারেনি।

রায়শেখর

চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাসের পর যেসব বৈষ্ণব কবিদের নাম স্মরণীয়, রায়-শেখর তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

বাংলার বৈষ্ণব পদকর্তাদের নাম নিয়ে যে সাধারণ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, রায়শেখরের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। শেখর, শশিশেখর, শেখর রায়, কবি শেখর রায়, দুঃখী শেখর প্রভৃতি বিভিন্ন ভণিতাযুক্ত পদগুলি রায়শেখরের রচনা বলে মনে করা হয়। তবে এর সমর্থনে নিশ্চিত প্রমাণ নেই।

এই সঙ্গে আরও একটি সমস্যার কথা উল্লেখ করতে হয়। বিদ্যাপতিও তাঁর অনেক পদের ভণিতায় 'কবিশেখর' নামটি ব্যবহার করেছেন। উভয় কবির রচিত ব্রজবুলি পদও পাওয়া যায় এবং এই পদগুলির মধ্যে যথেষ্ট মিল থাকায়, পার্থক্য নির্ণয় করা অনেক ক্ষেত্রে কঠিন হয়ে পড়ে। সমস্যাটিকে কঠিনতর করেছেন নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 'কবিশেখর' ভণিতাযুক্ত পদগুলি নির্বিচারে বিদ্যাপতির পদ সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করে। তবে এর সমাধানের পথ নির্দেশ করেছেন পদকল্পতরুর সম্পাদক সতীশচন্দ্র রায়। অভ্যন্তরীণ প্রমাণ উপস্থিত করে তিনি দেখিয়েছেন যে, বিদ্যাপতির পদে রাধা-কৃষ্ণের সেবক-সেবিকা, দাস-দাসী প্রভৃতির উল্লেখ নেই। কারণ দাস-দাসী, বিশেষ করে সখা ও সখী হিসাবে ভজনারীতি চৈতন্যোত্তর কালে প্রবর্তিত হয়। রূপ গোস্বামীই সর্বপ্রথম সখীভাবের সাধনা বা মঞ্জরী সাধনার ব্যাখ্যা করেন। চৈতন্য-পরবর্তী কবিদের মধ্যে সাধনার এই পদ্ধতি বিশেষ প্রিয় ছিল। তাঁদের রচনাতেও এর প্রতিফলন দেখা যায়। রায়শেখরও মঞ্জরীভাবের সাধক। তাঁর একটি পদে আছে, রাধা অভিসারে চলেছেন, রায়শেখর অন্তরঙ্গ সখী হিসাবে তাঁর অলঙ্কার ইত্যাদি বহন করে চলেছেন।

যতনহিঁ নিঃসরু নগর দুরন্তা।
শেখর অভরণ ভেল বহন্তা ॥[৯২]

মিথিলার কবি বিদ্যাপতি এবং বাংলার কবি রায়শেখরের ব্যবহৃত ব্রজবুলি পর্যা-লোচনা করলেও দু'জন পৃথক পৃথক কবিকে চিহ্নিত করা যায়। বিদ্যাপতি ব্রজবুলিতে

শুদ্ধ মৈথিল শব্দের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। এছাড়া তাঁর ভাষা ব্যাকরণশুদ্ধ। কিন্তু বাঙালী কবি রায়শেখর শব্দের প্রয়োগে এবং ছন্দের ব্যবহারে তেমন শুদ্ধতা রক্ষা করতে পারেন নি। যদিও রায়শেখরের রচনার লালিত্যগুণে আপাতদৃষ্টিতে এই ত্রুটি ধরা পড়ে না এবং মনে হতে পারে বিদ্যাপতিরই রচনা। সন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে দেখলে পার্থক্য ধরা পড়ে এবং সংশয় থাকে না যে 'কবিশেখর' পৃথক ব্যক্তি।[৯৩] ডঃ অসিত-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই অভিমত সমর্থন করেন।[৯৪]

বিভিন্ন 'শেখর' ভণিতাযুক্ত বাঙালী পদকর্তাদের মধ্যে রায়শেখর কে, অথবা এই সবগুলি তাঁরই ভণিতা কিনা তা নির্ধারণ করা দুরূহ ব্যাপার। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এ সম্পর্কে বলেছেন : "দণ্ডাত্মিকা নামক পদ সংগ্রহে যে শেখরের ভণিতা আছে, তিনিই রায়শেখর, কারণ 'দণ্ডাত্মিকা' পদের সঙ্গে 'পদকল্পতরু' ধৃত রায়শেখর, শেখর ইত্যাদি ভণিতাযুক্ত পদের সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য আছে। সুতরাং 'দণ্ডাত্মিকা' পদাবলী ও 'পদকল্পতরু'র পাঠ মিলাইয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে— কবির যথার্থ নাম ছিল শেখর। রায়-নৃপ-কবি সমস্তই কবি নিজ নামের বিশেষণ হিসাবে ব্যবহার করিয়াছেন।'[৯৫]

জগদ্বন্ধু ভদ্র গৌরপদতরঙ্গিণীতে বলেছেন, রায়শেখরের প্রকৃত নাম শশিশেখর। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন নিত্যানন্দের বংশে, গোবিন্দদাস কবিরাজের কিছু পরে। জন্মস্থান বর্ধমান জেলার পড়ান গ্রামে। সতীশচন্দ্র রায় মনে করেন, ১৫০৪ শকে খেতুরীতে যে মহোৎসব হয় তার পূর্বেই রায়শেখরের মৃত্যু হয়েছিল। এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে তিনি নানা যুক্তি দেখিয়েছেন।[৯৬] দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন, ইনি প্রায় মহাপ্রভুর সমসাময়িক কবি।[৯৭] বিমানবিহারী মজুমদার রায়শেখরকে ষোড়শ শতকের কবি বলেছেন।[৯৮] তিনি আরও বলেছেন : "শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকারের ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুনন্দনের শিষ্য রায়শেখর গোবিন্দদাস কবিরাজের মতন অষ্টকালীয় নিত্যলীলার পদ লিখিয়াছেন। রায়শেখর শ্রীকৃষ্ণলীলার, বাল্যলীলা, গোষ্ঠ, পূর্বরাগ, অভিসার, মান, খণ্ডিতা, রসোদ্গার, আক্ষেপানুরাগ বিষয়ে পদ রচনা করিয়াছেন। ইনি ভণিতায় শেখর বা রায়শেখর লিখিতেন।"[৯৯]

যেসব তথ্য বর্তমানে পাওয়া যায়, তার সাহায্যে রায়শেখরের কাল ও ব্যক্তিজীবন সম্বন্ধে চূড়ান্তরূপে কিছু বলা চলে না। আমরা অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূল বক্তব্য স্বীকার করে নিতে পারি। সে বক্তব্য হল এই যে, রায়শেখর গোবিন্দদাসের পরবর্তী সময়কার সপ্তদশ শতকের কবি।[১০০]

পদাবলী সাহিত্যের নানা শাখায় রায়শেখর বিচরণ করেছেন। কৃষ্ণের বাল্য ও গোষ্ঠলীলা, পূর্বরাগ, অভিসার, মান, খণ্ডিতা, আক্ষেপানুরাগ প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর পদ পাওয়া যায়। গোবিন্দদাস কবিরাজের মতো দণ্ডাত্মিকা পদে তিনি রাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীয় নিত্যলীলার পদ রচনা করেছেন। এই সব পদে রাধা-কৃষ্ণের প্রতি দণ্ডের লীলা বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তীকালে এই পদগুলি রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পালাগান রচয়িতাদের প্রভাবান্বিত করেছে।

রায়শেখর যে প্রকৃত কবি-প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, তা নিম্নোধৃত ব্রজবুলিতে রচিত অভিসার পদটি থেকে উপলব্ধি করা যেতে পারে।

ঝরঝর বরিখে সঘনে জল-ধারা।
দশ দিশ সবহুঁ ভেল আন্ধিয়ারা॥
এ সখি কীয়ে করব পরকার।
অব জনি বাধয়ে হরি অভিসার॥
অন্তরে শ্যাম চন্দ পরকাশ।
মনহি মনোভব লেই নিজ পাশ॥
কৈছনে সঙ্কেতে বঞয়ে কান।
সোঙরিতে জর জর অথির পরাণ॥
ঝলকই দামিনি দহন সমান।
ঝনঝন শব্দ কুলিশ ঝনঝন॥
ঘর-মাহা রহইতে রহই না পার।
কি করব এসব বিঘিনি বিথার॥[১০১] ইত্যাদি

কবির অন্যান্য বিষয়ক পদের পরিচয় নেবার এখানে প্রয়োজন নেই। বাৎসল্য রসের প্রকাশ তাঁর রচনায় কিভাবে কতটা হয়েছে তা এখন দেখা যেতে পারে।

পুরনো বিষয়, বাঁধা ছক,— সুতরাং বিশেষ প্রতিভাশালী না হলে শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-লীলা বর্ণনাকে চিত্তাকর্ষক করে তোলা যে কোনো কবির পক্ষেই কঠিন। রায়শেখরের অনেক পদই গতানুগতিক ; চমৎকৃতি— যা রসের মূলকথা— তার অভাব অনুভূত হয়।

যশোদা কঠোর তপস্যা করে কৃষ্ণের মতো পুত্র লাভ করেছেন। পুত্রের 'সুধানন' দেখে তাঁর মনে 'প্রেম-সুখ-সিন্ধু' উথলে ওঠে।

জশোমতি বোলত ভাষ।
এ বিধু বদনে মা বোল বোলইতে
যুনইতে শ্রবণ উল্লাস॥[১০২]

ছেলের মুখে 'মা' ডাক শুনতে পাবার আকাঙ্ক্ষা খুবই স্বাভাবিক। যশোদা এখানে আমাদের আপনজন।

তারপর কৃষ্ণ কথা বলতে শিখেছেন। তাঁর মুখের কথা শুনে যশোদা আনন্দে আত্মহারা। সেই আনন্দে কৃষ্ণকে তিনি সুস্বাদু খাদ্য খাওয়াতে লাগলেন।

আধ আধ বালক সত বোল বোলত
জননি বদন তহি চাই।
মাখন ক্ষির স্বর উদর পুরী দেহ
নবনিত খাই তথাই॥[১০৩]

কৃষ্ণের গোষ্ঠে যাবার বয়স হয়েছে। নানা আশঙ্কায় যশোদার হৃদয় পূর্ণ। দৈবানুগ্রহে পুত্র পেয়েছি, তবে আর ভয় কেন? যশোদা নিজেকে একবার প্রবোধ দেন, আবার বিচ্ছেদ ভাবনায় কাতর হয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়েন—

নে রে রাম ধর বাড়াইয়া কর
গোপালে সোপিএে দি ॥
রাম করে ধরি জশোদা সুন্দরি
সোপিছে যাদব রায় ।
নয়নের জল করে ছল ছল
বসন তিতিয়ে জায় ।
রাম করে হরি সমর্পণ করি
জশোদা মুরছা হইল ।[১০৪]

যশোদার ভয় কিছুতেই দূর হয় না—

বলরামের কর লৈয়া, গোপালেরে সমর্পিয়া,
পুন পুন বলে নন্দরাণী ।
এই নিবেদন তোরে, না যাবে কালিন্দী তীরে,
সাবধান মোর নীলমণি ॥
রামেরে লইয়া কোরে, সিঞ্চিযে আঁখির নীরে,
পুন পুন চুম্বে মুখখানি ।[১০৫]

কৃষ্ণ এখনও বালক, পথঘাট চেনেন না, এখনই কেন তাঁকে গোষ্ঠে পাঠানো হবে ?

ঘর পথ যে না জানে সে জনা চলিল বনে
এ তাপ কেমনে সহে মায় ॥
আমার জীবন দুলালিয়া ।
কিবা ঘরে নাহি ধন কেনে বা যাইবে বন
রাখালে রাখিবে ধেনু লৈয়া ॥
আমার নয়নের তারা হাপুতীর পুত তোরা
আণ্ডল করিয়া যাবি মোরে ।
দুধের ছাওয়াল হৈয়া বনে যাবে ধেনু লৈয়া
কি দেখি রহিব যাই ঘরে ।
ননী জিনি তনুখানি আতপে মিলায় জানি
সে ভয়ে সঘন প্রাণ কাঁপে ।
... ...
শিরীষ-কুসুম-দল জিনিয়া-চরণ তল
কেমনে ধাইবে হেন পায় ॥[১০৬]

কিন্তু গোচারণ যে কুলের ধর্ম, গোষ্ঠে যেতেই হবে । তাই—

ধরিয়া মায়ের কর কহে রাম দামোদর
শুভ কাজে না করিহ দুখ ।
আমার কুলের ধর্ম গোচারণ নিজ কর্ম
করিতে পাই যে বড় সুখ ॥[১০৭]

গোষ্ঠে যাওয়া যখন বন্ধ করা গেল না, তখন যশোদা কৃষ্ণ ও বলরামকে 'রক্ষামন্ত্র' দিলেন তাদের নিরাপত্তার জন্য। এমনকি বেদে ডেকে 'ঝাড়ফুঁক'ও করিয়ে নিলেন।

ডাকিনী শাকিনী ভয়ে ধড় প্রাণ নাহি রহে
বাদিয়া সাধিয়া আনি মায়।
অক্ষয়-অমর-তনু হয় যেন রাঁম কানু
এমতি বান্ধিয়া দিবে গায়॥[১০৮]

যশোদা এখানে এক সংস্কারাচ্ছন্ন স্নেহান্ধ গ্রাম্য রমণী হিসাবে আমাদের নিকট উপস্থিত হন।

রায়শেখর বাৎসল্যের যেসব চিত্র এঁকেছেন সেগুলি আমাদের নিকট পরিচিত। অন্যান্য পদকর্তারাও অনেকটা এই ভাবেই বাৎসল্য ভাবনাকে প্রকাশ করেছেন। রায়-শেখরের মধ্যে ভাবগত অনুসরণের উৎসাহ কম দেখা যায়। তাঁর বৈশিষ্ট্য রাধার প্রতি যশোদার স্নেহের চিত্রণে। কৃষ্ণ গোষ্ঠে চলে গেছেন, গৃহ শূন্য, যশোদার মন উদাস। মনের এই অবস্থায় রাধার প্রতি তাঁর স্নেহের সঞ্চার হল। কৃষ্ণ যে রাধার প্রতি আকৃষ্ট তার ইঙ্গিত তিনি আগেই পেয়েছেন। এটাও রাধার প্রতি তাঁর আকর্ষণের অন্যতম কারণ।

কানুরে পাঠাইয়া বনে যশোদা বিষাদ মনে
আসিয়া রাইরে করে কোরে।
দুখে আউলাইছে গা মুখে না নিঃসরে রা
বসন ভিজিয়া গেল লোরে॥
গদগদ-স্বরে রাণী কহয়ে বিষাদ-বাণী
ধরিয়া রাধার দুটি করে।
কীর্তিদা সমান হেন আমারে জানিবা তেন
সে ঘর এ ঘর সব তোরে॥
কি আর করিব সাধ সকলে পড়িল বাদ
দিনেক রাখিতে নারি তোমা।
এমনি বিষম লোক জীয়ন্তে পাড়য়ে পোক
তিলেক নাহিক কারু ক্ষেমা॥
বিবিধ মোদক আনি রাইয়ের আঁচলে রাণী
দিলা কত যতন করিয়া।
ফুকার করিয়া কান্দে হিয়া থির নাহি বান্ধে
ধারা বহে মুখ বুক বাইয়া॥[১০৯]

রাধার প্রতি যশোদার এমন স্নেহের পরিচয় পাওয়া যায় জ্ঞানদাসের রচনায়—

রাধিকারে লয়ে কোরে রাণীর অতি সুখ।
মন সাধে চায়্যা রৈল রাধার চাঁদমুখ॥
প্রতি অঙ্গে হাত দিয়া অনিমেখে রাণী।

এমন সোনার বাছা মুই যাই নিছনি ॥
ভাসায়ে আনন্দে রাণী রাধা কোলে লয়ে।
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দেই বদন কমলে ॥[১১০]

কৃষ্ণের বয়স বাড়লেও যশোদা তাঁকে শিশুর মতোই দেখেন। রাধা এবং কৃষ্ণ দু'-জনেই তাঁর স্নেহের পাত্র। তাঁদের বিলাসলীলা তাঁর চোখে পড়ে না, তাঁদের বিলাস-লীলাকে বালক-বালিকার খেলা হিসাবেই দেখেন যশোদা। কৃষ্ণ সারারাত বিলাস-কুঞ্জে অনিদ্রায় থেকে প্রত্যুষে বাড়ী ফিরে ঘুমিয়ে পড়েন, উঠতে দেরী হয়। সখারা গোষ্ঠে যাবার জন্য ডাকতে আসে। যশোদা তখন যান ছেলের ঘুম ভাঙ্গাতে। সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠবার পর শরীর সজীব দেখাবার পরিবর্তে মনে হয় কত ক্লান্ত। স্নেহাতুর যশোদা সম্ভোগচিহ্নগুলির অন্য ব্যাখ্যা দেন। এমনকি, রাত্রির অন্ধকারে রাধা-কৃষ্ণের পরিধেয় বস্ত্র যে পরিবর্তিত হয়ে গেছে তার প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করতে চান না যশোদা।

রামের বসন পরিলা কখন
কে নিল বসন তোর।
রাতা উতপল নয়ন-যুগল
কি লাগি দেখিয়ে ঘোর ॥
নীল-মলিন আতপে মলিন
কেন বা এমন দেহ।
উনমত হৈয়া বুলহ ধাইয়া
কুদিঠি দিলে বা কেহ ॥
হিয়ার উপর কণ্টকে আঁচড়
গিয়াছিলা কোন বনে।
আমার কপালে না জানি কি ফলে
পরানে মরিব মেনে ॥[১১১]

বিলাসলীলায় ক্লান্ত পুত্রকে অসুস্থ মনে করে এবং কেউ অশুভ দৃষ্টি দিয়েছে ভেবে, যশোদা দেবতার নিকট গেলেন পূজা দিতে।

রায়শেখর প্রথম শ্রেণীর কবি না হলেও বাৎসল্যরসের পদকর্তা হিসাবে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। অলংকারবিহীন শাদামাঠা ভাষায় তিনি বাৎসল্যরসের অনুভূতি সহজরূপে প্রকাশ করেছেন। তাঁর যশোদা স্নেহান্ধ রমণী। কৃষ্ণের ঐশ্বর্যরূপ যশোদাকে আকৃষ্ট করেনি। রায়শেখরের বাৎসল্য পার্থিব, অলৌকিক নয়।

উপরোক্ত পাঁচজন কবি ছাড়া আমাদের আলোচ্য কালখণ্ডের মধ্যে আর যাঁরা বাৎসল্য রসের কিছু কিছু পদ রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গোবিন্দদাস, ঘনরামদাস, উদ্ধবদাস, যদুনন্দন দাস, বংশীবদন প্রভৃতি। অবশ্য বিমানবিহারী মজুমদার মনে করেন, গোবিন্দদাস নামাঙ্কিত বাৎসল্যরসের অধিকাংশ পদই খ্যাতনামা পদকর্তা গোবিন্দদাস কবিরাজের কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

হিন্দী

কৃষ্ণদাস

কুম্ভনদাস, সূরদাস, পরমানন্দ দাস ও কৃষ্ণদাস,— অষ্টছাপের এই চারজন সাধক কবি বল্লভাচার্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। কুম্ভনদাসই দীক্ষা নেন সকলের আগে। তিনি অষ্টছাপের বিশিষ্ট কবি। কিন্তু তাঁর জীবন সম্বন্ধে প্রামাণিক তথ্য বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। ডঃ দীনদয়ালু গুপ্ত বলেছেন,— কিছু কিছু পদে কুম্ভনদাস তাঁর গুরু এবং গুরুর পরিবারবর্গের পরিচিতি দিয়েছেন, কিন্তু নিজের সম্বন্ধে কোথাও কিছু লিখে যাননি।[১১২]

হরিরায়জী রচিত চৌরাসী বৈষ্ণবন কী বার্তা থেকে তাঁর সম্বন্ধে দু'একটি-কথা জানা যায়। জানা যায়, ব্রজভূমির গোবর্ধন পর্বতের নিকটবর্তী জমুনাবতো গ্রামে তিনি বাস করতেন। পরাসোলী চন্দ্র সরোবরের কাছে তাঁর পৈত্রিক কিছু জমি ছিল। এই জমি দেখাশুনাও করতেন কু ভনদাস। মাঝে মাঝে যেতেন শ্রীনাথজীর মন্দিরে কীর্তন গাইতে। কবির জন্ম 'গোরবা' ক্ষত্রিয় কুলে।[১১৩] মাতা-পিতার কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। এই প্রসঙ্গে প্রভুদয়াল মীতল বলেছেন : "ইন বার্তাওঁ মেঁ [চৌরাসী বৈষ্ণবন কী বার্তা এবং অষ্ট সখান কী বার্তা] উনকে নিবাস স্থান ঔর উনকী জাতি কা তো উল্লেখ হুয়া হৈ, কিন্তু উনকে পূর্বজ কুটুম্বী এবং মাতা-পিতা কা কোঈ বিবরণ নহী" দিয়া গয়া হৈ।"[১১৪]

আমরা আরও জানতে পারি যে, কুম্ভনদাসের প্রথম জীবন কেটেছে তাঁর ধর্মপ্রাণ পিতৃব্য ধর্মদাসের সাহচর্যে।[১১৫] অল্প বয়সেই তিনি কীর্তনে পারদর্শিতা লাভ করেন, তাই দীক্ষা নেবার পর বল্লভাচার্য তাঁকে শ্রীনাথজীর মন্দিরে কীর্তনসেবার ভার দেন। কুম্ভনদাস নিজে কতকগুলি মধুর পদ রচনা করে গান করতেন। তাঁর কীর্তনের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল দূরে দূরান্তরে। স্বামী হরিদাসের মতো সাধকও তাঁর মধুবর্ষী কীর্তন শুনতে আসতেন।[১১৬]

সম্রাট আকবরও নাকি কীর্তন শোনার জন্য একবার তাঁকে দিল্লীতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কুম্ভনদাস এই আমন্ত্রণ পেয়ে উল্লসিত হননি। কারণ দিল্লী গেলে কৃষ্ণের সেবায় ছেদ পড়বে। শ্রীনাথজীর বিচ্ছেদ-বেদনা সইতে হবে। তাই আকবর যখন গাইতে অনুরোধ করলেন তখন কবি শোনালেন—

> ভক্তন কো ক্যা সীকরী সোঁ কাম।
> আবত জাত পন্হৈয়াঁ টূটী বিসরি গয়ো হরিনাম॥
> জাকো মুখ দেখী অঘ লাগে তাকো করন পরী পরনাম।
> কুম্ভনদাস লাল গিরধর বিন য়হ সব ঝুঠো ধাম॥[১১৭]

অর্থাৎ, ভক্তের সোনার হারে কি প্রয়োজন ? আসতে যেতে জুতো ক্ষয়ে গেল, হরি

নাম ভুলে গেলাম। যার মুখ দেখলে পাপ হয় তাকেও প্রণাম করতে হয়। কুম্ভনদাস বলেন, গিরিধারী ছাড়া পৃথিবীতে সব মিথ্যা।

কুম্ভনদাসের জন্ম-মৃত্যুর তারিখ জানা যায় না। শুধু কয়েকটি প্রাসঙ্গিক ঘটনা থেকে তাঁর জীবিতকাল অনুমান করা যেতে পারে। বল্লভাচার্য শ্রীনাথজীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন ১৫৪৯ বিক্রমাব্দে বা ১৪৯১ খ্রীস্টাব্দে। গোবর্ধননাথজীর বার্তা থেকে এই তথ্য পাওয়া যায়। ঐ সময় কুম্ভনদাস দীক্ষা গ্রহণ করেন। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, ১৪৯১ খ্রীস্টাব্দে কবি অন্তত নবযুবক ছিলেন। তাঁর মত্যুর সময় সম্বন্ধে এই বক্তব্যটি যথেষ্ট আলোকপাত করে: "পরমানন্দদাসজী [অষ্টছাপের কবি] কা নিধনকাল সম্বৎ ১৬৪০ বি. মানা গয়া হৈ ঔর সুরদাসজী কা গোলোকবাস সম্বৎ ১৬৩৮-৩৯ বি. কে লগভগ নির্ধারিত কিয়া গয়া হৈ। অতঃ ইসসে স্পষ্ট অনুমান লগায়া জা সকতা হৈ কি কুম্ভনদাস জী কা নিধন কাল সম্বৎ ১৬৩৮ য়া ১৬৩৯ বি. হোগা। চৌরাসী বার্তা ঔর বল্লভ সম্প্রদায় মেঁ য়হ প্রচলিত হৈ কি কুম্ভনদাস কী আয়ু ১১৩ বর্ষ কী থী। সম্বৎ ১৬৩৮ য়া ১৬৩৯ বি. নিধন তিথি মাননে পর ইনকী জন্মতিথি সং ১৫২৫ যা সং ১৫২৬ বি. আতি হৈ।"[১১৮] অর্থাৎ, পরমানন্দদাসের মৃত্যু ১৬৪০ বিক্রমাব্দে এবং সূরদাসের মৃত্যু ১৬৩৮-৩৯ বিক্রমাব্দের কাছাকাছি কোনো সময়ে হয় বলে মনে করা হয়। সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে, কুম্ভনদাসের মৃত্যুও ১৬৩৮ বা ১৬৩৯ বিক্রমাব্দে হয়েছিল। একটি প্রচলিত মত অনুসারে— যার সমর্থন চৌরাসী বার্তা ও বল্লভ সম্প্রদায়েও পাওয়া যায়— কুম্ভনদাস ১১৩ বৎসর জীবিত ছিলেন। যদি ১৬৩৮ বা ১৬৩৯ বিক্রমাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়ে থাকে, তাহলে প্রচলিত ধারণার ভিত্তিতে কুম্ভনদাসের জন্মসাল দাঁড়ায় ১৫২৫ বা ১৫২৬ বিক্রমাব্দ।

কুম্ভনদাসের পদাবলী যথেষ্ট সমাদৃত হলেও তাঁর জীবিতকালে সেগুলি গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়নি বলেই মনে হয়। সেজন্য তাঁর অনেক পদ হয়ত লুপ্ত হয়ে গেছে। কবির রচনায় মধুর রসের নিপুণ ও বিচিত্র প্রকাশ দেখা যায়। তবে বাৎসল্য রসের পদ রচনায়ও তিনি কম পারদর্শী নন। মধুর রসই হোক কি বাৎসল্য রসই হোক, মূল বিষয় এক— 'শ্রীকৃষ্ণ'। রামচন্দ্র শুক্ল তাই বলেছেন: "বিষয় বহী কৃষ্ণ কী বাললীলা ঔর প্রেমলীলা হৈ।"[১১৯] রাসলীলা প্রভৃতি নানা উৎসব কেন্দ্র করে কৃষ্ণলীলার টুকরো টুকরো বিচ্ছিন্ন ছবি এঁকেছেন কবি। সুরদাস কিংবা পরমানন্দদাসের পদে অনেকটা পালাগানের মতো যে পারম্পর্য লক্ষ্য করা যায়, কুম্ভনদাসের পদাবলীতে তা নেই। রাসোৎসবের একটি পদে কবি বলেছেন—

রাস মেঁ গোপাল লাল নাচত, মিলি ভামিনী।
অংস-অংস ভুজনি মেলি, মণ্ডল-মধি করত কেলি,
কনক-বেলি মনু তমাল স্যাম-সঙ্গ স্বামিনী॥[১২০]

অর্থাৎ, রাস উৎসবের নৃত্যে, সুন্দর গোপাল এবং ভামিনী এক সঙ্গে নাচছেন। নাচতে নাচতে কাঁধের উপর হাত রাখার জন্য মনে হয় যেন শ্যামল তমাল বৃক্ষে কনকলতা জড়িয়ে আছে। শুধু রাস নয়, কবি দানলীলা, কুঞ্জলীলা, বসন্তলীলা,

ঝুলনোৎসব প্রভৃতি উপলক্ষ করেও পদ রচনা করেছেন। তাছাড়া শুধু বসন্ত নয়, বৎসরের সব ঋতুর মধ্যেই তিনি আবিষ্কার করেছেন সৌন্দর্য এবং মধুরলীলার উপযোগী পরিবেশ। বর্ষার রূপ কবিকে মুগ্ধ করে। বৈষ্ণব কবিদের রচনায় বর্ষার সঙ্গে থাকে একটু বেদনার সুর। আশঙ্কা হয়, রাধার অভিসারে বেরোবার প্রয়াস ব্যর্থ করে দেবে। কুম্ভনদাসের মধ্যে কিন্তু সে আশঙ্কা নেই। রবীন্দ্রনাথের মতো তিনি বর্ষার বারিধারায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন।

রিমি-ঝিমি বরষত মেহ প্রীতম সঙ্গরী !
চলো সখী ! ভীজ়ত সুখ লাগেগো ॥
তৈসেঈ বোলত চাতক, পিক, মোর।
তৈসেঈ গরজ মধুরী তৈসোঈ পবন সীতল লাগেগো ॥[১২১]

অর্থাৎ, রিম্ ঝিম্ করে বৃষ্টি পড়ছে। একদিকে যেমন চাতক, কোকিল ও ময়ূর ডাকছে, অন্যদিকে মেঘের মৃদু মধুর গর্জন। শীতল বাতাস বইছে। সখী চলো, এমন সময় প্রিয়তমের সঙ্গে বৃষ্টিতে ভিজতে খুব ভালো লাগবে।

কুম্ভনদাস শুধু বর্ষার রূপ দেখে মুগ্ধ হননি। তাঁর রাধা বর্ষাকে নিবিড়ভাবে ভালোবেসেছেন। এই ভালোবাসার প্রকাশ বারবার পাওয়া যায়। যেমন এখানে—

স্যাম ! সুনু নিয়রে় আয়ৌ মেহু
ভীঁজেগী মেরী সুরঙ্গ চুনরী ওট পীতাম্বর দেহু ॥
দামিনি তে় ডরপতি হোঁ মোহন নিকট আপুনী লেহু ।[১২২]

অর্থাৎ, শ্যাম শোন, বর্ষা এসে গেছে ; আমার সুন্দর রঙিন ওড়না ভিজে যাবে। তুমি তোমার হলুদ উড়ানি দিয়ে আমাকে ঢেকে দাও।

কবির মধুর রসের পদগুলি ভাষার স্বচ্ছতায় ও সৌকর্যে এবং বিষয়বৈচিত্র্যে হিন্দী কৃষ্ণকাব্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। রাধা-কৃষ্ণের সংলাপের মধ্যে তিনি যথেষ্ট নাটকীয়তা সৃষ্টি করতে সক্ষম হওয়ায় পাঠকদের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।

কুম্ভনদাসের মধুররসের রচনাবলীর বিস্তৃত আলোচনার স্থান এখানে নেই। তাঁর বাৎসল্যরসের পদগুলিই আমাদের আলোচ্য বিষয়। এই বিভাগেও কুম্ভনদাস সার্থক কবি।

কৃষ্ণকে কোলে পেয়ে নন্দ, যশোদা এবং সকল ব্রজবাসী আনন্দে উচ্ছল। কিন্তু যশোদার আনন্দের তুলনা নেই।

ফুলে আনন্দরাইজু, ফুলী জসুমতি মাই।
গোদ লিএ ফুলসতি বডী কমলনৈন সুখদাই ॥[১২৩]

অর্থাৎ, পুত্র কোলে পেয়ে যশোদার গর্বের অন্ত নেই। তিনি কমলনয়ন কৃষ্ণকে কোলে নিয়ে আদর করছেন আর আনন্দে উৎফুল্ল হচ্ছেন।

কৃষ্ণকে পেয়ে যশোদা অন্য সব কাজের কথা বুঝি ভুলে গেছেন। ছেলেকে নিয়েই তাঁর দিন কেটে যায়। তাঁকে কোলে করা, দোলনায় দোলানো, আদর করা, খাওয়ানো—এসব করতেই সময় শেষ হয়।

রতন খচিত কঞ্চন কো পালনা, তা-মধি ঝুলত গিরিধরলাল।
জসুমতি হরষি ঝুলব্বতি, গাব্বতি সুন্দর-গুণ দৈ-দৈ কর তাল॥
করি গুলগুলী হঁসাব্বতি হরি কোঁ, কবহুঁক মুখ সোঁ চুম্বতি গাল।[১২৪]

কবি বলেছেন, রত্নখচিত মনোহর দোলনায় গিরিধারীলাল ঝুলছেন। যশোদা আনন্দিত হয়ে কৃষ্ণের গুণগান করছেন এবং দোলনা দোলার সঙ্গে সঙ্গে হাতে তাল দিচ্ছেন। কখনো সুড়সুড়ি দিয়ে হরিকে হাসাচ্ছেন, কখনো বা মুখ চুম্বন করছেন।

রত্নখচিত দোলনার কথা না থাকলে এটি আমাদেরই ঘরের ছবি হতে পারত। তবে যশোদার যে খাঁটি মায়ের প্রাণ তা সুস্পষ্টরূপেই অনুভব করা যায়। দোলনার কথা বারবার এসেছে কবির পদে। মায়ের হৃদয়দোলারই প্রতীক হয়ত।

কুম্ভনদাসের বাৎসল্যভাবনা নানা উৎসব কেন্দ্র করে প্রকাশ পায়। কৃষ্ণের জন্মের পর ষষ্ঠী-পুজার অনুষ্ঠানে কত সমারোহ। কত লোকের আনাগোনা, কত কলরব। তবু যশোদার অন্যদিকে মন নেই, ছেলের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে পরম সুখে মগ্ন তিনি— "নিরখি-নিরখি সুখ পাঙ্গৈ॥"[১২৫]

দশহরার শুভদিনে কৃষ্ণ যবের অঙ্কুর ধারণ করেছেন; তাঁর কপালে কুমকুমের তিলক শোভা পাচ্ছে। পুত্রের কল্যাণ কামনায় যশোদা মঙ্গল আরতি করছেন, তাঁর সব বালাই দূর করবার জন্য দান করছেন মুক্তার হার।[১২৬]

এর পরে দেখা যায় গোপাল ও বলরামকে বসন-ভূষণ, তিলক প্রভৃতিতে সজ্জিত করে যশোদা তাঁদের হাতে রাখী বাঁধছেন।[১২৭] যশোদা রাখী বাঁধছেন পুত্রের মঙ্গল কামনায়—

রাখী বাঁধতি হৈ নন্দরাণী।
রত্নজটিত কী সুভগ বনী অতি মোহন কে মন মানী॥[১২৮]

অর্থাৎ, কল্যাণ কামনায় নন্দরাণী পুত্রের হাতে রত্নখচিত রাখী বেঁধে দিলেন; ব্রাহ্মণদের দক্ষিণা দিয়ে তুষ্ট করলেন এবং তাঁরা খুশি মনে আশীর্বাদ করে গেলেন কৃষ্ণকে।

আবার, কার্তিক মাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশীর-রাত্রির উৎসবেও যশোদা কৃষ্ণের মঙ্গল কামনায় নানা অনুষ্ঠান পালন করছেন দেখা যায়।[১২৯] যশোদার কাছে এইসব উৎসবের দিনগুলির নিজস্ব কোন মূল্য নেই; পুত্রের কল্যাণ কামনার সুযোগ এনে দেয় বলেই তাদের গুরুত্ব।

কৃষ্ণ বড় হয়েছেন। মা'র কোল ছেড়ে বাড়ীর প্রাঙ্গণে খেলা করেন, আর তা দেখে যশোদার মন আনন্দে পূর্ণ হয়ে যায়। কুম্ভনদাস বলেছেন—

ক্রীড়ত কাহ্ন কনক আঁগন মাঁহী।
নিজ-প্রতিবিম্ব বিলোকি, কিলক করি, ধাব্বত পকরন কোঁ পরছাঁহী॥
পকরি ন পাব্বত ভ্রমিত হোত জব, আব্বত-উলটি লাল তিহি ঠাঁহী।
'কুম্ভনদাস' প্রভু কী য়হ লীলা নিরখি জসোমতি হঁসি মুসিক্যাহী॥[১৩০]

অর্থাৎ, কৃষ্ণ সোনার মতো রৌদ্র ঝলমল আঙিনায় খেলা করছেন। খিলখিল

করে হাসতে হাসতে নিজের ছায়াকে ধরবার জন্য কৃষ্ণ ছুটোছুটি করছেন, কিন্তু ধরতে পারছেন না। তখন শ্রান্ত হয়ে আগের জায়গায় ফিরে আসছেন। কুম্ভনদাস বলেন, প্রভুর এই লীলা দেখে যশোদা মৃদু মৃদু হাসছেন।

কৃষ্ণের খেলা দেখে যশোদা নিজে আনন্দ পান ; সে আনন্দ ব্রজবাসী সবাই যাতে পেতে পারে সেজন্য তিনি উৎসুক। তাই তিনি কৃষ্ণকে বলছেন :

নন্দ কে লাল ! মন-হরণ সুন্দর স্যাম !
জাউঁ বলি-বলি অব কীজিএ কলেৰা ॥
বিবিধ পকৱান, দধি, দুধ, মাখন, মিশ্রী,
পহরি লেউ বসন, কটি বাঁধি লেহু মেৰা ॥
বলরাম-সংগ মিলি জাউ খেলন লাল !
সকল ব্রজ-জন আনন্দ-দেবা।
"দাস কুম্ভন" প্রভু নন্দ নন্দন কুঁৱর—
জসোদা কে প্রাণ, মেরে দেৱধিদেৱা ॥[১৩১]

অর্থাৎ হে নন্দনন্দন, মনোহর শ্যামসুন্দর, আমি বলিহারি যাই। এখন উঠে জল-খাবার খেয়ে নাও। সবরকম মিষ্টান্ন দুধ, দই, মাখন, মিছরি প্রস্তুত। কাপড় পরে নাও, কটিতে মেওয়া বাঁধো, তারপর বলরামের সংগে খেলতে যাও। তোমার খেলা দেখে ব্রজবাসীরা আনন্দ পাবে। কুম্ভনদাস বলেন, তুমি নন্দ নন্দন, যশোদার প্রাণ-প্রিয় এবং ভক্তের দেবাদিদেব।

সন্তানের গুণ মা অন্যকে ডেকে এনে দেখাতে চান। এখানেও যশোদা কৃষ্ণের মনোমুগ্ধকর খেলা ব্রজবাসীদের দেখাবার জন্য ব্যগ্র। কিন্তু কৃষ্ণ যে ভক্তের নিকট দেবাদিদেব, এই কথা উল্লেখ করাতে লৌকিক বাৎসল্যেরসের পরিবেশ ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

কৃষ্ণের বাড়ী ফিরতে বিলম্ব হলে যশোদা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। একদিন সখীকে অনুরোধ করছেন, তুমি কৃষ্ণকে কুঞ্জগৃহ থেকে নিয়ে এস। তাঁকে সঙ্গে না নিয়ে কিছুতেই ফিরবে না। মনে রেখো, আমি তোমার পথ চেয়ে অপেক্ষা করব।[১৩২]

অন্যত্র দেখছি, কৃষ্ণ দেরী করে বাড়ী ফেরায় যশোদা বলছেন—

ললারে ! আজু অবেরো আয়ো ?
বডীয় বার কী মারগ জোৱতি, তৈঁ কিত গহরু লগায়ো ॥
অব কহুঁ বাহরি জান ন দৈহোঁ মেরো হিয়ো জুডায়ো।
ঘর হী বোহোত খিলৌনা তেরেঁ কাহেকোঁ বাহরি ধায়ো ॥
এক ঠৌঙ্গি দৈন উরাহনো আঈ, "মৈঁ কাহু কো দধি নহীঁ খায়ো।"
"কুম্ভনদাস" গিরিধর য়োঁ কহেঁ তৱ করত আপুনো ভায়ো ॥[১৩৩]

অর্থাৎ, বাছা ! আজ এত দেরী করে কেন ফিরলে ? কখন থেকে আমি তোমার পথ চেয়ে রয়েছি। আর কখনো আমি তোমাকে বাইরে যেতে দেব না। তোমাকে দেখে আমার প্রাণ জুড়াল। ঘরেই তো কত খেলনা, বাইরে যাবার কি দরকার ! এখনই এক গোপিনী এসে তোমার জন্য আমাকে কথা শুনিয়ে গেল।

কুম্ভনদাসের বাৎসল্যরসের বেশী বৈচিত্র্য নেই। তথাপি তিনি সরল অনাড়ম্বর ভাষায় সন্তানের জন্য মা'র বাৎসল্যের অনুভূতি সুচারুরূপেই প্রকাশ করেছেন।

সুরদাস

হিন্দী বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে সূরদাসের স্থান নির্ণয় প্রসঙ্গে অধ্যাপক বিজয়েন্দ্র স্নাতক বলেছেন— "মধ্যকালীন বৈষ্ণব ভক্ত কবিয়োঁ মেঁ সূরদাস কা স্থান শীর্ষ পর হৈ।"[১৩৪] অর্থাৎ, মধ্যযুগীয় বৈষ্ণব ভক্তকবিদের শীর্ষস্থানীয় সূরদাস। শুধু মধ্য-যুগের নয়, সর্বকালের হিন্দী বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ, একথা বলতে দ্বিধা করবার কোনো কারণ নেই।

সূরদাসের প্রতিভা সম্বন্ধে পণ্ডিত রামচন্দ্র শুক্লের অভিমত হল: "জিস প্রকার রামচরিত কা গান করনেবালে ভক্তকবিয়োঁ মেঁ গোস্বামী তুলসীদাসজী কা স্থান সর্বশ্রেষ্ঠ হৈ উসী প্রকার কৃষ্ণচরিত গানেবালে ভক্ত কবিয়োঁ মেঁ মহাত্মা সূরদাসজী কা। বাস্তব মেঁ য়ে হিন্দী কাব্যগগন কে সূর্য ঔর চন্দ্র হৈঁ।[১৩৫] অর্থাৎ, রামচরিত অবলম্বনে যেসব কবি কাব্য রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে যেমন তুলসীদাস শ্রেষ্ঠ, তেমনি কৃষ্ণ-লীলার কবিদের মধ্যে সূরদাস শ্রেষ্ঠ। এই দুই কবি হিন্দী সাহিত্যাকাশের সূর্য ও চন্দ্র।

সূরদাসের জীবন সম্বন্ধে নিঃসংশয় তথ্য বেশি কিছু জানা যায় না। ভক্তমাল প্রভৃতি পাঁচটি বৈষ্ণবীয় গ্রন্থে সুরদাস সম্পর্কে কিছু তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। এদের মধ্যে হরিরায়জী রচিত চৌরাসী বৈষ্ণবন বার্তায় বলা হয়েছে, সুরদাসের জন্ম হয়েছিল দিল্লীর নিকটবর্তী সীহী গ্রামে। আবার কোথাও কোথাও বলা হয়েছে, আগ্রা ও মথুরার মধ্যবর্তী রুনকতা তাঁর জন্মস্থান। এই দুটি ভিন্ন মতবাদের সমন্বয় সাধন করেছেন হিন্দী সাহিত্যের এক প্রখ্যাত ইতিহাসকার। তাঁর মতে সুরদাসের জন্মস্থান সীহী গ্রামই, তিনি আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন। পরে তিনি মথুরা আসেন এবং তারও পরে আগ্রা ও মথুরার মাঝামাঝি যমুনা তীরবর্তী গউঘাটে বসবাস আরম্ভ করেন।[১৩৬] হরিরায়জীর চৌরাসী বৈষ্ণবন কী বার্তা গ্রন্থের বিবরণই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য। তিনি সুরদাসের জন্মস্থান, মাতাপিতা, গৃহত্যাগ প্রভৃতির বিবরণ বাল্যকাল থেকে বৃদ্ধকাল পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করেছেন।

সুরদাসের জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ নিয়েও বিভিন্ন মত প্রচালিত আছে। এইসব মতামত বিচার করে একজন বিদগ্ধ সমালোচক সিদ্ধান্ত করেছেন: "সুরদাস কে জন্মকাল, মৃত্যুকাল আদি কে বিষয় মেঁ বিভিন্ন মন্তব্য প্রকট কিএ জাতে হৈ। উন সবকা পরীক্ষণ করনে পর হম ইস নিষ্কর্ষ পর পহুঁচে হৈঁ কি উনকা জন্ম ১৫৩৫ বি. মেঁ হুআ থা, লগভগ সংবৎ ১৫৬৬ মেঁ বে শ্রীবল্লভাচার্য জী কী শরণ মেঁ গএ ঔর উনকী মৃত্যু অনুমানতঃ ১৬৩৮ অথবা ১৬৩৯ বি.। মেঁ হুঈ।"[১৩৭] এর মূল ভাবার্থ হল এই যে, সুরদাসের জন্ম ১৫৩৫ বিক্রমাব্দে এবং তাঁর মৃত্যু হয়েছিল ১৬৩৮ থেকে ১৬৩৯ বিক্রমাব্দের কোনো এক সময়ে। ১৫৬৬ বিক্রমাব্দের কাছাকাছি সময়ে তিনি বল্লভাচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

প্রচলিত ধারণা এই যে, সূরদাসের তিন ভাই ছিল। মা বাবার উপেক্ষা ও উদাসীনতায় সংসারের প্রতি বীতরাগ হয়ে তিনি গৃহত্যাগ করেন। কেন এই উপেক্ষা? তিনি অন্ধ ছিলেন বলেই কি? তাঁর অন্ধত্ব সম্বন্ধেও নিশ্চিতরূপে কিছু জানা যায় না। কবির রচনা থেকে তাঁর অন্ধত্ব সম্বন্ধে কোনো সুস্পষ্ট ইঙ্গিতের অভাব সমস্যাকে আরও জটিল করেছে। কোনো কোনো পদে অবশ্য 'অন্ধে' কিংবা 'নিপট অন্ধে' পাওয়া যায়। কিন্তু 'অন্ধ' কথাটি এখানে শারীরিক না দার্শনিক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, ঠিক বোঝা যায় না। তাঁর মতো অনুভূতিপ্রবণ কবি নিজের অন্ধত্ব সম্বন্ধে কোনো আভাস দেননি, এটা আশ্চর্যের বিষয়। বহুদিনের কিংবদন্তী এই যে, সূরদাস অন্ধ ছিলেন, কিন্তু জীবন ও জগতকে তিনি দেখতে পেতেন ঈশ্বরের অনুগ্রহে দিব্যদৃষ্টির সাহায্যে। তাই তাঁর রচনা জীবনের বাস্তব অনুভূতিতে এমন প্রাণবন্ত। ডঃ কৃষ্ণচন্দ্র গুপ্ত মনে করেন, মধ্যযুগের ভক্তরা এই অলৌকিক ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং সেই বিশ্বাস এখনও ভক্তমহলে বিদ্যমান।[১৩৮]

কিন্তু এ যুগে এই সমস্যা দিব্যদৃষ্টির যুক্তি দিয়ে সমাধান করা চলে না। আমরা ডঃ দেবেন্দ্রনাথ শর্মার সিদ্ধান্ত সমীচীন বলে মনে করি। তিনি বলেন, সূরদাস অন্ধ ছিলেন কিনা তা বিতর্কের বিষয়। কেউ কেউ বলেন, তিনি ছিলেন জন্মান্ধ, আবার অন্যরা তাঁর কাব্যের সজীবতা এবং চিত্রকল্পের যথার্থ প্রয়োগ দেখে মনে করেন, কবি পরবর্তী জীবনে দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছিলেন। কিন্তু এই দুটি বক্তব্যই অনুমান নির্ভর। তবে তাঁর রচনার বাস্তবতা ও সজীবতা অনুধাবন করলে সন্দেহ থাকে না যে, কবি তাঁর জীবনের কোনো এক পর্বে পৃথিবীর রূপ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাঁর কল্পনাশক্তি প্রখর হতে পারে, হয়ত লোকের মুখ থেকে অনেক জেনেছেন, কিন্তু শুধু এরই সাহায্যে জীবনের বিচিত্র লীলা এমন জীবন্ত করে তোলা যায় না।[১৩৯]

আনুমানিক ১৫৬৬ বিক্রমাব্দে সূরদাস বল্লভাচার্যের সংস্পর্শে আসেন। তার পূর্বেই নানা সাধু-সন্ন্যাসীর সাহচর্যের ফলে তাঁর মনে ঈশ্বরাসক্তি গভীর হয়েছিল। তাছাড়া, স্বরচিত ভক্তিগীতি যখন তিনি গাইতেন তখন লোকে মুগ্ধ হয়ে তা শুনত। মনে হয় তাঁর সংগীত-প্রতিভা শুধু সহজাত নয়, তিনি হয়ত গুরুর কাছে সংগীতের চর্চা করেছেন।[১৪০]

প্রথম সাক্ষাতের পর বল্লভাচার্যের অনুরোধে সূরদাস তাঁকে বিনয়পদের কয়েকটি গান শুনিয়েছিলেন। এ থেকে স্বভাবতই মনে হয়, সূরদাস ছিলেন দাস্যভাবের উপাসক। বল্লভাচার্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণের পর তিনি গুরু-প্রচারিত পুষ্টিমার্গের ভক্ত হন। দাস্যভাবে সম্ভ্রমবোধের জন্য ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে যে দূরত্ব থাকে, পুষ্টি-মার্গে তা নেই। মধুর রসের মতোই পুষ্টিমার্গে ভক্ত ও ভগবানের নিবিড় সম্পর্ক। পুষ্টিমার্গ সম্প্রদায়ের প্রধান উপজীব্য গ্রন্থ ভাগবত। সুতরাং সূরদাকের রচনায় স্বভাবতই ভাগবতের প্রভাব খুব বেশি। কবি নিজেই তা স্বীকার করে বলেছেন—

ব্যাস কহে সুকদেব সো দ্বাদস স্কন্ধ বনাই।
সূরদাস সোঈ কহে পদ ভাষা করি গাই॥[১৪১]

অর্থাৎ, ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্দের কাহিনী যেমন ব্যাস শুকদেবকে শোনালেন, তেমনি আমি দেশীয় ভাষায় সেই কথা গেয়ে শোনাচ্ছি।

কিন্তু তাই বলে একথা ধারণা করা ভুল যে, সুরদাস শুধুই ভাগবতানুসারী পদ রচনা করেছেন। তাঁর রচনায় যথেষ্ট মৌলিকত্ব না থাকলে তিনি কখনোই এরূপ বিপুল খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারতেন না।

সুরদাসের রচিত মুখ্যগ্রন্থ তিনটি: সুর-সাগর, সুর সারাবলী, এবং সাহিত্য-লহরী। তাছাড়া প্রাণপ্যারী, নল দময়ন্তী, রামজন্ম, একাদশী মাহাত্ম্য প্রভৃতি গ্রন্থ সুরদাস নামাঙ্কিত হলেও এগুলি যে প্রসিদ্ধ ভক্ত কবি সুরদাসের রচনা, এমন কোনো নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় না। যদি সত্যি তাঁর রচনাই হয়, তবু এদের বিষয়বস্তু আমাদের আলোচনার বহির্ভূত।

সুর সাগরই সুরদাসের প্রামাণিক পদসংকলন। চৌরাসী বার্তা থেকে জানা যায়, সুরদাসের জীবিতকালেই সুরসাগর সংকলিত হয়। বারটি স্কন্ধে রাধাকৃষ্ণের লীলা বিষয়ক পদগুলি এই গ্রন্থে বিন্যস্ত করা হয়েছে। সুর সাগরের পদগুলি নাগলীলা, গোবর্ধনলীলা, সুরপচ্চীসী, ভ্রমরগীত, দানলীলা, মানলীলা প্রভৃতি পৃথক পুঁথি হিসাবেও পাওয়া যায়।

সুরসারাবলী সুরসাগরের সংক্ষিপ্ত রূপ। সাহিত্যলহরীর পদগুলি ভিন্ন গোত্রের। এগুলি দুরূহ প্রহেলিকা পদ। হিন্দীতে বলা হয় 'উলটবাসিয়া' বা 'দৃষ্টিকূট' পদ। অর্থাৎ, আপাতদৃষ্টিতে যে অর্থ প্রতিভাত হয় তার অন্তরালে থাকে কোনো গূঢ় অর্থ। এইসব পদেও রাধাকৃষ্ণের লীলাকাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এই রীতিতে তুলসীদাস, কবীর এবং আরও অনেক হিন্দী কবি পদ রচনা করেছেন। সুরসাগরেও দৃষ্টিকূট পদের কিছু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।[১৪২]

পূর্বেই বলা হয়েছে, সুরদাস ছিলেন দাস্যভাবের সাধক। প্রথম সাক্ষাতের সময় তিনি বল্লভাচার্যকে স্বরচিত বিনয়পদের এই গানটি গেয়ে শোনান: "প্রভু হোঁ সব পতিতন কো টীকো।" অর্থাৎ, পতিতদের মধ্যে আমি সবচেয়ে পতিত। গান শুনে বল্লভাচার্য বলেন— "জো সুর হৈব কৈঁ এসো ঘিঘিয়াত কাহে কো হৈ।" যিনি সূর্য [সুর] তিনি কেন বিলাপ করছেন। এর অর্থ এই নয় যে, বল্লভাচার্য দাস্যভাবকে স্বীকৃতি দেননি। তাঁর মতে সাধকের যাত্রাপথে দাস্যভাবে ভাবিত হওয়া প্রথম ধাপ, শেষ লক্ষ্য নয়। দাস্যভক্তি অহংকার বিনষ্ট করে, সাধককে মহত্তর সাধনার পথে এগিয়ে দেয়। এই পথ ধরেই তিনি সর্বোত্তম মধুরভাবে উপনীত হতে সক্ষম হন। বল্লভাচার্য তাই নির্দেশ দিলেন, কৃষ্ণলীলার সকল পর্যায় নিয়ে পদ রচনা করতে। শুধু দাস্যভাব নিয়ে থাকলে সাধনা পূর্ণ হবে না।

বল্লভাচার্য ও তাঁর সম্প্রদায় ছিলেন ভক্তিবাদের পুষ্টিমার্গে বিশ্বাসী। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ডঃ ভাণ্ডারকর পুষ্টিভক্তির চারটি স্তর নির্দেশ করেছেন: প্রবাহ-পুষ্টিভক্তি, মর্যাদা-পুষ্টিভক্তি, পুষ্টি-পুষ্টিভক্তি ও শুদ্ধ-পুষ্টি ভক্তি। সুরদাস ছিলেন চতুর্থ পর্যায়ের সাধক। এই পর্যায় হল: "The

fourth is of those who through more love devote themselves to the singing and praising of God as if it were a haunting passion."[১৪৩]

বল্লভাচার্য সাধক-জীবনের প্রথম ভাগে ছিলেন বালগোপালের একনিষ্ঠ উপাসক। শেষ জীবনে তিনি মধুররসে ভাবিত হয়েছিলেন। সুরদাসও বালগোপালকে অবলম্বন করে যেমন বাৎসল্যরসের পদ লিখেছেন, তেমনি রাধা-কৃষ্ণলীলার মধুর রসাশ্রিত পদও রচনা করেছেন। এই উভয় বর্গের পদাবলীতেই তাঁর কবি প্রতিভার উজ্জ্বল বিকাশ ঘটেছে। তাঁর কাব্য সাধনার এই দুটি পর্ব পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। সুরদাসের কৃষ্ণলীলার বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি কৃষ্ণের জীবনের ধারাবাহিক বর্ণনা দিয়েছেন। জন্ম থেকে যৌবন এবং মথুরা গমন পর্যন্ত দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনাও তাঁর পদাবলীতে অতি নিপুণভাবে বর্ণিত হয়েছে। সুর সাহিত্যে কৃষ্ণ শুধু 'পতিত পাবন' নন, কখনও তিনি শিশু, সখা, আবার তিনিই কখনও "চিত্ত চোর-মদন মোহন।" সুরদাস একদিকে যেমন কৃষ্ণের একটি সামগ্রিক রূপ উপস্থিত করেছেন, তেমনি অন্যদিকে কৃষ্ণ দেবতার আসন থেকে নেমে এসেছেন পৃথিবীর লৌকিক পরিবেশে। আমাদের বক্তব্য প্রাঞ্জল করে প্রকাশ করেছেন একজন সমালোচক। তিনি বলেছেন— "সুর সাগর মেঁ কৃষ্ণ জন্ম সে লেকর শ্রীকৃষ্ণ কে মথুরা জানে তক কী কথা অত্যন্ত বিস্তার সে ফুটবল পদোঁ মেঁ গাঈ গঈ হৈ। ভিন্ন ভিন্ন লীলাওঁ কে প্রসংগ কো লেকর সচ্চে রসমগ্ন কবি নে অত্যন্ত মধুর ঔর মনোহর পদোঁ কী ঝড়ী সী বাঁধ দী হৈ।"[১৪৪] অর্থাৎ, সুর-সাগর গ্রন্থে কৃষ্ণের জন্ম থেকে মথুরা যাত্রা পর্যন্ত কাহিনী ছোট ছোট পদে কীর্তিত হয়েছে ; ভিন্ন ভিন্ন লীলার প্রসংগ নিয়েও রসমগ্ন কবি সুন্দর ও মনোরম কবিতার ঝাড় বেঁধে দিয়েছেন।

সুরদাসের মধুররসের পদ আস্বাদন করবার জন্য তাঁর রাধার দুটি বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করা প্রয়োজন। প্রথমত, শিশুকাল থেকেই রাধা কৃষ্ণের খেলার সঙ্গিনী, তিনি কৃষ্ণের শুধু যৌবন-সঙ্গিনী নন। রাধা নন্দের বাড়ী এসে কখনও পুতুল খেলেন, কখনও বা কানামাছি। কৃষ্ণ যশোদার কাছে নালিশ করেন, রাধা তাঁর বাঁশী চুরি করে নেবে। আবার রাধা তাঁর মা'র কাছে অভিযোগ করেন যে, কৃষ্ণ ধাক্কা দিয়ে তাঁর দই ফেলে দিয়েছেন। রাধা-কৃষ্ণের এই বাল্যলীলার ছবি, সুরদাসের পূর্বে কেউ আঁকেন নি। পরবর্তীকালেও এমন উজ্জ্বল ছবি কোথাও পাওয়া যায় না। হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী যথার্থই বলেছেন : "বিদ্যাপতি কী রাধা ঔর চন্ডীদাসকী রাধা ইসকে পহলে নহী দিখাঈ দেতী। বাল-কেলী কী বর্ণনা মেঁ সুরদাস অকেলে হৈঁ।"[১৪৫] অর্থাৎ, বিদ্যাপতি-চন্ডীদাস রাধার বাল্যলীলা দেখান নি ; সুরদাস এ বিষয়ে অনন্য। তাঁর রাধা-কৃষ্ণের বাল্যের প্রীতি ধীরে ধীরে প্রেমে পরিণত হয়েছে দানলীলা, জলকেলি ইত্যাদির মধ্য দিয়ে।

দ্বিতীয়ত, বল্লভাচার্য সম্প্রদায় স্বকীয়া নায়িকায় বিশ্বাসী। গৌড়ীয় মতে, পরকীয়া ভজনে আকর্ষণের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। অষ্টছাপের কবিরা এবং কৃষ্ণকাব্যের অন্যান্য কবিরাও স্বকীয়াবাদের সমর্থক। এই সম্বন্ধে ডঃ দ্বিবেদী বলেন : "রাধা ঔর কৃষ্ণ

সম্বন্ধী প্রেমকে গানে তো ইস্ প্রদেশ মে' চল পড়ে, পরন্তু রাধা কৃষ্ণ কী রাণী হী সমঝী গঈ, সূরদাস নে রাধা ঔর কৃষ্ণ কা বিবাহ বড়ী ধূমধাম সে করায়া হৈ।"[১৪৬] অর্থাৎ, রাধা-কৃষ্ণের প্রেমগীতি এদেশেও প্রচলিত হল। কিন্তু রাধাকে কৃষ্ণের রাণী হিসেবেই মনে করা হয়। সূরদাস খুব ধুমধামের সঙ্গে রাধা-কৃষ্ণের বিয়ে দিয়েছেন।

আরেকজন সমালোচক বলেছেন যে, রাসলীলার পূর্বে সূরদাস রাধা-কৃষ্ণের বিবাহ দিয়ে রাধা যে পরকীয়া নায়িকা নন, স্বকীয়া— তার প্রমাণ দিলেন।[১৪৭]

সূরদাস যে বিবাহ দিয়েছেন তা গন্ধর্ব বিবাহ। তিনি বলেছেন—

জাকৌ ব্যাস বরনত রাস।
হৈ গন্ধর্ব বিবাহ চিত দে, সুনৌ বিবিধ বিলাস।
কিয়ৌ প্রথম কুমারিকনি ব্রত, ধরি হৃদয় বিশ্বাস।
নন্দ-সুত পতি দেহ দেবী, পূজি মন কী আস॥[১৪৮]

অর্থাৎ, ব্যাসদেব যে উৎসবকে রাস বলে বর্ণনা করেছেন, প্রকৃতপক্ষে তা হল গন্ধর্ব বিবাহ। রাধা হৃদয়ে বিশ্বাস নিয়ে প্রথম করলেন কুমারী ব্রত এবং পরে "নন্দসুতকে আমি যেন পতিরূপে লাভ করি'— এই ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্য দেবী পূজা করলেন।

এই বিবাহ সম্বন্ধে সূরদাসের মধ্যে যে সংযমের পরিচয় পাওয়া যায়, নন্দদাস ও পরমানন্দদাসের রচনায় তা নেই। তাঁরা সাড়ম্বরে রাধা-কৃষ্ণের বিবাহ দিয়েছেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব কবিদের মতো পরকীয়াতত্ত্বে বিশ্বাসী না হলেও কৃষ্ণকাব্যের হিন্দী কবিরা তাঁদের মতোই মনে করতেন, বিরহে প্রেমের চরম স্ফূর্তি। সূরদাসের ভ্রমরগীত বা উদ্ধব-সংবাদের পদগুলিতে রাধার বিরহ-বেদনার গভীরতা মর্মস্পর্শী ভাবে রূপায়িত হয়েছে। ভাগবতেও ভ্রমরগীত আছে।[১৪৯] সূরদাস ভাগবতের রীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হলেও তাঁর রচনায় মৌলিকত্বের অভাব নেই। হিন্দী সাহিত্যে ভ্রমরগীতের প্রথম প্রবর্তক সূরদাস। অন্যান্য হিন্দী কবিরা এই ক্ষেত্রে তাঁকেই অনুসরণ করেছেন। ভ্রমরগীতগুলি সূরদাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। একটিমাত্র বাক্যে এদের মূল্য নির্ধারণ করেছেন দেবেন্দ্রনাথ শর্মা: "ভ্রমরগীত সূর-সাহিত্য কা প্রাণ হৈ; 'সাগর' কী উৎকৃষ্টতম রত্নরাশি হৈ।"[১৫০] অর্থাৎ, ভ্রমরগীত সূর-সাহিত্যের প্রাণ, সাগরের [সূর সাগরের] উৎকৃষ্ট রত্নরাজি।

ভ্রমরগীত ঠিক মাথুর পদাবলীর সমার্থক নয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্যে মাথুর পর্যায়ের পদাবলী প্রধানত রাধা ও কৃষ্ণের বিচ্ছেদ-বেদনা অবলম্বনে রচিত। ভ্রমর-গীতে এই বেদনা ব্যাপকতর। রাধা, গোপনারী এবং সকল বৃন্দাবনবাসী কৃষ্ণের বিচ্ছেদে কাতর। কৃষ্ণ মথুরায় আছেন, নানা কাজে ব্যস্ত। সখা উদ্ধবকে বৃন্দাবনে পাঠালেন তাঁর খবর জানতে এবং নন্দ-যশোদা-রাধা ও অন্যান্য পরিচিতজনের সংবাদ সংগ্রহ করে আনতে। উদ্ধব যখন কথা বলছেন, তখন সেখানে গুনগুন করে গান করতে করতে এক ভ্রমর উড়ে এল। গোপিনীরা তাকে প্রশ্ন করল, তোমাকে কি কুব্জা পাঠিয়েছে? তুমি কি শ্যামসুন্দরের খবর জান?[১৫১]

গোপিনীরা বক্রোক্তির সাহায্যে ভ্রমরকে লক্ষ্য করে প্রকৃতপক্ষে উদ্ধবকেই শোনালেন,

কৃষ্ণবিহীন জীবনের নানা বেদনার কথা। উদ্ধবের ব্রজধামে আগমন এবং মথুরা প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত সকল ঘটনা ও আলোচনা প্রায় সাড়ে-সাতশ' পদে বর্ণনা করা হয়েছে। এইসব পদাবলী ভ্রমরগীতি হিসাবে চিহ্নিত।

উদ্ধব মথুরা ফিরে যাচ্ছেন; গোপিনীরা নিজেদের কত কথা কৃষ্ণকে বলে পাঠালেন। রাধার চোখে জল, ভালো করে কথা বলতে পারছেন না। শেষ পর্যন্ত শুধু বলতে পারলেন—

ইতনী বিনতী সুনহু হমারী, বারক হু, পতিয়া লিখি দীজৈ।

চরণকমল দরসন নব নবকা, করুণাসিন্ধু জগত জস লীজৈ॥[১৫১]

অর্থাৎ, আমার একান্ত মিনতি শোন, কৃষ্ণকে চিঠি লিখে দাও, একবার অন্তত তাঁর চরণকমল দর্শন দিয়ে জগতে করুণাসিন্ধু বলে তিনি যশস্বী হোন।

এখানে রাধা কৃষ্ণের দয়িতা নন, একান্তরূপে ভক্তা কেলি-কলাবতী-বিরহিনী রাধাকে এখানে খুঁজে পাওয়া যায় না।

কিন্তু সে যাই হোক, আবেগে রুদ্ধকণ্ঠ্য রাধাকে কবি উপস্থিত করায় পাঠক বিরহিনীর মর্মবেদনা গভীরভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হন।

অন্যত্র বিরহবিধুরা রাধার মনের কথা বলেছেন গোপিনীরা—

বিনু হরি ক্যোঁ রাখোঁ মন ধীর।

এক বের হরিদরস দিখাবহু, সুন্দর স্যাম সরীর॥

তুম জু দয়াল দয়ানিধি কহিয়ত, জানত হোঁ পরপীর।

বিছুরেঁ প্রাণ, নাথ ব্রজ আবৈঁ, কটিত হম কত জদুবীর॥

মত অপজস আনো সির অপনৈঁ, কঠিন মদন কী পীর।

'সূরদাস' প্রভু মিলন কহত হে, রবিতনয়া কে তীর॥[১৫৩]

—হে উদ্ধব, হরি বিনা মন কি করে স্থির রাখি। একবার তাঁর শ্যামল-সুন্দর মূর্তি নিয়ে তিনি দেখা দিয়ে যান। হে কৃষ্ণ, তুমি দয়াল, দয়ানিধি, সাধুসন্ত সকলেই একথা বলে থাকেন। বিরহে আমাদেব প্রাণ যায়, হে প্রিয়, তুমি একবার এসো, হায়, নিজের মাথায় অপবাদ নিও না, আমরা যে মদন-পীড়িত॥ সূরদাস বলেন, মিলন হবে।

ভ্রমরগীতের বহিভূর্ত কিছু সুন্দর বিরহের পদ লিখেছেন সূরদাস। এমনি একটি পদ—

নিসি দিন বরষত নৈন হমারে।

সদা রহতি বরষা রিতু হম পর, জব তৈঁ স্যাম সিধারে॥

দৃগ অঞ্জন ন রহত নিসি বাসর, কর কপোল ভএ কারে।

কণ্চুবিপট সুখত নহিঁ কবহুঁ, উর বিচ বহত পনারে॥

আঁসু সলিল সবৈ ভই কায়া, পল ন জাত রিস টারে।

'সূরদাস' প্রভু য়হৈ পরেখো, গোকুল কাহেঁ বিসারে॥"[১৫৪]

অর্থাৎ, আমার গৃহ থেকে যেদিন শ্যাম চলে গেছেন সেদিন থেকে ব্রজধামে একমাত্র

বর্ষা ঋতুই চলছে। আমাদের চোখে দিনরাত অবিশ্রাম বর্ষা ঝরছে। চোখে কাজল থাকে না, চোখের জলে সেই কাজল ধুয়ে যায় এবং হাত ও গাল কালিমালিপ্ত হয়। বস্ত্রের আঁচল শুকোবার অবকাশ হয় না, বুক ভিজে যায়। সমস্ত দেহ চোখের জলে সিক্ত। সময় কাটে না, বিক্ষুব্ধ মন শান্ত হয় না। সুরদাস বলেন প্রভুর এটি পরীক্ষা ; কিন্তু হে কৃষ্ণ, তুমি কেন গোকুলকে ভুলে আছ ?

সুরদাসের রাধা প্রগল্‌ভা নন, নিজের হৃদয় উন্মুক্ত করবার ভাষা তাঁর নেই। তাঁর এই মূক বেদনা আমাদের স্পর্শ করে। অবশ্য ব্রজগোপিনীদের আর্তির মধ্য দিয়ে কবি রাধার বিরহ-যন্ত্রণা আংশিক প্রকাশ করেছেন।

সুরদাসের কবি-সত্তার সামগ্রিক আভাস দেবার জন্য তাঁর ভ্রমরগীত এবং মধুররসের পদাবলী সম্বন্ধে সামান্য উল্লেখ করা হল। এবার আমাদের মুখ্য আলোচ্য বিষয় আরম্ভ করা যেতে পারে।

সুরদাস বাৎসল্য অনুভূতির বর্ণনায় অনন্যসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। আপাতদৃষ্টিতে যা তুচ্ছ বলে মনে হয়, তা-ও তিনি উল্লেখ করেছেন বাৎসল্যের পরিবেশকে পূর্ণতা দানের জন্য। মাতা যশোদা, পিতা নন্দ, ব্রজবাসিনী গোপিনীদের,— এমনকি পথযাত্রী পথিকেরও বালগোপালের বাল্যলীলা দেখে যে সহজ স্নেহ উৎপন্ন হয়, তার মনোরম চিত্র সুরদাস সার্থকভাবে রূপায়িত করেছেন। তাঁর বাৎসল্য একমাত্র নন্দ-যশোদাকে কেন্দ্র করেই বিবর্তিত হয়নি।

বাৎসল্যের সর্বব্যাপী প্রভাব থেকে কঠোর-হৃদয় কংসও যে মুক্ত নন, সুরদাস তা-ও দেখিয়েছেন। প্রতিজ্ঞানুসারে বসুদেব তাঁর সদ্যোজাত প্রথম পুত্রকে কংসের নিকট নিয়ে যান—

পহিলৌ পুত্র দেবকী জায়ৌ, লৈ বসুদেব দিখায়ৌ।
বালক দেখি কংস হঁসি দীন্যৌ, সব অপরাধ ক্ষমায়ৌ ॥[১৫৫]

অর্থাৎ, দেবকীর পুত্রকে দেখে কংস হাসলেন এবং [স্নেহবশত] তার সব অপরাধ ক্ষমা করলেন।

কিন্তু কংসের এই মমতাবোধ ক্ষণস্থায়ী। কিছুক্ষণ পরে নিজের স্বার্থের কথা চিন্তা করে পুত্রটিকে হত্যা করেন। এর পর থেকে একে একে সব পুত্রই প্রাণ হারাল কংসের হাতে। অষ্টম গর্ভের পুত্র কৃষ্ণ যাতে রক্ষা পান, সেজন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন দেবকী। স্বামীকে তিনি বললেন, এমন কিছু উপায় কর যাতে এই সন্তানটিকে রক্ষা করা যায়। কংসকে কথায় ভোলানো যাবে না। তাই বুদ্ধি, বল, ছল, কৌশল দিয়ে একে অন্যত্র সরিয়ে ফেল। আমরা এমন ভাগ্য করিনি যে সন্তানকে কাছে রেখে নিত্য স্নেহরস পান করব।[১৫৬]

বৃন্দাবনে নিরাপদ আশ্রয়ে কৃষ্ণকে রেখে আসবার জন্য বসুদেব যখন প্রস্তুত, তখন দেবকী কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। পুত্রের প্রাণের আশঙ্কায় তিনি যেমন ব্যাকুল, তেমনি আবার পুত্রের বিচ্ছেদ ভাবনায়ও বেদনাক্লিষ্ট। দেবকী বিলাপ করে স্বামীকে বলছেন, তুমি কেন কংসের হাত থেকে আমাকে সেদিন রক্ষা করেছিলে ? বিবাহের

দিনই কংস কেন আমাকে হত্যা করল না? এমন ছেলের বিচ্ছেদে মা কেমন করে বাঁচে?[১৫৭]

নন্দের গৃহে কৃষ্ণকে রেখে এলেন বসুদেব। বৃন্দাবনে সাড়া পড়ে গেল, যশোদার ছেলে হয়েছে। সমগ্র জনপদ উৎসবমুখর। কত লোক ছুটে এলো কৃষ্ণকে দেখতে। কোনো গোপিনী এসে বলছে, যশোদা, গোপালকে একটু আমার কোলে দাও; আমি ওঁর কমলমুখ একবার ভালো করে দেখে নিই, তারপর তুমি ছেলেকে কোলে নিও।[১৫৮]

নন্দ কর্তৃক আয়োজিত পুত্রোৎসবে দূর-দূরান্তর থেকে কত লোক দান গ্রহণ করতে এসেছে। তারা কৃষ্ণের অনুপম মূর্তি দেখে মুগ্ধ। কিছু লোক কৃষ্ণকে একবার দেখে ফিরে গেল; আবার, অনেকেই কৃষ্ণকে নিত্য দেখবার সুযোগ পাবার জন্য নন্দের গৃহদ্বারে পড়ে থাকতে চাইছে। গোবর্দ্ধনবাসী এমনি একজন নিজের মনোবাসনা প্রকাশ করে বলল—

দীজৈ মোহি কৃপা করি সোঈ, জো হৌ আয়ো মাঁগন।
জসুমতি-সুত অপনে পাইনি চলি, খেলত আবে আঁগন।
জব হঁসি কৈ মোহন কছু বোলে, তিহি সুনি কৈ ঘর জাউঁ॥[১৫৯]

অর্থাৎ, কৃপা করে আমার প্রার্থনা পূর্ণ করুন। যশোদার পুত্র যখন খেলতে খেলতে আঙিনায় আসবেন, কৃষ্ণ যখন হেসে কিছু বলবেন, তা দেখে ও শুনে আমি ঘরে ফিরে যাব।

একদিন দোলনায় শুয়ে শুয়ে খেলতে খেলতে শিশু কৃষ্ণ উপুড় হয়ে পড়লেন। দৃশ্যটি অতি সাধারণ। এই অতি সাধারণ দৃশ্যও কিন্তু মায়ের অন্তরে অপূর্ব আনন্দ দেয়। ভক্ত কবি সুরদাস এই তুচ্ছ ছবিটিও অবহেলা করেন নি। তিনি যশোদার আনন্দকে বর্ণনা করে বলেছেন—

মহরি মুদিত উলটাই কৈ মুখ চুমন লাগী।
চিরজীবৌ মেরো লাড়িলো, মৈঁ ভঈ সভাগী॥
এক পাখ এয়-মাস কো মেরো ভয়ো কহ্নাঈ।
পটকি রাল উলটো পর্‌য়ো, মৈঁ করৌ বধাঈ॥[১৬০]

—যশোদা প্রসন্ন হয়ে শিশু কৃষ্ণকে উল্টে নিয়ে মুখ-চুম্বন করতে লাগলেন। বললেন —"আমার আদরের বাছা, তুমি দীর্ঘজীবী হও। আমি সৌভাগ্যবতী। আমার কানাই আজ সাড়ে-তিন মাসের হল, হাঁটুতে ভর দিয়ে উল্টে গেছে। আমি (ওর) কল্যাণ কামনা করি।"

কয়েকমাস পর দোলনায় দুলতে দুলতে একদিন শিশু কৃষ্ণ মাটিতে পড়ে গিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। যশোদা আকুল হয়ে ছুটে এলেন। তাড়াতাড়ি কৃষ্ণকে কোলে তুলে গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করে শান্ত করলেন।

কখনো আবার যশোদা শিশু কৃষ্ণকে ঘুম পাড়াবার জন্য দোলনা দুলিয়ে আবোল-তাবোল গান করেন—

জশোদা হরি পালনৈঁ ঝুলাবৈ।

হলরাবৈ, দুলরাই মল্‌হাবৈ, জোই-সোই কছু গাবৈ ॥
মেরে লাল কোঁ আউ নিঁদরিয়া, কাহেঁ ন আনি সুবাবৈ।
তু কাহেঁ নহি বেগহি আবৈ, তোকোঁ কান্হ বুলাবৈ।[১৬২]

অর্থাৎ, যশোদা কৃষ্ণকে দোলনায় দোলাচ্ছেন। কখনও দোলা দিচ্ছেন, কখনও তিনি আদর করতে করতে মুখে নানারকম শব্দ করছেন। আর যা মনে আসছে তা-ই গেয়ে চলেছেন : ঘুম, তুই আমার বাছার কাছে আয়। তুই কেন ওকে ঘুম পাড়াচ্ছিস না! তুই কেন তাড়াতাড়ি আসিস না? তোকে কানাই ডাকছে।

ঘুমপাড়ানী গান শুনে কৃষ্ণ ঘুমের আবেগে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে চোখ বুঁজে থাকেন। কৃষ্ণ ঘুমিয়ে পড়েছেন ভেবে যশোদা গান থামিয়ে সকলকে ইশারায় চুপ করতে বলেন। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে কৃষ্ণ জেগে ওঠেন, যশোদা আবার সুর করে গাইতে থাকেন—

কবহুঁ পলক হরি মুঁদি লেত হৈঁ কবহুঁ অধর ফরকাবৈ।
সোবত জানি মৌন হ্বৈ কৈ রহি, করি-করি সৈন বতাবৈ।
ইহিঁ অন্তর অকুলাই উঠে হরি, জসুমতি মধুরৈঁ গাবৈ।

—কৃষ্ণ আর একটু বড় হয়েছেন, মুখে দু'একটি অস্ফুট কথা শোনা যায়। কখনো যশোদার কোলে শুয়ে অর্থহীন শব্দ করেন ; কখনও বা খিলখিল করে হাসেন।

অবোধ শিশুর এইসব শৈশবলীলা দেখে যশোদার হৃদয় পুত্রস্নেহে আপ্লুত হয়ে যায়—

নিরখি-নিরখি মুখ কহতি লাল সোঁ, মো নিধনী কে ধনিয়াঁ।[১৬৩]

বারবার ছেলের মুখের দিকে চেয়ে যশোদা বলেন – বাছা, তুই আমার কাঙালিনীর ধন।

কৃষ্ণকে নিয়ে মায়ের মনে নানা ইচ্ছা জেগে ওঠে—

নন্দ-ঘরনি আনন্দ ভরী, সুত স্যাম খিলাবে।
কবহিঁ ঘুটুরুবনি চলহিঁগে, কহি, বিধিহিঁ মনাবে॥
কবহিঁ দঁতুলি দ্বৈ দুধ কী দেখোঁ ইন নৈননি।
কবহিঁ কমল-মুখ, বোলিহৈঁ সুনিহোঁ উন বৈননি॥
চূমতি কর-অধর-ভ্রূ লটকতি লট চূমতি।
কহা বরনি সুরজ কহৈ, কহঁ পাবৈ সো মতি॥[১৬৪]

আনন্দ-মগ্ন নন্দরাণী পুত্র শ্যামসুন্দরকে খেলা দিচ্ছেন। তিনি বিধাতার কাছে প্রার্থনা করেন "আমার ছেলেটা কবে হামা দেবে। কবে আমি নিজের চোখে ওর দুধের ছোট দুটি দাঁত দেখব। আর কবে ওর কোমল মুখের কথা শুনব।" স্নেহে আপ্লুত হয়ে তিনি হাত, পা, অধর, এবং ঝুলে পড়া চুল চুম্বন করেন। সুরদাস বলেন, মা'র এই স্নেহ-অভিলাষ প্রকাশ করবার শক্তি তিনি কোথায় পাবেন!

যশোদা শুধু বিধাতার কাছেই প্রার্থনা করেন না, আবেগের বশে তিনি পুত্রের কাছেও তাঁর অভিলাষ ব্যক্ত করেন—

নান্হরিয়া গোপাল লাল, তু বেগি বড়ো কিন হোহি।

ইহি মুখ মধুর বচন হঁসি কৈ ধোঁ', জননি কহে কব মোহি ॥
য়হ লালসা অধিক মেরে জিয় জো জগদীস করাহি ।
মো দেখত কান্হুর ইহি আঁগন, পগ দ্বৈ ধরনি ধরাহি ॥
খেলহি হলধর সঙ্গ, রঙ্গ-রুচি, নৈন নিরখি সুখ পাঊ ।
ছিন-ছিন ছুধিত জানি পয় কারণ, হঁসি-হঁসি নিকট বুলাউঁ ॥
জাকৌ সিব-বিরঞ্চি-সনকাদিক মুনিজন ধ্যান ন পাবৈ ।
সুরদাস জসুমতি তা সুত-হিত, মন অভিলাষ বঢ়াবৈ ॥[১৬৫]

—আমার গোপাল, তুই কেন তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যাসনা ! না জানি কবে তুই হাসি মুখে মধুর কণ্ঠে 'মা' বলে ডাকবি ! আমার অন্তরের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ঈশ্বর কবে পূর্ণ করবেন ! যখন কানাই এই আঙিনায় মাটির উপর নিজের দুটি পা রেখে চলবে, আমি দু'চোখ ভরে দেখে সুখী হব । যেদিন বড় ভাই বলরামের সঙ্গে আনন্দে খেলবে । এবং ক্ষণে ক্ষণে খিদে পেয়েছে ভেবে আমি হেসে ওকে দুধ খাওয়াবার জন্য কাছে ডাকব, সে কী আনন্দ !

অভিলাষের শেষ এখানেই হয় না । বলা যেতে পারে এখন তো অভিলাষের আরম্ভ । দিন দিন তাঁর ইচ্ছা বেড়েই যায় । সুরদাস মায়ের অন্তরের নানা ইচ্ছার ছবিও অপূর্বভাবে তুলে ধরেছেন—

জসুমতি মন অভিলাষ করৈ ।
কব মেরো লাল ঘুটুরুবনি রেঁগে, কব ধরণী পগদ্বৈ ক ধরৈ ।
কব দ্বৈ দাঁত দুধকে দেখোঁ, কব তোতরৈঁ মুখ বচন ঝরৈ ॥
কব নন্দহি বাবা কহি বোলৈ, কব জননী কহি মোহিঁ রবৈ ।
কব মেরো অঁচরা গহি মোহন জোই-সোই কহি মোসোঁ ঝগরৈ ॥
কব ধোঁ তনক-তনক কছু খৈ হৈ, অপনে কর সোঁ মুখহি ভরৈ ।
কব হঁসি বাত কহেগো মোসোঁ, জা ছবি তৈঁ দুখ দুরি হরৈ ॥[১৬৬]

—যশোদা মনে মনে আকাঙ্ক্ষা করেন, আমার ছেলেটা কবে হামা দেবে, কবে মাটিতে দু'পা রাখবে । কবে আমি ওর দুধের দুটি দাঁত দেখব । কবে ওর মুখের আধো আধো কথা শুনতে পাব । কবে নন্দকে বাবা, আমাকে বারবার মা বলে ডাকবে ! কবে মোহন আমার অঞ্চল ধরে মনে যা আসবে তাই বলে আমার সঙ্গে ঝগড়া করবে ; কবে একটু একটু খাবে, কবে নিজের হাতে মুখে গ্রাস তুলবে ; কবে হেসে আমার সঙ্গে কথা বলবে, আর সেই সৌন্দর্যে আমার সমস্ত দুঃখ দূর হয়ে যাবে !

কিছুদিনের মধ্যেই যশোদার অভিলাষ পূর্ণ হয় । কৃষ্ণ হামা দিতে আরম্ভ করেন ; তারপর ধীরে ধীরে কথা বলতে আরম্ভ করেছেন, কিন্তু কৃষ্ণ কিছুতেই দরজার চৌকাঠ পেরুতে পারেন না । মা তাই দেখেই খুব খুশি ।

চলত দেখি জসুমতি সুখ পাবৈ ।
ঠুমুকি-ঠুমুকি পগ ধরণী রেঁগত, জননী দেখি দিখাবৈ ॥[১৬৭]

—কৃষ্ণকে চলতে দেখে যশোদা আনন্দিত । কৃষ্ণ মাটিতে ঠমকে ঠমকে পা রেখে

চলছেন, আর মাকে নিজের চলা দেখাচ্ছেন।

মাটিতে চলতে শিখে কৃষ্ণ মাটি খেতেও শিখলেন। একদিন অবোধ শিশু নিজে মাটি খেয়ে মাকেও এলেন মাটি খাওয়াতে। মা শিশুর কাণ্ড দেখে একদিন হাসলেন, পরে সমস্ত শরীর ধূলি-মলিন কৃষ্ণকে একটি লাঠি উঁচিয়ে ধমক দিতে শুরু করলেন—

মোহন কাহেঁ ন উগিলৌ মাটী।
বার-বার অনরুচি উপজাৱতি, মহরি হাথ লিএ সাঁটী॥[১৬৮]

—মোহন, মুখ থেকে মাটি ফেলছ না কেন? মাটি খাওয়া যে ঘৃণার কাজ, যশোদা তা কৃষ্ণকে বোঝাতে চাইলেন।

কৃষ্ণের মুখে মাটি আছে কিনা দেখতে গিয়ে যশোদা কৃষ্ণের মুখগহ্বরে বিশ্বরূপ দর্শন করলেন। বহুক্ষণ তিনি অপলকনেত্রে সে দৃশ্য দেখলেন। ভাবলেন আমি মা, আর এ আমার ছেলে! যশোদার আশ্চর্য বোধ হতে লাগল। তিনি নন্দরাজকে গিয়ে সব কথা বললেন।

কিন্তু নন্দ বিশ্বাস করলেন না কৃষ্ণের এই ঐশ্বর্যস্বরূপের কথা।

কহত নন্দ সুমতি সোঁ বাত!
কহা জানি ঐ, কহ তৈঁ দেখ্যৌ, মেরেঁ কান্হ রিসাত।
পাঁচ বরষ কো মেরো কান্হৈয়া, অজরজ তৈরী বাত।
বিনহীঁ কাজ সাঁটি লৈ ধাৱতি, তা পাছেঁ বিললাত,
কুসল রহে বলরাম স্যাম দোউ, খেলত-খাত-অন্হাত।
সুর স্যাম কোঁ কহা লগাৱতি, বালক কোমল-বাত॥[১৬৯]

যশোদার কথা শুনে নন্দরাজ বললেন— কি জানি, আমার কানাইয়ের মধ্যে তুমি কি দেখেছ, আর তাই নিয়ে কানাইয়ের উপর রাগ করছ। পাঁচ বছরের আমার ছোট কানাই, আশ্চর্য তোমার কথা। অকারণে তুমি লাঠি নিয়ে ওদের পেছনে ছুটছ। আমার বলরাম ও শ্যামসুন্দর খেলছে, স্নান করছে, খাচ্ছে, কুশলে আছে। পিতা নন্দ তো তাই চান।

যশোদার অপত্যস্নেহের বর্ণনা সকল ভক্ত বৈষ্ণব কবিই দিয়েছেন। কিন্তু পিতৃস্নেহের এই উদাহরণ সুরদাসের কাব্যের অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য; অন্যান্য কবিদের রচনায় নন্দর বাৎসল্য এরূপ প্রাধান্য লাভ করেনি।

কৃষ্ণকে যশোদা এবার হাত ধরে চলতে শেখাচ্ছেন—

সিখৱতি চলন জসোদা মৈয়া।
অরবরাই কর পানি গহাৱত, জগমগাই ধরণী ধরেপৈয়া॥[১৭০]

—যশোদা [কৃষ্ণকে] চলা শেখাচ্ছেন। কৃষ্ণ টলমল চরণে যখন মাটিতে পা রাখছেন; টলমল করে পড়ে যাবার উপক্রম হলে যশোদা তাঁর হাত ধরে ফেলছেন। এর পর কৃষ্ণের মুখে কথা ফুটল—

কহন লাগে মোনে মৈয়া মৈয়া।
নন্দ মহর সোঁ বাবা বাবা, অরু হলধর সোঁ ভৈয়া॥[১৭১]

—মোহন এখন 'মা' 'মা' বলেন, ব্রজরাজ নন্দকে 'বাবা', 'বাবা' বলেন এবং বলরামকে 'ভৈয়া' বলেন।

কৃষ্ণের এক বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়ায় তাঁর জন্মোৎসব পালনের আয়োজন করা হয়েছে। যশোদা, নন্দ এবং ব্রজের সমস্ত গোপ-গোপীনীরা আনন্দে উৎফুল্ল। কৃষ্ণকে স্নান করাতে গেলে তিনি কান্নাকাটি করছেন। যশোদা মুখে নানা শব্দের ধ্বনি তুলে পুত্রকে ভুলিয়ে সুন্দর পোশাক পরাচ্ছেন। কৃষ্ণকে যশোদা কিভাবে সাজ-সজ্জা করাচ্ছেন তার নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন কবি। এই কাজের মধ্যে কবি যশোদার মাতৃহৃদয়ের আনন্দকে তুলে ধরতেও ভোলেন নি। কৃষ্ণের কর্ণচ্ছেদ উৎসবেও যশোদার মানসিকতাকে সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন সুরদাস। যশোদার মনের দুটি দিকই কবি সুস্পষ্ট করেছেন। পুত্রের কর্ণচ্ছেদ উৎসবের অঙ্গ, তা একদিকে যশোদাকে যেমন উৎসব করেছে, অন্যদিকে কর্ণচ্ছেদের মুহূর্তে পুত্রের শারীরিক যন্ত্রণার ভাবনা তাঁকে পীড়িত করেছে।

একটু বড় হবার পর থেকে কৃষ্ণ মা'র কাছে নানা আবদার করেন। যশোদা মুখে বিরক্তি প্রকাশ করেন, কিন্তু মনে মনে আনন্দ উপভোগ করেন। কিছুতেই স্নান করবেন না কৃষ্ণ; তেলের বাটি নিয়ে যশোদা তাঁর পিছে পিছে ছোটেন। হেরে গিয়ে কৃষ্ণ কেঁদে মাটিতে গড়াগড়ি যান। যশোদা তখন ভয় দেখান, তুমি স্নান করো না,— আমি মরে যাই। শেষ পর্যন্ত অনেক বুঝিয়ে স্নান করিয়ে নন্দের সংগে খেতে বসান। শিশুর প্রথম খাওয়া শেখার চমৎকার বাস্তব বর্ণনা দিয়েছেন সুরদাস—

জেঁবত কান্হ নন্দ ইকঠৌরে।
কছুক খাত লপটাত সোঁউ কর বালকেলি অতি ভোবে॥
বরা কৌর ফেলত মুখ ভীতর, মিরিচ দসন টকটৌরে।
তীছন লগী নৈন ভরি আএ, রোৱত বাহর দৌরে॥
ফুঁকতি বসন রোহিনী ঠাঢ়ী, লিএ লগাই অঁকোরে।
সুর-স্যাম কৌ মধুর কৌর দৈ কৃষ্ণে তাত নিহোরে।[১৭২]

অর্থাৎ, নন্দ এবং কৃষ্ণ এক থালাতে খাচ্ছেন। বালকসুলভ স্বভাবে অবুঝ কৃষ্ণ কিছু খাচ্ছেন এবং কিছু দু'হাতে মাখছেন, কখনো মুখে বড় বড় গ্রাস দিচ্ছেন, খেতে খেতে লঙ্কা চিবানোতে ঝাল লেগেছে। চোখে জল ভরে এল, কাঁদতে কাঁদতে দৌড়ে বাইরে চলে এলেন। রোহিনী মা [তাই দেখে] তাঁকে কোলে তুলে নিলেন এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুখে ফুঁ দিতে লাগলেন। নন্দ তখন শ্যামসুন্দরের মুখে মিষ্টি গ্রাস তুলে দিয়ে তাঁর কান্না থামাচ্ছেন।

অতি পরিচিত ছবি। নিত্য-পরিচিত কিছু বস্তু আছে, যা কখনও পুরাতন বা বিবর্ণ হয় না। মাতৃস্নেহ এবং শিশুর লীলা তেমনি পুরাতন। অথচ চিরনূতন। কবি এই সত্য উপলব্ধি করেছেন। তাই বারবার তাঁর কাব্যে এই সব ছবি ধরা দিয়েছে।

কৃষ্ণের বয়স বাড়লেও ছেলেমানুষী দূর হয়নি। এখনও মায়ের বুকের দুধ খান। যশোদা বুঝিয়ে বলছেন, এবার এ অভ্যাসটা ছাড়। তোমার বন্ধুরা দেখলে হাসবে,

অমন সুন্দর দাঁতে পোকা হবে। কৃষ্ণের কিন্তু এসব কথা মনঃপূত নয়। তিনি দুষ্টুমির হাসি হেসে মায়ের বুকে মুখ লুকান।[১৭৩]

মায়ের দুধ ছেড়ে কি খাবেন কৃষ্ণ? কালো গোরুর দুধ। গোরুর দুধ খেতে কৃষ্ণ নারাজ। তাই যশোদা তাঁকে লোভ দেখাচ্ছেন—

কজরী কৌ পয় পিয়হু লাল, জাসোঁ তেরী বেনি বঢ়ৈ।
জৈসেঁ দেখি ঔর ব্রজ বালক, ত্যোঁ বল বৈস চঢ়ৈ।[১৭৪]

অর্থাৎ, কালো গোরুর দুধ খেলে তোমার বেণী বড় হবে। আর ব্রজবালকদের মতো গায়ে খুব জোর হবে।

মা'র কথা বিশ্বাস করে কৃষ্ণ দুধ খেতে রাজী হলেন। কিন্তু গরম দুধ খেতে গিয়ে জিভ পুড়ল, তিনি কাঁদতে লাগলেন। তখন যশোদা সস্নেহে সান্ত্বনা দিয়ে শান্ত করলেন ছেলেকে।

. যশোদা কৃষ্ণকে কোলে বসিয়ে মুখের দিকে চেয়ে চেয়েই তৃপ্ত নন। ছেলে আপন মনে একা একা কেমন করে খেলা করে, তা তিনি আড়াল থেকে দেখে আনন্দ পেতে প্রয়াসী। কৃষ্ণ ছোট ছোট পা ফেলে উঠোনে নাচেন, গান করেন, দু'হাত তুলে নাম ধরে গোরুদের ডাকছেন, কখনো একটু একটু করে মাখন মুখে দিচ্ছেন, আবার মণিময় স্তম্ভে নিজের ছায়া দেখে অন্য কোনো বালক এসেছে ভেবে তাকে তাড়া করতে ছোটেন। যশোদা আড়াল থেকে এইসব দেখে পুলকিত হন॥

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের সুপরিচিত চাঁদের প্রসঙ্গটি সুরদাস বিস্তৃতরূপেই বিবৃত করেছেন। কৃষ্ণ বায়না ধরেছেন চাঁদ এনে দিতে হবে, তার সঙ্গে খেলা করবেন। যশোদা অনেক বোঝালেন, মিঠাই-মেওয়া দিয়ে ভোলাতে চাইলেন, বললেন, তোমাকে সুন্দর কনে এনে বিয়ে দেব,— কিছুতেই কৃষ্ণের মন ভোলে না, কান্না থামে না। হঠাৎ চাঁদের দিকে চেয়ে নতুন বায়না। বললেন, আমার খিদে পেয়েছে, চাঁদ খাব।[১৭৫] কত ভালো ভালো খাবার এনে সামনে রাখলেন যশোদা। কৃষ্ণ চাঁদ ছাড়া কিছুই খাবেন না বলে কাঁদতে লাগলেন। তখন যশোদা এক বুদ্ধি আঁটলেন। তিনি জল-ভরা একটি পাত্র এনে রাখলেন, তাতে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব পড়ল। সেই প্রতিবিম্ব দেখিয়ে যশোদা কৃষ্ণকে বলছেন—

লৈ লৈ মোহন, চন্দা লৈ।
কমল নৈন বলি জাউঁ সুচিত হ্বৈ, নীচেঁ নৈকুঁ চিতৈ॥
জা কারণ তৈঁ সুনিসুত সুন্দর, কীন্থী ইতী অরৈ।
সোই সুধাকর দেখি কন্হৈয়া ভাজন মাহিঁ পরৈ॥
নভ তৈঁ নিকট জানি রাখ্যৌ হৈ, জল-পুট জতন জুগৈ।
লৈ অগনে কর কাঢ়ি চন্দ কৌঁ জো ভাবৈ সো কৈ॥
গগন-মণ্ডল তৈঁ গহি আন্যৌ হৈ, পঞ্ছী এক পঠৈ।
সূরদাস প্রভু ইতী বাত কৌঁ, কত মেরো লাল হঠৈ॥[১৭৬]

অর্থাৎ, মা বলছেন, মোহন, এবার চাঁদ নাও। তোমার আবদার দেখে একটা পাখিকে

আকাশে পাঠিয়ে চাঁদ ধরে এনে জলে রেখে দিয়েছি। এখন তুমি ওকে নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করো।

কৃষ্ণ কিছুতেই চাঁদ ধরতে পারছেন না। চেষ্টা করে করে তিনি শ্রান্ত। যশোদা পুত্রের অবস্থা দেখে বললেন— "তুব মুখ দেখি ডরত সসি ভারী।"[১৭৭] তোমার মুখ দেখে চাঁদ ভয়ানক ভয় পেয়েছে, তাই সে চোরের মতো পাতালে পালিয়ে গেল।

এ কথায় বালকের মন আত্মগৌরবে পূর্ণ হল। কেউ তাঁকে ভয় করে না, শুধু চাঁদ তাঁর মুখে বীরত্বের ব্যঞ্জনা দেখেই পালিয়েছে। সুতরাং অবুঝ ছেলের মতো কান্না সাজে না তাঁর। সুরদাস যে শিশুর মানসিকতা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন- এই পদটিতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

কৃষ্ণ এখন বন্ধুদের সঙ্গে পথে বেড়াতে বের হন। মাথায় নানা দুষ্টুমি ভরা। সখাদের সঙ্গে ঘরে ঘরে গিয়ে দই, ননী খেয়ে ফেলেন, আবার ভাঁড়গুলি ভেঙে দেন। গোপিনীরা যশোদার কাছে নালিশ করতে এলে তিনি চটে যান। নিজের ঘরে কত খাবার, কৃষ্ণ কেন যাবেন অন্যের বাড়ী চুরি করতে? আর অতটুকু ছেলে কি শিকেয় তোলা খাবারের নাগাল পান? উল্টে তিনি গোপিনীদের তিরস্কার করেন: "হাথ নচাবত আবতি গ্বারিনি, জীভ করৈ কিন থেরী।"[১৭৮] হাত নাচিয়ে, মুখ খিঁচিয়ে সব গোয়ালিনীরা ঝগড়া করতে এসেছে!

প্রথম প্রথম এমনি করেই গোয়ালিনীদের ফিরিয়ে দেওয়া হত। কিন্তু বারবার একই অভিযোগ পেয়ে যশোদা একদিন ক্রুদ্ধ হয়ে লাঠি নিয়ে তাড়া করে কৃষ্ণকে ধরে উদূখলের সঙ্গে বাঁধলেন। তাঁর কোমল হাত কঠোর বন্ধনে পীড়িত হল। কৃষ্ণের বেদনা দেখে গোপিনীরাও বলল, ওকে ছেড়ে দাও; আর কৃষ্ণ তো কাঁদতে কাঁদতে হেঁচকি তুলছেন। তখন যশোদা ছেলের বাঁধন খুলে দিলেন।

এই প্রসঙ্গটি সুরদাস বিস্তৃতভাবে বিবৃত করেছেন। স্বাভাবিকরূপেই ভাগবত পুরাণের ছায়া পড়েছে। তবে, পৌরাণিক পটভূমিকায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে আমাদের অতি পরিচিত একটি দুষ্টু ছেলে আর তার স্নেহান্ধ জননী,— যে মা কেউ ছেলের দোষ বলতে এলে ক্রুদ্ধ হয় এবং কখনো কখনো ছেলেকে ধরে মারে, যেন অভিযোগ-কারীদেরই শাস্তি দিতে।

গোচারণ কুলধর্ম। এখন কৃষ্ণের গোচারণে যাবার বয়স হয়েছে। তিনি নিজেও বাইরে যাবার জন্য উৎসুক। দাদা বলরাম এবং সখাদের সঙ্গে তিনিও গোচারণে যাবেন। যশোদা এ প্রস্তাবে বড়ই উদ্বিগ্ন। বনের মধ্যে কতদূরে চলে যাবেন, বিপদে পড়বেন, যমুনার জলে একা একা স্নান করতে গিয়ে হয়ত ডুবে যাবেন। তাছাড়া, সঙ্গে মণ্ডা-মেঠাই বেঁধে দিলেও ছেলেমানুষ নিজে নিজে কি খেতে পারবেন? হয়ত সারাদিন উপবাসেই কাটবে। তিনি চান, কৃষ্ণ সর্বদা তাঁর চোখের সামনে থাকবেন। তাই তাঁকে নিবৃত্ত করবার জন্য ভয় দেখান—

দূরি খেলন জনি জাহু ললা মেরে, বনমৈ আএ হাউ।[১৭৯]

—বাছা, আজ দূরে খেলতে যেও না, বনে আজ 'হাউ' এসেছে। কৃষ্ণ প্রশ্ন করলেন—

মা, হাউকে কে পাঠিয়েছে ? নিকটে দাঁড়িয়ে বলরাম ভাবছিলেন, যে কৃষ্ণ পাতালে শেষনাগের শয্যায় থাকেন, তাঁকে ভয় দেখিয়ে কি হবে ? বলরামের ভাবনা লৌকিক জগৎ থেকে সুরদাসকে উত্তীর্ণ করল ভক্তির জগতে। ভক্তির জয় হল, কিন্তু লৌকিক জগতের সহজ সুন্দর চিত্রটি গেল হারিয়ে।

একদিন বাড়ী ফিরে কৃষ্ণ যশোদার নিকট অভিযোগ করলেন—

মৈয়া মোহি দাউ বহুত খিঝায়ো।
মোসোঁ কহত মোলকো লীন্থো, তু জসুমতি কব জায়ো !
কহা করোঁ ইহি রিসকে মারে খেলন হোঁ নহিঁ জাত ॥
পুনি-পুনি কহত কোন হৈ মাতা, কো হৈ তেরোঁ তাত।
গোরে নন্দ, জসোদা গোরী, তু কত স্যামল গাত।
চুটকী দৈ-দৈ গ্বাল নচাবত, হঁসত সবৈ মুসুকাত ॥
তু মোহী কোঁ মারণ সীখী, দাউহি কবহু ন খীঝৈ।
মোহন-মুখ রিস কীয়ে বাতেঁ, জসুমতি সুনি-সুনি রীঝৈ।[১৮০]

অর্থাৎ, মা, দাদা [বলরাম] আমাকে খেপায়। বলে তোমাকে কেনা হয়েছে। যশোদা তোমাকে কবে জন্ম দিয়েছেন ? কি বলব। রাগে আমি খেলতে পর্যন্ত পারি না। দাদা বারবার জিজ্ঞাসা করে, তোর মা কে ? বাবা কে ? যশোদা ও নন্দ উভয়েই ফর্সা। তুমি তাঁদের ছেলে হলে গায়ের রঙ শ্যামবর্ণ হল কেন ? গোপ বালকেরা আমাকে ভুলিয়ে তুড়ি দিয়ে নাচায়, পরে তারাই আমাকে দেখে হাসাহাসি করে এবং মুচকে হাসে। তুমি তো শুধু আমাকে মারতে পার ; বলরাম দাদাকে বকুনি পর্যন্ত দাও না।

কৃষ্ণের মুখে এইসব অভিমানের কথা শুনতে যশোদার ভালোই লাগে। কিন্তু কৃষ্ণ যখন দুঃখে কাঁদতে থাকেন তখন যশোদা তাঁকে বুকের উপর টেনে নেন এবং সান্ত্বনা দিয়ে বলেন— "হোঁ মাতা তু পুত।"[১৮১] অর্থাৎ, আমি মা এবং তুমি আমার পুত্র। যশোদার কাছে এর চেয়ে বড় সত্য নেই। আর সেই সত্য কত সংক্ষেপে, কত গভীর ও সুন্দর করে বলেছেন কবি।

বাৎসল্যের পরিবেশে নন্দ-যশোদা-কৃষ্ণ-বলরামের দিন ভালোই কেটে যাচ্ছিল। হঠাৎ এক রাত্রিতে নন্দ স্বপ্ন দেখলেন, হরি কোথায় হারিয়ে গেছেন ; বলরাম ও মোহনকে [কৃষ্ণকে] কেউ কোথাও নিয়ে গেছে। স্বপ্নের কথা ভেবে নন্দ চিন্তিত—

উত নন্দহি সপনো ভয়ো, হরি কহুঁ হিরানে।
বলমোহন কোউ লৈ গয়ো, সুনি কৈ বিলখানে ॥[১৮২]

—নন্দের স্বপ্নের কথা শুনে যশোদা মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। দুঃস্বপ্ন কয়েক দিনের মধ্যেই সত্য হয়ে দেখা দিল। কংসের যজ্ঞশালায় যেতে হবে কৃষ্ণকে, অক্রুর তাঁকে নিতে এসেছেন। যে কংস কৃষ্ণকে জন্মকালেই হত্যা করতে চেয়েছিল, যার নিষ্ঠুর হৃদয় বজ্রের মতো কঠোর, সেই কংসের কাছে পুত্রকে পাঠালে পরিণতি কি হবে, তা ভেবে যশোদা মৃতপ্রায়। এদিকে রোহিণী বলছেন, কানাই-বলাই আমার প্রাণ। তাঁরা

মথুরা চলে গেলে কি নিয়ে বাঁচব? শোকের আবেগে একবার তিনি মাটিতে গড়াগড়ি যান, আবার উঠে বসে চিৎকার করে কাঁদতে থাকেন।[১৮৩] নন্দ বোঝান, কংস কৃষ্ণের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। পুতনাবধ, অঘাসুর বধ প্রভৃতি কাহিনী বর্ণনা করে কৃষ্ণের অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় দিয়ে যশোদাকে নিশ্চিন্ত করতে চাইলেন; যশোদা তাতে খুব আশ্বস্ত হলেন না; অথচ শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যরূপ সহজ লৌকিক শোকের পরিবেশকে লঘু করে দিল।

শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণকে মথুরা যেতেই হল। নন্দ সঙ্গে গেলেন। অভিপ্রায় ছিল কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করে সংগে নিয়ে ফিরে আসবেন। কিন্তু ফিরলেন একা। যশোদা জিজ্ঞাসা করলেন— "কহাঁ রহ্যো মেরো মনমোহন।"[১৮৪] আমার মনোমোহনকে কোথায় রেখে এলে? কানাই-বলাইকে রেখে আসবার জন্য বারবার তিনি ধিক্কার দিতে লাগলেন নন্দকে।

যশোদা সর্বদা উন্মুখ হয়ে আছেন, কখন ফিরবেন কৃষ্ণ! ক্ষণে ক্ষণে ঘর-বাহির করেন। প্রতিবেশিনীরা বলে, শান্ত হও, সময় হলেই ছেলে ফিরে আসবে। কিন্তু কি করে তিনি শান্ত হবেন। যেদিকে চোখ ফেরান, পুত্রের স্মৃতিবিজড়িত চিহ্ন দেখতে পান।

জদ্যপি মন সমুঝাব্রত লোগ।
সূল হোত নবনীত দেখি মেরে, মোহন কে মুখ জোগ॥[১৮৫]

যশোদা বলছেন, লোকে আমাকে প্রবোধ দেয়; কিন্তু মাখন দেখলেই আমার হৃদয় শূলবিদ্ধ হয়; কারণ মাখন কৃষ্ণের বড় প্রিয় ছিল।

এদিকে কৃষ্ণ কংসকে বধ করে মথুরার রাজা হয়েছেন। দেবকী ও বসুদেবকে নিজের মাতা-পিতা হিসাবে চিনেছেন। রাজকার্যে ব্যস্ত। কৃষ্ণের বৃন্দাবনে আসবার সময় নেই। যশোদা সব কথা শুনে উন্মাদিনী।

ব্রজরাণী বলছেন—

হোঁ তৌ মাঈ মথুরা হী পৈ জৈ হোঁ
দাসী হৈব বসুদেব রাই কী, দরসন দেখত রৈহোঁ॥[১৮৬]

—যশোদা বিলাপ করছেন, আর তো কোনো উপায় নেই, আমি মথুরা যাব। সেখানে বসুদেবের বাড়ীতে দাসী হব। তাহলে মোহনকে সারাক্ষণ দেখতে পাব।

ব্রজের রাণী দাসী হতে চান পুত্রস্নেহের আকর্ষণে। তিনি কৃষ্ণকে খবর পাঠালেন—

কহিয়ৌ স্যাম সোঁ সমুঝাই।
য়হ নাতৌ নহিঁ মানত মোহন, মনৌ তুম্হারী ধাই॥
এক বার মাঁখন কে কাজেঁ রাখে মৈঁ অটকাই।
বাকৌ বিলগ ন মানৌ মোহন, লাগেঁ মোহি বলাই॥
বারহিঁ বার য়হৈ লৌ লাগী, গহৈ পথিক কে পাইঁ।
'সরদাস' য়া জননী কৌ জিয়, রাখৌ বদন দিখাই॥[১৮৭]

শ্যামকে বুঝিয়ে বলবে, যদি অন্য কোনো সম্বন্ধ মোহন স্বীকার না করতে চান, তবে অন্তত আমাকে যেন ধাত্রী হিসেবে স্বীকৃতি দেন। একবার মাখন চুরির জন্য বেঁধে রেখেছিলাম, কৃষ্ণের কি এখনো সেকথা মনে রয়েছে? কৃষ্ণের সব অমঙ্গল আমি মাথা পেতে নিচ্ছি, তাঁর মঙ্গল হোক। সুরদাস বলছেন, একবার দেখা দিয়ে জননীর প্রাণরক্ষা কর।

যশোদা কৃষ্ণকে মায়ের মতো পালন করেছেন, প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছেন। অথচ জঠর-জাত সন্তান নয় বলে তাঁর মাতৃত্বের অধিকার নেই। এই মর্মান্তিক বেদনা প্রকাশ করা যায় না। নিজের ছেলে নয়। তার জন্য এত শোক কেন, বলবে সবাই। যশোদা সর্বদা ভাবছেন, তাঁকে ছাড়া কৃষ্ণের না জানি কত অসুবিধা হচ্ছে। কারণ, কৃষ্ণের অভ্যাসের সঙ্গে তিনি পরিচিত। তাঁর ভালোলাগার জিনিস কি, কি তাঁর দরকার এবং কখন তা হাতে তুলে দিতে হবে— এসব তো একমাত্র যশোদাই জানেন। অতি বিনীতভাবে দেবকীকে তিনি বলে পাঠালেন—

> সন্দেসো দেবকী সোঁ কহিয়ো।
> হোঁ তো ধাই তিহারে সুত কী, ময়া করত হী রহিয়ো॥
> জদপি টের তুম জানতি উনকী, তউ মোহিঁ কহি আবৈ।
> প্রাত হোত মেরে লাল লড়েতে, মাখন রোটী ভাবে॥
> তেল উবটনো অরু তাতো জল, তাহি দেখি ভজি জাতে।
> জোই জোই মাঁগত সোই সোই দেতী, ক্রম ক্রম করি কৈন্থাতে॥
> 'সুর' পথিক সুনি মোহিঁ রৈনি দিন, বচয়ো রহত ওর সোচ।
> মেরো বালক লড়েতো মোহন, হৈবহৈ করত সংকোচ॥[১৮৮]

—হে পথিক, দেবকীকে আমার এই কথা বলবে। আমি তোমার ছেলের ধাত্রী। আমি কৃষ্ণ সম্বন্ধে যেকথা জানাচ্ছি তাতে ক্ষুণ্ন হয়ো না। স্নানের জন্য তেল, গরম জল ইত্যাদি দেখলেই কৃষ্ণ পালিয়ে যেতেন। তাঁর সব আবদার পূরণ করে তাঁকে স্নান করাতাম। তুমি তো ওর অভ্যাসগুলির সঙ্গে পরিচিত, তবু একান্ত মমতা-বশেই তাঁর রুচি সম্বন্ধে দু'একটি কথা জানাচ্ছি। সকালে ঘুম থেকে উঠেই আমার বাছার রুটি-মাখন খেতে ভালো লাগে। সুরদাস বলছেন, যশোদার ভাবনা তাঁর চোখের মণি বুঝি সর্বদাই সংকোচ বোধ করছেন নতুন জায়গায়।

দেবকীকে পাঠানো খবর গিয়ে পৌঁছল কৃষ্ণের কাছে। কৃষ্ণ উদ্ধবকে পাঠালেন বৃন্দাবনে। যশোদাকে বলে পাঠালেন, বলরাম দাদাকে নিয়ে আমি শীগ্গিরই যাচ্ছি তোমাকে দেখতে। তুমি শুধুই আমার ধাত্রী বলে নিজের পরিচয় দিয়েছ, এতে আমি বড় বেদনা পেয়েছি। তোমার স্তন্য পান করেছি সেকথা ভুলব কি করে? এখানে অনেক সুখ, তবু এখানে থাকা যায় না। কৃষ্ণ এইসব কথাই বলে পাঠালেন—

> উধো ইতনী কহিয়ো জাই।
> হম আবৈঁগে দোউ ভৈয়া, মৈয়া, জনি অকুলাই॥
> য়াকো বিলগ বহু হম মান্যো, জো কহি পঠয়ো ধাই।

হহ গুণ হমকোঁ কহা বিসরিহৈ, বড়ে কিএ পয় প্যাই ॥
অরু জব মিল্যো নন্দ বাবাসোঁ, তব কহিয়ো সমুঝাই।
তোঁ লোঁ দুখী হোন নহি পারেঁ, ধোরী ধূমরি গাই ॥
জদ্যপি ইহাঁ অনেক ভাঁতি সুখ তদপি রহ্যো নহি জাই।
'সুরদাস' দেখোঁ ব্রজবাসিনি, তব হাঁ হিয়ো সিরাই ॥[১৮৯]

কৃষ্ণ উদ্ধবকে এই বার্তাও যশোদাকে পৌঁছে দিতে বললেন—

নীকৈঁ রহিয়ো জসুমতি মৈয়া
আবৈঁগে দিন চারি পাঁচ মৈঁ, হম হলধর দোউ ভৈয়া ॥
নোঙ্গ, বেঁত, বিষাণ, বাঁসুরী, দ্বার, আবের সবেরৈঁ।
লৈ জনি জাই চুরাই রাধিকা, কছুক খিলোঁনা মেরে ॥
জা দিন তৈঁ হম তুমভেঁ বিছুরে, কৌউ ন কহত কন্হৈয়া।
উঠি ন সবেরে কিয়ৌ কলেউ, সাঁঝ ন চাখী ঘৈয়া ॥
কহিয়ে কহা নন্দ বাবা সোঁ, জিতৌ নিঠুর মন কীন্থৌ।
'সুরদাস' পহুচাঁই মধুপুরী, ফেরি ন সোধো লীন্থৌ ॥[১৯০]

—মা, তুমি ভালো থেকো, আমি ও দাদা চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই যাচ্ছি। তোমাকে ছেড়ে আসার পর থেকে আমাকে কানাই বলে কেউ ডাকেনি। সকালে কোনোদিন জলখাবার খাইনি। আর, বিকেলে দুধ দুইবার সময় দুধের ধারা সরাসরি আমার মুখে পড়ত, এখন তেমনটি আর হয় না। মা, আমার বাঁশীটি সামলে রেখো। আমার দড়ি, বিষাণ এবং ছোট লাঠিটিও সাবধানে রেখো। রাধা যেন চুরি করে না নিয়ে যায়। নন্দ বাবাকে বলো তাঁর এত কঠোর প্রাণ যে, মথুরা পৌঁছে দিয়ে আমাদের আর কোনো খবর নিলেন না।

শুধু বার্তা পেয়ে যশোদার বেদনার উপশম হয় না। তিনি বারবার উদ্ধবকে অনুরোধ জানালেন, একবার যেন কৃষ্ণ এসে দেখা দিয়ে যান। দই, ঘি, বাঁশী প্রভৃতির সঙ্গে যশোদা কৃষ্ণকে পাঠালেন বুকভরা আশীর্বাদ।

কৃষ্ণ তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেন নি। আর আসতে পারেন নি বৃন্দাবনে। শুধু আর একবার দেখা হয়েছিল যশোদার সঙ্গে। সূর্যগ্রহণ উপলক্ষে গোপ-গোপিনীরা এলেন কুরুক্ষেত্রে। নন্দ যশোদাও এলেন পুত্রের সঙ্গে দেখা করতে। বহুজন বেষ্টিত কৃষ্ণকে একান্তে পাবার কোনো সুযোগ ছিল না।

যশোদার দুঃখ মাতৃহৃদয়ের চিরন্তন বেদনার প্রতীকী রূপও বলা যেতে পারে। সংসারের কর্মস্রোত একদিন মায়ের কোল থেকে সন্তানকে টেনে নিয়ে যায়, সে আর কখনো ফেরে এসে মায়ের শূন্য হৃদয় তেমন করে পূর্ণ করতে পারে না।

সুরদাস প্রথম শ্রেণীর বাৎসল্য রসের পদাবলী রচনা করেছেন একথা অনস্বীকার্য। সঙ্গে সঙ্গে তিনি যে যশোদার মাতৃহৃদয় সার্থক উন্মোচনে পারদর্শিতার প্রমাণ দিয়েছেন, তাও স্বীকার করতে হয়। হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী এই প্রসঙ্গে বলেছেন: "কহা জাতা হৈ কি সুরদাস বাল-লীলা বর্ণন করনে মেঁ অদ্বিতীয় হৈঁ; মৈঁ কহুঙ্গা,

সুরদাস মাতৃ-হৃদয়কা চিত্র খীঁচনে মেঁ অপনা সানী নহীঁ রখতে।'[১৯১] অর্থাৎ, বলা যায়, বাল্যলীলা বর্ণনায় সুরদাস অদ্বিতীয় ; আমি বলি, মাতৃহৃদয় চিত্রণে তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।

যশোদার স্নেহ ছিল স্বার্থলেশহীন : "In the love of Yasoda and Nanda for Krishna, parental affection (Vatsulya Bhava), is displayed. This parental love is considered to be Prototype of true and selfless love."[১৯২]

সুরদাস যশোদার বাৎসল্যকে অবশ্যই প্রাধান্য দিয়েছেন কিন্তু একমাত্র তাঁর বাৎসল্যই কবির উপজীব্য নয়। নন্দ, রোহিনী, এবং ব্রজবাসীদের কৃষ্ণের জন্য যে বাৎসল্যবোধ, তার চিত্রও সুরদারের রচনায় পাওয়া যায়। কৃষ্ণের এই সর্বজনপ্রিয়তার মধ্যে তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্বের কিছুটা আভাস পাওয়া যায়।

পূর্বেই বলা হয়েছে, সুরদাস প্রধানত ভাগবত অনুসরণ করে কৃষ্ণেব বাল্যলীলার কাহিনী বর্ণনা করেছেন। কোথাও কোথাও ভাগবতানুসারী কৃষ্ণের ঐশ্বর্যরূপের আবির্ভাব বাৎসল্যের অনুভূতিকে ব্যাহত করেছে সত্য, কিন্তু তা সাময়িক। সুরদাসের রচনাবলীতে লৌকিক ও বাস্তবানুগ বাৎসল্যের অনুভূতি প্রাধান্য লাভ করেছে, কৃষ্ণের ঐশ্বর্যরূপ সরে গেছে পশ্চাতে।

এটা সম্ভব হয়েছে সুরদাসের রচনার গুণে। তিনি তুচ্ছ অথচ বাস্তব ঘটনা দক্ষতায় সঙ্গে চিত্রায়িত করে সৃষ্টি করেছেন ঘরোয়া পরিবেশ। অলৌকিক পরিমণ্ডল থেকে কৃষ্ণ নেমে আসেন আমাদের গৃহে। মা'র স্তন্যপানলোভী, স্নানে অনিচ্ছুক, লংকা চিবিয়ে ক্রন্দনরত বালক আমাদের সুপরিচিত যে কৃষ্ণ যশোদাকে নানা বিচিত্র আবদারে উত্যক্ত করেন, যিনি মথুরা গিয়েও তাঁর ছোট লাঠি ও দড়িটির কথা ভুলতে পারেন না, সেই বালককে আমরা অসীম শক্তিধর ভগবানের রূপভেদ হিসাবে ততটা নয়, যতটা ঘরের ছেলে হিসাবে গ্রহণ করতে উৎসুক।

এইসব বাস্তবানুগ বাৎসল্যরসসিক্ত ঘটনার মধ্য দিয়ে যশোদার মাতৃহৃদয় অশেষ নিপুণতার সঙ্গে উন্মোচন করেছেন সুরদাস। সেই দৃশ্যটি কী সুন্দর! যেখানে কৃষ্ণ একা একা উঠোনে খেলা করছেন, নেচে নেচে বেড়াচ্ছেন আর আড়াল থেকে যশোদা তা দেখে মুগ্ধ হচ্ছেন। সামনে আসছেন না, হয়ত কৃষ্ণ তাঁকে দেখে সংকোচ বোধ করে আপনমনে এই খেলা বন্ধ করবেন। কৃষ্ণের আবদার মেটাতে, তাঁকে স্নান করাতে, খাওয়াতে কত কৌশল অবলম্বন করতে হত যশোদাকে। কখনো বলছেন সুন্দরী বৌ এনে দেব, আবার কখনো লোভ দেখাচ্ছেন, কৃষ্ণ ও বলরামের মধ্যে যে আগে ছুটে এসে খেতে বসবে সে রাজা হবে ; অনিচ্ছুক ছেলেকে দুধ খাওয়াবার জন্য বোঝাচ্ছেন, কালো গোরুর দুধ খেলে গায়ে খুব জোর হয়, আর তাহলে অন্য ছেলেরা কেউ তাঁর সঙ্গে লড়াইয়ে পেরে উঠবে না ; চাঁদ ধরতে পারছেন না বলে কৃষ্ণ যখন কাঁদছেন তখন যশোদা বুঝিয়ে বললেন, কৃষ্ণকে দেখে চাঁদ ভয় পেয়েছে, তাই পালিয়ে গেছে। একথা শুনে কৃষ্ণের মনে আত্মগৌরবের ভাব জেগে উঠল, তিনি শান্ত হলেন। এইসব প্রসঙ্গ

থেকে উপলবধি করা যায়, যশোদার তথা সুরদাসের শিশু-মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে বাস্তব জ্ঞান ছিল।

বাৎসল্যের পদগুলি যে সহজেই শ্রোতা বা পাঠকের মন গভীরভাবে আকৃষ্ট করতে পারে, তার একটি প্রধান কারণ সুরদাসের ভাষার বৈশিষ্ট্য। ব্রজমণ্ডলের লোকমুখে প্রচলিত ভাষাকেই কাব্যরচনার জন্য সুরদাস গ্রহণ করেছিলেন। ব্রজভাষাকে সাহিত্যের আসরে প্রথম মর্যাদা দিলেন তিনিই। প্রথম, কিন্তু তাই বলে ভাব প্রকাশে অপটু নয়। উপমা, অলংকার এবং বাগ্‌বাহুল্যে বিড়ম্বিত নয় তাঁর ভাষা। স্বচ্ছতা ও সাবলীলতাই এ ভাষার শক্তি। পাঠকের মন সরাসরি স্পর্শ করবার যোগ্যতাই এর অনন্যতা।

বাংলা সাহিত্যে সুরদাসের আলোচনায় অন্যতম পথিকৃৎ নলিনীমোহন সান্যালের বক্তব্য দিয়ে এই প্রসঙ্গটি শেষ করা যেতে পারে: "এই অপত্যস্নেহের নানা বৈচিত্র্য সুরদাস এমন তন্ন তন্ন করিয়া এবং এমন মধুরভাবে দেখাইয়াছেন যে উহা অমর হইয়া থাকিবে। যদি তিনি শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা মাত্র লিখিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন, তাহা হইলেও তিনি একজন শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া স্বীকৃত হইতেন।"[১৯৩]

পরমানন্দদাস

অষ্টছাপের আটজন কবির মধ্যে সুরদাসের পরেই পরমানন্দদাসের স্থান। শ্রীব্রজ-ভূষণ শর্মা সম্পাদিত পরমানন্দ-সাগর গ্রন্থের প্রস্তাবনায় ডঃ দীনদয়ালু গুপ্ত পরমানন্দদাস সম্পর্কে বলেছেন— "হিন্দী মেঁ কৃষ্ণভক্তি সে সম্বন্ধিত কাব্য প্রচুর মাত্রা মেঁ উপলব্ধ হে। ...কৃষ্ণভক্ত কবিয়োঁ মেঁ বল্লভ সম্প্রদায় কে 'অষ্টছাপ' আঠ ভক্ত কবি বহুত প্রসিদ্ধ হৈ। বে হেঁ সুরদাস, পরমানন্দদাস, কুম্ভনদাস, কৃষ্ণদাস অধিকারী, নন্দদাস, চতুর্ভুজদাস, ছীতস্বামী ঔর গোবিন্দস্বামী। ...ইন মে ভী সুরদাস ঔর পরমানন্দ দাস অগ্রগণ্য হৈঁ। যে পরমভক্ত পরম দার্শনিক, পরম সংগীতজ্ঞ তথা পরম প্রতিভাসম্পন্ন কবি হৈঁ।[১৯৪] অর্থাৎ হিন্দীতে কৃষ্ণভক্তি সম্বন্ধীয় পদ প্রচুর আছে। কৃষ্ণভক্ত কবিদের মধ্যে বল্লভ সম্প্রদায়ের অষ্ট-ছাপের আটজন ভক্তকবি বিশেষ প্রসিদ্ধ। তাঁরা হলেন সুরদাস, পরমানন্দদাস প্রভৃতি। ...এঁদের মধ্যে সুরদাস এবং পরমানন্দ দাস অগ্রগণ্য। এঁরা পরম ভক্ত, পরম দার্শনিক, পরম সংগীতজ্ঞ এবং প্রতিভাসম্পন্ন কবি।

ডঃ দীনদয়ালু গুপ্তের কথার প্রতিধ্বনি পাওয়া যাবে প্রামাণিক বৈষ্ণব গ্রন্থ শ্রীহরি রায়জীর চৌরাসী বৈষ্ণব কী বার্তাতেও: "বৈষ্ণব তো অনেক শ্রী আচার্য জী কে কৃপাপাত্র হৈঁ পরন্তু সুরদাস ঔর পরমানন্দদাস য়ে দোউ সাগর ভয়ে।[১৯৫] অর্থাৎ, আচার্যের ঘৃণা তো অনেক বৈষ্ণবই পেয়েছেন, কিন্তু সুরদাস ও পরমানন্দ দাস ঘৃণা পেয়ে হলেন সাগর।

অষ্টছাপের অন্যান্য কবিদের মতো পরমানন্দদাসও তাঁর মাতা-পিতা, জন্মের তারিখ ও স্থান এবং কোথায় প্রথম জীবন কেটেছে, ইত্যাদি সম্পর্কে নীরব। তাঁর

রচনা থেকে কবির জীবন সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। তাই অনুমানের উপর নির্ভর করতে হয়। বল্লভ সম্প্রদায়ে একটি মত প্রচলিত আছে যে, পরমানন্দ দাস বল্লভাচার্য অপেক্ষা পনেরো বছরের ছোট ছিলেন এবং তিনি সুরদাসের প্রায় সমবয়সী। বল্লভাচার্যের জন্ম হয় ১৫৩৫ বিক্রমাব্দে। সে হিসাবে পরমানন্দদাসের জন্ম হয় ১৫৫০ বিক্রমাব্দে। চৌরাসী বৈষ্ণবন কী বার্তা অনুসারে কবির জন্মস্থান ফরুখাবাদের অন্তর্গত কনৌজে। এই গ্রন্থ থেকেই জানা যায় কবির মাতা-পিতা দরিদ্র ছিলেন। তাঁর জন্ম দিনে এক বণিক কবির মাতাপিতাকে অনেক দ্রব্য উপঢৌকন দিয়ে যান তাঁরা খুবই আনন্দিত হন এবং তাই নবজাত পুত্রের নাম রাখলেন পরমানন্দ দাস। কবি বাল্যকাল থেকেই জীবন সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন, বিবাহ করেন নি। বল্লভ-সম্প্রদায়ভুক্ত হবার আগে পরমানন্দদাস কীর্তন সমাজে সুপরিচিত ছিলেন তাঁর গানের জন্য। কবির শিক্ষা সম্পর্কেও কিছু জানা যায় না। তবে চৌরাসী বৈষ্ণবন কী বার্তা থেকে এইটুকু স্পষ্ট যে, বাল্যকাল থেকেই তাঁর পদ-রচনা এবং গান গাইবার দক্ষতা ছিল।[১৯৬]

পরমানন্দদাসের দীক্ষা সম্পর্কে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। বলা হয়, একবার মকর-স্নান উপলক্ষ্যে তিনি প্রয়াগে আসেন। সেখানে তিনি স্বপ্নাদেশ পান অড়েল গ্রামে গিয়ে বল্লভাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার। বল্লভাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পর কবি তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা দেখে অভিভূত হন।[১৯৭]

প্রথম সাক্ষাতেই পরমানন্দদাস বল্লভাচার্যকে গুরু হিসাবে বরণ করেন। সংবৎ ১৫৭৬-এ বল্লভাচার্য তাঁকে দীক্ষা দেন। এতদিন কবি মাথুর ইত্যাদি মধুরভাবের পদ রচনা করতেন এবং গাইতেন। বল্লভাচার্যের নির্দেশে তিনি কৃষ্ণের বাল্যলীলার পদ রচনা আরম্ভ করলেন।[১৯৮]

কিছুদিন অড়েল থাকার পর পরমানন্দদাস বল্লভাচার্যের সঙ্গে ব্রজ অভিমুখে যাত্রা করেন। এবং পরবর্তীকালে কবি পদ রচনা এবং মন্দিরে গোবর্ধননাথের সেবা ও কীর্তনগানের মধ্যে দিয়েই জীবন অতিবাহিত করেন। প্রভুদয়াল মীতল পরমানন্দ-দাসের শেষ জীবন প্রসঙ্গে এই মন্তব্য করেছেন।[১৯৯] কবির মৃত্যু সময় সম্পর্কেও কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তবে এইটুকু জানা যায় যে, পরমানন্দদাসের মৃত্যু কুম্ভনদাসের মৃত্যুর পরই হয়। কবি কুম্ভনদাসের মৃত্যু হয় ১৬৩৯ বিক্রমাব্দে; তাই অনুমান করা হয়, পরমানন্দ দাসের মৃত্যু হয় সুরদাস ও কুম্ভনদাসের মৃত্যুর পর ১৬৪০ বিক্রমাব্দের কাছাকাছি কোনো সময়।[২০০]

পরমানন্দদাসের পদগুলি বিচার করলে দেখা যায় কবি মূলতঃ বাৎসল্যভাব, কান্তাভাব ও দাস্যভাবে ভাবিত। ডঃ দীনদয়ালু গুপ্ত মন্তব্য করেছেন:

"পরমানন্দদাসকে কাব্য মেঁ ভগবদ্ প্রেম কে বিবিধ ভাবোঁ সে উদ্ভূত ভক্তি রস কে সাথ উচ্চ কোটি কা কাব্যানন্দ ভী হৈ জো জন-মন কো রস মগ্ন কর দেতা হৈ। উস কাব্য মেঁ বাৎসল্য, দাস্য ঔর মাধুর্য কী অবিরল প্রসন্নকারিণী ধারা প্রবাহিত হৈ। উসমেঁ প্রেম কী বহুরূপিণী অবস্থাওঁ কে মনোরম চিত্র অঙ্কিত হুএ হৈ।"[২০১] অর্থাৎ,

পরমানন্দদাসের কাব্যে ভগবৎ প্রেম উদ্ভূত বিচিত্র ভাব এবং ভক্তির সঙ্গে উচ্চ পর্যায়ের কাব্যানন্দ মিলিত হয়ে জনগণের মন রসমগ্ন করে তোলে। তাঁর কাব্যে বাৎসল্য, দাস্য এবং মাধুর্যের প্রসন্নকারিণী ধারা অবিরল প্রবাহিত। প্রেমের বিচিত্র রূপের মনোরম চিত্রও উদ্ভাসিত হয়েছে তাঁর কাব্যে।

হিন্দী সাহিত্যে বেশ কয়েকটি গ্রন্থ পরমানন্দদাসের নামে প্রচলিত। এ সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে পরমানন্দসাগর প্রামাণিক পদসংগ্রহ। প্রভুদয়াল মীতল স্পষ্টই বলেছেন: 'ইন গ্রন্থো মেঁ কেবল পরমানন্দসাগর হী উনকী স্বতন্ত্র এবং প্রামাণিক রচনা হৈ।"[২০২] অন্য একজন বিশেষজ্ঞও বলেছেন যে, পরমানন্দদাসের যেসব রচনা পাওয়া গিয়েছে তাদের মধ্যে পরমানন্দসাগর সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক।[২০৩]

পরমানন্দদাসের পদগুলির প্রাণবস্তু কৃষ্ণের ব্রজলীলা। কবির ভক্তহৃদয় তন্ময় হয়ে রচনা করেছে কৃষ্ণের বাল্য লীলা, গোপিনীদের আসক্তি, গোপী বিরহ তথা ভ্রমর গীত প্রভৃতি। পরমানন্দদাসের পদের মূল্যায়ন করতে গিয়ে অধ্যাপক বলদেব উপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন: 'অষ্টছাপ মেঁ সূরদাস ঔর পরমানন্দদাস য়ে দো হী সর্বশ্রেষ্ঠ মানে জাতে হৈঁ ক্যোঁ কি ইন দোনোঁ নেহী কৃষ্ণকী সম্পূর্ণ লীলায়োঁ কা গান সব সে অধিক মার্মিক শব্দোঁ মেঁ কিয়া থা।"[২০৪] অর্থাৎ, অষ্টছাপের কবিদের মধ্যে সূরদাস এবং পরমানন্দদাস উভয়কে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করা হয় কারণ, এঁরা অপূর্ব হৃদয়গ্রাহী কাব্যে কৃষ্ণের সম্পূর্ণ লীলাগান করেছেন।

সূরদাসের মতো পরমানন্দদাসও বাল্য-প্রীতি থেকে আরম্ভ করে যৌবনাবস্থার প্রণয় পর্যন্ত রাধাকৃষ্ণের প্রেমের বিচিত্র ছবি এঁকেছেন। শিশু কৃষ্ণ ও শিশু রাধা পরস্পরের খেলার সঙ্গী, কৃষ্ণ রাধাকে বলেন— 'রাধে, ইহ নীকো হে খেলু।"[২০৫] রাধে, সেই ভালো আমরা খেলি। আবার, দুই শিশুর মধ্যে প্রচণ্ড ঝগড়াও হয়। দুরন্ত শিশুকৃষ্ণ খেলতে খেলতে রাধার গলার মালা ছিঁড়েছেন, রাধা ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন—

> তুম মেরী মোতিন দর কোঁ তোরী।
> রহে ঢোটা, তোসোঁ নন্দমহর কহা করন কহী হে জোরী।[২০৬]

—তুমি আমার মোতির হার ছিঁড়েছ। নন্দকুমার, তোমায় কি বলব, তোমার জুড়ি নেই।

শুধু রাধার সঙ্গে শিশুকৃষ্ণের খেলার বর্ণনা দিয়েই কবি ক্ষান্ত হনান, বন্ধুদের সঙ্গে শিশুকৃষ্ণের নানা ধরনের খেলার বর্ণনাও রয়েছে। যেমন—

> গোপাল মাঈ খেলত হৈঁ চোগান।
> ব্রজকুমার বালক সংগ লীনে বৃন্দাবন মৈদান॥[২০৭]

অর্থাৎ, গোপাল বল নিয়ে ব্রজকুমারদের সঙ্গে বৃন্দাবনের মাঠে খেলছেন।

যদিও পরমানন্দদাসের বাৎসল্য-রসাশ্রিত পদগুলি সর্বাপেক্ষা সমাদৃত তথাপি রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা-বিষয়ক বেশ কিছু উৎকৃষ্ট পদও তিনি রচনা করেছেন। প্রভুদয়াল মীতল এই প্রসঙ্গে বলেছেন: "যদ্যপি পরমানন্দদাস কে কাব্য কা প্রধান বিষয় শ্রীকৃষ্ণ কী বাল-লীলাওঁ কা গায়ন হৈ, তথাপি উনোঁনে শৃংগার-ভক্তি কে বিবিধ

অংগো কা ভী বিস্তার পূর্বক গায়ন কিয়া হৈ।"[২০৮]

কৃষ্ণের মোহনরূপে রাধা মুগ্ধ: "হরি কো মুখ-কমল দেখে লাগত নহিঁ পলক॥"[২০৯] হরি-মুখ-কমল দেখে চোখের পলক পড়ছে না। ধীরে ধীরে রাধার অন্তরে অনুরাগ সঞ্চারিত হচ্ছে। কিন্তু কৃষ্ণ-অনুরাগের যন্ত্রণাও আছে। পরমানন্দদাস পূর্বরাগের বেদনাকে প্রকাশ করেছেন:

জব তে প্রীতি স্যাম সোঁ কীনী।
তা দিন তেঁ মেরে ইন নৈননি নেঁকছু নীঁদ ন লীনী॥[২১০]

—যেদিন থেকে শ্যামের সঙ্গে প্রেমে পড়েছি, সেদিন থেকে আমার চোখে ঘুম নেই।

শুধু পূর্বরাগ নয়, বাসকসজ্জা, অভিসার, সম্ভোগ এবং মান ইত্যাদির নিপুণ বর্ণনাও পরমানন্দদাস করেছেন: এবং বিভিন্ন ঋতু, বিশেষ করে বর্ষা, শরৎ ও বসন্ত পরমানন্দদাসের পদে উল্লেখযোগ্য স্থান পেয়েছে। তাঁর রচনায় ঋতুচক্রের আবির্ভাব সম্বন্ধে ডঃ দীনদয়ালু গুপ্ত বলেছেন: ভারতবর্ষের ঋতুগুলির মধ্যে বর্ষা, শরৎ ও বসন্ত তিনটি ঋতুই সুখকর। এই তিনটি ঋতুর উল্লাস ও উৎসাহে ভরা আনন্দোৎসবের বর্ণনা অষ্টছাপের সব কবিই করেছেন, কিন্তু এদিক দিয়েও সুরদাস ও পরমানন্দদাস প্রতিভায় ও নৈপুণ্যে অদ্বিতীয়।...বর্ষার ঝুলন-দোলা ও বর্ষা বিহারের রাস, শরতের বিমলচন্দ্র এবং পুষ্প সজ্জায় সুসজ্জিতা সুন্দরী রাধিকা, তাঁর চারিপাশে সখীরা উল্লাসে নৃত্য-গীত করছেন, কিংবা প্রকৃতির বিবিধ মনোরম প্রফুল্ল পরিবেশে দোলোৎসবের রঙিন বাসন্তীরাস, এই তিনটি রাসের সুখপ্রদ ছবি সুরদাসের রচনার মতো পরমানন্দসাগরেও পাওয়া যায়।[২১১]

অষ্টছাপের অন্যান্য কবিরা রাধাকৃষ্ণের মিলনের ছবি আঁকতেই ভালোবাসেন। কিন্তু সুরদাস, কুম্ভনদাস এবং পরমানন্দদাস তার ব্যতিক্রম।[২১২] বিরহবেদনায় আজ বিস্মৃত রাধা কিংবা অন্য গোপিনীরা পরমানন্দদাসের পদে করুণ অথচ মোহিনী মূর্তি নিয়ে আমাদের নিকট উপস্থিত হন। বেদনায় অন্যমনা রাধার একটি ছবি:

অনমনা বৈঠীএ রহৈ।
অন্তরগত কী বিথা মোহিনী কাহূ সোঁ না কহৈ॥[২১৩]

—রাধা অন্যমনা হয়ে বসে আছেন। সুন্দরী নিজের অন্তরের ব্যথা কাউকে বলতে পারছেন না।

এই পদে রাধার অন্তরের অব্যক্ত যন্ত্রণার ছবিটি সুন্দরভাবে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে কয়েকটি সরল অনাড়ম্বর শব্দসমষ্টির সাহায্যে। প্রভুদয়াল মীতলও পরমানন্দদাসের বিরহের পদগুলিকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন: "পরমানন্দদাসকে কাব্য মেঁ শৃংগার ভক্তিকে সংযোগ ঔর বিয়োগ দোনোঁ পক্ষোঁ কা কথন হুআ হৈ, কিন্তু উনকে বিরহকে পদ অত্যন্ত উৎকৃষ্ট এবং প্রভাবোৎপাদক হৈঁ।"[২১৪] অর্থাৎ, পরমানন্দদাসের কাব্যে শৃংগার-ভক্তির মিলন ও বিরহ দু'দিকের কথাই বলা হয়েছে; কিন্তু তাঁর বিরহের পদগুলি উৎকৃষ্ট, যা পাঠকের চিত্তে প্রভাব বিস্তার করে। বিরহ পূর্ণরূপে প্রকাশিত

হয়েছে ভ্রমরগীত বা গোপী-উদ্ধব-সংবাদে। ভ্রমরকে উপলক্ষ্য করে ব্রজাঙ্গনারা উদ্ভবকে নিজেদের অন্তরবেদনা জ্ঞাপন করেছেন। ডঃ দীনদয়াল্ গুপ্ত ও পরমানন্দদাসের ভ্রমরগীত-বিষয়ক পদগুলি খুবই মর্মস্পর্শী ও হৃদয়গ্রাহী বলে মনে করেন।[২১৫]

পরমানন্দদাস রাস, দোল বা ঝুলন ছাড়া অন্যান্য উৎসবের বর্ণনাও করেছেন। যেমন, দীপান্বিতা কিংবা গিরিগোবর্ধন-পূজা ইত্যাদি উৎসব সম্বন্ধেও পদ রচনা করেছেন।

অষ্টছাপের প্রত্যেক কবিই ব্রজভাষা ব্যবহার করেছেন, কিন্তু সুরদাস ও পরমানন্দদাস এই ভাষার সাহিত্যরূপায়ণে অগ্রণী। তাছাড়া, পরমানন্দদাসের ভাষার সজীবতা, চিত্রময়তা ও সরসতা লক্ষণীয়।[২১৬] ভাষার এই গুণের জন্য কবি অল্প কয়েকটি কথায় গভীর কথা বলতে পেরেছেন। যেমন—

জা দিন তেঁ জাঁগন খেলত দেখ্যো জসোমতি কোপুতরী।
তব তেঁ গৃহ সোঁ নাতো টুটৌ জেসেঁ কাচো সুতুরী।[২১৭]

—যেদিন থেকে যশোমতির পুত্রকে অঙ্গনে খেলতে দেখেছি, সেদিন থেকেই কাচের সুতোর মতো সংসারের বন্ধন ছিন্ন হয়ে গিয়েছে।

হিন্দী কৃষ্ণকাব্যে পরমানন্দদাস বাৎসল্যের কবি হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। অষ্টছাপের কবিরা প্রত্যেকেই কৃষ্ণকে অবলম্বন করে বাৎসল্যের ছবি এঁকেছেন। কিন্তু সুরদাসের পর পরমানন্দদাসই অষ্টছাপের কবিদের মধ্যে বাৎসল্য রসের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন।

সুরদাসের শিশু-কৃষ্ণ ও বাৎসল্য সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে S. M. Pandey and Norman Zide সমালোচকদ্বয়ও পরমানন্দদাসের বৈশিষ্ট্যকে স্বীকৃতি দিয়েছেন, —"All the poets of this sect have written poems on this subject (Vatsalya) and among these the poems of Surdas and of Paramanandadas are the most important."[২১৮]

পরমানন্দদাসের পদে বাৎসল্য-রস সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে প্রভুদয়াল মীতল তাঁর যে বক্তব্যটি রেখেছেন সেটিও প্রণিধানযোগ্য: "ব্রজভাষা কাব্য মেঁ সুর ঔর পরমানন্দ বাৎসল্য রসকে সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হৈঁ।"[২১৯] অর্থাৎ, ব্রজভাষা-কাব্যে সুরদাস ও পরমানন্দদাস বাৎসল্য রসের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। পরমানন্দদাসের বাৎসল্যের বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি শুধু যশোদা ও নন্দের অপত্য স্নেহের ছবি এঁকেই ক্ষান্ত হননি, কৃষ্ণকে অবলম্বন করে দেবকী, বসুদেব, বলরাম, রোহিণী ও অন্যান্য গোপিনীদের বাৎসল্যের কথাও বলেছেন। তাছাড়া, কৃষ্ণের জন্ম থেকেই তাঁর কৃষ্ণলীলার কাহিনী আরম্ভ হয়েছে। পরমানন্দদাসের বাৎসল্যরসের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেই ডঃ দীনদয়াল্ গুপ্ত মন্তব্য করেছেন: "বাল চিত্রণ মেঁ সুর কী ভাঁতি পরমানন্দ স্বামী নে ভী বাল-স্বভাব, বাল-চেষ্টা ঔর বাল ক্রীড়াওঁ কা মনোবিজ্ঞানিক ঢংগ সে চিত্রণ কিয়া হৈ।"[২২০] অর্থাৎ বালকের চরিত্র-চিত্রণে সুরদাসের মতো পরমানন্দদাসও বালকের স্বভাব, বালকের চেষ্টা এবং বালকের ক্রীড়া ইত্যাদির ছবি মনোবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিবৃত করেছেন।

পরমানন্দদাসের রচনায় মাতা-পিতার হৃদয়ের অপরিসীম স্নেহের প্রকাশ পেয়েছে কৃষ্ণের জন্ম মুহূর্ত থেকেই। কারাগারে কৃষ্ণের জন্ম হয়েছে, দেবকী ও বসুদেব পুত্রের জীবন রক্ষার জন্য ব্যাকুল :

বসুদেব দেবকী মতো উপায়ো পলনা মেলি লয়ো।[২২১]

—দেবকীর পরামর্শে বসুদেব উপায় ঠিক করলেন। তিনি কৃষ্ণকে ঝুলনায় নিলেন।

দুর্যোগপূর্ণ রাত্রি, অথচ পুত্রের জীবনরক্ষায় ভীত স্নেহ-ব্যাকুল মা দেবকীর অনুনয়ে চিন্তিত বসুদেব সেই ভয়াবহ রাত্রে যমুনা পার করে কৃষ্ণকে গোকুলে রেখে এলেন। পরমানন্দদাসের ভক্তহৃদয় কিন্তু শিশু কৃষ্ণকে দেবকী ও বসুদেবের স্নেহ ক্রোড়ে রেখেও তাঁর ঐশ্বর্যময় রূপের কথা বিস্মৃত হতে পারেন নি।[২২২]

অধিক বয়সে সন্তান পেয়ে নন্দের অপরিসীম আনন্দ— "আজু নন্দরায়কে আনন্দ ভয়ো।" সমস্ত গোকুলও আনন্দে মগ্ন, কিন্তু মা যশোদার আনন্দ অতুলনীয়। তিনি তাঁর পুত্র কৃষ্ণের মুখের দিকে শুধু চেয়েই আছেন: "বদন নিহারতি হৈ নন্দরাণী।" আবার কখনো তিনি কৃষ্ণকে দোলায় শুইয়ে আদর করছেন এবং দোলা দিচ্ছেন—

ঝুলো পালনে হো লালন লেহুঁ বলৈয়াঁ তেরী।
গাউঁ গীত কহি জসুমতি রাণী চুটকী দৈ-দৈ রীঝেরী॥[২২৩]

—যশোদা কৃষ্ণকে দোলনায় দোলাচ্ছেন এবং বলছেন বাছা, তুমি দোলনায় দোল; আমি তোমার বালাই নিই। আচ্ছা, আমি গান করি বলে যশোমতি রাণী প্রসন্ন অন্তরে গানের সংগে তুড়ি দিচ্ছেন। পরিচিত ঘরোয়া আবহাওয়ার আমেজটি খুব ভালোভাবে ফুটে ওঠে পরমানন্দদাসের পদে।

পালনা ঝুলত বাল গোপাল।
গাদী বৈঠি ঝুলাবতি জসুমতি অতি ফুলী দেখতি ব্রজবাল॥
কবহুঁক গোদ রোহিনী লৈ কে বোলতি মৈঁ বলিহারী লাল।
কবহুঁক কনিয়াঁ লেতি গোপিকা ঝুঁঝনা দৈজু খিলাত উতাল॥[২২৪]

অর্থাৎ গোপাল দোলনায় দুলছেন। যশোদা গদিতে বসে দোলাচ্ছেন, আনন্দিত চিত্তে ব্রজবালারা তা দেখছেন। কখনো রোহিনী তাঁকে কোলে নিয়ে বলছেন— বাছা, আমি তোমার বলিহারী যাই, আবার কখনো গোপীনীরা কোলে তুলে ঝুনঝুনি দিয়ে তাঁকে খেলিয়ে আনন্দ দিচ্ছেন।

এমনি অজস্র সহজ সুন্দর ছবি ছড়িয়ে আছে পরমানন্দদাসের পদাবলীতে। তাঁর আর একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কৃষ্ণের জীবন কাহিনীর বিবরণ দেওয়া। কৃষ্ণের জন্মের ষষ্ঠদিনে ষষ্ঠীপূজা হবে। সকাল থেকে যশোদার ব্যস্ততার অন্ত নেই। তিনি—

কুঁবর নুবাই জসোদা রাণী কুল দেব্যা কে পাঁই পরায়ো।[২২৫]

অর্থাৎ, কৃষ্ণকে স্নান করিয়ে যশোদা কুল-দেবতাকে প্রণাম করাচ্ছেন। সমস্ত ব্রজধাম আনন্দে উৎফুল্ল। আর ব্রজরাজ নন্দ ও মা যশোদা, "আনন্দে ব্রজরাজ জসোদা

মানহুঁ অধন ধন পায়ো ॥"[২২৬]

অর্থাৎ, আনন্দিত ব্রজরাজ ও যশোদাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন নির্ধন ধন পেয়েছেন।

এমনি নানা আনন্দ-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শিশু কৃষ্ণ ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠছেন। এবার যশোদা পুত্রের জন্য—

অনুপ্রাসন— দিন নন্দলাল কো করতি জসোদা মাঈ।[২২৭]

—যশোদা নন্দলালের অন্নপ্রাশনের দিন ঠিক করলেন। শুভদিনে পুত্রের মঙ্গলা-কাঙ্ক্ষায় কুলদেবীর বন্দনা করে, ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ ভিক্ষা করলেন। তারপর কোলে বসিয়ে পায়েস খাওয়ালেন— "জসুমতি রাণী খীর খবাব্রত প্রথম শুভ দিন মানী।"[২২৮] এর কিছুদিন পরেই হ'ল কৃষ্ণের কর্ণচ্ছেদ অনুষ্ঠান। এমনি করে নবজাতককে কেন্দ্র করে পরিবারে যত অনুষ্ঠান হয় তার প্রত্যেকটি অবলম্বন করে পরমানন্দ দাস বাৎসল্যানুভূতির ক্রমবিকাশ বর্ণনা করেছেন।

এদিকে কৃষ্ণ ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠছেন। তাঁর প্রতিটি কাজ অন্যের চোখে যত অর্থহীন হোক না কেন, যশোদার কাছে তা পরম আশ্চর্যজনক। মাতৃহৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত স্নেহাধারার বৈচিত্র্য রূপায়িত হয়েছে পরমানন্দদাসের রচনায়। তাই প্রতিটি উৎসব-অনুষ্ঠানেই যশোদার ভূমিকাটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। কৃষ্ণকে অবলম্বন করে প্রতিটি অনুষ্ঠানে তাঁর স্নেহকোমল মাতৃমূর্তি প্রত্যেকবার নবীনতর ও উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে। কৃষ্ণের কর্ণচ্ছেদ উৎসবের বর্ণনাতেও যশোদার স্নেহময়ী মাতৃরূপের অতুলনীয় প্রকাশ দেখা যায়। আর সেই সঙ্গে রোহিণীর স্নেহ-কোমল রূপটিও মুগ্ধ করে—

কণক সূচী লৈ স্রবননি দীনী বেধ ত বার ন লাগী।
বাল রুদন জব করনহি লাগ্যো রোহিণী মাত লৈ ভাগী॥
চুচকারতি চুম্বতি চাপতি হিয় লেউ বলৈয়া তেরী।
দেত দান নন্দরায় বিপ্রনি কোঁ কহেঁ পরমানন্দ টেরী॥[২২৯]

—সোনার ছুঁচ দিয়ে কান বিঁধতে দেরী হ'ল না। সেই বেদনায় বালক কাঁদতে লাগলেন, অমনি রোহিণী তাঁকে নিয়ে গেলেন এবং মুখে শব্দ করে আদর করে চুমা দিয়ে বুকে চেপে ধরে বললেন, আমি তোমার সব যন্ত্রণা, সব অমঙ্গল নিলাম। পরমানন্দদাস বলেন, এই উপলক্ষ্যে নন্দরাজ ব্রাহ্মণদের প্রচুর দক্ষিণা দিলেন।

কৃষ্ণের এক বৎসর পূর্ণ হ'ল। ব্রজরাজের গৃহে উৎসব। যশোদা আজ নানা কাজে ব্যস্ত। কখনো পুত্রকে স্নান করাচ্ছেন, কখনো সাজাচ্ছেন আবার কখনো— "তিলক করতি অচ্ছিত দৈ জসুমতি সুতকী লেত বলাঈ।"[২৩০] অর্থাৎ, যশোদা কৃষ্ণের কপালে তিলক পরিয়ে তাঁর সব অমঙ্গল দূর করছেন।

পরমানন্দদাসের রচনায় শুধু যশোদার স্নেহকোমল মাতৃমূর্তি দেখতে পাই না, ব্রজের অন্যান্য গোপিনীদের বাৎসল্যের পরিচয়ও পাওয়া যায়। অন্য গোপিনীরাও যে কৃষ্ণের প্রতি স্নেহাসক্ত এবং সেজন্য যশোদার একটু ঈর্ষার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায় এই পদটিতে :

রহে রী! গ্বালি জোবন মদমাতী।
মেরে ছগন মগন সে লালহিঁ কত লৈ উছংগ লগাৱতি ছাতী
খীজত তেঁ অবহী রাখে হৈঁ নাহ্নী নাহ্নী উঠঁতি দ্বৈ দুধকী দাঁতী
খেলনি দৈ ঘর জাই আপনেঁ ডোলতি কহা ইতো ইতরাতী॥
উঠি চলী গ্বালি লাল লাগে রোৱন তব জসুমতি লাঈ বহু ভাঁতী।
পরমানন্দ রে ওট দৈ অঁচর ফিরি আঈ নৈননি মুসকাতী॥[২৩১]

—যশোদা বলছেন, যৌবন মদমত্ত ব্রজবালা, কেন তুমি আমার ছোট বাছাকে এত জোরে বুকে জড়িয়ে ধরে রেখেছ? তিনি রাগ করে বলছেন, সবে ওর দুটো মাত্র দুধের দাঁত উঠেছে; ওকে খেলা করতে দাও, তুমি বাড়ী যাও তো! যৌবনোচ্ছ্বাসে কেন এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছ? এই কথা শুনে ব্রজবালা উঠে যাবার উপক্রম করতেই কৃষ্ণ কাঁদতে আরম্ভ করলেন। বাধ্য হয়ে যশোদা গোপিনীকে অনুনয় করে ফিরিয়ে আনলেন। পরমানন্দ দাস বলেন গোপিনী মুখের উপর আঁচল টেনে দিলেন, আর তাঁর চোখে মৃদু হাসির আভাস দেখা দিল। পরমানন্দদাসের কাব্যে স্নেহাতুর গ্রাম্যরমণীর ভয় ও সংস্কার যশোদার চরিত্রে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

মার কাছে সন্তানের সামান্য কাজও অসামান্য। যেমন, কৃষ্ণ নিজে নিজে পাশ ফিরেছেন। যশোদার কাছে কৃষ্ণের এই কার্জটি অসাধারণ কৃতিত্বের তাই আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে শুধু এ জন্যই উৎসব পালন করছেন:

করৱট প্রথম লঈ নন্দ নন্দন।
তাকৌ মহরি মহোচ্ছৱ মানত ভরন লিপায়ো চন্দন॥[২৩২]

—নন্দ নন্দন প্রথম পাশ ফিরতে শিখেছেন। সেই আনন্দে মা যশোদা গৃহের সর্বত্র চন্দন লেপন করে মহোৎসব পালন করছেন।

শিশু কৃষ্ণ এখন আধো-আধো কথা বলেন, দুধের দাঁত দেখান, যশোদা তাতেই মুগ্ধ:

বারী মেরে লটকন পগু ধয়ো দুতিয়াঁ।
কমল নয়ন বলি জাওঁ বদন কী
সোহতি হৈঁ নাহ্নী নাহ্নী দুধ কী দ্বে দঁতিয়াঁ।
ইহ মেরী ইহ তেরী ইহ বাবা নন্দ কী ইহ বলভদ্র কী
ইহ তাকী জো ঝুঁলাৱৈ তেবৌ পলনা।[২৩৩]

—মরে যাই! আমার বুকের উপর তোমার টলমল পা দু'খানি রাখো। যশোদা বলছেন — কমল-নয়ন তোমার সুন্দর মুখে ছোট ছোট দুটি দুধের দাঁতের শোভা দেখে আমি আনন্দে আত্মহারা। এটা আমার, এটা তোমার, এটা বাবা নন্দের, এটা বলরাম দাদার আর এটা যে তোমার দোলনা দোলাবে তার।

কৃষ্ণ মাটিতে বসে খেলতে খেলতে সারা গায়ে ধুলো মেখেছেন আর সেই ধুলি-মলিন পুত্রকে কোলে তুলে নিয়েও যশোদা অভিভূত হয়ে পড়েন:

জনম-ফল মানতি জসোদা মাঈ।

জব নন্দলাল ধূরি-ধূসর বপু গরেঁ রহত লপটাঈ ॥
গোদ বৈঠি গহি চিবুক মনোহর বাত কহত তুতরাঈ ।
অতি আনন্দ প্রেম পুলকিত তন মুখ চুম্বতি ন অঘাঈ ॥[২৩৪]

—যশোদা নিজের জন্ম সার্থক মনে করেন যখন ধূলি-ধূসরিত-দেহ নিয়ে নন্দলাল তাঁর কোলে বসেন, গলা জড়িয়ে, চিবুক তুলে চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে আধো আধো কথা বলেন। যশোদার সমস্ত শরীর আনন্দে প্রেম-পুলকিত হয়ে ওঠে এবং তাঁর [কৃষ্ণের] মুখচুম্বন করেও যেন তিনি তৃপ্তি পান না।

যশোদার মনে নানা চিন্তা। তিনি ভাবেন কবে তাঁর ছেলে মাটিতে পা রেখে চলবে, কবে তাঁকে মা বলে ডাকবে, বাড়ীর নানা কাজে সাহায্য করবে। প্রত্যেক মায়ের মতো যশোদারও আকাঙ্ক্ষা তাঁর পুত্র তাড়াতাড়ি বড় হয়ে উঠুক। পরমানন্দদাস মায়ের অন্তরের ভাবনাগুলি তাঁর রচনায় সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন :

এক সমৈ জসুমতি অপনী সখী সোঁ বাত কহতি মুসিকাই ।
মো দেখত কব ধোঁ মেরো ললনা ভূমি ধরহিঁগে পাই ॥
ফিরি মোসোঁ মঈয়া কব কহিহেঁ কুঁৱর কছুক তুতরাই ।
অরিহেঁ কবহুঁ দুধ দধি কারণ তন গোরজ লপটাই ॥
খরিক দুহাৱন জাত মোহি কব আনি মিলহিঁগে ধাই ।
ৱহ ধোঁ দ্যোস হোইগো কবহুঁ ললন দুহেঁগে গাই ॥
সৌঁপি দেহুঁগী সুতহি চরাৱন গৈয়াঁ ঘ্যা বনরাই ।
ইহি অভিলাষ করতি জসুমতি জিয় পরমানন্দ বলি জাই ॥[২৩৫]

যশোদার আকাঙ্ক্ষা ধীরে ধীরে পূর্ণ হচ্ছে। কৃষ্ণ এখন সারা আঙিনায় খেলে বেড়ান, যশোদাও মাঝে মাঝে পুত্রের খেলায় যোগ দিয়ে অপরিসীম আনন্দ উপভোগ করেন :

মনিমৈ আঁগন নন্দকে খেলত দোউ ভৈয়া ।
গোর স্যাম জোরী বনী বল কুঁৱর কন্হৈয়া ॥
... ...
সঁঙ্গ-সঙ্গে জসোমতি রোহিণী হিত জহৈয়া ।
চুটকী দৈ দৈ নচাৱহী সুত জানি নহৈয়া ॥[২৩৬]

কৃষ্ণ মায়ের সঙ্গ ছাড়তে চান না। সমস্ত সময় মাকে তাঁর সঙ্গী হিসাবে চাই। কিন্তু যশোদা সংসারের নানা কাজে ব্যস্ত থাকেন ; কৃষ্ণ তাঁকে বিরক্ত করেন, কখনো আঁচল চেপে ধরেন, কখনো দধি মন্থন দণ্ড। তাই যশোদা বলছেন :

দধি-মাখন কৱৈ নন্দ-রাণী হো ।
বারে কন্হৈয়া আরি ন কীজৈ ছাঁড়ি ন দেহু মথানী হো ॥[২৩৭]

—বাছা কানাই, জিদ করো না, মন্থনদণ্ড ছেড়ে দাও। মা যশোদা কৃষ্ণকে শান্ত করার জন্য আরো বলছেন :

বারী মেরে মোহন কর পিয়ায়ঁগে কোন চিত্ত মেঁ ঠানী হো ।

হঁসি মুসিকাই জননী-তনচিতয়ো বুবিসাগর কী আনীহো ॥[২৩৮]

—আমার বাছা মোহন, অমন করো না। তোমার হাত ব্যথা করবে। এমন জিদ কেন ধরেছ ? কৃষ্ণ মায়ের দিকে চেয়ে হাসেন, তাঁর সাগর-মন্থনের কথা মনে পড়ছে।

পরমানন্দদাস একটি বাস্তব ছবি তুলে ধরেছিলেন, কিন্তু শেষ মুহূর্তে ভক্তির আতিশয্যে কৃষ্ণের উপর দেবত্ব আরোপ করে বাস্তব সৌন্দর্যের সবটুকু রক্ষা করতে পারেন নি। পরমানন্দদাসের রচনা পর্যালোচনা করলেই এ সত্যটি উপলব্ধি করা যায় যে সর্বপ্রথম তিনি ভক্ত, তাই ভক্তির প্লাবনে তাঁর সব কিছু ভেসে যায়। তিনি পার্থিব জগৎ ভুলে যান, কৃষ্ণকে সাধারণ মানব-শিশুর পর্যায় থেকে দেবতার আসনে বসিয়েই তিনি আনন্দে ও ভক্তিতে অভিভূত হন। কৃষ্ণ মাটি খেয়েছেন দেখে যশোদা সন্তানকে শিক্ষা দেবার জন্যে লাঠি হাতে এগিয়ে এলেন। ভয় দেখানোই যশোদার উদ্দেশ্য। পরমানন্দদাস কৃষ্ণলীলায় মুগ্ধ হয়ে কৃষ্ণের গুণ-গান করে বললেন, যশোমতীর হাতে দড়ি-লাঠি দেখে ব্রহ্মা, মহাদেব বিস্মিত হয়ে চেয়ে আছেন।[২৩৯] কৃষ্ণের মহিমান্বিত রূপ প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে কবি তাঁর মুখ গহ্বরে বিশ্বরূপ দেখালেন যশোদাকে। "বদন উঘারি আভ্যন্তর দেখ্যো ত্রিভুবন রূপ বৈরাটী ॥"[২৪০]

অন্যদিকে পরমানন্দদাসের রচনার মধ্যে গ্রামীণ জীবনের অতি পরিচিত বাস্তব ছবিও সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। যেমন :

সকাল হতেই গোপ পরিবারে গো-দোহনের পালা শুরু হয়। স্বয়ং ব্রজরাজ গো-দোহন করেন। কৃষ্ণের ইচ্ছা হয় গো-দোহনে পিতার সঙ্গী হতে, এমনকি তিনি দোহন করতে চান। যশোদাকে গিয়ে তাই বলেন :

তনক কনক কী দোহনী দৈ দৈ রী মৈয়া।
তাত দুহন সিখবনি কহ্যো মোহি ধৌরী গৈয়াঁ ॥[২৪১]

—মা, আমাকে ছোট সোনার দুধ দুইবার পাত্র দাও। বাবা আমাকে ধবলী গোরুটি দুইতে শেখাবেন। যশোদা কৃষ্ণকে দুধ দুইবার পাত্র দিলেন। কৃষ্ণ পিতার কাছে এসে উপস্থিত। পুত্র দুধ দুইতে শিখুক, এই উদ্দেশ্যে নন্দ কৃষ্ণকে গোরু দুইতে দিয়ে সরে দাঁড়ালেন। কৃষ্ণ অপটু হস্তে দুধ দুইতে চেষ্টা করছেন। ঠিকভাবে বসতেও তিনি জানেন না, দুধের ধারা এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ছে, আর স্নেহমুগ্ধ পিতা দূর থেকে পুত্রের অপটুতা দেখে হাসছেন।

কৃষ্ণের নিত্যনতুন ইচ্ছা জাগে। একদিন সকালে তিনি যশোদাকে বললেন :

মৈয়া গাঁই চরাবন জৈ-হোঁ।
তু কহে নন্দ মহর বাবা সোঁ বডৌ ভয়ো ন ডরৈ হোঁ ॥
শ্রীদামা আদি সখা সব অপনে অরু দাউ সঙ্গ লৈহোঁ।
দহ্যো ভাতকাৱরি ভরি লৈহোঁ ভূখে লাগে খৈহোঁ ॥
বংসীবট কী সীতল ছহিয়াঁ খেলত অতি সুখ পৈহোঁ।[২৪২]

—মা, আমি গোরু চরাতে যাবো। তুমি বাবাকে বলো আমি বড় হয়েছি, ভয় পাবো না। শ্রীদাম প্রভৃতি সখা এবং দাদার [বলরাম] সঙ্গে যাবো। সঙ্গে পাত্র ভরে দই

ভাত নেব, খিদে পেলে খাব। বংশীবটের শীতল ছায়ায় খেলতে খুবই ভালো লাগবে।

পুত্রের ইচ্ছার কথা শুনে যশোদা উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন। কৃষ্ণ ধীরে ধীরে বড হয়ে উঠছেন, নানা কাজের দায়িত্ব তুলে নিচ্ছেন, যশোদার কাছে এর চেয়ে বেশি আনন্দের কি থাকতে পারে; তাই আজ আনন্দিত চিত্তে তিনি গোচারণের জন্যে কৃষ্ণকে সাজাতে বসেছেন:

গাঁই চরাৱন কো দিনু আয়ো।
ফুলী ফিরতি জসোদা অঙ্গ অঙ্গ লালন উবটি নুৱায়ো।
ভূষণ বসন ৱিৱিধ পহিরাত্র কজ্জর তিলকু বনাযো।[২১৩]

—গোচারণের দিন এসেছে। যশোদা গর্বিত চিত্তে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। পুত্রকে উবটন দিয়ে স্নান করাচ্ছেন। বিবিধ ভূষণ পরিযে চোখে কাজল ও কপালে তিলক দিচ্ছেন।

রোহিণীর সঙ্গে কৃষ্ণের স্নেহের সম্পর্কও কবির রচনায় স্থান পেয়েছে। কৃষ্ণ গোচারণে যান, বলরাম ও অন্যান্য সখারা কৃষ্ণকে খেপান। এর বিরুদ্ধে নালিশ কিন্তু যশোদার কাছে নয়, কারণ কৃষ্ণ জানেন তাঁর কাছে বলরামের বিরুদ্ধে কিছু বলে কোনো লাভ নেই। তাই কৃষ্ণ নালিশ করতে এসেছেন বলরামের মা রোহিণীর কাছে। কৃষ্ণকে অবলম্বন করে রোহিণীর স্নেহের প্রকাশ কবি দক্ষতার সঙ্গে বর্ণনা কবেছেন

দেখিরী রোহিণী মইয়া! ঐসে হেঁ বল ভঈয়া।
জমনা কে তীর মোকোঁ জু জু আ বুলায়ো।
সুবল শ্রীদামা সাথ হঁসি-হঁসি মিলৱত হাথ।
আপ ডরপ্যো অরু হোঁ হী ডরপায়ো॥
জহাঁ জহাঁ বোলেঁ মোর, চিত্তৱৈ তিনকী ওর।
ভাজোরে ভাজোরে! ভঈয়া ও হৈ দেখি আয়ো॥
আপু চঢ়ে তরু মোহি ছাঁড়ি ধরু।
ধর-ধর ছাতী কিয়ে ঘরহুঁ কো ধায়ো॥[২৪৪]

—দেখ গো রোহিণী মা, বলরাম দাদা কি রকম! যমুনার তীবে ডেকে এনে আমাকে ভয় দেখায়। সুবল শ্রীদামের সঙ্গে হেসে হেসে যুক্তি করে আমাকে খেপায়। নিজেরা ভয় পায়, আমকেও ভয় দেখায়। যেদিকে ময়ূর ডাকে সেদিকেই ওদের মন যায়। "পালারে পালা ভাই, ঐ দেখ এলোরে" বলে নিজেরা গাছের উপর চড়ে যায়। আমাকে গাছের তলায় রেখে দেয়। আমি ছুটে বাড়ী এসেছি। দেখ আমার বুক কেমন ধুকপুক করছে।

লপকি লিয়ো উঠাই, উরসোঁ রহী লগাই।
মেরো রী! মেরো কহি হিয়ো ভরি আযো॥
'পরমানন্দ' বোল দ্বিজ বেদ মন্ত্র পঢ়ি পঢ়ি।
বছিয়া কী পুছসোঁ হাথ দিৱায়ো॥[২৪৫]

—রোহিণী তাঁকে কোলে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। মরি মরি বাছা, তোমার কষ্টে আমারও যে কষ্ট হচ্ছে। পরমানন্দ বলেন, তখনই রাণী ব্রাহ্মণ ডেকে বেদমন্ত্র পাঠ করালেন এবং কৃষ্ণকে বাছুরের লেজ হাতে ধরালেন।

কৃষ্ণের সকালে সহজে ঘুম ভাঙ্গে না, বিছানা ছেড়ে তিনি উঠতে চান না। তাই যশোদাকে প্রত্যেক দিন নানা প্রলোভন দেখিয়ে, কখনও বা আদর করে, ঘুম থেকে তুলতে হয় :

উঠু গোপাল ! প্রাতকাল দেখোঁ মুখ ভেরোঁ।
পাছেঁ গৃহ কাজ করোঁ নিত্য নেমঁ মেরোঁ।[২৪৬]

—যশোদা কৃষ্ণকে আদর করে বলছেন, গোপাল ওঠো, সকালে তোমার মুখ দেখে তারপর আমি আমার গৃহকাজ আরম্ভ করি, এটাই আমার নিয়ম। যশোদা কৃষ্ণকে জাগাবার জন্য আদর করে আরো বলেন— "রবি কী কিরণ প্রকট ভঈ উঠৌ লাল নিসা গঈ।"[২৪৭] সূর্যকিরণ প্রকাশিত হচ্ছে, বাছা রাত শেষ হয়েছে।

শুধু ঘুম থেকে তোলা নিয়ে নয়, কৃষ্ণকে নিয়ে মা'র নানা জ্বালা। খেলার আকর্ষণে কৃষ্ণ খেতে ভুলে যান। "কাহু কহাঁ হৈ খেলত।" —দেখতো কানু কোথায় খেলছে? যশোদাকে নানা জায়গায় খুঁজে বেড়াতে হয়। —"ঢুঁঢ়তি ফিরতি জসোদা মাতা," —খাওয়াবার জন্যে ডাকাডাকি করতে হয়।

ভোজন কোঁ বোলতি মহতারী।
বল-সমেত আবহু মেরে লালন। বেঠে নন্দ পরোসেঁ থারী॥
খীর সিরাত স্বাদ নহিঁ আৱৈ বেগি গসা তুম লেহু মুরারী।[২৪৮]

—খাওয়ার জন্যে মা ডাকছেন। বলদেবের সঙ্গে আমার মোহন এসো। নন্দ থালার সামনে তোমাদের অপেক্ষায় বসে আছেন। ক্ষীর ঠাণ্ডা হয়ে গেলে ভালো লাগবে না। তাড়াতাড়ি মুখে গ্রাস তুলে নাও, মুরারী।

কৃষ্ণ খেলা ছেড়ে আসতে চান না। তাই যশোদা বলেন, খেয়ে শরীর সুস্থ করে সুবল শ্রীদামের সঙ্গে খেলা করো। আবার কখনো নিজের হাতে তিনি কৃষ্ণকে খাইয়ে দিচ্ছেন :

হরি ভোজন করত বিনোদ সোঁ।
করি করি কৌর মুখারবিন্দ মেঁ দেতি জসোদা মোদ সোঁ॥[২৪৯]

—হরি আনন্দে ভোজন করছেন। মা আনন্দে ভাত গ্রাস করে কৃষ্ণের মুখে তুলে দিচ্ছেন। তাছাড়া, নানা খাদ্যের প্রলোভনও তিনি দেখান যাতে কৃষ্ণ সহজে খেয়ে নেয়। "মধু মেৱা পকৱান মিঠাঈ দূধ দহী ঘৃত ওদ সোঁ।"[২৫০] অর্থাৎ, মধু মেওয়া, মিষ্টি দুধ, দই যা তাঁর ইচ্ছা করে তাই কৃষ্ণ খেয়ে নিন। আবার কখনো কৃষ্ণ খেতে আসছেন না দেখে ভয় দেখিয়ে যশোদা তাঁর মোক্ষম অস্ত্র প্রয়োগ করে বলেন, যে তিনি আর তাঁর মা হবেন না, বলভদ্রের মা হবেন। তখন কৃষ্ণ সব খেলা ফেলে ছুটে এসে যশোদার গলা জড়িয়ে ধরেন, আর মা শান্তি পান : "দৌরি কেঁ কণ্ঠ লগে মনমোহন মেরী সোঁ, মেরী সোঁ মেরো কহ্হৈয়া।"[২৫১]

—মনমোহন ছুটে এসে যশোদাকে জড়িয়ে ধরলেন, আর যশোদা আমার সোনা, আমার সোনা, আমার কানাই, বলে আদর করতে লাগলেন।

কৃষ্ণ বড় হবার সংগে সংগে যশোদার কৃষ্ণকে নিয়ে আরো নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। কৃষ্ণ তাঁর বন্ধুদের সংগে নিয়ে বৃন্দাবনের ঘরে ঘরে গিয়ে চুরি করেন। শিকেয় তোলা দুধ-দই-ননী নামিয়ে এনে খান, যা খেতে পারেন না তা ছড়িয়ে ছিটিয়ে নষ্ট করেন। অতিষ্ঠ হয়ে হয়ে শেষ পর্যন্ত গোপিনীরা যশোদার কাছে নালিশ করে বললেন—"তেরে লাল মেরো মাখনু খায়ো।"[২৫২] তোমার ছেলে আমার মাখন খেয়েছে। কিন্তু যশোদা তাঁদের কথা বিশ্বাস করেন না। কৃষ্ণ কোনো অন্যায় করতে পারে, একথা তাঁর কাছে অবিশ্বাস্য। স্বভাবতই তিনি গোয়ালিনীর উপরই ক্ষুব্ধ হন।

গ্বালিনি! তোপেঁ ঐসোঁ ক্যোঁ কহি আয়ো।
মেরে ঘর-ঘর বাত স্যামঘন তাহি তেঁ দোসু লগায়ো॥
ঘর হি কোঁ মাখন দুধ ন ভাবৈ তেরোঁ দহোঁ ক্যোঁ খায়ো।[২৫৩]

—গোয়ালিনী, তুমি এমন কথা কি করে বললে? ঘনশ্যাম সবার ঘরে যায় তাই তোমরা দোষ দিচ্ছ। অথচ, ও বাড়ীর মাখন, দুধই খায় না তোমার দই কেন খাবে? কৃষ্ণের উপর দোষারোপ করায় যশোদা এত ক্রুদ্ধ হয়েছেন যে তিনি নন্দরাজের গো-সম্পদের অহংকার প্রকাশ করে বলেছেন, কৃষ্ণ তাঁদের দুধ দই যা খেয়েছেন, তা সব তিনি ফিরিয়ে দেবেন :

গোরস কহা দিখাবনি আঈ।
ইতনো লৈ খায়ো নন্দজুকে ঢোটা বদলি লেহি মেরী মাঈ॥[২৫৪]

যশোদা সাধারণ গ্রাম্য মেয়েদের মত পুত্রের হয়ে প্রতিবেশিনীদের সঙ্গে কোমর বেঁধে ঝগড়া করছেন। এবং সব বাগবিতণ্ডার মধ্য দিয়ে তাঁর মাতৃহৃদয়ের বাস্তবোচিত প্রকাশ ঘটেছে। কবি দেখাচ্ছেন যশোদা স্নেহান্ধ, ছেলের কোন দোষ থাকতে পারে এটা তাঁর বিশ্বাসের অতীত। মাতৃ-হৃদয়ের এই সব চিত্রের সাহায্যে কবি লৌকিক ও অলৌকিক বাৎসল্যের মধ্যে মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। যশোদা গোয়ালিনীদের আবার বলছেন :

ইতনক—সোঁ গোপাল কহা করি জানে দধি কী চোরী।
কাহে কোঁ আবতি হাথ নচাবত জীভ ন করহী থোরী॥[২৫৫]

আরে, আমার ছোট্ট গোপাল দই চুরি করতে জানেই না। হাত নাচিয়ে ঝগড়া করতে তোমাদের জিভে আটকায় না?

ছেলে ধীরে ধীরে বড় হবার সংগে সংগে মা'র মনে গোপন আকাঙ্ক্ষা জাগে একটি মনের মতো বৌ ঘরে আনবার। কৃষ্ণ একদিন আবদার করে মাকে বললেন,—মা, আমার এমন বৌ চাই যে তাঁকে কোলে বসিয়ে আদর করবে, নানা রকম মিষ্টি রান্না করে আদর করে নিজের হাতে খাওয়াবে। শুনে যশোদা বললেন—"ওহো মেরে লাল। কহোঁ বাবা সোঁ তেরা কহ্যোঁ করাবৈ॥"[২৫৬] —আহা বাছা, তোমার বাবাকে বলবো কোথাও বিয়ে ঠিক করতে।

এরপরই বৃষভানুর কন্যার সঙ্গে কৃষ্ণের বিবাহের দিন নির্ধারিত হচ্ছে। এবং "আজু লাল কী হোত সগাই।"—আজ আমার বাছার বিয়ে, তাই মা যশোদা আনন্দে ও অহংকারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন— "ফুলী ফিরতি জসোদা রানী।"[২৫৭] যশোদা রাণী গর্বে চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। পুত্রের বিয়ে, নন্দগৃহে উৎসব, নানা বাদ্য বাজছে, সবাই আনন্দে মত্ত, যশোদা কর্মব্যস্ত হয়েও আনন্দে বিভোর।

এমনি করেই শৈশব কৈশোরের দিনগুলি মাতৃস্নেহচ্ছায়ায় কেটে যায়। এর পর কৃষ্ণকে মথুরায় যেতে হ'ল। কৃষ্ণহীন-বৃন্দাবনে নেমে এলো চিরন্তন অন্ধকার। রাধা ও ব্রজের অন্যান্য গোপিনীরা অসহনীয় বিরহ যন্ত্রণা ভোগ করছেন। বয়স্কা গোপিনীরা কৃষ্ণহীন বৃন্দাবনে পুত্রের বিচ্ছেদ বেদনা অনুভব করেন। বেদনাতুর এক বৃদ্ধা বলছেন :

গোপাল-বিনু কৈসে' কে' ব্রজ রহিবো'।

ধুসর-ধূরি উঠাই গোদ লৈ লাল ববন সোঁ কাহিবো'।[২৫৮]

—গোপাল ছাড়া ব্রজে কিভাবে থাকব, ধূলি ধূসরিত দেহ কোলে তুলে 'বাছা' বলে কাকে ডাকব!

পুত্রের বিচ্ছেদে মা বেদনা পাবেন এটা স্বাভাবিক। কিন্তু কবির বৈশিষ্ট্য এই যে, বৃন্দাবনের স্নেহাসক্ত অন্য নারীরাও কৃষ্ণের জন্যে ব্যাকুল। ডঃ দীনদয়ালু গুপ্ত এই প্রসঙ্গে বলেছেন : "শৃঙ্গার-রতি কী বিয়োগ-দশা কে চিত্রণ কে সাথ পরমানন্দদাস নে কুছ পদ বাৎসল্য-বিয়োগ পর ভী লিখে হৈ। ইন পদোঁ মে' যশোদা তথা মাতৃ-হৃদয়া, বাৎসল্য ভাব ধারিণী অন্য ব্রজাঙ্গনাও' কী বিরহ বেদনা কে চিত্র ভী অঙ্কিত কিয়ে গয়ে হৈ।"[২৫৯] অর্থাৎ, শৃঙ্গার-রতির বিরহদশার বর্ণনা কবি যেমন দিয়েছেন, তেমনি বাৎসল্যরসাশ্রিত কিছু বিরহের পদও তিনি রচনা করেছেন। এসব পদে যশোদার পুত্রের জন্য যে বেদনা অনুরূপ বেদনার ব্যাকুলতা অন্যান্য ব্রজরমণীদের অন্তরে মূর্ত হয়ে উঠেছে। দীর্ঘদিন হয়ে গেছে কৃষ্ণ মথুরা চলে গেছেন। বাৎসল্য-বিরহে অধীর একজন গোপিনী যশোদাকে এসে প্রশ্ন করছেন :

জসোদা! মধুবন তে' আজু— কালি তেরে হু কোউ আয়োঁ?

বহুত দ্যৌস বিদিত গএ স'দেসো' ন পায়োঁ।

কৈসৈ তোহি নীন্দ পরৈ কৈসে গৃহ ভাবৈ।

জাকী নিধি ছুটি জাই ধীরজ কৈসে আবৈ॥

গোপিনি কে বচন সুনত বিলখতি নন্দরাণী।

পরমানন্দ প্রীতি জানি নয়ন স্রবৈ পানী॥[২৬০]

অর্থাৎ, যশোদা, মথুরা থেকে আজ-কালের মধ্যে কেউ এলো? কতদিন হয়ে গেল, কৃষ্ণের কোনো সংবাদ পাচ্ছি না। কেমন করে যে তোমার ঘুম হচ্ছে, কেমন করে যে তুমি ঘরে আছ! যার অন্তরের নিধি চলে যায়, সে যে কি করে ধৈর্য ধরে থাকে! গোপিনীর কথা শুনে নন্দরাণীর দুচোখ থেকে উচ্ছ্বসিত অশ্রুধারা পড়তে লাগল।

তবু যশোদার যন্ত্রণা হৃদয়বিদারক। অন্য বয়স্কা-গোপিনীদের সঙ্গে তাঁর

বেদনার তুলনা চলে না। তিনি দিনরাত শুধু পথ চেয়ে আছেন কবে তাঁর পুত্র তাঁর কোলে ফিরে আসবে। কৃষ্ণের নাম উচ্চারিত হলেই তাঁর চোখ জলে পূর্ণ হয়ে যায়।

প্রাত জসোদা পন্থ নিহারতি নিরখতি সাঁঝ-সকারে।,
জো কোউ কাহ্ন-কাহ্ন কহি টেরত অঁখিয়নি বহত পনারে॥[২৬১]

উদ্ধব বৃন্দাবন এসেছেন কৃষ্ণের সংবাদ দিতে। কাজ শেষ হতেই তিনি ফিরে চলেছেন মথুরায়। গোপিনীরা তাঁদের বেদনার কথা কখনো প্রচ্ছন্নভাবে, কখনো শ্লেষাত্মকভাবে, আবার কখনো বা চোখের জলের মধ্য দিয়ে কৃষ্ণের কাছে বলে পাঠাচ্ছেন। কিন্তু যশোদার কণ্ঠে শ্লেষ নেই, ক্রোধ নেই, তাঁর হৃদয় যন্ত্রণাক্লিষ্ট, চোখ অশ্রুপূর্ণ; কোনো অভিযোগ না করে তিনি পুত্রের জন্যে আন্তরিক আশীর্বাদ পাঠাচ্ছেন।

কহিযো জসোদা কী আসীস।
জহাঁ রহহু তহাঁ লাড লড়হু মেরে জীবহু কোটি বরীস॥[২৬২]

—উদ্ধব, কৃষ্ণকে যশোদার আশীর্বাদের কথা বলো। আমার আদরের বাছা যেখানেই থাক সেখানেই সে কোটি বর্ষ আয়ু লাভ করুক।

কবি নন্দের পুত্র বিচ্ছেদের যন্ত্রণাময় অন্তরও তুলে ধরতে ভোলেন নি। উদ্ধবের হাতে পুত্রকে তিনি কি পাঠাবেন? স্নেহের পাত্র, হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ ধন তাঁকে দেওয়ার কি শেষ আছে? তিনি উদ্ধবের হাত দিয়ে দুধ দুইবার পাত্র ভবে কৃষ্ণের সবচেয়ে আদরের ধবলী গোরুর দুধে তৈরী ঘি পাঠালেন।[২৬৩]

উদ্ধব যখন মথুরা ফিরে চলেছেন তখন নন্দ আর চোখের জল রোধ করতে পারলেন না:

কহত নন্দ উধো কে আগৈ নৈন নীর ভরি আবত।
নন্দ-ভাগ হম ব্রজ কে বাসী কৃষ্ণ-বিনা দুখ পাবত॥[২৬৪]

—অশ্রুসজল চোখে নন্দ উদ্ধকে বললেন—আমরা ব্রজবাসীরা মন্দভাগ্য, কৃষ্ণ বিনা দুঃখ পাচ্ছি।

সত্যি কৃষ্ণ বিনা যশোদা ও নন্দের কাছে সমস্ত ব্রজপুরীই অন্ধকার। নন্দ উদ্ধবের সংগে কৃষ্ণের কাছে যে খবর পাঠিয়েছেন, তা থেকেই নন্দ-যশোদার অন্তরের তীব্র বেদনা সুস্পষ্ট:

নন্দ নিহোরোঁ* বহুত কিয়ো।
সুনহু স্রবন দৈ স্যাম-মনোহর! মুখ সঁদেস দিয়ো॥
এক বার মুখ-কমল দিখাবহু হিত করি গোকুল আবহু।
জননী-তাত কো নাঁতো* মানোঁ সো কাহে বিসরাবহু॥[২৬৫]

অর্থাৎ, শ্যামসুন্দর মন দিয়ে শোনো, নন্দ অনেক অনুনয় করে আমাকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছেন। একবার অন্তত তোমার মুখ-কমল গোকুলে এসে দেখিয়ে যাও। যাদের জনক জননীর মতোই মনে কর, তাঁদের কি করে ভুলে গেলে।

ব্রজ গোপিনীদের বিরহের সংগে যেমন রাধার বিরহবেদনার তুলনা চলে না,

তেমনি বৃন্দাবনের অন্যান্য বয়স্ক ও বয়স্কা গোপ-গোপিনীদের দুঃখের সঙ্গে নন্দ-যশোদার যন্ত্রণার তুলনাও বাতুলতা। পরমানন্দ অসামান্য কৃতিত্বের সঙ্গে নন্দ যশোদার স্নেহাতুর আর্ত হৃদয়ের হাহাকার মূর্ত করেছেন।

তবে সূর্যগ্রহণ উপলক্ষে কুরুক্ষেত্রে বৃন্দাবনের গোপ-গোপিনীর সঙ্গে নন্দ-যশোদাও কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। সুরদাসের মতো পরমানন্দদাসও এই প্রসঙ্গটি উল্লেখ করে বলেছেন :

নন্দ-জসোদা উঠি-উঠি ভেটত আপুনে' ললনু।[২৬৬]

—নন্দ-যশোদা উঠে নিজের পুত্রের সঙ্গে দেখা করলেন।

সমস্ত হিন্দী বৈষ্ণব সাহিত্যে সুরদাসের পর পরমানন্দদাসই কৃষ্ণের জন্ম থেকে মথুরায় রাজা হওয়া পর্যন্ত, কৃষ্ণের জীবনখণ্ডের মধ্যে বাৎসল্যের ক্রমবিবর্তনটি তুলে ধরেছেন।

পারমানন্দদাসের পদাবলী পাঠকের বারবারই সুরদাসের রচনার সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্যের কথা মনে পড়বে। এই সাদৃশ্যের কারণ সহজেই অনুমেয়। দুই পদকর্তারই কাব্যরচনার উৎস ছিল ভাগবত। কিন্তু ভাগবতের বিভিন্ন প্রসঙ্গ বিবৃত করতেও তাঁরা একই ধারা অবলম্বন করেছেন। দুই কবির মধ্যে মূল পার্থক্য হ'ল এই যে, সুরদাসের রচনা কাব্য-সুষমায় অধিকতর সমৃদ্ধ, পরমানন্দদাসের পদাবলীতে ভক্তিরসের প্রাধান্য।

নন্দদাস

রচনার উৎকর্ষের দিক থেকে বিচার করলে, অষ্টছাপের কবিদের মধ্যে সুরদাসের পরেই নন্দদাসের স্থান। প্রভুদয়াল মীতলও এই কথা বলেছেন : অষ্টছাপকে কবিয়োঁ মেঁ সুরদাসকে উপরান্ত নন্দদাস কী হী বিশেষ প্রসিদ্ধি হৈ।"[২৬৭] রাম-কুমার বর্মাও এই কথারই প্রতিধ্বনি করেছেন।[২৬৮] নন্দদাসের রচনা থেকে তাঁর জীবন-বৃত্তান্ত কিছুই পাওয়া যায় না। ভক্তমাল গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, তিনি রায়পুর গ্রামে থাকতেন। 'দো সৌ বাবন বৈষ্ণবনকী বার্তা' গ্রন্থে তাঁকে পূর্বদেশের লোক বলা হয়েছে। 'অষ্টসখান কী বার্তা'র একটি হস্তলিখিত পুঁথিতে নন্দদাসকে রামপুরের লোক বলা হয়েছে। এই রামপুর কোথায় বলা কঠিন। এই প্রসঙ্গে 'হিন্দী সাহিত্য কা বৃহৎ ইতিহাসে' বলা হয়েছে : "ইন:ক আধার পর কেবল ইতনা কহা জা সকতা হৈ কি নন্দদাস গোকুল, মথুরা সে পূর্ব কী ওর স্থিত রামপুর গ্রামকে রহনেবালে থে। রামপুরস্থান কী ঠীক ঠীক স্থিতি কা পতা নহী' লগ সকা হৈ।"[২৬৯] অর্থাৎ, উপরোক্ত গ্রন্থগুলির উপর নির্ভর করে কেবল এটুকু বলা যায় যে, নন্দদাস গোকুল এবং মথুরা থেকে পূর্বদিকে অবস্থিত রামপুর গ্রামে থাকতেন। রামপুর ঠিক কোথায় অবস্থিত তা জানা যায় না।

ভক্তমাল গ্রন্থে তাঁকে উচ্চকুলের ব্রাহ্মণ বলা হয়েছে। বার্তা গ্রন্থেও তাঁকে ব্রাহ্মণ বলা হয়েছে, কিন্তু এ দুই গ্রন্থেই তাঁর মা-বাবার কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। 'দো সৌ বাবন বৈষ্ণবন বার্তা' গ্রন্থে নন্দদাসকে রামচরিত মানসের রচয়িতা

তুলসীদাসের ভ্রাতা বলা হয়েছে। তবে নন্দদাস তুলসীদাসের সহোদর ভাই ছিলেন, কি জ্ঞাতি ভাই ছিলেন, সে সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট উল্লেখ নেই। 'অষ্টসখান কী ৰাৰ্তা' গ্রন্থে বলা হয়েছে, বিঠ্‌ঠলনাথের শরণাপন্ন হবার পর তিনি নন্দদাসকে কিছুদিন সুরদাসের সংসর্গে রাখেন। কাঁকরোলীর বৈষ্ণবদের মধ্যে কিংবদন্তি আছে, সুরদাস এই সময় সাহিত্য-লহরী গ্রন্থটি রচনা করেন নন্দদাসের মনে একাগ্রতা আনার জন্যে এবং তাঁর বিদ্যার অহমিকা চূর্ণ করার জন্যে। ডঃ দীনদয়ালু গুপ্ত প্রমাণ করেছেন যে, সুরদাসের সাহিত্য-লহরী ১৬১৭ বিক্রমে লিখিত হয়।[২৭০] এ থেকেই অনুমান করা যায়, নন্দদাস বিঠ্‌ঠলনাথের শরণাপন্ন হন আনুমানিক ১৬১৬ বিক্রমের কাছাকাছি কোনো সময়। কিংবদন্তি আছে, নন্দদাস এরপর সাংসারিক জীবনে ফিরে যান। গোস্বামী বিঠলনাথ গোকুলে স্থায়ী বসবাসের পর আনুমানিক ১৬২৪ বিক্রমের কাছাকাছি সময়ে নন্দদাস আবার গোস্বামী বিঠ্‌ঠলনাথের শরণাপন্ন হন এবং এরপর কখনো গোবর্ধন ছেড়ে কোথাও যাননি। 'দো সৌ বাৱন বৈষ্ণৱন কী বার্তা'তে বলা হয়েছে, যখন নন্দদাস গোস্বামী বিঠ্‌ঠলনাথের শিষ্য হন তার অব্যবহিত পূর্বেও তাঁর লৌকিক জীবনের প্রতি প্রচণ্ড আকর্ষণ ছিল। তিনি সে সময় তুলসীদাসের সঙ্গে কাশীতে থাকতেন। তখন তিনি বিবাহিত ছিলেন কিনা তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। অনুমান করা হয় যে, বিবাহের কিছুদিন পর বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নেন এবং রামানন্দ সম্প্রদায়ভুক্ত হয়ে কাশীতে বসবাস আরম্ভ করেন। এ সময় তিনি সংসার-বিরাগী হয়ে তুলসীদাসের সঙ্গে থাকতেন। নন্দদাসের বয়স তখন পঁচিশ বা ছাব্বিশ বছর ছিল বলে অনুমান করা হয়। ১৬১৬ বিক্রমাব্দে বিঠ্‌ঠলনাথের শরণাপন্ন হয়েছিলেন নন্দদাস। আগে-পরে যেসব সাল তারিখের উল্লেখ আছে নানা প্রসঙ্গে তা থেকে মনে হয়, তাঁর জন্ম ১৫৯০ বিক্রমে। কিন্তু সব কিছুই আনুমানিক।[২৭১] ডঃ দেবেন্দ্রনাথ শর্মা মন্তব্য করেছেন: "নন্দদাসকে জন্ম ঔর মৃত্যুকে সময়কে সম্বন্ধ মেঁ নিশ্চিত রূপ সে কুছ কহনা অসম্ভব হৈ।"[২৭২] অর্থাৎ, নন্দদাসের জন্ম ও মৃত্যুর সময় সম্বন্ধে নিশ্চিতরূপে কিছুই বলা যায় না। তবে দো সৌ বৈষ্ণৱ কী ৰাৰ্তাতে আছে নন্দদাসের মৃত্যু বীরবল ও গোস্বামী বিঠ্‌ঠলনাথের জীবিতকালেই বীরবলের মৃত্যু হয় ১৬৪২ বিক্রমে। নন্দদাস-এর আগেই মারা যান। ঐতিহাসিকেরা বলেন, আকবর তাঁর উদার মতবাদ দীন-ইলাহী প্রচারের পূর্বে বীরবলের সঙ্গে প্রায়ই হিন্দুদের দেবমন্দিরে যেতেন এবং সাধক ও ভক্তদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁদের উপদেশ শুনতেন। খুব সম্ভব আকবর বীরবলের সঙ্গে গোবর্ধনেও আসতেন। এবং নন্দদাসের পদ দ্বারাও বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন। ঐতিহাসিকেরা ১৬৩৯ বিক্রমের দু' তিন বৎসর পূর্বেই আকবরের এই মানসিক অবস্থার নির্দেশ দিয়েছেন। এসব থেকে অনুমান করা যেতে পারে, ১৬৩৯ বিক্রমের কাছাকাছি সময়ে নন্দদাস মারা যান।[২৭৩]

কবির প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কেও কিছুই জানা যায় না। তবে তাঁর রচনা পাঠ করে স্পষ্টই বোঝা যায়, তাঁর পাণ্ডিত্য কত গভীর ছিল। ব্রজভাষায় নন্দদাসের

বিশেষ অধিকার ছিল তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। তাছাড়া সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল, তা না হলে ভাগবতের দশম স্কন্দের এমন অপূর্ব ভাবানুবাদ করা সম্ভব হতো না।

নন্দদাসের নামাঙ্কিত প্রায় ২৮টি গ্রন্থ পাওয়া যায়। তবে, প্রমাণ ও তথ্যাদির অভাবে সমস্ত গ্রন্থগুলি নন্দদাসের রচিত কিনা তা নিশ্চিত করে বলা চলে না। বিষয়বস্তু ও ভাষার বৈশিষ্ট্য পরীক্ষা করে চৌদ্দটির লেখক যে নন্দদাস, এমন সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। এই চৌদ্দটি গ্রন্থের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দুটি গ্রন্থ হ'ল : 'রাস-পঞ্চাধ্যায়ী' এবং 'সিদ্ধান্তপঞ্চধ্যায়ী'।

সুরদাসের মতো নন্দদাসের পদাবলীও ভক্তিরস-সমৃদ্ধ ; কিন্তু নন্দদাসের রচনায় কাব্যগুণের ঔজ্জ্বল্য হয়তো অধিকতর আকৃষ্ট করে। দেবেন্দ্রনাথ শর্মা নন্দদাসের রচনা আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন : "ইন রচনাওঁ কো দেখনে সে য়হ স্পষ্ট হৈ কি সুরদাস কী ভাঁতি নন্দদাস কে লিয়ে কবিতা কেবল ভক্তি কা সাধন হী নহীঁ থী ; বহ স্বয়ং সাধ্য ভী থী— অর্থাৎ শুদ্ধ কবিতাকে উদ্দেশ্য সে ভী উন্‌হোনে কবিতা কী হৈ, জিসমেঁ ভক্তি কা কোঈ স্পর্শ নহীঁ হে...।"[২৭৫] অর্থাৎ, এঁর রচনা দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায়, সুরদাসের মতো কবিতা কেবলমাত্র ভক্তিসাধনার পথ নয়, এগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থাৎ শুদ্ধ কবিতা হিসাবেও সার্থক, তাতে ভক্তির কোনো স্পর্শ নেই।

সমালোচক হয়তো বোঝাতে চাইছেন যে, ভক্তি-নিরপেক্ষ মানদণ্ডেও নন্দদাস কবি হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভের অধিকারী।

এসব গ্রন্থ ছাড়া নন্দদাসের অ-গ্রন্থিত পদাবলী তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ; অবশ্য সব পদগুলিই প্রথম শ্রেণীর নয়। তবে, সাধারণত এইসব পদ নিঃসন্দেহে কাব্য সুষমা-মণ্ডিত হয়ে একটি সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে।

কবির মঙ্গলচরণের পদগুলিতে তাঁর ভক্ত হৃদয়ের প্রকাশ :

> বেদ রটত, ব্রহ্ম রটত, সম্ভু রটত, সেস রটত,
> নারদ-সুক-ব্যাস রটত পাৱত নাহিঁ পার রী॥[২৭৬]

—তাঁর গুণগান বেদ রটনা করছেন, ব্রহ্মা রটনা করছেন, শিব রটনা করছেন, শেষনাগ রটনা করছেন। নারদের মুখ থেকে শুনে ব্যাসদেব রটনা করেও এর শেষ করতে পারছেন না।

নন্দদাসের ভক্তহৃদয়ের পরিচয় শুধু মঙ্গলাচরণ পদেই নয়, তাঁর গুরুস্তবগুলির মধ্যেও উপলব্ধি করা যায়।[২৭৬]

নন্দদাস হনুমানেরও জয়গান রচনা করেছেন। সুতরাং অনুমান করা হয়, নন্দদাস রামচরিত-মানস রচয়িতা তুলসীদাসের ভ্রাতা। কবি দীর্ঘদিন তাঁর কাছে ছিলেন। ফলে, গোস্বামী বিঠ্‌ঠলনাথের শিষ্যত্ব গ্রহণ করার পরও তুলসীদাসের প্রভাব সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। আর তাই কৃষ্ণভক্ত কবি, যাঁর কাব্যপ্রেরণা ভাগবত, তিনি হনুমানের জয়গান করেছেন :

> সিন্ধু পার পহুঁচ্যো পৱনপুত দূত শ্রীরঘুনাথ কো।

ছ্যুট্যো জানো ধনুখ তেঁ সর পরম সুভট হাথ কো ॥[২৭৭]

—শ্রীরঘুনাথের দূত হয়ে পবননন্দন সিন্ধু পার হয়ে পৌঁছালেন [লংকায়], যেন পরম শ্রেষ্ঠ হস্তের ধনুকের বাণ ছুটে এলো ।

বল্লভ সম্প্রদায়ের কোনো কবিই এ ধরনের পদ রচনা করেন নি । ব্রজরত্নদাস কবির এই বৈশিষ্ট্য আলোচনা করে বলেছেন : "ঐসা জ্ঞাত হোতা হৈ কি অপনে ভাই গোস্বামী তুলসীদাসজীকে প্রভাব কে কারণ হী ইন্‌হোনে ঐসা কিয়া হৈ ক্যোঁকি অষ্টছাপকে অন্য কবিয়োঁ নে ঐসে পদ নহীঁ বনাএ হৈঁ ।"[২৭৮]

নন্দদাস মূলত মধুররসের কবি । তাঁর সমস্ত কাব্যধারা আলোচনা করলে এটি সহজেই সুস্পষ্ট হয় । তাছাড়া, কবির রচনার মধ্যে মিলনাত্মক পদগুলিই প্রাধান্য পেয়েছে । তবে, অন্যান্য বিষয়ক পদও তিনি রচনা করেছেন । সেদিক থেকে নন্দদাসের পদে বৈচিত্র্যের অভাব নেই ।

যেমন কৃষ্ণের গুণগান শুনেই রাধার অন্তরে পূর্বরাগ উৎপন্ন হয় । কবি রাধার অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন :

কৃষ্ণ নাম জব তেঁ স্রবণ সুন্যো রী আলী,
ভূলী রী ভরন হোঁ তো বাবরী ভঈ রী
ভাঁর ভাঁর আবৈঁ নৈন, চিতহূঁ ন পরৈ চেন,
মুখহূ ন আবৈ বৈন, তন কী দসা কছু ঔর ভঈ রী ।[২৭৯]

—রাধা বলছেন, সখি, কৃষ্ণনাম যবে থেকে শুনেছি ঘর ভুলেছি, পাগলিনী হয়েছি, চোখে জল ভরে আসছে, হৃদয়ে শান্তি পাচ্ছি না, মুখে কথা সরছে না, দেহের অবস্থার কথা কিছু বলার নয় ।

কৃষ্ণ অনুরাগিণী রাধার বর্ণনায় নন্দদাস অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন । ফলে, রাধা হয়ে উঠেছেন স্পষ্ট ও জীবন্ত । এরপরেই দেখা যায়, রাধা কৃষ্ণের রূপে মুগ্ধ । চোখের পলকও বাধা সৃষ্টি করছে । চোখ ভরে কৃষ্ণের রূপমাধুরী রাধা দেখতে পাচ্ছেন না । "দেখন দৈ মেরী বৈরন পলকৈঁ ।"[২৮০] —কৃষ্ণের রূপ দেখতে আজ চোখের পলকও আমার শত্রুতা করছে ।

রাধার রূপ বর্ণনাতেও নন্দদাস পারদর্শি তার পরিচয় দিয়েছেন । তাঁর অনন্য-সাধারণ রূপ শুধু কৃষ্ণকে নয়, যে তাঁকে দেখে সেই সম্মোহিত হয় । একটি পদে নন্দদাস বলছেন— রাধা মান করেছেন, একজন সখী তাঁকে ডাকতে এসেছেন । সখী এসে রাধাকে দেখে এত মুগ্ধ হয়েছেন যে, তিনি স্বয়ং রাধার রূপ দেখবেন না কৃষ্ণকে ডেকে এনে দেখাবেন, তা ভেবে পাচ্ছেন না ।

নন্দদাস প্রভু দোউ বিধি হী কঠিন পরী ।
দেখিবোঁ করোঁ, কিধোঁ লাল হী দিখাউঁ ॥[২৮১]

বল্লভাচার্য ও তাঁর পুত্র গোস্বামী বিঠ্‌ঠলনাথ স্বকীয়া প্রেমে বিশ্বাসী । স্বভাবতই তাঁর সম্প্রদায়ভুক্ত সকলেই এই মত বিশ্বাস করতেন । নন্দদাসও তাঁর ব্যতিক্রম নন । তাই তিনি সাড়ম্বরে রাধা-কৃষ্ণের বিবাহ দিয়েছেন :

দুলহ গিরিধরলাল ছবীলো দুলেহিন রাধা গোরী।[২৮২]

—বর গিরিধারীলাল, বধূ গৌরবর্ণা সুন্দরী রাধা।

বল্লভ সম্প্রদায়ের অষ্টছাপের প্রত্যেক কাব্য সংগ্রহ নিয়ে যদি আলোচনা করা যায়, তবে নিঃসন্দেহে সুরদাসের কাব্য সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর কাব্যের গভীরতা অনস্বীকার্য। কিন্তু কাব্যের সুষমা ও সৌন্দর্য বিচারে নন্দদাস সর্বোৎকৃষ্ট। 'হিন্দী সাহিত্য কা বৃহৎ ইতিহাসে' নন্দদাসের কবিকৃতি সম্পর্কে আমাদের উপরোক্ত বক্তব্যের অনেকটাই সমর্থিত হয়েছে: "যদি হম ভক্তিভাব কী গহনতা ঔর সর্বহিতকারী প্রভাবকে দৃষ্টিকোণোঁ সে সুরদাস, পরমানন্দদাস তথা নন্দদাস, ইন তীন কবিয়োঁ কী উপলব্ধ রচনাওঁ কা তুলনাত্মক অধ্যয়ন করেঁ তো সর্বপ্রথম স্থান সুর কো, দ্বিতীয় স্থান পরমানন্দদাস কো ঔর তৃতীয় স্থান নন্দদাস কো দেঙ্গে। পরন্তু কেবল পদলালিত্য ঔর ভাষামাধুর্য পর দৃষ্টি রখী জায় তো নন্দদাস অপনে কুছ চুনে হুএ গ্রন্থো কী ভাষা কে কারণ প্রথম স্থান ঔর পরমানন্দদাস তৃতীয় স্থান পর রখে জায়েঙ্গে।"[২৮৩]

নন্দদাসের কবি-প্রতিভার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ভাবানুগ শব্দের ব্যবহার ও প্রসাদগুণ। তাঁর ভাষাগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ডঃ দীনদয়ালু গুপ্ত যে মন্তব্য করেছেন, সেটি এখানে স্মরণ করা যেতে পারে: 'ভাষা কী শক্তি, ভাবকে অনুসার শব্দচয়ন পর বহুত নির্ভর রহতী হৈ। নন্দদাস কী ভী ভাষা মেঁ ভাবকে অনুসার শব্দোঁকে প্রয়োগ কা এক ভারী গুণ হৈ, জিসসে ভাব কা এক চিত্র পাঠককে সামনে আ জাতা হৈ।"[২৮৪]

যেমন ফুল-দোলায় রাধা দুলছেন, শব্দ ঝংকারের মধ্য দিয়ে সেই দোলা পাঠক বা শ্রোতার মনের মধ্যেও দোলা জাগায়:

> ফুলন কে তরৌঁ না, কুন্তল লসৈঁ ফুলন কে
> ফুলন কী কিংকিণী সরস সঁবারী
> ফুল-মহল মেঁ ফুলী শ্রীরাধা,
> ফুলন করো নন্দদাস জায় বলিহারী।[২৮৫]

—সুন্দরী রাধার কানে ফুলের অলংকার ও কুন্তল কোমরে ফুলের কিংকণী, ফুল-মহলে রাধা আনন্দে বসে আছেন, আর নন্দদাস তা দেখে বাহবা দিচ্ছেন।

নন্দদাসের এই কান্তকোমল পদের জন্য তিনি জয়দেবের সঙ্গে তুলনীয়।

নন্দদাসের মধুর রসের পদের তুলনায় বাৎসল্যরসের পদ অল্প। বিশেষ করে সুরদাস ও পরমানন্দদাসের বাৎসল্যরসের পদের তুলনায় তাঁর বাৎসল্যের পদ সামান্যই বলা চলে। বাৎসল্যের ক্ষেত্রে সুরদাস বা পরমানন্দদাসের মতো তাঁর কাব্য প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ ঘটেনি। দীনদয়ালু গুপ্ত নন্দদাসের বাৎসল্যের পদ প্রসঙ্গে বলেছেন: "ইন পদোঁ মেঁ বালস্বভাব ঔর বাল-চেষ্টাওঁ কা বৈসা সুক্ষ্ম ঔর মোহক চিত্রণ নহী হৈ জৈসা সুরদাস ঔর পরমানন্দদাস কী রচনাওঁ মেঁ মিলতা হৈ।"[২৮৬] অর্থাৎ, এসব পদে বাল-সুলভ স্বভাবের ও বাল্যলীলার সুক্ষ্ম এবং মনোমুগ্ধকর চিত্র যা সুরদাস ও পরমানন্দ-

দাসের রচনাতে পাওয়া যায়— তা নন্দদাসের পদে নেই।

নন্দদাস অবশ্য তাঁর পূর্বসূরীদের মতো কৃষ্ণের জন্ম থেকেই বাৎসল্যরসের পদ রচনা আরম্ভ করেছেন। যেমন, গোকুলে নন্দগৃহে কৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছেন। এই সংবাদে ব্রজবাসীরা উৎফুল্ল, আর যশোদা অপরিসীম আনন্দে আত্মহারা :

ফুলো ফুলো পুত্র দেখি, লয়ো উর লুমি কৈ।
ফুলী হে জসোদা-মায়, ঢোটা মুখ চুমি কৈ॥[২৮৭]

—যশোদা পুত্র দেখে দেখে উল্লসিত এবং উৎসাহের সঙ্গে বুকে জড়িয়ে ধরছেন, আর পুত্র মুখ চুম্বন করে আনন্দ লাভ করছেন।

নন্দদাস শুধু যশোদার আনন্দের কথা বলেন নি, নন্দের আনন্দকেও অতি সুন্দর-ভাবে ব্যক্ত করেছেন :

ফুলে হৈঁ ভণ্ডার সব দ্বার দয়ে খোলি কৈ।
... ...
নন্দরায় দেত ফুলে 'নন্দদাস' বোলি কৈ॥[২৮৮]

—নন্দদাস বলছেন, আনন্দে নন্দ সমস্ত পরিপূর্ণ ভাণ্ডারের দ্বার খুলে দিয়েছেন। অথাৎ, পুত্রের মঙ্গলকামনায় স্নেহময় পিতা অবারিত হস্তে প্রার্থীদের দান দিচ্ছেন।

নন্দদাস যশোদার অপত্য স্নেহের পর্ণ পরিচয় দিতে গিয়ে কৃষ্ণের শৈশব ও যশোদার পুত্র পালনের রীতিনীতিগুলি সুন্দরভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। কৃষ্ণের উপর অযথা দেবত্ব আরোপ করে বাস্তব জীবনকে বিশেষ ক্ষুণ্ণ করা হয়নি। যেমন—

বাল গোপাল ললন কোঁ, মোদভরী, জসুমতি হুলরাৱতি।
মুখ চুমতি, দেখতি সুন্দর তন, আনন্দ ভরি ভরি গাৱতি॥
কবহুঁক পালনা মেলি ঝুঝাৱতি কবহুক অস্তন পান করাৱতি।
নন্দদাস প্রভু গিরিধর কোঁ বাণী নিরখি নিরখি সুখ পাৱতি॥[২৮৯]

—যশোদা বালক গোপালকে আদর করে আনন্দময় তৃপ্তি লাভ করছেন। কখনো মুখ চুম্বন করছেন, কখনো সুন্দর দেহটি দেখছেন, আবার কখনো আনন্দে গান করছেন। কখনো দোলায় শুইয়ে দোলা দিচ্ছেন, কখনো স্তন্য পান করাচ্ছেন। নন্দদাস বলছেন, গিরিধারীকে দেখে দেখে যশোদার সুখের অন্ত নেই।

যশোদা কৃষ্ণকে কখনো দোলায় দুলিয়ে, কখনো নানাভাবে সাজিয়ে আনন্দ পেতে চান। সন্তানকে পরিচর্যার মধ্যে মায়ের স্নেহাসক্ত অন্তর আনন্দ পায়। মায়ের এই মনস্তত্ত্বকে নন্দদাস সুন্দরভাবে বুঝেছিলেন। তিনি বলেন—

নন্দ কো লাল, ব্রজ পালনৈঁ ঝুলৈঁ।
কুটিল অলকাৱলী, তিলক গোরোচন,
চরণ-অংগুঠা মুখ কিলক-কিলক কুলৈঁ॥[২৯০]

—নন্দের দুলাল ব্রজভূমিতে দোলায় দুলছেন। কুঞ্চিত কেশদাম, কপালে চন্দনের তিলক, পায়ের বুড়ো আঙ্গুল মুখে দিয়ে খিলখিল করে হাসছেন।

কৃষ্ণ একটু একটু করে বড় হয়ে উঠছেন। সকালে যশোদা তাঁকে ঘুম থেকে ডেকে তোলেন। "জগাবতি অপনে সুত কো রাণী।"[২৯১] রাণী যশোদা আপন পুত্রকে ঘুম থেকে জাগাচ্ছেন। কখনো ঘুম থেকে তোলার জন্যে পুত্রকে নানা খাবারের লোভ দেখাচ্ছেন :

মাখন, মিশ্রী ঔর মিঠাঈ দুধ মলাঈ আনী।

ছগন মগন তুম করহু কলেউ, মেরে সব সুখদানী ॥[২৯২]

—মাখন, মিছরি, মিষ্টি, দুধ, সর সব এনে দিয়েছি, সর্বসুখদাতা আমার বাছা, তুমি জলখাবার খেয়ে নাও। আবার কখনো মা বলছেন—

চিরৈয়া-চুহচানী, সুন চকঈ কী বাণী,

কহত-জসোদা-রাণী জাগৌ মেরে লালা।[২৯৩]

—যশোদা বলছেন, পাখী কিচমিচ করে ডাকছে, আমার বাছা, তুমি জাগো!

কৃষ্ণকে বিছানা থেকে তোলার জন্যে যশোদা আরও বলেন, দেখ, সূর্যকিরণ ছড়িয়ে পড়েছে, ব্রজবালারা দধি মন্থন করছে, গোপ-বালকেরা তোমার জন্যে দ্বারে দাঁড়িয়ে আছে। মায়ের কথা শুনে কৃষ্ণ উঠে পড়েন এবং আধো আধো স্বরে মা'র সঙ্গে নানা কথা বলেন।

জননি-বচন সুনি তুরত উঠে হরি কহত বাত তুতরাণী।[২৯৪]

শিশুরা সাধারণত বেশভূষা, দেহের পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। কৃষ্ণ এর ব্যতিক্রম নন। যশোদা কৃষ্ণকে বোঝাচ্ছেন এবং সাজসজ্জা করে দিতে চেষ্টা করছেন। কিন্তু কৃষ্ণের এসব ভালো লাগে না; তিনি যশোদাকে নানাভাবে বাধা দিয়ে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করছেন :

ছগন-মগন বারে, কন্হৈয়া! নৈকু উরৈঘৌ আই রে।

বন মেঁ খেলন জাত, হৈব বহে সব মলিন গাত,

অপনে লালা কী লৈহুঁ বলাই রে।

সঙ্গ কে লরিকা সব বনি-ঠনি আএ

য়ৌ কহিহৈঁ কৈসী হৈ তব মাঈ রে।

জসুদা গহতি ধাই বৈয়াঁ, মোহন করত,

নুহেঁয়া নুহেঁয়া নন্দদাস বলি জাই রে।[২৯৫]

—আমার ছোট সোনা কানাই, কাছে এসো, স্বজনেরা নালিশ করে গেছে, তুমি ধুলোবালি মাখা শরীরে বনে খেলতে চলে যাও। তোমার সব অমঙ্গল, তোমার নিন্দা, আমি মাথায় করে নেবো। দেখ তোমার সখারা সকলে কত সেজেগুজে এসেছে; তারা বলবে, তোমার মা কেমন মানুষ! বলে যশোদা দৌড়ে গিয়ে কৃষ্ণের হাত ধরলেন। কৃষ্ণ যত না না, করছেন, নন্দদাস তত আনন্দিত হচ্ছেন।

এই পদে নন্দদাস গ্রামের মা ও শিশুর একটি জীবন্ত ছবি তুলে ধরেছেন,—একটি সজীব নিত্য পরিচিত ছবি। কোথাও অতিশয়োক্তি নেই, নেই অলৌকিকতা।

নন্দদাসের রচনায় মধুর রসের তুলনায় বাৎসল্যের পদ অল্প হলেও বাস্তবতার

অভাব নেই। কবির পদে গ্রাম্য জীবনের সুন্দর চিত্রও সহজলভ্য। যেমন—

অতি আছী তনক কনক কী দোঁহনী সোঁহিনী
গঢ়াই দৈ রী মৈয়া ;
জাই কহেঁগো নন্দ-ববা সোঁ, আছে পাট কী
মঈ দুহন সিখাই দৈ গৈয়া।
মেরী দাঁঈ কে ঢোটা সব ছোটে, তেউ সীখেঁ রী
করত বন-ধৈয়া ;
'নন্দদাস' প্রভু হঁসত, লোটত অরু ভরত
নৈন জল জসুমতি লেতি বলৈয়া ॥[১৯৬]

—কৃষ্ণ যশোদাকে বলেছেন, মা, আমাকে অতি সুন্দর সোনার ছোট্ট দুধের বাটি গড়িয়ে দাও। আমি নন্দ বাবাকে বলবো— "নতুন পাত্রে গোরু দোহন ভালো করে শিখিয়ে দাও।" আমার চেয়ে ছোট্ট বালকেরা বনে গিয়ে গোরু দোহন করে দুধের ধারা পান করে। এই আবদার যাতে পূর্ণ হয়, সেজন্যে কৃষ্ণ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কান্না শুরু করে দিয়েছেন। তাই দেখে যশোদা তাঁর বালাই নিচ্ছেন, আর নন্দদাস প্রভুর লীলা দেখে হাসছেন।

কবি শুধু যশোদার বাৎসল্যরসের চিত্র এঁকেই ক্ষান্ত নন ; কৃষ্ণের প্রতি তিনি নিজেও অপত্য স্নেহে আপ্লুত।

মাধো জু ! তনিক সো বদন সদন-সোভা কোঁ
তনিক ভৃকুটি পৈ তনিক দিঠোনা।[১৯৭]

—মাধব তোমার ছোট্ট সুন্দর মুখচ্ছবি গৃহের শোভা বর্ধন করছে। তোমার উপর যাতে কু-নজর না পড়ে, তার জন্যে ভ্রূর উপর কাজল পরানো হয়েছে।

কৃষ্ণকে দেখে নন্দদাসের অন্তরের অপত্যস্নেহ স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎসারিত হয়। তাই, কৃষ্ণের মুখের উপর ভ্রমরের মতো চূর্ণ কুন্তল, গলার বাঘনখের মালা, চোখের কাজল সব কিছুর দিকে নন্দদাস মমতায় মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। কখনো কৃষ্ণের আবোল-তাবোল কথাও শুনছেন মুগ্ধ চিত্তে।

অলবল-কল কছু কহাঁত বনাঈ।[১৯৮]

বাৎসল্যরসে অভিভূত নন্দদাসের কৃষ্ণের রূপ দেখে তৃপ্তি হয় না, যেমন যশোদার কৃষ্ণের রূপ দেখে মন ভরে না। যশোদা কৃষ্ণের প্রত্যেকটি কাজই সৌন্দর্যের দীপ্তিতে দেখতে পান, তেমনি নন্দদাসও মমতায় কৃষ্ণের প্রতি পদক্ষেপে রূপমাধুরী আকণ্ঠ পান করেন।

অপত্যস্নেহে কাতর কবির অন্তরের বাৎসল্য নিঃসন্দেহে নন্দদাসের কবিসত্তা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করে তুলেছে। তাছাড়া নন্দদাসের বাৎসল্যের পদ অল্প হলেও, বাস্তব রসে সিঞ্চিত হয়ে সে-সব পদ সজীব সুষমায় বিশিষ্টতা লাভ করেছে।

হিন্দী সাহিত্যে যে কয়েকজন মুসলমান ভক্তকবির নাম পাওয়া যায়, তাঁদের মধ্যে রসখান বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদীজী রসখান সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, সেটি আমাদের আলোচনার প্রারম্ভে স্মরণ করা যেতে পারে : "শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তিকে সাহিত্য মেঁ জিস মধুর ভাব পর বহুত অধিক বল দিয়া গয়া হৈ উসমে বিশ্ব-জনীন তত্ত্ব হৈ। ধর্ম সম্প্রদায় ঔর বিশ্বাসোঁ কে বাহরী বন্ধন উস বিশ্বজনীন মাধুর্য তত্ত্ব কে আকর্ষণ কো রোক নহীঁ সকে হেঁ। উন দিনোঁ অনেক মুস্লিম সহৃদয় ইস মধুর ভাব কী ভক্তিসাধনা সে আকৃষ্ট হুএ থে। ইন সব মেঁ প্রমুখ হৈঁ বাদসা বংশ কী ঠসক ছোড়নে বালে সুজান রসখানি।"[৯৯] অর্থাৎ, কৃষ্ণভক্তি সাহিত্যে যে মধুররসের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে বিশ্বজনীন তত্ত্ব বর্তমান। সাম্প্রদায়িকতা বা বাহ্যিক বন্ধন এই বিশ্বজনীন মাধুর্য তত্ত্বের আকর্ষণকে ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি। ফলে, সেযুগে বহু সহৃদয় মুসলমান মধুর ভাবের ভক্তি সাধনায় আকৃষ্ট হলেন। এঁদের মধ্যে প্রধান বাদশা বংশের কুলমর্যাদা পরিত্যাগকারী সুজন রসখান।

হিন্দীর মধ্যযুগীয় ভক্ত কবিদের মতো রসখানের জীবন-বৃত্তান্তও অন্ধকারাচ্ছন্ন। এমনকি কবির নিজের লেখার মধ্যেও তাঁর বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। শুধুমাত্র রসখানের 'প্রেমবাটিকা' কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি পদে রসখান নিজের সম্পর্কে দু'একটি ইঙ্গিত দিয়েছেন। যেমন—

দেখি গদর হিত সাহিবী, দিল্লী নগর মসান।
ছিনহি বাদসা বংশ কী, ঠসক ছোরি রসখান ॥[১০০]

—অত্যাচার বা বিপ্লবে মান, প্রতিষ্ঠা সব ধূলিসাৎ হয়ে দিল্লী শ্মশান ভূমিতে পরিণত হতে দেখে, বাদশাহী বংশজাত রসখান মিথ্যা অহংকার মুহূর্তে ত্যাগ করলেন।

রসখানের জীবন সম্পর্কে শুধু এইটুকু জানা যায় যে, তিনি দিল্লীতে থাকতেন এবং বাদশাহ বংশের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ ছিল। দিল্লীকে শ্মশান হতে দেখে রসখান সম্পদ ও সম্মান ত্যাগ করে ব্রজভূমিতে চলে আসেন।

কিন্তু 'বাদশাহ' শব্দটি নিয়ে পাণ্ডতদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। কেউ বলেন, তিনি ছিলেন মোগল রাজবংশের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত; আবার কেউ কেউ ভিন্ন মত পোষণ করেন। এই বিতর্কিত বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছেন শ্রীকৃষ্ণ গুপ্ত,[১০১] দুর্গাশংকর মিশ্র[১০২] ও রামচন্দ্র শুক্ল[১০৩] প্রভৃতি আরো অনেকে। বিতর্ক যাই থাক না কেন, তিনি যে সম্ভ্রান্ত বংশীয় ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই।

কবির লেখাতেই পাওয়া যায়, দিল্লীতে তাঁর নিবাস। তবে, শ্রীশিব সিংহ তাঁর 'শিবসিংহ সরোজ'[১০৪] গ্রন্থে কবির বাসভূমি পিহানী বলেছেন। কিন্তু এ নিয়েও যথেষ্ট মতভেদ আছে। ডঃ ভবানীশংকর যাজ্ঞিক তাঁর 'রসখান রত্নাবলী' গ্রন্থে রসখানের জীবন বৃত্তান্ত আলোচনা করতে গিয়ে এই মতের প্রতিবাদ করেছেন।[১০৫]

তাঁর মতে রসখানের জন্মের সময় পিহানী গ্রামের অস্তিত্ব ছিল না।

সুতরাং রসখানের বৃত্তান্ত কিছুই জানা যায় না। তৎকালীন কবিরা আত্মপ্রচার সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন এবং ভক্ত কবিদের মধ্যে জীবন-বৃত্তান্ত লেখার প্রচলনও ছিল না।

'দো সৌ বাবন বৈষ্ণবন বার্তা' গ্রন্থ থেকে এইটুকু জানা যায় যে, গোস্বামী বিঠ্‌ঠল-নাথের ২৫২ জন ভক্ত-শিষ্যের মধ্যে রসখান ছিলেন অন্যতম। রামচন্দ্র শুক্ল তাঁর 'হিন্দী সাহিত্য কা ইতিহাস' গ্রন্থে এই কথাই বলেছেন : "য়ে বড়ে ভারী কৃষ্ণভক্ত ঔর গোস্বামী বিঠ্‌ঠলনাথজী কে বড়ে কৃপাপাত্র শিষ্য থে। দো সৌ বাবন বৈষ্ণবোঁ কী বার্তা মেঁ ইনকা বৃত্তান্ত আয়া হৈ।"[১০৬] এই গ্রন্থ থেকে আরো জানা যায়, রসখান এক বণিকের সুন্দর ছেলের প্রতি প্রচণ্ড আসক্ত ছিলেন। একদিন তিনি শুনতে পান, একজন অপরজনকে বলছেন— বণিকপুত্রের প্রতি রসখানের যেমন তীব্র ভালোবাসা, ঈশ্বরের প্রতিও তেমনি ভালোবাসা থাকা উচিত। একথা শুনে মর্মাহত হয়ে রসখান শ্রীনাথজীকে খুঁজতে গোকুলে আসেন এবং গোস্বামী বিঠ্‌ঠলনাথের কাছে দীক্ষা নেন। রসখানের নামে অন্য একটি আখ্যায়িকাও প্রচলিত। শোনা যায়, তিনি একটি সুন্দরী রমণীর প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত ছিলেন। কিন্তু সেই রমণী নিজের সৌন্দর্য সম্পর্কে এতই সচেতন ছিলেন যে, ভালোবেসে কাউকে আত্মসমর্পণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। এই সময় রসখান ফারসীতে ভাগবতের অনুবাদ পাঠ করে মুগ্ধ হন। গোপিনীদের অলৌকিক প্রেম ও গভীর অনুরাগ তাঁকে আকৃষ্ট করে। তাঁর মনে হয়, কৃষ্ণের নিকট আত্মসমর্পণই শান্তির পথ। তিনি বৃন্দাবনে এসে বিঠ্‌ঠলনাথের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন।[১০৭]

রসখান পদ রচনা আরম্ভ করেন খুব সম্ভব ১৬৪০ সংবতের কাছাকাছি। কারণ বিঠ্‌ঠলনাথের মৃত্যু হয় ১৬৪৩ সংবতে। তার আগেই নিশ্চয় কবির দীক্ষা হয়। তাছাড়া তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'প্রেমবাটিকা' রচনাকাল ১৬৭১ সংবতে। এই কাব্যগ্রন্থেই এর ইঙ্গিত রয়েছে। যেমন—

> বিধু সাগর রস ইন্দু সুভ, বরস সরস রসখান।
> প্রেমবাটিকা রুচি রুচির, চির হিয় হরিখ বখান ॥[১০৮]

—রসখান বলেন, আমি সর্বদা উল্লসিত-হৃদয়ে শুভবর্ষ ১৬৭১ 'প্রেমবাটিকা' রচনা করি। অর্থাৎ, ১৬৭১ বিক্রমাব্দে 'প্রেমবাটিকা' রচিত হয়।

রামচন্দ্র শুক্ল এই মতটি স্বীকার করেছেন।[১০৯] এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে, রসখানের পদাবলীর রচনাকাল সং ১৬৪০ থেকে সং ১৬৭১ পর্যন্ত। কিন্তু কবির রচনা খুব বেশি পাওয়া যায় না। ছোট ছোট পদ বা দোঁহা একত্রিত করে 'প্রেমবাটিকা' নামে একটি কাব্যগ্রন্থ প্রচলিত আছে, এবং তাঁর অন্য কাব্যগ্রন্থের নাম 'সুজন রসখান' বা 'কবিত সবৈয়া'।

গেয় কাব্যগ্রন্থ 'সুজন রসখান' কবির অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। রামচন্দ্র শুক্ল এই সম্বন্ধে বলেন— "ইনকী কৃতি পরিমান মেঁ তো বহুত অধিক নহী হৈ পর জো হৈ বহ

প্রেমিয়ো* কে মর্ম কো স্পর্শ করনেবালী হৈ। ইনকী দো ছোটী ছোটী পুস্তকে অব তক প্রকাশিত হুঈ হৈঁ—'প্রেম বাটিকা' [দোহা] ঔর 'সুজন রসখান' [কবিত সবৈয়া]। ঔর কৃষ্ণভক্তোঁ কে সমান ইনহোনে 'গীতকাব্য' কা আশ্রয় ন লেকর কবিত সবৈয়োঁ মেঁ অপনে সচ্চে প্রেম কী ব্যঞ্জনা কী হৈ।"৩১০

'সুজন রসখান' গ্রন্থে ছোট ছোট পদে কবি কৃষ্ণ ভক্তি, ব্রজানুরাগ, কৃষ্ণপ্রেম, রাধা-কৃষ্ণের রূপ-বর্ণনা, মিলন-বিরহ ইত্যাদি কৃষ্ণের বিচিত্র লীলা বর্ণনা করেছেন।

সুজন-রসখান নামটি পরবর্তী যুগে প্রচলিত হয়। মনে হয়, কবি পদ-রচনার প্রয়োজনে রসখান নামটি গ্রহণ করেছেন। কারো কারো মতে, কবির প্রকৃত নাম সৈয়দ ইব্রাহিম। কিন্তু কবি নিজের রচনায় এ নাম ব্যবহার করেন নি। ব্রজ-সাহিত্যে তিনি রসখান নামেই সুপরিচিত।

রসখানের রচনার অনুভূতিগুলি বড় তীব্র। 'হিন্দী সাহিত্য কা বৃহৎ ইতিহাস' গ্রন্থে এই সম্বন্ধে বলা হয়েছে : "হিন্দী কে মুসলমান কৃষ্ণভক্তোঁ মেঁ সর্বাধিক লোকপ্রিয় কবি রসখান নে নীতিপরক উক্তিয়াঁ ভী প্রস্তুত কী হৈঁ, জিনমেঁ মুখ্য রূপ সে জীবন কে প্রেমতত্ত্ব কী বড়ী মার্মিক অভিব্যক্তি হুঈ হৈ।"৩১১ অর্থাৎ, হিন্দী সাহিত্যে কৃষ্ণ-ভক্ত মুসলমান কবিদের মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় কবি রসখান। কবি নীতি-পদ রচনা করেছেন। কিন্তু, প্রধানত তাঁর প্রেমতত্ত্বমূলক পদগুলি বিশেষরূপে মর্মস্পর্শী।

রসখানের পদে ভক্তির মধ্যে আত্ম নিবেদনের তন্ময়তা লক্ষণীয়। তিনি ভক্তিতে এত তন্ময় যে, পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গে রূপান্তরিত হতেও তাঁর আপত্তি নেই, শুধু নিজের উপাস্যের লীলাভূমিতে থাকতে পারলেই তিনি সৌভাগ্য বলে মনে করেন।

মানুষ হৌঁ তো বহী রসখান
বসৌঁ মিলি গোকুল গাঁব কে গবারন।
জো পসু হৌঁ তো কহা বস মেরো
চরৌঁ নিত নন্দ কী ধেনু মঁঝারন॥
পাহন হৌঁ তো বহী গিরি কো
জু কিয়ৌঁ ব্রজ ছত্র পুরন্দর ধারন॥
জো খগ হৌঁ তো বসেরো করৌঁ
নিত কালিন্দী কূল কদম্ব কী ডারন॥

—রসখান বলেন, যদি তাঁর পুনর্জন্ম হয়, তিনি যেন গোপবালক হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। আর যদি পশু হয়ে তাঁর জন্ম হয়, তবে যেন তিনি নন্দের যে সমস্ত গোরু গোষ্ঠভূমিতে চারণ করে তার মধ্যে থাকেন ; যদি পাথর হয়ে জন্মগ্রহণ করেন, তবে যেন সেই পর্বতের অংশ হন— যে পর্বতকে ইন্দ্রের কোপ থেকে গোকুলবাসীদের রক্ষার জন্যে কৃষ্ণ ছত্র রূপে ধারণ করেছিলেন ; আর যদি পক্ষী হয়ে জন্মান, তবে যেন যমুনার কূলবর্তী কদম্ববৃক্ষে গৃহ নির্মাণ করেন।

পদটিতে কবির ভক্তির প্রগাঢ়তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। ভক্তির আতিশয্যে রসখান কৃষ্ণকে মাঝে মাঝে বাস্তব জীবন থেকে বহুদূরে সরিয়ে এনেছেন। ভক্তির

প্রাবল্যে কৃষ্ণ অলৌকিক শক্তির অধিকারী ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে উঠেছেন।

সেস, গনেস মহেস দিনেস সুরেসহু জাহি নিরন্তর গাবৈঁ।
জাহি অনাদি অনন্ত অখণ্ড অছেদ অভেদ সুবেদ বতাবৈঁ॥[৩১৩]

—শেষনাগ, শিব, গণেশ, সূর্য, ইন্দ্র প্রভৃতি যাঁর নিরন্তর গুণগান কবেন, যাঁকে [কৃষ্ণকে] বেদ ও অনাদি, অনন্ত, অখণ্ড, অচ্ছেদ্য ও অভেদ্য বলে বর্ণনা করেছেন, তাঁকে অভিবাদন করি।

কিন্তু কৃষ্ণের এই ব্রহ্মময় মূর্তিতে রসখান ততটা মুগ্ধ নন। কৃষ্ণের স্বাভাবিক নয়নাভিরাম রূপই কবিকে আকৃষ্ট করে রেখেছে। যেরূপ—

কল কাননি কুণ্ডল মোর পখা উর পৈ বনমাল বিরাজতি হৈ।
মুরলী কর মৈঁ অধরা মুসকানি তরঙ্গ মহা ছবি ছাজতি হৈ॥[৩১৪]

—নিজের সখীকে কোন গোপিনী কৃষ্ণের সৌন্দর্য বর্ণনা দিয়ে বলছেন, কৃষ্ণের দুই কানে সুন্দর কুণ্ডল, মাথায় ময়ূরেব পালকের মুকুট, ব কের উপর বনমালা শোভিত, তাঁর হাতে বাঁশী, অধবে মৃদু হাসি অপরূপ সৌন্দর্য সৃষ্টি কবছে।

কৃষ্ণের প্রেমময় রূপ কবিকে যেমন আকুল করেছে, তেমনি সৌন্দর্য-শিরোমণি রাধার ভুবনমোহিনী-বূপও তাঁকে সমানভাবে আকৃষ্ট করেছে। তাই, রসখান রাধার রূপ বর্ণনায়ও সমান দক্ষ।

কোন কী নাগরি রূপ কী আগরি জাতি লিয়ে সংগ কোন কী বেটী।
জা কো লসৈ মুখ চন্দ সমান সুকোমল অঙ্গনি রূপ লপেটী।[৩১৫]

—রাধাকে যেতে দেখে কৃষ্ণ একজন গোপিনীকে জিজ্ঞাসা করছেন, সৌন্দর্যের আধার এই যে যুবতী, যাঁর মুখ চন্দ্রের মতো সুকোমল, লাবণ্যময় অঙ্গে যেন রূপ ওতপ্রোত-ভাবে মিশে আছে, যাঁর সংগে চলেছ, তিনি কার কন্যা, কার স্ত্রী?

কৃষ্ণের মুগ্ধ দৃষ্টি অবলম্বন করে কবি রাধার সৌন্দর্য সজীব কবে তুলেছেন।

রসখান চীরহরণ, দানলীলা ইত্যাদি কৃষ্ণলীলার অঙ্গগুলিও অতি নিপুণভাবে বর্ণনা করেছেন। যেমন—

আজু মহূঁ দধি বেচন জাত হী মোহন রোখ লিয়োঁ মগ আয়োঁ।[৩১৬]

—আজ আমার দধি বিক্রি করতে যাবার সময় মোহন পথ রোধ করে দাঁড়াল।

রসখানের বংশী-বিষয়ক পদগুলি খুবই সুন্দর। সূরদাস ও নন্দদাসের গোপিনী-দের মতো রসখানের গোপিনীরাও বাঁশীকে নিজেদের সতীন ভাবেন, ঈর্ষা করেন। কারণ, বাঁশী সর্বদা কৃষ্ণের ওষ্ঠে লেগেই আছে এবং মুহূর্ত সঙ্গছাড়া হয় না।[৩১৭]

কিন্তু রসখানের সর্বাপেক্ষা কৃতিত্ব মিলনের পদ-চিত্রণে। রাধা-কৃষ্ণ লীলা-কেলির কমনীয়তা ও বিলাসিতার রর্ণনায় তাঁর অসাধারণ নৈপুণ্য।

আজু অচানক রাধিকা রূপ নিধান সোঁ ভেট ভঈ বন মাঁহী।
দেখত দীঠ জুরী রসখান মিলে ভরি অংক দিয়ে গর বাঁহী॥
প্রেম পগী বতিয়াঁ দুহুঁধাঁ কী দুহূঁ কো লগী অতি হী চিত চাহীঁ।
মোহনী মন্ত্র বসীকর জন্ত্র হহা পিয় কী তিয় কী নহিঁ নাহীঁ॥[৩১৮]

—আজ হঠাৎ রাধা এবং সৌন্দর্যের ভাণ্ডারী কৃষ্ণের দেখা হয়ে গেল। আনন্দ-সাগর-কৃষ্ণ তাঁকে দেখামাত্র গলা জড়িয়ে বাহুপাশে বেঁধে ফেললেন। দুজনেই প্রেমের কথা বলতে লাগলেন। দুজনের মনেই মিলনের প্রবল ইচ্ছা। প্রিয়তম কৃষ্ণের হাঁ, হাঁ করা যদি মোহিনী মন্ত্র হয়, তবে রাধার না, না করা বশীকরণ মন্ত্র।

আপাতদৃষ্টিতে চিত্রটি লৌকিক বলেই মনে হয়। কিন্তু, ভক্ত-কবি লৌকিক জগতকে অবলম্বন করেই অলৌকিক ধামে প্রবেশ করেছেন। রসখানের রচনার এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেই বোধ হয় শ্রীহংসরাজ অগ্রবাল মন্তব্য করেছেন: "ইন্‌হোনে অপনী কবিতাওঁ মেঁ প্রেম কা বহুত সুন্দর চিত্রণ কিয়া হৈ; পরন্ত য়হ প্রেম লৌকিক বসনা সে উচাঁ উঠা হৈ, ঔর ইসমেঁ শারীরিকতা কো নিয়ন্ত্রিত কর বিশ্বজনীন বনানে কা প্রযত্ন কিয়া গয়া হৈ। একাঙ্গী ঔর নিস্বার্থ প্রেম হী ইনকা আদর্শ হৈ।"[৩১৯] অর্থাৎ, কবি তাঁর কবিতাগুলিতে প্রেমের অপূর্ব সুন্দর চিত্র এঁকেছেন। এবং কবি লৌকিক প্রেমের বাসনাকে উন্নততর করে, দৈহিক কামনাকে নিয়ন্ত্রিত করে বিশ্বজনীন করে তোলার সাধনা করেছেন। এদিক দিয়ে নিঃস্বার্থ প্রেমই তাঁর আদর্শ।

কবির সমস্ত পদেই রয়েছে ভাববিহ্বল ঈশ্বর-নিবিষ্ট ঐকান্তিক প্রেম।

রসখান গোস্বামী বিঠ্‌ঠলনাথের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করলেও সুরদাস ও পরমানন্দ-দাস প্রভৃতি অষ্টছাপের কবিদের মতো কৃষ্ণলীলার ধারাবাহিক বৃত্তান্ত রচনা করেন নি। কৃষ্ণের বিভিন্ন লীলার অল্প দু'একটি করে পদ তিনি রচনা করেছেন। তবে তাঁর বিরহের পদ অপেক্ষাকৃত কম।

রসখানের পদে ভাষার নৈপুণ্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর কবিতার ভাষা সরস, সুবোধ্য ও কোমল। কবির এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে বিয়োগী হরি মন্তব্য করেছেন: "ইন্‌হোনে, মুসলমান হোকর ভী ব্রজভাষা মেঁ বড়ী হী উত্তম কবিতা রচী। ইনকী কবিতা মেঁ শব্দাড়ম্বর শায়দ কহীঁ হো। উসমেঁ প্রসার ঔর ভাবগাম্ভীর্য কুটকুট ভরা হুআ হৈ।"[৩২০] অর্থাৎ, কবি মুসলমান হয়েও ব্রজভাষায় উত্তম কবিতা রচনা করেছেন। তাঁর কবিতায় শব্দাড়ম্বর নেই। অথচ ঔদার্য ও ভাব-গাম্ভীর্যে পূর্ণ। মনে হয়, শব্দ-চয়নের জন্যে যেন বিশেষ পরিশ্রমই করতে হয়নি কবিকে।

রসখান সুরদাস ও নন্দদাসের মতো ভাব ও রূপ-চিত্রণে পারদর্শিতা দেখাতে হয়তো পারেন নি। কিন্তু ভাষার ক্ষেত্রে ব্রজ-সাহিত্যে রসখান একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। তাই হিন্দী সাহিত্য কা বৃহৎ ইতিহাসে তাঁর ভাষা-প্রসঙ্গে বলা হয়েছে: "ইনকী রচনাএঁ অপনী ভাষাশৈলী কী সরসতা ঔর প্রভাবোৎপাদকতা কে কারণ বড়ী লোকপ্রিয় হুঈ হৈঁ।"[৩২১] অর্থাৎ, রসখানের ভাষা সরস ও প্রভাবশালী বলে খুবই জনপ্রিয়।

রসখান বাৎসল্যের পদ মাত্র কয়েকটি রচনা করেছেন। অষ্টছাপের অন্যান্য কবিদের মতো, বিশেষ করে সুরদাস বা পরমানন্দদাসের মতো, রসখানের বাৎসল্যের পদে কৃষ্ণের বাল্যলীলার পূর্ণাঙ্গ চিত্র নেই। বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে শিশু-কৃষ্ণের ধীরে ধীরে বড় হয়ে ওঠা, সেই সঙ্গে যশোদার স্নেহ-মমতার বিচিত্র অনুভূতির পরিচয়

পাওয়া যায়। একটি দুটি পদে দেখা যায় যে, কবি কৃষ্ণের বাল্যলীলা দেখে বাৎসল্য রসে আপ্লুত হয়েছেন।

ধূরি ভরে অতি সোভিত স্যাম জূ তৈসী বনীসির সুন্দর চোটী।
খেলত খাত ফিরৈঁ অঁগনা পগ পৈঁজনী বাজতি পীরী কাছোটী॥
ৱা ছবি কৌ রসখান বিলোকত বারত কাম কলানিধি কোটী।
কাগ কে ভাগ বড়ে সজনী হরি হাথ সোঁ লৈ গয়ো মাখন রোটী॥[৩২২]

—ধূলিলিপ্ত কৃষ্ণের দেহ অত্যন্ত সুন্দর দেখাচ্ছে। তাঁর মাথায় সুন্দর বেণী, তিনি আঙ্গিনায় কখনো খেলছেন, আবার কখনো মাখন রুটি খেতে খেতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাঁর পায়ে নূপুর বাজছে, তিনি হলুদ-বরণ কাপড় পরে আছেন। কৃষ্ণের এই সময়ের সৌন্দর্য দেখে কামদেবও নিজের সৌন্দর্যকে তুচ্ছ মনে করছেন; আর ঐ কাকটা বড়ই ভাগ্যবান যে কৃষ্ণের হাত থেকে মাখন রুটী ছোঁ মেরে নিয়ে গেছে।

রসখান শুধু নিজের অন্তরের বাৎসল্য প্রকাশ করে ক্ষান্ত হননি। কৃষ্ণের জন্মের পর যশোদা ও পিতা নন্দের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দকেও সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন। কৃষ্ণকে দেখে অন্যান্য গোপিনীদের অন্তরও যে স্নেহমুগ্ধ হয়, সেকথাও তাঁর পদাবলীতে স্থান পেয়েছে।

লোগ কহৈঁ ব্রজকে রসখান আনন্দিত নন্দ জসোমতি জূ পর।
ছোহরা নাজ নয়ো জনম্যো তুম সো কোউ ভাগ ভরয়ো নহিঁ ভূ পর॥
ৱারি কৈ দান সঁৱার করো অপনে অপচাল কুচাল ললু পর।
নাচত রাৱরো লাল গুপাল সো কাল সোঁ ব্যাল কপাল কে উপর,॥[৩২৩]

—কবি নন্দ-যশোদার আনন্দে উল্লসিত। আজ তোমাদের পুত্র জন্মগ্রহণ করেছেন, তোমাদের মতো ভাগ্যবান পৃথিবীতে কেউ নেই। নন্দ যশোদা তাঁদের ছোট্ট ও দুষ্টু ছেলের বালাই নিয়ে সকল প্রার্থীকে নানাবিধ দান বিতরণ করছেন।

রসখান ভোলেন নি যশোদা বাৎসল্যের শিরোমণি। যশোদার বাৎসল্য রূপায়ণেও কবি যথার্থ সার্থকতা লাভ করেছেন। যেমন, যশোদা কৃষ্ণের পরিচর্যা করছেন, তিনি কৃষ্ণের সমস্ত দেহে তেল মাখাচ্ছেন, চোখে কাজল পরাচ্ছেন, ভ্রূ এঁকে দিচ্ছেন, আবার পরম স্নেহে মাঝে মাঝে আদর করছেন।

আজু গঈ হুতী ভোর হী হোঁ
রসখানি রঈ হিত নন্দ কে ভৌনহিঁ।
ৱাকো জিয়ো জুগ লাখ করোর
জসোমতি কো সুখ জাত কহ্যো নহি॥
তেল লগাই লগাই কৈ অঞ্জন
ভৌঁহ বনাই বনাই ডিঠৌনহিঁ।
ডারি হমেল নিহারতি আনন
ৱারতি জ্যো চুচুকারতি ছোনহিঁ॥[৩২৪]

—একজন গোপিনী অন্য গোপিনীকে বলছেন, আমি আজ সকালবেলা নন্দগৃহে

গিয়েছিলাম। কৃষ্ণের মতো পুত্র পেয়ে যশোদা যে সুখ পেয়েছেন, তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তাঁর পুত্র লক্ষ-কোটি যুগ জীবিত থাকুন। যশোদা তাঁর মাথায় তেল মাখিয়ে দিলেন, চোখে কাজল পরালেন এবং ভ্রূ এঁকে দিলেন, যাতে কারো কুনজর না লাগে তার জন্যে কালো টিপ পরালেন। তারপর ছেলের গলায় হার পরিয়ে তার রূপের বাহার দেখছেন, আর ছেলের বালাই নিয়ে তাঁকে আদর করছেন।

কৃষ্ণ এখন একটু বড় হয়েছেন; যশোদা নিজেই ছেলের সঙ্গে খেলা করেন। আর এই খেলার মধ্যে মা সহজ আনন্দ লাভ করেন। সেই আনন্দে ভাস্বর হয় তাঁর বাৎসল্য রসাসিক্ত রূপ।

'তা' জসুদা কহ্যো ধেনু কী ওট ঢিঁঢোরত তাহি ফিরৈঁ হরি ভূলৈঁ।
ঢূঢ়ন কুঁপগ চারি চলৈঁ মচলৈঁ রজ মাঁহি বিথূরি দুকূলৈঁ॥
হেরি হ সে রসখান তবৈ উর ভাল তৈঁ টারি কৈ ৰার লটূলৈঁ।
সো ছবি দেখি আনন্দ নন্দজু অঙ্গনি অঙ্গ সমাত ন ফুলৈঁ॥[৩২৫]

—কৃষ্ণের বাল্যলীলা দেখে কোনো গোপিনী তাঁর সখীকে বলছেন— কৃষ্ণকে খেলা দেবার জন্যে যশোদা গোরুর পেছনে লুকিয়ে শব্দ করলেন, যা শুনে কৃষ্ণ নিজের অন্য সব কথা ভুলে যশোদাকে খুঁজতে লাগলেন। তিনি যশোদাকে খোঁজার জন্যে অল্প কয়েক পা এগোলেন, কিন্তু মাকে না পেয়ে বায়না ধরেন এবং মাটিতে লুটিয়ে লুটিয়ে নিজের বস্ত্র ধুলোয় মলিন করেন। ছেলের এই অবস্থা দেখে যশোদা তার কাছে আসেন। মাকে দেখে কৃষ্ণের মুখে হাসি ফুটে ওঠে। আর, যশোদা কৃষ্ণের লম্বা লম্বা চুলগুলি সরিয়ে তাঁর মুখ-চুম্বন করতে থাকেন। এই দৃশ্য দেখে নন্দের আনন্দের সীমা নেই।

ছেলের সঙ্গে যশোদার এই খেলাটি বাস্তব জীবনের পরিচিত ঘটনা। তাই এত মনোরম। সেই সঙ্গে পিতা নন্দের অন্তরও কবি অল্প কথায় উদ্ভাসিত করেছেন। তাছাড়া পদটির বৈশিষ্ট্য এই যে, মাতা-পুত্রের খেলার এরূপ বর্ণনা অন্য কোনো হিন্দী বৈষ্ণব কবির রচনায় পাওয়া যায় না।

সন্তানের বিপদের মধ্যে মাতৃস্নেহ একটি অনন্যসাধারণ রূপধারণ করে। সন্তানকে বিপন্ন দেখে মা অধীর হয়ে তাকে রক্ষা করবার জন্যে ব্যাকুল হন। আর, মায়ের স্নেহ-ব্যাকুলতার মধ্যেই ময়ের সার্থক রূপ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। কবি একটি পদে বলেছেন, কৃষ্ণ কালীয়দমনের জন্যে যমুনার জলে নেমেছেন। সাপ তাঁকে জড়িয়ে ধরেছে। যশোদা এ সংবাদ পেয়ে ছুটে এসেছেন যমুনার কূলে। কিন্তু তাঁর পুত্র কৃষ্ণকে সাপের হাত থেকে রক্ষার জন্যে যশোদাকে কেউ সাহায্য করল না। শোকাকুলা যশোদা তাই আক্ষেপ করে তাঁর এক সখীকে বলছেন:

অপুনো সো ঢোটা হন সব হী কে সদা চাহেঁ,
দোউ প্রাণী সব হী কে কাজ নিত ধাৰহীঁ॥
তে তৌ রসখান অব দূর তেঁ তমাসৌ দেখে,

তরণি তনুজা কে নিকট নহি আরহী॥
অদিন পরে তে অনুহিতু সব হয়ে লোগ,
রহে তো অজোগ দেখি লোচন দরাবহী॥
কহা কহৌ আলী খ্যালী দেত সব টালী হায়,
মেরে বনমালী কোন কালী তে ছুড়াবহী॥[৩৬]

—সখি, আমরা [নন্দ ও যশোদা] দু'জনে সমস্ত ব্রজ-বালকদের নিজের ছেলের মতো মনে করি, এবং প্রতিদিন দু'জনে অন্যের কাজে ছুটে যাই। অর্থাৎ, সর্বদা অন্যের সাহায্যে তৎপর থাকি। যশোদা বলছেন— তারাই আজ দূর থেকে তামাশা দেখছে, কেউ যমুনার কাছে পর্যন্ত যাচ্ছে না। আজ দুর্দিন, তাই সবাই মমতাহীন; আর দুঃসময় বলেই সবাই মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। কি বলব, সবাই তামাশা দেখছে, নিজেদের গা বাঁচাচ্ছে, কেউ আমার বনমালীকে কালীয়নাগের কাছ থেকে ছাড়িয়ে আনতে যাচ্ছে না।

কবি কালীয়-দমনের প্রসংগটির মধ্য দিয়ে যশোদার বাৎসল্যের একটি সার্থক রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। যিনি ব্রজের সকলকে নিজের সন্তানতুল্য ভালোবাসেন, আজ তার বিপদে কেউ তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসছে না। ব্রজবাসীর এই উদাসীনতা যশোদাকে আজ চরম বেদনা দিচ্ছে। রসখানের ভাষা-মাধুর্যে প্রতিটি শব্দের মধ্য দিয়ে মায়ের বাৎসল্য রসের যন্ত্রণা মূর্ত হয়ে উঠেছে।

দুঃখের বিষয়, এমন হৃদয়গ্রাহী বাৎসল্যের পদ কবি অল্প কয়েকটি মাত্র রচনা করেছেন। রসখান মূলত মধুররসের কবি।

উপরে যে, পাঁচজন হিন্দী কৃষ্ণকাব্যের কবির কথা বলা হ'ল, তাঁরা ছাড়াও আলোচ্য কালখণ্ডে আরো কিছু কবি বাৎসল্যের পদ রচনা করেছেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অষ্টছাপ সম্প্রদায়ভুক্ত কবি কৃষ্ণদাস, ছীতস্বামী, গোবিন্দস্বামী ও চতুর্ভুজ দাস। চৈতন্য-সম্প্রদায়ের পদকর্তা গদাধর ভট্টও কয়েকটি বাৎসল্যরসের পদ রচনা করেছেন। এছাড়া, হিন্দী-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভক্ত কবি তুলসীদাসের কয়েকটি কৃষ্ণ-বিষয়ক বাৎসল্যের পদ পাওয়া যায় তাঁর গ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণগীতাবলীতে। তবে তিনি মূলত রামকথার কবি, রামকাহিনী বর্ণনায়ই তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ। তাঁর রচিত কৃষ্ণকথায় তেমন ঔজ্জ্বল্য নেই।

নির্দেশিকা

১. চৈতন্যচরিতামৃত, ২।২।৭৭

২. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সম্পাদিত, চণ্ডীদাস-পদাবলী; ভূমিকা, পৃ ৬

৩. দীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৮ম সং, পৃ ১৩২-৩৩

৪· বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ সম্পাদিত, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, দান খণ্ড, পৃ ৮৮

৫· মণীন্দ্রমোহন বসু সম্পাদিত, দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী, ১ম খণ্ড, পদ সংখ্যা ১৫

৬ তদেব, পদসংখ্যা ৩৬

৭· দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী, ১ম খণ্ড, পদ সংখ্যা ৬১

৮· নীলরতন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, চণ্ডীদাসের পদাবলী, পৃ ২৩১

৯ তদেব, পৃ ২৩২

১০· তদেব, পৃ ২৪৩-৪৪

১১ তদেব, পৃ ৯০

১২· তদেব, পৃ ৯১

১৩· তদেব, পৃ ৯৩

১৪· তদেব, পৃ ৯১-৯২

১৫· তদেব, পৃ ৯৩

১৬ তদেব, পৃ ২৩৭

১৭ তদেব, পৃ ২৩৮

১৮· তদেব, পৃ ২৪৪

১৯· তদেব, পৃ ২৪৬

২০· তদেব, পৃ ২৯২

২১ তদেব, পৃ ২৯৩

২২· তদেব, পৃ ২৯৫

২৩· তদেব, পৃ ২৯৬

২৪ চৈতন্যচরিতামৃত, ১।১১।৪৮

২৫ পদকল্পতরু, ৩য় খণ্ড, ৪র্থ শাখা, পদসংখ্যা ২২।২৩১৫

২৬· দীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৮ম সং, পৃ ১৮৭

২৭· সুকুমার সেন, বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড পূর্বার্ধ, ৫ম সং, পৃ ৪১০

২৮· অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ২য় খণ্ড, ২য় সং, পৃ ৬৫৮-৫৯

২৯· মালবিকা চাকী সংকলিত, বাসু ঘোষের পদাবলী, ভূমিকা

৩০· চৈতন্যচরিতামৃত, ১।১১।১৯

৩১· মালবিকা চাকী সংকলিত, বাসু ঘোষের পদাবলী, ভূমিকা

৩২· Sen, Sukumar. A History of Brajabuli Literature, p. 35

৩৩· অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ২য় খণ্ড, ২য় সং, পৃ ৬৬১

৩৪· নটবর দাস, রসকলি

৩৫. মালবিকা চাকী সংকলিত, বাসু ঘোষের পদাবলী, পদসংখ্যা ২০৮
৩৬. দীনবন্ধু দাস, সংকীর্তনামৃত, পৃ ২
৩৭. পদকল্পতরু, ২য় খণ্ড, ৩য় শাখা, পদসংখ্যা ১১।১১৫১
৩৮ মালবিকা চাকী সংকলিত, বাসু ঘোষের পদাবলী, পদসংখ্যা ৬
৩৯. তদেব, পদসংখ্যা ৯
৪০. তদেব, পদসংখ্যা ১৬০
৪১. তদেব, পদসংখ্যা ২০৮
৪২. তদেব, পদসংখ্যা ২০৮
৪৩. পদকল্পতরু, ৩য় খণ্ড, ৪র্থ শাখা, পদসংখ্যা ৪।২২২১
৪৪. তদেব, ৫।২২২২
৪৫. মালবিকা চাকী সংকলিত, বাসু ঘোষের পদাবলী, পদসংখ্যা ১৩৯
৪৬. তদেব, পদসংখ্যা ১৬৬
৪৭. তদেব, ১৬৮
৪৮. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ২য় সং, পৃ ৬৬৫
৪৯. ব্রহ্মচারী অমরচৈতন্য সম্পাদিত, বলরামদাসের পদাবলী, ভূমিকা
৫০. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ২য় সং, পৃ ৬৭৯
৫১. Sen, Sukumar. A History of Brajabuli Literature, p. 77
৫২. নরহরি চক্রবর্তী, ভক্তিরত্নাকর, দ্বাদশ তরঙ্গ, পৃ ৮৩৭
৫৩. পদকল্পতরু, ৩য় শাখা, ২য় খণ্ড, ৮১৭ নং পদ, পৃ ১২৩
৫৪. অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী, পৃ ৫৭
৫৫. ব্রহ্মচারী অমরচৈতন্য সম্পাদিত, বলরামদাসের পদাবলী, পৃ ৩৩
৫৬. তদেব, পৃ ৩৪
৫৭. তদেব, পৃ ৩৪
৫৮. ভাগবত, ১০ম স্কন্দ, ৯ম অধ্যায়, ১৪-১৮ শ্লোক
৫৯. ব্রহ্মচারী অমরচৈতন্য সম্পাদিত, বলরামদাসের পদাবলী, পৃ ৩৪
৬০. তদেব, পৃ ৩৫
৬১. তদেব,, পৃ ৩৭
৬২. তদেব, পৃ ৩৯
৬৩. পদকল্পতরু ২য় খণ্ড, ৩য় শাখা, পদ সংখ্যা ৩।১২১৮
৬৪. তদেব, ২২।১২০৭
৬৫. তদেব, ২৫।১২১০
৬৬. তদেব, ২৯।১২১৪
৬৭ চৈতন্যচরিতামৃত, ১।১১।৫২
৬৮ ভক্তিরত্নাকর, তরঙ্গ ৯।১০।১৪
৬৯. নরোত্তমবিলাস, ষষ্ঠ ও অষ্টম বিলাস।

৭০. Sen, Sukumar. A History of Brajabuli Literature, p. 67

৭১. দীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পৃ: ১৮৪

৭২. Sen, Sukumar. A History of Brajabuli Literature, p. 67-68

৭৩. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, জ্ঞানদাসের পদাবলী, পৃ: ১৭০, পদ ১৬

৭৪ তদেব, ভূমিকা, পৃ: ১৬

৭৫ তদেব, পৃ: ১০১, পদ ১৪

৭৬. তদেব, পৃ: ১২৮, পদ ৯

৭৭. তদেব, পৃ: ১৬২, পদ ৫

৭৮ সুকুমার ভট্টাচার্য সম্পাদিত, জ্ঞানদাস, যশোদার বাৎসল্যলীলা

৭৯ সুকুমার সেন, বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড পূর্বার্ধ, ৫ম সং, পৃ ৪২৮, পাদটীকা

৮০. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, জ্ঞানদাসের পদাবলী, ভূমিকা

৮১. সুকুমার ভট্টাচার্য সম্পাদিত, জ্ঞানদাস, যশোদার বাৎসল্যলীলা, পৃ: ১, পদ ১

৮২. তদেব, পৃ: ২, পদ ২

৮৩. তদেব, পৃ: ৪, পদ ৪

৮৪. তদেব, সুকুমার সেনের ভূমিকা, পৃ: ৫

৮৫ তদেব, পৃ: ১৯, পদ ১৮

৮৬. হরেকৃষ্ণ ও মুখোপাধ্যায় শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, জ্ঞানদাসের পদাবলী, পৃ: ৩৩, পদ ১

৮৭. তদেব, পৃ: ৩৩, পদ ১

৮৮ তদেব, পৃ: ৩৩, পদ ২

৮৯ তদেব, পৃ: ৩৪, পদ ৩

৯০. তদেব, পৃ: ৩৪, পদ ৩

৯১. তদেব, পৃ: ২৭, পদ ১

৯২. যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, দ্বারেশচন্দ্র শর্মাচার্য সংকলিত, রায়শেখর পদাবলী, পৃ: ২৭৪, পদ সংখ্যা ১৮০

৯৩. সতীশচন্দ্র রায়ের অভিমতের জন্য, দ্র. পদকল্পতরু, ৫ম খণ্ড

৯৪ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৬২৩

৯৫. তদেব, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৬১৮

৯৬. পদকল্পতরু, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২১৮

৯৭ দীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৮ম সং, পৃ: ১৮৮

৯৮. বিমানবিহারী মজুমদার, ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য, পৃ: ৬১

৯৯. বিমানবিহারী মজুমদার, ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য, পৃ ১৩৫

১০০. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, পৃ ৬১৬, রায়শেখর অনুচ্ছেদ

১০১. পদকল্পতরু, ২য় খণ্ড, ৩য় শাখা, পদসংখ্যা ১৩।৯৮৫

১০২. যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সংকলিত, রায়শেখরের পদাবলী-পৃ ১, পদ সংখ্যা ১

১০৩. তদেব, পৃ ২, পদ সংখ্যা ২

১০৪. তদেব, পৃ ৮-৯, পদসংখ্যা ৯

১০৫. তদেব, পৃ ৯, পদ সংখ্যা ১০

১০৬. যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সংকলিত, রায়শেখরের পদাবলী, পৃ ১৫৫-৫৬, পদ সংখ্যা ১১২

১০৭. তদেব, পৃ ১৫৭, পদসংখ্যা ১১৩

১০৮. তদেব, পৃ ১৫৪, পদ সংখ্যা ১১১

১০৯. তদেব, পৃ ১৫৩-৫৪, পদ সংখ্যা ১১৬

১১০. বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত, জ্ঞানদাস ও তাঁহার পদাবলী, পৃ ৫৮

১১১. যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সংকলিত, রায়শেখরের পদাবলী, পৃ ১১৪, পদ সংখ্যা ৯৮

১১২. দীনদয়ালু গুপ্ত সংকলিত, হিন্দী সাহিত্য কা বৃহৎ ইতিহাস, ৫ম ভাগ, পৃ ৭৫

১১৩. তদেব, পৃ ৭৫

১১৪. প্রভুদয়াল মীতল অষ্টছাপ পরিচয়, পৃ ৯৭

১১৫. দীনদয়ালু গুপ্ত সংকলিত, হিন্দী সাহিত্য কা বৃহৎ ইতিহাস, ৫ম ভাগ, পৃ ৭৫

১১৬ বলদেব উপাধ্যায়, ভাগবত সম্প্রদায়, পৃ ৪৩২

১১৭. দীনদয়ালু গুপ্ত সংকলিত, হিন্দী সাহিত্য কা বৃহৎ ইতিহাস, ৫ম ভাগ, পৃ ৭৫

১১৮. তদেব, পৃ ৭৬

১১৯ রামচন্দ্র শুক্ল, হিন্দী সাহিত্য কা ইতিহাস, পৃ ১৭২

১২০. ব্রজভূষণ শর্মা ও অন্যান্য সম্পাদিত, কুম্ভনদাস, পৃ ২৪, পদ ৪২

১২১. তদেব, পৃ ৪২, পদ ৯১

১২২. তদেব, পৃ ৪৫, পদ ১০৪

১২৩. তদেব, পৃ ২, পদ ৩

১২৪. তদেব, পৃ ৩, পদ ৫.

১২৫. তদেব, পৃ ৩, পদ ৬

১২৬. তদেব, পৃ ১৮, পদ ২৪

১২৭. তদেব, পৃ ৫৩, পদ ১২৫

১২৮. তদেব, পৃ. ৫৩, পদ ১২৬

১২৯ তদেব, পৃ. ২৭, পদ ৪৮

১৩০. তদেব, পৃ. ৫৫, পদ ১৩২

১৩১. তদেব, পৃ. ৫৪, পদ ১২৮

১৩২. তদেব, পৃ. ৫৫, পদ ১৩৩

১৩৩. তদেব, পৃ. ৫৫-৫৬, পদ ১৩৪

১৩৪. বিজয়েন্দ্র স্নাতক, সূর-সাহিত্যিক-এক-সর্বেক্ষণ— হরবংশলাল শর্মা সম্পাদিত. সূরদাস গ্রন্থের অন্তর্গত প্রবন্ধ, পৃ. ৬৩

১৩৫. রামচন্দ্র শুক্ল, হিন্দী সাহিত্য কা ইতিহাস, পৃ. ১৬৩

১৩৬. দীনদয়ালু গুপ্ত, হিন্দী সাহিত্য কা বৃহৎ ইতিহাস, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫৬

১৩৭. তদেব, পৃ. ৫৭

১৩৮. কৃষ্ণচন্দ্র গুপ্ত, সূরদাস কে অন্ধত্ব কা রূপান্তরণ [রামস্বরূপ আর্য ও গিরিরাজ শরণ অগ্রবাল সম্পাদিত, সূর সাহিত্য সন্দর্ভ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত], পৃ. ৬৬৪

১৩৯. দেবেন্দ্রনাথ শর্মা, ব্রজভাষা কী বিভূতিয়াঁ, পৃ. ১৬

১৪০. দীনদয়ালু গুপ্ত, হিন্দী সাহিত্য কা বৃহৎ ইতিহাস, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫৬-৫৭

১৪১. নন্দদুলারে বাজপেয়ী সম্পাদিত, সূর সাগর, ১ম ভাগ, পৃ. ৭৩, পদ ১২৫

১৪২. দীনদয়ালু গুপ্ত, হিন্দী সাহিত্য কা বৃহৎ ইতিহাস, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫৯-৬০

১৪৩ Bhandarkar, R. G. Collected Works, vol. IV, p. 113

১৪৪. রামচন্দ্র শুক্ল, হিন্দী সাহিত্য কা ইতিহাস, পৃ. ১৬০

১৪৫. হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী, সূরদাস কী রাধা ; সূর সাহিত্য গ্রন্থের অন্তর্গত প্রবন্ধ, পৃ. ৯০৮

১৪৬. হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী, উস যুগ কী সাধনা ঔর তাত্কালিক সমাজ— [হরবংশলাল শর্মা সম্পাদিত সূরদাস গ্রন্থের অন্তর্গত প্রবন্ধ], পৃ. ৫৬

১৪৭. সত্যদেব চৌধুরী, সূর কা সংযোগ-শৃঙ্গার-বর্ণন ; উপরোক্ত গ্রন্থের অন্তর্গত প্রবন্ধ, পৃ. ১০৩

১৪৮. নন্দদুলারে বাজপেয়ী সম্পাদিত, সূর সাগর, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬২৯, পদ ১০৭১।১৬৮৯

১৪৯. ভাগবত, ১০ম স্কন্ধ, ৪৭ অধ্যায়

১৫০. দেবেন্দ্রনাথ শর্মা। ব্রজভাষা কী বিভূতিয়াঁ, পৃ. ২৯

১৫১ নন্দদুলারে বাজপেয়ী সম্পাদিত, সূর সাগর, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭১, পদ ৩৪৯৭।৪৯১৫

১৫২. তদেব, পৃ. ৩২৬, পদ ৩১৯০।৩৮০৮

১৫৩. তদেব, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৩৪, পদ ৩৭১৮।৪৩৩৬

১৫৪. তদেব, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩৫-৩৬, পদ ৩২৩৬।৩৮৫৪

১৫৫ তদেব, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৭, পদ ৪।৬২২

১৫৬. তদেব, পৃ. ২৬০, পদ ৯।৬২৭
১৫৭. তদেব, পৃ. ২৬১, পদ ১১।৬২৯
১৫৮. তদেব, পৃ. ২৭৯, পদ ৫৫।৬৭৩
১৫৯. তদেব, পৃ. ২৭২, পদ ৩৫।৬৫৩
১৬০. তদেব, পৃ. ২৮৪, পদ ৬৮।৬৮৬
১৬১. তদেব, পৃ. ২৭৬, পদ ৪৩।৬৬১
১৬২. তদেব, পৃ. ২৭৬, পদ ৪৩।৬৬১
১৬৩. তদেব, পৃ. ২৮৮, পদ ৮১।৬৯৯
১৬৪. তদেব, পৃ. ২৮৬, পদ ৭৪।৬৯২
১৬৫. তদেব, পৃ. ২৮৬, পদ ৭৫।৬৯৩
১৬৬. তদেব, পৃ. ২৮৬-৮৭, পদ ৭৬।৬৯৪
১৬৭. তদেব, পৃ. ৩০৩, পদ ১২৬।৭৪৪
১৬৮. তদেব, পৃ. ৩৪৬, পদ ২৫৪।৮৭২
১৬৯. তদেব, পৃ. ৩৪৭, পদ ২৫৭।৮৭৫
১৭০. তদেব, পৃ. ৩০০, পদ ১১৫।৭৩৩
১৭১. তদেব, পৃ. ৩১৩, পদ ১৫৫।৭৭৩
১৭২. তদেব, পৃ. ৩৩৭, পদ ২২৪।৮৪২
১৭৩. তদেব, পৃ. ৩৩৬, পদ ২২২।৮৪০
১৭৪ তদেব, পৃ. ৩১৯, পদ ১৭৪।৭৯২
১৭৫. তদেব, পৃ. ৩২৫, পদ ১৮৮।৮০৬
১৭৬ তদেব, পৃ. ৩২৭-২৮, পদ ১৯৫-৮১৩
১৭৭. তদেব, পৃ. ৩২৮, পদ ১৯৬।৮১৪
১৭৮. তদেব, পৃ. ৩৫৯, পদ ২৯৩।৯১১
১৭৯. তদেব, পৃ. ৩৩৫, পদ ২২১।৮৩৯
১৮০. তদেব, পৃ. ৩৩৩-৩৪, পদ ২১৫।৮৩৩
১৮১. তদেব, পৃ. ৩৩৪, পদ ২১৫।৮৩৩
১৮২. তদেব, পৃ. ২৬৯, পদ ২৯৩৫।৩৫৫৩
১৮৩. তদেব, পৃ. ২৭৮, পদ ২৯৭৮।৩৫৯৬
১৮৪. তদেব, পৃ. ৩১৫, পদ ৩১৩৭।৩৭৫৫
১৮৫. তদেব, পৃ. ৩২১, পদ ৩১৬৬।৩৭৮৪
১৮৬. তদেব, পৃ. ৩২২, পদ ৩১৭০।৩৭৮৮
১৮৭. তদেব, পৃ. ৩২২-২৩, পদ ৩১৭২।৩৭৯০
১৮৮. তদেব, পৃ. ৩২৩, পদ ৩১৭৫।৩৭৯৩
১৮৯. তদেব, পৃ. ৩৭৫, পদ ৩৪৩৮।৪০৫৬
১৯০. তদেব, পৃ. ৩৭৫, পদ ৩৪৩৯।৪০৫৭

১৯১. হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী, সূরদাস কী যশোদা, সূর সাহিত্য গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধ, পৃ ১২০

১৯২. Panday, S. N. & Zide, Norman. Suradas and his Krishna Bhakti, in 'Krishna', ed. by Milton Singer, p. 181

১৯৩. নলিনীমোহন সান্যাল, ভক্তপ্রবর মহাকবি সূরদাস, পৃ ৩০

১৯৪. ব্রজভূষণ শর্মা সম্পাদিত, পরমানন্দ সাগর, প্রস্তাবনা, পৃ ১-২

১৯৫. তদেব, প্রস্তাবনায় উদ্ধৃত, পৃ ২

১৯৬. ডঃ দীনদয়ালু গুপ্ত, হিন্দী সাহিত্য কা বৃহৎ ইতিহাস, ৫ম ভাগ, পৃ ৭৭-৭৮

১৯৭ তদেব, ৫ম ভাগ, পৃ ৭৮

১৯৮. তদেব, ৫ম ভাগ, পৃ ৭৮

১৯৯. প্রভুদয়াল মীতল, অষ্টছাপ পরিচয়, পৃ ১৮০

২০০. ডঃ দীনদয়ালু গুপ্ত, হিন্দী সাহিত্য কা বৃহৎ ইতিহাস, ৫ম ভাগ, পৃ ৭৯

২০১. ব্রজভূষণ শর্মা, পরমানন্দ সাগর, প্রস্তাবনা, পৃ ২

২০২. প্রভুদয়াল মীতল, অষ্টছাপ পরিচয়, পৃ ১৮২

২০৩. ডঃ দীনদয়ালু গুপ্ত, হিন্দী সাহিত্য কা বৃহৎ ইতিহাস, ৫ম ভাগ, পৃ ৮১

২০৪. বলদেব উপাধ্যায়, ভাগবত-সম্প্রদায়, ১ম সং, পৃ ৪১০

২০৫. ব্রজভূষণ শর্মা ও অন্যান্য সম্পাদিত, পরমানন্দ সাগর, পৃ ১০৪, পদ ২২৮

২০৬. তদেব, পৃ ১০৬, পদ ২৩১

২০৭. তদেব, পৃ ১০৭, পদ ২৩৫

২০৮. প্রভুদয়াল মিতল, অষ্টছাপ পরিচয়, পৃ ১৮১

২০৯. ব্রজভূষণ শর্মা ও অন্যান্য সম্পাদিত, পরমানন্দ সাগব, পৃ ২৩৭, পদ ৫৩৬

২১০. তদেব, পৃ ১৮৫, পদ ৪১৭

২১১ তদেব, পৃ ৮-৯

২১২. তদেব, পৃ ৯

২১৩. তদেব, পৃ ৩২৮, পদ ৭৫৩

২১৪. প্রভুদয়াল মীতল, অষ্টছাপ পরিচয়, পৃ ১৮২

২১৫. ব্রজভূষণ শর্মা ও অন্যান্য সম্পাদিত, পরমানন্দসাগর, প্রস্তাবনা, পৃ ১১

২১৬. তদেব, প্রস্তাবনা, পৃ ১১

২১৭. তদেব, পৃ ২০১, পদ ৪৫৩

২১৮. S. M. Panday and Norman Zide. Surdas and his Krishna-bhakti, in 'Krishna', ed. by Milton Singer, p. 179

২১৯. প্রভুদয়ালু মীতল, অষ্টছাপ পরিচয়, পৃ ১৮১

২২০. ব্রজভূষণ শর্মা ও অন্যান্য সম্পাদিত, পরমানন্দ সাগর, প্রস্তাবনা, পৃ ৬

২২১. তদেব, পৃ ৪, পদ ৮

২২২. তদেব, পৃ ৩, পদ ৭

২২৩ তদেব, পৃ. ২০, পদ ৪১
২২৪ তদেব, পৃ. ১৯, পদ ৪০
২২৫. তদেব, পৃ. ২৬, পদ ৫৭
২২৬. তদেব, পৃ. ২৬, পদ ৫৭
২২৭. তদেব, পৃ. ৩০, পদ ৬৬
২২৮. তদেব, পৃ. ৩১, পদ ৬৮
২২৯ তদেব, পৃ. ৩৩, পদ ৭১
২৩০. তদেব, পৃ. ১৩, পদ ৩১
২৩১. তদেব, পৃ. ৫৫, পদ ১১৮
২৩২. তদেব, পৃ. ৫৮, পদ ১২৩
২৩৩. তদেব, পৃ. ১৮, পদ ৩৬
২৩৪ তদেব, পৃ. ৪৬, পদ ১০০
২৩৫. তদেব, পৃ. ৪৯, পদ ১০৬
২৩৬ তদেব, পৃ. ৪১-৪২, পদ ৯১
২৩৭. তদেব, পৃ. ৬১, পদ ১৩২
২৩৮ তদেব, পৃ. ৬১, পদ ১৩২
২৩৯. তদেব, পৃ. ৬১. পদ ১৩১
২৪০ তদেব, পৃ. ৬১, পদ ১৩১
২৪১ তদেব, পৃ. ১৬৯. পদ ৩৮১
২৪২. তদেব, পৃ. ১২১, পদ ২৬৩
২৪৩. তদেব, পৃ. ১২১, পদ ২৬৪
২৪৪. তদেব, পৃ. ১১১-১২, পদ ২৪৩
২৪৫. তদেব, পৃ. ১১২, পদ ২৪৩
২৪৬. তদেব, পৃ. ৩৯, পদ ৮৫
২৪৭. তদেব, পৃ. ৩৫, পদ ৭৮
২৪৮. তদেব, পৃ. ১৪২-৪৩, পদ ৩১৭
২৪৯. তদেব, পৃ. ১৪৪, পদ ৩২১
২৫০. তদেব, পৃ. ১৪৪, পদ ৩২১
২৫১. তদেব, পৃ. ১৪০, পদ ৩১১
২৫২. তদেব, পৃ. ৮০, পদ ১৭২
২৫৩. তদেব, পৃ. ৮৫, পদ ১৮৩
২৫৪. তদেব, পৃ. ৮৮, পদ ১৯০
২৫৫. তদেব, পৃ. ৯২, পদ ১৯৮
২৫৬. তদেব, পৃ. ৭০, পদ ১৫১
২৫৭. তদেব, পৃ. ৭১, পদ ১৫২

২৫৮. তদেব, পৃ. ৪১৬, পদ ৯৫৭

২৫৯ দীনদয়ালু গুপ্ত, অষ্টছাপ ঔর বল্লভ সম্প্রদায়, ২য় ভাগ, পৃ. ৭৩৫

২৬০. ব্রজভূষণ শর্মা ও অন্যান্য সম্পাদিত, পরমানন্দসাগর, পৃ. ৪২২, পদ ৯৭৩

২৬১ তদেব, পৃ. ৫০০, পদ ১১৪২

২৬২. তদেব, পৃ. ৪৯৮, পদ ১১৩৮

২৬৩ তদেব, পৃ. ৪৯৮, পদ ১১৩৮

২৬৪ তদেব, পৃ. ৪৯৯, পদ ১১৪০

২৬৫ তদেব, পৃ. ৫০০-৫০১, পদ ১১৪৩

২৬৬. তদেব, পৃ. ৫১০, পদ ১১৬৫

২৬৭ প্রভুদয়াল মীতল, অষ্টছাপ পরিচয়, পৃ. ৩১৬

২৬৮. রামকুমার বর্মা, হিন্দী সাহিত্য কা আলোচনাত্মক ইতিহাস, ৩য় সং, পৃ ৫৪৩

২৬৯. দীনদয়ালু গুপ্ত, হিন্দী সাহিত্য কা বৃহৎ ইতিহাস, ৫ম ভাগ, পৃ. ৯০

২৭০. তদেব, পৃ. ৯০

২৭১. তদেব, পৃ. ৯০

২৭২. দেবেন্দ্রনাথ শর্মা, ব্রজভাষা কী বিভূতিয়াঁ, পৃ. ৫১

২৭৩ দীনদয়ালু গুপ্ত, হিন্দী সাহিত্য কা বৃহৎ ইতিহাস, ৫ম ভাগ, পৃ. ৯১

২৭৪. দেবেন্দ্রনাথ শর্মা, ব্রজভাষা কী বিভূতিয়াঁ, পৃ. ৫১

২৭৫. ব্রজরত্নদাস সম্পাদিত, নন্দদাস পদাবলী, পৃ. ২৭৯, পদ ১

২৭৬. তদেব, পৃ. ২৮১, পদ ৬

২৭৭ তদেব, পৃ. ২৮৫, পদ ২০

২৭৮. তদেব, ভূমিকা, পৃ. ১১৮

২৭৯. তদেব, পৃ. ২৯৭, পদ ৫৪

২৮০ তদেব, পৃ. ৩০৩, পদ ৭৯

২৮১. তদেব, পৃ. ৩২০, পদ ১৪০

২৮২. তদেব, পৃ. ২৯৯, পদ ৬০

২৮৩. দীনদয়ালু গুপ্ত, হিন্দী সাহিত্য কা বৃহৎ ইতিহাস, পৃ. ৯৯

২৮৪. দীনদয়ালু গুপ্ত, অষ্টছাপ ঔর বল্লভ সম্প্রদায়, ২য় ভাগ, পৃ. ৮৭৬

২৮৫. ব্রজরত্নদাস, সম্পাদক, নন্দদাস পদাবলী, পৃ. ৩২৮, পদ ১৭২

২৮৬. দীনদয়ালু গুপ্ত, অষ্টছাপ ঔর বল্লভ সম্প্রদায়, ২য় ভাগ, পৃ. ৮৬৯

২৮৭. ব্রজরত্নদাস সম্পাদিত, নন্দদাস গ্রন্থাবলী, পৃ. ১৮৯, পদ ২৮

২৮৮. তদেব, পৃ. ২৯০, পদ ২৮

২৮৯. উমাশংকর শুক্ল সম্পাদিত, নন্দদাস, ২য় ভাগ, পৃ. ৩৩১, পদ ৭৫

২৯০. ব্রজভূষণ শর্মা সম্পাদিত, নন্দদাস গ্রন্থাবলী, পৃ. ২৯২, পদ ৩৪

২৯১ তদেব, পৃ. ২৯১, পদ ৩১

২৯২. তদেব, পৃ ২৯১, পদ ৩১

২৯৩. তদেব, পৃ ২৯১, পদ ৩২

২৯৪. তদেব, পৃ ২৯১, পদ ৩১

২৯৫. ব্রজরত্নদাস সম্পাদিত, নন্দদাস গ্রন্থাবলী, পৃ ২৯২, পদ ৩৬

২৯৬ তদেব, পৃ ২৯৩, পদ ৩৯

২৯৭. তদেব, পৃ ২৯৩, পদ ৪০

২৯৮. তদেব, পৃ ২৯৪, পদ ৪১

২৯৯. হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী, দুর্গাশংকর মিশ্রের রসখান কা অমর কাব্য, (১ম সং), পরিশিষ্ট, পৃ ৯১

৩০০. ভবানীশংকর যাজ্ঞিক সম্পাদিত, রসখান রত্নাবলী, পৃ ৭১, পদ ৪৮

৩০১. শ্রীকৃষ্ণ গুপ্ত, রসখান, পৃ ৭৩

৩০২. দুর্গাশংকর মিশ্র, রসখান কা অমর কাব্য, পৃ ১২

৩০৩. রামচন্দ্র শুক্ল, হিন্দী সাহিত্য কা ইতিহাস, পৃ ১৮৫

৩০৪. শিবসিংহ, শিবসিংহ সরোজ, পৃ ৪৮১

৩০৫. ভবানীশংকর যাজ্ঞিক, রসখান রত্নাবলী, ভূমিকা, পৃ ৯-১০

৩০৬. রামচন্দ্র শুক্ল, হিন্দী সাহিত্য কা ইতিহাস, পৃ ১৮৫

৩০৭. তদেব, পৃ ১৮৫

৩০৮. ভবানীশংকর যাজ্ঞিক সম্পাদিত, রসখান গ্রন্থাবলী, পৃ ৭১, পদ ৫১

৩০৯. রামচন্দ্র শুক্ল, হিন্দী সাহিত্য কা ইতিহাস, পৃ ১৮৫

৩১০ তদেব, পৃ ১৮৫-৮৬

৩১১. দীনদয়ালু গুপ্ত, হিন্দী সাহিত্য কা বৃহৎ ইতিহাস, ৫ম ভাগ, পৃ ৪৯১

৩১২ ভবানীশংকর যাজ্ঞিক সম্পাদিত, রসখান রত্নাবলী, পৃ ৭৩, পদ ১

৩১৩. তদেব, পৃ ৭৫, পদ ৮

৩১৪. তদেব, পৃ ১১২, পদ ১১৭

৩১৫. তদেব, পৃ ১০৩, পদ ৯১

৩১৬ তদেব, পৃ ১০৭, পদ ১০৪

৩১৭. তদেব, পৃ ১১৩, পদ ১২০

৩১৮. তদেব, পৃ ১৫৪, পদ ২২৭

৩১৯. শ্রীহংসরাজ অগ্রবাল, দুর্গাশংকর মিশ্রের রসখান কা অমর কাব্য গ্রন্থের পরিশিষ্ট, পৃ ৯৫

৩২০. বিয়োগী হরি, দুর্গাশংকর মিশ্রের রসখান কা অমর কাব্য গ্রন্থের পরিশিষ্ট, পৃ ৯০

৩২১. দীনদয়ালু গুপ্ত সংকলিত, হিন্দী সাহিত্য কা বৃহৎ ইতিহাস, ৫ম ভাগ, পৃ ৪৯১

৩২২. ভবানীশংকর যাজ্ঞিক সম্পাদিত, রসখান রত্নাবলী, পৃ ৮৪, পদ ৩২

৩২৩. তদেব, পৃ. ৮৪-৮৫, পদ ৩৪

৩২৪. তদেব, পৃ. ৮৩, পদ ৩১

৩২৫. তদেব, পৃ. ৮৩, পদ ৩০

৩২৬. তদেব, পৃ. ৮৪, পদ ৩৩

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলা ও হিন্দী বাৎসল্যরসের পদাবলী তুলনামূলক আলোচনা

তুলনামূলক আলোচনা সম্পর্কে দুটি পরস্পরবিরোধী অভিমত আছে। জন ডান বলেছেন— 'Comparisons are odious'।[১] প্রত্যেক লেখক ও শিল্পী নিজস্ব ভাবনা ও ব্যক্তিত্বের দ্বারা শিল্প রচনা করেন। সুতরাং যে শিল্পকর্মের রচয়িতাদের মধ্যে মূলগত পার্থক্য রয়েছে সেখানে ভালো-মন্দ, ছোট-বড়, বিচার করতে যাওয়া বিরক্তিকর।

কিন্তু আমাদের আলোচ্য বিষয়ের ক্ষেত্রে তুলনা করবার সুবিধা আছে। সেটা হ'ল এই যে, বাংলা ও হিন্দী বৈষ্ণব কবিরা একই সূত্র থেকে নানা কাহিনী আহরণ করে কৃষ্ণ-কেন্দ্রিক কাব্য রচনা করেছেন। সুতরাং এই ক্ষেত্রে আমাদের পক্ষে তুলনা করে দেখানো সম্ভব,—কোথায় কোন কবি একই বিষয় প্রস্ফুটিত করতে গিয়ে সফলতা অর্জন করেছেন, অথবা উভয়ভাষী কবির দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পার্থক্যই বা কোথায়। এরূপ তুলনামূলক আলোচনা বিরক্তিকর নয়, বরং আনন্দদায়ক— যাকে শেক্সপিয়র বলেছেন : Comparisons are odorous.[২]

ভাগবতের অনুসরণ বৈষ্ণব ভক্ত-কবিদের মূল উদ্দেশ্য ছিল কৃষ্ণের লীলাগান। তা তিনি বাঙালি-কবিই হোন, অথবা হিন্দী-ভাষী কবিই হোন। নিছক কাব্য রচনার উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁরা পদ রচনা করেন নি। কবির ভক্তি মানসিকতাই মুখ্য ; এবং বাংলা ও হিন্দী ভাষার বৈষ্ণব কবিদের ভক্তির উৎসভূমি ভাগবত। বাংলা ও হিন্দী বৈষ্ণব পদ-সাহিত্যে ভাগবত যে অঙ্গাঙ্গি সম্পর্কান্বিত এবং তা এতই সুপ্রকাশ যে প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। উভয় ভাষার কবিরা ভাগবতের পীঠভূমিতে দাঁড়িয়ে যে কৃষ্ণলীলার কাহিনী বর্ণনা করেছেন, তা অভিনবরূপে বাংলা ও হিন্দী বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

হিন্দী বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদকর্তা সুরদাস কৃষ্ণলীলা গানের সূচনাতেই ভাগবতের নিকট তাঁর অপরিসীম ঋণের স্বীকৃতি দিয়েছেন :

ব্যাস কহে সুকদের সোঁ দ্বাদস-স্কন্ধ বনাই।
সুরদাস সোঁঈ কহে পদ ভাষা করি গাই ॥[৩]

—ব্যাসদেব দ্বাদশ স্কন্দে শুকদেবকে যা বলেছেন, সুরদাস সেই কথাই দেশীয় ভাষায় গাইবেন।

এছাড়া, তাঁর রচনার বহু স্থানে তিনি ভাগবতের প্রভাবের কথা স্বীকার করেছেন, "সুর কহ্যা ভাগরত অনুসার"।

বাংলা ও হিন্দী পদাবলী-সাহিত্যে বর্ণিত প্রসঙ্গগুলি মোটামুটি ভাগবতানুগ বলা যায়। কৃষ্ণের জন্মলীলা থেকে আলোচনার সূত্রপাত করা যেতে পারে। কৃষ্ণের আবির্ভাবের সময় আসন্ন, সমস্ত পরিবেশ রমণীয়, শুভক্ষণ উপস্থিত। বিষ্ণু দেবকীর গর্ভ থেকে আবির্ভূত হলেন— "তমদ্ভুতং বালকমম্বুজেক্ষণং চতুর্ভুজং শঙ্খগদাদ্যুদায়ুধম্।"[৪] অর্থাৎ, বালকের কমল-নয়ন চতুর্ভুজের শঙ্খচক্রগদাপদ্ম।

পরমপুরুষের আবির্ভাবে, "সূতিকাগৃহং বিরোচয়ন্তং গতভাঃ প্রভাবাবিৎ।"[৫] অর্থাৎ বালক নিজের অঙ্গ-প্রভায় সূতিকাগৃহ আলোকিত করে রেখেছেন। বসুদেব ও দেবকী নতমস্তকে তাঁর স্তব করতে লাগলেন। বিষ্ণু চতুর্ভুজ মূর্তি পরিহার করে প্রাকৃত মানব-শিশুর রূপধারণ করলেন। ভগবানের আদেশে নিষ্ঠুর কংসের হাত থেকে রক্ষার জন্যে বসুদেব নবজাত শিশুকে নিয়ে যাত্রা করলেন বৃন্দাবনে। কারাগারের দ্বার আপনি উন্মুক্ত হ'ল। ভয়ংকর দুর্যোগপূর্ণ রাত্রি, নিরুপায় বসুদেব তারই মধ্যে যমুনা পার হলেন। শেষনাগ তার ফণা বিস্তার করে শিশুকে রক্ষা করলেন বর্ষণের হাত থেকে। ভগবানের আদেশে বৃন্দাবনে নন্দগৃহে যশোদার ক্রোড়ে জন্ম নিয়েছেন যোগমায়া। বসুদেব নন্দগৃহে এসে গোপদের নিদ্রিত দেখে কৃষ্ণকে যশোদার শয্যায় রেখে তাঁর কন্যাকে নিয়ে ফিরে এলেন।

বাংলা ও বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে একমাত্র দীন চণ্ডীদাস ছাড়া কোনো প্রথম শ্রেণীর কবিই কৃষ্ণের জন্ম সম্পর্কে কিছুই বলেন নি। এই প্রসঙ্গে ডঃ গীতা চট্টোপাধ্যায় বলেছেন : "বিস্ময়কর, কোনো প্রথম শ্রেণীর কবিপ্রতিভা কৃষ্ণের জন্মলীলার প্রতি আকৃষ্ট হয়নি। বোধ করি, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের বৈশিষ্ট্যবশত কৃষ্ণের নিত্যলীলায় বিশ্বাসী পদকর্তা কৃষ্ণ-জন্মের প্রসঙ্গে আগ্রহহীন।"[৬] দীন চণ্ডীদাস তার পদ রচনায় ভাগবতকে বিশেষভাবে অবলম্বন করেছেন। তাই তাঁর রচনায় কৃষ্ণের জন্ম, বাল্যলীলা, গোষ্ঠ ইত্যাদির মধ্যে ভাগবতের প্রভাব সুস্পষ্ট। দীন চণ্ডীদাস সম্পর্কে ডঃ গীতা চট্টোপাধ্যায় তাই বলেছেন— "ভাগবতীয় ঘটনা বিবরণের নৈষ্ঠিক অনুবর্তনে উৎসাহী ছিলেন।"[৭]

দীন চণ্ডীদাসের পদাবলীতেও ভাগবতের মতোই জন্মের পর কৃষ্ণের অলৌকিক জ্যোতিতে চতুর্দিক উদ্ভাসিত হয়েছিল :

রূপের ছটায়ে আন্ধার ঘরেতে

জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠে।[৮]

বসুদেব ও দেবকী অনুভব করেন তাঁদের সন্তান—

দেবের দেবতা পরম ঈশ্বর[৯]

এবং দেবতা জ্ঞানেই তাঁরা ঈশ্বরের আরাধনা শুরু করেন। কৃষ্ণ বৈষ্ণবী মায়ায় দেবকী ও বসুদেবের দেব-জ্ঞান হরণ করলেন :

চতুর্ভুজ ছাড়ি

দ্বিভুজ হইলা পূর্ণ।[১০]

তখন দেব-মহিমা ভুলে কৃষ্ণকে দেবকী নিজের সন্তান জ্ঞানে কোলে তুলে নিলেন : কিন্তু কংসের হাত থেকে পুত্রকে রক্ষার জন্যে বসুদেব ও দেবকী ভাবনায় আকুল হয়ে পড়লেন। সেই মুহূর্তে দৈববাণী হ'ল :

নন্দ ঘোষ-ঘরে রাখিহ ছাবালে

ঘুচক হিরার বেথা।[১১]

ভাগবতে আছে, গভীর রাত্রে প্রসবক্লান্ত মূর্ছিত যশোদার কোলে কৃষ্ণকে রেখে পরিবর্তে তাঁর সদ্যোজাত কন্যাকে নিয়ে বসুদেব ফিরে এলেন। সকালে ঘুম ভাঙলে যশোদা পুত্রের মুখ দেখে উৎফুল্ল হলেন এবং সমস্ত গোকুলে নন্দ-যশোদার পুত্র হয়েছে, এই সংবাদে উৎসব শুরু হয়ে গেল। ভাগবতের এই বিস্তৃত বর্ণনা অন্যান্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব কবিদের পদে সামগ্রিক ভাবে না হলেও কিছু কিছু ইঙ্গিত আছে।

নিদ্রা অচেতন রাণী কিছুই না জানে,

চেতন পাইযা পুত্র দেখিল নয়নে ॥

... ...

একথা শুনিয়া নন্দ আনন্দিত মন।

একে একে চলিলেন সূতিকা ভবন ॥[১২]

দীন চণ্ডীদাস ভাগবত অনুসারী হয়েও নন্দগৃহে কৃষ্ণকে রেখে যাওয়ার ঘটনায় তাঁর স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয়। গভীর রাত্রে সম্পূর্ণ গোপনে (দীন চণ্ডীদাসের পদে) বসুদেব একাজ করেন নি। বসুদেব নন্দগৃহে এসে নন্দ এবং যশোদাকে তাঁর শিশুপুত্রের অলৌকিকত্ব সম্পর্কে বলছেন :

বসুদেব বলে— ...লেহ

দিলাঙ তোমার ঠাঞি ॥

লালন পালন করিবে ছাআলে

এই সে তোমার পুত্র।

মনের আনন্দে ...দিলাঙ

কহিল ইহার সূত্র ॥[১৩]

বসুদেব একথাও স্বীকার করেছেন যে, তিনি কংসের হাত থেকে পুত্রকে রক্ষা করবার জন্যে তাঁদের কাছে এসেছেন। তারপরই দেখি—

এ বোল শুনিঞা আনন্দে জসদা

বালক লইঞা কোলে ॥[১৪]

হিন্দী বৈষ্ণব কবিরাও ভাগবতেরই পুনরাবৃত্তি করেছেন। বসুদেব ও দেবকী অত্যাচারী কংসের হাত থেকে পুত্রকে রক্ষা করার জন্যে ব্যাকুল। তখন কৃষ্ণ তাঁর চতুর্ভুজ মূর্তি নিয়ে প্রত্যক্ষ হলেন তাঁদের কাছে। "দুখিত দেখি বসুদেব দেবকী, প্রগট ভএ ধরি কৈ ভুজ চারৈ।"[১৫]— বসুদেব ও দেবকীকে দুঃখিত দেখে কৃষ্ণ তাঁর চতুর্ভুজরূপ ধারণ করলেন। দেবকী ও বসুদেব পুত্রের অলৌকিক রূপ দেখে বিস্মিত হলেন। কৃষ্ণ তাঁদের বললেন—

তুরত মোহি গোকুল পহুঁচাবহু,' য়হ কহি কৈ সিসু বেষ ধরয়ৌ।[১৬]

—তাড়াতাড়ি আমাকে গোকুলে পৌঁছাও, একথা বলেই তিনি শিশুরূপ ধারণ করলেন। পুত্রের জীবন রক্ষার জন্যে পিতা বসুদেব নবজাত শিশু কৃষ্ণকে নিয়ে বৃন্দাবনের পথে যাত্রা করলেন।

ভাদোঁ কী রয়নি অঁধিয়ারী

গরজত গগন দামিনী কৌঁধতি গোকুল চলে মুরারী।[১৭]

—ভাদ্র মাসের অন্ধকার রাত্রি, মেঘ গর্জন করছে, ক্রুদ্ধ বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, মুরারী গোকুলে চলেছেন। ভয়ংকর অন্ধকারে ও প্রবল বৃষ্টির মধ্যে বসুদেব কৃষ্ণকে নিয়ে যমুনা পার হলেন। প্রচণ্ড বর্ষণের হাত থেকে শিশুকে রক্ষা করার জন্যে—

"সেস সহস্র ফণ বূঁদ নিবারত সেত ছত্র সির তান্যোঁ।"[১৮]

—শেষনাগ শ্বেত ছত্রের মতো নিজের সহস্র ফণা বিস্তার করে তাঁর [কৃষ্ণের] মাথার উপর মেলে তাঁকে বৃষ্টি থেকে রক্ষা করলেন। বসুদেব শিশুকে মূর্ছিত যশোদার কাছে রেখে ফিরে এলেন মথুরায়। সকালে নিদ্রাভঙ্গের পর কোলের কাছে যশোদা কৃষ্ণকে দেখে নিজের পুত্র মনে করে তাঁকেই বক্ষে টেনে নিলেন এবং আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে নন্দকে সংবাদ পাঠালেন।

জাগী মহরি, পুত্র মুখ দেখ্যো, পুলকি অঙ্গ উব মৈঁ ন সমাই।

গদ-গদ কণ্ঠ, বোল নহি আবৈ, হরষবন্ত হৈব নন্দ বুলাই ॥[১৯]

—জেগে উঠে পুত্রমুখ দেখে যশোদার অঙ্গ পুলকিত হ'ল; তাঁর আনন্দের সীমা নেই। গদ্-গদ্ কণ্ঠ, কথা বলতে পারছেন না, হরষিত হয়ে তিনি নন্দকে ডেকে পাঠালেন।

অধিক বয়সে নন্দের পুত্র-সন্তান হয়েছে। স্বভাবতই নন্দগৃহে আজ উৎসব। সমস্ত বৃন্দাবন আনন্দে মগ্ন।

কোন গোপ ধেয়া গিয়া দধি দুগ্ধ ঘৃত লয়্যা

উভারয়ে নন্দের ভবনে।

দুজনে দুজন মেলি বাহু যুদ্ধ পেলাপেলি

কোন গোপ করয়ে নর্তনে।[২০]

ভাগবতেও এই নন্দ মহোৎসবের বর্ণনা রয়েছে, যা বাংলা পদাবলীর মতোই উচ্ছ্বাসমুখর।

গোপাঃ পরস্পরং হৃষ্টা দধিক্ষীরঘৃতাম্বুভিঃ।
আসিঞ্চন্তো বিলিম্পন্তো নবনীতৈশ্চ চিক্ষিপুঃ॥[২১]

—গোপগণ পরমানন্দে দধি দুগ্ধ ঘৃত ও জল দ্বারা পরস্পরের দেহে অভিষিক্ত করে এবং পরস্পরের দেহে মাখন লিপ্ত করছেন ও মাখন একে অন্যের প্রতি নিক্ষেপ করছেন। হিন্দী বৈষ্ণব পদাবলীতেও এই উৎসবের বর্ণনা ভাগবতানুসারী।

বাংলা ও হিন্দী বৈষ্ণব পদাবলীতে কৃষ্ণের মৃত্তিকা ভক্ষণ ও যশোদাকে বিশ্বরূপ প্রদর্শনের প্রসঙ্গটি সম্পূর্ণ ভাগবতকে অনুসরণ করেই রচিত। বাংলা পদে আছে—

বদন মেলিয়া গোপাল রাণী পানে চায়।
মুখ মাঝে অপরূপ দেখিবারে পায়॥
এ ভূমি আকাশ আদি চৌদ্দ ভুবন।
সুরলোক নাগলোক নরলোকগণ॥
... ...
দেখি নন্দ ব্রজেশ্বরী বচন না স্ফুরে।
স্বপ্ন প্রায় কি দেখিনু হেন মনে করে॥
নিজ-প্রেমে পরিপূর্ণ কিছুই না মানে।
আপন তনয় কৃষ্ণ প্রাণ মাত্র জানে।
ডাকিয়া কহয়ে নন্দে আশ্চর্য বিধান।
পুত্রের মঙ্গল লাগি বিপ্রে কর দান॥[২২]—উদ্ধবদাস

হিন্দী বৈষ্ণব পদাবলীতে অনুরূপ বর্ণনাই পাওয়া যায়, কোনো ব্যতিক্রম নেই। এখানে সুরদাস যে রূপান্তর করেছেন, তা উদ্ধৃত করা যেতে পারে—

অখিল ব্রহ্মাণ্ড-খণ্ড কী মহিমা, দিখরাঈ মুখ মাঁহি।
সিন্ধ-সুমের-নদী-বন-পর্বত চকিত ভঈ মন চাহি॥

—যশোদা কৃষ্ণের মুখের ভিতর, অখিল ব্রহ্মাণ্ডের মহিমা দেখলেন এবং তিনি আশ্চয হয়ে আরো দেখলেন সমুদ্র, নদী, বন ও পর্বত ইত্যাদি।

ভাগবতে মৃত্তিকা ভক্ষণের প্রসঙ্গে আছে—

সা তত্র দদৃশে বিশ্বং জগৎ স্থানু চ খং দিশঃ।
সাদ্রিদ্বীপাব্ধিভূগোলং সবাম্বগ্নীন্দুতারকম্॥
জ্যোতিশ্চক্রং জলং তেজো নভস্বান্ বিয়দেব চ।
বৈকারিকানীন্দ্রিয়ানি মনোমাত্রা গুণাস্ত্রয়ঃ॥[২৩]

—কৃষ্ণের মুখগহ্বরে যশোদা বিশ্বরূপ দর্শন করলেন। সেই মুখবিবরে স্থাবর, জঙ্গম, অন্তরীক্ষ, দশদিক, পর্বত, দ্বীপ, সাগর সহ ভূগোলক এবং প্রবাহবায়ু, বিদ্যুতের ঝলক, চন্দ্র, তারকামণ্ডল, জ্যোতিষচক্র, জল, তেজ, বায়ু আকাশ, মহৎ, অহংকার, ইন্দ্রিয়সকল এবং তাদের নিয়ন্ত্রণকারী দেবতাসমূহ, মন শব্দাদি বিষয় সকল ও সত্ত্বাদিগুণ— এই সমস্ত একই সঙ্গে যশোদা দেখতে পেলেন।

আর, সেই অকল্পনীয় বিরাট সর্বব্যাপী বিশ্বচিত্রের এক পাশে যশোদা দেখতে

পেলেন ব্রজধাম এবং নিজেকে। বিশ্বরূপ দর্শন করে ভীতিবিহ্বল যশোদা ভাবছেন : কিং স্বপ্ন এতদুত দেবমায়া কিংবা মদীয়ো বত বুদ্ধিমোহঃ।"[২৪] অর্থাৎ, একি স্বপ্ন? না, ভগবানের মায়া, অথবা আমারই বুদ্ধি বিভ্রমের লক্ষণ?

বিশ্বরূপ দর্শনের ফলে যশোদার মন যখন ক্রমশ তত্ত্বজ্ঞান প্রাধান্য লাভ করছিল, তখনই কৃষ্ণ যশোদার উপর অপত্য-স্নেহের বৈষ্ণবী মায়া বিস্তার করায় যশোদা বিশ্বরূপ দর্শনের স্মৃতি বিস্মৃত হয়ে স্নেহবিগলিত চিত্তে পুত্রকে কোলে তুলে নিলেন। তিনি আবার ফিরে এলেন লৌকিক জগতে।

ভাগবতে বিশ্বরূপ বর্ণনায় যে গাম্ভীর্য, ভয়, বিস্ময় এবং অসীম ব্রহ্মাণ্ড কল্পনায় যে কবিত্ব উপলব্ধ হয়, বাংলা বা হিন্দী পদাবলীতে তার একান্তই অভাব। তাছাড়া, মূল ভাগবতের ঐশ্বর্যবোধের চিত্র অনেকটা ফিকে হয়েছে। পদাবলীর বর্ণনা অনেক সহজ ও স্বাভাবিক। বাৎসল্যের অনুভূতি কৃষ্ণকে ঐশ্বর্যলোক থেকে একেবারে বাস্তবলোকে এনে উপস্থিত করেছে।

প্রসঙ্গত সুরদাসের একটি পদের উল্লেখ করা যেতে পারে। যশোদা কৃষ্ণের মুখের ভিতরে বিশ্বরূপ দর্শনের বিবরণ দেবার পর নন্দ বলছেন—

কহত নন্দ জসুমতি সোঁ বাত।
কহা জানিঐ, কহতেঁ দেখ্যৌ, মেরৈঁ কান্হ বিসাত॥
পাচ বরষ কো মেরৌ কন্‌হৈয়া, অজবজ তেরী বাত।
বিনহী কাজ সাঁটি লে ধাবতি, তা পাছে বিললাত॥
কুসল রহেঁ বলবান স্যাম দোউ খেলত-খাত-অন্থাত।[২৫]

—যশোদার কাছে বিশ্বরূপ দর্শনের কথা শুনে নন্দ যশোদাকে বলছেন, কি জানি আমার কানাইয়ের মধ্যে তুমি কি দেখেছ, তাই নিয়ে শুধু শুধু কানাইয়ের উপর রাগ করছ। পাচ বছরের আমার ছোট্ট কানাই, আশ্চর্য তোমার কথা। বিনা কারণেই তুমি লাঠি নিয়ে ওদের পেছনে ছুটছ। বলরাম-শ্যাম দুজনে খেলছে, স্নান করছে, খাচ্ছে, কুশলে আছে। পিতা নন্দ তো তাই চান।

নন্দ লৌকিক পুত্র স্নেহে এমনই অন্ধ যে, তিনি কৃষ্ণের ঐশ্বর্যরূপ কল্পনা করতে পারেন না এবং চানও না।

বাংলা পদাবলীতেও মানবিক স্নেহ অলৌকিকত্বকে অবিশ্বাস করবার প্ররোচনা দেয়। তবে, গৌড়ীয় পদকর্তারা নন্দের স্নেহকে বড় করে দেখেন নি। যশোদা কৃষ্ণের মুখে বিশ্বরূপ দেখেও বিশ্বাস করতে পারছেন না :

নিজ-প্রেমে পরিপূর্ণ কিছুই না মানে।
আপন তনয় কৃষ্ণ প্রাপ মাত্র জানে॥
ডাকিয়া কহয়ে নন্দে আশ্চর্য বিধান।
পুত্রের মঙ্গল লাগি বিপ্রে কর দান॥
এ দাস উদ্ধবে কবে ব্রজেশ্বরীর প্রেম।
কিছু না মিশায় যেন জাম্বুনদ হেম॥[২৬]

পদাবলী সাহিত্যে যশোদার বাৎসল্য অতুলনীয়। মাতৃহৃদয়ের এই স্নেহোৎকণ্ঠই যশোদাকে প্রতি মুহূর্তে মহিমান্বিত করেছে। কিন্তু ভাগবতে বাৎসল্যের যে সর্বোৎকৃষ্ট চিত্র অঙ্কিত হয়েছে এমন কথা বলা কঠিন। কারণ, কৃষ্ণের ঐশ্বর্যময় মহিমা প্রায়ই যশোদা ও নন্দকে বিভ্রান্ত করেছে; কিন্তু পদাবলীতে যশোদার স্নেহ, "কিছু না মিশায় যেন জাম্বুনদ হেম।" এই প্রসঙ্গে ডঃ গীতা চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্যটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে: "ভাগবতে যে মাতৃহৃদয় অর্ধোন্মোচিত, বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে তাই পূর্ণ প্রস্ফুটিত।"[২৭]

বাংলা পদাবলী সাহিত্যে ভাগবতের প্রভাব অপেক্ষাকৃত কম। অথচ হিন্দী কৃষ্ণকাব্য অপেক্ষা বাংলা কাব্যে অধিকতর প্রভাব থাকা ছিল স্বাভাবিক। কারণ, অন্যান্য বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ব্রহ্মসূত্রের নিজস্ব ব্যাখ্যা করেছেন। বল্লভাচার্য শ্রীব্রহ্মসূত্রাণুভাষ্য রচনা করে নিজস্ব ব্যাখ্যা প্রচার করেছেন। কিন্তু গৌড়ীয় পদাবলী সাহিত্যের প্রাণপুরুষ চৈতন্যদেব নিজে কোনো গ্রন্থ রচনা করেন নি। গৌড়ীয় সম্প্রদায় প্রয়োজন বোধ করেন নি ব্রহ্মসূত্রের নতুন কোনো ভাষ্যের। তাঁরা ভাগবতকেই বেদান্তসূত্রের প্রামাণ্য ভাষ্য হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এমন নির্ভরতা সত্ত্বেও গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদাবলী হিন্দী কৃষ্ণকাব্যের মতো ভাগবত দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হয়নি।

সুরদাস, পরমানন্দদাস প্রভৃতি কবিরা ভাগবতে বর্ণিত কৃষ্ণ-কথা ধারাবাহিক ভাবে বিবৃত করেছেন। কিন্তু বাঙ্গালি বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে একমাত্র দীন চণ্ডীদাস কৃষ্ণ-কাহিনীর ধারাবাহিকতা রক্ষায় সচেষ্ট ছিলেন। অন্য বাঙ্গালি পদকর্তারা ভাগবতের কয়েকটি প্রসঙ্গ নিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে পদ রচনা করেছেন। ভাগবত কাহিনী সামগ্রিকরূপে পদাবলীতে স্থান দেবার উদ্দেশ্য তাঁদের ছিল না।

সুরদাস এবং অন্যান্য হিন্দী বৈষ্ণব কবিরা অনেক ক্ষেত্রে ভাগবতের আক্ষরিক অনুবাদ করেছেন। আক্ষরিক অনুবাদ যেখানে নেই, সেখানেও কবিরা ভাগবতের বর্ণনার প্রতি মোটামুটি বিশ্বস্ততার স্বাক্ষর রেখেছেন।

ভাগবত ও বাংলা পদাবলী

ভাগবতের বিশ্বস্ত বিবরণ ভাষান্তর করায় উৎসাহ ছিল না গৌড়ীয় পদকর্তাদের। বিশ্বস্ততার কথা দূরে থাক, কৃষ্ণ-কাহিনীর কোনো একটি প্রসঙ্গের সার্বিক উপস্থাপনেও তাঁদের যত্নবান দেখা যায় না। বিশ্বরূপ দর্শনের যে বর্ণনা ভাগবতে আছে, তার সঙ্গে উপরে উদ্ধৃত বাংলা বিবরণটি অনুধাবন করলেই এর সত্যতা উপলব্ধি করা যাবে।

হিন্দী পদকর্তাদের ভাগবতের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার পরিচয় সুস্পষ্ট। কিন্তু তেমন স্পষ্ট নয় বাংলা পদাবলী সাহিত্যে। বিশেষ করে পদ রচনার ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য।

কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে বাৎসল্যরসের যে বিস্তার ঘটেছে, বাংলা ও হিন্দী পদাবলী সাহিত্যে তার একটু তাত্ত্বিক ভূমিকা প্রয়োজন। হিন্দীভাষী বৈষ্ণব কবিদের একমাত্র

উপাস্য দেবতা কৃষ্ণ। কৃষ্ণ ও পদকর্তার মধ্যে কোনো দেবোপম মহামানবের আবির্ভাব ঘটেনি,— যে আবির্ভাব ভক্তের মন মূল লক্ষ্য থেকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারে। তাই তাঁরা ভাগবত-বর্ণিত কৃষ্ণের প্রতি বিশ্বস্ততা রক্ষা করে তাঁর লীলাকীর্তন করেছেন। পদকর্তা ও কৃষ্ণের মধ্যে ছিলেন দীক্ষাগুরু। অধিকাংশ বিশিষ্ট হিন্দী বৈষ্ণব কবি ছিলেন বল্লভ সম্প্রদায়ভুক্ত। তাঁরা দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন বল্লভাচার্যের কাছ থেকে। কেউ কেউ বা পুত্র বিঠ্‌ঠলনাথকে গুরুপদে বরণ করেছেন।

বল্লভাচার্য পাণ্ডিত্যে এবং ধর্মসাধনায় আদর্শ পুরুষ। সকল বৈষ্ণবের শ্রদ্ধার পাত্র। প্রসিদ্ধি এই যে, বল্লভাচার্য ৮৪ খানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। বর্তমানে মাত্র শ্রীব্রহ্মসূত্রাণুভাষ্য, জৈমিনীসূত্রভাষ্য ও ভাগবতের সুবোধিনী টীকা— এই তিনখানি অসম্পূর্ণ গ্রন্থ পাওয়া যায়। একটি বিশেষ দার্শনিক মতবাদের প্রবক্তা হিসাবে বল্লভাচার্য সম্মানিত।

চৈতন্যদেব বহুভাষাবিদ্ পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু কোনো গ্রন্থ রচনা করেন নি। শুধু কয়েকটি শ্লোক তাঁর নামে চিহ্নিত। পাণ্ডিত্য ও তত্ত্বগত দার্শনিকতা তাঁর ব্যক্তিত্বের উপর সামান্যই প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে। তাঁর জীবনই তাঁর বাণী। সে জীবন করুণাঘন ও প্রেমময়। তাকে দেখে, তাঁর কথা শুনে, তাঁর জীবনকথা জেনে লোকে মুগ্ধ হতো। চৈতন্যের প্রভাব সীমিত সংখ্যক সহচরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। এবং শুধু ধর্ম নয়, সামাজিক ক্ষেত্রেও তাঁর প্রভাব পড়েছিল। কেবল বাংলা দেশে নয়, ভারতের বিস্তৃত অঞ্চলে চৈতন্যের ব্যক্তিত্বের মহিমা প্রচার লাভ করেছিল।

এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয় অবশ্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব কবিদের উপর চৈতন্যদেবের প্রভাব এবং পদাবলীতে তার প্রতিফলন। এটা আগেই বলা দরকার, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় দুটি শাখায় বিভক্ত। একটি নবদ্বীপ কেন্দ্রিক, আর একটির কেন্দ্র বৃন্দাবন। বৃন্দাবনের বাঙালী বৈষ্ণবরা ছিলেন পণ্ডিত, তাঁদের কাজ ছিল বৈষ্ণব ধর্মের তাত্ত্বিক ভূমিকা বিধিবদ্ধ করা। ষড়গোস্বামীদের অনেকেই পদাবলী রচনা করেছেন, কিন্তু তা প্রায় সবই সংস্কৃতে। তাঁরা চৈতন্যদেবের লীলা প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ পেয়েছেন কম। তাই তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও বৃন্দাবনের বৈষ্ণবাচার্যগণ চৈতন্যদেবকে অতিমানব হিসাবে গণ্য করেন নি। সুতরাং এঁদের উপাস্য দেবতা ছিলেন কৃষ্ণ ; তাঁদের উপর চৈতন্যের প্রভাব কখনো এমন প্রবল হতে পারেনি যার ফলে কৃষ্ণের মূর্তি আচ্ছন্ন হতে পারে।

কিন্তু যেসব বাঙালী পদকর্তা চৈতন্যের দিব্যোন্মাদ প্রত্যক্ষ করেছেন, অথবা সমকালের কিংবা অব্যবহিত পরবর্তীকালের যেসব ভক্ত-কবি চৈতন্য-প্রভাবান্বিত পরিমণ্ডলে বাস করেছেন, তাঁদের নিকট মহাপ্রভু ছিলেন অবতার স্বরূপ। নবদ্বীপ কেন্দ্রিক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নিকট তিনিই ভক্তের পরম আরাধ্য, তাঁর মধ্যে একাধারে মিলন ঘটেছে রাধা ও কৃষ্ণের। নরহরিদাসের 'গৌরনাগর' তত্ত্ব অনুসারে চৈতন্য 'নাগর' এবং ভক্তেরা নাগরীরূপে তাঁর ভজনা করেন,— রাগানুগা ভক্তির শ্রেষ্ঠ পরিণতি। মুরারিগুপ্ত চৈতন্যকে বলেছেন 'যুগাবতার'। কবি কর্ণপুর চৈতন্যকে দ্বি-ভুজ কৃষ্ণ বলে বিশ্বাস

করতেন।[২৮] প্রায় সকল চৈতন্য-জীবনীকারই বলেছেন, শ্রীকৃষ্ণই শচীনন্দন রূপে জন্ম-গ্রহণ করেছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজকেই উদ্ধৃত করা যাক—

ভাগবত ভারত শাস্ত্র আগম পুরাণ।
চৈতন্যকৃষ্ণ অবতার প্রকট প্রমাণ ॥[২৯]

বৃন্দাবনের গোস্বামীরা চৈতন্যের অবতারত্ব সম্বন্ধে নীরব। তাঁরা ভাগবতের নির্দেশ মান্য করতেন— 'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং'।

সুতরাং বাঙালী পদকর্তাদের কাছে চৈতন্যের অবতাররূপে ছিল নিকটতর; কৃষ্ণ কিছুটা দূরের এবং কিছুটা বা চৈতন্যের দ্বারা আচ্ছন্ন। তাই, বাংলা পদাবলীতে ভাগবতের কৃষ্ণ তেমন উজ্জ্বল হয়ে ওঠেন নি। বরং চৈতন্যের প্রতি শচীর বাৎসল্যের চিত্র উজ্জ্বলতর রূপে প্রতিভাত। হিন্দীর বাৎসল্য রসাশ্রিত পদাবলী মূলত কৃষ্ণ-কেন্দ্রিক। কোথাও কোথাও রাধার প্রতি ছিটেফোঁটা স্নেহ বর্ষিত হয়েছে। কোনো অবতারের মূর্তি কৃষ্ণের স্বরূপ মূর্তিকে ভক্তের হৃদয় থেকে আড়াল করতে পারেনি।

অবশ্য বল্লভাচার্যকেও কেউ কেউ অবতার হিসাবে দেখেছেন। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত এই প্রসঙ্গে বলেছেন "এই 'পুষ্টি' সম্প্রদায়ের ভক্তগণের বিশ্বাস ছিল বল্লভাচার্য এবং তৎপুত্র বিঠ্ঠলনাথ শ্রীকৃষ্ণের অবতার ছিলেন এবং অষ্টছাপের আটজন কবি ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের অষ্ট সখাসখির অবতার।"[৩০] কিন্তু এই অবতার-ভাবনা শুধু বল্লভাচার্যের দীক্ষিত শিষ্যদের মধ্যে গণ্ডিবদ্ধ ছিল। প্রত্যেক শিষ্যের নিকটই তাঁর দীক্ষাগুরু ঈশ্বরের প্রতিনিধি। এই চিরাগত বিশ্বাসের জন্যেই সূরদাস, কুম্ভনদাস, প্রভৃতি অষ্টছাপের কবিরা গুরুকে অবতার হিসাবে দেখেছেন। যেমন, কুম্ভনদাস বলেছেন:

আজু বাধাঈ শ্রীবল্লভ-দ্বার।
প্রগট ভএ পুরণ পুরুষোত্তম প্রগট করন লীলা-অবতার ॥[৩১]

—আজ বল্লভ-দ্বারে বন্দনা করি। নিজের অবতারলীলা দেখাবার জন্য পুরু-ষোত্তমের নতুন করে আবির্ভাব ঘটেছে।

এই সংকীর্ণ কবিগোষ্ঠীর বাইরে বল্লভাচার্যের অবতারত্বের সামগ্রিক স্বীকৃতি পাওয়া যায় না। এমনকি অষ্টছাপের কবিরাও তাঁকে অবলম্বন করে সার্থক পদ রচনা করেছেন, তারও বড় একটা দৃষ্টান্ত নেই। অপরদিকে, চৈতন্যদেবের সমকালীন এবং পরবর্তী কালের বহু কবি চৈতন্যের জীবন ও সাধনাকে বিষয় করে অনেক উৎকৃষ্ট পদ রচনা করেছেন। একজন হিন্দী সমালোচকের মন্তব্য থেকে আমাদের উপরোক্ত মত সমর্থিত হবে: "হিন্দী বৈষ্ণব সাহিত্য মে বল্লভাচার্য পর ভী কুছ পদ মিলতে হৈ। উনমে উন্‌হে পরব্রহ্ম কৃষ্ণ অবতার সব বাতায়া হৈ। উক্তিয়ো কী সমানতা হোতে হুএ ভী উনমে সে উনকে ঈশ্বরত্ব কী ভাবনা দৃঢ় বিশ্বাস কে রূপ মে পরিলক্ষিত নহী হোতী।"[৩২] অর্থাৎ, হিন্দী বৈষ্ণব সাহিত্যেও কিছু পদ পাওয়া যায় যাতে বল্লভা-চার্যকে পরব্রহ্ম কৃষ্ণের অবতার বলা হয়েছে। উক্তির মধ্যে মিল থাকা সত্ত্বেও অর্থাৎ হিন্দী ও বাংলা-বৈষ্ণব কবিতায় গুরু-বন্দনার পদে মিল থাকা সত্ত্বেও বল্লভচার্যকে ঈশ্বরের

সঙ্গে একাত্ম করার ভাবনাটি দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হয়নি।

এই কারণেই হিন্দী পদকর্তারা ভাগবত-বর্ণিত কৃষ্ণ-কাহিনী যথাযথরূপে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে নিজেদের রচনায় স্থান দিয়েছেন। সুতরাং বাংলা কাব্যে ভাগবতের প্রতি যে বিশ্বস্ততার অভাব, হিন্দী পদাবলীতে তা নেই।

শচীমাতার বাৎসল্য বাংলার পদকর্তাদের অন্যতম অবলম্বন। গৌরাঙ্গকে অবলম্বন করে রচিত বাৎসল্যের পদগুলি মানবিক গুণে উজ্জ্বলতর মনে হয়।। ভাগবতের প্রসঙ্গ-গুলির বাংলা রূপান্তরে কোথাও কোথাও কৃষ্ণের পরিবর্তে গৌরাঙ্গকেই নায়ক করা হয়েছে। যেমন, ভাগবতে কৃষ্ণের চাঁদের জন্যে বায়না বাসুদেব ঘোষের পদে হয়েছে গৌরাঙ্গের বায়না।[৩৩] এমনি বহু ক্ষেত্রেই কৃষ্ণ ও চৈতন্য প্রায় অভিন্ন। এই অভিন্নতা-বোধের প্রমাণ তাঁর বহুল প্রচলিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে।

হিন্দী কবিরা ঐশ্চর্যলোকের কৃষ্ণকে একেবারে ঘরের ছেলে করেছেন ; আর বাঙালী কবিরা এক অসাধারণ মানবপুত্রকে দেবত্বের পথে এগিয়ে নিয়েছেন। অবশ্য, বাৎসল্যের পদাবলীতে দেবত্বের পরিবেশ সৃষ্টিতে কবিরা তেমন উৎসুক ছিলেন না। কিন্তু গৌরাঙ্গের জীবন ও সাধনা অবলম্বন করে অন্যান্য প্রসঙ্গের পদাবলীও রচিত হয়েছে। বাংলা পদাবলীতে গৌরাঙ্গের প্রভাবের সবচেয়ে বড় প্রমাণ গৌরচন্দ্রিকা, যা কীর্তনের পূর্বে অবশ্যই গীত হয়। বাংলায় গৌরাঙ্গকেন্দ্রিক বাৎসল্য ও অন্যান্য বিষয়ক পদাবলীর মতো রচনা হিন্দীতে নেই।

বাংলা ও হিন্দী পদাবলীর মধ্যে আর একটি বড় পার্থক্য এই যে, বাংলায় মধুর রসের প্রাধান্য এবং হিন্দীতে প্রাধান্য বাৎসল্যের। চৈতন্যদেব ছিলেন মধুর-রসের সাধক। রাধাভাবে ভাবিত হয়ে তিনি কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হতেন। অতএব তাঁর অনুগামী কবিরা স্বভাবতই মধুরভাবের সাধনাকেই ঈশ্বরানুভূতির চরম ও শ্রেষ্ঠ স্তর হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। তাঁরা অন্য চারটি রসের পদাবলীও রচনা করেছেন, কিন্তু লক্ষ্য ছিল মধুর রস। মধুর রসে পোঁছতে হলে শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য রস আস্বাদন করে যেতে হবে— এই হ'ল সাধনার রীতি। সুতরাং বাঙালী পদকর্তাদের নিকট বাৎসল্য, যাত্রাপথে বিরামভূমি বলা যায়।

হিন্দী কবিদের বাৎসল্য রসাশ্রিত পদাবলীর প্রাচুর্য, বৈচিত্র্য ও উৎকর্ষ বিচার করলে প্রতীয়মান হবে, বাৎসল্যকে তাঁরা শুধু বিরামভূমি হিসাবে গণ্য করেন নি। হিন্দী ভক্ত-কবিদের সাধনায় বাৎসল্য ভাবনার বিশেষ স্থান ছিল। কেননা, অষ্টছাপের কবিদের গুরু বল্লভাচার্য ছিলেন বালগোপালের উপাসক। কবিদের তিনি বাৎসল্যের পদ রচনায় উৎসাহ দিতেন। সুরদাস যখন দীক্ষা নিতে এসে জানান এ পর্যন্ত তিনি শুধু বিনয়-পদ রচনা করেছেন, তখন বল্লভাচার্য তাঁকে বাৎসল্যের পদ লিখতে উপদেশ দেন। এ ধরনের উপদেশ চৈতন্য কাউকে দেননি। জীবনের শেষ ভাগে চৈতন্যপন্থী গদাধর পণ্ডিতের সাহচর্যে বল্লভাচার্য মধুররসে শ্রীকৃষ্ণ আরাধনার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।[৩৪] কিন্তু বালগোপালের মূর্তি পূজা বন্ধ হয়নি।

আমাদের বক্তব্য এই নয় যে, হিন্দী কবিরা অন্য রসের পদ রচনায় মনোযোগী

ছিলেন না। তাঁরা সব রসেরই, বিশেষ করে মধুর রসেরও উৎকৃষ্ট পদাবলী রচনা করেছেন। সুরদাস বাৎসল্য ও মধুর— এই উভয় রসের পদ রচনাতেই সমান পারদর্শিতার স্বাক্ষর রেখেছেন। তবে বাৎসল্যের পদ রচনায় হিন্দী ভক্ত-কবিদের যে, শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা ও ঔৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়, বাঙালী পদকর্তাদের মধ্যে স্পষ্টই তার অভাব লক্ষণীয়। বিশেষ করে সুরদাসের বাৎসল্যরসের পদাবলী গুণে ও প্রাচুর্যে অতুলনীয়। এই প্রসঙ্গে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন: "বাঙলায় বাৎসল্য রসের ভাল ভাল পদ কিছু কিছু থাকিলেও হিন্দী বাৎসল্য রসের পদের তুলনায় তাহা অনেক কম। বাৎসল্য রসের পদেই হিন্দী শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবি সুরদাসের বৈশিষ্ট্য।"[৩৫]

হিন্দী ও বাংলা মধুর রসের পদাবলীর সাদৃশ্য ও পার্থক্য নিয়ে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে হিন্দী মধুররসের একটি বৈশিষ্ট্য বাৎসল্য রসের পদেও লক্ষণীয়। বাংলা পদাবলীতে রাধা প্রধান নায়িকা, গোপিনীরা তাঁর সহচরী। রাধা-কৃষ্ণের মিলনের পথ প্রশস্ত করে দেওয়াতেই তাঁদের মূল ভূমিকা। কিন্তু হিন্দী পদাবলী সাহিত্যে রাধার এই প্রাধান্য নেই। তিনি অন্য গোপিনীদের মতোই কৃষ্ণের একজন প্রেমাকাঙ্ক্ষিনী। অন্য গোপিনীরাও কৃষ্ণের প্রণয়িনী। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেন: "হিন্দীতে আবার কান্তা প্রেমের পদ রাধাকে লইয়া বেশী নয়, বেশীই হইল গোপীগণকে লইয়া। সুরদাসের এই জাতীয় পদগুলির ভিতরে প্রসিদ্ধতম পদ হইল 'উদ্ধব-সংবাদের' পদ।...হিন্দী বৈষ্ণব কবিতায় গোপীগণেরও যথেষ্ট স্থান রহিয়াছে।"[৩৬]

অনুরূপভাবে কৃষ্ণ শুধু নন্দ ও যশোদার পুত্র নন, তিনি সকল গোপিনীরও স্নেহের পাত্র। জন্মের পর থেকে মথুরা যাত্রা পর্যন্ত গোপিনীরা শুধু কৃষ্ণকে কেন্দ্র করেই পদাবলীতে স্থান পেয়েছেন। কৃষ্ণের প্রতি তাঁদের স্নেহ, যত্ন ও আগ্রহ কখনো শিথিল হয়নি। বাংলা পদাবলীতে কৃষ্ণের প্রতি গোপিনীদের এই সর্বজনীন বাৎসল্য কখনো সোচ্চার হয়ে উঠতে দেখা যায় না। সেখানে যশোদাই বলতে গেলে একমাত্র নায়িকা। কিন্তু হিন্দী পদাবলীতে কৃষ্ণ সমগ্র ব্রজভূমিব বাৎসল্যে লালিত।

বাৎসল্যের নানা প্রসঙ্গ॥ হিন্দী বাৎসল্যরসের পদাবলীতে কৃষ্ণ-কাহিনী শুরু হয়েছে তাঁর কারাগারে জন্ম থেকে। দেবকী, বসুদেব, এমনকি কংসেরও স্নেহের প্রকাশ দেখানো হয়েছে। কংস নৃশংস, তবু তাঁর হৃদয় যে একেবারে স্নেহশূন্য নয়, তার প্রমাণ রেখেছেন সুরদাস। তাই, দেবকীর প্রথম পুত্রকে দেখে কংস হাসলেন এবং মায়ের কোলে তাকে ফিরিয়ে দিলেন।[৩৭] পরে অবশ্য নিজের নিরাপত্তার কথা ভেবে এই শিশুকে তিনি হত্যা করেছিলেন। বসুদেব ও দেবকীর বাৎসল্যও কৃষ্ণকাব্যের হিন্দী কবিরা বিবৃত করেছেন। অষ্টম গর্ভের পুত্র কৃষ্ণের প্রাণ রক্ষার জন্যে তাঁকে যখন বৃন্দাবন নিয়ে যাচ্ছেন বসুদেব, তখন একদিকে পুত্রের মঙ্গলের জন্যে স্বস্তি, অন্যদিকে পুত্রকে লালন করবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবার বেদনায় দেবকীর হৃদয় দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পীড়িত। সুরদাস দেবকীর এই বিক্ষুব্ধ অন্তরের কথা বলেছেন।[৩৮]

বাংলা কৃষ্ণ-কাহিনীর শুরু সাধারণত নন্দের গৃহে। যশোদা ঘুম থেকে জেগে

দেখলেন কৃষ্ণ তাঁর শয্যায় শুয়ে আছেন—

নিদ্রা অচেতন রাণী কিছুই না জানে।
চেতন পাইয়া পুত্র দেখিল নয়নে ॥[৩৯]

বাঙালী কবিদের মধ্যে বোধ হয়, দীন চণ্ডীদাসই ভাগবত অনুসরণে নন্দগৃহে আগমনের পূর্ববর্তী কাহিনী বর্ণনা করেছেন। কোথাও কোথাও কবির বর্ণনায় মৌলিকত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ভয়ংকর দুর্যোগের রাত্রিতে যমুনা নদী পার হবার সময় হঠাৎ বসুদেবের হাত থেকে কৃষ্ণ জলে পড়ে গেলেন—

হাত হইতে পিছলিআ কুথারে পড়িল গিআ
কোনখানে দেখিতে না পাই।
আকুল হইয়া চিত্তে "—গেলা শিশু কোন ভিতে
মাঝপথে তুমারে হারাই ॥"

দেবকীকে তিনি কি কৈফিয়ৎ দেবেন ?

কি বলিব ঘরে গিআ হেন পুত্র হারাইআ
দেবকীরে কি বোল বলিব।

জল থেকে পুত্রকে যখন উদ্ধার করলেন, তখন বসুদেবের পিতৃস্নেহের কিছু পরিচয় পাওয়া গেল :

ঘুচিল অশেষ তাপ কুথারে গেছিলে বাপ
অভাগারে বধিয়া পরাণে।[৪০]

মাতৃস্নেহের প্রাবল্য পিতার স্নেহকে প্রায় আচ্ছন্ন করে রেখেছে। হিন্দী বাৎসল্য পদাবলীতেও যশোদার প্রাধান্য। কিন্তু নন্দের অপত্যস্নেহ অবহেলিত নয়। বসুদেবের পিতৃ-হৃদয়ের কোমল অনুভূতির প্রতি উভয় ভাষার কবিরাই প্রায় সমান উদাসীন। দীন চণ্ডীদাস এইদিক থেকে বিশিষ্টতার দাবি করতে পারেন।

যশোদা অধিক বয়সে পুত্রসন্তান লাভ করেছেন। তাই, নিজের আনন্দ একটু বেশি বলা যায়। ধাত্রী যখন তাঁর কাছে নাড়ী কাটার জন্যে পুরস্কার প্রার্থনা করল তখন যশোদা, "মন মেঁ বিহঁসি তবৈ নন্দরাণী, হার হিয়ে কো দীনৌ।"[৪১] অর্থাৎ, নন্দরাণী খুশি হয়ে গলার হার তাকে দিয়ে দিলেন।

ঠিক এভাবে পুরস্কৃত করবার ঘটনা না থাকলেও যশোদা যে সবাইকে তাঁর আনন্দের অংশীদার করবার জন্যে ব্যগ্র, বাংলা পদাবলীতেও তার চিত্র পাওয়া যায়। প্রথমেই আহ্বান করছেন স্বামীকে—

কোথা গেল নন্দরাজ পড়িল মানস কাজ
দেখসিয়া পুত্রের বদন।
নীল বরণ শশী উদয় করিল আসি
দেখি কর সফল জীবন।[৪২]

পুত্রলাভ করায় যশোদা-নন্দের আনন্দ তো খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রতিবেশী গোপ-গোপিনীরাও উল্লসিত। এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী গোপিনীদের সঙ্গে এসে কৃষ্ণকে

দেখে স্নেহমুগ্ধ কণ্ঠে বলছেন :

কহে জসদায়— তোমার বালক
দেখিয়া হইলুঁ সুখী।
কোথা আরাধিলে কি দেব পূজিলে
ধন্য করি তোরে লিখি ॥
এমত ছায়ালে হেদে গো জসদা
নিছনি লইআ মরি।[৪৩]

হিন্দী কৃষ্ণকাব্যে নবজাতকের প্রতি ব্রজবাসীদের সস্নেহ আগ্রহ আরো গভীর ও ব্যাপক। গোবর্ধনের এক নাগরিক সংবাদ পেয়েই কৃষ্ণকে দেখতে এসেছে, পেয়েছে প্রচুর পারিতোষিক। কিন্তু এতে সে সন্তুষ্ট নয়, কৃষ্ণকে দেখে তার আশ মেটেনি। কৃষ্ণকে নব নব রূপে দেখে সে নিজেকে ধন্য করতে চায়। তাই তার একান্ত আবেদন—

নন্দরাই, সুনি বিনতী মেরী, তবহিঁ বিদা ভল হৈব হোঁ।
দীজৈ মোহিঁ কৃপা করি সোঈ, জো হোঁ আয়ো মাঁগন।
জসুমতি-সুত অপনেঁ পাইনি চলি, খেলত আবৈ আঁগন।
জব হঁসি কৈ মোহন কছু বোলৈঁ, তিহি সুনি কৈ ঘর জাউঁ।[৪৪]

অর্থাৎ, হে নন্দরাজ, দয়া করে আমাকে এখানে কিছুদিন থাকার অনুমতি দাও। মোহন নিজের পায়ে চলছে, আঙিনায় খেলা করছে এবং হেসে কথা বলছে,— এই মধুর দৃশ্য দেখেই আমি চলে যাবো।

বাংলা পদাবলীর প্রতিবেশিনীরাও কৃষ্ণকে দেখে মুগ্ধ হয়—

দেখিঞা বালকে এক দিঠে থাকে
নঅন পালট নহে।[৪৫]

এখানে কৃষ্ণ দৃষ্টি-নন্দন। তাঁকে দেখে সুখ হয়। কিন্তু হিন্দী পদাবলীতে ভক্ত হৃদয়ের যে গভীর অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়, এখানে তার অভাব। সুরদাস লিখেছেন, একজন কৃষ্ণের জন্ম-সংবাদ পেয়ে "অতি আতুর উঠ ধায়ো"। 'আতুর' শব্দটির মধ্যে দর্শনার্থীর অন্তরের ব্যাকুলতা মূর্ত হয়ে উঠেছে। এমন ঐকান্তিক ব্যাকুলতা বাংলা পদাবলীতে কদাচিৎ দেখা যায়।

বিভিন্ন অনুষ্ঠানের পটভূমিকায় কৃষ্ণ-বাৎসল্য পরিস্ফুট করায় হিন্দী পদকর্তারা অধিকতর আগ্রহী। এই অনুষ্ঠানগুলি দুই শ্রেণীর : প্রথমত, কৃষ্ণের ব্যক্তিজীবন সম্পর্কিত অনুষ্ঠান, দ্বিতীয়ত, সামাজিক অনুষ্ঠান। ষষ্ঠী, অন্নপ্রাশন, জন্মোৎসব কৃষ্ণকে কেন্দ্র করেই অনুষ্ঠিত হয়। কৃষ্ণের জন্মের ছয় দিন পরে ষষ্ঠী পূজার অনুষ্ঠান। পরমানন্দদাস বলছেন—

মঙ্গল দ্যৌস ছঠী কৌ আয়ো।
আনন্দে ব্রজরাজ জসোদা মানহুঁ অধন ধন পায়ো ॥[৪৬]

অর্থাৎ, মাঙ্গলিক ঘোষণার মধ্যে ষষ্ঠী পূজার দিন বোঝা যাচ্ছে। আনন্দে ব্রজরাজ ও যশোদার মনে হচ্ছে যেন নির্ধন আজ ধন লাভ করেছে।

তারপর "আজু কাহু করি হে' অন্নপ্রাসন"। আজ কানাইয়ের অন্নপ্রাশন হবে, তাই যশোদা ব্যস্ত ; পুত্রকে উবটন ইত্যাদি দিয়ে স্নান করাচ্ছেন, পট্টবস্ত্র পরাচ্ছেন, নানাভাবে ছেলেকে সাজাচ্ছেন, বারবার পুত্রের মুখ চুম্বন করে তাঁর সব অমঙ্গল দূর করে দিচ্ছেন। আর কোলে বসিয়ে পুত্রের মুখে প্রথম গ্রাস তুলে দিচ্ছেন নন্দ :

বার বার মুখ নিরখি জসোদা, পুনি-পুনি লেত বলাই।
ঘরী জানি সুত-মুখ-জুঠবারন নন্দ বেঠে লে গোদ।[৪৭]

তারপর এলো কৃষ্ণের এক বৎসর পূর্তির উৎসব। "অরী, মেরে লালন কী আজু বরস-গাঁঠি, সবৈ সখিনি কোঁ বুলাই মঙ্গল-গান করাবৌ॥"[৪৮] অর্থাৎ, আজ আমার বাছার বর্ষপূর্তির উৎসব। সব সখীদের ডেকে মঙ্গল গান করাবো।

যখন মঙ্গল-গীত শুরু হ'ল তখন যশোদা সানন্দে সখীদের সঙ্গে যোগ দিলেন, —"জসোদা আপুন মঙ্গল গাবৈ"।[৪৯]

এছাড়া রাখী, দশহরা, দীপান্বিতা ইত্যাদি বিভিন্ন পূজাপার্বণের দিনে যশোদা তাঁর শত কাজের মধ্যেও সর্বপ্রথম পুত্রের কল্যাণ কামনা করেন। এমনি একটি ছবি পাই পরমানন্দদাসের রচনায়—

রচ্ছা বাধঁতি জসুদা মৈয়া
...   .
রতন-কনক রাখী বন্ধন করি ফুনি ফুনি লেতি বলেয়া॥[৫০]

—যশোদা কৃষ্ণের হাতে রত্নখচিত সোনার রাখী বেঁধে দিচ্ছেন। আর, পুত্রের শুভ কামনায় তাঁর সমস্ত আপদ-বালাই নিজে নিচ্ছেন।

হিন্দী বাৎসল্যের পদে দোলনার প্রাধান্য, বাংলা পদাবলীতে দোলনা উপেক্ষিত। হিন্দী ভাষার বৈষ্ণব কবিরা প্রায় সকলেই যশোদা কৃষ্ণকে দোলনায় দোলাচ্ছেন,— এর বর্ণাঢ্য চিত্র এঁকেছেন। পুত্রের জন্য অনেক যত্নে দোলনা তৈরি করতে হবে। মা তাই কাঠের মিস্ত্রিকে বলছেন :

পালনা অতি সুন্দর গাঢ় ল্যাউ রে বঢ়েয়া।
সীতল চন্দন কটাউ, ধরি খরাদ রঙ্গ লাউ॥[৫১]

দোলনা তৈরি হয়ে এলো। কৃষ্ণকে দোলনায় রেখে আস্তে আস্তে দোলা দিচ্ছেন, আর গুন-গুন করে ঘুম পাড়ানো গান করে চলেছেন যশোদা। এই ছবিটি সুরদাস প্রভৃতি অনেক কবিরই প্রিয়। পরমানন্দদাসের একটি পদ এই :

ঝুলৌ পালনে হো লালন লেহুঁ বলেয়াঁ তেরী।
গাউ' গীত কহি জসুমতি রাণী চুটকী দৈ-দৈ রীঝেরী॥[৫২]

অর্থাৎ যশোদা বলছেন, আমার বাছা, দোলনায় দোল ; আমি তোমার বালাই নিই। তারপর তিনি আঙ্গুলে তুড়ি-দিয়ে দিয়ে সুর করে গান গাইতে লাগলেন।

হিন্দী বাৎসল্যরসের পদাবলীতে শিশু-কৃষ্ণের সঙ্গে দোলনার প্রসঙ্গ প্রায় অভিন্ন। অথচ বাংলা পদাবলীতে দোলনা প্রায় অনুপস্থিত। শুধু দীন চণ্ডীদাস একবার উল্লেখ করেছেন :

দোলার উপরে সুতাইঞা রাণী
করেন গৃহের কাজ ॥[৫৩]

দোলনা এখানে মাতৃস্নেহের সমুদ্রে দোলা দেয় না। গৃহকাজের সুবিধার জন্যে পুত্রকে নিরাপদে রাখার আশ্রয় মাত্র।

বাঙালী কবিদের আছে মায়ের কোল, যা মাতা-পুত্রের দেহস্পর্শের মধ্য দিয়ে নিবিড়তর একাত্মবোধ গড়ে তোলে। রায়শেখর বলেছেন—

জশোমতি ডোরে কোরে করি লালন
অম্বরে মুছায় মুখ ইন্দু।
হেরি ষুধানন মরমহি হরসিত
উথলে প্রেম ষুখ সিন্ধু ॥
জশোমতি বোলত ভাষ।
এ বিধু বদনে মা বলি বোলইতে
ষুনইতে শ্রবণ উল্লাস ॥[৫৪]

ছেলেকে কোলে করে তার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে নানা স্বপ্ন দেখতে কত সুখ! ছেলের চাঁদপানা মুখে কবে আধো-আধো স্বরে 'মা' বলে ডাক শুনবেন যশোদা!

মাতৃস্নেহ ভৌগোলিক গণ্ডিতে আবদ্ধ নয়। সুরদাসের যশোদাও অনুরূপ ভাবে পুত্রের মুখে 'মা' ডাক শোনবার জন্যে উৎসুক হয়ে আছেন…"কব তোতরেঁ মুখ বচন ঝরৈ। কব নন্দহিঁ বাবা কহি বোলে, কব জননী কহি মোহিঁ ররৈ।"[৫৫] অর্থাৎ, কবে ওর মুখে আধো-আধো কথা ফুটবে, কবে আমার বাছা নন্দকে বাবা এবং আমাকে মা বলে ডাকবে।

শিশুর জীবনে ক্রমবিকাশের দৈনন্দিন রূপ মাতৃহৃদয়কে যে গভীররূপে মুগ্ধ করে, তা হিন্দী কবিদের দৃষ্টি এড়ায় নি। শিশু-কৃষ্ণ শুয়ে শুয়ে খেলা করতে করতে নিজের পায়ের বুড়ো আঙ্গুলটি মুখে দিয়েছেন, সেই দৃশ্য দেখে যশোদা যেন এক নতুন আবিষ্কারের আনন্দে গান গেয়ে উঠলেন :

চরন গহে অ গুঠা মুখ মেলত।
নন্দ-ঘরনি গাৱতি, হলরাৱতি, পলনা পর হরি খেলত ॥[৫৬]

আর একদিনের কথা। সেদিন প্রথম কৃষ্ণ নিজে নিজে দোলনার উপর পাশ ফিরে শুয়েছেন। কবি বলছেন :

করৱট প্রথম লঈ নন্দ-নন্দন।
তাকৌ মহরি মহোচ্ছৱ মানত ভৱন লিপায়ো চন্দন ॥[৫৭]

অর্থাৎ, প্রথম যেদিন নন্দ-নন্দন নিজে নিজে পাশ ফিরলেন, সে দিনটি যশোদা মহোৎসব রূপে পালন করলেন, সমস্ত গৃহ চন্দনলিপ্ত করলেন।

আর যেদিন কৃষ্ণ নিজেই সম্পূর্ণ উপুড় হতে সক্ষম হলেন, সেদিন যশোদা পুত্রের কৃতিত্বে মুগ্ধ :

মহরি মুদিত উলটাই কৈ মুখ চুমন লাগী।

চিরজীরো মেরো লাড়িলো, মৈঁ ভঈ সভাগী ॥[৫৮]

অর্থাৎ, আনন্দিত যশোদা কৃষ্ণকে চিৎ করে শুইয়ে মুখ চুম্বন করে বললেন, আমার বাছা, চিরজীবী হও ; আমি আজ ভাগ্যবতী।

পুত্রের প্রতি গভীর ভালোবাসা, এমন গভীর আকর্ষণ, কৃষ্ণের কোন ক্ষতি করবে না তো ? মা নিজেকেই বিশ্বাস করতে পারছেন না। তাই, যশোদা বলছেন :

লালন, রারী য়া মুখ উপর।
মাঈ মোরিহি দীঠি ন লাগৈ, তাতেঁ মসি বিন্দা দিয়ৌ ভ্রূপর ॥[৫৯]

—বাছা, তোমার মুখের দিকে চেয়ে আমার আনন্দের সীমা নেই। সখি, আমার চোখের নজর যাতে বাছার অমঙ্গল না করে, সেইজন্যে ভ্রূর উপর কাজলের টিপ লাগিয়ে দিয়েছি।

রায়শেখরের যশোদাও পুত্রের উপর 'কুদীঠি'[৬০] পড়বার আশংকায় ভীত। তবে সেটি নিজের নয়, অপরের কু-দৃষ্টি।

কৃষ্ণ ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠছেন। যশোদা তাঁকে নিয়ে এখন খেলা করছেন :

নন্দ-ঘরনি আনন্দ ভরী, সুত স্যাম খিলারৈ।
কবহিঁ ঘুটুরুনি চলহিঁগে, কহি, রিধিহিঁ মনারৈ ॥
কবহিঁ দঁতুলি দ্বৈ দুধ কী, দেখৌঁ ইন নৈননি।
কবহিঁ কমল-মুখ বোলিহৈঁ, সুনিহৌ উন বৈননি ॥
চুমতি কর-পগ-অধর-ভ্রূ, লটকতি লট চুমতি।
কহা বরনি সুরজ কহৈ, কহঁ পারৈ সো মতি ॥[৬১]

অর্থাৎ, নন্দ-ঘরণী আনন্দে পূর্ণ হয়ে পুত্রকে খেলা দিচ্ছেন, আর মনের আকাঙ্ক্ষা ঈশ্বরকে জানিয়ে প্রার্থনা করছেন, কবে আমার বাছা হামা দেবে, কবে দুধের দুটি দাঁত দেখতে পাবো, কবে ঐ কমল মুখের বাণী শুনতে পাবো ! যশোদা কৃষ্ণের হাত, পা, অধর, ভ্রূ, ঝুলে পড়া চুল চুমায় চুমায় ভরে দিচ্ছেন। সুরদাস বলেন, এই স্নেহ বর্ণনা করবার মতো শক্তি আমার কোথায় !

যশোদার মনের এই আকাঙ্ক্ষা অনেকটাই পূর্ণ হ'ল, যখন—

ঘুটুরুনি চলত স্যাম মণি-আঁগন, মাতু-পিতা দোউ দেখত রী।
কবহুঁক কিলকি তাত-মুখ হেরত, কবহুঁ মাতু-মুখ পেখত রী ॥
... ...
কবহুঁক দৌরি ঘুটুরুবনি লপকত, গিরত, উঠত পুনি ধারৈ রী।
ইততেঁ নন্দ বুলাই লেত হৈঁ, উততেঁ জননি বুলারৈ রী ॥[৬২]

—শ্যাম মণি-মাণিক্যের আভায় উজ্জ্বল আঙিনায় হামা দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আর মা-বাবা দু'জনে তা দেখছেন। পুত্র কখনো এসে বাবার দিকে, কখনো বা মা'র দিকে চাইছেন। কখনো তিনি দ্রুত হামা দিতে গিয়ে পড়ে যাচ্ছেন, আবার উঠে চলছেন। একবার নন্দ ডাকছেন (আমার কাছে এসো), আবার যশোদা ডাকছেন তাঁর কাছে যেতে। কৃষ্ণ দু'দিকেই ছুটে ছুটে আসা-যাওয়া করছেন।

শিশুর স্বভাব ও জীবনধারা ভাষার গণ্ডি স্বীকার করে না। তাই, হিন্দী বাংলা কিংবা অন্য যে কোনো ভাষার সাহিত্যে কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ পাওয়া যায়। হিন্দী কৃষ্ণ-কাব্যে যেমন, বাংলা পদাবলীতে তেমনি হামাগুড়ির কথা কবিরা বর্ণনা করেছেন দেখা যায়। কেননা, শিশু বড় হবার পথে এটি একটি স্বাভাবিক স্তর। তাই, উদ্ধবদাস বলেছেন:

বাল গোপাল রঙ্গে মন-বয় সখা সঙ্গে
হামাগুড়ি আঙ্গিনায় খেলায়।[৬৩]

হামাগুড়ি দিয়ে আঙ্গিনায় ঘুরতে ঘুরতে কৃষ্ণ "মৃত্তিকা মনের সুখে খায়"। অর্থাৎ, যশোদা কিংবা নন্দ কেউ কৃষ্ণের চলাফেরা সস্নেহ দৃষ্টিতে অনুসরণ করেন নি, এটাই বোঝা যায়। হিন্দী পদকর্তারা কিন্তু দেখিয়েছেন যে, কৃষ্ণের প্রতিটি কাজই তাঁরা বিশেষরূপে লক্ষ্য করে আনন্দ লাভ করেছেন। উদ্ধবদাস এই অবাধ হামাগুড়ি দেওয়াকে বিশ্বরূপ দর্শনের ভূমিকা হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

কিন্তু বাসুদেব হামাগুড়ির শুধুই একটি সুন্দর ছবি এঁকেছেন।

এক মুখে কি কহব গোরাচান্দের লীলা।
হামাগুড়ি যায় নানা রঙ্গে শচীর বালা॥
লালে মুখ ঝর ঝর দেখিতে সুন্দর।
পাকা বিম্বুফল জিনি সুরঙ্গ অধর॥[৬৪]

সুরদাসের যশোদা কৃষ্ণের দুটি দুধের দাঁত দেখার জন্যে ব্যাকুল। বাঙালী পদকর্তা বংশীবদন বলেছেন, কৃষ্ণ নিজেই হেসে হেসে মাকে তাঁর দাঁত দেখাচ্ছেন।

নন্দ সুনন্দ যশোমতি রোহিণি
আনন্দে সুত-মুখ চায়।
অরুণ দৃগঞ্চল কাজরে রঞ্জিত
হাসি হাসি দশন দেখায়॥[৬৫]

যদুনাথ দাস মায়ের কোলে কৃষ্ণের একটি সুন্দর বাস্তব ছবি এঁকেছেন। কোলে বসে কৃষ্ণ আধো-আধো কথা বলছেন। মুখ দিয়ে লালা ঝরছে, কখনো উঠছেন, কখনো বসছেন, আর মাঝে মাঝে মাকে বকছেন—

জননী কোরে বিলসিত নন্দ দুলাল
আধহি আধ, বোলত দোলত
মুখ মে চোয়য়ত লাল॥
ক্ষণে ক্ষণে উঠত, ক্ষণে বিঠত মোহন,
ক্ষণে ক্ষণে দেয়ত গারি।[৬৬]

বাঙালী পদকর্তাদের এইসব দৃশ্য অপেক্ষা হিন্দী কবিদের বাৎসল্যের চিত্রগুলি অধিকতর মর্মস্পর্শী। পরমানন্দদাস বলেছেন, যশোদা কৃষ্ণকে বুকের উপর তুলে তাঁর নতুন ওঠা দাঁত দেখছেন। সেই দুধের দাঁত কার ভাগে কোনটা পড়বে, তার হিসাবটা শোনাচ্ছেন ছেলেকে। কৃষ্ণের সঙ্গে এই অর্থহীন প্রলাপের মধ্যে ফুটে উঠেছে

যশোদার মাতৃরূপ। কবির কথাচিত্রটি এই :

বারী মেরে লটকন পগু ধরো ছাতিয়াঁ
কমল-নয়ন বলি জাউ' বদন কী
সোহঁতি হৈঁ নান্হী নান্হী দুধ কী দ্বৈ দতিয়াঁ।
ইহ মেরী ইহ তেরী ইহ বাবা নন্দ কী ইহ বলভদ্র কী।
ইহ তাকী জু ঝলাবৈ তেরো পলনা।[৬৭]

—আমার বাছা, তোমার টলমলে পা দুটি আমার বুকের উপর রাখো। কমল-নয়ন, তোমার সুন্দর মুখের ছোট ছোট দুটি দুধের দাঁতের বলিহারী যাই। এ দাঁতটা আমার, ওটা তোমার, এটা বাবা নন্দের, এটা বলভদ্র দাদার, আর এটা যে তোমার দোলনা দোলায় তার।।

চৈতন্যের সমকালীন ও পরবর্তীকালের বাংলা পদাবলীতে কৃষ্ণলীলার রসবৈচিত্র্য গৌরাঙ্গে আরোপিত হয়েছিল। যশোদার স্থান অধিকার করেছিলেন শচীমাতা। কৃষ্ণ-লীলা ও চৈতন্যলীলার বাৎসল্য রসের পদ বিচার করলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। যেমন, কৃষ্ণ এখন হাঁটতে শিখছেন। তাঁর টলমল পা দুটি মাটিতে রাখছেন, যশোদা তাঁর হাত ধরে আছেন। কিন্তু কৃষ্ণের কাছে মাটিতে কষ্ট করে হাঁটার চেয়ে মায়ের কোল অনেক ভালো।

যশোমতী সুন্দরী, কর অঙ্গুলি ধরি,
শিশুকে শিখায়ত ঠারি॥
কবহি যশোমতি, মুখ হেরি রোয়ত,
পুন পুন মাগই কোর।[৬৮]—যদুনাথ দাস

অনুরূপ চৈতন্যলীলার পদও আছে। শচীমায়ের অপত্যস্নেহ রসে সিক্ত সেই পদগুলি। শিশু নিমাই মায়ের আঁচল ধরে একটু একটু করে হাঁটছেন। মায়ের আঁচল ধরে মায়ের পায়ে-পায়ে হাঁটতে শিশুদের ভালো লাগে এবং একটা নির্ভরতাবোধও থাকে।

মায়ের অঞ্চল ধরি শিশু গোরহরি।
হাঁটি হাঁটি পায় পায় যায় গুড়ি-গুড়ি॥
টানি লেঞা মার হাত চলে ক্ষণে জোরে।
পদ আধ যাইতে ঠেকার করি পড়ে॥
শচীমাতা কোলে লৈতে যায় ধুলা ঝাড়ি।
আখুটি করিয়া গোরা ভূমে দেয় গড়ি॥
আহা আহা বলি মাতা মুছায় অঞ্চলে।
কোলে করি চুম্ব দেয় বদন কমলে॥[৬৯]

গোরা 'আখুটি করে মাটিতে পড়ে যাচ্ছেন, আর শচীমা গোরার আঘাত লাগলো মনে করে তাড়াতাড়ি কোলে তুলে নিচ্ছেন; একটি সহজ ও স্বাভাবিক সৌন্দর্য আছে ছবিটির মধ্যে। তাছাড়া যে মুহূর্তে কবি বাসু ঘোষ বলেন, "আখুটি করিয়া গোরা ভূমে দেয় গড়ি", সেই মুহূর্তে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে একটি জেদী, দুরন্ত শিশু, যে শচীমায়ের

আঙিনায় আবদার করছে। হিন্দী বৈষ্ণব পদে কিন্তু বল্লভাচার্য বা বিঠ্ঠলনাথ কেউই কৃষ্ণলীলা গানের সঙ্গে মিশে এক হতে পারেন নি।

শিশু-কৃষ্ণকে যশোদা হাত ধরে হাঁটতে শেখাচ্ছেন, কখনো বা নন্দ শেখাচ্ছেন; হিন্দী বৈষ্ণব কবিরাও বিষয়টি নিয়ে বহু পদ রচনা করেছেন। বহু পদ রচিত হবার ফলে শিশুর হাঁটতে শেখার ক্রমবিকাশের ধারা বর্ণিত হয়েছে বিভিন্ন রূপে—

ধনি জসুমতি বড়ভাগিনী, লিএ কাহ্ন খিলাবৈ।
তনক-তনক ভুজ পকরি কে ঠাঢ়ো হোন সিখাবৈ॥
লরখরাত গিরি পরত হৈঁ, চলি ঘুটুরুনি ধাবৈঁ।
পুনি ক্রম-ক্রম ভুজ টেকিকৈ, পগ দ্বৈক চলাবৈঁ॥[৭০]

—মহাভাগ্যবতী যশোদা, তিনি কানাইকে খেলা দিচ্ছেন। তাঁর ছোট ছোট হাত ধরে দাঁড়াতে শেখাচ্ছেন। কৃষ্ণ টলমল করে পড়ে যাচ্ছেন, তারপর হামা দিয়ে চলতে শুরু করেছেন। কিন্তু যশোদা আবার ধীরে ধীরে তাঁর হাত ধরে দু'পা হাঁটাচ্ছেন।

শুধু যশোদা নন, পিতা নন্দও পুত্রকে হাত ধরে চলতে শেখান:

গহে অঁগুরিয়া ললন কী, নন্দ চলন সিখাবত।
অরবরাই গিরি পরত হৈঁ, কর টেকি উঠাবত॥[৭১]

—নন্দ নিজে ছেলের আঙুল ধরে চলতে শেখাচ্ছেন। শ্যাম টলমল করে পড়ে যাচ্ছেন। তখন নন্দ তাঁর হাত ধরে তুলছেন।

এরপরই হিন্দী কবি বর্ণনা করছেন, কৃষ্ণ এক পা দু'পা করে চলছেন: "কাহ্ন চলত পগ দ্বৈ-দ্বৈ ধরণী।" কৃষ্ণ এবার মাটিতে পা রেখে চলছেন। কিন্তু এই হাঁটতে শেখার মধ্যে কখনো 'তনক-তনক' অর্থাৎ, ছোট ছোট হাত ধরে যশোদা তাঁকে দাঁড়াতে শেখাচ্ছেন। কখনো "লরখরাত গিরি পরত হৈ", কিংবা "অরবরাই গিরি পরত হৈ"। অর্থাৎ, দাঁড়াতে গিয়ে টলমল করে পড়ে যাচ্ছেন; কৃষ্ণের দাঁড়াতে গিয়ে টলমল করে পড়ে যাওয়ার ভঙ্গিমাটি বোঝাতে দুটি সহজ ও চলিত শব্দ 'লরখরাত' ও 'অরবরাই' খুবই সুষ্ঠু প্রয়োগ হয়েছে। এই দুটি শব্দের দ্বারা কৃষ্ণের টলমল করে দাঁড়ানো ও টলে টলে চলার দৃশ্যটি চিত্রময় হয়ে উঠেছে।

কৃষ্ণ শিশু হলেও বোঝেন তাঁকে চলতে দেখে যশোদার খুব আনন্দ হয়। তাই, তিনি দু-এক পা হাঁটেন এবং ফিরে ফিরে দেখেন যশোদা দেখছেন কিনা। কবি শিশুর মানসিকতাকে সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন:

চলত দেখি জসুমতি সুখ পাবৈ।
ঠুমুকি ঠুমুকি পগ ধরণী রেঁগত, জননী দেখি দিখাবৈ।[৭২]

—কৃষ্ণকে চলতে দেখে মা যশোদা অত্যন্ত আনন্দিত। কৃষ্ণ ঠমকে-ঠমকে মাটিতে পা রেখে চলেছেন এবং মাকে নিজের চলা দেখাচ্ছেন।

ক্রমে সময় এলো যখন কৃষ্ণ শুধু হাঁটেন না, ছুটে ছুটে খেলাও করেন, নাচেন। আর যশোদা নিজেই পুত্রের খেলায় যোগ দেন। কখনো করতালি দেন নৃত্যের সঙ্গে, কখনো বা গান করেন। বাঙালী কবির চোখে ছবিটি এই:

ভাল নাচে রে নাচে রে নন্দ-দুলাল
ব্রজ রমণীগণ চৌদিগে বেঢ়ল
যশোমতি দেই করতাল ॥[৭৩] —বংশি

যশোদা ননীর লোভ দেখিয়ে কৃষ্ণকে নাচান, আর এই নৃত্যে মাতৃ হৃদয় উদ্বেলিত হয়।

দধি-মন্থ-ধ্বনি শুনইতে নীলমণি
আওল সঙ্গে বলরাম।
যশোমতী হেরি মুখ পাওল মরমে সুখ
চুম্বয়ে চান্দ-বয়ান ॥
কহে শুন যাদুমণি তোরে দিব ক্ষীর ননী
খাইয়া নাচহ মোর আগে।[৭৪] —ঘনরামদাস

যশোদা পুত্রের কৃতিত্বে মুগ্ধ, তাই দধি-মন্থন ছেড়ে পুত্রের নৃত্য দেখার জন্যে মুগ্ধ কণ্ঠে সবাইকে ডাকছেন

খাইতে খাইতে নাচে কটিতে কিঙ্কিণী বাজে
হেরি হরষিত ভেল মায় ॥
নন্দ-দুলাল নাচে ভালি।
ছাড়িল মন্থন-দণ্ড উথলিল মহানন্দ
সঘনে দেই করতালি ॥
দেখ দেখ রোহিণি গদ গদ কহে বাণী
যাদুয়া নাচিছে দেখ মোর।[৭৫] —ঘনরাম দাস

বাংলা বৈষ্ণব পদাবলীতে কৃষ্ণের নৃত্যের নানা বর্ণনা পাওয়া যায়। কখনো এমনি খেলার ছলে তিনি নাচেন, কখনো বা ননীর লোভে। আর, যশোদা পুত্র গর্বে গর্বিনী। কারণ কৃষ্ণের নৃত্য দেখার জন্য 'ব্রজ রমণীগণ চৌদিকে বেঢ়ল,' যশোদার অহংকারের শেষ নেই, 'যাদুয়া নাচিছে দেখ মোর"। বাংলা বৈষ্ণব পদাবলীতে নৃত্যকে কেন্দ্র করে যশোদার আনন্দোচ্ছ্বাসের নানা রূপ দেখা যায়।

শুধু যশোদার নয়, সমস্ত ব্রজবধূরাও কৃষ্ণের প্রতি স্নেহাসক্ত—

ব্রজ-বধূ মেলি দেওই করতালি
বোলই ভালি রে ভাল।
... ..
বংশি কহই সব ব্রজ রমণীগণ
আনন্দ-সায়রে ভাস।
হেরইতে পরশিতে লালন করইতে
স্তন খিরে ভীগল বাস ॥[৭৬] —বংশি

হিন্দী বৈষ্ণব পদাবলীতেও কৃষ্ণের নৃত্যের মনোরম ছবি আছে।—

আঁগন স্যাম নচাবহীঁ, জসুমতি নন্দরাণী।
তারী দৈ-দৈ গাবহীঁ, মাধুরী মৃদুবাণী ॥[৭৭]

—অঙ্গনে নন্দরাণী যশোদা শ্যামকে হাততালি দিয়ে নাচাচ্ছেন এবং মৃদু-মধুর স্বরে গান করছেন। অথবা,

লট লটকনু মটকনু কর পহুঁচী নূপুর বাজহিঁ পাই।
চুটকী দৈ-দৈ নচাৱতি হরি কোঁ হঁসতি জসোদা মাই ॥[৭৮]

—কোঁকড়া চুলের গোছা ঝুলছে, হাতে বাজু এবং পায়ের নূপুর বাজছে। যশোদা হেসে হেসে কৃষ্ণকে তুড়ি দিয়ে নাচাচ্ছেন।

নৃত্যের প্রসঙ্গ বর্ণনায় বাঙালী পদকর্তারা বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। নৃত্যে ছেলের কৃতিত্ব যশোদা সকলকে ডেকে এনে দেখান। নৃত্যের তাল রাখবার জন্যে হাততালি দিয়ে নিজেই উৎসাহিত করেন ছেলেকে। কৃষ্ণের মতো গৌরাঙ্গও নৃত্যপটু ছিলেন। বাসুদেব ঘোষের নিম্নোদ্ধৃত পদটি নৃত্যের প্রসঙ্গ দিয়ে আরম্ভ হলেও মাতৃ-স্নেহের ক্ষেত্রে এর ব্যঞ্জনা সুদূরপ্রসারী।

শচীর আঙিনায় নাচে বিশ্বম্ভর রায়।
হাসি হাসি ফিরি ফিরি মায়েরে লুকায় ॥
বয়ানে বসন দিয়া বোলে লুকাইলুঁ।
শচী বোলে বিশ্বম্ভর আমি না দেখিলুঁ ॥
মায়ের অঞ্চল ধরি চঞ্চল-চরণে।
নাচিয়া নাচিয়া যায় খঞ্জন গমনে ॥[৭৯]

নৃত্যের আনন্দোল্লাস ব্যতীত এই কটি চরণের মধ্যে মাতা-পুত্রের সহজ অন্তরঙ্গতার যে ছবি আছে, ভারতীয় পদাবলী সাহিত্যে তার দৃষ্টান্ত বেশি নেই। স্নেহের তাগিদে মা তাঁর প্রবীণতার গাম্ভীর্য ত্যাগ করে ছেলের সঙ্গে কানামাছি খেলতে নেমেছেন। কবি অনবদ্য ভাষায় মাতা-পুত্রের স্নেহসম্পর্ক মুক্তাবিন্দুর মতো তুলে ধরেছেন আমাদের সামনে। মা ছেলের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছেন,—এমনি একটি ছবি রসখানের পদেও পাওয়া যায়। তবে, বাসু ঘোষের পদের মতো তা মাধুর্যমণ্ডিত নয়।

রসখান বলছেন,—

'তা জসুদা কহ্যৌ ধেনু কীওট ঢিঁঢোরত তাহি ফিরৈঁ হরি ভূলৈঁ।
ঢুঁঢ়ৎ কুঁপগ চারি চলৈঁ মচলৈঁ রজ নাঁহি বিথুরি দুকূলৈঁ ॥
হেরি হঁসে রসখান তবৈ উর ভাল তৈঁ টারি মৈৱার লটূলৈঁ।
সো ছবি দেখি আনন্দ নন্দজু অঙ্গনি অঙ্গ সমাত ন ফূলৈঁ ॥[৮০]

—কৃষ্ণের বাল্যলীলা দেখে কোনো গোপিনী তাঁর সখীকে বলেছেন, কৃষ্ণকে খেলা দেবার জন্যে যশোদা গোরুর পেছনে লুকিয়ে শব্দ করলেন, যা শুনে কৃষ্ণ নিজের অন্য সব কথা ভুলে যশোদাকে খুঁজতে লাগলেন। তিনি যশোদাকে খোঁজার জন্যে অল্প কয়েক পা এগোলেন, কিন্তু মাকে না পেয়ে বায়না ধরেন এবং মাটিতে লুটিয়ে লুটিয়ে নিজের বস্ত্র ধুলোয় মলিন করেন। ছেলের এই অবস্থা দেখে যশোদা তাঁর কাছে আসেন। মাকে দেখে কৃষ্ণের মুখে হাসি ফুটে ওঠে। আর, যশোদা কৃষ্ণের লম্বা লম্বা

চুলগুলি সরিয়ে তার মুখ চুম্বন করতে থাকেন। এই দৃশ্য দেখে নন্দের আনন্দের সীমা নেই।

হিন্দীভাষী বৈষ্ণব কবিরা কৃষ্ণের প্রথম কথা বলাকে যথেষ্ট মূল্য দিয়েছেন। সন্তান প্রথম যখন কথা বলতে আরম্ভ করে, মা তখন অর্ধস্ফুট কথা শুনে বিস্ময়মুগ্ধ হন। বাঙালী বৈষ্ণব কবিরা এই প্রসঙ্গটিকে ততটা প্রাধান্য দেননি। অথচ এটি খুবই বাস্তব বা স্বাভাবিক। হিন্দীভাষী কবিরা শিশু ধীরে ধীরে বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর পরিবর্তনে মাতৃ-হৃদয়ে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, তার নিপুণ বিশ্লেষণ করেছেন। কৃষ্ণ একটু একটু কথা বলতে আরম্ভ করেছেন, তখন যশোদা পুত্রের গুণাবলী সবাইকে ডেকে বলছেন—

কহন লাগে মোহন মৈয়া মৈয়া।
নন্দ মহর সৌঁ বাবা বাবা, অরু হলধর সৌঁ ভৈয়া ॥৮১

—মোহন এখন মা-মা বলে, নন্দকে বাবা-বাবা, আর হলধরকে দাদা।

সুরদাসের বাস্তববোধের জন্যে যশোদা পৃথিবীর মমতাময়ী মা হিসাবে সার্থক হয়েছেন। কোথাও অস্বাভাবিকতা নেই। কৃষ্ণ বড় হয়েও মায়ের স্তন্য পান করেন; যশোদা কিছুতেই তা বন্ধ করতে পারছেন না। যশোদা কৃষ্ণকে বেশ করে বুঝিয়ে বলছেন,—

জসুমতি কান্হহিঁ যহৈ সিখাবতি।
সুনহু স্যাম, অব বড়ে ভএ তুম, কহি স্তন-পান ছুড়াবতি ॥
ব্রজ-লরিকা তোহি পীবত দেখত, হঁসত, লাজ নহিঁ আবতি।
জৈহৈঁ বিগরি দাত যে আছে, তাতৈঁ কহি সমুঝাবতি ॥৮২

—যশোদা কানাইকে শেখাচ্ছেন, শোন শ্যাম, এখন তুমি বড় হয়েছ। একথা বলে তার স্তন্য পান ছাড়াবার চেষ্টা করছেন। তিনি আরো বলেন, ব্রজ-বালকেরা তোমাকে স্তন্য পান করতে দেখে হাসে, তোমার লজ্জা করে না? তোমার এত সুন্দর দাঁত নষ্ট হয়ে যাবে। এসব কথা বলে তাঁকে বোঝাচ্ছেন।

খাওয়া নিয়ে কৃষ্ণের নানা বায়না। যশোদা নিজের হাতে দুধ গরম করে কৃষ্ণকে খাওয়াতে চেষ্টা করেন, কিন্তু তিনি খেতে চান না। নানা ঝামেলা করেন। তখন অনন্যোপায় হয়ে যশোদা কৃষ্ণকে নানাভাবে ভোলাতে থাকেন। দুধ খেলে গায়ে জোর হবে, বলরামের মতো লম্বা চুল হবে, ইত্যাদি:

কজরী কৌ পয় পিয়হু লাল, জাসৌঁ তেরী বেনি বঢ়ৈ।
জৈসৈঁ দেখি ঔর ব্রজবালক, ত্যৌঁ বল বৈস চঢ়ৈ ॥
য়হ সুনি কৈ হরি পীবন লাগে, জ্যৌঁ ত্যৌঁ লয়ৌ লঢ়ৈ।
অঁচবত পয় তাতো জব লাগ্যো, রোবত জীভি ডঢ়ৈ ॥৮৩

—মা যশোদা বলছেন, বাছা কালো গোরুর দুধ খাও, দেখবে তোমার চুলের বেণী কত বড় হবে। আর দেখবে, ব্রজের অন্যান্য বালকদের মতো তোমার গায়ে খুব জোর হবে এবং তুমিও দীর্ঘায়ু হবে। একথা শুনে মা'র কথা রক্ষার জন্যে দুধ খেতে

লাগলেন। কিন্তু দুধ গরম থাকায় জিভ পুড়ে গেল। কৃষ্ণ কাঁদতে লাগলেন।

তারপর হঠাৎ কান্না থামিয়ে মাথায় হাত দিয়ে কৃষ্ণ দেখেন তাঁর চুল যেমন ছিল তেমনি আছে, এতটুকুও বড় হয়নি। তখন মায়ের কাছে তাঁর বিষণ্ণ প্রশ্ন :

মৈয়া, কবহি বঢ়েগী চোটী ?
কিতী বার মোহি দুধ পিয়ত ভঈ, য়হ অজহুঁ হৈ ছোটী।
তু জো কহতি বল কী বেণী, জ্যোঁ, হৈবহৈ লাম্বী মোটী॥
কাঢ়ত-গুহত নহৱাৱত জৈহৈ নাগিনি সী ভুই লোটী।
কাঁচো দুধ পিয়াৱতি পচি পচি দেতি ন মাখন রোটী॥[৮৪]

—মা, আমার বেণী কবে বড় হবে? আমার দুধ খাওয়া তো কতক্ষণ হয়ে গেছে, কিন্তু চুল এখনো ছোটই রয়েছে। তুমি যে বলেছিলে বলরাম দাদার বেণীর মতো আমার বেণীও লম্বা ও মোটা হবে এবং আঁচড়াতে, বাঁধতে ও স্নানের সময় নাগিনীর মতো মাটিতে লোটাবে? তুমি আমাকে বারে বারে জোর করে কাঁচা দুধই খাওয়াও, মাখন-রুটি দাও না।

শিশু-কৃষ্ণকে যশোদার নানা কথা বোঝাতে হয় দুধ খাওয়ার জন্যে। দুধ খেয়েও তাঁর চুল বড় হচ্ছে না দেখে এই যে দুঃখবোধ, তা মাতা-পুত্রের ঘনিষ্ঠতার প্রতীক। শিশুকে লালন-পালনের মধ্যে মায়ের যে ঐকান্তিক চেষ্টা ও যত্নের প্রয়োজন থাকে, হিন্দীভাষী কবিরা সে বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন। তাই সকালে ঘুম থেকে কৃষ্ণকে তোলা, সকালের খাবার খাওয়ানো, খেলা থেকে ডেকে আনা, প্রয়োজন হলে দূরে যেতে না দিয়ে নিজে সঙ্গ দেওয়া, স্নান করানো, দুপুরে খাওয়ানো, রাত্রিতে শোয়ানো ইত্যাদি প্রত্যেকটি বিষয়ের বর্ণনা তো আছেই, আর সেই সঙ্গে আছে যশোদার বাৎসল্য রসের পূর্ণ পরিচয়। নন্দদাসের একটি পদে যশোদার কৃষ্ণকে ঘুম থেকে তোলার ছবিটি বড় মনোরম :

জগাৱত অপনে সুত কো রাণী।
উঠৌ মেরে লাল, মনোহর সুন্দর, কহি কহি মধুর বাণী॥[৮৫]

—আমার বাছা সুন্দর-মনোহর ওঠ ; মধুর স্বরে রাণী যশোদা নিজের পুত্রের ঘুম ভাঙাচ্ছেন। ঘুম থেকে তোলার জন্যে যশোদা কৃষ্ণের যা যা প্রিয় খাদ্য, সেই সব খাদ্য তাঁর সামনে এনেছেন :

মাখন, মিশ্রী ঔর মিঠাঈ দুধ মালাঈ আনী।
ছগন মগন তুম করহু কলেউ মেরে সব সুখদানী॥
জননী-ৱচন সুনি তুরত উঠে হরি কহত বাত তুতরাণী।[৮৬]

—মাখন, মিছরি, মিঠাই, দুধ, সর এনে বলছেন : আমার বাছা, তুমি জলখাবার খেয়ে নাও। জননীর কথা শুনে হরি তৎক্ষণাৎ উঠলেন এবং আধো-আধো কথা বলতে লাগলেন।

কৃষ্ণ বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে খেলতে দূরে বনে চলে যান। যশোদা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হন। সব সময় চোখের সামনে না থাকলেই তিনি ব্যাকুল হয়ে পড়েন। কিন্তু

কৃষ্ণকে তিনি কিছুতেই আটকাতে পারেন না। তাই তাঁকে ভয় দেখিয়ে বলেন—

দূরি খেলন জনি জাহু ললা মেরে, বন মেঁ আএ হাউ।
তব হঁসি বোলে কান্হর, মৈয়া কৌন পঠাএ হাউ ?[৮৭]

—আমার বাছা, অনেক দূরে খেলতে যেও না, বনে একটা হাউ এসেছে। কৃষ্ণ মার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে হেসে জিজ্ঞাসা করেন— "মা, হাউ কে পাঠিয়েছে ?"

সন্তানের জন্যে মাতৃহৃদয়ের ভয়-ভাবনা ভৌগোলিক সীমা মানে না। বাংলা বৈষ্ণব কবির যশোদাও কৃষ্ণকে দূর বনে যেতে দিতে অনিচ্ছুক। উদ্বিগ্ন-হৃদয় যশোদা কৃষ্ণকে নিবৃত্ত করার জন্যে জ্ঞানদাস একই উপায় গ্রহণ করেছেন :

গোকুলের মাঝে এক হেল্য মহাভয়।
আস্যাছে দারুণ হাউ লোকে জনে কয়॥
কৃষ্ণ বলে একথা শুনিলে কাব ঠাঁঞি।
হাঁউ কেমন মা যশোদা আমি দেখি নাঞি॥
অবোধ ছাওয়াল মোব কি পুছিস মোকে।
বলবান হাউ এক ঝাউবনে থাকে॥[৮৮]

শিশু চৈতন্যকে ভয় দেখাবার জন্যে শচীমাতাকেও একই উপায় অবলম্বন করতে দেখি। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে চৈতন্যের শৈশব-লীলার বিশদ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। শিশু গোরা খেলতে গিয়ে বস্ত্র ও দেহ মলিন করে ঘরে ফিরে আসেন; শচীকে তাই বলতে হয়

সাজিয়া কাজিয়া পাঠাইল আমি।
ধূলায় ধূসর হইলা তুমি॥
রজনী প্রভাতে ছাড়িলে ঘর।
রড় দিয়া আইস হাউব ডর॥[৮৯]

ভয় পেয়ে নিমাইও ঘরে ফিরে আসেন—

হাউর ডর শুনি আইলা ঘবে।[৯০]

প্রসঙ্গত বলা যায় যে, ভাগবতের বিভিন্ন কাহিনী যে নিমাইয়ের জীবনে আরোপিত হয়েছে এটি তারই একটি দৃষ্টান্ত।

বৈষ্ণব কবি মায়ের মনস্তত্ত্ব ভালো করেই উপলব্ধি করেছিলেন। বাংলার কবির সঙ্গে হিন্দীভাষী বৈষ্ণব কবির এ বিষয়ে মিল আছে।

কৃষ্ণ যাতে দূরে খেলতে না যান তার জন্য কখনো কখনো যশোদা তাঁর কাজ ফেলে কৃষ্ণের সঙ্গে খেলাতেও যোগ দেন। আর এই খেলার মধ্যে মা ছেলের সঙ্গ দিয়ে শুধু কৃষ্ণকে আনন্দ দেন না, পুত্রের সঙ্গে খেলার মধ্যে তিনি নিজেও স্নেহে আপ্লুত হন। তাই তিনি কৃষ্ণকে বলছেন—

মেরে আগেঁ খেল করৌ কছু, সুখ দীজৈ মেয়া কোঁ।[৯১]

—আমার সামনে কিছু খেলা করে আমাকে আনন্দ দাও।

যশোদা কৃষ্ণ ও তাঁর সখাদের সঙ্গে চোর চোর খেলছেন। যশোদা স্বয়ং হয়েছেন

বুড়ি। কৃষ্ণকে বলছেন—

মৈঁ মুঁদোঁ হরি আঁখি তুম্হারী, বালক রহৈঁ লুকাঈ।[২২]

—হরি, আমি তোমার চোখ বেঁধে রাখব, অন্য বালকেরা লুকিয়ে থাকবে। মা স্বয়ং খেলবেন, এই আনন্দে কৃষ্ণ সখাদের দৌড়ে ডেকে আনলেন।

কৃষ্ণ খেলতে গিয়ে সমস্ত দেহে ধুলো মেখে আসেন, জামা কাপড় মলিন হয়ে যায়। কিন্তু স্নানে তাঁর প্রচণ্ড ভীতি। তাই যশোদা কৃষ্ণকে নানাভাবে বোঝাচ্ছেন :

মেরে ছগন মগন বারে কন্হৈয়া বনমেঁ খেলন জাত।
নেঁক উরৈ ধোঁ আই লাল হৈব রহে মলিন গাত॥
সংগ কে লরিকা বনি-বনি আয়ে য়োঁ কহেংগে কৈসী হৈ তেরী মাত।[২৩]

—আমার আদরের বাছা, তোমার বালাই নিই, কোথায় বনে খেলতে গিয়েছিলে? বাছা, এমন মলিন দেহ নিয়ে ফিরে এসেছ। তোমার সংগে ছেলেরা কেমন সুন্দর সেজে এসেছে। তোমার এমন মলিন বেশ দেখলে তারা বলবে, কেমন তোমার মা?

কৃষ্ণকে স্নান করবার জন্যে যশোদা এসব বলছেন। কিন্তু কৃষ্ণ কিছুতেই স্নান করতে চান না। যশোদার হাতে তেল উবটন দেখলেই কান্না জুড়ে দেন। কৃষ্ণের কান্না থামাবার জন্যে তাঁকে ছলনার আশ্রয় নিতে হয়।

জসুমতি জবহিঁ কহ্যৌ অন্হাবন, রোই গএ হরি লোটত রী।
তেল উবটনৌ লৈ আগেঁ ধরি, লালহিঁ চোটত-পোটত রী।
মৈঁ বলি জাউঁ নহাউ জনি মোহন, কত রোবত বিনু কাজৈঁ রী।
পাছেঁ ধরি রাখ্যৌ ছপাঈ কৈ উবটন-তেল সমাজৈঁ রী।
মহরি বহুত বিনতী করি রাখতি, মানত নহীঁ কন্হৈয়া রী॥[২৪]

—যশোদা কৃষ্ণকে স্নানের কথা বলতেই হরি কেঁদে লুটিয়ে পড়লেন। তেল উবটন রেখে দিয়ে মা ছেলেকে আদর করে বোঝাতে লাগলেন। আমি তোমার বলিহারী যাই মোহন, তুমি স্নান করো না, কিন্তু বিনা কারণে কেন কাঁদছ? তেল উবটন ইত্যাদি সব পেছনে লুকিয়ে রেখে অনেক করে বোঝাতে লাগলেন। কিন্তু কৃষ্ণ কিছুতেই শান্ত হলেন না।

সকাল বেলাকার জলখাবাবের সময় অনেক স্নেহে যত্নে যশোদা কৃষ্ণকে খেতে দিচ্ছেন, এ বর্ণনা হিন্দীতে প্রায়ই পাওয়া যায়। যেমন, "করহু কলেউ রাম-কৃষ্ণ মিলি কহতি জসোদা মৈয়া।"[২৫]

—যশোদা বলছেন, রাম-কৃষ্ণ, তোমরা জলখাবার খেয়ে নাও।

শুধু সকালবেলার খাওয়ার কথা বলেই কবি সুরদাস ক্ষান্ত হন না। বিভিন্ন সময়ে কৃষ্ণের খাওয়া এবং তা নিয়ে যশোদার নানা ঝঞ্ঝাটের সমস্ত ছবিরই নিখুঁত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। তুচ্ছ বিষয়ও তাঁর নিপুণ প্রকাশভংগিতে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। বন্ধুদের সংগে খেলতে খেলতে দুপুরের খাওয়ার কথা কৃষ্ণের মনে থাকে না। ফলে যশোদাকে খুঁজে বেড়াতে হয় কোথায় কৃষ্ণ। তিনি ছেলেকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন সম্ভাব্য সকল জায়গায়:

নন্দ বুলাৱত হৈঁ গোপাল।
আবহু বেগি বলৈয়া লেঁউ হোঁ, সুন্দর নৈন বিসাল।[৯৬]

—মা সস্নেহে ডাকছেন, সুন্দর বিশাল লোচন গোপাল, তাড়াতাড়ি এসো আমি তোমার বালাই নিই। তোমাকে নন্দ-বাবা ডাকছেন।

কিন্তু কৃষ্ণ আসছেন না দেখে যশোদা ডেকে বলছেন,— "ভাত সিরাত তাত দুখ পাৱত, বেগি চলৌ মেরে লাল।"[৯৭]

—ভাত ঠাণ্ডা হচ্ছে, বাবা নন্দ রুষ্ট হচ্ছেন, আমার বাছা ছুটে চলে এসো। তিনি আরো বলছেন— "হোঁ বারী নান্হে পাইনি কী দৌরি দিখাৱহু চাল।"[৯৮]

—আমি তোমার ছোট ছোট পায়ের বলিহারি যাই দৌড়ে তোমার চলা দেখাও।

সূরদাস পিতা নন্দের বাৎসল্যের ছবি আঁকতেও সিদ্ধহস্ত। তাঁর বর্ণনায় আছে নন্দের দুপুরের খাওয়াই হয় না যদি রাম ও কৃষ্ণ সঙ্গে না বসেন :

মেরৈঁ সংগ আই দোউ বৈঠৈঁ, উন বিনু ভোজন কোনে কাম।[৯৯]

—আমার সঙ্গে দুজন [রাম কৃষ্ণ] খেতে বসে। ওদের ছাড়া খাওয়া অর্থহীন হয়ে পড়ে।

কৃষ্ণ এসে খেতে বসেছেন। বড় বড় গ্রাস মুখে তোলার চেষ্টা করছেন। কিছু খাচ্ছেন, কিছু গায়ে হাতে মাখছেন। হঠাৎ মুখের ভিতর লঙ্কা পড়ে যাওয়াতে ঝাল লেগেছে। কাঁদতে কাঁদতে ছুটে বাইরে চলে গেলেন, তাই দেখে রোহিণী তাঁকে কোলে তুলে মুখে ফুঁ দিয়ে আদর করতে লাগলেন :

"ফুঁকতি বদন রোহিণী ঠাঢ়ী লিএ লগাই অঁকোরে।"[১০০]

বাংলার বৈষ্ণব কবিরা মানব জীবনের প্রতিদিনের খুঁটিনাটি প্রতিটি বিষয় হয়তো তাঁদের পদে গ্রহণ করেননি। তবে জীবনের প্রধান প্রধান বিষয়গুলি উপেক্ষা করা হয়নি। অনেক সময় একই বিষয় উভয় ভাষার কবিরা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু বলার ভঙ্গিমায়, কিংবা দৃষ্টিভঙ্গিতে পার্থক্য দেখা যায়। হিন্দী বৈষ্ণব কবিরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখিয়েছেন, কৃষ্ণকে খাওয়ানো নিয়ে যশোদাকে নানাভাবে চেষ্টা করতে হচ্ছে। বাঙালী কবিদের কৃষ্ণ একটু লোভী। তাঁরা দেখিয়েছেন কৃষ্ণ সকালে ঘুম থেকে উঠেই খাবার জন্যে বায়না শুরু করেন :

রজনী প্রভাতে উঠি নন্দের গৃহিণী।
দধির মন্থন করে তুলিতে নবনী॥
নিদ্রাগত ছিল কৃষ্ণ শয়ন মন্দিরে।
নিদ্রাভঙ্গ হইল বৈসে পালঙ্ক উপরে॥
আমার হয়েছে ক্ষুধা শুনগো জননী।
স্তন কিম্বা দেহ মোরে খাইতে নবনী॥
মা মা বলিয়া তবে বাহিরে আইলা।
কি খাব বলিয়া কৃষ্ণ কাঁদিতে লাগিল॥[১০১]

হিন্দী বৈষ্ণব সাহিত্যে যশোদা যেখানে কৃষ্ণকে খেয়ে নেবার জন্য অনুনয়

করছেন, বাংলা বৈষ্ণব কাব্যে কৃষ্ণ অসহ্য ক্ষুধার জ্বালায় যশোদাকে অতিষ্ঠ করছেন।

মাখন কারণ লালত রোবত
তোরহি ধরনি লোটাই।[১০২]

কবিরা ঘরে ঘরে এ রূপটি প্রত্যক্ষ করছেন বলেই ক্ষুধার্ত শিশুর এমন জীবন্ত ছবি আঁকা সম্ভব হয়েছে :

একদিন বিহানে উঠিঞা নন্দরাণী।
যাদুরে লইয়া কোলে মথিছে নবনী॥
হেনকালে ধরে কৃষ্ণ মন্থনের ডারি।
ননী দে মা বল্যা কর পাত এ মুরারি॥[১০৩] —জ্ঞানদাস

অথবা, যশোদা কৃষ্ণকে তাঁর অনুপম নৃত্য দেখাতে বললে কৃষ্ণ তার উত্তরে বলেন—

বসিয়া মায়ের কোলে, আধ আধ বাণী বোলে,
শুন শুন ওগো নন্দরাণী।
ক্ষুধাতে হালিছে গা, নাচিতে না উঠে পা,
খাইতে দে মা খীর সর ননী॥
শুনিয়া গোপালের কথা মরমে পাইলা ব্যথা,
ভাসে রাণী নয়নের জলে।
হাতে লৈয়া খীর ননী, চাঁদ মুখে দেয় রাণী,
চুম্ব দেয় বদন কমলে॥[১০৪] —বংশীবদন

এমনকি নিজের ভাণ্ডার শূন্য থাকলে ক্ষুধার্ত কৃষ্ণকে অনেক সময় শান্ত করাব জন্যে যশোদার অন্য বাড়ী থেকে ননী চেয়ে আনতে যেতে হয়।

একদিন মাতৃ-স্তন্য পানে ইচ্ছুক দুরন্ত শিশু কৃষ্ণকে শান্ত করতে কোলে তুলে নিয়ে যশোদা বসেছেন, এমন সময় দুধ উথলিয়ে উঠছে দেখে তিনি কৃষ্ণকে কোল থেকে নামিয়ে দুধের কাছে চলে যান। স্তন্যপানে অতৃপ্ত কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে ঘরে প্রবেশ করেন। যশোদা ফিরে এসে কৃষ্ণকে না দেখে চিন্তিত হলেন।

আমি কি এমন জানি কোলে করি যাদুমণি
যাদুরে করাই স্তন পান।
মোরে বিধি বিড়ম্বিল গোরস উথলি গেল
তা দেখি ধরিতে নারি প্রাণ॥
গোপাল না লৈনু কোলে ভুলিনু রোহিণী বোলে
সে কোপে কোপিত যাদুমণি।[১০৫]

যশোদা কৃষ্ণকে খুঁজে পাচ্ছেন না। মা'র স্তন্য পান করে ক্ষুধা মেটাবার সুযোগ না পাওয়াতেই কৃষ্ণের এই ক্রোধ। এদিকে তিনি নানা পাত্র ভেঙে ক্ষীর, ননী ইত্যাদি চুরি করে খেয়ে নিয়েছেন। কিন্তু যশোদার কাছে চুরি করাটা বিশেষ অপরাধ নয়, তিনি ব্যস্ত পুত্রকে না দেখতে পেয়ে। তাই বন্ধুদের প্রশ্ন করেন :

তোমরা করিছ খেলা গোপাল কোথায় গেলা

দৃঢ় করি বল এ বোল।[১০৬]

কৃষ্ণ মায়ের দুর্বলতা বোঝেন। ঘনরামদাস একটি বিশেষ ঘটনার মধ্যে যশোদার দুর্বলতাকে আরো সুন্দর করে স্পষ্ট করেছেন। একদিন—

যমুনার জলে গেলা যশোদা রোহিণী।
শূন্য ঘর পাঞা লুটে এ ক্ষীর নবনী॥
পিঁড়ির উপর পিঁড়ি উদুখল দিয়া।
তমু ত শিকার ভাণ্ড লাগি না পাইয়া॥
নাড়িতে ছেদিয়া ভাণ্ড হেটে পাতে মুখ।
হেনই সময় দেখে জননী সম্মুখ॥[১০৭]

হঠাৎ মাকে দেখে কৃষ্ণ ছুটে পালান। আর—

দু বাহু পসরি আগে যায় নন্দরাণী।
ধরিতে ধরিতে ধরা না দেয় নীলমণি॥
গৃহে পড়ি গড়ি যায় দধি নবনীত।
কোপ-নযনে বাণী চাহে চারিভীত॥[১০৮]

এবং তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে রোহিণীকে প্রশ্ন করেন— "হেদে গো বামেব মা, ননী চোরা গেল কোন পথে।" কাবণ কৃষ্ণেব অত্যাচারে ঘবে "ক্ষীর রস যত হয়, কিছুই নাহিক রয়"।[১০৯]

কৃষ্ণের আহার সম্বন্ধে বাংলা পদাবলী থেকে যেসব উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে দুটি বৈশিষ্ট্যের মিশ্রণ দেখা যায়। একটি বাঙালীর ভোজন বিলাসিতা, অন্যটি মধ্যযুগীয় বাঙালী সমাজের দারিদ্র্য। ঘুম ভাঙ্গার পরেই কৃষ্ণ যখন খাবার জন্য বায়না শুরু করেন তখন এই সিদ্ধান্ত করাই স্বাভাবিক যে, পূর্বরাত্রে তাঁর খাওয়া যথেষ্ট হয়নি। ক্ষুধার জ্বালায় খাদ্যের প্রতি লোভ স্বাভাবিক এবং এইদিক থেকে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে দারিদ্র্যের যেসব চিত্র আছে, তাব সংগে বলরামদাসের উদ্ধৃত পদটির যোগ আছে বলে মনে হয়।

শিবায়ন কাব্যে দেখা যায়, পার্বতী পুতুল-কন্যার বিবাহেব পর বিদায়ের মুহূর্তে পুতুল-বরকে অনুরোধ করছেন: "আটং ঢাক্যা বস্ত্র দিয় পেট ভরা ভাত।"[১১০] শুধু দু'বেলা পেট ভরে ভাত খাওয়াটার মধ্যেই ছিল সকল সুখের উৎস। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম নিজের দৈন্য সম্বন্ধে বলেছেন:

তৈল বিনা কৈল স্নান কবিনু উদক পান
শিশু কাঁদে ওদনেব তরে।[১১১]

দু'মুঠো ভাতের জন্য এমনি হাহাকাব, মধ্যযুগের কাব্যে অনেক জায়গাতেই পাওয়া যায়।

কিন্তু উপরে উদ্ধৃত পদাবলী থেকে এ-ও দেখা যায়, দারিদ্র্য ছাড়াও কৃষ্ণ আদুরে বাঙালী ছেলের মতো ভোজনবিলাসী ছিলেন এবং স্নেহাতুরা যশোদা সেই বিলাসকে সমর্থন করতে দ্বিধা করতেন না। তবে, দুধ ননী ক্ষীর ইত্যাদি খাওয়ার যে ছবি বাংলা পদাবলীতে পাওয়া যায়, সেটা যে প্রাচুর্যের চিত্র এমন কথা বলা যায় না। কারণ নন্দ

জাতিতে গোয়ালা, দুধ, ননী ক্ষীর বিক্রয় করাই তাঁর ব্যবসা। তাই, ব্যবসার পণ্য কৃষ্ণ খেয়ে নিঃশেষ করলে কখনো কখনো জননীকে ক্রুদ্ধ হতেও দেখা যায়; কারণ এই পণ্য হ'ল তাঁদের জীবিকার্জনের সম্বল।

চুরি করে দুধ ননী, ক্ষীর খাওয়ায় যশোদা ক্রুদ্ধ হন। মায়ের ক্রুদ্ধ মূর্তি দেখে কৃষ্ণ ভয়ে পালিয়ে থাকেন কিছুক্ষণ। যে কোনো কারণেই হোক না কেন, ছেলেকে কিছুক্ষণ দেখতে না পেলে তাঁর রাগ জল হয়ে যায়, কৃষ্ণকে ফিরে কোলে পাবার জন্যে তিনি ব্যাকুল হন। সেই ব্যাকুলতা ধরা পড়েছে কবির রচনায়:

তোমা না দেখিয়া প্রাণ হইল আকুল॥
কার ঘরে আছে গোপাল বোল ডাক দিয়া।
তোমার মায়ের প্রাণ যায় বিদরিয়া॥[১১২] —ঘনরামদাস

ভাগবতের যশোদা প্রয়োজনে রুদ্রাণী হতে পারেন। পদাবলীর যশোদা 'বাংলা দেশের মা'। এইটিই তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয়। তিনি সন্তান-অন্ত প্রাণ, একটু অদর্শনে ব্যাকুল হয়ে পড়েন। আর তাই—

ঘরে ঘরে উকটিতে পদচিহ্ন দেখি পথে
সকরুণ-নয়ানে নেহারে।
আহা মরি হায় হায় মুরছিয়া পড়ে তায়
কান্দে পদচিহ্ন লৈয়া কোরে।[১১৩] —ঘনরামদাস

এবং শেষপর্যন্ত দেখি যশোদা পুত্রকে কোলে পেয়ে জীবন ফিরে পেয়েছেন:

মরণ-শরীরে যেন পাইল পরাণ দান
শুনিতেই নূপুরের ধ্বনি॥
বসিয়া মায়ের কোলে গদ গদ বাণী বোলে
অনেক সাধের যাদুমণি।[১১৪] —ঘনরামদাস

ভাগবতে এই চুরি করার অপরাধে যশোদা কৃষ্ণকে উদুখলে বেঁধে রেখেছেন, তিরস্কার করেছেন।[১১৫] বাঙালী মা এত রূঢ় হতে পারেন না, তাই বোধ হয় বাঙালী বৈষ্ণব কবিরা এ বিষয়ে তেমন দৃষ্টি দেননি। মনে হয়, সন্তানের অন্যায় আচরণের জন্যেও মায়ের কঠোর ব্যবহার তাঁরা চিন্তাই করতে পারেন না। স্নেহ-ব্যাকুল চিরন্তন বাঙালী মা, যশোদা সম্পর্কে এর চেয়ে বেশি কিছু চিন্তাই করা যায় না।

বলরামদাসের একটি পদে কৃষ্ণ নন্দের কাছে নালিশ করছেন যে, ননী চুরির জন্যে যশোদা তাঁকে দড়ি দিয়ে বেঁধেছেন:

দাঁড়াইয়া নন্দের আগে গোপাল কান্দে অনুরাগে
বুক বাহিয়া পড়ে ধারা।
না থাকিব তোমার ঘরে অপযশ দেহ মোরে
মা হইয়া বলে ননি-চোরা॥
ধরিয়া যুগল করে বাঁধিয়া ছান্দন-ডোরে
বাঁধে রাণী নবনী লাগিয়া।[১১৬]

প্রচণ্ড অভিমানে যশোদার সবচেয়ে দুর্বল স্থানে আঘাত করে কৃষ্ণ বলেন যে, তিনি যশোদার নিজের জঠরজাত সন্তান নন, তাই তিনি কৃষ্ণের প্রতি রূঢ় হতে পারেন :

পরের ছাওয়াল পাইয়া মারেন আসেন ধাইয়া
শিশু বলি দয়া নাহি তার ॥[১১৭]

তিনি মাকে আঘাত দেবার জন্যেই বলেন— "এ দুঃখে যমুনা হব পার।" কিন্তু কৃষ্ণ যশোদার গর্ভজাত সন্তান না হয়েও সন্তানাধিক। যাঁকে প্রতি মুহূর্তে যশোদা হারান সেই কৃষ্ণ তাঁকে ত্যাগ করে যাবেন, তিনি চিন্তাই করতে পারেন না। তিনি ছুটে কৃষ্ণকে কোলে তুলে নেন—

যশোদা আসিয়া কাছে গোপালেব মুখ মুছে
অপরাধ ক্ষমা কর মোবে ॥[১১৮]

কৃষ্ণকে কোলে ফিরে পেতে যশোদা সব কিছুই কবতে প্রস্তুত। তাই পুত্রের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা কবতেও তিনি দ্বিধা করেন না।

হিন্দী বৈষ্ণব কবি কৃষ্ণকে উদূখলে বন্ধনেব ঘটনাটি অন্যভাবে ব্যবহার করেছেন। কৃষ্ণ অন্যের গৃহে গিয়ে মাখন, ননী, দই চুবি করে খান, আরো নানা রকম অত্যাচাব করেন। অতিষ্ঠ হয়ে ব্রজগোপিনীরা যশোদার কাছে নালিশ করছেন। প্রথমে স্নেহান্ধ যশোদা অভিযোগ বিশ্বাসই করছেন না। তিনি গোপিনীদের বলেন, "গ্বালিনি! তোপেঁ ঐসো ক্যোঁ কহি আয়ো।"[১১৯] গোয়ালিনী, তোমরা এমন কথা কি করে বলতে এসেছ! কারণ, "মেরে কান্হ কোঁ কছুঅ ন লাগৈ গংগা কো সো পান্যোঁ।"[১২০] অর্থাৎ, আমার কানুকে কোনো দোষই স্পর্শ করেনি, সে গংগা জলের মতো পবিত্র। তাছাড়া যশোদা গোয়ালিনীদের বলেন, পাঁচ বছরের ছেলে সে কি করে চুরি করবে? মা সাধাবণতঃ সন্তানের বয়স কম করে বলেন। বিশেষ করে ছেলেকে নিয়ে যেখানে ঝগড়া, সেখানে নিজের সন্তানকে শিশু প্রতিপন্ন করে দোষ স্খালনের চেষ্টার মধ্যে কবির বাস্তব দৃষ্টিভংগি যে খুবই সজাগ, সেটি উপলব্ধি করা যায়। মাখন চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে যশোদা যখন গোয়ালিনীদের সংগে ঝগড়া করেন, তখন তাঁকে গ্রামের একজন সাধারণ মা ছাড়া কিছুই ভাবা যায় না। তিনি স্নেহান্ধ হয়ে কোমর বেঁধে অন্যান্য গোপিনীর সংগে ঝগড়া করছেন। তিনি বলছেন, তাঁর পুত্রকে গোপিনীরা মিথ্যা দোষারোপ করছেন। কৃষ্ণকে চুরির অপবাদ দেওয়ায় তিনি প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়েছেন। তাই তিনি বলেন,—

গোরস কহা দিখাৱনি আঈ।
ইতনো লৈ খায়ো নন্দজু কে ঢোটা বদলি লৌহি মেরী মাঈ।[১২১]

—দুধ কোথায় দেখাতে এসেছ? নন্দপুত্র যতটা দুধ তোমাদের খেয়েছে ততটা দুধ নিয়ে যাও বাছারা। সুরদাসের পদে যশোদার পাড়াগাঁয়ের স্নেহান্ধ মাতৃরূপটি আরো বেশি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তিনি বলছেন, মাত্র পাঁচ বছরের তাঁর ছেলে, তাঁর পক্ষে চুরি করা কখনোই সম্ভব নয়। গোপিনীদের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি তিরস্কার করছেন :

মেরো গোপাল তনক সো, কহা করি জানৈ দধি কী চোরী

হাত নচাবত আৱতি প্বারিনি, জীভ করৈ কিন থোরী।
কব সৌকৈঁ চঢ়ি মাখন খায়ো, কব দধি-মটুকী ফোরী।
অঁগুরী করি কবহুঁ নহিঁ চাখত, ঘরহী ভরী কমোরী।[১২২]

—আমার ছোট্ট গোপাল দই চুরি করতে জানেই না। অথচ এই গোয়ালিনীদের দেখ, কিভাবে হাত নাচিয়ে জিভ চালাচ্ছে [ঝগড়া করছে]। কবে কৃষ্ণ তোমাদের শিকেয় চড়ে মাখন খেয়েছে, কবে দইয়ের হাঁড়ি ভেংগেছে? ঘরে হাঁড়ি ভর্তি দই রয়েছে তা কৃষ্ণ আংগুল দিয়ে চেখেও দেখে না।

কিন্তু নালিশ শুনে শুনে যশোদা ক্রমে উত্যক্ত হয়ে উঠলেন। নানাভাবে ছেলেকে বোঝান, "অনত সুত গোরস কোঁ কত জাত।"[১২৩] —বাছা, দুধের জন্যে অন্যত্র কোথায় যাও? ঘরেই তো কৃষ্ণা ও ধবলী গাইয়ের দুধের মাখন আছে, কেন চেয়ে নাও না! গোপিনীরা কটু কথা বলে যায়, ব্রজরাজ তাতে অসন্তুষ্ট হন। আবার কখনো বলেন—

ঔগুন ছাঁড়ি মানি কহ্যো মেরো।
চপল চোর ঘর-ঘর ডোলত হো কৌন বিৱাহ করৈ গো তেরো।[১২৪]

—আমার কথা শোন, এসব ছাড়; না হলে এমন চঞ্চল চোরকে কে বিয়ে করবে? কখনো বা কৃষ্ণকে ধমক দিয়ে বলেন— "কন্হৈয়া তু নাহিঁ মোহিঁ ডরাত।"[১২৫] কানাই, তুমি আমাকে ভয় পাও না? ঘরে এত মাখন, দই থাকতে তুমি অন্যের ঘরে চুরি করে বেড়াও? যশোদা কৃষ্ণকে এত বুঝিয়ে, ধমকেও সংশোধন করতে পারলেন না। একদিন চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়লে গোপিনীরা কৃষ্ণকে যশোদার কাছে নিয়ে এলেন, তখনো তাঁর মুখে মাখন লেগে আছে। কৃষ্ণ তাড়াতাড়ি মুখ মুছে বলছেন,—

মৈয়া মৈঁ নহিঁ মাখন খাযো।
খ্যাল পরৈঁ য়ে সখা সবৈ মিলি, মেরৈঁ মুখ লপটায়ো।[১২৬]

—মা, আমি মাখন খাইনি। মনে পড়েছে, সব সখারা মিলে আমাকে হাস্যাস্পদ করার জন্যে মুখে মাখন লাগিয়ে দিয়েছে।

যশোদা ক্রুদ্ধ হয়ে ছড়ি হাতে এগিয়ে এসে কৃষ্ণকে ধরলেন। রাগে তাঁর শরীর কাঁপছে। "সাঁটিয়া লিএ হাথ নন্দরাণী, থরথরাত রিস গাত।"[১২৭] তিনি কৃষ্ণকে দড়ি দিয়ে উদুখলের সংগে বাঁধতে লাগলেন। কৃষ্ণের শাস্তি ও কান্না দেখে গোপিনীরা তাঁর সব দোষ ভুলে গেলেন, তাঁরা মমতার বশীভূত হয়ে বারবার যশোদাকে অনুরোধ করতে লাগলেন, কৃষ্ণকে ছেড়ে দেবার জন্যে: "কমল নয়ন হরি হলকনি রোৱৈ বন্ধন ছোরি জসোৱৈ॥"[১২৮] —কমল নয়ন হরি হেঁচকি তুলে কাঁদছেন; যশোদা, বাঁধন খুলে দাও। কেউ বলছেন, "বজ্রহু কে কঠিন হিয়ো তৈরো হৈ জসোৱৈ"।[১২৯] যশোদা গোপিনীদের কথায় ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। কারণ এই গোপিনীদের নালিশ শুনে শুনেই উত্যক্ত হয়ে তিনি আজ কৃষ্ণকে কঠিন শাস্তি দিতে বাধ্য হয়েছেন। পুত্রকে শাস্তি দিয়ে তিনি নিজে মর্মান্তিক যন্ত্রণা ভোগ করছেন। ফলে, স্নেহাতুরা জননীর সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ে গোপিনীদের উপর।

কহন লগী অব বঢ়ি— বঢ়ি বাত।

ঢোটা মেরো তুমহিং বঁধায়ো, তনকহিং মাখন খাত ॥[১৩০]

—যশোদা গোপিনীদের বলছেন, এখন তোমরা বড় বড় কথা বলছ। অথচ তোমরাই তো সামান্য মাখন খাবার জন্যে আমার ছেলেটাকে বেঁধে রাখতে বাধ্য করেছ।

বন্দী অবস্থাতেই কৃষ্ণ অলৌকিক ক্ষমতাবলে গৃহাঙ্গনের দুই বৃহৎ বৃক্ষ উৎপাটিত করায় ভীত শঙ্কিত যশোদা পুত্রকে বন্ধনমুক্ত করে কোলে তুলে নিলেন।

"নৈন জল ভরি ঢাবি জসুমতি, সুতহি-কণ্ঠ লগাই।"[১৩১]

—চোখের জলে যশোদা পুত্রকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

গৃহে ফিরে নন্দ সমস্ত ঘটনা শুনে যশোদার উপর ক্রুদ্ধ হলেন :

"বাঁধি রাখতি সুতহি মেরে, দেত মহরিহিং গারি।"[১৩২]

—ছেলেকে আমার বেঁধে রেখেছিলে? বলে স্ত্রীকে তিরস্কার করলেন। আর কৃষ্ণ 'বাবা' বলে নন্দের কাছে ছুটে গেলেন।

"তাত কহি তব স্যাম দৌরে, মহর লিয়ো অঁকবারি।"[১৩৩]

যশোদার অনুশোচনার সীমা নেই। নিজেকেই তিনি দোষারোপ করছেন :

মোহন হৌং তুম উপর বারী।
কণ্ঠ লগাই লিএ, মুখ চুমতি, সুন্দর স্যাম বিহারী।
কাহে কোঁ ঊখল সোঁ বাঁধো, কৈসী মৈঁ মহতারী ॥[১৩৪]

—মোহনকে বুকে জড়িয়ে মুখ চুম্বন করে যশোদা বলছেন— মোহন, আমি তোমার বলিহারি যাই, শ্যামসুন্দর বিহারী, আমি কি রকম মা যে তোমাকে উদুখলে বেঁধে রেখেছিলাম।

বাসুদেব ঘোষ বোধ হয় একমাত্র বাঙালী পদকর্তা, যিনি মাখন চুরির প্রসঙ্গ নিয়ে কয়েকটি পদ রচনা করেছেন। যেমন, গোপিনীরা যমুনায় জল আনতে যাবার অবকাশে কৃষ্ণ তাদের ঘরে ঢুকে চুরি করে ননী খেয়ে নিয়েছেন। গোপিনীরা বিশেষ করে কুটিলা, যশোদার কাছে গিয়ে কৃষ্ণ সম্পর্কে নানা কটুক্তি করে এলেন। যশোদা ক্রুদ্ধ হয়ে—

একথা শুনিয়া রাণীর ক্রোধ উপজিল।
কৃষ্ণের যুগল করে বন্ধন করিল ॥
কদম্বের ডালে রাণী করিল বন্ধন।[১৩৫]
প্রহার করেন কৃষ্ণে করেন ক্রন্দন ॥

কৃষ্ণ ননী মাখন চুরি করার অপরাধে হিন্দী ও বাংলা কবিরা সকলেই কৃষ্ণকে উদুখলে বেঁধেছেন। কিন্তু বাসু ঘোষ একমাত্র কবি যাঁর পদে, কদম্বের ডালের সংগে কৃষ্ণকে বাঁধা হয়েছে। তাছাড়া, ক্রন্দনরত কৃষ্ণের সংগে যশোদার কথোপকথনও লক্ষণীয় :

তোমার চরণে ধরি বলি নন্দরাণী।
চুরী করি আর আমি খাব না নবনী ॥
বন্ধনেতে প্রাণ যায় বলেন কানাই।
যশোদা প্রহার করে কথা শুনে নাই ॥[১৩৬]

তখন কৃষ্ণ যশোদাকে নিরস্ত করার জন্যে তাঁর দুর্বল স্থানে আঘাত দিয়ে বলেছেন যে, তিনি যমুনা পার হয়ে চলে যাবেন, অন্যের সন্তান হয়ে অন্য রমণীকে 'মা' বলে ডাকবেন। সে অন্ততঃ তাঁকে ভালো করে ননী-মাখন খেতে দেবে। তাছাড়া কৃষ্ণ যে যশোদার যথার্থ সন্তান নন, তা যশোদার নিষ্ঠুর আচরণেই বোঝা যায়। নিজের মা কখনই সন্তানকে এমন নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করতে পারতেন না। কৃষ্ণের এই কথায় যশোদা স্থির থাকতে পারেন না। তিনি কৃষ্ণকে মুক্তি দেন এবং তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকে। তিনি বলেন— "দুকর পুরিয়া তোরে দিব রে নবনী।" কৃষ্ণ যে তাঁর অনেক তপস্যার ধন। তাই কৃষ্ণকে শাস্তি দিয়ে আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হচ্ছেন :

অনেক তপের ফলে তোমা ধনে পেয়েছি কোলে
আজি মোর কুমতি হইল।[১৩৭]

সন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষায় যশোদা কি কঠিন তপস্যা করেছেন সে কথা তিনি স্মরণ করে বলেন।

অনেক তপের ফলে পেয়েছি তোমারে।
কাত্যায়নী পূজেছিলাম সাগরের ধারে॥
গ্রীষ্মকালে চারিদিকে জ্বালিয়া আগুনি।
গায়ের মাংস কাটি দিতাম করি খানি খানি॥[১৩৮]

কিন্তু অভিমানে রুষ্ট হয়ে কৃষ্ণ যশোদার কোলে কিছুতেই যাবেন না। যশোদা কৃষ্ণকে নানাভাবে বোঝাচ্ছেন :

নয়নের তারা তুমি তোমারে হারায়ে আমি
গাভি যেন বাছা হারাইল।[১৩৯]

যশোদা কৃষ্ণকে শান্ত করার চেষ্টা করেন। আর সেই সঙ্গে নিজেকে সহস্রবার ধিক্কার দেন। শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণ যশোদার কোলে এলেন :

অনেক যতনে রাণী কৃষ্ণে বুঝাইল।
গোলোকের নাথ কৃষ্ণ কোলেতে আইল॥[১৪০]

আর পুত্র কোলে পেয়ে যশোদারও চিত্ত শান্ত হল। পুরনো প্রসঙ্গটি একটু নতুন ভাবে সাজিয়েছেন বাসুদেব।

হিন্দী কবিরা এই প্রসঙ্গটি যেভাবে বিবৃত করেছেন, তার একটু বিস্তৃত বিবরণ উপরে দেওয়া হয়েছে। একটি ঘটনার সূত্রপাত এবং পরিণতি এখানে যেমন করে দেখানো হয়েছে, অন্যত্র তা করা হয়নি। এখানে কৃষ্ণ, যশোদা, বলরাম ও গোপিনীরা সকলেই নিজ নিজ ভূমিকায় যথোপযুক্ত অংশ গ্রহণ করেছেন। সব মিলিয়ে একটি সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যায়। এক দুরন্ত পুত্রের স্নেহাসক্ত গ্রাম্য মায়ের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন যশোদা। তিনি পুত্রের দুরন্তপনায় উত্যক্ত। অন্যের নালিশে ক্ষিপ্ত, পুত্রকে শাস্তি দেবার মধ্যে যেন অভিযোগকারিণীদের সাজা দেবার এক কুটিল বাসনা গুপ্ত হয়ে আছে। নিজে তো অনুতপ্ত হনই। এবং শাস্তির পর ছেলেকে শতগুণ বেশি আদর করেন।

বাসু ঘোষের এই প্রসঙ্গটি বর্ণনায় এমন সামগ্রিক ব্যাপ্তি নেই। একটি সুন্দর লিরিকধর্মী ছবিতেই তার সমাপ্তি।

পুত্রের জন্যে অজানা আশঙ্কা সুরদাসের পদে প্রায়ই পাওয়া যায়। যেমন, একদিন কৃষ্ণ হঠাৎ ঘুম ভেঙে চেঁচিয়ে জেগে উঠলেন ; তাঁর চিৎকারে নন্দ যশোদারও ঘুম ভেঙে গেল। কৃষ্ণ বলছেন, তাঁকে যেন কেউ কালীদহে ফেলে দিচ্ছে, এই রকম স্বপ্ন দেখেছেন। যশোদা শুনে বলছেন, গোরু স্নান করাতে যমুনার ঘাটে যায়, বাছা আমার ভয় পেয়েছে। তিনি তাড়াতাড়ি কৃষ্ণকে কোলে তুলে নিয়ে বললেন— "বৃন্দাবনমেঁ ফিরত জহাঁ—তহাঁ কিহিঁ কারণ তু জাই।[১৪১] —বৃন্দাবনে এখানে-সেখানে কেন যে তুমি ঘুরে বেড়াও! পুত্রের স্বপ্নের কথায় যশোদা ভীত ও চিন্তিত—"সপনো সুনি জননী অকুলানী।"[১৪২] তখন নন্দ ও যশোদা চিন্তিত হয়ে নিজেদের মাঝখানে পুত্রকে শোয়ালেন। কৃষ্ণ বাবা ও মায়ের মাঝখানে শুয়ে শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।[১৪৩]

ঘুমের মধ্যে শিশুর ভয় পাওয়া, কোনো দুঃস্বপ্ন দেখায় মাতাপিতার আতঙ্ক, ইত্যাদি সাধারণ ঘটনা। সুরদাসের বৈশিষ্ট্য অতি সামান্যের মধ্যেই তিনি বাৎসল্যের যথার্থ পরিচয় তুলে ধরেন।

আর যেদিন সত্যি কৃষ্ণ কালীয়-দমনের জন্যে জলে নামলেন, সেই সংবাদ পেয়ে যশোদা ও নন্দ ছুটে এলেন কালীদহের তীরে এবং সমস্ত দৃশ্য দেখে যশোদা মাটিতে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। রসখান পুত্রের জন্যে মাতৃ-হৃদয়ের ভয় ও যন্ত্রণাকে অপূর্ব কৌশলে প্রকাশ করেছেন। কৃষ্ণ কালীয়কে দমনের জন্যে জলে নেমেছেন, সাপ তাঁকে জড়িয়ে ধরেছে। ব্রজের সবাই তীরে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখছে, অথচ কেউ কৃষ্ণকে সাহায্য করতে এগিয়ে যাচ্ছে না দেখে যশোদা ব্যাকুল হয়ে সখীকে বলছেন—

আপনো সো ঢোটা সবহী কে সদা চাহেঁ,
দোউ প্রাণী সবহী কে কাজ নিত ধাবহীঁ ॥
তে তৌ রসখানি তব দূরেতেঁ তমাসো দেখে,
তরনি তনুজা কে নিকট নাহিঁ আবহীঁ ॥
আদিন পরে তে অনহিতু সব ভয়ে লোক,
য়হে তো অজোগ দেখি লোচন দুরাবহীঁ ॥
কহা কহোঁ আলী খ্যালী দেত সব টালী হায়
মেরে বনমালী কোন কালীতে ছুড়াবহীঁ ॥[১৪৪]

—যশোদা নিজের সখীকে কালীয়-দমনের বর্ণনা দিয়ে বলছেন— হে সখি, আমরা [নন্দ ও যশোদা] দু'জনে সব গোপ বালকদের নিজের ছেলের মতো মনে করি এবং দু'জনে প্রতিদিন অন্যের প্রয়োজনে ছুটে যাই ; অর্থাৎ সর্বদাই অন্যের সহায়তায় তৎপর থাকি। অথচ তারাই আজ দূর থেকে তামাশা দেখছে। কেউ যমুনার কাছে পর্যন্ত যাচ্ছে না। আজ দুর্দিন তাই সবাই মমতাহীন। খারাপ সময় বলেই সবাই মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। কি বলব, সবাই তামাশা দেখছে, নিজেদের গা বাঁচাচ্ছে, কেউ আমার বনমালীকে কালীয় নাগের কাছ থেকে ছাড়িয়ে আনছে না।

শেষ পর্যন্ত কালীয়কে দমন করে কৃষ্ণ ফিরে এলেন। নন্দ ও যশোদা তাঁকে বিপদ-মুক্ত দেখে উৎফুল্ল হলেন।

বাংলার বৈষ্ণব কবিরা কালীয়-দমনকে কেন্দ্র করে এমন বাৎসল্যের পদ রচনা করেন নি। তবে, প্রসঙ্গটি বাঙালী বৈষ্ণব কবিদেরও উৎসাহিত করেছে। কৃষ্ণ কালীয়দমন করতে জলে নেমেছেন, এই ভয়াবহ সংবাদে সমস্ত ব্রজভূমি শোকাকুল :

ব্রজবাসীগণ কান্দে ধেনু বৎস শিশু।
কোকিল ময়ূর কান্দে যত মৃগ পশু ॥[১৪৫]

আর, যশোদা এই ভয়ংকর সংবাদে বারবার মূর্ছিত হয়ে পড়ছেন। "যশোদা রোহিণী দেহ ধরণে না যায়।"[১৪৬] বলরামদাস যশোদার যন্ত্রণার সঙ্গে পিতা নন্দের বেদনার কথাও ভোলেননি। পুত্রের শোচনীয় ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে স্বয়ং মৃত্যু বরণ করতেও ইচ্ছুক। তাই, "ধাইয়া চলয়ে বিষ করিতে ভক্ষণ ॥"[১৪৭]

এখানে ব্রজবাসীদের হৃদয়হীন আচরণের কোনো অভিযোগ নেই।

শিশু কৃষ্ণের চাঁদের জন্য বায়না হিন্দী ও বাংলা উভয় ভাষার কবিরাই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু বাঙালী বৈষ্ণব কবি মূলতঃ রাধাকৃষ্ণের যুগল-মূর্তির উপাসক। তাই, শেষ পর্যন্ত রাধাকে এনে ক্রন্দনরত শিশু-কৃষ্ণকে শান্ত করতে হয়েছে। কিন্তু হিন্দী ভাষার বৈষ্ণব কবিতায় যশোদাই স্বয়ং তাঁর অপত্য স্নেহে নানা ভাবে বুঝিয়ে কৃষ্ণের কান্না থামিয়েছেন।

কৃষ্ণের একটা কিছু নিয়ে বায়না করা চাই। হঠাৎ একদিন দিনের বেলাতেই চাঁদ চেয়ে বসলেন :

মা মোরে আনি দেহ শশী ॥[১৪৮]

যশোদা শুনে বলেন,—

রাণী কহে বাণী, শুন নীলমণি,
আমি চাঁদ পাব কোথা ॥[১৪৯] —শেখর রায়

কিন্তু কৃষ্ণ কিছুতেই তাঁর বায়না ছাড়েন না,—

এ বোল বলিয়া, ধূলাতে পড়িয়া,
লোটায় যাদব রায়।[১৫০] —শেখর রায়

কৃষ্ণের ক্রন্দনে অন্যান্য ব্রজ-নারীরা স্নেহে বেদনা বোধ করেন। তাঁরা যশোদাকে এসে বলেন :

কেন গো কান্দিছে নীলমণি।
আমরা পরের নারী, ক্রন্দন সহিতে নারি
কোন প্রাণে সহিছ গো তুমি ॥[১৫১] —যদুনাথ

নিরুপায় যশোদা বলেন,—

অবোধ শিশুর মতি, দিনে চাঁদ পাব কতি,
এ বড় বিষম হইল দায়।[১৫২] —যদুনাথ

কিন্তু শিশু-কৃষ্ণ কোনো কথাই বোঝেন না—

চাঁদ বলি ভূমে গড়ি যায় ॥[১৫৩] —যদুনাথ

যশোদা কৃষ্ণকে শান্ত করার জন্যে কত বোঝাচ্ছেন। দিনের শেষে রাত্রি হবে, চাঁদ যখন ধীরে ধীরে উঠে আসবে তখন তাঁকে পথেই ফাঁদ পেতে যশোদা ধরে আনবেন। কৃষ্ণের ক্রন্দন যশোদাকে কষ্ট দিচ্ছে—

চাঁদ মোর চাঁদের লাগিয়া কাঁদে।[১৫৪] —ঐ

অকস্মাৎ সেখানে রাধা এসে উপস্থিত হন। রাধার অপূর্ব সুন্দর মুখের দিকে চেয়ে যশোদা রাধাকে মুখ ঢেকে রাখতে বলেন, কারণ—

তোমার মুখের শ্রেণী, শরতের চন্দ্র জিনি,
তাহা দেখি যাদুয়া মাঙিবে ॥[১৫৫] —ঐ

আশ্চর্যের বিষয়, রাধাকে দেখে কৃষ্ণের এত আবদার ও কান্না সব থেমে গেছে। তিনি বিস্ময়মুগ্ধ হয়ে রাধার দিকে চেয়ে আছেন। যশোদা পুত্রের কান্না থামতে দেখে রাধাকে অনুরোধ করেন কৃষ্ণকে নিজের কাছে ডেকে নিতে।

রাণী কহে রাধিকায় গোপাল তোমা পানে চায়,
ডাক দিয়া লহ নিজ কাছে।[১৫৬] —ঐ

কৃষ্ণ চাঁদের জন্যে বায়না ভুলেছেন। কান্না ভুলে রাধা ও অন্যান্য গোপ বালক-বালিকাদের সংগে খেলছেন দেখে, যশোদা প্রসন্ন মনে নিজের কাজে গেলেন।

শিশু চৈতন্যেরও চাঁদের জন্যে বায়না ছিল। যশোদার মতো পুত্র স্নেহাতুরা শচীমাকেও নিমাইকে ভোলাতে দেখি,—

পূর্ণিমা রজনী চাঁদ গগনে উদয়।
চাঁদ হেরি গোরাচাঁদের হরিষ হৃদয় ॥
চাঁদ দেমা বলি শিশু কাঁদে উভরায়।
হাত তুলি শচী ডাকে আয় চাঁদ আয় ॥
না আসে নিঠুর চাঁদ নিমাই ব্যাকুল।
কাঁদিয়া ধূলায় পড়ে হাতে ছিঁড়ে চুল ॥[১৫৭]

শেষ পর্যন্ত বাসু ঘোষ নিমাই যে ভাবী চৈতন্য সেই আভাস দিয়ে পদটি শেষ করেছেন :

রাধাকৃষ্ণ চিত্র এক মিশ্রগৃহে ছিল।
পুত্র শান্তাইতে শচী তাহা হাতে দিল ॥
চিত্র পাঞা গোরাচাঁদের মনে বড় সুখ।
বাসু কহে পটে পহু হের নিজ মুখ ॥[১৫৮]

হিন্দী বৈষ্ণব কবিরা কৃষ্ণের চাঁদ চাওয়া ও যশোদার তাঁকে নানাভাবে ভোলানোর বিষয় নিয়ে বহু পদ রচনা করেছেন। সুরদাস এঁদের মধ্যে সর্বপ্রধান। তিনি এই প্রসঙ্গটি অবলম্বন করে যশোদার মাতৃ-হৃদয়কে উদ্ভাসিত করে তুলেছেন।

একদিন যশোদা আঙিনায় কৃষ্ণকে চাঁদ দেখাচ্ছেন,— "ঠাঢ়ী অজির জসোদা অপনৈ, হরিহিঁ লিএ চন্দা দিখরাবত।"[১৫৯] আর তারপরই কৃষ্ণ বায়না ধরলেন, তাঁর চাঁদ চাই। যশোদা কৃষ্ণের কান্না দেখে নিজেকেই দোষারোপ করছেন,— "মৈঁ হী ভুলি চন্দ

দিখরায়ো"[১৬০]— আমিই ভুলে ওকে চাঁদ দেখিয়েছি। প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণের কান্না যশোদা কোন মতেই সহ্য করতে পারছেন না। তাই নানা কথা বলে ভোলাতে চাইছেন। কিন্তু কৃষ্ণ কিছুতেই ভুলছেন না। এবার নতুন আবদার— "তাহি কহত মৈঁ খৈহোঁ।"[১৬১] —কৃষ্ণ বলছেন, আমি চাঁদ খাব। তখন অনন্যোপায় যশোদা পাত্র ভরে জল এনে বললেন— "আউ চন্দ তোহি লাল বুলাবৈ।"[১৬২] —বাছা এসো চাঁদ তোমাকে ডাকছে। তাছাড়া তিনি কৃষ্ণকে বোঝাচ্ছেন, দেখ, চাঁদ খাবার জিনিস নয়, চাঁদ তো "খিলৌনা সবকৌ।" অর্থাৎ, সবার খেলনা। কৃষ্ণ জলের মধ্যে আঙ্গুল ডুবিয়ে চাঁদ ধরার চেষ্টা করছেন, কিন্তু কিছুক্ষণ পর হতাশ হয়ে আবার কান্না জুড়েছেন :

মৈয়া, মৈঁ তৌ চন্দ-খিলৌনা লৈহোঁ।
জৈহোঁ লোটি ধরনি পর অবহীঁ, তেরী গোদন ঐ হোঁ॥
সুরভী কৌ পয় পান ন করি হোঁ বেণী সিরন গুহৈ হোঁ।
হ্বৈ হোঁ পূত নন্দ বাবা কৌ, তেরো সুত ন কহৈ হোঁ॥[১৬৩]

অর্থাৎ, আমি চাঁদ-খেলনা নেব। যদি না দাও, আমি এখনই মাটিতে গড়াগড়ি যাব। তোমার কোলে যাব না, সুরভির দুধ খাব না, বেণী বাঁধব না এবং নন্দ বাবার ছেলে হব, তোমার ছেলে হব না।

শিশু-কৃষ্ণ মাকে কিভাবে সবদিক থেকে জব্দ করা যায় তা জানেন। এমনকি, শেষ অস্ত্রটি তিনি মায়ের উপর প্রয়োগ করেছেন, তিনি নন্দের পুত্র হবেন, মা যশোদার নয়। তখন যশোদা কৃষ্ণকে শান্ত করার জন্য একটি নতুন উপায় উদ্ভব করলেন :

আগৈঁ আউ, বাত সুনি মেরী, বলদেবহিঁ ন জনৈ হোঁ।
হঁসি সমুঝাবতি, কহতি জসোমতি, নঈ দুলহিয়া দৈহোঁ॥
তেরী সোঁ, মেরী সুনি মৈয়া, অবহিঁ বিয়াহন জৈ হোঁ।[১৬৪]

—কাছে এসো, আমার কথা শোন, বলদেবকে বলো না। হেসে যশোমতি বলছেন, তোমার জন্যে নতুন বৌ আনব। কৃষ্ণ একথা শুনে বললেন, তোমার শপথ, এখনই আমি বিয়ে করতে যাব। অপূর্ব বাস্তবভিত্তিক ছবিটি। শিশুমাত্রেই খুশি হয় যখন বোঝে শুধুমাত্র তাকেই দেওয়া হবে একটি নতুন বস্তু, অন্যকে নয়। স্বভাবতঃই কৃষ্ণও খুশি হন যখন শোনেন তাঁর বিয়ে হবে এবং বলদেবকে সেকথা বলা হবে না। তিনি তখনই বিয়ে করতে যেতে চান। যশোদার তখন নতুন সমস্যা। তিনি আবার পাত্রে জল নিয়ে কৃষ্ণের কাছে এনে রাখলেন। বললেন "লৈ লৈ মোহন চন্দ লৈ।" যে চাঁদের জন্যে তুমি এত কাঁদছ তাকে আকাশে একটি পাখি পাঠিয়ে ধরে এনেছি : গগন-মণ্ডল তেঁ গহি আন্যো হৈ, পঞ্ছী এক পঠৈ।"[১৬৫] বাংলার বৈষ্ণব কবি কিন্তু চাঁদ ধরার জন্যে ফাঁদের কথা চিন্তা করেছেন :

আকাশের পথে পাতিয়া ফাঁদ।
ধরিব আমরা গগন চাঁদ॥[১৬৬] —যদুনাথ

ফাঁদ পেতে চাঁদ ধরার মধ্যে বৈশিষ্ট্য এই যে চাঁদকে সজীব পদার্থ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাছাড়া "চাঁদ মোর চাঁদের লাগিয়া কাঁদে", এই উক্তির মধ্যে দেখানো হয়েছে যে চাঁদ ও কৃষ্ণের রূপ, গুণ ও মাধুর্য সমপর্যায়ের।

কিন্তু হিন্দী বৈষ্ণব পদে সুরদাস পাখি দিয়েই চাঁদকে ধরে এনেছেন। যশোদা কৃষ্ণকে বলছেন হাত দিয়ে তুমি এবার চাঁদকে ধর। কৃষ্ণ কিন্তু কিছুতেই চাঁদকে ধরতে পারছেন না তখন যশোদা তাঁকে বোঝাচ্ছেন, "তুব মুখ দেখি ডরত সসি ভারী।"[১৬৭] তোমার মুখ দেখে চাঁদ খুব ভয় পেয়েছে। তাই তুমি জলে হাত দিলেই সে ভয়ে পাতালে প্রবেশ করছে। চাঁদ তাঁকে দেখে ভয় পাচ্ছে, যশোদার মুখে একথা শুনে কৃষ্ণ প্রসন্ন হলেন এবং শান্ত হলেন।

বাংলা বৈষ্ণব পদে গোচরণ নিয়ে বহু উৎকৃষ্ট পদ রচিত হয়েছে। বাঙালী বৈষ্ণব কবি, যিনি বাৎসল্যরসের একটি-দুটি পদও রচনা করেছেন, তিনিও গোচারণের পদ নিশ্চয়ই লিখেছেন। আর সেই জন্যই বৈষ্ণব পদাবলীতে বাৎসল্যের পদে গোষ্ঠের পদই সর্বাধিক। কিন্তু গো-দোহনের পদ একটিও নেই। হিন্দী কবি গো-দোহন সম্পর্কে অনেক সুন্দর পদ রচনা করেছেন। কৃষ্ণ নন্দের কাছে আবদার করছেন— "মৈঁ দুহিহোঁ মোহিঁ দুহন সিখবহু।"[১৬৮] আমি দুধ দুইব, আমাকে দুধ দুইতে শিখিয়ে দাও। নন্দ পুত্রকে হতাশ করতে চান না, যদিও তিনি জানেন একাজ শিশুর পক্ষে অসম্ভব। আর কৃষ্ণ নন্দের অনুমতি পেয়ে ছুটে আসেন যশোদার কাছে :

> তনক কনক কী দোহনী দৈ দৈ রী মৈয়া।
> তাত দুহন সিখবন কহ্যো মোহি ধৌরী গৈয়াঁ॥[১৬৯]

—মা, ছোট সোনার দোহন পাত্রটি দাও ; বাবা আজ আমাকে ধবলী গোরু দুইতে শেখাবেন বলেছেন। তারপর দুধের পাত্রটি নিয়ে দুধ দুইতে বসলেন, কিন্তু ঠিকমতো দুইতে পারছেন না, দুধের ধারা এদিক ওদিক পাত্রের বাইরে পড়ে যাচ্ছে।

কৃষ্ণের অক্ষমতা দেখে ব্রজরাজ সস্নেহে হাসছেন,

> ধার অটপটী দেখি কেঁ ব্রজপতি হঁসি দীনোঁ॥[১৭০]

আর, যশোদা কৃষ্ণের কাণ্ড দেখে হাসতে হাসতে তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেন—

> আট বরষকে কুঁবর কন্হৈয়া, ইতনী বুদ্ধি কহাঁ তৈঁ পায়ো।

—আট বছরের বাছা কানাই, এত বুদ্ধি তুমি কোথা থেকে পেয়েছ?[১৭১]

কৃষ্ণ গোচারণে যেতে চাইছেন, যশোদা প্রথম একটু আপত্তি করছেন। কিন্তু বলভদ্র যশোদাকে আশ্বাস দেওয়াতে তিনি কৃষ্ণকে গোচারণে যেতে দিলেন। তবু কৃষ্ণের গোষ্ঠযাত্রা যশোদার স্বাভাবিক দুশ্চিন্তার কারণ হল। সন্তান প্রথম যখন মার সান্নিধ্য থেকে দূরে যায়, মা'র পক্ষে চিন্তা হওয়া তো স্বাভাবিক। কিন্তু হিন্দী পদে যশোদা কৃষ্ণকে গোষ্ঠে পাঠাতে উন্মাদিনী হন না, ঘনঘন মূর্ছিতও হয়ে পড়েন না। কৃষ্ণের গোষ্ঠ যাত্রায় তাঁর চিন্তার সংগে আনন্দ ও গর্ববোধ রয়েছে। কেননা, কৃষ্ণ কুলধর্ম পালন করবার উদ্দেশ্যেই গোষ্ঠে যাচ্ছেন। এটা বংশের কর্তব্য পালনের প্রথম পদক্ষেপ।

কিন্তু বাংলার বৈষ্ণব কবি যশোদাকে সৃষ্টি করেছেন সম্পূর্ণ 'বাঙালী মা' করে।

এক মুহূর্তের জন্যে তিনি কৃষ্ণকে কাছ-ছাড়া করতে পারেন না। তাই কৃষ্ণকে গোষ্ঠে যেতে দিতে যশোদা ব্যাকুল হন :

বলরাম, তুমি মোর গোপাল লৈয়া যাইছ

...   .

এ হেন দুধের বাছা   বনেতে বিদায় দিয়া

কেমনে ধরিবে প্রাণ মায়।[১৭২]

তাই কৃষ্ণকে গোষ্ঠে যেতে দিতে যশোদার দু চোখে ধারা বইছে, কখনও বা তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়ছেন। কখনো তিনি স্পষ্টই পুত্রকে গোচারণে পাঠাতে অস্বীকার করেন :

রাণী বলে কি বলিলি   না পাঠাইব বনমালী

তোমরা সবাই যাও বনে।

বড় হইলে লালনে   লইয়ে যেও কাননে

পাঠাইব তোমা সভা সনে॥[১৭৩]

মা'র কাছে সন্তান চিরদিনই শিশুমাত্র, 'দুধের বাছা।' এমন ছেলেকে কি গোষ্ঠে পাঠানো যায় ?

বসন ধরিয়া হাতে   ফিরে গোপাল সাথে সাথে

দণ্ডে দণ্ডে দশবার খায়।[১৭৪]

তাছাড়া যশোদার তো কৃষ্ণকে নিয়ে আরো অনেক ভয়।

"দারুণ কংসের চর তারা ফিরে নিরন্তর"।[১৭৫]

তাই, কৃষ্ণের মত দামাল ছেলেকে গোষ্ঠে পাঠাতে তাঁর এত ভয়। তিনি স্পষ্টই কৃষ্ণের সখাদের বলেছেন,

দামালিয়া যাদু মোর   না মানে আপন পর

ভালমন্দ নাহিক গেয়ান।[১৭৬]

কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং গোষ্ঠে যাবার জন্যে ব্যস্ত। মায়ের কাছে আবদার করে বলেন—

গোঠে আমি যাব মাগো গোঠে আমি যাব।

শ্রীদাম সুদাম সঙ্গে বাছুরি চরাব।[১৭৭]

কাজেই যশোদা কৃষ্ণকে গোচারণে পাঠাবার জন্যে সাজাতে বসেন। কিন্তু কিছুতেই তিনি কৃষ্ণকে গোষ্ঠ-সজ্জায় সজ্জিত করতে পারছেন না।

বান্ধিতে বিনোদ চূড়া নিরখিতে কেশ।

আঁখিযুগ ঝর ঝর না হইল বেশ॥[১৭৮] —ঘনরামদাস

শেষ পর্যন্ত যশোদা মনস্থির করে কৃষ্ণকে সাজিয়ে দিলেন :

জানিল গোঠরে আজি যাবে নীলমণি।

মনের সাধে করে বেশ যশোদা রোহিনী॥

কপালে রচিঞা দিল চন্দনের রেখা।

চূড়াটি বান্ধিঞা দিল ময়ূরের পাখা॥[১৭৯]

যশোদা কৃষ্ণকে গোষ্ঠ সজ্জায় সজ্জিত করেন, কিন্তু হাসিমুখে পুত্রকে যেতে দিতে পারেন না—

নারিলুঁ বিদায় দিতে কহে ঘন ঘন ॥
স্তন-ক্ষীরে ভিজিল রাণীর সব বাস।[180] —ঘনরামদাস

অবশেষে যশোদা কৃষ্ণের দায়িত্বভার বলরামকে সমর্পণ করলেন।

হের আরে বলরাম হাত দে মায়ের মাথে।
দেহ রাখিয়া প্রাণ দিলাম তোমার হাতে ॥[181]

বারবার কৃষ্ণের প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্যে অনুরোধ করে বললেন—

এই নিবেদন তোরে, না যাবে কালিন্দী তীরে
সাবধান মোর নীলমণি ॥[182]

তিনি কৃষ্ণের হাত নিজের মাথায় রেখে শপথ করিয়ে নিলেন। এবং সাবধান করে বললেন—

আমাব শপতি লাগে না ধাইও ধেনুর আগে,
পবাণের পবাণ নীলমণি—
নিকটে রাখিহ ধেনু, পুরিহ মোহন বেনু,
ঘরে বসি আমি যেন শুনি।[183] —যাদবেন্দ্র

কিন্তু এতেও যশোদা শান্তি পান না। তিনি কৃষ্ণের সমস্ত দেহে রক্ষামন্ত্র পড়ে দেন—

অক্ষয়-বিজয়-তনু হয় যেন রাম কানু
এমতি ঝাড়িয়া দেহ গায়।[184]

যশোদা পুত্রের সঙ্গে নানা খাদ্য দিয়ে দেন। এবং বলরামকে বারংবার বলে দেন—

কানুর ধরাতে বাঁধি।
ক্ষীর ছেনা ননী চাঁছি ॥
যাদুরে করিয়া কোলে।
আপনি খাইবে বলে ॥
দুখিনী অভাগী আমি।
কেবল ভরসা তুমি ॥[185]

গোচারণে পাঠিয়ে মা যশোদার সারাদিন দুশ্চিন্তায় কাটে। সন্ধ্যায় সেই চিন্তার অবসান হয়। দূর থেকে কৃষ্ণের বাঁশী শুনে তিনি ছুটে যান—

ধাইয়া আইল নন্দরাণী কেশ নাহি ঢাকে।
বাছার মুখের বেণু তোরে কেন ডাকে ॥[186] —ঘনরামদাস

বলরামদাস শুধু বাৎসল্যের নয়, প্রতিবাৎসল্যের ছবিও নিপুণ ভাবে এঁকেছেন। সমস্ত দিন বন্ধুদের সঙ্গে নতুন অভিজ্ঞতার আনন্দে কেটে গিয়েছে, কিন্তু সন্ধ্যা হবার সঙ্গে সঙ্গে শিশু মায়ের কোলে আশ্রয় পেতে চায়। এই অনুভূতিটি কবি প্রকাশ করেছেন :

আজি মাঠে আমাদের বিলম্ব দেখিয়া।
হেন বুঝি কান্দে মা পথ পানে চাঞা॥
বেলি অবসান হৈল চল যাই ঘরে।
মায়ে না দেখিয়া প্রাণ কেমন যেন করে॥[১৮৭]

কৃষ্ণ যখন সখাদের কাছে বলেন, "মায়ে না দেখিয়া প্রাণ কেমন যেন করে" তখন মায়ের জন্যে কৃষ্ণের অন্তরের তীব্র ব্যাকুলতাই প্রকাশিত হয়।

গোচারণের পর গৃহে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। যশোদা এতক্ষণ ব্যগ্র হয়ে কৃষ্ণের ফেরার পথ চেয়ে ছিলেন। তাই কৃষ্ণ ফিরে আসতেই তিনি বলেন—

নন্দদুলাল বাছা যশোদা দুলাল।
এতক্ষণ মাঠে থাকে কাহার ছাওয়াল॥[১৮৮]

যশোদা পুত্রকে কোলে বসিয়ে বলেন, নবতৃণাঙ্কুর রাঙা চরণে বিঁধে না জানি কত কষ্ট পেয়েছেন পুত্র। সমস্ত দিনের রৌদ্রতাপে তাঁর মুখ মলিন হয়েছে, তবু দিনের শেষে পুত্রকে কোলে পেয়ে মা'র চিন্তা দূর হয়, তিনি এখন আনন্দিত :

সন্ধ্যা সময় গৃহে আওল যদুপতি
যশোমতি আনন্দ চীত।[১৮৯]

যশোদা ফিরতে দেরী হবার কারণ জানতে চান।

এতক্ষণ কোথা হিয়া দিয়া ব্যথা
গেছিলে কোন বা বনে।
এখানে এ ধড় গৃহ মাঝে ছিল
পরাণ তোমার সনে॥
আঁখির তারাটি গেছিল খসিয়া
এবে আঁখি আসি বসি।[১৯০]

যখন জানতে পারলেন হারিয়ে যাওয়া গোরু খোঁজার জন্যে কৃষ্ণ আজ সমস্ত দিন বনে বনে ঘুরে শ্রান্ত হয়েছেন তখন যশোদা পুত্রের কষ্টের কথা চিন্তা করে স্তব্ধ হয়ে যান।

কাষ্ঠের পুত্তলি রয়॥[১৯১]

নন্দের উপর যশোদা ক্রুদ্ধ হন, কারণ তিনিই কৃষ্ণকে গোচারণে পাঠিয়েছেন। আর কখনো কৃষ্ণকে গোচারণে যেতে দেবেন না যশোদা।

তোমারে লইয়া আন দেশে যাব
না রব নন্দের ঘরে।[১৯২]

তিনি নন্দকে গিয়ে বলেন—

চোরা ধেনু সনে বহু দুখ মেনে
পাইল যাদব মোর।
শুনিতে শুনিতে পরাণ বিদরে
দুখের নাহিক ওর॥[১৯৩]

সন্তান-অন্ত প্রাণ যশোদা কৃষ্ণের কষ্টের কথা শুনে নিজেই কষ্ট পেতে থাকেন। পৃথিবীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সব কিছুই তুচ্ছ; সন্তানের কল্যাণ কামনায় যশোদা নন্দের ঘর পরিত্যাগ করতেও প্রস্তুত।। গোষ্ঠের পদাবলীর মধ্যে বাঙালীর সন্তানবৎসল মাতৃ-হৃদয়ের পূর্ণতর পরিচয় পাওয়া যায়।

এরপরই আমরা দেখি পরিশ্রান্ত পুত্রদের সামনে নানা খাদ্য সাজিয়ে দিয়েছেন যশোদা। ক্ষুধাক্লিষ্ট সন্তানের মুখে খাদ্য দেওয়ার মধ্যে মাতৃহৃদয়ের একটি বিশেষ আনন্দ আছে:

ক্ষীর ননী ছেনা সর, আনিয়া সে ঘরে ঘর,
আগে দেই রামের বদনে।
পাছে কানাইয়ের মুখে দেয় রাণী মহাসুখে,[১৯৪]

খেতে দিতে দিতে যশোদা বলেন—

আহা মরি মরি পরাণ-পুথলি
বাছনি কালিয়া সোনা।
কত না পেয়েছ ক্ষুধায় পীড়িত
বনে যেতে করি মানা॥[১৯৫]

কৃষ্ণ খেয়ে দেয়ে তৃপ্ত হয়েছেন দেখে যশোদার অন্তরও শান্ত হয়। তিনি—

চিবাইতে দিল কপূর্র তাম্বুল
স্নেহে সে যশোদা মা।
ধরিয়া চরণ জাতিয়া দিছেন
শীতল পাখার বা॥[১৯৬]

হিন্দী বৈষ্ণব কবিতায় গোষ্ঠের পদে কৃষ্ণের জন্যে যশোদার উদ্বেগ থাকলেও বাংলা পদে তিনি অধিকতর ব্যাকুল। হিন্দী পদে যশোদার মনে আনন্দ ও গর্বের ভাবটি বড় হয়ে উঠেছে। কারণ পুত্রের জীবনে প্রবেশের এই প্রথম পদক্ষেপ।

গাই চরাবণ কো ছিনু আয়ো।
ফুলী ফিরতি জসোদা অংগ অংগ লালন উবটি ন্হবায়ো॥
ভূষণ বসন বিবিধ পহিরাত্র কজ্জর তিলকু বনায়ো।
বিপ্র বুলাই বেদ-ধুনি কীনী মোতিনি চৌক পুরায়ো॥[১৯৭]

—কৃষ্ণের গোচারণে যাবার দিন এসেছে। যশোদা গর্বে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। উবটন দিয়ে ছেলেকে স্নান করাচ্ছেন, নানা বসন-ভূষণ পরাচ্ছেন। চোখে কাজল, কপালে তিলক দিচ্ছেন। ব্রাহ্মণ-ডেকে বেদমন্ত্র পাঠ করাচ্ছেন।

পরমানন্দদাসের উপরোদ্ধৃত পদ থেকে বাংলা পদকর্তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করা যায়। বাঙালী কবির যশোদার মনে সর্বদা একটা হারাই-হারাই ভাব রয়েছে, এবং তাঁরা কৃষ্ণের গোচারণে যাবার পটভূমিকায় যশোদার সকরুণ মূর্তি আমাদের কাছে তুলে ধরছেন। হিন্দী পদে যশোদাকে সেই তুলনায় অনেকটা কঠিন মনে হয়।

তবে, উভয় ভাষার পদে কোথাও কোথাও মিলও পাওয়া যায়। কৃষ্ণ যশোদাকে বলছেন—

মৈয়া হোঁ গাই চরাৱন জৈহোঁ।
তু কহি মহর নন্দ বাবা সোঁ, বড়ো ভয়ো ন ডরৈ হোঁ॥[১৯৮]

—মা আমি গোরু চরাতে যাব ; তুমি নন্দবাবাকে বলবে, এখন আমি বড় হয়েছি, ভয় পাব না।

সকালবেলা গোপ-বালকদের হৈ-হৈ শুনেই কৃষ্ণ ছুটে চললেন তাদের সঙ্গে। কিন্তু তিনি ফিরে ফিরে দেখছেন, যশোদা পেছনে আসছেন কিনা। কারণ, কৃষ্ণের মনে ভয়, যশোদা তাঁকে গোচারণে যেতে দেবেন না।

যশোদা ছুটে এসে কৃষ্ণের দু'হাত ধরে ফেললেন। কিন্তু বলরাম তাঁকে আশ্বাস দেওয়ায় তিনি কৃষ্ণকে তাঁদের সঙ্গে যেতে দিলেন ; বলরামকে বললেন,— "বল সোঁ কহৈ জসুমতি দেখে রহিয়ো প্যারে।"[১৯৯] যশোদা বলরামকে বলছেন, বাছা ওর প্রতি লক্ষ্য রেখ।

এই পদটির সঙ্গে বাংলা গোষ্ঠের আলোচনা করলেই, উভয় ভাষার পদের মধ্যে পার্থক্য ও সাদৃশ্য স্পষ্ট হবে। বাংলা পদে আছে, গোষ্ঠযাত্রার প্রাক্কালে যশোদা বলরামকে অনুনয় করে বলছেন—

সবার অগ্রজ তুমি, তোরে কি শিখাব আমি,
বাপ মোর যাইয়ে নিছনি॥[২০০]

অন্য একটি পদে আছে, "নয়নে গোচরে বাছায় সদাই রাখিবে॥"[২০১] বাঙালী কবি যখন বলেন— "দেহ রাখিয়া প্রাণ দিলাম তোমার হাতে" তখন পুত্রের জন্যে মায়ের ভাবনা এবং বিচ্ছেদ বেদনা বড় বেশি তীব্র হয়ে ফুটে ওঠে। হিন্দী পদে যশোদার ব্যাকুলতা এত বেশি নয়।

গোষ্ঠে যাবার সময় যশোদা কৃষ্ণের সঙ্গে নানা খাদ্য দিয়ে দিয়েছেন এবং কৃষ্ণের অভ্যাস সম্বন্ধেও সতর্ক করে দিয়ে বলরামকে অনুরোধ করেছেন তিনি নিজে যেন কৃষ্ণকে যত্ন করে খাওয়ান :

দণ্ডে দশ বার খায় যাহা দেখে তাহা চায়
ছেনা দধি এ ক্ষীর নবনী।
রাখিও আপন কাছে ভুখ জানি লাগে পাছে
আমার সোনার যাদুমণি॥[২০২]

হিন্দী পদাবলীতে যশোদা সাধারণত কৃষ্ণের সঙ্গে কোনো খাবার দেন না। দুপুরের খাবার কোনো গোপিনীকে দিয়ে গোচারণ ভূমিতে পাঠানো হয়। হিন্দীতে একে বলা হয় 'ছাক'। যশোদা গোপিনীকে বলছেন, "ছাক লৈ জাহরী মেরী মাঈ জঁহা রী মিলৈ মেরো কুঁৱর কন্হাঈ।"[২০৩]

—সখী, দুপুরের খাবার নিয়ে যাও ; আমার আদরের কানাইকে যেখানে পাবে খাইয়ে এসো। আর কত বিচিত্র সুস্বাদু খাদ্যই না তিনি দিয়েছেন তাঁর আদরের

কানাইয়ের জন্যে, মিষ্টি, দই, ক্ষীর, পাঁপর ইত্যাদি।

কৃষ্ণ গোচারণ থেকে ফিরে আসছেন দেখে যশোদা ছুটে গেলেন—

জসুমতি দৌরি লিয়ে হরি কনিয়াঁ।

আজু গয়ো মেরো গাই চরাবন, হোঁ বলি জাউঁ নিছনিয়া।[২০৪]

—যশোদা দৌড়ে গিয়ে কৃষ্ণকে কোলে তুলে নিলেন। আজ আমার বাছা গোরু চরাতে গিয়েছিল, আমি বলিহারি যাই।

আবার কৃষ্ণের ফিরতে দেরী হলে যশোদা দুশ্চিন্তায় থাকেন—

ললারে! আজু অবেরো আয়ো?

বড়ীয় বার রী মারগ জোবতি, তৈঁ কিত গহরু লগায়ো॥

অব কহুঁ বাহরি জাদ ন দৈহোঁ মেরো হিয়ো জুড়ায়ো।

ঘর হী বোহোত খিলৌনা তেরে' কাহেকোঁ বাহীর ধায়ো॥[২০৫]

—বাছা আমার, আজ বড়ো দেরী করে এসেছ! কখন থেকে আমি তোমার পথ চেয়ে আছি! আর তোমাকে আমি বাইরে যেতে দেব না। এতক্ষণে তোমায় দেখে আমার বুক জুড়াল। ঘরে তো অনেক খেলনা, বাইরে কি এমন আছে!

এই পদটিতে হিন্দী কবির যশোদা ও বাঙালী কবির যশোদা বড় কাছাকাছি এসেছেন। বিলম্বে বাড়ী ফেরার জন্য বলরাম দাসের যশোদা পুত্রকে অনুযোগ দিয়ে বলছেন—

নন্দদুলাল বাছা যশোদা দুলাল।

এতক্ষণ মাঠে থাকে কাহার ছাওয়াল॥[২০৬]

হিন্দী পদে যশোদা পুত্রের জন্যে দুশ্চিন্তা করলেও তাতে খুশির একটি আমেজ আছে। তাই তিনি সবাইকে গর্বের সঙ্গে বলছেন— কৃষ্ণ তার জন্য বনের ফল নিয়ে এসেছ।[২০৭] যশোদা পুত্রের এই কৃতিত্বে মুগ্ধ।

এরপরই যশোদা কৃষ্ণকে আদর করে খাওয়াতে বসিয়েছেন, এবং কৃষ্ণকে বলছেন, গরম গরম মাখন রুটি খেয়ে নাও।[২০৮] ক্লান্তিতে কৃষ্ণ তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়েছেন; তা দেখে যশোদা বেদনা বোধ করছেন— "বহুতৈ দুখ হরি সোই গয়োরী" অর্থাৎ সমস্ত দিন অনেক কষ্ট পেয়ে হরি ঘুমিয়ে পড়েছে।

বাংলা বৈষ্ণব কবিতায় যশোদার মাতৃস্নেহের স্বরূপকে প্রকাশ করার জন্যে কবিরা কিছু কিছু নতুন বিষয়ও গ্রহণ করেছেন।

কৃষ্ণ রাধার সঙ্গে প্রমোদে মত্ত হয়ে রাত্রি যাপন করেছেন। প্রভাতে যশোদা এসেছেন নিদ্রাকাতর কৃষ্ণের ঘুম ভাঙ্গাতে। রাত্রির অন্ধকারে রাধাকৃষ্ণের পরিধেয় অদলবদল হয়ে গেছে। যশোদার মাতৃ-হৃদয় কিন্তু পুত্রের বিলাস-চিহ্নিত দেহের অন্য অর্থ করে। তিনি মা, তাঁর সব সময়ই ভয় পুত্রের বুঝি কোনো অমঙ্গল ঘটল। কিংবা কারো কু-দৃষ্টি পড়ল।

রামের বসন পরিলা কখন

কে নিলে বসন তোর।

রাতা উতপল নয়ন-যুগল
কি লাগি দেখিয়ে জোর ॥
নীল-নলিন আতপে মলিন
কেন বা এমন দেহ।
উনমত হৈয়া বুলহ ধাইয়া
কুদিঠি দিলে বা কেহ ॥
হিয়ার উপর কণ্টকে আঁচড়
গিয়াছিলা কোন বনে।
আমার কপালে না জানি কি ফলে
পরানে মরিব মেনে ॥[২০৯]

এরপরই যশোদা দেবতার কাছে কৃষ্ণের কুশল কামনা করেছেন। বাংলার সহজ সরল মাতৃমূর্তি যশোদার মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে। তাছাড়া স্নেহে এমন অন্ধ হওয়া স্নেহকোমল নারীর পক্ষেই সম্ভব।

কৃষ্ণ বিলাসকুঞ্জে তাঁর বাঁশী (সোনার) ফেলে এসেছেন। যশোদা কৃষ্ণের হাতে বাঁশী না দেখে বিশেষ চিন্তিত। সোনা হারানো অমঙ্গলের চিহ্ন। যশোদাও এই সংস্কারে বিশ্বাসী। চিন্তান্বিত হয়ে যশোদা রোহিণীকে ডেকে বলছেন—

মায়ের কপালে লেখা হেদে গো রামের মা
না জানি কি আছয়ে কপালে ॥
সোনা যে হারাতে নাই কি করিলি কানাই
কান্দিয়া কান্দিয়া রাণী বলে।
হায় আমি কি করিব দেশান্তরি হয়ে যাব
তুমি বাস ঘুচালে গোকুলে ॥[২১০]

রাধার জন্যে পুত্রের আগ্রহ যশোদা বুঝতে পারেন। কিন্তু রাধা পরস্ত্রী; যশোদা নিরুপায়, শুধু পুত্রের যন্ত্রণার সঙ্গে একাত্ম হওয়া ভিন্ন অন্য কোনো উপায় নেই। অথচ তাঁর মনেও আশা ছিল রাধার মতো পুত্রবধূ হবে। পুত্রের আনন্দে তিনিও আনন্দিত হবেন। তাই কৃষ্ণ গোচারণে গেলে পুত্র-বিরহে কাতর যশোদা রাধাকে দেখতে পেয়ে তাঁকে কোলে তুলে নেন, পুত্রের প্রিয়জনকে কোলে তুলে পুত্রের বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা প্রশমিত করতে চান।

কানুরে পাঠাইয়া বনে যশোদা বিষাদ-মনে
আসিয়া রাইরে করে কোরে।
দুখে আউলাইছে গা মুখে না নিঃসরে রা
বসন ভিজিয়া গেল লোরে ॥[২১১]

যশোদার অন্তরের অব্যক্ত আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ হয়ে পড়ে—

কীর্ত্তিদা সমান হেন আমারে জানিবা তেন
সে ঘর এঘর সব তোরে।

কি আর করিব সাধ সকলে পড়িল বাদ
দিনেক রাখিতে নারি তোমা॥[২১২]

যশোদা আরও উন্মুক্ত করেন তাঁর অন্তর —

আমার জীবন তোমরা দু'জন
দুখানি আঁখির তারা।

আর বা বলিব কী॥
আর কিবা কহু তোমা হেন বহু
নাহিক আমার ঘরে॥[২১৩]

আর তাই রাধাকে বিদায় দিতে গিয়েও বিদায় দিতে পারছেন না : "বিদায় করিতে নারে কান্দয়ে করুণে।"

পুত্রস্নেহাতুরা জননী শুধু মাত্র পুত্রের আনন্দের কথা ভেবে রাধাকে নানা ছলে গৃহে ডেকে পাঠান। তিনি জানেন, রাধার শ্বশুরালয়ে অনেক বাধা, তাছাড়া জটিলা ও কুটিলা দুই ননদিনী রাধার প্রতি বিরূপ।

জটিলা কুপিলে আসিতে না দিবে
সে আর আপদ দড়।
কুটিলা কুমতি বিষের মুরতি
সেহ সে ধাউড় বড়॥[২১৪] —শেখর

তাই তিনি জটিলা ও কুটিলাকে প্রসন্ন করে নানা উপায়ে রাধাকে বাড়ী ডেকে আনেন—

কুন্দলতা আনি কথা কহে যশোমতী।
রাধারে আনহ বাছা করিয়া যুকতি॥[২১৫]

তারপর যশোদা রাধাকে কৃষ্ণের জন্য রান্না করতে পাঠান। কারণ, কৃষ্ণ তাহলে আগ্রহের সঙ্গে খাবেন। যশোদা কৃষ্ণকে বলেন—

তুমি না খাইলে রাই না আসিবে
স্বরূপে কহিলুঁ তোরে॥[২১৬] —শেখর

আর এই কথা শুনে কৃষ্ণ,

আকণ্ঠ পুরিয়া
করিলা ভোজন পান॥[২১৭] —শেখর

কৃষ্ণের পরিতৃপ্ত আহারে শুধু রাধা নয়, যশোদার মনও তৃপ্তিতে ভরে যায়। তাই রাধার প্রতি তাঁর এত স্নেহ। শ্বশুর বাড়ী ফেরার আগে যশোদা রাধাকে বসন-ভূষণে সাজিয়ে কোলে বসিয়ে আদর করেন—

সে যে যশোমতী পিরীতি মুরতি
রাইয়েরে করিয়া কোলে।
সে সব ভূষণ করিয়া যতন

দেয়ল তাহার গলে ॥[২১৮]

পুত্র-বাৎসল্য যশোদার কাছে পুত্র-প্রিয়তমাকে স্নেহের অধিকারিণী করেছেন।

বাঙালী কবিরা নতুন নতুন প্রসঙ্গের অবতারণা করে বিষয়-বস্তুতে অনেক বৈচিত্র্য এনেছেন।

অকস্মাৎ দুঃসংবাদ এল অক্রুর এসেছেন কংসের আমন্ত্রণে কৃষ্ণ ও বলরামকে মথুরা নিয়ে যেতে। একদিন তাঁরা মথুরা চলে গেলেন; কৃষ্ণ বৃন্দাবনে আর ফিরে এলেন না। কৃষ্ণহীন ব্রজধামে চির অন্ধকার নেমে এল। বিচ্ছেদের বেদনায় সমগ্র ব্রজভূমি ম্রিয়মাণ। আশ্চর্য, বাঙালী কবিরা পুত্র বিরহে কাতর যশোদার বেদনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ-নীরব। রাধার বিরহ যন্ত্রণা নিঃসন্দেহে মর্মান্তিক। কিন্তু বিচ্ছেদ-বেদনা বাৎসল্যেও কিছু কম কষ্টকর নয়। গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, শেখর প্রভৃতি পদকর্তারা মায়ের বেদনা সম্বন্ধে একটি কথাও বলেননি। বাংলা বৈষ্ণব সাহিত্যের কেন্দ্রবিন্দু রাধা; যশোদার অশ্রুজলে রাধার বিরহ বেদনার তীব্রতা যদি কিছু কমে যায় এই ভেবে হয়ত বাঙালী কবিরা যশোদার বেদনা সম্পর্কে নীরব।

একমাত্র দীন চণ্ডীদাস অক্রুরের আগমনে মা যশোদা ও পিতা নন্দের ভীতি ও বেদনা, কৃষ্ণের বিদায় মুহূর্তে যশোদার বিলাপ এবং নন্দ যখন মথুরা থেকে একা ফিরে এলেন, তখন পুত্রহারা যশোদার ক্রন্দন ইত্যাদি নিয়ে কিছু কিছু পদ রচনা করেছেন। যেমন, অক্রুর কৃষ্ণকে নিতে এসেছেন এই সংবাদ পেয়ে যশোদা ব্যাকুল হয়ে বলে উঠলেন :

কি বোল, কি বোল আর আর বল—
ঘন ঘন পুছে তায় ॥
কাঁদি কহে নন্দ— ঘুচিল আনন্দ
অক্রুর আইল নিতে।[২১৯]

যশোদা যে কৃষ্ণকে প্রতি মুহূর্তে "চক্ষে হারান", সেই, কৃষ্ণ আজ মথুরাপুরী চলেছেন। যশোদার পক্ষে চিন্তা করাই অসম্ভব।

মথুরা-গমন একথা শুনিতে
ফাটয়ে মায়ের প্রাণী ॥[২২০]

শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণকে যেতে দিতে হয়। নন্দ অবশ্য সঙ্গে যাচ্ছেন। যে কংসের ভয়ে পুত্রকে যশোদা সর্বদা দু'হাতে আগলে রেখেছেন, সেই কংসের দূত এসেছে কৃষ্ণ ও বলরামকে মথুরা নিয়ে যেতে। কৃষ্ণ-বলরাম সুসজ্জিত হয়ে অক্রুরের সঙ্গে রথে চলেছেন। যশোদা চিন্তামগ্ন, বুঝি তাঁর কোন বিশেষ অপরাধ স্মরণ করেই কৃষ্ণ তাঁকে পরিত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন। একবার চুরি করবার জন্য যশোদা কৃষ্ণকে উদূখলে বেঁধে রেখেছিলেন। আজ কি সেই কথা স্মরণ করেই কৃষ্ণ যশোদাকে পরিত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন? তিনি যে মা—

তুমি কি ছাড়িবে মায়।
শুনহে যাদব রায় ॥

কি দোষ পাইয়া মোর।
কিছু না জানিল ওর ॥
মায়ের কি দোষ ধরি।

* * *

অনেক তপের ফলে।
পাইলাম তোমারে কোলে ॥
মুই অভাগিনী নারী।[২২১]

অক্রুর কৃষ্ণ ও বলরামকে নিয়ে মথুরা চলে গেলেন। পুত্রহাবা যশোদার তাই —

সুখ গেল দূর দুখ রহে পাশে
কেমনে বঞ্চিব নিশি।[২২২]

তিনি রোহিণীকে ডেকে বলেন, পুত্রহীন জীবনের চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়।

যশোদা বলেন— শুনগো রোহিণী
আর কি দাঁড়ায়ে দেখ।
কৃষ্ণ বলরাম ছাড়িয়ে চলিল
আব কি পরাণ রাখি ॥[২২৩]

কৃষ্ণ বৃন্দাবন ত্যাগ করার আগেই পুত্র বিরহের আশঙ্কায় যশোদা বারবার অচেতন হয়ে পড়েছেন—

পড়ে রাণী মূর্ছিত হয়ে।

যশোদার আর সযত্নে রান্না করতেও আগ্রহ নেই। কাব জন্যই বা রাঁধবেন? এখন সব কিছুই তাঁর কাছে অর্থহীন।

নয়ন ছাড়িয়া গেলে কি কাল জীবনে—[২২৪]

অবুঝ মায়ের প্রাণ; তাঁর সন্দেহ, কাবো যুক্তিতে বুঝি কৃষ্ণ মথুরা যাচ্ছেন। কৃষ্ণকে তিনি তাই বলছেন—

একবার চাহ মায়ের পানে।
কে তোরে যুকতি দিল নিশ্চয় আমারে বল
এই সে আছিল তোর মনে ॥[২২৫]

যশোদা ভাবেন তাঁর অবোধ শিশুপুত্র অন্যের কথায় মথুরা চলেছেন। কিন্তু কৃষ্ণ চলে গেলে—

কে আর ডাকিবে 'মা' বলিয়ে।[২২৬]

যশোদার অন্তরের গভীর বেদনা এই একটি চরণে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

চৈতন্যের নবদ্বীপ ত্যাগ ও কৃষ্ণের বৃন্দাবন ত্যাগ অবলম্বনে যে সব পদ রচিত হয়েছে তাদের মধ্যে মিল লক্ষণীয়। শচীমাতার ও যশোদার বেদনা পদাবলীতে এক হয়ে গেছে। কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাস নিতে রাত্রির অন্ধকারে গৌরাঙ্গ নবদ্বীপ ছেড়ে গেছেন। সকালে গোরাকে কোথাও দেখতে না পেয়ে শচীমাতা চতুর্দিকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন ঃ

আউদড়-কেশে ধায় বসন না রহে গায়
শুনিয়া বধূর মুখের কথা ॥
ত্বরিতে জ্বালিয়া বাতি খুঁজিলেন ইতি উতি
গোরাঙেগ উদ্দেশ না পাইঞা।
বিষ্ণুপ্রিয়া বধূসাথে কান্দিতে কান্দিতে পথে
ডাকে শচী নিমাঞি বলিয়া ॥[২২৭]

শচী জেনেছেন গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস নিতে গিয়েছেন। এ সংবাদ তাঁর পক্ষে মর্মান্তিক ; কারণ গোরাই তাঁর জীবনের শেষ সম্বল।

পড়িয়া ধরণীতলে শোকে শচী কাঁদি বলে
লাগিল দারুন বিধি বাদে।
অমূল্য রতন ছিল কোন বিধি হরি নিল
পরাণ পুতুলি গোরাচাঁদে ॥[২২৮]

শচী যশোদার মতোই বলেন,

শচী কহে, শুন মোর নিতাই গুণমণি।
কেবা আসি দিল মন্ত্র কে শিখাইল কোন তন্ত্র
কি হইল কিছুই না জানি ॥
গৃহমাঝে গিয়াছিনু ভালমন্দ না জানিনু
কিবা দোষে গেল রে ছাড়িয়া।
কেন বা নিঠুর হৈলা পাথারে ভাসায়ে গেলা
রহিব কাহার মুখ চায়া ॥[২২৯]

গৌরাঙ্গের সন্ন্যাসে শচী জীবন্মৃত হয়ে পড়লেন—

মরা হেন রহিল পড়িয়া।

বাংলা বৈষ্ণব পদে কংসের দূত হিসাবে অক্রূরের আগমন, কৃষ্ণের মথুরা গমন, কংস হত্যা, কৃষ্ণের বৃন্দাবনে ফিরে না আসা, এবং নন্দ-যশোদার বিষন্ন দিন যাপন ইত্যাদি প্রসঙ্গ দীন চণ্ডীদাসের পদাবলীতেই বিশেষ করে পাওয়া যায়। পূর্বেই বলা হয়েছে তিনি ভাগবত অনুসারী কবি। তাই ভাগবতের এইসব বিষয় অবলম্বনে কিছু কিছু পদ রচনা করেছেন।

বৃন্দাবনে যশোদা বেদনার্ত। মথুরায় অন্য দৃশ্য। জন্ম মুহূর্তে যে পুত্রকে ত্যাগ করেছিলেন সেই পুত্রকে ফিরে পেয়ে দেবকী আনন্দে উৎফুল্ল :

ও মোর বাছুনি, চাঁদ মুখখানি
দেখিয়ে নয়ান ভরি।[২৩০]

কংসাসুর ধ্বংস হয়েছে, মথুরায় ফিরে এসেছে শান্তি। কৃষ্ণ ও বলরাম মথুরাতেই থাকবেন, —এই নির্মম কথাটি নন্দকে বলতে কৃষ্ণ বেদনা বোধ করছেন। বলরামকে ভার দিলেন এই কঠিন কর্তব্যটি করার জন্য। বলরামের মুখে একথা শোনা মাত্র নন্দ "মূর্ছিত হইয়া ধরণী পড়ল তবে।"[২৩১]

নন্দের নিজের বেদনা তো আছেই তার চেয়ে বড় ভাবনা যশোদাকে এ খবর কি ভাবে দেবেন।

কেমনে যাইব গোকুল নগরে
কৃষ্ণ বলরাম রাখি।
যশোদা রোহিণী কিসে প্রবোধিব
বড় পরমাদ দেখি ॥[২৩২]

নন্দ ফিরে এসেছেন শুনে যশোদা ও রোহিণী ছুটে এলেন কৃষ্ণ-বলরামকে দেখার আশায়। কিন্তু নিরাশ হতে হল। যশোদা নন্দের উপর প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন—

তুমি নন্দ বড়ই নিদয়া।
কোথা না রাখিলা মোহ মায়া ॥[২৩৩]

কৃষ্ণ-হারা যশোদা মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণায় মৃত্যু কামনা করেন। যশোদার মনে হয়, বাঁচিব কাহার তরে"। কৃষ্ণচন্দ্র বৃন্দাবনে নেই, যশোদার কাছে সমস্ত বৃন্দাবন অন্ধকার। নন্দকে ডেকে বলেন—

শুন, নন্দ ঘোষ, আমার বচন
জ্বালহ আনল ভালি।
তাতে প্রবেশিব যশোদা রোহিণী
দেহত অনল জ্বালি ॥[২৩৪]

যশোদার জীবনে আজ শুধু সম্বল চোখের জল। পুত্র বিরহে যশোদার দিন যায় শুধু—

কানাই, কানাই— বলিয়া বলিয়া
নিরবধি রাণী কান্দে ॥[২৩৫]

দীন চণ্ডীদাস যশোদা, নন্দ ও রোহিণীর পুত্রের বিচ্ছেদ বেদনা সম্পর্কে আর বিশেষ কিছু বলেননি। অন্যান্য কবিদের মত রাধার বেদনাই তাঁকে চঞ্চল করে তুলেছে।

বলা যেতে পারে যশোদার পুত্র বিরহের বর্ণনায় দীন চণ্ডীদাস বাঙালী কবিদের মধ্যে ব্যতিক্রম।

কিন্তু হিন্দী কবিরা রাধার বিরহের সঙ্গে সঙ্গে মাতৃ-হৃদয়ের বিচ্ছেদ যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করেননি। বিশেষ করে সুরদাস পুত্র-হারা যশোদার বেদনার যে পরিচয় তুলে ধরেছেন তা অতুলনীয়। রাধার অনন্ত বিরহ বেদনাকে যেমন তিনি হৃদয়গ্রাহী করে বর্ণনা করেছেন, তেমনি করেই যশোদার মর্মজ্বালাকে রূপ দিয়েছেন।

হিন্দী পদাবলীতে অক্রুর আগমনের আগেই যশোদা ও নন্দ অমঙ্গলের পূর্বাভাস পেয়েছেন। নন্দ স্বপ্ন দেখেছেন, কৃষ্ণ-বলরাম কোথায় যেন হারিয়ে গেছেন :

উত নন্দহিঁ সপনো ভয়ো, হরি কহুঁ হিরানে।
বলমোহন কোউ লৈ গয়ো সুনি কৈ বিলখানে ॥[২৩৬]

এ স্বপ্নের কথা শুনে যশোদা মূর্ছিত হয়ে পড়লেন—

ধরণী মুরছি পরী অতি ব্যাকুল, বিবস জসোদা রাণী।[২৩৭]

আর যথার্থই যেদিন কংসের দূত হয়ে অক্রূর বলরাম ও কৃষ্ণকে নিতে এলেন যশোদা ব্যাকুল হয়ে ছুটে কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন,—

(গোপাল রাঈ) কিহি অবলম্বন রহিহৈঁ প্রাণ।

নিঠুর বচন কঠোর কুলিসহুঁতেঁ, কহত মধুপুরী জান॥[২৩৮]

—বাছা গোপাল, কাকে অবলম্বন করে প্রাণ রাখব? নিষ্ঠুর কঠোর কথা শুনছি, তুমি নাকি মধুপুরী যাবে?

মার স্নেহ কৃষ্ণকে ধরে রাখতে পারল না। শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণকে যশোদার যেতে দিতেই হয়। তখন যশোদা ছেলের কাছে ভিক্ষা করে বারবার বলতে থাকেন, বাছা, আমাকে ত্যাগ করো না।[২৩৯] ভবিষ্যতের দুর্ভাগ্যের দিনগুলির ইংগিত বুঝি মাতৃ হৃদয়ে আগেই প্রতিভাত হয়। আর তাই যশোদা পুত্রকে অসহায় ভাবে বলছেন, "মোহি তজি ন দুলারে"। মর্মান্তিক বেদনায় যশোদা কৃষ্ণকে বলেন—

কন্‌হৈয়া মেরী ছোহ বিসারী।

ক্যোঁ বলরাম কহত তুম নাহীঁ, মৈঁ তুম্‌হারী মহতারী।[২৪০]

—কানাই, আমার স্নেহ ভুলে গেলে! বলরাম বলছে, তুমি কেন বলছ না আমি তোমার মা।

তাছাড়া যশোদার ভয়, কৃষ্ণ তাঁর চিরশত্রু কংসের আমন্ত্রণে মথুরা যাচ্ছেন। যদিও কৃষ্ণ পুতনা, তৃণাবর্ত প্রভৃতি রাক্ষসদের হত্যা করেছেন তবু পুত্রের জন্য মায়ের দুর্ভাবনা তো খুবই স্বাভাবিক। সুরদাস যশোদার বেদনার কথা বলতে গিয়ে রোহিণীর যন্ত্রণার কথা বলতেও বিস্মৃত হননি। কারণ রোহিণীর বেদনাও তো মর্মান্তিক।

য়ে দোউ ভৈয়া জীবন হমরে কহতি রোহিণী রোই।

ধরণী গিরতি, উঠতি অতি ব্যাকুল, কহি রাখত নহিঁ কোঈ॥[২৪১]

—রোহিণী বলছেন, এই দুই ভাই আমার প্রাণ। ব্যাকুল হয়ে তিনি কখনও মাটিতে লুটিয়ে পড়ছেন, কখনও উঠছেন। কেউ তাঁকে ধরে রাখতে পারছে না।

যাত্রার পূর্ব মুহূর্তে যশোদা কৃষ্ণকে বলছেন—

মোহন নৈঁকু বদন-তন হেরৌ।

রাখৌ মোহিঁ নাত জননী কৌ, মদন গুপাল লাল মুখ ফেরৌ॥[২৪২]

—বাছা মোহন গোপাল, মুখ ফেরাও, একটু (ভাল করে) মুখ দেখি। আমার সংগে মায়ের সম্পর্ক রেখ।

যশোদার এই উক্তির মধ্যে একটি বিশেষ বিষণ্ণ সুর রয়েছে। কৃষ্ণ দেবকী ও বসুদেবের সন্তান। মথুরায় তাদের কোলে গিয়ে কৃষ্ণ যশোদার স্নেহ যদি ভুলে যান কিংবা আর যদি না ফিরে আসেন, সমস্ত সম্পর্ক যদি ছিন্ন করেন, এ ধরনের চিন্তা যশোদার মনে হওয়া তো স্বাভাবিক। কিন্তু জঠরজাত সন্তান না হয়েও কৃষ্ণ যশোদার সন্তানাধিক। বাংলা পদাবলীতে তাই বোধ হয় যশোদা প্রতি মুহূর্তে কৃষ্ণকে

হারাবার ভয়ে অধীর। বাংলা গোষ্ঠের পদগুলি তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। হিন্দী পদাবলীতে যশোদা কখনই কৃষ্ণকে গোচারণে পাঠিয়ে এমন ব্যাকুল হননি, কিন্তু যে মুহূর্ত থেকে অক্রূর এসেছেন বৃন্দাবনে, হিন্দী পদাবলীতে যশোদার মানসিক পরিবর্তনটি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে, পুত্রের প্রতি উক্তিগুলিতে তাঁর হৃদয়ের প্রচণ্ড কাতরতা অনুভূত হয়। অথচ হিন্দী কবির যশোদা পুত্রকে সকালে উঠিয়ে নিজেই হাসিমুখে গোষ্ঠে পাঠিয়েছেন :

গ্বাল-বাল সব টেরহী, গৈয়া বন চারণ।
লাল উঠৌ মুখ ধোইঐ, লাগী বদন উঘারণ ॥[২৪৩]

—গোপ বালকেরা ডাকছে বনে গোরু চরাতে যাবে বলে, বাছা ওঠো, মুখ ধুয়ে নাও, বলে মুখের কাপড় সরিয়ে দিচ্ছেন।

সেই যশোদাকেই দেখা যায় কৃষ্ণ-বলরামকে নিয়ে অক্রূর মথুরার পথে যাত্রা করতেই তিনি "পুত্র" বলে চিৎকার করে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।

মহরি, পুত্র কহি সোর লগায়ো,
তরু জ্যোঁ ধরনি লুটাই।[২৪৪]

—যশোদা "পুত্র" বলে চিৎকার করে কাটা গাছের মত মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

কৃষ্ণ মথুরায় এসে কংসকে হত্যা করে বসুদেব ও দেবকীকে কারামুক্ত করলেন। নন্দকে বৃন্দাবনে ফিরে যেতে অনুরোধ করে, কৃষ্ণ তাঁকে নিজের স্বরূপ বোঝালেন—

মৈঁ আয়ৌ সংসার মেঁ ভুব-ভার উতারণ।[২৪৫]

—আমি এসেছি পৃথিবীর ভার লাঘব করতে। তিনি স্বয়ং ঈশ্বর। তাঁর মাতাপিতা কেউ নেই, ইত্যাদি বলে নন্দকে বহু জ্ঞানের কথা শোনালেন। নন্দ কৃষ্ণের এই জ্ঞানের কথায় আরও কাতর হয়ে পড়লেন। কারণ এতদিন যাকে সন্তান স্নেহে পালন করেছেন সেই পুত্র, হোল না দেবতা, নন্দের পিতৃসত্তাকে অস্বীকার করতে পারেন ; কিন্তু পিতা যিনি, তিনি মুহূর্তে পুত্রকে ঈশ্বর জেনে হৃদয়কে পরিবর্তন করতে পারেন না। তাই কৃষ্ণের উপদেশে তিনি কোন সান্ত্বনা খুঁজে পাচ্ছেন না—

নিঠুর বচন জনি কহো কন্হাঈ। অতিহী দুসহ সহো নহিঁ জাঈ।
তুম হঁসি কৈ বোলত যে বাণী। মেরেঁ নেন ভরত হৈ পানী ॥[২৪৬]

—কানাই, তোমার নিষ্ঠুর কথা দুঃসহ, তুমি হেসে যে কথা (তত্ত্বকথা) বলছ, শুনে আমার চোখে জল ভরে আসছে।

নন্দের কাছে এই জ্ঞানপূর্ণ কথার কোন মূল্য নেই কারণ তিনি স্নেহে অন্ধ, তাঁর কাছে যুক্তি অর্থহীন। কৃষ্ণ তাঁর পুত্র, এর বেশী তিনি ভাবতেই পারেন না। তাই স্পষ্ট তিনি বলেন,

(মেরে) মোহন তুমহিঁ বিনা নহিঁ জৈহোঁ।
মহরি দৌরি আগে জব ঐহৈ, কহা তাহি মৈঁ কৈহোঁ ॥[২৪৭]

—আমার মোহন, তোমাকে ছাড়া যাব না, যশোদা দৌড়ে আসবেন, তখন তাঁকে আমি কি বলব ?

কৃষ্ণ তাঁকে বুঝিয়ে বললেন, নন্দ, ব্রজে ফিরে যান, মথুরা আর বৃন্দাবনের মধ্যে কতটুকুই বা দূরত্ব ! নন্দ বেদনাক্লিষ্ট অন্তরে গোকুলে ফিরে এলেন। নন্দের রথ আসছে, যশোদা ছুটে এলেন, কিন্তু কৃষ্ণ মথুরা থেকে ফিরে আসেননি। দুঃখে ব্যথায় যশোদার সহ্যের সীমা অতিক্রম করে যায়। বেদনার আধিক্যে তিনি নন্দ যে স্বয়ং বেদনার্ত সে কথাও ভুলে যান। যশোদা নন্দকে ধিক্কার দিতে বা কটুবাক্য বলতে দ্বিধা করেন না। স্বামীর প্রতি এই রূঢ়তার মধ্যে দিয়ে কবি যশোদার বেদনার তীব্রতাকেই বোঝাতে চেয়েছেন—

জসুদা কান্হ কান্হ কৈ বুঝৈ।
ফুটিন গঈ তুম্হারী চারৌ, কৈসে মারগ সুঝৈ॥
ইক তৌ জরী জাত বিনু দেখেঁ, অব তুম দীন্হৌ ফুঁকি।
য়হ ছাতিয়া মেরে কান্হ কঁবর বিনু ফটিন ভঙ্গ দ্বৈ টুকি॥
ধিক তুম ধিক য়ে চরণ অহৌ পতি, অধ বোলত উঠি ধাএ।
'সুর' স্যাম বিছুরণ কী হম পৈ, দৈন, বধাঈ আএ॥[২৪৮]

—যশোদা কানু কানু করে কাঁদতে লাগলেন। নন্দকে বলছেন, তোমার দৃষ্টি কেন নষ্ট হয়ে গেল না, কি করে তোমার চোখ কৃষ্ণ ছাড়া পথ দেখলো। একে তো কৃষ্ণকে না দেখে বুক জ্বলে যাচ্ছে। তার উপর তুমি সে আগুন উসকে দিলে। কানুকে ছাড়া আমার হৃদয় কেন টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে না। ধিক্কার তোমাকে, ধিক্কার স্বামী তোমার চরণকে, যে চরণ নিয়ে ফিরে এসেছ,— বলতে বলতে উন্মাদিনী ছুটলেন।

মানসিক যন্ত্রণায় যশোদার প্রিয় বস্তুও অপ্রিয় মনে হয়; তাই নন্দের প্রতি এই কটু ভাষণ। এমনকি, শোকের উন্মাদনায় তিনি নন্দ কেন রাম বিরহে দশরথের মত প্রাণ ত্যাগ করেননি বলে স্বামীকে বাক্যযন্ত্রণা দিয়েছেন।[২৪৯] আবার স্বামীর কাছেই ব্যাকুল হয়ে বলছেন—

কহাঁ রহ্যৌ মেরৌ মন-মোহন।
রহ মূরতি জিয় তৈঁ নহিঁ বিসরতি, অঙ্গ অঙ্গ সব সোহন॥[২৫০]

—যশোদা নন্দকে বলছেন, আমার মনমোহনকে কোথায় রেখে এলে ! যার প্রত্যেকটি অঙ্গ সুন্দর, সেই অনুপম মূর্তি হৃদয় থেকে মুছে ফেলতে পারছি না।

আর খাবার তৈরী করতে গেলে, ননী, মাখন ইত্যাদি দেখলে পুত্র-হারা মায়ের যন্ত্রণা দ্বিগুণ হয়ে ওঠে :

জদ্যাপি মন সমুঝাবত লোগ,
সুল হোত নবনীত দেখি মেরে, মোহন কে মুখ জোগ॥[২৫১]

—যদিও লোকে অনেক বোঝাচ্ছে, তবু ননী দেখলেই আমার অন্তর শূলবিদ্ধ হচ্ছে, মোহনের খাবার জিনিস তো !

কৃষ্ণ এখন মথুরার রাজা, যশোদার সামান্য ননী বা মাখনে তাঁর প্রয়োজন নেই, ইত্যাদি বলে অনেকেই যশোদাকে বোঝাতে চেষ্টা করছেন। কিন্তু যশোদার কাছে

কৃষ্ণ যে তাঁর পুত্র ছাড়া আর কিছু নন। কৃষ্ণ শূন্য বৃন্দাবন তাঁর কাছে অন্ধকার। পুত্রকে শুধু দেখার জন্য বসুদেবও দেবকীর দাসী হয়ে থাকতেও তিনি প্রস্তুত ঃ

হে'াঁ তো মাঙ্গ মথুরা হী পৈ জেহে'াঁ।

দাসী হৈব বসুদেব রাই কী, দরসন দেখত রৈহে'াঁ॥[২৫২]

—সখী, আমি মথুরা যাব। বসুদেবের দাসী হয়ে থাকব এবং আমার কৃষ্ণকে সব সময় দেখব।

পুত্র বিরহাতুরা যশোদা শুধু মথুরার দিকে চেয়ে থাকেন, আর মথুরাগামী কোন পথিক দেখলেই কৃষ্ণের কাছে খবর পাঠান। কখনও বলেন— "কৃষ্ণকে আসতে ব'লো, কৃষ্ণ বৃন্দাবন ছেড়ে যাবার পর থেকে এখানে নিত্য উৎপাত হচ্ছে।[২৫৩] আবার কখনও কৃষ্ণকে বলে পাঠান—

কহিয়ৌ স্যাম সোঁ সমঝাই,

য়হ নাতো নহিঁ মানত মোহন, মনৌ তুম্হারী ধাই।[২৫৪]

—শ্যামকে বুঝিয়ে বলো, যদি অন্য কোন সম্বন্ধ মোহন স্বীকার না করেন তবে যেন অন্ততঃ আমাকে তাঁর ধাত্রী বলে। স্বীকার করে নেন।

শুধু কৃষ্ণ নয়, দেবকীর কাছেও তিনি নানা কথা বলে পাঠান

সন্দেসো দেবকী সোঁ কহিয়ৌ।

হোঁ তো ধাই তিহারে সুতকী, ময়া করত হী রহিয়ৌ।

জদপি টেব তুম জানতি উনকী তউ মোহিঁ কহি আবৈ।

প্রাত হোত মেরে লাল লড়ৈতে, মাখন রোটী ভাবৈ॥

তেল উবটনৌ অরু তাতো জল, তাহি দেখি ভজি জাতে।

জোই জোই মাঁগত সোই সোই দেতী, ক্রম ক্রম করিকে ন্হাতে॥

'সুর' পথিক সুনি মোহিঁ রৈনি দিন বঢ়য়ৌ রহত উর সোচ।

মেরো অলক লড়েতো মোহন হ্বৈহে করত সঁকোচ॥[২৫৫]

—পথিক দেবকীকে আমার সংবাদ দিও। তাঁকে ব'লো, আমি তার ছেলের ধাত্রী, আমার উপর যেন কৃপাদৃষ্টি রাখেন। অর্থাৎ, আমি যা বলছি তাতে ক্ষুণ্ণ হয়ো না। কৃষ্ণ উবটন আর গরম জল দেখা মাত্র পালিয়ে যায়। ও এখানে যা কিছু চাইত তাই দিতাম। তবেই ধীরে ধীরে ও স্নান করত। তুমি তো ওর অভ্যাসগুলি নিশ্চয়ই জান। তবু আমার মুখ থেকে এসব কথা মমতা বশে বেরিয়ে আসছে। সকালে উঠেই আমার আদরের বাছার মাখন-রুটি ভাল লাগে। সুরদাসের ভণিতায় যশোদা বলছেন, আমার মনে দিনরাত বড়ই চিন্তা, আমার চোখের মণি, আমার বাছা, ওখানে বোধ হয় সংকোচ বোধ করছে।

কৃষ্ণ যশোদা, নন্দ ও অন্যান্য গোপ গোপিনীদের বিচ্ছেদ-ব্যাকুলতার সংবাদ পেলেন। তিনি তাঁর প্রিয় সুহৃদ উদ্ধবকে বৃন্দাবনে যাবার আদেশ দিয়ে বললেন, যশোদা, নন্দ ও গোপিনীদের সঙ্গে কথা বলিতে। যশোদার কথা বলতে গিয়ে কৃষ্ণের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে, "সুনৌ ঊধৌ কহত বনত ন, নৈন ভরি ভরি লেত।"[২৫৬]

উদ্ধব শোন,— বলতে গিয়েও বলতে পারছেন না, চোখ জলে ভরে আসছে। শেষে কৃষ্ণ উদ্ধবের সঙ্গে সংবাদ পাঠালেন—

ঊধো ইতনী কহিয়ো জাই।

হম আবৈংগে দোউ ভৈয়া, মৈয়া জনি অকুলাই ॥[২৫৭]

—উদ্ধব, এই কথা গিয়ে বলো, আমরা দু-ভাই যাব, মা যেন ব্যাকুল না হন। তাঁর জন্য যশোদার ব্যাকুলতা কৃষ্ণ জানেন। যশোদার জন্য 'অকুলাই' শব্দটি প্রয়োগ করে কবি সুরদাস যশোদার যন্ত্রণাটি সুস্পষ্ট করে তুলেছেন। সুরদাস বাৎসল্যের মত প্রতি-বাৎসল্যের পদ রচনাতেও অদ্বিতীয়। সন্তানেরও যে মায়ের প্রতি সুগভীর মমতা থাকে সেটিও তিনি সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন। কৃষ্ণ উদ্ধবকে বলছেন যশোদাকে জানাতে—

নীকেঁ রহিয়ো জসুমতি মৈয়া।

আবৈংগে দিন চারি পাঁচ মৈঁ, হম হলধর দোউ ভৈয়া ॥

*　　*　　*

জা দিন তৈঁ হম তুমতৈঁ বিছুরে, কোউ ন কহত কন্হৈয়া ॥[২৫৮]

—মা, তুমি ভাল থেকো। আমি ও বলরাম দাদা চারপাঁচদিনের মধ্যেই যাব। * * * * * যেদিন থেকে তোমাকে ছেড়ে এসেছি সেদিন থেকে কেউ আমাকে কানাই বলে ডাকে না।

"কানাই" ডাকটি যশোদার সমগ্র সত্তার সরব প্রতীক। আজ মথুরার রাজা কৃষ্ণ সিংহাসনে বসেও যে ডাক শোনার জন্য ব্যাকুল।

যশোদা উদ্ধব মারফৎ কৃষ্ণের সংবাদ পেলেন ; কিন্তু মায়ের মন তাতে ভরে না। তিনি পুত্রকে কাছে পেতে চান, চোখের সামনে দেখতে চান। তাই তিনি উদ্ধবকে বললেন—

ঊধো পা লাগতি হোঁ কহিয়ো, স্যামহিঁ ইতনী বাত।

ইতনী দূর বসত ক্যোঁ বিসরে, অপনে জননী-তাত ॥

জা দিন তৈঁ মধুপুরী সিধারে, স্যাম মনোহর গাত।

তা দিন তৈ মেরে নৈন পপীহা, দরস প্যাস অকুলাত ॥[২৫৯]

—উদ্ধব, পায়ে ধরি, শ্যামকে এই কথা ব'লো, নিজের মা-বাবাকে এত কাছে থেকেও কেন ভুলে আছে। যেদিন শ্যাম মনোহর মধুপুরী চলে গেছে, সেদিন থেকে আমার নয়ন-পাপিয়া তাকে দেখার জন্য পিপাসার্ত হয়ে আছে।

যশোদা বারবার উদ্ধবকে অনুরোধ করছেন কৃষ্ণকে একবার বৃন্দাবনে পাঠিয়ে দেবার জন্য। তাছাড়া যশোদা দেবকীর কাছেও অনুরোধ করে পাঠিয়েছেন যেন কৃষ্ণকে তিনি একবার পাঠিয়ে দেন। তিনি ও নন্দ তো দেবকীর কাছে কোন অপরাধ করেননি। বরং দেবকী-বসুদেবের পুত্রকে রক্ষাব জন্য তিনি নিজের কন্যাকে কংসের বলি হিসাবে পাঠিয়েছেন।[২৬০] তিনি অনেক যত্নেই তাঁদের পুত্রকে লালন করেছেন। অবশেষে মাতৃ-হৃদয়ের চরম যন্ত্রনার কথাটি বলেছেন — "মৈয়া কৌন বুলাবৈ"। অর্থাৎ, মা বলে আর

কে আমাকে ডাকবে ?

উদ্ধব মথুরা ফিরে যাচ্ছেন, যশোদা তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ দান মায়ের আশীর্বাদ পাঠাচ্ছেন।

কহিয়ো জসুমতি কী আসীস।

জহাঁ রহো তহঁ নন্দ লাড়িলো, জীবো কোটি বরীস।[২৬১]

—উদ্ধব, যশোদার আশীর্বাদ দিও। নন্দ-নন্দন যেখানেই থাকুন, কোটি বৎসর তাঁর আয়ু হোক।

যশোদা কোথাও কৃষ্ণকে দেবকী-নন্দন বা রাজা কৃষ্ণ সম্বোধন করছেন না। কারণ, যশোদার কাছে কৃষ্ণ চিরদিনই নন্দ-নন্দন, অর্থাৎ যশোদার পুত্রই। পুত্রের জন্য সঙ্গে দিলেন,—

মুরলী দঈ, দোহনী ঘৃত ভরি, ঊধো ধরি লই সীস।

য়হ তো ঘৃত উনহী সুরভিন কো, জে প্যারী জগদীস॥[২৬২]

—বাঁশী, দুধ দুইবার পাত্র ভরে ঘি দিলেন। উদ্ধব তা মাথায় তুলে নিলেন। কৃষ্ণকে বলতে বললেন যে, এ ঘি জগদীশের আদরের গোরু সুরভির দুধ থেকে তৈরী।

হিন্দী পদাবলীতে যশোদা ও নন্দের আশীর্বাদ পাঠানোর দৃশ্য পরিচিত। পরমানন্দদাসের রচনাতেও এই ধরনের পদ পাওয়া যায়। সুরদাসও পরমানন্দদাসের আশীর্বাদের ভঙ্গিমা অনেকটা একই রকম। শুধু পরমানন্দদাস তাঁর পদে মাতৃস্নেহের সঙ্গে পিতৃস্নেহও যুক্ত করায় বাৎসল্যের বিকাশ পূর্ণতর হয়েছে। পরমানন্দদাস পিতৃ-হৃদয়ের মমতার কথা আরো একটু বেশী করে বলেছেন।. কারণ, সন্তানের বিচ্ছেদ যন্ত্রণা শুধু মা'র নয়, পিতার অন্তরেও বর্তমান।

কহত নন্দ ঊধো কে আগে নৈন নীর ভরি আবত।

মন্দভাগ হম ব্রজকে বাসী কৃষ্ণ-বিনা দুখ পাবত॥[২৬৩]

নন্দ চোখের জল ফেলতে ফেলতে উদ্ধবকে বলছেন, মন্দভাগ্য আমরা ব্রজবাসী কৃষ্ণ বিনা নিত্য দুঃখ পাচ্ছি।

ভাগবতে আছে সূর্যগ্রহণ উপলক্ষ্যে কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণের সঙ্গে গোপগণের সাক্ষাৎ হয়।[২৬৪] হিন্দী কাব্যে ভাগবতের সেই অংশটি গ্রহণ করা হয়েছে।

বৃন্দাবনের সমস্ত গোপ-গোপিনীরা কুরুক্ষেত্রে এসেছেন কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হতে। নন্দ-যশোদাও ছুটে এসেছেন পুত্রকে দেখতে।

নন্দ যশোদা সব ব্রজবাসী

অপনে অপনে সকট সাজিকৈ, মিলন চলে অবিনাসী।[২৬৫]

—নন্দ-যশোদা ও অন্যান্য সব ব্রজবাসী নিজেদের শকট সাজিয়ে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হবার আশায় দ্রুত চললেন।

কর্মব্যস্ত কৃষ্ণের সঙ্গে কুরুক্ষেত্রের প্রাঙ্গণে দেখা হল অল্প সময়ের জন্য—

আএ মেরে পাহুনে মিলনু।

নন্দ-জসোদা উঠি-উঠি ভেটত আপুনেঁ ললনু॥[২৬৬]

—অতিথি মিলনের সময় হয়। নন্দ-যশোদা নিজের পুত্রের সঙ্গে উঠে মিলিত হলেন।

বাৎসল্য পর্বের এই সমাপ্তি বড় বিবর্ণ মনে হয়। এক মর্মস্পর্শী নাটকীয় পরিবেশ রচনার সুযোগ পদকর্তারা গ্রহণ করেননি। কেন, তা বোঝা যায় না। এতদিন পরে পুত্রকে দেখে নন্দ-যশোদার নিরুদ্ধ বেদনা উৎসারিত হয়ে উঠতে পারত। এক চরম মুহূর্ত এল তাঁদের জীবনে। অথচ তা উপেক্ষিতই রয়ে গেল। রাজবেশী, কর্মব্যস্ত নায়ক কৃষ্ণকে দেখে নন্দ-যশোদা কি মুহূর্তের মধ্যে উপলব্ধি করলেন,— ইনি তাঁদের আদরের কানাই নন। যাঁকে কোলে করা যায়, আদর করা যায় আবার দরকার হলে শাস্তিও দেওয়া যায়। ইনি অলৌকিক শক্তিধর দেবতা। মানব-মানবীর লৌকিক স্নেহের অশ্রুজল দিয়ে তাঁকে নতুন করে আপন করবার প্রয়াস বৃথা।

রাধার প্রতি বাৎসল্য

বৈষ্ণব সাহিত্যে রাধা একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারিণী। রাধার পূর্বরাগ, অভিসার, মান ও বিরহ প্রভৃতি নিয়ে শত শত পদ যুগযুগ ধরে কবিরা রচনা করেছেন। অথচ রাধার শৈশবকে কেন্দ্র করে কীর্তিকা বা অন্য কোন নারীর বাৎসল্যের পদ বাংলা ও হিন্দী উভয় ভাষার পদাবলীতে বেশী পাওয়া যায় না।

রাধাকে কেন্দ্র করে বাৎসল্যের পদে বাংলা ও হিন্দীভাষী কবিদের মধ্যে একদিকে যেমন যথেষ্ট মিল রয়েছে, অন্যদিকে উভয় ভাষার কবিদের মধ্যে স্বকীয়া ও পরকীয়া মতবাদের পার্থক্য থাকায় মৌলিক ভিন্নতাও লক্ষণীয়।

বাঙালী কবিরা রাধাকে জন্ম মুহূর্ত থেকেই কৃষ্ণ অনুরাগিনী হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। রাধার জন্ম হয়েছে, বৃষভানুপুরী উৎসবে মত্ত। কিন্তু রানী কীর্তিকা কন্যাকে দেখে চিন্তায় আকুল হয়ে পড়েছেন, কারণ কন্যা চক্ষুহীনা।

নাহিক নয়ান দুটি কীর্তিকা দেখিল॥
পায়াছিলাম সাধ পুরাব রতনের বিধি।
গোবিন্দ দাস কহে নিদারুণ বিধি।[২৬৭]

কন্যা হয়েছে শুনে প্রতিবেশিনীরা কীর্তিকার গৃহে এসেছেন। কিন্তু অন্ধ কন্যা পেয়ে কীর্তিকা বেদনায় কাতর।

কান্দয়ে কীর্তিকা রাণী দুনয়নে বহে পানি
ধূলে পাড় গড়াগড়ি যায়।[২৬৮]

সকলের অনুরোধে এবং মমতাবশে কীর্তিকা চোখের জল মুছে কন্যাকে কোলে তুলে নেন। ইতিমধ্যে সংবাদ পেয়ে ব্রজরমণীদের সঙ্গে যশোদাও কৃষ্ণকে কোলে নিয়ে সেখানে এসেছেন। কোল থেকে পুত্রকে নামিয়ে তিনি কীর্তিকার পাশে গিয়ে বসলেন তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্য। আর এদিকে কৃষ্ণ হামা দিয়ে রাধার কাছে গিয়ে উপস্থিত এবং "রাই হিয়ায় হাত দিয়া রহিলেন হরি।"[২৬৯]

কীর্তিকা হঠাৎ দেখলেন কন্যা চোখ মেলে চেয়ে আছেন। তিনি বিস্ময়ে ও আনন্দে বিহ্বলা "নিরমল আঁখি দেখি, কীর্তিকা বিহ্বলা"।[২৭০] কীর্তিকার অন্তরের সমস্ত

দুঃখ মুহূর্তে অন্তর্হিত হয়ে যায়। কন্যার রূপে তিনি নিজেই মুগ্ধ :

কন্যার বদন দেখি কীর্তিকা জননী।
আনন্দে অবশ দেহ আপনা না জানি ॥[২৭১]

ব্রজাঙ্গনারাও কন্যার সৌন্দর্যে মুগ্ধ। তাঁরা সস্নেহে বলেন—

এ তোর বালিকা চান্দের কলিকা
দেখিয়া জুড়ায় আঁখি।
হেন মনে লয় সদাই হৃদয়ে
পসরা করিয়া রাখি ॥[২৭২]

রাধা ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠছেন। এদিক ওদিক খেলতে চলে যান। একদিন নন্দ গৃহে গিয়েছেন। যশোদা তাকে যত্ন করে সাজিয়ে বাড়ী পাঠিয়ে দিলেন। কীর্তিকা মেয়ের সাজ-সজ্জা দেখে প্রশ্ন করেছেন—

প্রাণ-নন্দিনী রাধা বিনোদিনী
কোথা গিয়াছিলা তুমি।
এ গোপনগরে প্রতি ঘরে ঘরে
খুঁজিয়া ব্যাকুল আমি ॥[২৭৩]

তাছাড়া কীর্তিকা কন্যার আঁচলে নানা খাদ্য সামগ্রী দেখে আবার জানতে চাইলেন—

এ খীর মোদক চিনি কদলক
কে তোর আঁচরে দিল ॥
অগোর চন্দন কস্তুরী কুমকুম
কে রচিল তোর ভালে।[২৭৪]

রাধা বললেন, পথ থেকে যশোদা তাঁকে বাড়ী নিয়ে যান। যশোদার স্নেহ ও আদরের কথা তো বললেনই, সেই সঙ্গে কৃষ্ণের রূপে যে তিনি মুগ্ধ সে কথা বলতেও রাধা দ্বিধা করলেন না। রাধা বললেন—

তাহার বেটার রূপের ছটায়
জুড়াইল মোর প্রাণ ॥[২৭৫]

যশোদার আদর সম্বন্ধে আরও জানালেন—

কি হেন আকুতে তার বাম ভিতে
লয়ে বসাইল মোরে।
এক দিঠে রহি তাহার আমার
রূপ নিরীক্ষণ করে ॥[২৭৬]

সংসার অনভিজ্ঞা রাধা যশোদার এই একাগ্রভাবে উভয়কে একত্র দেখার অর্থ উপলব্ধি করতে পারেননি। জ্ঞানদাস রাধার শিশুসুলভ মানসিকতাকে তুলে ধরে বাস্তববোধের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু কীর্তিকা যশোদার এই বিশেষ সমাদরের অর্থ বোঝেন। আর তাই—

ঝিয়ের কাহিনী শুনি গোয়ালিনী
মুচকি মুচকি হাসে।[২৭৭]

কন্যার সারল্যে কীর্তিকার সস্নেহ হাস্য পরিবেশটি রমণীয় করে তুলেছে।

বাংলা বৈষ্ণব সাহিত্যে এরূপর আর কন্যারূপে রাধাকে দেখতে পাওয়া যায় না। এরপর যে রাধার সঙ্গে আমাদের পরিচয় তিনি আয়ান-পত্নী হয়েও কৃষ্ণপ্রেমে পাগলিনী।

বাঙালী পদকর্তারা পরকীয়াতত্ত্বে বিশ্বাসী। রাধার পরকীয়া প্রেমের গাঢ়তা ও মাধুর্য বাংলা বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রাণবস্তু। তাই রাধার প্রতি বাৎসল্য সমগ্র পদাবলীতে অতি ক্ষুদ্র স্থান অধিকার করে আছে।

হিন্দী বৈষ্ণব কবিরা স্বকীয়াবাদে বিশ্বাসী; তাই পরমানন্দ দাস, নন্দ দাস প্রভৃতি কবিরা রাধা-কৃষ্ণের বিয়ে দিয়েছেন সমারোহের সঙ্গে। হিন্দী বৈষ্ণব সাহিত্যে রাধার হৃদয় জন্মকাল থেকে বাংলা পদাবলীর মতো কৃষ্ণানুরাগে রঞ্জিত নয়। সুরদাস অবশ্য শিশু রাধা ও কৃষ্ণের বিবাহের কথা বলেননি। তবে কবি দেখিয়েছেন শৈশবের সখ্য ক্রমে প্রেমে পরিণত হয়েছে এবং তিনি গন্ধর্বমতে রাধা-কৃষ্ণের বিবাহ দিয়েছেন। রাধার বিবাহ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে কীর্তিকা ও বৃষভানু, যশোদা কিংবা অন্য গোপিনীদের বাৎসল্যানুভূতির বিচিত্র প্রকাশ মনোরম হয়ে উঠেছে।

তবে হিন্দী কবিও রাধার কাহিনী আরম্ভ করেছেন জন্ম মুহূর্ত থেকে—

আঠৈ ভাদৌ কী উঁজিয়ারী।
প্রগট ভঈ শ্রীকুবঁরি রাধিকা সকল-সিরোমণি প্যারী।[২৭৮]

ভাদ্রমাসের শুক্লা অষ্টমীতে সকলগুণের শিরোমণি সুন্দরী রাধিকা আবির্ভূত হলেন। আর রাধার জন্মের সংবাদ পাবার পর বৃষভানুপুরীতে আনন্দোৎসব শুরু হয়েছে।

কীর্তিকা স্নেহ-মুগ্ধ হয়ে কন্যার রূপ দেখছেন, "কীর্তি ঢিগ নিরখী সুঠি কন্যা,"[২৭৯] অর্থাৎ, কীর্তিকা সুন্দরী কন্যাকে দেখে মুগ্ধ হচ্ছেন।

হিন্দী কবিরা কৃষ্ণের দৈনন্দিন জীবনের অনেক প্রসঙ্গ নিয়ে পদ রচনা করেছেন। তেমনি রাধার প্রাত্যহিক জীবনের কিছু কিছু ঘটনাও হিন্দী পদাবলীতে পাওয়া যায়। এমনি একটি রাধার দোলনায় চড়া। দোলনায় দোল দিতে দিতে কীর্তিকা স্নেহাবেশে আনন্দ পাচ্ছেন:

রসিকিনী রাধা পলনা ঝুলৈ
দেখি দেখি গোপীজন ফুলৈ॥
রতন জটিত কৌ পলনা সোহৈ।
নিরখি নিরখি জননী মন মোহৈ॥[২৮০]

—সুরসিকা রাধা দোলনায় দুলছেন, আর তা দেখে গোপিনীদের গর্বের অন্ত নেই। রত্নখচিত দোলায় তিনি শোভা পাচ্ছেন, আর তা দেখে দেখে মা'র মন মোহিত হচ্ছে।

এর পরই রাধার এক বৎসর পূর্তি উৎসবের বর্ণনা। এই জন্মোৎসবের দিনে একজন গোপিনী শিশু রাধাকে দেখে স্নেহাবিষ্ট হয়ে অন্য এক গোপিনীকে বলছেন, রাধা কীর্তিকার অনেক ভাগ্যের ধন, আজ সেই ছোট্ট বাছার জন্মদিন, তাই তিনিও আজ আনন্দে উৎফুল্ল :

যহ সুখ দেখোরী তুম মাঈ !
বরস গাঁঠি বৃষভান— ললী কী বহুরী কুসল সাঁ আঈ ॥
আগম কে দিন নীকে' লাগত সর্বহিন মন সচু পাঈ।
ধন বড ভাগ রানী কীরতিকে পুণ্য-পুঞ্জ-নিধি পাঈ ॥[২৮১]

হিন্দী কবির রাধা স্বকীয়া। একজন সমালোচক বলেছেন :

"গৌড়ীয় বৈষ্ণব মত মে রাধা পরকীয়া হী হে ॥ হিন্দীকে ভক্তি সাহিত্য মে কুছ গোপিয়া তো পরকীয়া হে, পরন্তু রাধা স্বকীয়া হী হে।"[২৮২] অর্থাৎ, গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে রাধা পরকীয়া, হিন্দী ভক্তি সাহিত্যে কিছু গোপিনী পরকীয়া, কিন্তু রাধা স্বকীয়া।

সুরদাস ব্যতীত পরমানন্দ দাস, নন্দ দাস ও কুম্ভন দাস,— সকলেই শিশু-রাধা ও শিশু-কৃষ্ণের মধ্যে সমারোহের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছেন। কুম্ভনদাসের পদে আছে, রাধার জন্মের পর যশোদা প্রায় কীর্তিকার গৃহে যাতায়াত করছেন ; পরস্পর পরস্পরের পুত্র-কন্যাকে কোলে নিচ্ছেন, তেল মাখাচ্ছেন, আদর করছেন, ইত্যাদি। একদিন কথা প্রসঙ্গে কীর্তিকা বলছেন, সখী, এসো এই খোকা-খুকিব বিয়ে দিই, তাহলে আমরা সর্বদা চোখ ভরে আনন্দেব দৃশ্য দেখতে পাব :

কীর্তি কহী— মহরি ! যহ ললী ললা কী সগাঈ কীজৈ।
হিলিমিলিকে নৈননি কো যহ সুখ সদা নিরন্তর লীজৈ ॥[২৮৩]

এর পবই উভয়ে বিবাহ স্থির করে ফেললেন।

নন্দদাস তো "স্যাম সগাই" (শ্যামের বিবাহ) নামক স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। নন্দদাসের পদাবলীতেও রাধাকৃষ্ণের বিবাহ সম্পর্কে পদ আছে। কিন্তু এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে যশোদা বা কীর্তিকার বাৎসল্যের পরিচয় পাওয়া যায় না।

সুরদাস সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পথ নিয়েছেন। তিনি শিশু বাধাকে প্রথম শিশু কৃষ্ণের খেলাব সঙ্গিনী হিসাবেই বর্ণনা কবেছেন। কৃষ্ণ বৃন্দাবনে নানা খেলায় মত্ত। হঠাৎ একদিন রাধাকে দেখতে পেলেন :

ঔচক হী দেখী তহঁ রাধা···[২৮৪]

বাধা ও কৃষ্ণের পরিচয় হল, পবস্পরের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠতে লাগলো। কিন্তু রাধার চিন্তা রয়েছে ঘরে ফেরার। কাবণ, মা তার জন্য চিন্তা করছেন। রাধা তাঁর সখীকে বলছেন যে, তাঁর মা তাঁকে নিশ্চয়ই খোঁজ করছেন। রাধার এই উক্তির মধ্যে প্রতি-বাৎসল্য রসের সৃষ্টি হয়েছে :

মাতা কহতি কহাঁ হী প্যারী, কহাঁ অবের লগাঈ।[২৮৫]

—মা হয়ত বলছেন, বাছা কোথায় এত দেরী করছে,— রাধা বালিকা বয়সেই মা'র

প্রতি কত আকৃষ্ট তা এই উক্তি থেকে প্রমাণিত হয়।

কৃষ্ণের সঙ্গে খেলা করে রাধা বাড়ী ফিরছেন, কিন্তু মন পড়ে আছে কৃষ্ণের কাছে। মা কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করলে রাধা অসংলগ্ন উত্তর দেন। মেয়ের অবস্থা দেখে কীর্তিকা শঙ্কিত :

কুবঁরি কোঁ কহুঁ দীঠি লাগী, নিরখি কৈ পছিতাই।
সূর তব বৃষভানু-ঘরণী, রাধিকা উর লাই ॥[২৮৬]

—কীর্তিকা দেখে দেখে দুঃখ বোধ করছেন, আর ভাবছেন রাধার বুঝি কারো দৃষ্টি লেগেছে। সুরদাস বলেন, বৃষভানু ঘরণী তাই রাধাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

বাইরে ঘোরাঘুরি করাতেই কু-দৃষ্টি লাগে। তাই মা বলছেন :

কুঁবরি সোঁ কহতি বৃষভানু-ঘরণী।
নৈ কু নহিঁ ঘর রহতি, তোহিঁ কিতনো কহতি."...[২৮৭]

রাধাকে বৃষভানু ঘরণী বলছেন, তোমাকে কত বলি তবু ঘরে কিছুতেই থাকবে না...। তিনি কন্যাকে আরও বলেন, সবার ঘরে ছেলেমেয়ে আছে, কিন্তু তোমার মত ভয় ডরের বালাই নেই এমন কেউ নয়। কিন্তু মায়ের এইসব সস্নেহ উপদেশ বৃথা। রাধা যে কৃষ্ণের সঙ্গে খেলার জন্য আকুল। বাল্য প্রীতি ধীরে ধীরে প্রণয়ে পরিণত হচ্ছে।

রাধা একদিন নন্দের বাড়ী এসেছেন কৃষ্ণের সঙ্গে খেলা করতে। কৃষ্ণ তাঁর খেলার সাথীকে মা'র সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। যশোদা রাধার পরিচয় পেয়ে সস্নেহে তাঁকে বুকে টেনে নিলেন। এবং তারপর—

জসুমতি রাধা কুঁবরি সঁবারতি
বড়ে বার সীমন্ত সীসকে, প্রেম সহিত নিরুবারতি ॥
মাঁগ পারি বেণী জু সঁবারতি, গুঁথি সুন্দর ভাঁতি।
গোরেঁ ভাল বিন্দু বন্দন, মনু ইন্দু প্রাপ্ত-রবি কান্তি ॥[২৮৮]

—যশোদা রাধাকে সাজাচ্ছেন। সিঁথি করে সুন্দর বেণী বেঁধে দিয়েছেন, সস্নেহে তিনি রাধাকে দেখছেন। সুন্দর গৌর কপালে চন্দন বিন্দু যেন প্রভাত সূর্যের সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে। আর রাধার আঁচলে বেঁধে দিয়েছেন—

তিল চাঁবরী, বাতাসে, মেবা, দিয়ৌ কুঁবরি কী গোদ।[২৮৯]

রাধা গৃহে ফিরে এলেন। কীর্তিকা রাধার সাজসজ্জা ও আঁচলে নানা খাদ্য দেখে প্রশ্ন করছেন :

কিন তেরে ভাল তিলক রচি কীনৌ,
কিহিঁ কচ গুঁদি মাঁগ সির পারী।[২৯০]

—কে তোমার সিঁথি করে সুন্দর চুল বেঁধে দিয়েছে? কপালে তিলক এঁকেছে কে?

কবি সুরদাসের এই পদ মনে করিয়ে দেয় জ্ঞানদাসের পদ—

অগোর চন্দন কস্তুরী কুঙ্কুম

কে রচিল তোর ভালে।[২৯১]

স্নেহ-প্রেমের ক্ষেত্রে ভাষা ও স্থান কালের ঊর্ধ্বে প্রায়ই মিল খুঁজে পাওয়া যায়। উপরোক্ত দু'টি পদ এই মিলের সুন্দর দৃষ্টান্ত।

রাধা বাড়ী ফিরে মাকে যশোদার কথা সব বললেন। তারপর নির্বিকার চিত্তে জানালেন— "মো-তন চিতে, চিতে ঢোটা-তন।"[২৯২]

রাধা বলছেন, যশোদা একবার আমাকে দেখেন আর একবার ছেলেকে দেখেন। একথা শুনে কীর্তিকা যশোদার অন্তরের আকাঙ্ক্ষা উপলব্ধি করে মৃদু মৃদু হাসতে থাকেন।

বৈষ্ণব পদাবলীতে রাধার প্রতি-বাৎসল্যের উজ্জ্বল প্রকাশ বেশী নেই। কৃষ্ণের লীলা-সহচরী বলেই রাধার সমাদর। পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে আমরা এ সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছি। অবশ্য রাধার প্রতি কীর্তিকার স্নেহ স্বাভাবিক ও সুন্দর। কিন্তু পদকর্তারা সেদিকে বিশেষ দৃষ্টিপাত করেননি। যশোদা রাধাকে স্নেহ করেন তিনি কৃষ্ণের ভালোবাসার পাত্রী বলে। বাৎসল্যরসের পদাবলীতে কৃষ্ণের সমুজ্জ্বল মূর্তির পাশে এক নগণ্য অনুজ্জ্বল স্থান অধিকার করে আছেন রাধা।

এই আলোচনা থেকে দুই ভাষার বাৎসল্যরসাশ্রিত পদাবলীর মধ্যে যে সাদৃশ্য প্রথমেই লক্ষ্য করা যায় তা হল কৃষ্ণের জীবন-কথার প্রসঙ্গ। উভয় ভাষার পদকর্তারাই ভাগবত থেকে কৃষ্ণ কাহিনী গ্রহণ করার ফলে এই সাদৃশ্য। কিন্তু হিন্দী ও বাংলা পদাবলীতে বৈসাদৃশ্য এবং নিজস্ব বৈশিষ্ট্যও লক্ষণীয়। এই সব পার্থক্য ও বিশিষ্টতার জন্য উভয় ভাষার বাৎসল্য পদাবলী নিজস্ব চরিত্রে সমৃদ্ধ। নিজস্বতা আছে বলেই পদাবলী সাহিত্য নিছক ভাগবতের অনুবৃত্তি হয়নি।

বিষয় এক হলেও প্রতিভাবান কবিরা নিজস্ব রচনারীতির দ্বারা তাঁদের রচিত পদাবলী বিশিষ্টরূপে চিহ্নিত করেছেন। শব্দচয়ন, অলংকার ও উপমার প্রয়োগ এবং দৃষ্টিভঙ্গির নিজস্বতা একই কৃষ্ণ-প্রসঙ্গ মনোরম ভিন্নতায় সমুজ্জ্বল করেছে এবং ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তি থেকে রক্ষা করেছে পদাবলীর কাব্যপ্রাণকে।

তাছাড়া সামাজিক ও ভৌগোলিক ভিন্নতা হিন্দী ও বাংলা বাৎসল্যরসের পদাবলীতে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে। তাই হিন্দী কবির কৃষ্ণ প্রকৃতই গোপ-বালক; তিনি খেলা ছাড়াও দুধ দুইতে শেখার জন্য উৎসুক। কৃষ্ণ গোচারণে যান কারণ এটা তাঁর কুলধর্ম, সুতরাং কর্তব্য।

কিন্তু বাঙালী কবির কৃষ্ণ গোচারণে যান বন্ধুদের সঙ্গে খেলার সুযোগ পেতে। বৃন্দাবনের যশোদা পুত্রের গোষ্ঠ যাত্রায় চিন্তিত,— পাছে কোন বিপদ ঘটে! আবার আনন্দিতও, কারণ পুত্রের কুলধর্ম পালনের জন্য এই প্রথম সংসার-জীবনে প্রবেশ। কিন্তু নবদ্বীপের যশোদা পুত্রের বিচ্ছেদবেদনায় কাতর। অন্ততঃ হিন্দী কবির যশোদার চেয়ে অনেক বেশী ব্যাকুল। যতক্ষণ কৃষ্ণ গোষ্ঠে থাকেন ততক্ষণ বাঙালী পদকর্তার যশোদা পুত্র বিচ্ছেদের জন্য বিলাপ করেন; গোচারণে গিয়ে কৃষ্ণ যে কুলধর্ম পালন করছেন,— এ সম্বন্ধে যশোদার সচেতনতা লক্ষ্য করা যায় না।

হিন্দী পদাবলীতে শিশু কৃষ্ণের প্রধান আশ্রয় দোলনা। বাংলা পদাবলীতে দোলনা প্রায় অনুপস্থিত। পরিবর্তে আছে মায়ের কোল। সুতরাং মাতা-পুত্রের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ ও নিবিড়। মা'র স্নেহের আতিশয্য প্রতি ক্ষেত্রে দেখা যায়। মাতৃস্নেহপুষ্ট বাঙালী কবির কৃষ্ণ একটু দুষ্টু, জেদী এবং ভোজনরসিক। বৃন্দাবনের যশোদাও স্নেহশীলা, কিন্তু বাংলার যশোদার মতো স্নেহের দাবীর কাছে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করতে দেখা যায় না। বাঙালী কবির যশোদার অন্তরে স্নেহের এতই প্রাবল্য যে পুত্রের স্পর্শে বা চিন্তায় দেহে শিহরণ জেগে ওঠে এবং স্বতোৎসারিত স্তন্যধারায় তাঁর বসন সিক্ত হয়।

দুই অঞ্চলের ধর্ম সাধনার পার্থক্যও বৈসাদৃশ্য সৃষ্টির সহায়ক হয়েছে। হিন্দী বাৎসল্যরসের কবিরা প্রায় সকলেই পুষ্টিমার্গের ভক্ত। তাঁদের গুরু ছিলেন বালগোপালের উপাসক। তাই কবি-শিষ্যদের উপর এর প্রভাব পড়েছে। কবিরা বাৎসল্যরসের পদাবলী রচনায় উৎসাহিত হয়েছেন। হিন্দী বৈষ্ণব কাব্যে তাই বাৎসল্য রসের পদাবলীর উৎকর্ষ ও প্রাচুর্য দুই-ই দেখা যায়। হিন্দীতে কৃষ্ণের বাল্যজীবন বর্ণনায় ধারাবাহিকতা আছে এবং বর্ণনা বিশদ। বাঙালী পদকর্তারা ধারাবাহিকতা এবং বিশদ বর্ণনার প্রতি মনোযোগী ছিলেন না : তাঁরা কৃষ্ণের কোনো কোনো জীবন-প্রসঙ্গ অবলম্বন করে লিরিকধর্মী পদ রচনা করেছেন। একমাত্র ব্যতিক্রম দীন চণ্ডীদাস। তিনি অনেকটা হিন্দী কবিদের রীতি অনুযায়ী পদ রচনা করেছেন।

হিন্দী কবিরা শুধু কৃষ্ণের প্রতি যশোদার বাৎসল্য অবলম্বনে পদ রচনার সুযোগ পেয়েছেন। বাঙালী পদকর্তারা কিন্তু গৌরাঙ্গের জন্য শচীমাতার স্নেহকে পদাবলীর বিষয় হিসাবে গ্রহণ করবার অতিরিক্ত সুযোগ পেয়েছেন। শচীমাতা ও গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদগুলি কাব্যগুণে সমৃদ্ধ এবং পাঠকচিত্তে তাদের আবেদনও গভীরতর।

গৌরাঙ্গ ছিলেন মধুর ভাবের উপাসক। তাই বাংলা পদাবলীতেও মধুর রসের প্রাধান্য। মধুররসের এই প্রাধান্য বাংলা বাৎসল্যরসের পদাবলীর উপরও পড়েছে। কৃষ্ণ মথুরা যাবার পর রাধার যে বিরহ বেদনা, তাকে অবলম্বন করে বহু বাংলা পদ রচিত হয়েছে। রাধার মতো যশোদা পুত্র বিরহে কাতর। কৃষ্ণ গোচারণে যান। সারাদিন বাড়ী থাকেন না। যশোদা পুত্রের বিচ্ছেদে কাতর। যশোদার পুত্র-বিরহকে গুরুত্ব দেবার জন্য বাংলা পদাবলীতে গোষ্ঠলীলার পদ প্রাধান্য পেয়েছে।

বাংলা মধুররসের পদাবলীতে রাধাই নায়িকা। হিন্দী পদাবলীতে রাধা গোপিনীদের একজন মাত্র,— নায়িকার বিশিষ্ট মর্যাদা তাঁকে দেওয়া হয়নি। তেমনি বাৎসল্যের ক্ষেত্রে বাংলা পদাবলীতে যশোদাই নায়িকা। একমাত্র দীন চণ্ডীদাস ব্যতীত অন্য পদকর্তারা কৃষ্ণের পরিজনদের পশ্চাদ্‌ভূমিতে রেখেছেন। অপরপক্ষে হিন্দী পদাবলীতে কৃষ্ণকে স্নেহ করবার দাবীদার শুধু যশোদা নন ; আছেন নন্দ, রোহিণী, বলরাম এবং ব্রজভূমির গোপ-গোপিনীরা। প্রেমে গভীরতার সঙ্গে আছে কিছুটা সংকীর্ণতা। প্রণয়ী-প্রণয়িনী পরস্পরের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় তৎপর ; আত্মীয়-পরিজনের অবস্থান তখন তাদের মনোজগতের বাইরে। এই প্রবণতা বাঙালী কবিরা

রূপায়িত করেছেন যশোদার মধ্যে। যেন কৃষ্ণের উপর স্নেহের দাবী যশোদার একার,—আর কারো নয়।

বাংলা ও হিন্দী বাৎসল্যরসের পদাবলী নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিকাশ লাভ করেছে। উভয়ের মধ্যে কোথায় সাদৃশ্য কোথায় বৈসাদৃশ্য তা ব্যাখ্যা করে দেখাবার প্রয়াস করা হয়েছে। কিছু ভিন্নতা থাকলেও মৌলিক ঐক্যটাই প্রধান কথা। কারণ উভয় ভাষার বাৎসল্যরসাশ্রিত পদাবলীর সৃষ্টি ও বিকাশের মূলে রয়েছে ভক্তিরস। যেন একটি বাৎসল্য ভক্তিরসবৃন্তে বাংলা ও হিন্দী বাৎসল্যরসের দু'টি প্রস্ফুটিত পদাবলী-কুসুম।

প্রথম অধ্যায়

বৈষ্ণবধর্ম ও পদাবলী-সাহিত্য

খ্রীস্টীয় ষোড়শ শতাব্দী ভারতীয় ভক্তিধর্মের স্বর্ণযুগ। ভারতবর্ষে, বিশেষভাবে সমগ্র উত্তরভারতে, ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠা, প্রচার এবং প্রসার হিন্দুমানসে যে প্রবল ভয়-ভাবনা, চিন্তায় যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, মনে হয়, তারই ফলশ্রুতিরূপে দেখা দিল নতুন এক ভক্তিধর্মের প্রাদুর্ভাব। এই ভক্তিধর্মের একদিকে সমন্বয়ের সাধনা ইসলামী-ভক্তিবাদ তথা সুফীবাদের সঙ্গে হিন্দু-ভক্তিবাদের সমন্বয়, অন্যদিকে হিন্দুসমাজের বর্ণ ও জাতিভেদের প্রাচীর অগ্রাহ্য করে বিভিন্ন বর্ণ ও জাতির সমন্বয়। এই সমন্বয় সাধনার নেতৃত্ব যাঁরা গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের নাম মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। কবীর, নানক, দাদু, শঙ্করদেব, বল্লভাচার্য, চৈতন্যদেব, তুকারাম, তুলসীদাস এবং আরো অনেকে ইতিহাসের এই যুগটিকে [ষোড়শ ও সপ্তদশ শতক] একটি নতুন ধর্ম ও মননের আলোকে আলোকিত করে রেখেছিলেন। কাব্যে, গানে, দোঁহায়, বিচিত্র বাণীর ভিতর দিয়ে হিন্দু জনমানসে এঁরা এক নতুন প্রেরণা সঞ্চার করেছিলেন। ধর্মীয়, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ওলট-পালটের অনিশ্চয়তার মধ্যে এইসব সাধক, কবি এবং সন্তদের বাণী ও দান হিন্দুমানসকে একটি নিশ্চিত ও নিশ্চিন্ত আশ্রয় দিয়েছিল। যে নামে এই আশ্রয়টি ইতিহাসে পরিচিত সে হল ভক্তিধর্ম।

ভক্তিবাদের বিকাশ

ভক্তিবাদ ও ভক্তিধর্ম ভারতবর্ষের ইতিহাসে নতুন কিছু নয়। কিন্তু নতুন কিছু না হলেও মধ্যযুগীয় ভক্তিধর্ম আর পূর্বতন ভক্তিধর্ম— এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য বিস্তর। ভারতেতিহাসে ভক্তিবাদের দুটি ধারা, একটি শৈব-শাক্ত অন্যটি বৈষ্ণব।

আমাদের আলোচনার নির্দিষ্ট কালখণ্ডে বৈষ্ণব ভক্তিধর্মের ছিল অবিসংবাদী প্রাধান্য; আলোচ্য বিষয় মধ্যযুগীয় ভক্তিবাদ। সুতরাং বৈষ্ণব ভক্তিবাদই আমাদের আলোচনার ক্ষেত্র। তবে, '…আরম্ভের পূর্বেও আরম্ভ আছে। সন্ধ্যাবেলায় দীপ জ্বালার আগে সকালবেলায় সলতে পাকানো।'[১] ভক্তিবাদের কথা বলবার পূর্বে তাই সকালবেলার সলতে পাকানোর কাজটুকু করে নিতেই হয়।

ঋগ্বেদে 'ভক্তি' শব্দের প্রয়োগ না থাকলেও অনেকগুলি সূক্তে ভক্তির ভাব প্রকাশ করা হয়েছে দেখা যায়। ইন্দ্র ও অগ্নির প্রতি মাতা পিতা এবং অন্যান্য মানবিক সম্পর্ক আরোপ করা হয়েছে [৩।১৬]। অন্যত্র বলা হয়েছে, স্ত্রী যেমন স্বামীকে আলিঙ্গন করে তেমনি আমার স্তুতি তোমাকে [ইন্দ্রকে] আলিঙ্গন করে [১০।৪৩।১-২]।

বরুণসূক্তে ভক্তের ব্যাকুলতা অধিকতর পরিস্ফুট [ঋগ্বেদ, ৭।৮৩।২-৪]। কিন্তু উপনিষদেই আরাধ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার আকাঙ্ক্ষা তীব্রতর। বৃহদারণ্যক উপনিষদে ঋগ্বেদের স্বামী-স্ত্রীর আলিঙ্গনের উপমাটি গ্রহণ করে পুরুষ ও আত্মার নিবিড় মিলনের অনুভূতি গভীরতর রূপে প্রকাশ পেয়েছে [৪।৩।২১]। মুণ্ডক উপনিষদেও বলা হয়েছে যে, বেদ অধ্যয়নের দ্বারা মেধার সাহায্যে বা শাস্ত্রবাণী শ্রবণে তাঁকে পাওয়া যায় না; আত্মা যাঁকে বরণ করেন, তিনিই তাঁকে লাভ করেন [৩।২।৩]। ভক্তির প্রধান বৈশিষ্ট্য আত্মনিবেদন এবং অনুগ্রহ ভিক্ষা এখানে পরিস্ফুট হয়েছে।

যতদূর জানা যায়, 'ভক্তি' শব্দের প্রথম উল্লেখ করা হয়েছে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে:

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥ ইঃ৬।২৩।

অর্থাৎ, যাঁর পরমেশ্বর ও গুরুর প্রতি অচলা ভক্তি আছে কেবল তিনিই উপনিষদ বর্ণিত ঈশ্বর কথা উপলব্ধি করতে পারেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে পণ্ডিতদের মতে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ বৈদিক উপনিষদ সমূহের মধ্যে সর্বশেষে রচিত। এইজন্যই এখানে 'ভক্তি' শব্দটির প্রথম আবির্ভাব ভক্তিবাদের ক্রমবিবর্তনের ধারানুসারী হয়েছে।

শাণ্ডিল্যসূত্রই বোধহয় প্রথম প্রচলিত অর্থে ভক্তির স্বরূপ নির্দিষ্ট করে দেয়—'সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।' অর্থাৎ, ঈশ্বরে ঐকান্তিক অনুরাগই ভক্তি।[২]

পরবর্তীকালের ভক্তিবাদে ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে যে নিবিড় একাত্মতার অনুভূতি দেখা যায় বেদ ও উপনিষদের যুগে তা ছিল না। ভক্তের হৃদয়ে সান্নিধ্যের আকাঙ্ক্ষা থাকলেও তখন পর্যন্ত আরাধ্য দেবতার অধিষ্ঠান ছিল মহিমার উচ্চ আসনে। ভক্তিবাদ ক্রমবিকাশের এই দুটি স্তর বিশ্লেষণ করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: 'দেবতারা যখন বাহিরে থাকেন, যখন মানুষের আত্মার সঙ্গে তাঁহাদের আত্মীয়তার সম্বন্ধ অনুভূত না হয়, তখন তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের কেবল কামনার সম্বন্ধ ও ভয়ের সম্বন্ধ। তখন

তাঁহাদিগকে স্তবে বশ করিয়া আমরা হিরণ্য চাই, গো চাই, আয়ু চাই, শত্রু পরাভব চাই ; যাগযজ্ঞ-অনুষ্ঠানের ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতায় তাঁহারা অপ্রসন্ন হইলে আমাদের অনিষ্ট করিবেন এই আশঙ্কা তখন আমাদিগকে অভিভূত করিয়া রাখে। এই কামনা এবং ভয়ের পূজা বাহ্য পূজা ; ইহা পরের পূজা। দেবতা যখন অন্তরের ধন হইয়া ওঠেন তখনই অন্তরের পূজা আরম্ভ হয়, সেই পূজাই ভক্তির পূজা।'[৩]

রবীন্দ্রনাথ উপরোক্ত নিবন্ধে আরো বলেছেন, 'এই ভক্তিধর্মের দেবতাই বিষ্ণু। বিষ্ণু বৈদিক দেবতা, কিন্তু তিনি প্রধানতম দেবতা ছিলেন না। তাঁকে উদ্দেশ্য করে ঋগ্‌বেদে চার-পাঁচটির বেশি সূক্ত রচিত হয়নি। তবে বিভিন্ন প্রসঙ্গে তাঁর উল্লেখ আছে অনেকবার এবং তিনি যে পরাক্রমশালী দেবতা তারও পরিচয় পাওয়া যায়। বিষ্ণু গৃহসুখের কারণ [৬।৪৯।১৩] এবং গর্ভস্থ ভ্রূণের রক্ষাকর্তা হিসাবে [৭।৩৬।৯] ভক্তদের নিকট বিশেষ প্রিয় ছিলেন।

বেদের পরবর্তী ব্রাহ্মণ সাহিত্যে বিষ্ণুর প্রাধান্য স্বীকৃতি লাভ করে। তিনি অসুরদের পর্যুদস্ত করে পৃথিবীকে রক্ষা করেছেন।[৮] বিষ্ণুর এই রক্ষাকর্তার রূপটি সহজেই ভক্তদের আকৃষ্ট করেছে। কঠোপনিষদে বিষ্ণু শ্রেষ্ঠ দেবতা। সংসারজীবনের পরপারে বিষ্ণুর পাদপদ্মই একমাত্র আশ্রয়স্থল [১।৩।৯]।

ভক্তের পূজা পেলেও বিষ্ণু 'অন্তরের ধন' হয়ে উঠে 'অন্তরের পূজা' যে পাননি তা পরবর্তী ইতিহাস থেকে প্রমাণিত হয়। অন্তরের ধন হিসাবে পূজা পেয়েছেন তাঁরই অবতার কৃষ্ণ। কৃষ্ণ নামটিও প্রাচীন। ঋগ্‌বেদে দুজন কৃষ্ণের অস্তিত্ব জানা যায়। একজন ছিলেন ঋষি ; ঋগ্‌বেদের অষ্টম ও দশম মণ্ডলের কয়েকটি সূক্ত তাঁরই রচনা।

ঋগ্‌বেদে উল্লিখিত দ্বিতীয় কৃষ্ণ পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার প্রভৃতির মতে এক অনার্য বীর, যিনি দশ হাজার সেনা নিয়ে ইন্দ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন এবং অনিবার্যরূপেই পরাস্ত হয়েছিলেন।

দেবকীর পুত্র কৃষ্ণের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ছান্দোগ্য উপনিষদে। কৃষ্ণ এখানে ঋষি আঙ্গিরসের শিষ্য [৩।১৭।৬]। আঙ্গিরস কৃষ্ণের সঙ্গে যেসব আলোচনা করেছেন তার সঙ্গে গীতায় কৃষ্ণের উপদেশের মিল দেখা যায়। সুতরাং সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, ছান্দোগ্য উপনিষদের এবং গীতার কৃষ্ণ অভিন্ন। প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার দেখিয়েছেন কৃষ্ণকে আঙ্গিরসের শিষ্য হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে উপনিষদের সংশ্লিষ্ট শ্লোকের ভুল ব্যাখ্যার জন্য।[৫] প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণ যে তখন শিক্ষার্থীর স্তর অতিক্রম করেছেন তার প্রমাণ ঐ উপনিষদের পাঠের মধ্যেই রয়েছে।

পাণিনির ব্যাকরণে [৪।৩।৯৮ সংখ্যক সূত্রে][৬] এবং ভগবদ্‌গীতা, মহাভারত প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থে কৃষ্ণ বাসুদেবের উল্লেখ পাওয়া যায়। এইসব উল্লেখ থেকে প্রমাণিত হয় যে, বাসুদেবকে কেন্দ্র করে বৈষ্ণবধর্মের আদিরূপ ভাগবতধর্ম বুদ্ধদেবের জন্মের

পূর্বে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল। এ ছাড়া ঐতিহাসিক নিদর্শন থেকেও ভাগবতধর্মের প্রভাব সম্বন্ধে নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিক কুইণ্টাস কার্টিয়াস আলেকজাণ্ডারের জীবনীতে লিখেছেন যে, পুরুর সৈন্যেরা দেবতা 'হেরাক্লিসের' মূর্তি নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যেত প্রেরণালাভের জন্য।[৭] ডঃ ভাণ্ডারকর 'হেরাক্লিস'-কে বাসুদেব কৃষ্ণ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

মেগাস্থিনিসের বিবরণেও পাওয়া যায় সমতলভূমির ভারতবাসীরা, বিশেষ করে শৌরসেন বা মথুরা অঞ্চলের অধিবাসীরা, হেরাক্লিসের পূজা করত।

গ্রীক রাষ্ট্রদূত হেলিওডোরাস (Heliodorus) গোয়ালিয়রের নিকটবর্তী ভিলসার সন্নিহিত বেসনগরে একটি স্তম্ভ নির্মাণ করে বাসুদেবের নামে উৎসর্গ করেছিলেন।

স্তম্ভের গাত্রের লেখমালা থেকে জানা যায় বাসুদেব 'দেবদেব' অর্থাৎ দেবতাশ্রেষ্ঠ। হেলিওডোরাস নিজেও ছিলেন বাসুদেবের পূজারী। এই স্তম্ভ আনুমানিক ১৮০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে নির্মিত হয়েছিল।[৮]

দেবতাদের মধ্যে শিব ছিলেন বিষ্ণুর প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বী। বিষ্ণু কতকগুলি বিশেষ গুণের জন্য জনচিত্তে অবিসংবাদী অধিকার স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই সম্বন্ধে অধ্যাপক ড্যানিয়েল ইংগলস্ বলেছেন : 'By late Classical times Visnu had so grown by the absorption of other Gods and cults that one may almost say that he was all things to all men....One can distinguish Visnu from Siva only by certain general tendencies. In general, the elements of terror is lacking in the concepts of Visnu. To this statement only the man-lion incarnation furnishes an exception. On the other hand, kindly human traits, which are rare in Saiva imagery, abound in Vaisnava. The personal incarnations of Visnu were more important in his worship than the cosmic force from which they were said to emanate. Visnu, not Siva, was worshipped as a child, a youth a, lover.'[৯]

বিষ্ণু এবং তাঁর অবতার কৃষ্ণকেই যদি ধর্মগ্রন্থে পাওয়া যেত, তবে হয়ত কৃষ্ণের স্বরূপ নির্ণয়ে এত সমস্যার সম্মুখীন হতে হত না। বৈদিক সাহিত্যে বিষ্ণুর আবির্ভাবের কিছুকাল পরে অনুরূপ গুণসম্পন্ন এবং শক্তিধর দেবতা নারায়ণের উল্লেখ পাওয়া যায়। বিষ্ণু ও নারায়ণ কী দুই পৃথক দেবতা ছিলেন, পরে এক হয়েছেন, না প্রথম থেকেই একই দেবতার দুই নাম? বাসুদেব ও কৃষ্ণ কী গোড়ায় ভিন্ন ছিলেন, পরে এক হয়েছেন? কৃষ্ণ কী বিষ্ণুর অবতার না কোনো ঐতিহাসিক বিরাট পুরুষ যাঁর কীর্তিকলাপে মুগ্ধ হয়ে ভক্তরা তাঁকে দেবত্বে উন্নীত করেছে? কোথায় পুরাণ শেষ এবং কোথায় ইতিহাসের শুরু? কৃষ্ণ অনার্য সভ্যতার ও সংস্কৃতির প্রতীক কিনা সে প্রশ্নও উঠেছে। পরবর্তীকালে রাধাকৃষ্ণের মধ্যে মিলনের যে আর্তি তা কী

আর্য অনার্য সভ্যতার মিলনের ব্যাকুলতা ? ডঃ ভাণ্ডারকর অন্য এক মৌলিক প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি বলেছেন, বহিরাগত আভীর জাতি আনীত খ্রীস্টের জীবনকথা কৃষ্ণ-কাহিনীর উৎস। যীশুর জীবনের সঙ্গে কৃষ্ণের অনেক সাদৃশ্য তিনি দেখিয়েছেন।[10] কিন্তু হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী ও দীনেশচন্দ্র সরকারের মতে এই সাদৃশ্য যুক্তিসহ নয়। বিষ্ণুর আর-এক অবতার রামের সঙ্গে কৃষ্ণের যোগ আছে কিনা এবং উত্তর ভারতের এক বিস্তৃত অঞ্চলে কী করে কৃষ্ণের আধিপত্য দূর হয়ে ধীরে ধীরে রামের প্রভাব বিস্তার লাভ করল ?

এইসব প্রশ্ন ও সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান পণ্ডিতরা এখনো করতে পারেননি। সমস্যার জটে জড়িয়ে পড়বার প্রয়োজন আমাদেরও নেই। যে কৃষ্ণ কোটি কোটি ভক্তের হৃদয়ে বহু শতাব্দী যাবৎ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার আসনে প্রতিষ্ঠিত, যাঁর জীবন-কথা বিভিন্ন ভাষার কবিদের কাব্য রচনার প্রেরণা, যিনি অসংখ্য নরনারীকে মুক্তির পথ দেখিয়েছেন, ভক্তের নিকট সেই কৃষ্ণের সত্তা কোনো সমস্যার দ্বারা আচ্ছন্ন নয়।

বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার

মথুরার ক্ষুদ্র জনপদে বৃষ্ণি বা সাত্বতদের প্রবর্তিত কৃষ্ণ উপাসনা খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক নাগাদ প্রায় সর্বভারতীয় ধর্মের মর্যাদা লাভ করবার পথে অগ্রসর হয়। পুরু রাজার আমলে এবং তার পরবর্তী কয়েক শতাব্দীতে বাসুদেবের পূজা যে প্রচলিত ছিল তা পূর্বে বলা হয়েছে। এই কালখণ্ড খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ থেকে প্রথম শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত। বৌদ্ধযুগে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে খ্রীস্টজন্মের পরবর্তী কয়েক শতাব্দী উত্তর ভারতে ভাগবতধর্মের ক্রমবর্ধমান প্রভাব অনেকটা ক্ষীণ হয়ে পড়েছিল।

গুপ্তযুগে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে ভক্তিবাদ রাজকীয় স্বীকৃতি লাভ করল। গুপ্ত সম্রাটরা ছিলেন বৈষ্ণব। তাঁরা নিজেদের 'পরম ভাগবত' আখ্যায় ভূষিত করতেন। গুপ্ত সম্রাটদের রাজত্বকালে [৩২০ আঃ ৫০০ খ্রীঃ] বৈষ্ণবধর্ম সর্বপ্রথম একটা সংহত রূপ লাভ করে। খুব সম্ভব এই সময়ই কৃষ্ণ-বিষ্ণুর অভিন্নত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

পাঞ্জাব, পশ্চিমভারত এবং বাংলা পর্যন্ত সমগ্র উত্তরভারতে গুপ্ত সম্রাটদের রাজত্বকালে যে বৈষ্ণবধর্ম বিস্তার লাভ করেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় সমকালীন মুদ্রায়, শিলালেখে এবং বিষ্ণু অধিষ্ঠিত মন্দিরের প্রাচুর্যে। পরাক্রমশালী গুপ্ত সম্রাটদের আদর্শ অনুসরণ করে অনেক ছোটো ছোটো রাজ্যের রাজারাও বৈষ্ণবধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন।

শুধু উত্তরভারতে নয়, দক্ষিণভারতেও বৈষ্ণবধর্ম প্রসারলাভ করেছে। 'The Bhagavata Purana refers to South India, particularly the Tamil country, as a special resort of devotees of Visnu.'[11]

শ্রীশ্রীমদ্‌ভক্তিবিলাস তীর্থমহারাজ দাক্ষিণাত্যে বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব সম্বন্ধে এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন : "পরম্পরাগত প্রবাদ হইতে জানা যায় যে বিষ্ণুস্বামী খ্রীস্টপূর্ব শতাব্দীতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সেই সময় দক্ষিণ ভারতেই বৈষ্ণবধর্ম প্রচলিত ছিল। তিনি বিষ্ণুর নরসিংহ অবতারের উপাসক ছিলেন। খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর নানাঘাট শিলালিপি হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বৈষ্ণবধর্ম খ্রীস্টপূর্ব যুগে দাক্ষিণাত্যে অনুপ্রবেশ করিয়াছিল। খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে দক্ষিণভারতে কৃষ্ণা জেলায় যে চৈন শিলালিপি আবিষ্কৃত হয় তাহাতে দেখা যায় ঐ সময় রাজা ছিলেন যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণী এবং ঐ শিলালিপিতে ভগবান বাসুদেবের স্তব দেখতে পাওয়া যায়। খ্রীস্টীয় যুগের প্রথমভাগে দাক্ষিণাত্যে মন্দিরসমূহে কৃষ্ণবলরামের উপাসনা প্রচলিত ছিল।...যদিও গোঁড়া মতবাদিগণ বলিয়া থাকেন যে, আলোয়াড়গণ অতি প্রাচীনকালে জীবিত ছিলেন, তথাপি মনে হয় তাঁহারা খ্রীস্টযুগের প্রথম শতাব্দীতেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই আলোয়াড়গণ কৃষ্ণ নারায়ণের পরম ভক্ত ছিলেন এবং "প্রবন্ধম্"-নামক কবিতাবলীতে তাঁহাদের ভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন।'[১২]

বৈষ্ণব সাধকদের ভাবাবেগই একমাত্র সম্বল ছিল না। দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণবাচার্যগণ বৈষ্ণবধর্মকে দার্শনিক ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রামানুজ ও মধ্ব। তাঁদের মতবাদ মধ্যযুগের ধর্মসাধনাকে গভীর-ভাবে প্রভাবান্বিত করেছে।

গুপ্তসাম্রাজ্য পতনের পর হর্ষবর্ধনই [৬০৬-৪৭ খ্রীঃ] উত্তরভারতের সর্বশেষ পরাক্রমশালী হিন্দু নৃপতি। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন শৈব, পরে বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী হন। তাঁর পরে সমগ্র আর্যাবর্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সর্বদা যুদ্ধে লিপ্ত রাজ্যে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে পড়ে। এর কিছুকাল পরে মুসলমান আক্রমণ হিন্দুধর্ম ও সমাজে নতুন বিপর্যয় সৃষ্টি করল। সেই অবস্থায় আত্মরক্ষার সমস্যাই মুখ্য হয়ে উঠেছিল, ধর্মচর্চার প্রশ্ন ছিল গৌণ। সুতরাং উত্তরভারতে বৈষ্ণব সাধনার যে প্রচার ও প্রসার শুরু হয়েছিল তা কয়েক শতাব্দীর জন্য ক্ষীণ হয়ে পড়ল। মুসলমান রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পর যখন অরাজকতা দূর হয়ে শান্তি ফিরে এল তখন নতুন উদ্যমে বৈষ্ণব সাধকরা তাঁদের মতবাদ প্রচার করতে আরম্ভ করলেন।

দক্ষিণভারতে মুসলমান রাজত্বের বিস্তার ঘটেছে অনেক পরে। তা ছাড়া উত্তরাঞ্চলের মতো দক্ষিণাঞ্চলের বিজয় কখনো তেমন সম্পূর্ণ হয়নি। তাই দাক্ষিণাত্যে বৈষ্ণব ভক্তদের সাধনায় ছেদ পড়েনি। এই কারণেই উত্তরভারতে যখন বৈষ্ণবধর্মের পুনরভ্যুত্থান ঘটল তখন পূর্ব ইতিহাস বিস্মৃত হয়ে লোকের মনে এই ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল যে, বৈষ্ণব সাধনার আবির্ভাব ও বিকাশ দাক্ষিণাত্য থেকেই হয়েছে। একটি প্রচলিত শ্লোকে এ কথাটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে :

'উৎপন্না দ্রাবিড়ে ভক্তির্বৃদ্ধিং কর্ণাটকে গতা।
অন্ধ্রদেশে ক্কচিৎ ক্কচিদ্ গুর্জরে বিলয়ং নীতা॥[১৩]

অর্থাৎ, দ্রাবিড়দেশে উৎপন্ন হয়ে কর্ণাটক ও অন্ধ্রদেশে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে, ভক্তিবাদ যখন গুজরাটে পৌঁছল তখন তার অনেক বিকৃতি ও বিনাশ ঘটে গেছে।

মুসলমান রাজত্ব একটু স্থিতিলাভ করার পর উত্তরভারতে ভক্তিধর্মের পুনরভ্যুত্থান লক্ষ্য করা যায়। হিন্দুধর্মের উপর অত্যাচার কম হয়নি। মন্দির ধ্বংস হয়েছে, শাস্ত্রগ্রন্থের বহ্ন্যুৎসব হয়েছে, পুরোহিত ও পণ্ডিতদের প্রাণ দিতে হয়েছে। লাঞ্ছনার হাত থেকে মুক্তি পায়নি দেববিগ্রহ। ভক্তদের প্রকাশ্য দৃষ্টি থেকে বিগ্রহকে সরানো হল অন্ধকার গর্ভগৃহে। পাছে লোভীর দৃষ্টি পড়ে তাই অলংকার খুলে নিয়ে বিগ্রহকে করা হল রিক্ত। সেই পরিচিত ঐশ্বর্যময় মূর্তি গেল হারিয়ে। যেখানে দেবতা নিজেই বিপন্ন, সেখানে বড়ো বড়ো মন্দিরে পুরোহিতের সাহায্যে আচার-অনুষ্ঠান করে দেবতার কাছে প্রার্থনা জানানো অর্থহীন মনে হয়েছিল।

সেদিনকার পরিস্থিতিতে বিপদ আসতে পারত যে কোনো মুহূর্তে। যিনি সর্বদার সঙ্গী হবেন, যাঁকে প্রার্থনা জানাতে মন্দিরে যাবার দরকার নেই, পুরোহিত দিয়ে মন্ত্র পাঠ করাবার প্রয়োজন নেই, অন্তরে যাঁর বাস, বিপদে যিনি ভক্তকে রক্ষা করবেন, রবীন্দ্রনাথ যাঁকে বলেছেন 'অন্তরের ধন'— তেমন দেবতাই ছিলেন ভক্তের কাম্য। কৃষ্ণ ও রাম ছিলেন তেমনি অন্তরের ধন। তাই অতি সহজেই তাঁরা অসংখ্য ভক্তের হৃদয় অধিকার করতে পেরেছিলেন।

মুসলমান ধর্মের সংস্পর্শে এসে ভক্তিধর্ম কিছু নতুন প্রেরণা যে লাভ করেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রথমত নবাগত মুসলমানদের মধ্যে জাতিভেদের সংকীর্ণতা ছিল না। এই উদারতার সুযোগ নিয়ে তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর অনেক হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করা সহজ হয়েছিল। মধ্যযুগে ভক্তিধর্ম ইসলামের উদারতা গ্রহণ করেছে। জাতিবর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেকেই নিজের আরাধ্য দেবতাকে ভালোবাসবার ও আরাধনা করবার অধিকারী। ভক্তিবাদীরা 'জাতির দোহাই' দিয়ে পরস্পরের মধ্যে বিভেদের প্রাচীর তোলেননি। চৈতন্যদেব চণ্ডালকে কোল দিয়েছিলেন। উত্তরভারতে কয়েকজন ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব ভক্তিসাধক জাতির বাধাকে অগ্রাহ্য করে সমাজের সকল শ্রেণীর লোককে শিষ্যমণ্ডলীতে গ্রহণ করেছিলেন। গুজরাটের ভক্ত কবি নরসিংহ মেহ্‌তা [১৫০০-১৫৮৫] গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবার থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন হরিজনদের সঙ্গে মিলিতভাবে কৃষ্ণের সাধন ভজন করবার অপরাধে। গুরু রামানন্দ [চতুর্দশ শতাব্দী] ব্রাহ্মণ হলেও আচারের ধর্ম ত্যাগ করে হরিজন সম্প্রদায় থেকে অনেককে শিষ্য হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। এই শিষ্যদের মধ্যে কবীর, পীপা, রবিদাস প্রভৃতি বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। আবার তথাকথিত হরিজন সাধকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে উচ্চবর্ণের হিন্দুরাও কুণ্ঠিত হতেন না।

দ্বিতীয়তঃ, সুফী সম্প্রদায়ের সাধনপদ্ধতি বৈষ্ণব সাধকদের সমর্থন পেল। সুফী সাধকরাও বিশ্বাস করতেন ভগবানের সঙ্গে মানুষের মিলন প্রেমিক-প্রেমিকার মিলনের মতই মধুর ও রহস্যময়। তাঁদের গীতিকবিতায় মানবিক প্রেম ভগবদ্‌প্রেমে রূপান্তরিত হয়। তাঁরাও উপলব্ধি করেছিলেন, আমাদের পদাবলী

কীর্তনের মত ঈশ্বরানুরক্তিমূলক গীতিকবিতার সংগীত শ্রবণ ভগবদ্‌প্রেম উপলব্ধির সহায়ক।[১৪]

ভক্তিবাদের দার্শনিক ভিত্তি

ভক্তিবাদের আবেদন শুধু জনসাধারণের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল না। শিক্ষিত সমাজেও এর প্রচার ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ভাগবত ধর্মের আবির্ভাব হয়েছে খ্রীস্টজন্মের পূর্বে। বিষ্ণুর মহিমা বেদে, উপনিষদে এবং অন্যান্য গ্রন্থে কীর্তিত হয়েছে; ভক্তির ব্যাখ্যাও হয়েছে বিভিন্ন গ্রন্থে নানা দিক থেকে। কিন্তু ভক্তিবাদের বিভিন্ন চিন্তাধারাকে সংহত করে দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করবার উদ্যোগ একাদশ শতাব্দীর পূর্বে হয়নি।

ভক্তিবাদের কয়েকজন আচার্য দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধমুক্ত পরিবেশে এই কাজটি সম্পন্ন করলেন খ্রীস্টীয় একাদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে। এইসব আচার্যদের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ মূলতঃ ভক্তিবাদের আলোকে বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যা। কারণ, তাঁরা জানতেন, শাস্ত্রের অনুমোদন আছে দেখাতে পারলেই ভক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা সুদৃঢ় এবং দ্রুততর হবে। একটা দার্শনিক ভিত্তি পেয়ে সংশয়বাদী বুদ্ধিজীবীরাও ধীরে ধীরে ভক্তিবাদের প্রতি আকৃষ্ট হতে লাগলেন।

পদ্মপুরাণে চারটি প্রধান বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে

> অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ।
> শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকাঃ বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ॥[১৫]

অর্থাৎ, কলিকালে শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক এই চারটি পৃথিবী পবিত্রকারী বৈষ্ণব [সম্প্রদায়] থাকবে। এইসব সম্প্রদায়ের দার্শনিক মতবাদ ব্যাখ্যা করেছেন অনেক আচার্য। তাঁদের মধ্যে রামানুজ শ্রী-সম্প্রদায়ের, মধ্ব ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের, বিষ্ণুস্বামী রুদ্র-সম্প্রদায়ের এবং নিম্বার্ক সনক-সম্প্রদায়ের প্রধান।

রামানুজের দান সম্বন্ধে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন 'আচার্য রামানুজ তাহার পূর্ববর্তীকালে প্রচারিত প্রসিদ্ধ প্রায় সকল বৈষ্ণব মতই গ্রহণ করিয়াছেন; তিনি এই সকলকে উপাদান-স্বরূপে ব্যবহার করিয়া স্বীয় লোকোত্তর দার্শনিক প্রতিভার স্পর্শে তাহাকে একটি দৃঢ় এবং সুস্পষ্ট মতবাদে রূপায়িত করেন। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন, ভারতবর্ষের ধর্মের ইতিহাসে প্রথমে বৈষ্ণবমতের জাগরণ ঘটিয়াছিল বৌদ্ধধর্মের প্রবল নাস্তিক্যবাদের প্রতিক্রিয়ায়। পরবর্তীকালে আবার দেখিতে পাই, আচার্য শংকরের অদ্বৈতবাদ সমগ্র ভারতবর্ষে এক প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল; এই আলোড়ন ভারতবর্ষের শক্তিবাদের ভিত্তিতে যে নাড়া দিয়াছিল তাহাকে রোধ করিবার ক্ষমতা বিভিন্ন পুরাণ-তন্ত্র-সংহিতাদির ছিল না; শংকরের ক্ষুরধার তর্কবুদ্ধির সম্মুখীন হইতে অনুরূপ বলিষ্ঠ প্রতিভার একান্ত প্রয়োজন ছিল; সেই

প্রয়োজনেই আবির্ভাব রামানুজাচার্যের। আচার্য রামানুজের পর হইতেই দার্শনিক বৈষ্ণব মত নানাভাবে গড়িয়া উঠিতে লাগিল; এই সকল মতবাদেরই মুখ্য প্রতিপক্ষ আচার্য শংকর। বেদান্তের অদ্বৈতবাদের খণ্ডনের উপরেই মধ্ব, নিম্বার্ক, বল্লভাচার্য প্রভৃতি পরবর্তী সকল প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্যগণের দার্শনিক মতের প্রতিষ্ঠা।'[১৬]

অদ্বৈতবাদী শংকরাচার্য নির্গুণ ব্রহ্ম ব্যতীত সব কিছুকেই মায়া বলেছেন। ভক্তিমার্গের চার প্রধান শাখার দ্বৈতবাদী তাত্ত্বিকরা জগৎ-সংসারকে মায়া বলে উড়িয়ে দেননি। তাঁদের ব্রহ্ম নির্গুণ নন, সগুণ। নির্গুণ ব্রহ্ম অন্তরের ধন বা personal God হতে পারেন না। আর যদি শুধু ব্রহ্মকে স্বীকার করে অন্য সব মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়া হয় তা হলে ভক্তের স্থান কোথায়? ভক্তিমার্গের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়ে। শ্রী সম্প্রদায়ের পুরোধা ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের মুখ্য প্রবক্তা রামানুজাচার্য [খ্রীষ্টীয় ১১শ শতাব্দী]। তাঁর পূর্ববর্তী বোধায়ন, দ্রমিড় গুহদেব, শঠকদমন, নাথমুনি, যমুনা প্রভৃতি আচার্যগণও এই মতবাদ উপস্থাপন করেছিলেন। কিন্তু যুক্তি, প্রমাণ ও বিশ্লেষণ দ্বারা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করবার কৃতিত্ব রামানুজের। শংকরাচার্য নির্গুণ ব্রহ্ম ব্যতীত সবই মায়া বলেছেন; রামানুজাচার্যের মতে ব্রহ্ম সগুণ, তাঁকে বিশেষ বিশেষ গুণ দ্বারা বিশিষ্ট করা যায়। জীব ও জগৎ মায়া নয়, ব্রহ্মের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। সে যোগ কেমন? অগ্নির সঙ্গে উত্তাপের যেমন যোগ। উভয়ে এক নয়, অথচ পৃথক অস্তিত্বও অকল্পনীয়। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের মূল তত্ত্বটি এই: 'Its most striking feature is the attempt which it makes to unite personal theism with the philosophy of the Absolute. Two lines of thought, both of which can be traced far back into antiquity, meet here and in this lies the explanation of a great part of its appeal to the cultured as well as the common people.'[১৭]

ভক্তবৎসল বিষ্ণুকে রামানুজ ব্রহ্মরূপে গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতবাদ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বৈষ্ণবদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে।

রামানুজের পরেই তেলুগু ব্রাহ্মণ নিম্বার্কাচার্য [১০১৪-৬২ খ্রীঃ] উল্লেখযোগ্য বৈষ্ণবগুরু। ইনি বাস করতেন বৃন্দাবন অঞ্চলে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত দার্শনিক মতবাদ দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বা ভেদভেদবাদ নামে পরিচিত। কারণ, নিম্বার্কাচার্য জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে ভেদ ও অভেদ দুই-ই স্বীকার করেছেন। ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে একদিকে যেমন প্রভেদ আছে, তেমনি অন্য দিকে আছে একাত্মতা। এই জন্যই সনক সম্প্রদায়ের দার্শনিক মতবাদ দ্বৈতাদ্বৈত বা ভেদাভেদবাদ নামে পরিচিত। ব্রহ্ম, বিষ্ণু ও বিষ্ণুর অবতার শ্রীকৃষ্ণ এই সম্প্রদায়ের মতে অভিন্ন। পরবর্তীকালে নিম্বার্কের অনুগামীরা রাধাকৃষ্ণের আরাধনাকে সাধনার প্রধান অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করেন।

তৃতীয় বৈষ্ণবগুরু মধ্বাচার্য [১২৩৮—১৩১৭ খ্রীঃ] দ্বৈতবাদী হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে পার্থক্য আছে—তাঁরা অভিন্ন নন, এই

হল দ্বৈতবাদের মূলতত্ত্ব। পরমেশ্বর যে জীব থেকে ভিন্ন এটা স্বাভাবিক, কারণ ভক্ত হিসাবে জীব পরমেশ্বরের আরাধনা কি করে করবেন— যদি পার্থক্য না থাকে ? প্রভু ও ভৃত্যের মধ্যে যে ভেদ, পরমাত্মা ও জীবাত্মার মধ্যেও সেই ভেদ। তবে দ্বৈতবাদীদের প্রভু করুণাময়— তাঁর করুণা লাভ করলে সংসারের দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। হরি ও বিষ্ণু মধ্বাচার্যের অনুগামীদের উপাস্য দেবতা।

রুদ্র সম্প্রদায়ের প্রথম আচার্য বিষ্ণুস্বামী। কিন্তু বল্লভাচার্য [১৪৭৮-১৫৩০ খ্রীঃ] এই সম্প্রদায়কে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচার করে। কেবলাদ্বৈতবাদী শংকর ব্রহ্মকে নির্ধর্মক, নির্বিশেষ, নিরাকার ও নির্গুণ প্রমাণ করতে চেয়েছেন। ব্রহ্মসূত্রের কয়েকটি সূত্রের ব্যাখ্যা করে বল্লভাচার্য দেখালেন এই মতবাদ অশুদ্ধ। শংকর বলেছেন জগৎ মিথ্যা, কিন্তু শুদ্ধাদ্বৈতাবাদে জগৎ সত্য; পরম ব্রহ্ম সগুণ ও নিগুর্ণ দুই-ই ; তিনি সচ্চিদানন্দ এবং ভক্তির দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণরূপ ব্রহ্মকে লাভ করা সম্ভব।

জন্মসূত্রে দক্ষিণভারতীয় হলেও বল্লভাচার্য উত্তরভারতকে তাঁর সাধনক্ষেত্র করেছিলেন। ব্রজধামে তিনি কৃষ্ণের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে পূজা আরম্ভ করেন। বৈষ্ণব গুরুদের মধ্যে তিনি সম্ভবত আনুষ্ঠানিকরূপে কৃষ্ণপূজার প্রবর্তক। উত্তর-ভারতে কৃষ্ণের আরাধনা জনপ্রিয় করার মূলে বল্লভাচার্য এবং তাঁর পুত্র বিঠ্ঠলনাথের [১৫১৫-৮৫ খ্রীঃ] দান বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। হিন্দী কৃষ্ণকাব্য রচনার পশ্চাতেও ছিল তাঁদেরই প্রেরণা।

চৈতন্যদেব ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম

উপরোক্ত চার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সঙ্গে চৈতন্যদেবের [১৪৮৬-১৫৩৩ খ্রীঃ] নাম উল্লেখ করা হয়নি সঙ্গত কারণেই। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের উপর রামানুজ, মধ্বাচার্য, বল্লভাচার্য প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্যদের মতবাদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বল্লভাচার্য চৈতন্যদেবের সঙ্গে শাস্ত্রালোচনার জন্য এসেছিলেন। এই সাক্ষাৎকারের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাবে 'চৈতন্যচরিতামৃতে'। বিবিধ শাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও চৈতন্যদেব শাস্ত্রের ব্যাখ্যা দিয়ে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে আগ্রহী ছিলেন না। তাই পূর্বোক্ত বৈষ্ণবাচার্যদের মতো তিনি নিজে কোন ভাষ্য রচনা করেননি। কারণ চৈতন্যদেব মনে করতেন শ্রীমদ্ভাগবতই ব্রহ্মসূত্রের একমাত্র নির্ভরযোগ্য ভাষ্য। তথাপি পণ্ডিতদের সঙ্গে আলোচনায় চৈতন্যদেব বেদান্তের যে ব্যাখ্যা করেছেন তার সংগ্রহ ও সম্পাদনা করে প্রধানত 'ষট্সন্দর্ভ' ও 'সর্বসংবাদিনী' নামক দুটি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন জীব গোস্বামী। প্রকৃতপক্ষে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের তত্ত্ব-প্রতিষ্ঠাতা সনাতন, রূপ, জীব গোস্বামী এবং 'গোবিন্দভাষ্য' রচয়িতা বলদেব বিদ্যাভূষণ।

কিন্তু দার্শনিক তত্ত্ব বাংলার বৈষ্ণব ভক্তদের নিকট কোনোদিনই বড়ো হয়ে দেখা দেয়

নি। চৈতন্যদেব নিজের কৃষ্ণপ্রেমে উম্মাদ জীবন দিয়ে ভক্তিধর্মের এমন ব্যাখ্যা করেছেন যা কোনো পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষ্যের সাহায্যে সম্ভব নয়। রাগানুগা ভক্তির কথা পূর্বেও শাস্ত্রগ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছিল। কিন্তু চৈতন্যদেব রাগানুগা ভক্তিকে সাধনার মূলমন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করে ভক্তদের মধ্যে এর প্রচারের পথ উম্মুক্ত করে দিয়েছেন। রাগানুগা ভক্তির আবেশে ঈশ্বরকে মনে হয় আনন্দস্বরূপ ও প্রেমস্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণই ভক্তের একমাত্র আরাধ্যদেবতা। তিনি প্রেমময়, সুতরাং ভক্তকেও প্রেমিক হতে হবে। প্রচলিত ঈশ্বর ভাবনার বশবর্তী হলে কৃষ্ণকে আরাধনা করলে তাঁকে দূরে সরিয়ে রাখা হবে, আপনজনের মতো ভালোবাসা সম্ভব নয়। বিপিনচন্দ্র পাল এই প্রসঙ্গে বলেছেন: 'শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা মানুষই হউন আর ঈশ্বরই হউন বৈষ্ণব পদকর্তাগণ ইহাদিগকে মানুষরূপেই আঁকিয়াছেন। আর বৈষ্ণব সিদ্ধান্তেও শ্রীকৃষ্ণকে মানুষরূপেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে; ইহাই আমাদের [বাংলার] বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের বিশেষত্ব...মহাপ্রভু যে সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন তাহাতে শ্রীকৃষ্ণকে মানুষরূপেই দেখিতে পাই।...নররূপ যেমন শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সিদ্ধরূপ, নরধর্ম ও মানব প্রকৃতিও সেইরূপ তাঁর নিত্যসিদ্ধ। রূপে ও গুণে সকল দিক দিয়া তিনি মানুষ। তবে এই মানুষ অপূর্ণ, তিনি পূর্ণ। এই মানবরূপ ও মানুষী প্রকৃত বিকাশধারাতে তিলে তিলে ফুটিতেছে, তাঁর মধ্যে এ সকল নিত্যকাল প্রস্ফুট হইয়া আছে।'[১৮]

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনার পাঁচটি রস। ভারতের অন্য কোনো বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে এই প্রকার সাধনার কথা নেই। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচটি রস-সম্পর্কের সাহায্যে ভক্ত কৃষ্ণের সান্নিধ্যলাভ করতে পারেন। 'এই পঞ্চরস গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মূল কথা। বৈষ্ণবেরা নীতিশাস্ত্র, জ্ঞান ও কর্ম মানেন না— তাঁহারা বলেন— রসই সর্বপ্রধান— যাঁহার চিত্তে সেই অনুরাগ জন্মিয়াছে, তিনি নীতিবিগর্হিত কোন কর্ম করিতে পারেন না, তাঁহার পক্ষে তাহা অসম্ভব— সুতরাং নীতিকথা নীচেকার কথা।'[১৯]

এই পঞ্চরসের মধ্যে মধুর রসই সর্বোত্তম। তাই রাধাকৃষ্ণের প্রেম বৈষ্ণবের নিকট আদর্শস্থানীয়। ঈশ্বর ও ভক্তের মধ্যে সম্পর্ক হবে রাধাকৃষ্ণের সম্পর্কের মতো।

এই সম্পর্কের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, রাধা সর্বশক্তির আধার কৃষ্ণের হ্লাদিনী বা আনন্দদায়িনী শক্তি। শক্তি ও শক্তিধর অভিন্ন, রাধা ও কৃষ্ণ তাই অভিন্ন। কিন্তু দুই ভিন্নরূপ গ্রহণ না করলে ঈশ্বরের লীলা প্রকট হয় না। সেইজন্য রাধা-কৃষ্ণের, ভক্ত-ভগবানের, পৃথক অস্তিত্ব অনুভব করা প্রয়োজন। সুতরাং পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার ভেদ ও অভেদ দুই-ই আছে। এর প্রয়োজন এবং ভেদ ও অভেদ কল্পনা অচিন্ত্য বা অজ্ঞাত। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের এই হল দার্শনিক ভিত্তি— অচিন্ত্য-ভেদাভেদ নামে যা পরিচিত। কিন্তু তত্ত্ব অপেক্ষা রস ও প্রেমই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে প্রাধান্য লাভ করেছে।

চৈতন্যদেবের মতবাদ সংক্ষেপে একটি শ্লোকের মধ্যে বলেছেন ভাগবতের টীকাকার শ্রীনাথ চক্রবর্তী:

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শাস্ত্রং ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমথো মহান্
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভোর্মতামিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

অর্থাৎ ভগবান কৃষ্ণই আরাধ্য, তাঁহার ধাম শ্রীবৃন্দাবন, ব্রজবধূদের গৃহীত উপাসনা পদ্ধতিই ভালো, ভাগবতই শাস্ত্র, প্রেমই সাধনার কাম্য অর্থ, এই হইল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মত, আমাদেরও তাহাতেই পরম শ্রদ্ধা। (ক্ষিতিমোহন সেনের ভাবানুবাদ) [২০]

চৈতন্যদেবের অনেক পূর্বেই বাংলাদেশে বৈষ্ণবধর্মের প্রবর্তন হয়েছিল। বিষ্ণুপূজার প্রাচীনতম ঐতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া যায় বাঁকুড়া শহরের নিকটবর্তী শুশুনিয়া পাহাড়ের গুহায় উৎকীর্ণ রাজা চন্দ্রবর্মার এক শিলালেখ থেকে।[২১] চন্দ্রবর্মার রাজত্বকাল চতুর্থ শতাব্দী। তিনি চক্রস্বামী বা বিষ্ণুর ভক্ত বলে শিলালেখে উল্লেখ করা হয়েছে। পঞ্চম শতাব্দীতে বগুড়া জেলায় গোবিন্দস্বামীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ঐ শতকেরই সমাপ্তির সময় অথবা পরবর্তী শতকের প্রথমে হিমালয়ের অরণ্যসমাচ্ছন্ন পাদদেশে শ্বেতবরাহস্বামী ও কোকামুখস্বামীর মন্দির স্থাপিত হয়। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার অনুমান করেন এই দুটি বিষ্ণুমন্দির।[২২]

সপ্তম শতাব্দীর একটি শিলালেখে বাংলার পূর্বপ্রান্তে অনন্তনারায়ণের মন্দির প্রতিষ্ঠা ও তাঁর পূজার উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং বাংলার পশ্চিম, উত্তর ও পূর্বপ্রান্ত পর্যন্ত সর্বত্র বিষ্ণু বা কৃষ্ণের পূজা সপ্তম শতাব্দীর মধ্যেই বিস্তারলাভ করেছিল।

পূর্বেই বলা হয়েছে গুপ্ত সম্রাটরা নিজেরা ছিলেন পরম বৈষ্ণব এবং বৈষ্ণবধর্মের পৃষ্ঠপোষক। সুতরাং গুপ্তযুগে বাংলা দেশে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের প্রেরণা এসেছিল। পালরাজগণ বৈষ্ণব না হলেও বৈষ্ণবমন্দির, স্তম্ভ ইত্যাদি নির্মাণে যে সহায়তা করেছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

লক্ষ্মণ সেন ছিলেন পরম বৈষ্ণব। তাঁর আমলে বিষ্ণুস্তবের পর রাজকার্য শুরু হত। লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি জয়দেব রচিত 'গীতগোবিন্দ' [১২শ শতক] বৈষ্ণব সাহিত্যে এক যুগান্তকারী গ্রন্থ। 'গীতগোবিন্দে' বর্ণিত রাধাকৃষ্ণলীলা বহু কবির ভক্তিমিশ্রিত কল্পনা উদ্দীপ্ত করেছিল, এবং অসংখ্য ভক্ত বৈষ্ণবের ধ্যান ও কীর্তনের বিষয় হয়েছিল।

বর্তমানে বিষ্ণুর দশাবতার সম্পর্কে যে ধারণা প্রচলিত আছে, জয়দেবের পূর্বে ঠিক তেমনটি ছিল না। গীতগোবিন্দে বিধৃত দশাবতারের বর্ণনা এখন ভারতের সর্বত্র বৈষ্ণব সমাজে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

বাংলার ধর্মে কৃষ্ণলীলার প্রাধান্য যে ষষ্ঠ শতাব্দী বা তার পূর্ব থেকেই ছিল তার আর-এক প্রমাণ পাহাড়পুরের মন্দিরগাত্রের ভাস্কর্য। কৃষ্ণলীলার নানা দৃশ্য মন্দির-গাত্রে উৎকীর্ণ আছে। শ্রীকৃষ্ণের সংগে এক নারীমূর্তি একটি প্রস্তরে খোদিত দেখা

যায়। অনেকের ধারণা এই নারী রাধা। তা যদি সত্য হয় তা হলে এইটি রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি রূপে আত্মপ্রকাশের প্রাচীনতম নিদর্শন। অবশ্য মূর্তিটি রাধার নয়' রুক্মিণী বা সত্যভামার— এমন অভিমতও শোনা যায়।

জয়দেবের 'গীতগোবিন্দের' পর রাধাকে আমরা পাই বিদ্যাপতির পদাবলীতে এবং বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে।' চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বেই রাধা-কৃষ্ণের লীলাকাহিনী এইসব গ্রন্থের রচনামাধুর্যের গুণে ভক্তসমাজে প্রচারলাভ করেছিল।

এর পূর্বে মাধবেন্দ্র পুরী [খ্রীঃ ১৪শ শতক] ভাগবতে বর্ণিত কৃষ্ণলীলা ভিত্তি করে ভক্তিমার্গের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করেন। তাঁর শিষ্য ঈশ্বরপুরী ছিলেন চৈতন্যদেবের গুরু। চৈতন্যদেব শুধু বাংলাদেশে নয়, উড়িষ্যা, দাক্ষিণাত্য এবং অন্যান্য অঞ্চলে রাগাত্মিকা ভক্তির বাণী প্রচার করে বৈষ্ণব সাধনায় এক যুগান্তকারী উদ্দীপনার সৃষ্টি করেন। তাছাড়া তাঁরই দূরদর্শিতায় শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবতীর্থ বৃন্দাবন নতুন গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হয়। রূপ, সনাতন, জীব গোস্বামী এবং অন্যান্য বাঙালী বৈষ্ণবাচার্যগণের ঐকান্তিক সাধনায় বৃন্দাবন কৃষ্ণপ্রেমের উন্মাদনায় মুখর হয়ে ওঠে। চৈতন্যদেব-পরবর্তী গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় বৃন্দাবনের বৈষ্ণবাচার্যগণের নির্দেশের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল ছিলেন।

চৈতন্যদেবের তিরোধানের প্রায় তিন শতাব্দী পরেও বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব বাংলাদেশে কত বিস্তৃত ছিল ও গভীর ছিল তা জানা যায় বিদেশীদের বিবরণ থেকে : 'The Vaisnava Cult is one of the most important among the beliefs of the Province. Ward in 1815 stated that six out of ten of the whole Hindu Population were worshippers of Krishna (Hindoos ii, 158); in 1828 Wilson (Religious sects, i, 152) calculated them at one-fifth; and in 1872 Hunter (Orissa, i, 144) at from one-fifth one-third of the whole number of Hindus. Wise···from a catalogue of the Temples in the Dacca District found that 74 percent belonged to Krishna in one or other of his numerous forms···'[২৩]

কৃষ্ণলীলার সূত্রপাত : পুরাণে ও সাহিত্যে

কৃষ্ণকাব্য এবং পদাবলী সাহিত্যের রসাস্বাদনের জন্য বৈষ্ণবধর্ম ও দর্শনের যতটুকু পটভূমি একান্ত আবশ্যক উপরে ততটুকুই বিবৃত করা হয়েছে। আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যে কৃষ্ণলীলার আবির্ভাব আকস্মিক নয়। বেদ-উপনিষদ যুগের বিষ্ণু-নারায়ণ-কৃষ্ণ একেবারে পাঠকদের চমকিত করে লীলাকাহিনীর নায়করূপে আত্মপ্রকাশ করেননি। বিভিন্ন পুরাণ এবং সংস্কৃত ও অপভ্রংশ সাহিত্যের মধ্য দিয়ে কৃষ্ণের লীলাকাহিনী

বিবর্তিত হয়ে হিন্দী, বাংলা এবং অন্যান্য ভাষায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। কৃষ্ণের কাহিনী বলতে গিয়ে পরবর্তী কবিরা স্বভাবতই সংস্কৃত ও অপভ্রংশ সাহিত্যের ঐতিহ্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছেন।

কৃষ্ণলীলার কাহিনী খানিকটা সুসংবদ্ধরূপে প্রথম পাওয়া যায় পুরাণে। প্রধান পুরাণ আঠারোটি। পুরাণগুলিকে সাত্ত্বিক, রাজস্ ও তামস্ এই তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সাত্ত্বিক শ্রেণীব বিষ্ণু, ভাগবত, নাবদীয়, গরুড়, পদ্ম ও বরাহ-পুরাণে কীর্তন করা হয়েছে বিষ্ণুর মহিমা। রাজস্ ও তামস্ শ্রেণীভুক্ত পুরাণ যথাক্রমে ব্রহ্মা ও শিবের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছে।

হিন্দী ও বাংলা রাধাকৃষ্ণ-সাহিত্যেব উপব পুরাণের প্রভাব সুদূরপ্রসারী। ডঃ সুশীলকুমার দে বৈষ্ণবধর্মের উপব পুবাণের প্রভাব সম্বন্ধে যা বলেছেন, সাহিত্যে পুরাণেব প্রভাব সম্বন্ধে তা প্রযোজ্য। তিনি বলেছেন: 'In spite of much learned writing, the mediaeval expansion of the faith was essentially popular in character and appeal. After the epics and the philosophics came the popular Puranas, which set forth the Krisna-legend against the exuberant and luscious background of myth, theology and mystical eroticism.'[২৪]

বিষ্ণুকেন্দ্রিক পুবাণগুলির মধ্যে ভাগবতই ভক্তিধর্মের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এই গ্রন্থ আঠাবো হাজার শ্লোকে সম্পূর্ণ, বারোটি স্কন্ধে এবং বত্রিশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। দশম স্কন্ধে কৃষ্ণের বাল্য, কৈশোর ও যৌবনলীলার বিবরণ আছে। গোপিনীদের সংগে কৃষ্ণেব প্রেমসম্পর্ক যে নারী-পুরুষের সাধারণ আকর্ষণ নয়, তার মধ্যে যে রহস্যময়তা আছে, লোকোত্তর ইংগিত আছে, তা ভাগবতের বর্ণনা থেকে উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু রাধা নামটি ভাগবতে উল্লেখ করা হয়নি। 'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্ [১৩।২৮],' একথা বলা হলেও ভাগবতই বেদ-উপনিষদের বিষ্ণু-কৃষ্ণকে ভক্তের অন্তরের ধন করে তুলেছে। বাসুদেব-কৃষ্ণের নরলীলার কাহিনী এখানে পরিবেশন করা হয়েছে। ভগবান নেমে এসেছেন ভক্তেব কাছে মানুষের রূপ নিয়ে। তিনি মানুষ হলেও নরোত্তম, সকল মানবিক গুণের পূর্ণতার প্রতীক।

পদ্ম ও বিষ্ণুপুরাণেও কৃষ্ণের লীলাকাহিনী আছে। কিন্তু ভাগবতের বিবরণের মতো তা ভক্তের হৃদয়ে স্থান পায়নি। তথাপি পদ্মপুরাণের কোনো কোনো ভাবধারা বৈষ্ণবধর্ম ও কাব্যকে যে প্রভাবিত করেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ভগবানকে নারীরূপে ভজনা করা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের একটি মূল তত্ত্ব। কয়েকটি উপাখ্যানের সাহায্যে এই তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডে। অনেক মুনি শ্রীকৃষ্ণের শৃংগাররসের মূর্তি ধ্যান করতে করতে গোপীরূপে রূপান্তরিত হয়ে পরমাত্মায় লীন হয়ে গিয়েছেন।

পাতালখণ্ডে রাধাকৃষ্ণের অষ্টপ্রাহরিক লীলার যে বিশদ বর্ণনা আছে তা পরবর্তী কবিদের অনুপ্রাণিত করেছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত গোবিন্দলীলামৃত এর

প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

অন্যান্য শ্রেণীর কয়েকটি পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের কথা আছে। এদের মধ্যে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ অন্যতম। এই পুরাণের চতুর্থ খণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন, মথুরা ও দ্বারকার বিভিন্ন লীলাকাহিনী স্থান পেয়েছে। পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ বলেছেন: '...the Brahmavaivarta Purana is the chief authority on the new school of Vaishnavism or Radha-Krishna cult."[২৫]

তাঁর মতে এই পুরাণ 'erotic Vaishnavism'-এর অগ্রদূত। রাধার জন্মের এক কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী পাওয়া যায় ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে।

আদমের পাঁজরের অস্থি থেকে ইভের সৃষ্টির অনুরূপ রাধার আবির্ভাব হয়েছে শ্রীকৃষ্ণের বক্ষপিঞ্জরের বাঁ দিক থেকে। অবশ্য অনেকের মতে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ অর্বাচীন রচনা। সুতরাং এর প্রভাবের মূল্য অপেক্ষাকৃত কম।

পরবর্তীকালের ভক্তিধর্মে, ভক্তিসাহিত্যে এবং কাব্যসাহিত্যে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রভাব সর্বাপেক্ষা বেশি। অনেক হিন্দী ও বাংলা কৃষ্ণকাব্য ভাগবতের লীলা বর্ণনার ছায়ানুসরণ মাত্র। ভাগবত বা বিষ্ণুপুরাণের কৃষ্ণলীলা কেন্দ্র করেই বড়ু চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচনা করেছেন। মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধের ভাবানুবাদ, কোথাও কোথাও বা হুবহু অনুবাদ। কবিশেখরের গোপাল বিজয় এবং রঘু পণ্ডিতের [ভাগবতাচার্য] কৃষ্ণ প্রেমতরঙ্গিণী একান্তরূপে ভাগবত-নির্ভর কাব্য। এই প্রসঙ্গে ডঃ সুশীলকুমার দে বলেছেন: 'The Srimad Bhagavata is indeed the one great purana which appears to have exercised an enormous influence on the development of Bhakti ideas in mediaeval time.'[২৬]

পুরাণের অনেক পূর্বে মহাভারতে কৃষ্ণের অন্য রূপ পাওয়া যায়। এখানে গোপিনীদের সঙ্গে তাঁর লীলাখেলার কথা নেই। মহাভারতের কৃষ্ণ কর্মবীর এবং বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ্। দেশের সামাজিক অবস্থা পরিবর্তিত হবার ফলে একই কৃষ্ণের দুই যুগে দুই রূপ পাই। বঙ্কিমচন্দ্র মহাভারতের কৃষ্ণের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।[২৭]

মহাভারতের সম্পূরক অংশ খিল হরিবংশে শ্রীকৃষ্ণের লীলাকাহিনী আছে। বিশেষজ্ঞদের মতে হরিবংশ অনেক পরে রচিত হয়েছিল এবং এটি মহাভারতের প্রক্ষিপ্ত অংশ। প্রকৃতপক্ষে হরিবংশ একটি পুরাণ।

সংস্কৃত কৃষ্ণকাহিনী-নির্ভর কাব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মাঘের শিশুপালবধ। কৃষ্ণের জীবনকথা এই প্রসিদ্ধ কাব্যের বিষয়বস্তু।

কীথ সাহেবের মতে সংস্কৃত নাটকের সূত্রপাত হয়েছিল কৃষ্ণলীলা কাহিনী অবলম্বন করে।[২৮] পতঞ্জলির মহাভাষ্যে কৃষ্ণ কর্তৃক কংসবধের নাট্যরূপ উপস্থিত করবার কথা আছে। খ্রীস্টপূর্ব ১৫০/২০০ বছরে এরূপ অভিনয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। বিখ্যাত নাট্যকার ভাস কংসবধ পর্যন্ত কৃষ্ণের বাল্যলীলাকে বিষয়বস্তু করে বালচরিত

রচনা করেছেন।

সংস্কৃতে লিখিত কৃষ্ণ-বিষয়ক স্তোত্রকাব্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দক্ষিণ-ভারতের সাধক বিল্বমঙ্গল বা কৃষ্ণলীলাশুক রচিত কৃষ্ণকর্ণামৃত। রচনার সময় নবম হতে চতুর্দশ শতক। এই কাব্যের ভাষা সুমধুর, ভাব অতীব উচ্চ। ভাষা ও ছন্দের দিক দিয়ে জয়দেবের গীতগোবিন্দকে স্মরণ করিয়ে দেয়। বিল্বমঙ্গল মধুর রসের কবি। চৈতন্যদেব ভাগবত-নির্ভর কাব্য কৃষ্ণকর্ণামৃতের পাঠ শুনে আনন্দলাভ করতেন :

চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক-গীতি, কর্ণামৃত, শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ-রামানন্দ-সনে মহাপ্রভু রাত্রি-দিনে, গায়, শুনে পরম আনন্দে।[২৯]

জয়দেব ছিলেন লক্ষ্মণ সেনের অন্যতম সভাকবি। তাঁর গীতগোবিন্দের রচনাকাল খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতক। বিশুদ্ধ গীতিকবিতা ও গীতিনাট্যের লক্ষণ এই কাব্যে যুগপৎ পাওয়া যায়। রাধা-কৃষ্ণের মিলনলীলা কবি দ্বাদশ সর্গে বর্ণনা করেছেন। বসন্ত সমাগমে শ্রীকৃষ্ণকে গোপীদের সঙ্গে রাসলীলায় মত্ত দেখে রাধার অভিমান হল, কৃষ্ণ তাঁর মান ভাঙালেন অনেক অনুনয়-বিনয় করে। শেষ সর্গে কবি এঁকেছেন পূর্ণ মিলনের চিত্র।

ভারতীয় সাহিত্যে গীতগোবিন্দের প্রভাব অপরিসীম। ভাষা, ছন্দ, অলংকার, ইত্যাদির প্রভাব পড়েছে পরবর্তী যুগের পদাবলী সাহিত্যে। বহু কবি গীতগোবিন্দের অনুকরণে কাব্য রচনা করেছেন। বিদ্যাপতির মত প্রতিভাবান কবিও নিজেকে "অভিনব জয়দেব" আখ্যায় ভূষিত করে গৌরববোধ করতেন। রাধা-কৃষ্ণলীলা কাহিনী জনপ্রিয় করতে এই গেয় নাট্যরসাশ্রিত কাব্যের দান অসামান্য।

ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার বলেছেন : "জয়দেবের গীতগোবিন্দ রাধাকৃষ্ণের লীলা-কীর্তনের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে একটি আলোকস্তম্ভ। ইহাতে আমরা রাধাকৃষ্ণের কেবলমাত্র বিহার নহে—উপাসনারও প্রকৃষ্ট পরিচয় পাই।"[৩০]

পরবর্তীকালের সাহিত্যের উপর গীতগোবিন্দের প্রভাব সম্বন্ধে ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন : "It would not be an exaggeration to say that the middle Bengali-nay, even to a large extent, modern Bengali lyrics of Vaishnava inspiration are based on the songs of the Gitago-vinda."[৩১]

জয়দেবের প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে কাশ্মীরের কবি ক্ষেমেন্দ্র দশাবতার-চরিত কাব্য রচনা করেছিলেন। বিষ্ণুর দশ অবতারের বর্ণনা করেছেন কবি। নবম অবতার বুদ্ধ। রচনাশৈলীতে জয়দেবের পূর্বাভাস পাওয়া যায়।

প্রকীর্ণ গীতিকবিতায় পদাবলীর পূর্বাভাস

কৃষ্ণ-বিষয়ক এমন একটি গ্রন্থের উল্লেখ করা হল যাদের কমবেশি প্রভাব আধুনিক-

ভারতীয় সাহিত্যের প্রথম পর্বের কৃষ্ণকাব্যের উপর পড়েছে। এ ছাড়া পদাবলী সাহিত্য প্রভাবান্বিত হয়েছে সংস্কৃত ও অপভ্রংশে রচিত বহু সংখ্যক বহুল প্রচারিত প্রকীর্ণ গীতিকবিতার দ্বারা। ছন্দ, রূপকল্প ও মেজাজের দিক থেকে বিচার করলে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। এই সব প্রকীর্ণ গীতিকবিতার বিষয়বস্তু সকল ক্ষেত্রে রাধাকৃষ্ণের লীলার ওপর নির্ভরশীল নয়। প্রাত্যহিক জীবনের, পরিচিত নিসর্গ বর্ণনার এবং লৌকিক প্রেমের চিত্র বৈষ্ণব কবিরা এখান থেকে গ্রহণ করে অলৌকিক ভগবৎ প্রেমে রূপান্তরিত করেছেন। নানাদিক থেকে এই প্রকীর্ণ সংস্কৃত ও প্রাকৃত কবিতাবলী বৈষ্ণব গীতিকবিতার যথার্থ পূর্বসূরী। উভয় শ্রেণীর গীতিকবিতা আলোচনা করলে স্পষ্টই উপলব্ধি করা যায় যে, বৈষ্ণব কবিতা ভারতীয় কাব্যধারার ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। লৌকিক ভাবানুভূতির কবিতাকে বৈষ্ণব কবিরা অলৌকিক স্তরে উন্নীত করেছেন। তাঁদের নবত্ব ও কৃতিত্বের অন্যতম কারণ এই।

প্রকীর্ণ গীতিকবিতাগুলি বিভিন্ন কোষগ্রন্থে নিবন্ধ হয়েছে। তা থেকেই এঁদের জনপ্রিয়তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সাতবাহন নৃপতি হাল কর্তৃক সংকলিত গাথা-সপ্তশতী কালানুক্রমিকতার দিক থেকে প্রাচীনতম কোষগ্রন্থ। হাল খ্রীস্টীয় প্রথম শতকে জীবিত ছিলেন বলে ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাক মনে করেন।[৩১] মহারাষ্ট্রীয় প্রাকৃতে রচিত সাতশত শ্লোক হাল সংকলন করেছেন; এর মধ্যে তাঁর নিজের রচনা চুয়াল্লিশটি। হাল বলেছেন, তিনি এক কোটি প্রাকৃত শ্লোক থেকে নির্বাচন করেছেন মাত্র সাতশত।[৩২] প্রাকৃত কাব্য সাহিত্যের প্রাচুর্যে বিস্মিত হতে হয়। আনন্দবর্ধন, মম্মটভট্ট, প্রভৃতি আলংকারিকরা গাথাসপ্তশতী থেকে দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করেছেন।

গাথাসপ্তশতীতে আদিরসাত্মক প্রেমের প্রাধান্য। পরকীয়া প্রেমের শ্লোক আছে চব্বিশ-পঁচিশটি। এক অজ্ঞাতনামা কবি বলেছেন: অমৃততুল্য প্রাকৃত কাব্য (গাথা-সপ্তশতী) না পড়ে অথবা না শুনে প্রেমের তত্ত্ব আলোচনা করতে লজ্জাবোধ হয় না কেন?[৩৩]

রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক শ্লোক অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কয়েকটি। এখানেই রাধার নাম যে প্রথম পাওয়া যায় শুধু তাই নয়, তিনি যে কৃষ্ণের সর্বাধিক প্রিয়পাত্রী তারও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পোট্টিস্ নামক কবি লিখছেন:

মুহ-মারুএণ তং কন্‌হ গো রঅং রাহিআএ অবণেন্তো।
এতাণ বল্লরীণং অন্নাণ বি গোর অং হরসি ॥ ১।৮৯

—হে কৃষ্ণ, তুমি ফুঁ দিয়ে রাধিকার মুখের ধুলা অপসারণ করে এই গোপীদের এবং অন্যান্য রমণীদের গৌরব অপহরণ করেছ।

চণ্ডীদাসের পদাবলীতেও যে গাথাসপ্তশতীর প্রভাব পড়েছিল তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন:

কালি বলি কালা গেল মধুপুরে
সে কালের কত বাকি।

যৌবন-সায়রে সরিতেছে ভাঁটা
তাহারে কেমনে রাখি ॥
জোয়ারের পানি নারীর যৌবন
গেলে না ফিরিবে আর।
জীবন থাকিলে বঁধুরে পাইব
যৌবন মিলান ভার ॥[৩৪]

কয়েক শতাব্দী পূর্বে এই সুরটিই ধ্বনিত হয়েছিল পবনরাজের একটি শ্লোকে :

ণই ঔর সচ্ছহে জোব্বণম্মি অই পবসিএসু দিঅসেসু।
অণিঅত্তাসু অ রাইসু পুত্তি বিং দড্ঢ মাণেণ ॥[৩৫]

—ওগো তরুণী, যৌবন যখন নদীতে বন্যাপ্রবাহের মতো চঞ্চল এবং দিনগুলি চিরদিনের জন্য হারিয়ে যায় এবং হারানো রাত্রিগুলি আর কখনো ফিরে আসে না, তখন তোমার রাহুগ্রস্ত মান নিয়ে এত গর্ব করবার কি আছে?

বাঙালী বৌদ্ধপণ্ডিত বিদ্যাকর সংকলিত সুভাষিত রত্নকোষে (৭০০-১১০০ খ্রীঃ রচিত) গীতিকবিতা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিদ্যাকর একাদশ শতকের শেষার্ধে সংকলনটি সম্পূর্ণ করেছেন বলে অনুমান করা হয়।[৩৬] এফ. ডবলু টমাস সম্পাদিত কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয় নামক সংকলন গ্রন্থটির সঙ্গে সুভাষিত রত্নকোষের নির্বাচিত কবিতায় অনেক ক্ষেত্রে মিল দেখা যায়। সেজন্য কেউ কেউ মনে করেন যে সুভাষিত রত্নকোষ ও কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয় একই সংকলন গ্রন্থের পরিবর্তিত রূপ। সুভাষিত রত্নকোষে ১০০০ থেকে ১৭২৮টি পর্যন্ত কবিতা পাওয়া গেছে। কবিদের মধ্যে বাঙালীর প্রাধান্য লক্ষণীয়।

গোবিন্দদাসের বিখ্যাত পদ: 'কণ্টকগাড়ি কমলসমপদতল' পড়তে গিয়ে সুভাষিত রত্নকোষের 'মার্গে পঙ্কিনি তোয়দান্ধতমসে' কবিতাটি মনে পড়ে যায়। গোবিন্দদাসের রাধিকার ন্যায় সংস্কৃত কবির অভিসারিকা নিজের ঘরের মধ্যে অন্ধকার কর্দমাক্ত পথেই চলা অভ্যাস করছেন। যোগেশ্বরের একটি কবিতায় বলা হয়েছে: 'বর্ষার রাত্রিতে নিঃসঙ্গ; আকাশ মেঘাচ্ছন্ন; চন্দ্রতারকা অদৃশ্য হয়ে বুঝি নিদ্রামগ্ন; কদম ফুলের গন্ধ ভিজে বাতাস ভেদ করে ছড়িয়ে যাচ্ছে দিকবিদিকে; নিশ্ছিদ্র অন্ধকার ভারী হয়ে উঠেছে ভেকের কান্নায়। এমন রাত্রিতে প্রিয়কে ছেড়ে কি করে থাকা যায়?' (২২০ নং)

নিঃসঙ্গ প্রেমিকের এই অনুভূতি বিদ্যাপতির পদে প্রতিধ্বনিত হয়েছে:

এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর। ইত্যাদি।

কয়েকটি কবিতায় রাধাকৃষ্ণের প্রণয়ানুভূতির কথাও ব্যক্ত করা হয়েছে। এমনি একটি—

ময়াম্বিষ্টোঃ ধূর্তঃ স সখি নিখিলামেব রজনীম্
ইহ স্যাদত্র স্যাদিতি নিপুণমন্যামভসৃতঃ।

ন দৃষ্টো ভাণ্ডীরে তটভুবি ন গোবর্ধনগিরের্
ন কালিন্দ্যাঃ কূলে ন চ নিচুলকুঞ্জে মুররিপুঃ ॥ ১৯ নং ॥

সখী রাধাকে জানাচেছ, কৃষ্ণকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। সারা রাত ধূর্ত কৃষ্ণকে এখানে ওখানে খুঁজেছি ; অন্য কোনো নারীর সঙ্গে রাত কাটাচেছ কিনা তাও দেখেছি। বটগাছের নীচে, গোবর্ধনগিরির সানুদেশে, কালিন্দীর কূলে, বেতস-কুঞ্জে— কোথাও তাঁকে পাওয়া গেল না।

শ্রীধরদাস সংকলিত সদুক্তিকর্ণামৃতে (১২০৬ খ্রীঃ) ২৪০০ নির্বাচিত সংস্কৃত শ্লোক পাওয়া যায়। লেখকদের মধ্যে বাঙালী কবির সংখ্যা প্রায় তিন শত। সদুক্তি-কর্ণামৃতে পার্থিব ও কৃষ্ণপ্রেমের কবিতা ছাড়াও সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কতকগুলি চিত্তগ্রাহী চিত্র পাওয়া যায়। সুভট রচিত এই কবিতায় অভিসারিকার উন্মাদনার বর্ণনা পাই :

অবলোক্য নর্তিত শিখণ্ডি মণ্ডলে-
র্নবনীরদৈ র্নিচলিতং নভস্থলম্।
দিবসেঽপি বঞ্জুলনিকুঞ্জমিত্বরী-
বিশতিস্ম বল্লভবতংসিতং রসাৎ ॥ ২।৬৩।১।

অর্থাৎ, যে নবীন মেঘ ময়ূরদের নৃত্যশীল করে, সেই মেঘ আকাশ ঢেকে ফেলেছে দেখে অভিসারিকা দিনের বেলাতেই রসাবিষ্ট হয়ে বল্লভভূষিত বঞ্জুলকুঞ্জে প্রবেশ করল।

দিবাভিসারের এই তন্ময়তা গোবিন্দদাসের রাধার মধ্যেও দেখা যায়—

গগনহি নিমগন দিনমণি-কাঁতি।
লখই না পারিয়ে কিয়ে দিন রাতি ॥
ঐছন জলদ কয়ল আঁধিয়ার।
নিয়ড়হিঁ কোই লখই নাহি পার ॥
চলু গজগামিনি হরি অভিসার।
গমন নিরঙ্কুশ মদন বিথার ॥[৩৭]

লক্ষ্মণসেনের একটি সুন্দর শ্লোকে রাধাকৃষ্ণের গোপন মিলনের কথা কেমন করে প্রকাশ হয়ে পড়ল তার বর্ণনা আছে। এক সরল রাখাল বালক সকলের সামনে কৃষ্ণের হাতে একটি মালা দিয়ে বলল, কৃষ্ণ, দেখ কোন গোপীর কেশগুচ্ছ তোমার মালার সঙ্গে জড়িয়ে আছে। আমি কুঞ্জে পেয়েছি। বালকের কথা শুনে রাধা ও কৃষ্ণ লজ্জায় মাথা নিচু করে রইলেন।

দ্বাদশ শতকের পূর্ববর্তী কবিরা রাধাকৃষ্ণের নাম উল্লেখ না করেও পূর্বরাগ, অভিসার, মিলন, বিরহ ইত্যাদি বিভিন্ন পর্যায়ের প্রেমের কবিতা রচনা করেছেন। শ্রীধরদাস এই সব বিভিন্ন কবিতাগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করে সাজিয়েছেন। যেমন সদুক্তি-কর্ণামৃতে অভিসারিকাকে চার শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে : দিবসাভিসারিকা ; তিমিরাভিসারিকা ; জ্যোৎস্নাভিসারিকা এবং দুর্দিনাভিসারিকা।[৩৮] এই শ্রেণী বিভাগের রীতি মোটামুটিরূপে বৈষ্ণব কবিরাও গ্রহণ করেছিলেন।

আর-একটি উল্লেখযোগ্য প্রাকৃত কবিতার সংকলন, প্রাকৃতপৈঙ্গল। আনুমানিক চতুর্দশ শতকে এই সংকলনটি সম্পূর্ণ হয়। পৈঙ্গলের লৌকিক অনুভূতির কবিতা ছায়া ফেলেছে বৈষ্ণব কাব্যে। চার লাইনের ছোট্ট একটি কবিতায় বিরহের সুর কেমন সুন্দরভাবে ধ্বনিত হয়েছে :

সো মহ কন্তা
দূর দিগন্তা।
পাউস আ-এ
চেউ চলাএ ॥[৩৯]

অর্থাৎ, আমার প্রিয়তম এখন দিগন্তশায়ী দূর দেশে ; বর্ষা আসে। চিত্ত চঞ্চল হয়।

রাধিকার সঙ্গে কৃষ্ণের ছলা-কলা সম্বন্ধীয় একটি শ্লোক :

'অরে রে বাহহি কাহ্ণ, ণাব ছোড়ি ডগমগ কুগতি ণ দেহি।
তই ইথি ণই হি সন্তার দেই, জো চাহহি সো লেহি ॥'[৪০]

হে কৃষ্ণ, নৌকা বেয়ে চলো ; ছোটো নৌকা টলমল করছে, আমাকে কোনো দুর্বিপাকে ফেলো না, নদী পার করে দাও, তারপর যা চাইবে তাই নিও।

এই শ্লোকটির প্রায় ভাবানুবাদ পাওয়া যায় বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে

দশনেত তৃণ ধরি বোলোঁ মো তোমারে।
যেই চাহ সেই দিবোঁ কর মোরে পারে ॥[৪১]

উপরে শুধু কয়েকটি কোষগ্রন্থে বিধৃত কয়েকজন কবির রচনা থেকে দৃষ্টান্ত দেওয়া হল। এইসব দৃষ্টান্ত থেকে উপলব্ধি করা যাবে যে ত্রয়োদশ শতকের প্রকীর্ণ কবিতাগুলি হিন্দী কৃষ্ণকাব্যের এবং বাংলা পদাবলী সাহিত্যের ভূমিকা রচনা করেছিল। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সদুক্তিকর্ণামৃত সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন তা সাধারণভাবে সকল সংস্কৃত ও প্রাকৃত প্রকীর্ণ কবিতা সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। তিনি বলেছেন : 'We find quite an anticipation of Middle Bengali poetic literature and even of modern Bengali poetry, in a number of these Slokas. For the study of the poetic literature of Bengali, the Sadukti-Karnamrita can certainly be considered as one of its basic sources although it is couched in the Sanskrit language.'[৪২]

পদাবলী

বৈদিক যুগ থেকে পুরাণ পর্যন্ত কৃষ্ণকাহিনীর বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জীবনের বিচিত্র কাব্যরূপও বিবর্তিত হয়েছে। সংস্কৃত, প্রাকৃত, প্রাচীন তামিল প্রভৃতি ভাষার কবিদের রচনায় রাধার আবির্ভাব অনেক পরে হলেও ভারতীয় সাহিত্যে তাঁর আগমন আকস্মিক নয়। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার যথার্থই বলেছেন : 'দ্বাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে সহসা জয়দেব অজ্ঞাত অখ্যাত রাধাকে লইয়া কাব্য রচনা করেন নাই ইহা

বুঝা প্রয়োজন। শ্রীরাধার অভিসার, মান, রাস, কুঞ্জভঙ্গ, বিরহ প্রভৃতি লইয়া তামিল, প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষায় বহু কবি বহু পদ ও শ্লোক জয়দেবের পূর্বে ও সমসময়ে লিখিয়াছিলেন।'[৪৩]

ভারতের পূর্বাঞ্চলে নতুন ধারায় পদাবলী রচনার গুরু জয়দেব। কিন্তু তাঁর পূর্বেও কৃষ্ণকাব্য প্রচলিত ছিল। যদিও পদাবলী বলতে আমাদের প্রথমেই মনে পড়ে বিশেষ কিছু গুণসম্পন্ন বাংলা বৈষ্ণবকাব্য, বৃহত্তর অর্থে ভারতের সকল ভাষাতেই বিভিন্নরূপে ও নামে কৃষ্ণ-বিষয়ক পদাবলী রচিত হয়েছে। আড়বার ভক্তগণ তামিল ভাষায় যে গেয় কাব্য রচনা করেছেন তা 'প্রবন্ধম্' নামে পরিচিত। হিন্দীতে পদাবলীর পরিবর্তে সাধারণত বলা হয় কৃষ্ণকাব্য। পশ্চিম ভারতে এ ধরনের ভক্তিগীতি 'বাণী' নামে পরিচিত। গদাধর ভট্টের একটি গীতি-সংকলনের নাম 'মোহিনীবাণী'।

পদাবলীর উৎকর্ষ এসেছে ধীরে ধীরে ক্রমবিবর্তনের পথে। সংস্কৃত ও প্রাকৃত প্রকীর্ণ কবিতা যে এর ভূমিকা রচনা করেছে তা পূর্বেই দেখানো হয়েছে। বাংলা পদাবলীর উপর গীতগোবিন্দের সরাসরি প্রভাব অনস্বীকার্য। মৈথিলী ভাষায় রচিত হলেও বিদ্যাপতির কৃষ্ণগীতি বাংলার বৈষ্ণব কবিদের নানা দিক থেকে প্রভাবান্বিত করেছে। চর্যাপদ. মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়, পৌরাণিক কাহিনীর লৌকিক গাথারূপ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পদাবলী রচনার পথ প্রশস্ত করেছে। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের মধ্যে বাংলা পদাবলী সাহিত্যের প্রথম নির্দেশিকা পাওয়া যায়।

পদাবলী (স্ত্রী) শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল পদসমুচ্চয় বা পদের শ্রেণী (পদানাং আবলী)। এখন পদ শব্দের অর্থ কি দেখা দরকার। ঋগ্বেদের আমল থেকেই পদ শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। 'পদ' শব্দের গান বা গীতিকাব্য অর্থটি বোধ হয় ঋগ্বেদের পরে এসেছে। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ বলেন: ' ·পদের অর্থই গান। খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতকে রচিত ভরতের নাট্যশাস্ত্রে 'পদ' শব্দে গান বা গীতিকেই লক্ষ্য করা হয়েছে। খ্রীস্টীয় চারশো-দুশো শতকের মহাকাব্য রামায়ণ মহাভারত ও হরিবংশে এবং এমনকি খ্রীস্টীয় শতকের প্রথম ভাগের পঞ্চরাত্র সংহিতা ও পুরাণ-সংহিতাগুলিতে গান বা গীতির দ্যোতক 'পদ' ব্যবহার দেখা যায়। রামায়ণে (বালকাণ্ডে, ৪র্থ সর্গ) 'বিচিত্রার্থপদং সম্যগ গায়কৌ সমচোদয়ৎ' বা 'অনগায়তাং মার্গবিধানসম্পদা' শ্লোকাংশে 'পদ' শব্দে গান বুঝিয়েছে।'[৪৪]

ভরত (আনুমানিক খ্রীঃ চতুর্থ-পঞ্চম শতক) নাট্যশাস্ত্রে 'গান্ধর্বমিতিবিজ্ঞেয় স্বরতালপদাশ্রয়ম্' (২৮।৮) এবং 'গান্ধর্বং ত্রিবিধং বিদ্যাৎ স্বরতালপদাত্মকম্' (২৮।১২) শ্লোকাংশ দুটিতে গান বা সংগীত অর্থেই 'পদ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

কালিদাসের (খ্রীস্টীয় ১ম-৪র্থ শতক) রচনাবলীর অনেক জায়গায় এরূপ গান বা সংগীত অর্থে 'পদ' শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়। মেঘদূতের নিম্নলিখিত শ্লোকে এই অর্থে 'পদ' শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে:

'উৎসঙ্গে বা মলিনবসনে সৌম্যঃ নিক্ষিপ্য বীণাং
মদ্গোত্রাঙ্কং বিরচিতপদং গেয়মুদ্গাতুকামা।

তন্ত্রীমার্দ্রাং নয়ন সলিলৈঃ সারয়িত্বা কথঞ্চিদ্
ভুয়োভুয়ঃ স্বয়মপি কৃতাং মূর্চ্ছনাং বিস্মরন্তী ॥'[৪৫]

অর্থাৎ, মলিনবসনা বিরহিনী কোলের উপর বীণা রেখে গান করছে। তার নিজের রচিত সেই গান আমারই কথায় পূর্ণ। গাইতে গিয়ে চোখের জলে বীণার তার বারবার সিক্ত হয়ে সুর ভুল হয়ে যায়।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালে বৌদ্ধ চর্যাগানের যে পুঁথি আবিষ্কার করেন তার উল্লেখ আছে 'চর্যাপদ' হিসাবে। সুতরাং বাংলা ভাষাতেও গান অর্থে 'পদ' শব্দের ব্যবহার হাজার বারোশ বছর আগে থেকে চলে আসছে। পদাবলী শব্দটির বিশেষ অর্থে প্রচলন হয় ৯ম-১২শ শতকে— এমন অনুমান করা যেতে পারে। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাবে ঐ সময় পর্যন্ত পদ বলতে প্রায়ই বোঝাত গানের দুটি লাইন বা couplet।

যতদূর জানা যায়, 'পদসমুচ্চয়' অর্থে পদাবলীর প্রথম ব্যবহার করেছেন অষ্টম শতকের প্রথমার্ধের আলংকারিক দণ্ডী তাঁর কাব্যাদর্শে: 'শরীরং তাবদিষ্টার্থব্যবচ্ছিন্ন পদাবলী' (১।১০)। কিন্তু এখানে পদ শব্দের অর্থ 'শব্দ', গান কিংবা গীতিকবিতা নয়। শার্ঙ্গদেব (১৩শ শতকের প্রথমার্ধ) নিজে সংগীতজ্ঞ হলেও পদ যে শব্দ অর্থেও ব্যবহার হতে পারে তা স্বীকার করেছেন: 'তাতাহন্যবাচকং পদম্।'[৪৬] মল্লিনাথ সমর্থন করে বলেছেন: 'অর্থপ্রকাশকং পদং', অর্থাৎ, যা অর্থ প্রকাশ করে তা-ই পদ। অবশ্য অন্যান্য টীকাকারেরা সংগীতরত্নাকরের পরিপ্রেক্ষিতে 'পদ' শব্দকে গীত অর্থেই গ্রহণ করেছেন।

সংস্কৃতে লিখিত হলেও জয়দেবের গীতগোবিন্দ বাংলা বৈষ্ণব পদাবলীর প্রেরণাস্থল। বাঙালী কবি রচিত পদাবলীর যে বৈশিষ্ট্য আমাদের মুগ্ধ করে তার সূচনা জয়দেব করেছিলেন নিম্নলিখিত শ্লোকে:

যদি হরি স্মরণে সরসং মনো
যদি বিলাস কলাসু কুতূহলম্।
মধুর কোমল কান্ত পদাবলীং
শৃণু তদা জয়দেব সরস্বতীম্ ॥[৪৭]

যদি হরি স্মরণ করে মন সরস করবার আকাঙ্ক্ষা থাকে, যদি তাঁর লীলাকলাদি সম্বন্ধে জানবার কৌতূহল থাকে, তবে জয়দেব রচিত এই মধুর কোমলকান্ত পদাবলী শ্রবণ করুন। 'মধুর কোমলকান্ত' এই হল পদাবলীর বৈশিষ্ট্য। মধুর কোমল এবং হৃদয়গ্রাহী পদাবলীর প্রথম রচয়িতা জয়দেব। এমন সংগীতময় মর্মস্পর্শী শ্লোক পূর্বে রচিত হয়নি।

বাংলা বৈষ্ণব পদাবলী

ভারতের সকল আঞ্চলিক ভাষার সাহিত্যেই পদাবলীর ভাষা অন্য শ্রেণীর কবিতার ভাষা থেকে পৃথক। ভক্তিরসাপ্লুত ভাবের স্নিগ্ধতাই এই পার্থক্যের প্রধান কারণ।

বাঙালী কবির রচিত পদাবলীর ভাষা মোটামুটি দুটি— বাংলা ও ব্রজবুলি। পদাবলী ব্যতীত অন্যত্র ব্রজবুলির ব্যবহার নেই। সুতরাং ব্রজবুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

ব্রজবুলি কথাটির প্রচলন উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে হয়নি। বৈষ্ণব পদাবলীর ভাষা স্বভাবতই ব্রজবুলির ভাষা হবে এই রকম ধারণার বশবর্তী হয়ে নাম দেওয়া হয়েছিল ব্রজবুলি। ষোড়শ থেকে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ব্রজবুলি পদাবলী রচনায় ব্যবহৃত হয়েছে।

ব্রজবুলির সর্বশেষ সার্থক প্রয়োগ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। বঙ্কিমচন্দ্র এবং মধুসূদনও ব্রজবুলিতে পদ রচনা করেছিলেন।

অধ্যাপক সুকুমার সেন বলেন : 'ব্রজবুলির বীজ লৌকিকের (অর্বাচীন অবহট্‌ঠের), অঙ্কুরোদ্‌গম মিথিলায় এবং প্রতিরোপণ বাংলায়।'[৪৮]

উমাপতির ও বিদ্যাপতির পদাবলী বাঙালী, অসমীয়া ও ওড়িয়া বৈষ্ণব কবিদের বিশেষরূপে প্রভাবিত করেছিল। সেই সূত্রে প্রাচীন মৈথিল ও বাংলার সঙ্গে কিছু হিন্দী শব্দের মিশ্রণের ফলে ব্রজবুলির সৃষ্টি হয়েছে।

অসমীয়া ও ওড়িয়া কবিরা স্থানীয় শব্দও কিছু কিছু ব্যবহার করেছেন। তৎসম শব্দের প্রাচুর্য ব্রজবুলির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। ব্রজবুলির প্রাচীনতম কবি যশোরাজ খান। ব্রজবুলিতে রচিত তাঁর 'এক পয়োধর চন্দন লেপিত' পদটির রচনাকাল আনুমানিক ১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীস্টাব্দ।

বৈষ্ণব কবিরা ব্রজবুলি কেন ব্যবহার করেছেন এ প্রশ্ন উঠতে পারে। প্রথমত, কৃত্রিম ভাষার একটা নিজস্ব আকর্ষণ আছে। পালি, প্রাকৃত ও অপভ্রংশও মিশ্রিত কৃত্রিম ভাষা। আমাদের সাহিত্যে এদের প্রয়োগ আছে। দ্বিতীয়ত, দৈনন্দিন ব্যবহারে ক্ষয়ে যাওয়া ভাষা অপেক্ষা একটি নতুন অপরিচিত ভাষায় অতীন্দ্রিয় অনুভূতির প্রকাশ অধিকতর ইঙ্গিতময় হয়ে ওঠে। তৃতীয়ত, ব্রজবুলির লালিত্য মধুর কোমলকান্ত পদাবলী রচনার পক্ষে বিশেষ উপযোগী।[৪৯]

কয়েকজন বাঙালী কবি ব্রজধামের ভাষা ব্রজভাখাতেও পদ রচনা করেছেন। পরমানন্দ ও কৃষ্ণানন্দ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। বৈষ্ণব পদাবলীর প্রাচীন সংকলনগ্রন্থে বাঙালী ও অবাঙালী কবি রচিত ব্রজভাখার পদাবলী অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।[৫০]

বিহার, বাংলা, আসাম ও উড়িষ্যার বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যকে যে ব্রজবুলি ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করেছিল তাতে ভুল নেই। ছন্দ, অলংকার, বাক্‌প্রতিমা প্রভৃতির জন্য বৈষ্ণব কবিরা সংস্কৃত সাহিত্যের নিকট সর্বাধিক ঋণী। রাধাকৃষ্ণের লীলাকাহিনী এবং ভক্তিধর্মের সারতত্ত্ব সর্বভারতীয়। সুতরাং বাংলা পদাবলী ও হিন্দী কৃষ্ণকাব্য সর্বভারতীয় কাব্যধারা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও আঞ্চলিক ভাষার পদাবলী সাহিত্য স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল।

ভারতীয় ভক্তিসাহিত্যে ও রসসাহিত্যে বাংলা ভাষার পদাবলী এক বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন, চৈতন্যদেবের প্রত্যক্ষ প্রভাব, বাংলা ভাষার লালিত্য এবং বাঙালী কবিদের রসানুভূতির প্রাবল্য মিলিতভাবে এই বৈশিষ্ট্য সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে।

বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনে বৈষ্ণব পদাবলীর এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। সাহিত্য, ধর্ম ও সংগীতের অপূর্ব সামঞ্জস্যপূর্ণ মিলন ঘটেছে বৈষ্ণব পদাবলীতে। ধর্মের গণ্ডী অতিক্রম করে বাঙালীর হৃদয় সাংস্কৃতিক জীবনে পদাবলী আপন স্থান করে নিয়েছে। অন্য ভাষার পদাবলী সাধক ও ভক্তদের নিকট মুখ্যত ভজন হিসাবে সমাদৃত। কিন্তু বাংলা পদাবলী বাঙালীর জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রায় পাঁচশত বৎসর যাবৎ পদাবলী বাঙালীর সাহিত্য সংগীত ও অধ্যাত্মরসের পিপাসা তৃপ্ত করে এসেছে। বর্তমানে পদাবলীর প্রভাব ক্ষীণ হলেও শতাধিক বৎসর পূর্ব পর্যন্ত বৈষ্ণব কবিদের রচিত গীতিকবিতা ছিল আমাদের ধর্ম ও সংস্কৃতির অন্যতম নিদর্শন।

বৈষ্ণব পদাবলী বৈষ্ণব সাধনার বিশিষ্ট অঙ্গ। কবিরা ছিলেন সাধক এবং বিভিন্ন শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। সুতরাং পদাবলীর সাহিত্যমূল্য যাই হোক না কেন, বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনই এর মূল ভিত্তি। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতাদর্শের সঙ্গে পরিচয় না থাকলে পদাবলীর রস সম্যক আস্বাদন করা সম্ভব নয়। পদাবলীর রচয়িতারা শুধু কবিত্বশক্তির অধিকারী ছিলেন না, তাঁরা সাধক এবং শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন— এজন্য এঁদের মহাজনও বলা হত।

ভক্ত ভগবানের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপন করে তাঁকে হৃদয়ের ধন করে তোলেন। এই সম্পর্ক পাঁচ প্রকারের এবং তা থেকে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর— এই পাঁচটি রসের সৃষ্টি হয়। এদের মধ্যে শেষোক্ত তিনটি রসই প্রধানত পদাবলীর উপজীব্য। বৈষ্ণব দর্শনে প্রেমের স্থান ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের উপরে। তাই পদাবলীতে শৃঙ্গার রসের প্রাধান্য। তবে এই প্রাধান্য বিশেষ করে বাংলার পদাবলীতে। চৈতন্যদেবের জীবন-সাধনার প্রভাবেই তা হয়েছে। দক্ষিণ ভারতের আড়বার সম্প্রদায়ের অন্যতম কবি অণ্ডাল, বিখ্যাত সাধিকা মীরা বাঈ ও অন্যান্য বহু সাধক কবি নিজেদের আরাধ্য দেবতার প্রিয়তমা হিসাবে কল্পনা করে পদ রচনা করেছেন। কিন্তু বাংলার মহাজনেরা চৈতন্যদেবকে রাধার আসনে বসিয়ে নিজেরা সখীরূপে ভক্তিরসাপ্লুত চিত্তে রাধাকৃষ্ণের লীলা প্রত্যক্ষ করেছেন, এখনও তা সেই লীলা সম্বর্ধনে সহায়তা করেছেন।

পদাবলীর মুখ্য বিষয়বস্তু শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা ও বৃন্দাবনলীলা। এর মধ্যে বৃন্দাবনলীলাই প্রাধান্য লাভ করেছে। চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের পরে তাঁর পুণ্য জীবনলীলা নিয়েও পদাবলী রচিত হতে থাকে। চৈতন্যবিষয়ক পদাবলী এই কটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে (১) চৈতন্য বন্দনা, (২) বাল্যকাল থেকে সন্ন্যাস গ্রহণ পর্যন্ত জীবনলীলা; (৩) চৈতন্যের ভাবোন্মাদ।

এই তো গেল পদাবলীর ধর্মের দিক। সাহিত্য হিসাবে পদাবলী গীতিকবিতার মর্যাদা পেতে পারে। বস্তুতপক্ষে পদাবলী আধুনিক বাংলা গীতিকবিতার উৎস-স্বরূপ। সুষ্ঠু শব্দ নির্বাচন, ছন্দের লালিত্য, বাক্‌প্রতিমার চমৎকারিত্ব এবং অনুভূতির গভীরতায় সাহিত্য-রসিকের মনে পদাবলীর আবেদন আলোড়ন সৃষ্টি করে। তবে আধুনিক গীতিকবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য যে আত্মমুখীনতা, পদাবলীতে তার অভাব আছে। পদাবলী কবির নিজস্ব সুখদুঃখ-সঞ্জাত অনুভূতির প্রতিফলন নয়। গোষ্ঠীগত ধর্মসাধনার ব্যক্তিনিরপেক্ষতা পদাবলীর বৈশিষ্ট্য।

সীমিত বিষয়বস্তু উপজীব্য বলে পদাবলী সাহিত্যে পুনরুক্তি দোষ ঘটেছে। একই ভাব, দৃশ্য, ঘটনাসংস্থান, উপমা ইত্যাদি বারবার ফিরে এসেছে বিভিন্ন পদে। তার ফলে চৈতন্যদেবের তিরোধানের শতাব্দীকালের মধ্যেই পদাবলী প্রাণহীন পুনরাবৃত্তিতে পরিণত হয়েছিল।

লৌকিকের আধারে অলৌকিককে ধরে রাখবার তীব্র ব্যাকুলতা পদাবলীর মধ্যে একটি রোমান্টিক আর্তির সুর এনেছে। সুদূরের জন্য এই রোমান্টিক পিপাসা গীতিকবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

পদাবলীর কবিরা ছিলেন সংস্কৃত সাহিত্যে ও অলংকারশাস্ত্রে পণ্ডিত। তাই অনেক ক্ষেত্রে সংস্কৃত ছন্দের অনুকরণ পাওয়া যায় পদাবলীতে। সাধারণত অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত এবং মিশ্র ছন্দে বৈষ্ণব কবিরা পদাবলী রচনা করেছেন।

পৃথিবীর সকল ধর্মের সাধন পদ্ধতিতেই সংগীতের প্রয়োগ দেখা যায়। আমরাও ঋগ্বেদের যুগ থেকে ভগবানের বন্দনায় ও আরাধনায় সংগীতের সহায়তা নিয়েছি। পদাবলীও ভজন হিসাবে রচিত, গীত হলেই তার রস সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা যায়। ভগবানের মহিমা ভক্তের হৃদয়ে মুদ্রিত করবার উদ্দেশ্যে যখন গান করা হয় তখন তাকে বলা হয় কীর্তন। কীর্তন-বিশারদ খগেন্দ্রনাথ মিত্র বলেছেন : 'ভগবদ্‌-ভক্তির জন্য যে গুণকথন, লীলাবর্ণন প্রভৃতির প্রয়োজন তাহা হইতেই সংগীতের নাম হইয়াছে কীর্তন। সুতরাং ভগবদ্‌ বিষয়ক সংগীত ব্যতীত অন্য সংগীতকে কীর্তন নামে অভিহিত করা যায় না।'[১]

রূপগোস্বামীর সংজ্ঞা অনুসারে কীর্তন তিন প্রকার : নামকীর্তন, গুণকীর্তন এবং লীলাকীর্তন। নামকীর্তন ও গুণকীর্তন শুনে শুনে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অচলা ভক্তি জাগ্রত হলেই লীলাকীর্তন শোনবার অধিকার জন্মে। লীলাকীর্তন অনধিকারীর পক্ষে চিত্তচাঞ্চল্যের কারণ হতে পারে।

কীর্তনের জন্যই পদাবলীর এমন জনপ্রিয়তা সম্ভব হয়েছে। পদাবলীর অনুভূতি সুরের মধ্য দিয়ে ভক্তের হৃদয় যেমনভাবে আপ্লুত করতে পারে শুধু কাব্যপাঠে বা শ্রবণে তা সম্ভব নয়। বিচ্ছিন্ন পদগুলিকে কৃষ্ণের বাল্য, গোষ্ঠ, রাস, প্রভৃতি লীলা হিসাবে গ্রথিত করে পালাকীর্তন সংকলন করায় শ্রোতাদের আগ্রহ বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে এক-একটি লীলাকে কেন্দ্র করে রসের সাবলীল বিস্তার সহজ হয়। রূপ-গোস্বামীর উজ্জ্বলনীলমণিতে নির্দেশিত রীতি অনুসারে রাধা-কৃষ্ণলীলাকে পালা-

কীর্তন হিসাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

বিবর্তনের ধারা অনুসারে পদাবলীর ইতিহাস তিনটি স্তরে বিভক্ত করা যায় : (১) চৈতন্যপূর্ববর্তী পদাবলী ; (২) চেতন্যসমকালীন পদাবলী ; (৩) চেতন্য-পরবর্তী পদাবলী।

ষোড়শ শতাব্দী বাংলা পদাবলী সাহিত্যের স্বর্ণযুগ। এই স্বর্ণযুগের মূল উৎস চেতন্যদেব। দিব্যোন্মাদের পর থেকে তিনিও পদাবলীর বিষয় হিসাবে বৈষ্ণব কবিদের নিকট সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি পেলেন। সুতরাং পূর্বেকার রাধা-কৃষ্ণের লীলার সঙ্গে পদাবলীতে যোগ হল চৈতন্যলীলা। বাংলা পদাবলীর এই বৈশিষ্ট্য অন্যান্য আঞ্চলিক সাহিত্যের কৃষ্ণকাব্যে স্বভাবতই অনুপস্থিত।

প্রাক্-চৈতন্য যুগ পদাবলী সাহিত্যের প্রস্তুতির যুগ। জয়দেবের গীতগোবিন্দ এবং বিদ্যাপতির মৈথিল পদাবলী যে ভূমিকা রচনা করেছিল, বড়ু চণ্ডীদাস এবং মালাধর বসু তাকে সার্থক পদাবলী রচনার পথে অনেক দূর এগিয়ে নিয়েছিলেন। তার পূর্বে অবশ্য আমরা পেয়েছি খ্রীস্টীয় দশম-দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত চর্যাপদ। প্রথম যুগের বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গে চর্যাপদের গঠনগত মিল কিছু থাকলেও আত্মিক মিল কম।

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচনাকাল আনুমানিক চতুর্দশ শতাব্দী। চণ্ডীদাস নামধারী পদকর্তা কয়জন ছিলেন সেই বিতর্কে আমাদের প্রয়োজন নেই। নানা প্রমাণ উল্লেখ করে পণ্ডিতরা সিদ্ধান্ত করেছেন বড়ু চণ্ডীদাস চেতন্যদেবের পূর্ববর্তী এবং 'দীন' ও দ্বিজ' চণ্ডীদাস চৈতন্যের সমসাময়িক অথবা পরবর্তীকালের পদকর্তা।

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পদের সংগ্রহ নয়। রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়লীলার কাহিনী অবলম্বন করে কবি গীতগোবিন্দের মতো গীতিনাট্য রচনা করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম থেকে কংসবধের জন্য মথুরা গমন এবং রাধার বিরহ-বিলাপ পর্যন্ত কাহিনী পাওয়া গেছে। এর পরে পুঁথি খণ্ডিত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন জন্ম, দান, নৌকা, বৃন্দাবন বংশী, রাধাবিরহ প্রভৃতি তেরোটি খণ্ডে বিভক্ত। কৃষ্ণ, রাধা ও বড়াই-এর উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়ে কাহিনী অগ্রসর হয়েছে এবং এর ফলে সৃষ্টি হয়েছে নাট্যরস। পরবর্তীকালের পদাবলীর সুর অনেক উক্তির মধ্যেই পাওয়া যায়। বিশেষ করে বিরহোৎকণ্ঠা রাধার বিলাপ পদাবলীর মাধুর্যে পূর্ণ। বংশীখণ্ডের এমনি কয়েকটি পংক্তি বিলাপোক্তির দৃষ্টান্ত হিসাবে উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

'কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নইকূলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে ॥
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন ॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন্ জনা।
দাসী হআঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা ॥

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি চিত্তের হরিষে।
তার পাএ বড়ায়ি মোঁ কৈলোঁ কোন দোষে॥
আঝর ঝরএ মোর নয়নের পানী।
বাঁশীর শবদে* বড়ায়ি হারায়িলোঁ পরাণী॥
আকুল করিতে* কিবা আহ্মার মন।
বাজাএ সুসর বাঁশী নান্দের নন্দন॥
পাখি নহোঁ তার ঠাঁই উড়ী পড়ি জাওঁ*।
মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ*॥
বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জাণী।
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী॥'[৫২]

গীতিনাট্য হিসাবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নানাবিধ গুণ আছে। কিন্তু কবি রাধিকার বিরহের আর্তি প্রকাশেই আশ্চর্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। পদাবলী সাহিত্যেরও প্রধান সুর বিরহের। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধাবিরহের অংশগুলি পরবর্তীকালের মাথুর পদাবলীর উপর ছায়াপাত করেছে।

চৈতন্যচরিতামৃতে বলা হয়েছে, চৈতন্য চণ্ডীদাসের পদাবলীর রসাস্বাদন করতেন। চরিতামৃতের আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলায় চারবার এই বিষয়ের উল্লেখ আছে। আদি লীলার ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে—

বিদ্যাপতি জয়দেব চণ্ডীদাসের গীত।
আস্বাদেন রামানন্দ-স্বরূপ-সহিত॥[৫৩]

চৈতন্যদেব যে চন্ডীদাসের পদ আস্বাদন করতেন তিনি তাঁর পূর্ববর্তী অথবা সমসাময়িক। কিন্তু নানা কারণে পূর্ববর্তী হওয়াই অধিকতর যুক্তিযুক্ত মনে হয়। তবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি বড়ু চণ্ডীদাসের পদ যে গৌরাঙ্গ আস্বাদন করতেন না তা একপ্রকার নিশ্চিত রূপেই বলা যেতে পারে। কারণ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অনেক অংশে এমন রুচির পরিচয় পাওয়া যায় যে চৈতন্যের পক্ষে এই কাব্য আস্বাদন করা সম্ভব নয়। তা ছাড়া শ্রীকৃষ্ণকীর্তন যদি তাঁর সমাদর লাভ করত তা হলে এই গ্রন্থ এমন করে বিস্মৃতির গর্ভে হারিয়ে যেত না। সুতরাং মনে হয় পদাবলীর কবি দ্বিতীয় চণ্ডীদাসের রচনা চৈতন্য আস্বাদন করতেন।

পদকর্তা চণ্ডীদাসের যথার্থ কালনিরূপণে যত মতভেদই থাক, তিনি চৈতন্যের পূর্ববর্তী অথবা সমকালীন হন, তাঁর কাব্যের উৎকর্ষ সম্বন্ধে কিন্তু দ্বিমত নেই। বিদ্যাপতির মতো চণ্ডীদাসের পদাবলী হয়ত ছন্দ, উপমা, বাক্‌প্রতিমা ও শব্দ-সম্ভারে সমৃদ্ধ নয়। কিন্তু সহজ অথচ প্রাণস্পর্শী ভাষায় চণ্ডীদাস আধ্যাত্মিক প্রেমের যে রহস্যানুভূতি সৃষ্টি করেছেন তার তুলনা নেই। চণ্ডীদাসের ভাবসম্মেলনের পদাবলী সম্বন্ধে দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন যে এদের 'স্তোত্ররূপে পাঠ করা যায়,' এরা 'প্রেমের সুগভীর মন্ত্র'।[৫৪]

চণ্ডীদাসের রাধা যোগিনী, তাঁর প্রেম কাম ও স্বার্থবোধের ঊর্ধ্বে। যোগিনী

রাধার চিত্র পাই এই পদটিতে—

আগো রাধার কি হলো অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকই একলে
না শুনে কাহার কথা॥
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে
না চলে নয়নের তারা।
বিরতি আহারে রাঙ্গা বাস পরে
যেন যোগিনীর পারা॥
এলাইয়া বেণী খুলয়ে গাঁথনি
দেখয়ে আপন চুলি।
হসিত বয়ানে চাহে মেঘ পানে
কি কহে দু'হাত তুলি॥[৫৫]

সন্ন্যাসবেশী চৈতন্যদেবের কৃষ্ণের জন্য ব্যাকুলতা দেখেই কি লেখা, না তাঁর আবির্ভাবের পূর্বাভাস কবির রচনায় ধরা পড়েছে? কৃষ্ণকে ভালোবেসে রাধা সকল গঞ্জনা হাসিমুখে সইতে পারেন:

কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোক—
তাহাতে নাহিক দুখ।
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ॥[৫৬]

রাধার এই নিঃশেষে আত্মনিবেদনমূলক প্রেমই জনমানসে পদাবলীর সঙ্গে চণ্ডীদাসের নাম অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত করেছে।

বর্ধমান জেলার কুলীনগ্রাম নিবাসী মালাধর বসু রচিত শ্রীকৃষ্ণবিজয় প্রাক্-চৈতন্য যুগের কৃষ্ণলীলা বিষয়ক একটি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। মালাধর সুলতান রুকনুদ্দীন বারবাক শাহের কাছ থেকে 'গুণরাজ খান' উপাধি পেয়েছিলেন। ১৪৮০ খ্রীস্টাব্দে শ্রীকৃষ্ণবিজয় সম্পূর্ণ হয়। কাব্যটি যথেষ্ট জনসমাদর লাভ করেছিল। চৈতন্যদেব স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের রসাস্বাদন করতেন। মালাধর বসুর পুত্রদের নিকট তিনি এই কাব্যের গুণ কীর্তন করেছেন— বিশেষ করে 'নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ' অংশটির।

বাংলায় ভাগবতের রসসমৃদ্ধ অনুবাদের অন্যতম পথিকৃৎ মালাধর বসু। শ্রীকৃষ্ণবিজয় ভাগবতের কয়েকটি স্কন্ধের অনুসরণে রচিত হলেও কোথাও কোথাও মৌলিক কবিত্বের সুর সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে এবং ঐ সব অংশগুলিতে বৈষ্ণব পদাবলীর পূর্বাভাস পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে:

কৃষ্ণ গেলে মরিব সখী তাহে কিবা কাজ।
কৃষ্ণের সাক্ষাতে মৈলে কৃষ্ণ পাবে লাজ॥
অল্প ধনলোভ লোকে এড়াইতে পারে।
কানু হেন ধন সখী ছাড়ি দিব কারে॥[৫৭]

চৈতন্যদেবের সমসাময়িক পদকর্তাদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় যশোরাজ খানের। ইনি ছিলেন হোসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯) সভাসদ। ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন যশোরাজ খান কৃষ্ণলীলা বিষয়ক একটি পাঁচালী রচনা করেছিলেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না। যশোরাজ খান পদাবলী সাহিত্যে স্থান লাভ করেছেন ব্রজবুলিতে রচিত তাঁর একটিমাত্র পদের জন্য। সেই বিখ্যাত পদটি হল

এক পয়োধর চন্দন লেপিত
আরে হজই গোর। ইত্যাদি

মুরারি গুপ্ত বয়সে কয়েক বছরের বড়ো হলেও চৈতন্যদেবের সহপাঠী ছিলেন। তিনি সংস্কৃতে প্রাচীনতম চৈতন্য-জীবনী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্ রচনা করেছেন।

'গৌরনাগর' তত্ত্বের প্রবক্তা নরহরি সরকার ছিলেন চৈতন্যের ভক্ত। শ্রীখণ্ডনিবাসী বৈদ্যবংশোদ্ভূত এই কবির পদের সঙ্গে অষ্টাদশ শতকের কবি নরহরি চক্রবর্তীর পদ মিশে যাওয়ায় কিছু বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। চৈতন্যদেবের রাধাভাব এবং কৃষ্ণভাব অবলম্বন করে তিনি কয়েকটি আবেগাপ্লুত পদ রচনা করেছেন। নরহরি সরকার পঞ্চদশ শতকের শেষভাগ থেকে ষোড়শ শতকের প্রথম পাদ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন বলে অনুমান করা হয়।

শিবানন্দ সেন ও তাঁর পুত্র পরমানন্দ কয়েকটি করে পদ রচনা করেছেন। পরমানন্দ অবশ্য কবি কর্ণপুর হিসাবেই পরিচিত এবং তিনখানি সংস্কৃত গ্রন্থের জন্যই তাঁর খ্যাতি। এদের মধ্যে চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের প্রসিদ্ধি সবচেয়ে বেশি। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে কবি কর্ণপুর জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৫২৪ খ্রীস্টাব্দে।[৫৮]

গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ এবং বাসুদেব ঘোষ তিন ভাই ছিলেন চৈতন্যের ভক্ত। গোবিন্দ ও মাধব কয়েকটি পদ রচনা করেছেন; গায়ন-ভজন-কীর্তনেই ছিল তাঁদের অনুরক্তি। তাঁদের সুমধুর কীর্তন সম্বন্ধে চৈতন্যচরিতামৃতে এবং অন্যত্র উল্লেখ পাওয়া যায়। বাসুদেব প্রায় ১১৮টি পদ রচনা করেছিলেন। চৈতন্যের সমসাময়িক কবিদের মধ্যে এত অধিক সংখ্যক পদ আর কেউ রচনা করেননি। তিনি কৃষ্ণলীলা এবং গৌরাঙ্গলীলা— এই উভয় বিষয় সম্বন্ধে পদ লিখেছেন। প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে গৌরাঙ্গলীলার পদগুলি তাঁর হাতে অধিকতর উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বাসুদেব বাংলা বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য বাৎসল্যরসের কবি।

অন্যান্য পদকর্তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য যদুনন্দন, যদুনাথ দাস, গোবিন্দ আচার্য, মাধব দাস, বংশীবদন, অনন্তদাস, শিবরাম প্রভৃতি। 'চৈতন্যের অন্তরঙ্গ বন্ধু'[৫৯] রায় রামানন্দ ছিলেন উড়িষ্যাবাসী; কিন্তু ব্রজবুলিতে তাঁর পদ 'পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল। অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল' বাংলাদেশে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

চৈতন্যের সমকালীন পদাবলী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় পদকর্তাদের নিকট কৃষ্ণ

অপেক্ষা চৈতন্য প্রাধান্য লাভ করেছেন। চৈতন্যের লীলা প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ পাওয়াতেই এটা সম্ভব হয়েছে। বিশ্বম্ভর সন্ন্যাস গ্রহণ করায় শচীর মাতৃহৃদয়ের যে বেদনা তা বৈষ্ণব কবিদের মন গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। এই সূত্র ধরেই বাংলা বৈষ্ণব পদাবলীতে বাৎসল্যরসের শুরু হয় বলা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। আধুনিক ভারতীয় ভাষায় শ্রীচৈতন্যই প্রথম ঐতিহাসিক মহামানব যিনি কাব্যের বিষয়বস্তু হয়েছিলেন। তাঁর পূর্ববর্তী সাহিত্যের নায়ক-নায়িকারা ছিলেন পৌরাণিক চরিত্র। চৈতন্যচরিত-গ্রন্থ বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য-ভাগবতে প্রথম একজন মহামানবের জীবনকথা বর্ণনা করা হয়েছে। এদিক থেকে বিচার করলে বলা যায় চৈতন্যের সমকালীন কবিরা মর্তের মানবকে মর্যাদা দিয়ে আধুনিক সাহিত্যের সূত্রপাত করেছিলেন।

১৫৩৩ খ্রীস্টাব্দে চৈতন্যদেবের তিরোধানের পর থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাপ্তি পর্যন্ত, এমনকি রবীন্দ্রনাথের ভানুসিংহের পদাবলীর প্রকাশকাল পর্যন্ত (১৮৮৪ খ্রীঃ) চৈতন্য-পরবর্তী পদাবলীর যুগ বিস্তৃত। এই কালখণ্ডের মধ্যে বহু কবি অসংখ্য পদ রচনা করেছেন। এই সময়ের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কবি জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরামদাস প্রভৃতি।

জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস চৈতন্য-পরবর্তী যুগের পদাবলী সাহিত্যের স্তম্ভস্বরূপ। বর্ধমান জেলার কাঁদরা গ্রামে জ্ঞানদাসের জন্ম হয়। জন্মের তারিখ ঠিক জানা যায় না, তবে বিভিন্ন সূত্র থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, ষোড়শ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে অষ্টম দশক পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। জ্ঞানদাস ছিলেন চৈতন্যের গুণমুগ্ধ ভক্ত এবং নিত্যানন্দের শিষ্য। তিনি বাংলা এবং ব্রজবুলি এই উভয় ভাষাতেই পদ রচনা করেছেন। তাঁর পূর্বরাগ ও আক্ষেপানুরাগ সম্বন্ধীয় পদগুলিই রচনাসৌকর্যে উৎকৃষ্ট। জ্ঞানদাস চণ্ডীদাসের যোগ্য উত্তরাধিকারী। ভাব, ভাষা ও মেজাজের দিক দিয়ে উভয়ের রচনায় যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। তবে জ্ঞানদাসের শিল্পবোধ যে সদা সচেতন তা তাঁর পদ অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করলেই উপলব্ধি করা যায়। চণ্ডীদাসের মধ্যে সাধকসত্তাই প্রাধান্য লাভ করেছে।

জ্ঞানদাসের—

> 'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
> প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥'

এবং

> 'তোমার গরবে গরবিনী হাম রূপসী তোমার রূপে।
> হেন মনে লয় ও দুটি চরণ সদা লয়্যা রাখি বুকে॥'

প্রভৃতি বহু পদের অপূর্ব ভাবব্যঞ্জনা আজও বাঙালীর চিত্ত মুগ্ধ করে, এখনও এই সব পদগুলি লোকের মুখে মুখে শোনা যায়।

গোবিন্দদাস বহু উৎকৃষ্ট পদ রচনা করেছেন। ব্রজবুলির কবি হিসাবে তিনি যে

শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করতে পারেন সে বিষয়ে অনেকেই একমত। বর্ধমান জেলার কুমারনগরে তাঁর জন্ম। জন্মের সময় ঠিক জানা যায় না, তবে আনুমানিক ১৫২০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৬১০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে তিনি জীবিত ছিলেন।

ভাব ও আঙ্গিকের দিক থেকে বিদ্যাপতির সঙ্গে তাঁর অনেক মিল দেখা যায়। তাই তাঁকে কেউ কেউ 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি' আখ্যা দিয়েছেন। গোবিন্দদাস সচেতন শিল্পী। তাঁর ছন্দজ্ঞান নিখুঁত, আঙ্গিক সযত্ন-রচিত, শব্দঝংকারে তিনি অতুলনীয়। অভিসারের, বিশেষ করে বর্ষাভিসারের পদ রচনায় তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। অল্প কয়েকটি কথায় পরিবেশ রচনায় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন গোবিন্দদাস। বর্ষার এই ছবিটি মাত্র দুটি পংক্তিতে কেমন সুন্দর ফুটেছে :

চৌদিশে অথির পবন ভোর, দোল।
জগভার শীকর নিকর হিলোল ॥[৬০]

বাৎসল্য রসের উৎকৃষ্ট পদকর্তা হিসাবে বলরাম দাস এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। বলরাম দাসের হাতে এই শ্রেণীর পদ বিচিত্ররূপে বিকাশলাভ করেছে। চণ্ডীদাসের মতো বলরাম দাসের সংখ্যা নিয়েও সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। বাৎসল্য রসের কবি বলরাম দাসের জন্মস্থান কৃষ্ণনগরের নিকটবর্তী দোগাছিয়া। ষোড়শ শতকের শেষভাগে তিনি জীবিত ছিলেন বলে অনুমান করা হয়।

আরো অনেক কবি উৎকৃষ্ট পদ রচনা করেছেন। খ্যাত-অখ্যাত সকল ভক্ত কবির রচনা বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করেছে।

আমরা পূর্বেই বলেছি ষোড়শ শতাব্দী পদাবলী সাহিত্যের স্বর্ণযুগ। শ্রীচৈতন্যের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি ছিল মূল প্রেরণা। তাঁর তিরোধানের পর বৈষ্ণব সমাজে যে শূন্যতা অনুভূত হল তা কিছুটা পূর্ণ করেছিলেন বৃন্দাবনের ষড়্গোস্বামীরা তাঁদের রচিত বৈষ্ণব শাস্ত্রগ্রন্থাদি প্রচার করে। এঁরা 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের দার্শনিক ভিত্তি রচনা করে আবেগের ধর্মকে সুদৃঢ় মননের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন।'[৬১] বৃন্দাবনের গোস্বামীদের প্রভাব বৈষ্ণব সমাজের উপর পড়তে আরম্ভ করে ষোড়শ শতকের শেষভাগে। এই সম্পর্কে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার বলেন, 'ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে গোপাল ভট্ট গোস্বামীর শিষ্য শ্রীনিবাস আচার্য এবং শ্রীচৈতন্যের সহচর লোকনাথ গোস্বামীর শিষ্য নরোত্তম ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন হইতে গোস্বামীদের রচিত কাব্য, নাটক, অলংকারাদি অধ্যয়ন করিয়া আসিলেন। তাঁহারা বাংলাদেশে এসব গ্রন্থের প্রচার করেন। তাহার ফলে পদাবলী উজ্জ্বলনীলমণি ও স্তবাবলীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়।'[৬২]

ধর্মের ক্ষেত্রে শাস্ত্রগ্রন্থ আবেগ রুদ্ধ করল, সহজ স্বতঃস্ফূর্ত ঈশ্বরোপাসনার স্থান অধিকার করল শাস্ত্রনির্দিষ্ট অনুষ্ঠান। তেমনি পদাবলীও বাধা পড়ল উজ্জ্বলনীলমণি ও ভক্তিরসামৃতসিন্ধু নির্দেশিত রীতি ও রসশাস্ত্রের গণ্ডীর মধ্যে। এই বন্ধন পদাবলীর কাব্যধর্ম বিকাশের সহায়ক হয়নি। পরিণামে সপ্তদশ শতকের প্রথম থেকেই পদাবলী সাহিত্যে প্রাণরসের দৈন্য অনুভব করা যায়। স্বতঃস্ফূর্ত আবেগের সারল্য

ও সাবলীলতা হারিয়ে প্রথাসিদ্ধ পথে পুনরাবৃত্তি করাই পদাবলী রচনার রীতি হয়ে দাঁড়াল।

চৈতন্যের সমকালীন পদকর্তারা তাঁর জীবনলীলাকে পদাবলীর বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। চৈতন্য-পরবর্তী কালের কবিদের রচনায় রাধা-কৃষ্ণ লীলা বড়ো হয়ে উঠেছে। তথাপি চৈতন্যের ছায়া পড়েছে রাধার কৃষ্ণের জন্য আকুলতার মধ্যে। চৈতন্য-পরবর্তীকালের কোনো কোনো কবি সর্বপ্রথম বাৎসল্য রসের পদ রচনা করেছেন। পূর্বে এই রসের পদ ছিল না বলা যায়। পুত্রের জন্য শচীমাতার আর্তির যে বর্ণনা পাওয়া যায় বিভিন্ন চরিতগ্রন্থে, সেই অনুভূতিই হয়ত কবিদের বাৎসল্য রসের পদাবলী রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছে।

সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে পদাবলী সাহিত্যের গুণগত উৎকর্ষ ক্রমশই হ্রাস পেতে আরম্ভ করলেও প্রচার বৃদ্ধি পেতে থাকে কীর্তনের জনপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে।

হিন্দী কৃষ্ণকাব্য

প্রাচীন হিন্দী সাহিত্যের নিদর্শনগুলি মুখ্যত দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথমত, নাথ সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে রচিত সাহিত্য; দ্বিতীয়ত, চারণ-সাহিত্য। খ্রীস্টীয় দশম-একাদশ শতকে ছিল গোরক্ষনাথ এবং অন্যান্য নাথ-সাধকদের কাহিনী অবলম্বনে রচিত নাথ-সাহিত্যের প্রাধান্য। দ্বাদশ শতাব্দী থেকে শুরু হল চারণ কবিদের যুগ। বিভিন্ন রাজবংশের শৌর্যবীর্যের গৌরবগাথা রচনা করে চারণ কবিরা ঘুরে ঘুরে তা গেয়ে বেড়াত। এই ধরনের চারণ গাথার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য চাঁদ কবির পৃথ্বীরাজ রাসো।

উত্তর ভারতে মুসলমান আধিপত্য সম্পূর্ণ হবার পর হিন্দু রাজাদের বীরত্ব প্রকাশের সুযোগ যখন আর রইল না তখন প্রেরণার অভাবে চারণ কবিদের কণ্ঠও স্তব্ধ হয়ে গেল। এর পর থেকে প্রায় আড়াইশ' বছর হিন্দী সাহিত্যের বন্ধ্যা পর্ব।

পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধে ভক্তিধর্মের প্রবল বন্যা হিন্দী সাহিত্যে নতুন প্রাণের সঞ্চার করে। ভক্তিবাদের যাঁরা গুরু তাঁরা ধনী দরিদ্রের পার্থক্য, জাতিভেদ, শিক্ষিত অশিক্ষিতের প্রভেদ বড়ো করে দেখেননি। সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোকেরাও আমন্ত্রণ পেল এই নতুন ধর্মে উজ্জীবিত হয়ে উঠতে। সুতরাং ধর্মব্যাখ্যানের ভাষা সংস্কৃতের পরিবর্তে হল হিন্দী। ভক্তিবাদের গুরুদের মধ্যে রামানন্দ (১৪০০-১৪৭০) প্রথম হিন্দী ব্যবহারের উপর জোর দেন। সংস্কৃতের পরিবর্তে হিন্দীতে ধর্মোপদেশ দেওয়া তিনিই আরম্ভ করেন। অবশ্য তাঁর লেখা হিন্দী গ্রন্থের কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না। গ্রন্থসাহেবে তাঁর রচিত 'কত জাঈ ঐ রে ঘর লাগো রঙ্গু' পদটি পাওয়া যায়। হয়ত আরও পদ তিনি রচনা করেছিলেন, এখন সেগুলি হারিয়ে গেছে।

মারাঠী সাধক নামদেব (১২৭০-১৩৫০ খ্রীঃ) হিন্দী কৃষ্ণকাব্যের পথিকৃৎ বলো

অত্যুক্তি হয় না। তিনি দীর্ঘকাল উত্তর ভারতে বসবাস করেছেন এবং নিজে খড়ীবোলী ও ব্রজভাষায় অনেক পদ রচনা করেছেন। নির্গুণ ভক্তির পদ লিখেছেন সধুক্কড়ী খড়ীবোলীতে ; আর সগুণ ভক্তির পদ রচনা করেছেন ব্রজভাষায়। রামানন্দ ছিলেন রামের সাধক ; নামদেব কৃষ্ণভক্ত। নিম্নলিখিত কৃষ্ণের বন্দনাগীতটি তাঁর রচনা :

ধনি ধনি মেঘা রোমাবলী। ধনি ধনি ক্রিসন ওঢ়ে কাঁবলী।
ধনি ধনি তূ মাতা দেবকী। জিহ গ্রিহ রমঈআ কঁবলাপতি॥
ধনি ধনি বনখণ্ড বিন্দ্রাবনা। জহঁ খেলৈ শ্রীনারায়ণা।
বেনু বজাবৈ গোধনু চরৈ। নামেকা সুআমী মানন্দু করৈ॥[৬৩]

বল্লভ-সম্প্রদায়ের গুরু বল্লভাচার্য নিজে হিন্দীতে কিছু না লিখলেও তাঁর প্রেরণায় অষ্টছাপের কবিরা হিন্দী কৃষ্ণকাব্যের ধারাকে বিশেষরূপে পুষ্ট করেছেন। গুজরাটের ভক্তকবি নরসিংহ মেহতা (১৫০০-১৫৮০) কয়েকটি ভক্তিমূলক গীতিকবিতা রচনা করেছেন হিন্দীতে।

দেখা যাচ্ছে রামানন্দ, নামদেব, বল্লভাচার্য, নরসিংহ মেহতা প্রভৃতি যাঁরা হিন্দী রচনার সূত্রপাত করেছিলেন তাঁরা মূলতঃ কেউ হিন্দীভাষী ছিলেন না। অবশ্য ব্রজভাষায় সগুণ কৃষ্ণভক্তির কাব্যরচনা শুরু হয়েছিল বল্লভাচার্য বৃন্দাবনে আসবার পঞ্চাশ ষাট বছর আগে। কবি বিষ্ণুদাস বৃন্দাবনলীলার মধুর রস অবলম্বন করে ঐ সময় রচনা করেছিলেন 'রুক্মিণী মঙ্গল'।

এই প্রসঙ্গে মিথিলার কবি বিদ্যাপতির নাম উল্লেখ করতে হয়। মৈথিল সাহিত্যের ইতিহাসকার ডঃ জয়কান্ত মিশ্রের মতে বিদ্যাপতির জন্ম ১৩৬০ খ্রীস্টাব্দে এবং মৃত্যু ১৪৩৭ খ্রীস্টাব্দে। মৈথিল ভাষায় বিদ্যাপতি মধুর রসের অনেকগুলি অপূর্ব পদ রচনা করেন। বিদ্যাপতির অনেক পদে রাধাকৃষ্ণের উল্লেখ নেই ; লৌকিক প্রেমের অনুভূতিই প্রকাশ পেয়েছে সেই সব কবিতায়।

বাঙালী পদকর্তাদের উপর বিদ্যাপতির গভীর প্রভাব পড়েছে। বাংলাদেশেই তাঁর রচনাবলী সমাদৃত এবং সংরক্ষিত হয়েছে এবং বিদ্যাপতির ভাষাও বাংলার কাছাকাছি। যেমন

চিকুর নিকুর তম সম পুনু আনন পুনিব সসী।
নঅন-পংকজ কে পতি আওল এক ঠাম রহু বসী॥[৬৪]

অর্থাৎ, রাধার কেশগুচ্ছে অন্ধকার জমাট বেঁধেছে, মুখ পূর্ণিমার চন্দ্রের মতো। চোখ কমলের ন্যায়। আশ্চর্য, রাত্রির অন্ধকার, পূর্ণিমার চন্দ্র এবং কমল একসঙ্গে মিলিত হয়েছে।

ব্রজভূমির কৃষ্ণকাব্যের কবিদের উপর বিদ্যাপতির প্রভাব নিশ্চয়ই খানিকটা পড়েছে। কিন্তু সংস্কৃতে রচিত হলেও জয়দেবের গীতগোবিন্দের প্রভাব এঁদের উপর অপেক্ষাকৃত বেশি লক্ষ্য করা যায়। জয়দেবের 'মেঘৈর্মেদুরমম্বরম্...'[৬৫] ইত্যাদি পদের প্রভাব অষ্টছাপের বিশিষ্ট কবি সুরদাসের নিম্নলিখিত রচনায় স্পষ্টই ধরা পড়ে :

গগন ঘহরাই জুরী ঘটা কারী।
পৱন-ঝকঝোর, চপলা চমক চহুঁওর,
সুৱন-তনচিতে নন্দ ডরত ভারী।
কহ্যো বৃষভানু কী কুঁৱরি সোঁ বোলি কৈ,
রাধিকা কাহ্ন ঘর লিএ জা রী॥
দোউ ঘর জহু সংগ' গগন ভয়োঁ স্যাম রংগ,
কুৱর-কর গহ্যো বৃষভানু-বারী॥[৬৬]

হিন্দী কৃষ্ণকাব্যের কবিদের বৈষ্ণব সম্প্রদায় ও উপ-সম্প্রদায় হিসাবে শ্রেণীবন্ধ করা চলে। কারণ, তাঁরা প্রত্যেকেই নিজস্ব সম্প্রদায়ের সাধন পদ্ধতি এবং মতবাদের পরিপ্রেক্ষিতে কাব্য রচনা করেছেন। সম্প্রদায় বহির্ভূত কবির সংখ্যা অল্প। বাঙালী পদকর্তাদের এভাবে চিহ্নিত করা যায় না। বৈষ্ণব হিসাবেই তাঁদের প্রধান পরিচিতি।

কৃষ্ণকাব্যে বল্লভ সম্প্রদায়ের দান সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। সম্প্রদায়ের গুরু বল্লভাচার্য বালগোপালের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে পূজার প্রবর্তন করেন। তিনি নিজে হিন্দীতে কিছু না লিখলেও প্রথম সারির কয়েকজন হিন্দী কবি তাঁর মতবাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে কাব্য রচনার প্রেরণা লাভ করেছেন। বল্লভাচার্যের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বিটঠলনাথ (১৫১৫-১৫৮৫) গুরুপদে অধিষ্ঠিত হন। বিটঠলনাথ নিজে কবি ছিলেন। পিতার চার জন এবং তাঁর নিজের চার জন কবিশিষ্য নিয়ে আট জন কবির অষ্টছাপ কবিগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আট জন কবির কৃষ্ণকাব্য আদর্শস্থানীয়। সেইজন্য অষ্টছাপ (ছাপ = সীল, মোহর) নামটি ব্যবহার করা হয়েছে।

বল্লভাচার্যের চার জন কবিশিষ্য হলেন সুরদাস, কৃষ্ণদাস, পরমানন্দদাস এবং কুম্ভনদাস। বিটঠলনাথের শিষ্যদের নাম— নন্দদাস, চতুর্ভুজদাস, ছীতস্বামী এবং গোবিন্দস্বামী। এঁরা প্রায় সকলেই ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ থেকে সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। এই কবিরা পশ্চিমা হিন্দী বা মথুরা-বৃন্দাবন অঞ্চলের ভাষাকে সাহিত্যিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ঐ অঞ্চলের নাম অনুযায়ী এই ভাষার নাম হল ব্রজভাষা। কৃষ্ণকাব্যের প্রায় সকল কবিই ব্রজভাষা ব্যবহার করেছেন। ব্রজভাষা যে অষ্টছাপের কবিদের পূর্বে কেউ ব্যবহার করেননি তা নয় ; কিন্তু তার সমৃদ্ধির কৃতিত্ব সুরদাস প্রমুখ কবিদেরই প্রাপ্য। তুলসীদাস এবং অধিকাংশ রামকাব্যের কবিরা সমৃদ্ধ করেছেন পূর্বী হিন্দীকে।

বল্লভাচার্য বালগোপালের ভক্ত হওয়ায় অষ্টছাপের কবিরা বাৎসল্য রসের অনেক পদ রচনা করেছেন। সুরদাসের বাৎসল্যরসের রচনাগুলি উৎকর্ষের দিক থেকে শ্রেষ্ঠ। ভারতীয় আর কোনো সাহিত্যে বাৎসল্যের এমন মধুর অনুভূতির স্পন্দন উপলব্ধি করা যায় না। অষ্টছাপের কবিরা বাৎসল্য ব্যতীত রাধা-কৃষ্ণের লীলা নিয়ে অনেক মধুর রসের পদও রচনা করেছেন। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব কবিদের মতো বল্লভী সম্প্রদায় রাধাপ্রেমকে পরকীয়া হিসেবে দেখেননি, গ্রহণ করেছেন স্বকীয়ারূপে।

চৈতন্যদেব বৃন্দাবনের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য তাঁর কয়েকজন বিশিষ্ট

ভক্তকে বৃন্দাবন পাঠিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে রূপ, সনাতন, জীব, বলদেব গোস্বামী প্রভৃতি অন্যতম। ব্রজভূমিতে গৌড়ীয় সম্প্রদায় এঁরাই প্রতিষ্ঠা করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের বৈশিষ্ট্যগুলি এই সম্প্রদায়ের হিন্দীভাষী ভক্তরা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতেন। এই সম্প্রদায়ের কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গদাধর ভট্ট, সূরদাস মদনমোহন এবং মাধুরীজী। গদাধর ভট্ট মোহিনীবাণীর রচয়িতা। এঁর রচনায় শব্দালংকার ও অর্থালংকারের আধিক্য দেখা যায়। 'মোহিনীবাণীর' যে সংস্করণ এখন পাওয়া যায় তাতে পদগুলি সাজানো হয়েছে এইভাবে : জন্মলীলা, নামমাহাত্ম্য ; যমুনা, বংশী, স্মরণ বন্দনা ; অনুরাগ ; রূপমাধুরী ; শ্রীরাধাবদন শোভা ; মান ; দান ; রাস ; বিবাহ ; ভোজন ; বসন্ত ; শ্রীরাধাগোবিন্দের হোরী ; বর্ষা ; ঝুলন ইত্যাদি। চৈতন্যদেবের হোলিলীলার উপরও পদ আছে। জীব গোস্বামী গদাধর ভট্টের পদাবলীর অনুরাগী ছিলেন।

সনাতন গোস্বামীর শিষ্য সূরদাস মদনমোহন (প্রকৃত নাম সূরধ্বজ) আকবরের রাজত্বকালে আমিন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু রাজকার্য অপেক্ষা কৃষ্ণের ভজনা এবং পদরচনাতেই ছিল তাঁর অধিকতর আগ্রহ। তাঁর পদাবলীর সংখ্যা বেশি নয়। কিন্তু কৃষ্ণানুভূতির তন্ময়তা পাঠকের চিত্ত স্পর্শ করে। জন্মলীলা, প্রভাতী, মুরলী, অনুরাগ, রাস, খণ্ডিতা, বসন্ত, ফুলদোল প্রভৃতি লীলাপ্রসঙ্গে তিনি পদাবলী রচনা করেছেন।

রূপ গোস্বামীর শিষ্য মাধুরীজী মথুরার নিকটবর্তী এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পদাবলী ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত (১) বংশীবটবিলাস, (২) উৎকণ্ঠা, (৩) কেলি (৪) বৃন্দাবনবিহার, (৫) দান, (৬) মান। এঁর রচনার বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রত্যেক শ্রেণীর পদাবলীর প্রথমেই শ্রীগৌরাঙ্গের বন্দনা করা হয়েছে।[৬৭] যেমন 'উৎকণ্ঠা'র প্রথমেই আছে :

> শ্রীচৈতন্য স্বরূপকো মন বচ করৌ প্রণাম।
> সদা সনাতন পাইয়ে শ্রীবৃন্দাবন ধাম॥
> গৌরনাম ঔর গৌরতনু অন্তর কৃষ্ণস্বরূপ।
> গৌর সাঁবরে দুহুন কো প্রগট একহি রূপ॥
> তিনকে চরণ প্রণামতে, সব সুলভ জগ হোঈ।
> গৌর সাঁবরে পাঈ য়হ, আপ অপুনো খোঈ॥

হিন্দী ও বাংলা কৃষ্ণকাব্যের কবিদের মধ্যে এই সম্প্রদায়ের কবিরা সেতুবন্ধনের কাজ করেছেন।

নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কবি শ্রীভট্ট। গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মতো নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের ভক্তরাও মধুর রসকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি রাধিকার উপাসনা এঁদের ধর্মানুষ্ঠানের অন্যতম অঙ্গ।

শ্রীভট্ট ১৫০০ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পদাবলী সহজ চলিত ভাষায় লেখা। তাঁর যুগলশতক নামক একশত পদের সংকলনটি ভক্ত পাঠকদের নিকট

বিশেষরূপে সমাদৃত। এই সম্প্রদায়ের সমকালীন আর-একজন কবি পরশুরাম।

রাধাবল্লভী সম্প্রদায়ের প্রবর্তক স্বামী হিতহরিবংশজী। এই সম্প্রদায় রাধা-কৃষ্ণের যুগল উপাসনা করলেও রাধার আরাধনাই প্রাধান্য লাভ করেছে। কুঞ্জলীলা এবং শৃঙ্গারকেলিতে রাধাকে কেন্দ্রচরিত্র হিসাবে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হিতহরিবংশ মথুরা অঞ্চলে আনুমানিক ১৫০২ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। কিংবদন্তী এই যে, রাধা তাঁকে স্বপ্নে দীক্ষা দেন এবং তারপর থেকে রাধাবাদ প্রচারের জন্য এই নতুন সম্প্রদায় স্থাপিত করেন। তিনি শুধু সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা গুরু নন, ভক্ত কবি হিসাবেও সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁর রাধা-সুধানিধি ১৭০টি শ্লোকের সংকলন। হিতহরিবংশের ব্রজভাষায় রচিত পদগুলি সরস ও হৃদয়গ্রাহী ; এগুলি হিতচৌরাসী নামে প্রসিদ্ধ।

হরীরাম ব্যাস রাধাবল্লভী সম্প্রদায়ের একজন জনপ্রিয় পদকর্তা। তিনি মূলত শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা এবং শৃঙ্গারলীলার কবি। বিশুদ্ধ ভগবদ্‌প্রেমের ভজনা তাঁর পদাবলীতে আবেগাপ্লুত ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে।

এই সম্প্রদায়ের আর-একজন কবি বৃন্দাবনবাসী ধ্রুবদাস। এঁর রচনা বহুল প্রচারিত। ছন্দের বৈচিত্র্য এঁর রচনার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ছোটোবড়ো সব মিলিয়ে তিনি প্রায় চল্লিশটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এদের মধ্যে রসহীরাবলী, ব্রজলীলা, দানলীলা, অনুরাগলতা প্রভৃতি কৃষ্ণভক্তের নিকট সমাদৃত।

হরিদাসী সম্প্রদায়ের প্রবর্তক আসধীরজী। কিন্তু এই সম্প্রদায়ের মতবাদকে নবরূপ দেন আলিগড়ের নিকটবর্তী হরিদাসপুর নিবাসী স্বামী হরিদাস। তিনি অষ্টছাপ কবিদের সমসাময়িক। এই সম্প্রদায়ের বিধি অনুযায়ী রাধাকৃষ্ণের যুগল উপাসনা সখীভাবে ভাবিত হয়ে করতে হয়। বিট্‌ঠলবিপুল এবং বিহারিনদাস তাঁদের কাব্যে সম্প্রদায়ের বিধি ও বিশ্বাসকে সুন্দরভাবে রূপায়িত করেছেন।

এইসব সম্প্রদায়ের বাইরে যাঁরা কৃষ্ণকাব্য রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মীরাবাঈ। কৃষ্ণকাব্যের সার্থক কবিদের মধ্যেও তাঁর স্থান প্রথম শ্রেণীতে। তিনি যোধপুরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ; উদয়পুরের মহারাণা কুমার ভোজরাজের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। আনুমানিক ১৫০০-১৫৫০ খ্রীস্টাব্দে তিনি জীবিত ছিলেন। অল্প বয়স থেকেই তিনি ছিলেন কৃষ্ণের একনিষ্ঠ ভক্ত। বিবাহের কিছুকাল পরে স্বামীর মৃত্যু হলে তাঁর কৃষ্ণপ্রেমের উন্মাদনা আরও বৃদ্ধি পেল। শ্বশুরকুল এই ভগবদ্‌প্রেমের ব্যাকুলতা সুনজরে না দেখায় তিনি চলে আসেন বৃন্দাবনে। সেখানে তখন বল্লভ সম্প্রদায়ের খুব প্রভাব। কিন্তু মীরা সেদিকে আকৃষ্ট হননি। রবিদাস তাঁর শ্রদ্ধা পেয়েছিলেন। বৃন্দাবনে জীবগোস্বামীর সঙ্গে আলোচনার পর চৈতন্যদেবের প্রতি যে মীরার ভক্তি জাগ্রত হয় তা তাঁর রচনা থেকেই পাই :

'স্যামকিসোর ভএ নবগোরা চৈতন্য জাকো নাঁব'...।"[৬৮]

মীরার শেষ জীবন অতিবাহিত হয় দ্বারকায়। তাঁর জীবনের তিন পর্বের ভৌগোলিক পরিবেশ তাঁর রচনার উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। রাজস্থান পর্বে

রাজস্থানী মিশ্রিত ব্রজভাষায় লিখেছেন ; বৃন্দাবন পর্বে বিশুদ্ধ ব্রজভাষা ব্যবহার করেছেন, এর পর দ্বারকাপর্বে লিখেছেন গুজরাটিতে।

মীরার রচনায় তিনি নিজেই রাধার ভূমিকা নিয়েছেন। গিরিধর গোপালই তাঁর সকল রচনার বিষয়। শ্রীকৃষ্ণ পতি, তিনি নতুন রাধা। একান্তরূপে আত্মনিবেদনের সুর ধ্বনিত হয় প্রায় প্রত্যেকটি পদে। একটিতে তিনি বলেছেন : হে আমার মোহন প্রিয়তম, তোমার মুখ দেখবার পর থেকে এই সংসার লবণাক্ত (বিস্বাদ) হয়ে গিয়েছে। আমি এখন সংসার থেকে দূরে দূরেই থাকি। সংসারে সুখের আশা মরীচিকার মতোই অলীক। তাই সাংসারিক সুখের আশা ত্যাগ করেছি। তা ছাড়া, প্রিয়তম, সংসারে সুখ তো ক্ষণস্থায়ী। বিয়ের পর বিধবা হবার জ্বালা সইতে হয়। সুতরাং মানুষের ঘরে বউ হয়ে লাভ কি ? বিয়ে করতে হলে পরম প্রিয়তমকে বরণ করাই ভালো ; তা হলে বিধবা হবার ভয় থাকবে না। তেমন ভাগ্যবতী হবার আশা হৃদয়ে জেগেছে।

মীরা মধুর রসের সাধিকা। তিনি স্বরচিত পদাবলী গান করতে করতে আত্মহারা হয়ে যেতেন। তাঁর রচনা এখনও প্রধানতঃ ভজন হিসাবেই সমাদৃত। কাব্যগুণ অপেক্ষা কৃষ্ণভক্তির অনন্য আন্তরিকতা মীরার পদাবলীর বড়ো সম্পদ।

হিন্দী সাহিত্যের আদিযুগে কৃষ্ণকাব্যের কবিরা বিভিন্ন দিকে যুগান্তর এনেছিলেন। তাঁরা গড়ে তুলেছিলেন সাহিত্যের বাহন হবার উপযোগী একটি ভাষা, যার প্রভাব অতিক্রম করেছিল হিন্দীভাষী অঞ্চলের গণ্ডী। কৃষ্ণকাব্যেব কবিরা হিন্দী কাব্যকে দিয়েছিলেন নবরূপ। ছন্দ, অলংকার, উপমা এবং শব্দসম্পদে সমৃদ্ধ হয়েছিল হিন্দী কবিতা। হিন্দী গীতিকবিতাব ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল কৃষ্ণকাব্যের মধ্যে।

বাংলা পদাবলী সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা করলে হিন্দী কৃষ্ণকাব্যের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। অধিকাংশ হিন্দী কবিই শুধু কৃষ্ণভক্ত নন ; তাঁরা প্রথমে কোনো সম্প্রদায়ের বা উপসম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত। সুতরাং গোষ্ঠীগত সংকীর্ণ দৃষ্টি-ভঙ্গির মধ্য দিয়ে কৃষ্ণেব প্রতি তাঁদের ভক্তির প্রকাশ হয়েছে অনেক ক্ষেত্রেই। বাঙালী পদকর্তারা প্রধানতঃ ছিলেন ভক্তবৈষ্ণব, উপসম্প্রদায়ের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পরিসরে নিজেদের সাধারণত গণ্ডীবদ্ধ করেননি। চৈতন্যদেবের প্রবল ব্যক্তিত্ব ক্ষুদ্র গোষ্ঠী গড়বার পথে ছিল অন্তরায়।

চৈতন্যদেবের কৃষ্ণপ্রেমের উন্মত্ততা দেখে রাধার উন্মত্ততা বাঙালী বৈষ্ণব কবিরা যেরূপ উপলব্ধি করতে পেরেছেন, হিন্দী কবিরা তেমন সুযোগ পাননি। ফলে বাংলা বৈষ্ণব পদাবলীতে শুধু যে মধুর রসের প্রাধান্য তাই নয়, কাব্যগুণেরও অনেক বেশি উজ্জ্বলতা লক্ষণীয়। ঠিক তেমনি হিন্দী কবিদের উপর সর্বাধিক প্রভাব পড়েছে বল্লভাচার্য ও তাঁর পুত্র বিট্‌ঠলনাথের। বল্লভাচার্য বালগোপালের উপাসনার প্রবর্তন করেছিলেন, সুতরাং বল্লভী এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের হিন্দী কবিরা বাৎসল্যরসের উৎকৃষ্ট পদ রচনা করেছেন। বিশেষ করে এদিক থেকে সূরদাসের তুলনা নেই। বাংলা পদাবলীতে এমন সুন্দর বাৎসল্যের চিত্র খুব বেশি পাওয়া যায় না।

পদাবলীর পরিমাণ, পদকর্তার সংখ্যা এবং পদাবলীর জনপ্রিয়তা বাংলাদেশে যত

বেশি অন্যত্র তেমন দেখা যায় না। মুদ্রণ-পূর্ব যুগ থেকেই বাংলা বৈষ্ণব পদাবলীর অসংখ্য সংকলন পাওয়া যায়। হিন্দী কৃষ্ণকাব্যের তেমন সংকলনের সংখ্যা নগণ্য। পদগুলি বিভিন্ন পালা অনুসারে সাজিয়ে কীর্তন করাও বাংলার বৈশিষ্ট্য। চৈতন্যদেব শুধু যে কীর্তন শুনতে ভালোবাসতেন তাই নয়, কীর্তনকে তিনি দৈনন্দিন জীবনচর্যার অংগ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।

হিন্দী কৃষ্ণকাব্যের পূর্ণতর বিকাশ এবং অধিকতর জনপ্রিয়তা কেন সম্ভব হয়নি সে বিষয়ে দুটি প্রধান কারণ নির্দেশ করা যেতে পারে। প্রথমত, চৈতন্যের তিরোধানের পর কৃষ্ণের বামে রাধার মূর্তি পরিকল্পনা করে রাধা-কৃষ্ণের যুগল মূর্তির পূজা আরম্ভ করলেন গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা। রাধাকে কৃষ্ণের সমান মর্যাদা দেওয়ায় অন্যান্য বৈষ্ণব সম্প্রদায় ক্ষুব্ধ হলেন। বিশেষ করে বল্লভী সম্প্রদায়ের সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের মনান্তর ঘটল।[৬৯] হিন্দী ভক্ত কবিরা তাই রাধাকে প্রাধান্য দিয়ে মধুর রসের পদ রচনায় উৎসাহ বোধ করেননি। বল্লভী সম্প্রদায়ের বিরূপতা নিশ্চয়ই তাঁদের মানসিকতার উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। কারণ বল্লভাচার্য এবং তাঁর শিষ্যদের মতামতের মূল্য হিন্দীভাষী বৈষ্ণবদের উপর ছিল খুব বেশি।

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন, রাধাকে কৃষ্ণের সমান মর্যাদা দিয়ে তাঁদের নিয়ে নিরন্তর লীলাবিস্তার বাংলা বৈষ্ণব কাব্যের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু হিন্দী বৈষ্ণব কবিরা মুখ্যতঃ ভাগবত-বর্ণিত কৃষ্ণলীলাকে অবলম্বন করে পদ রচনা করেছেন।[৭০] সুপরিচিত পৌরাণিক কাহিনীর গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকবার ফলে হিন্দী কৃষ্ণকাব্যে বৈচিত্র্যের অভাব ঘটেছে এবং জনচিত্তে এর আবেদন গভীর হতে পারেনি।

কিন্তু এর চেয়ে বড়ো কারণ বিষ্ণু বা নারায়ণের আর-এক অবতার রামের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। অবধীতে রচিত তুলসীদাসের রামচরিতমানস সম্পূর্ণ হয় ১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দে। তুলসীদাসের রচনার গুণে এই অতুলনীয় মহাকাব্য হিন্দীভাষীদের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। কৃষ্ণের বাল্যলীলা ও যৌবনলীলা বৈষ্ণব কবিদের বিষয়বস্তু। সমগ্র জীবনকে, স্ত্রী-পুত্র পরিবৃত সংসারী জীবনকে, আমরা খণ্ডিত কৃষ্ণকাহিনীতে পাই না। রামের জীবনকথায় এই অপূর্ণতা নেই। তা ছাড়া কৃষ্ণ যে দেবতা একথা আমাদের পক্ষে ভুলে থাকা কঠিন। কিন্তু রাম আমাদের পরিচিত চরিত্র। দেবতা অপেক্ষা নরোত্তম হিসাবে তাঁকে গ্রহণ করা সহজ। এই সব কারণে তুলসীদাসের রামায়ণ ভক্ত, কাব্যরসপিপাসু পাঠক এবং গল্পের শ্রোতা সকলেরই মনোরঞ্জন করতে সক্ষম হয়েছিল।

কৃত্তিবাস বাংলা সাহিত্যের আসরে রামকে এনেছিলেন। কিন্তু কবির কল্পনাজাত রাম বেশ কিছুটা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন চৈতন্যদেবের লোকোত্তর ব্যক্তিত্বের প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে।

পূর্বে বলা হয়েছে যে সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষায় রচিত প্রকীর্ণ কবিতা থেকে বৈষ্ণব কবিরা পদাবলী রচনায় যথেষ্ট প্রেরণা লাভ করেছেন। এই প্রেরণা এসেছে দু'রকমে। রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক কিছু সংখ্যক কবিতা ছিল প্রেরণার প্রত্যক্ষ উৎস। কিন্তু নিছক মানবিক প্রেমের প্রকীর্ণ কবিতাও রাধাকৃষ্ণের প্রেমবৈচিত্র্য রূপায়িত করতে বৈষ্ণব কবিদের বিশেষরূপে সহায়তা করেছে। 'কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্বোত্তম নরলীলা'[৭১]। এবং ভগবানের প্রেমের লীলা মানবরূপেই প্রকট হয়। সুতরাং ঈশ্বরের প্রতি ভক্তের গভীর আনন্দময় আকর্ষণ উপলব্ধি করা যেতে পারে একমাত্র পৃথিবীর মানব-মানবীর প্রেমানুভূতির মধ্য দিয়ে।

প্রকীর্ণ কবিতার এই প্রভাব ব্যতীত পদাবলী সাহিত্যে লক্ষ্য করা যায় লোক-প্রচলিত রাধাকৃষ্ণলীলা কাহিনীর গভীর প্রভাব। সে প্রভাব এমনই সর্বব্যাপী ছিল যে শিক্ষিত সংস্কৃতজ্ঞ বৈষ্ণব পদকর্তারাও তা এড়াতে পারেননি। বস্তুতঃপক্ষে পদাবলীর প্রথম পর্বে প্রকীর্ণ সংস্কৃত প্রাকৃত কবিতা অপেক্ষা লৌকিক কৃষ্ণকাহিনীর সাহিত্যরূপ ও শিল্পরূপে গভীরতর প্রভাব বিস্তার করেছিল। সাহিত্য ও শিল্পরূপ বলতে কি বুঝি তার একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। রাধা-কৃষ্ণের লীলাকাহিনী অবলম্বনে গ্রাম্যকবি রচিত এবং মুখে মুখে প্রচলিত কৃষ্ণমঙ্গল পাঁচালী ছিল মুখ্য সাহিত্যরূপ। লিখিত কাব্যরচনার প্রচলন তখনও সাধারণ লোকসমাজে ছিল না। আর পাঁচালীর কাহিনীকে ঈষৎ নাট্যরূপ দিয়ে যখন নৃত্য-গীত সহযোগে অভিনয় করা হত তখন তাই হয়ে উঠত কৃষ্ণকাহিনীর শিল্পরূপ। এটা যাত্রার একেবারে গোড়ার কথা।

দেশের জনসাধারণ, যারা সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ, যারা শাস্ত্র পাঠ করতে অক্ষম তারাও কিন্তু কৃষ্ণকাহিনীর সঙ্গে বিশেষরূপে পরিচিত ছিল। বেদ-উপনিষদে-পুরাণে বর্ণিত বিষ্ণু-কৃষ্ণের কাহিনী তারা শুনেছে কথক ঠাকুর ও গ্রামের পুরোহিত ঠাকুরের মুখে। কৃষ্ণের কংসবধ, গোবর্ধন ধারণ, কালীয়দমন, রুক্মিণীহরণ প্রভৃতি ঘটনার মধ্যে কল্পনা উদ্দীপ্ত করবার মতো যথেষ্ট নাটকীয়তা আছে, আবার গোষ্ঠে গোরু চরানো, গোপিনীদের বস্ত্রহরণ এবং তাদের সঙ্গে প্রেমের লীলা ইত্যাদির জন্য কৃষ্ণকে বড়ো কাছের মানুষ বলে মনে হত। তাই পল্লীকবি তাঁকে নিয়ে পালা রচনা করেছেন, গান লিখেছেন। নাটকীয় গুণসম্পন্ন এই পালাগুলিকে নৃত্য ও সংগীত সহযোগে অভিনয় করা হত লোকরঞ্জনের জন্য। আর পটুয়ারা আঁকতেন পট, ছড়া বাঁধতেন, তারপর বাড়ি বাড়ি ছড়া পড়ে কৃষ্ণলীলার পট দেখাতেন। কবি, নাট্যকার ও পটুয়া বেদ-পুরাণের কৃষ্ণকাহিনীকে সর্বত্র যথাযথরূপে গ্রহণ করেননি। শাস্ত্রীয় কৃষ্ণকাহিনীর সঙ্গে যোগ করেছেন নিজেদের কল্পনার ফসল।

এই পালা-গানের কৃষ্ণকাহিনীই হয়ত একদিন নাগরিক রঙ্গমঞ্চে স্থান পেয়েছিল। কীথের বিশ্বাস, কৃষ্ণকাহিনী দিয়েই ভারতে নাটকের সূত্রপাত হয়েছিল। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে[৭২] কৃষ্ণকর্তৃক কংসবধের ঘটনা অবলম্বনে যে অভিনয়ের কথা আছে তা-ই হল

এঁর মতে ভারতে নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে প্রাচীনতম উল্লেখ। কীথ তাঁর সংস্কৃত নাটকের ইতিহাসে এই মতবাদ সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেছেন।[৭৩]

উইন্টারনিটস্, ভেবর প্রমুখ পণ্ডিতরা অবশ্য এ সম্বন্ধে ভিন্ন মত পোষণ করেন। কৃষ্ণমচারিয়ার তাঁর সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে বিভিন্ন পণ্ডিতের মতামত নিয়ে আলোচনা করেছেন।[৭৪]

পতঞ্জলির মহাভাষ্যের আনুমানিক রচনাকাল খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক। প্রশ্ন উঠতে পারে কৃষ্ণলীলার সেই উল্লেখের পর কি এ ধরনের অভিনয় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল? ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে মথুরায় একটি শিলালেখ আবিষ্কৃত হওয়ায় প্রমাণ হয় এই অভিনয়ের ধারা অব্যাহত ছিল। জর্জ বুয়েলার এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকায় (১৮৯২) প্রমাণ করেছেন যে, এই শিলালিপি উৎকীর্ণ হয়েছিল প্রথম বা দ্বিতীয় খ্রীস্টাব্দে। এই লিপি থেকে জানা যায় যে, মথুরায় ঐ সময় কৃষ্ণলীলার এমন সব অভিনেতা অভিনেত্রী ছিল যারা অভিনয়কেই জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেছিল। অভিনয়কলা দীর্ঘকাল যাবৎ জনপ্রিয় না থাকলে তাকে অবলম্বন করে জীবিকার্জন সম্ভব হত না।

এই লীলাভিনয়ের ভাষা কি সংস্কৃত ছিল? সংস্কৃতে যে কৃষ্ণলীলার অভিনয় একেবারেই হত না, একথা বলা যায় না। কারণ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভাগবত-পুরাণে বলেছেন[৭৫] যারা আমার প্রতি শ্রদ্ধাশীল তারা আমার জন্মবৃত্তান্ত এবং অন্যান্য লীলার অভিনয় করবে। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতরা যদি এই ধরনের অভিনয় প্রায়ই করতেন তা হলে নিশ্চয়ই লীলানাট্যের লিখিতরূপ কিছু কিছু আমরা পেতাম। কিন্তু কৃষ্ণ-বিষয়ক প্রাচীনতম সংস্কৃত নাটকের নিদর্শন ভাসের 'বালচরিত'। এর পরে এই বিষয় নিয়ে রচিত আরও কয়েকটি সংস্কৃত নাটকের সন্ধান পাওয়া যায়। তা থেকে অনুমান করা যেতে পারে কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক নাটক শিক্ষিত সমাজে বিশেষ সমাদৃত হয়নি। পতঞ্জলিতে যে কৃষ্ণলীলাভিনয়ের কথা আছে তার ভাষা হয়ত সংস্কৃত ছিল না। কারণ সংস্কৃত নাটকের ইতিহাসে কৃষ্ণকাহিনীর ঐতিহ্য অনুপস্থিত। অপর দিকে হরিবংশ পুরাণের প্রমাণ থেকে আমরা জানতে পারি যে জনসাধারণের ভাষায় কৃষ্ণলীলার অভিনয় হত। মনে হয়, দেশের সর্বত্র, বিশেষ করে উত্তর ভারতের গ্রামাঞ্চলে, স্থানীয় ভাষায় ব্যাপকভাবে কৃষ্ণলীলার অভিনয় হত। মথুরায় একদল কৃষ্ণযাত্রার নট-নটীদের অভিনয়ের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, অভিনয়ের ভাষা ছিল 'তদ্দেশ ভাষা'[৭৬] অর্থাৎ মথুরা অঞ্চলের, যেখান থেকে নট-নটীরা এসেছে সেখানকার ভাষা। সংস্কৃত সর্বভারতীয় ভাষা, তাকে শুধু মথুরার ভাষা বলা যায় না।[৭৭]

কৃষ্ণযাত্রার ধারা যে সুপ্রাচীন কাল থেকে মথুরা অঞ্চলে চলে আসছিল তার বাহন যে স্থানীয় ভাষা ছিল, তা নানাভাবে প্রমাণ করেছেন ডঃ নরভিন হেইন তাঁর 'দি মিরাকল প্লেজ অব মথুরা' নামক গ্রন্থে।

জনচিত্তে কৃষ্ণের আসন যে পদাবলী-সাহিত্য রচনার পূর্বেই সুদৃঢ় হয়েছিল, ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তও তা মনে করেন। তিনি অবশ্য কৃষ্ণযাত্রা অভিনয় সম্পর্কে

স্পষ্ট করে কিছু বলেননি। তিনি বলেছেন: ‘মনে হয়, ব্রজের রাখাল কৃষ্ণের গোপীগণের সহিত যে প্রেমলীলা তা প্রথমে আভীর জাতির মধ্যে কতকগুলি রাখালিয়া গানরূপে ছড়াইয়া ছিল। চপল আভীরবধূগণ এবং কৃষ্ণের প্রেমলীলার গান দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়াইয়াছিল। প্রতিভাবান কবিরা এই লৌকিক গানগুলির সঙ্গে নানা কল্পনা মিশ্রিত করিয়া বৃন্দাবনলীলার কৃষ্ণকে পুরাণে স্থান দেয়।[৭৮]

মথুরায় কৃষ্ণযাত্রার প্রচলন আজ পর্যন্ত অব্যাহত আছে। রাসলীলার অভিনয় এখনও প্রধান আকর্ষণ। এই রাসলীলার অভিনয় কে প্রবর্তন করেছিলেন তা নিয়ে মতভেদ আছে। নারায়ণ ভট্ট এর প্রবর্তক বলে গৌড়ীয় সম্প্রদায় দাবী করেন। নারায়ণের জন্ম মাদুরায়, ১৫৩১ খ্রীস্টাব্দে। মথুরা এসে তিনি গৌড়ীয় সম্প্রদায়ভুক্ত এক গুরুর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে যে, রাসলীলা অভিনয় প্রবর্তনের পশ্চাতে বাংলাদেশে তৎকালে প্রচলিত কৃষ্ণযাত্রার ঐতিহ্য প্রভাব বিস্তার করেছে। অবশ্য অন্য কয়েকজন লেখক দাবী করেন যে, নিম্বার্ক সম্প্রদায়ভুক্ত কোনো এক সাধু রাসলীলাভিনয় প্রবর্তন করেছিলেন ষোড়শ শতকে।

মথুরা অঞ্চলের কৃষ্ণলীলাভিনয়ের উপর বাংলার কৃষ্ণযাত্রার প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে পড়েছে। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সাজসজ্জায় এবং অভিনয় প্রাঙ্গণের আয়োজন সম্পর্কিত অনেক বিষয়ে বাংলাদেশের রীতিনীতির সঙ্গে মিল রয়েছে। প্রাচীনকালে মথুরার কৃষ্ণযাত্রায় রাধা ও তাঁর সখীদের ভূমিকায় অভিনেত্রীরাই অভিনয় করত। কিন্তু বৃন্দাবনে গৌড়ীয় প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে বালকদের দিয়েই দেবদেবীর ভূমিকা অভিনীত হতে লাগল। বালক অভিনেতাদের সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন আবুল ফজল তাঁর ‘আইন-ই-আকবরী’-তে: ‘The Kirtaniyas are Brahamans, whose instruments are such as were in use among the ancients. They dress up smooth-faced boys as women and make them perform. singing the praises of Krishna and reciting his acts.’[৭৯]

বাংলার কৃষ্ণলীলায় যে বালকদের দিয়ে অভিনয় করানো হত দীনেশচন্দ্র সেন তার উল্লেখ করেছেন।[৮০]

এখানে আমরা পাই কৃষ্ণগীতি ও অভিনয়ের কথা। কীর্তন ও বালকদের দিয়ে অভিনয় করানোর রীতি বাংলা দেশ থেকে ব্রজভূমি পেয়েছে। আমরা এখনো কৃষ্ণলীলায় বালকদের রাধার ভূমিকায় দেখতে পাই।

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে অনুষ্ঠিত ব্রজভূমির লীলাভিনয়ে বঙ্গদেশীয় রীতি-পদ্ধতির প্রভাব যে দেখা যায় তা পূর্বেই বলা হয়েছে। বাংলার লোকসমাজে অনেক আগে থাকতেই রাধাকৃষ্ণের কাহিনী নানারূপে প্রচলিত না থাকলে অন্যত্র প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব হত না।

ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে এর একটি প্রমাণ উল্লেখ করেছেন ডঃ নীহাররঞ্জন রায়। তিনি বলেছেন: ‘প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে রাধা-কৃষ্ণ কাহিনীর কয়েকটি নাম যে বিবর্তিত রূপে আমাদের গোচর তাহাদের ভাষাতত্ত্বগত ইঙ্গিত খুব সুস্পষ্ট বলিয়াই

মনে হয়। কৃষ্ণ-কাহ্ন-কানু বা কানাই, রাধিকা-রাহী-রাই···প্রভৃতি নামের বিবর্তনের মধ্যে বোধ হয় এ তথ্য লুক্কায়িত যে কৃষ্ণ-রাধিকার কোনো কাহিনী কোনো না কোনো সাহিত্যরূপে আশ্রয় করিয়া কামরূপে ও বাংলাদেশে প্রসার লাভ করিয়াছিল তুর্কী-বিজয়ের বহু আগেই।'[৮১] সংস্কৃত নামের বিশুদ্ধ রূপ লোকমুখে ব্যবহৃত হতে হতে বিকৃত হয়েছে। কৃষ্ণ থেকে কানু বা কানাই, রাধা থেকে রাই। ডঃ রায় যে সাহিত্য-রূপের কথা বলেছেন তা লোকসাহিত্য হওয়াই সম্ভব। সংস্কৃত রচনায় বিধৃত থাকলে নামের এই বিকৃতি ঘটত না। তা ছাড়া শুধু কামরূপ পর্যন্ত নয়, আবুল ফজলের বিবরণ থেকে অনুমান করা যেতে পারে এই সাহিত্য এবং এই সাহিত্যভিত্তিক নাটক পশ্চিমে মথুরা-বৃন্দাবন পর্যন্ত প্রচলিত ছিল।

মানসোল্লাসে (১১২৯ খ্রীস্টাব্দে সংকলিত) কয়েকটি বাংলা গান স্থান পেয়েছে। এই গানগুলি বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শনের অন্যতম। এদের বিষয়বস্তুর মধ্যে আছে রাধা-কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা এবং কৃষ্ণের অবতার বর্ণনা।

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অভিমত সমর্থন করে ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন: 'গীতগোবিন্দের ভাষা, শব্দ ও ব্যাকরণের দিক হইতে সংস্কৃত সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার ছন্দ, রীতি ও ভংগী, ইহার অনুভব, ইহার প্রাণবায়ু সমস্তই যেন লোকায়ত স্থানীয় ভাষার, সে ভাষা প্রাচীনতম বাংলাই হোক বা বাংলাদেশে প্রচলিত শৌরসেনী অপভ্রংশেই হোক্।'[৮২] এই থেকে কেউ কেউ অনুমান করেন যে গীতগোবিন্দ প্রথম রূপ পেয়েছিল লোককবিদের মুখে, পরে জয়দেব তাকে সংস্কৃত পোশাক পরিয়ে সাহিত্যের দরবারে উপস্থিত করেন।

গ্রামের চাষী এবং সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোকেদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচনার অনেক পূর্ব থেকেই রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকাহিনী পালাগান হিসাবে প্রচলিত ছিল। এই গানকে বলা হত কৃষ্ণ ধামালী।

কৃষ্ণ ধামালী কিভাবে পদাবলী সাহিত্যকে প্রভাবান্বিত করেছে তার সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন দীনেশচন্দ্র সেন:

'কৃষ্ণ ধামালীতে কৃষ্ণ চাষার ঘরের ছেলে, রাধা চাষার ঘরের মেয়ে। রাধার দইয়ের ভাঁড় বহিবার বাঁক তৈরি করিবার জন্য বাঁশ চাহিতেছেন। কখনো তাহার মোট বহিতেছেন—সমস্তই রাধার একটি চুম্বন পাইবার প্রত্যাশায়। কৃষ্ণ ধামালীর দৃশ্য অমার্জিত রুচিযুক্ত চাষার ঘরের। এই ধামালী দুই শ্রেণীর: এক শ্রেণীর নাম শুকুল, অপর শ্রেণীর নাম আসল। এই আসল এত অশ্লীল যে তাহা চাষীরা পর্যন্ত নিজের ঘরে গাহে না—স্ত্রীলোক ও শিশুদিগকে দূরে রাখিয়া তাহারা মাঠে যাইয়া গায়— তাহাতে মধ্যে মধ্যে কানে হাত দিতে হয়— চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এই কৃষ্ণ ধামালীরই সংশোধিত সংস্করণ। বৌদ্ধযুগের এই কৃষ্ণচরিত্র আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে চাষাদের দেবতা তাহাদের মাথা ডিঙাইয়া যায় নাই, তাহাদের ঠাকুরকে চাষারা নিজের দলে ভিড়াইয়া নিজস্ব করিয়া লইয়াছে। এই সকল দেবচরিত্রে কৃত্রিমতা, সাজসজ্জা বা আড়ম্বর কিছুই নাই, তাঁহাকে আপনার জন বলিয়া

ভালোবাসিয়াছে। এইভাবে দেবতাকে মনের মানুষ করিয়া লইবার ফলে আমরা উত্তরকালে বৈষ্ণবদের পঞ্চতত্ত্বের অপূর্ব দার্শনিক মহিমা দর্শন করিতে পাই গৃহস্থালীকে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য এই পঞ্চরসের গৌরবে মণ্ডিত করিয়া ইহার আদর্শ বৈষ্ণবেরা ধর্মবেদীতে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সেই উচ্চ আদর্শের ভিত গড়িয়া দিয়াছিল চাষারা।'[৮৩]

ধামালীর তুলনায় একটু উন্নত মানের কৃষ্ণের প্রণয়লীলার গান পূজাপার্বণে গাওয়া রীতিসিদ্ধ ছিল। ব্রজের প্রেমলীলা প্রথমে স্থূল প্রণয়রসের গানের বিষয়বস্তু হিসাবে প্রচলিত হয়েছিল। দেবতাকে সমীহ করে চলবার জন্য অশ্লীলতা বর্জন করবার কথা গ্রাম্য কবিদের মনে হয়নি।[৮৪] কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার হলেও প্রাক্-চৈতন্য যুগের লোক-প্রচলিত ব্রজলীলা গানের সঙ্গে ঈশ্বরভাবনার কোন সম্পর্ক ছিল না। কৃষ্ণের বাল্য ও যৌবনলীলা লোককবিদের কল্পনা এমন আচ্ছন্ন করেছিল যার জন্য বাংলায় প্রবাদ সৃষ্টি হয়েছে: 'কানু বিনা গীত নাই।' '...বৈষ্ণব ধর্ম ও সাহিত্য অবলম্বনে রাধাকৃষ্ণের নাম বাংলার লোক-সাহিত্যের সকল স্তরেই বিস্তার লাভ করিয়াছে। বৈষ্ণব প্রভাবের পূর্ববর্তী বাংলার সকল প্রেম-সংগীতই প্রত্যক্ষভাবে অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণের মধ্যস্থতা ব্যতীতই ব্যক্ত হইত, রাধাকৃষ্ণের নাম তাহাতে থাকিত না।'[৮৫]

ধামালী জাতীয় কৃষ্ণ-বিষয়ক লীলাকাহিনীর লোকমুখ থেকে প্রথম সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রবেশ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন অবলম্বন করে। লৌকিক কৃষ্ণলীলা ও পদাবলী-সাহিত্যের মধ্যে সংযোগ সাধন করেছে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। চণ্ডীদাস তাঁর কাব্যে শুধু কৃষ্ণের জন্ম এবং কালিয়দমনের কাহিনী পুরাণ থেকে নিয়েছেন; তাম্বুল খণ্ড, দান খণ্ড, নৌকা খণ্ড, ভার খণ্ড, ছত্র খণ্ড, যমুনা খণ্ড, হার খণ্ড, বাণ খণ্ড, বংশী খণ্ড এবং রাধাবিরহ অধ্যায়গুলি লোকপ্রচলিত কৃষ্ণ-কাহিনীর কিছুটা মার্জিত রূপ। বৃন্দাবন খণ্ডের কিছু উপাদান ভাগবতের দশম স্কন্ধে পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে লিখিত পদাবলী সাহিত্যে, বিশেষ করে পালা কীর্তনে পুরাণ-বহির্ভূত অধ্যায়গুলির প্রভাব দেখা যায়। লোকসমাজে প্রচলিত কৃষ্ণকাহিনীর প্রভাব যে কত ব্যাপক ও গভীর ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যে। কবি ভাগবতের অনুসরণে কৃষ্ণ-কথা লিখতে বসেও দানলীলা ও পার খণ্ডে বাংলার নিজস্ব কাহিনী যোগ করেছেন। রাধার সখীদের নাম— যেমন, বৃন্দা, ললিতা, অনুরাধা, বিশাখা এবং কৃষ্ণের সখাদের নাম— শ্রীদাম, সুদাম, সুবল প্রভৃতি বিশেষ করে বাঙালী লোক-কবিদেরই দেওয়া। মালাধরই বোধ হয় প্রথম এই সব নামগুলিকে লিখিত সাহিত্যে ব্যবহার করেছেন।[৮৬]

এই প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র সেনের মন্তব্য বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন 'দানলীলা ও পার খণ্ডে রাধিকা ও গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে কৌতুক করিতে ও তাঁহাকে মানভরে গালি দিতে শিখিয়াছে; এখানে শ্রীকৃষ্ণ পীতধড়া-পরিহিত বংশীধারী প্রস্তরমূর্তি নহেন; তিনি প্রেমিকশিরোমণি, চতুরচূড়ামণি। ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে প্রেমদান করিয়া অনুগৃহীত করেন; শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের নায়ক প্রেম দিয়া

যেরূপ অনুগৃহীত, প্রেম পাইয়াও সেইরূপ অনুগৃহীত হন।...এইখানে প্রাণের খেলা,—মাধুর্যের এক নব পন্থা যাহা পদকর্তারা সম্পূর্ণ প্রকাশ করিয়াছেন।'[৮৭]

লোকসমাজ থেকে ধীরে ধীরে বিবর্তিত হয়ে কৃষ্ণলীলা কিভাবে সাহিত্যে স্থান লাভ করল তা সংক্ষেপে সুন্দর করে বলেছেন ডঃ সুকুমার সেন : 'কৃষ্ণলীলা প্রথম থেকেই লোক-ব্যবহারে প্রচলিত এবং পরে লোক-ব্যবহার থেকে কালে কালে গৃহীত হয়েছে সাধু সাহিত্যে। প্রথম নেওয়া হয়েছিল শিশু কৃষ্ণের অদ্ভুত লীলা— পুতনাবধ, গোবর্ধন ধারণ, কালিয়দমন, কংসবধ ইত্যাদি। তার পরে নেওয়া হয়েছিল গোপীলীলা। ব্রজগোপীদের সঙ্গে কৃষ্ণের প্রেমকাহিনী সাধুসাহিত্যে গৃহীত হতে অনেকদিন লেগেছে। বলতে পারি নবম শতাব্দী থেকে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত শ্রীচৈতন্যই কৃষ্ণলীলাকে সাহিত্যের আসরে সিংহাসনে বসিয়ে গেছেন। সে সিংহাসন হল পদাবলীর, সিংহাসনের আস্তরণ হল কীর্তনের।'[৮৮]

উপরোক্ত ধামালী গান সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র সেন 'হিস্টরি অব বেঙ্গলী ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড লিটারেচার' গ্রন্থে বৌদ্ধ মহাযানীদের সঙ্গে যোগ লক্ষ্য করেছেন সেই গ্রাম্য অশ্লীল সংগীতের। পণ্ডিত হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী এই অভিমত সমর্থন করে আরও বিস্তার করেছেন। তিনি বলেন, বৌদ্ধধর্মের অবনতির পর মুষ্টিমেয় মহাযানী সাধক শূন্যবাদ আঁকড়ে থাকলেও জনসাধারণের মধ্যে তা বেঁচে রইল বিকৃতরূপে। হিন্দুদের মতো দেবদেবীর পূজার প্রচলন হল। প্রজ্ঞাপারমিতা, অবলোকিতেশ্বর, মঞ্জুশ্রী প্রভৃতি দেব-দেবীর মূর্তির সঙ্গে বাসুদেব ও লক্ষ্মীর মূর্তির সাদৃশ্য দেখা যায়। নানা কারণে মনে হয় বৈষ্ণব ভক্তিবাদ মহাযান ভক্তিবাদেরই বিকশিত রূপ।[৮৯] মহাযানীদের মধ্যে নাম-কীর্তন প্রচলিত ছিল , বৈষ্ণব সাধনায়ও নাম-কীর্তনের ভূমিকা অপরিহার্য। কীর্তন যে মহাযানীরাই প্রচলন করেছে তার প্রমাণ চীনে সাধনার অঙ্গ হিসাবে কীর্তনের ব্যবহার। বিকৃতই হোক অথবা অবিকৃতই হোক, বৌদ্ধধর্মই ভারত ও চীনের মধ্যে যোগাযোগের সেতু।

ডঃ দ্বিবেদী মনে করেন, বাংলা, আসাম ও উড়িষ্যায় কৃষ্ণধর্মের বিস্তার ঘটেছে বৌদ্ধধর্মের ধ্বংসস্তূপের উপর। আউল, বাউল, সহজিয়া প্রভৃতি সাধকগোষ্ঠীর বিশেষ শ্রদ্ধাস্পদ ছিলেন নিত্যানন্দ। শ্রীগৌরাঙ্গ বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে তাঁকে সহযোগী করায় নিত্যানন্দের মর্যাদা বৃদ্ধি পেল এবং তার ফলে লৌকিক স্তরে যে কৃষ্ণধর্ম বিকৃত আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে আবদ্ধ ছিল চৈতন্যদেবের প্রেরণায় তা সংস্কৃত হয়ে বিশুদ্ধ রূপ নিয়ে উঠে এল সমাজের উঁচুতলায়।

উত্তর ভারতের কৃষ্ণধর্ম সরাসরি মহাযান সম্প্রদায় থেকে আসেনি। এসেছে নাথ ধর্ম থেকে। এই নাথ ধর্ম অবশ্য ক্ষীয়মাণ মহাযান সম্প্রদায় থেকে উদ্ভূত। সমাজের নিচুতলার মানুষের মধ্যে ছিল এই ধর্মের বিস্তার। লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংগীতের চিহ্ন লক্ষ্য করা যায় হিন্দী কৃষ্ণকাব্যে। সুরদাসের অনেক পদে যে পূর্ববর্তী লোক সাহিত্যের ছায়া উপস্থিত তা অস্বীকার করা যায় না।[৯০]

অষ্টাদশ শতকের প্রথম থেকেই পদাবলী সাহিত্যের উৎকর্ষের ক্রমাবনতি দেখা দেয়। অবশ্য ঐ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত কিছু ভালো পদ লেখা হয়েছিল। বৃন্দাবনের গোস্বামীদের রচিত অলংকারশাস্ত্র কাব্য রচনার রীতি পদ্ধতি নির্দিষ্ট করে দেয়। তা ছাড়া ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ক্রমশ প্রাধান্য লাভ করে হৃদয়ের আবেগ ও অনুভূতিকে আচ্ছন্ন করে ফেলছিল। পদাবলীর স্বতোৎসারিত ধারা এইভাবে ক্ষীণ হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল পদাবলীর সংকলন। বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর ক্ষণদা-গীত-চিন্তামণি, রাধামোহন ঠাকুরের পদামৃতসমুদ্র, দীনবন্ধু দাসের সংকীর্তনামৃত, নরহরি চক্রবর্তীর গীতচন্দ্রোদয়, গৌরসুন্দর দাসের কীর্তনানন্দ ও গোকুলানন্দ সেন বা বৈষ্ণবদাসের পদকল্পতরু পরপর সংকলিত হয়। উৎকর্ষ হ্রাস পেলেও পদাবলীর জনপ্রিয়তা কিন্তু বাড়তে লাগল। সংকলন গ্রন্থের প্রচার ও কীর্তনের প্রসার এই জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ। জনসমাজে পদাবলীর ব্যাপক প্রভাবের ফলে আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে তার গভীর ছাপ পড়েছে। বর্তমানে আমরা পদাবলী সাহিত্যের প্রভাব দেখতে পাই প্রধানত (১) কৃষ্ণলীলার অভিনয়ে, (২) সংগীতে, (৩) গীতিকবিতায় এবং (৪) সমালোচনা সাহিত্যে।

কৃষ্ণলীলা অভিনয়ের প্রধান অবলম্বন পদাবলী। সেই সঙ্গে সাজসজ্জা, সংগীত এবং সূত্রধারের কাহিনী বয়ন আকর্ষণ সৃষ্টি করত। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই কৃষ্ণলীলা (এবং চৈতন্যলীলাও) বাংলার সর্বত্র অভিনীত হতে থাকে। কৃষ্ণকমল গোস্বামীর কৃষ্ণলীলা বিষয়ক গীতিনাট্য সমগ্র পূর্ববঙ্গ মাতিয়ে রেখেছিল দীর্ঘকাল। কৃষ্ণলীলার সমাদর এখনও আছে, কিন্তু পুরাতন ধারার সঙ্গে এ যুগের নতুন কোনো ধারার সংমিশ্রণ না ঘটায় কতদিন যে এর জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ থাকবে বলা যায় না। কীর্তনের প্রভাব স্থায়ীভাবে বাংলার নিজস্ব সংগীতকে বিশিষ্ট রূপ দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনবদ্য ভাষায় বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে কীর্তনের দান সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। তিনি কীর্তনের মধ্যে দেখেছেন বাঙালীর আত্মপ্রকাশের পথ। তিনি বলেছেন: 'এক-একটি জাতির আত্মপ্রকাশের এক-একটি বিশেষ পথ থাকে। বাংলাদেশের হৃদয় যেদিন আন্দোলিত হয়েছিল সেদিন সহজেই কীর্তনগানে সে আপন আবেগ সঞ্চারের পথ পেয়েছে; এখনও সেটা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়নি।'[৯১]

কীর্তন জনচিত্তকে এমনই উদ্বেল করেছিল যে হিন্দুস্থানী গানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বেও বাংলা গানের নিজস্ব ধারাটি আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: 'বাংলার রাধা-কৃষ্ণের লীলা গান হিন্দুস্থানী গানের প্রবল অভিযানকে ঠেকিয়ে দিলে। এই লীলারসের আশ্রয় একটি উপাখ্যান। সেই উপাখ্যানের ধারাটিকে নিয়ে কীর্তন গান হয়ে উঠেছিল পালা গান।'[৯২]

বাংলা গানে বিশেষ করে রবীন্দ্র-সংগীতে কথার যে প্রাধান্য তা কীর্তনের দান,

রবীন্দ্রনাথই এদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন : 'বাঙালীর কীর্তনগানে সাহিত্যে সংগীতে মিলে এক অপূর্ব সৃষ্টি হয়েছিল— তাকে প্রিমিটিভ এবং ফোক্ মুজিক বলে উড়িয়ে দেওয়া চলবে না। উচ্চ অঙ্গের কীর্তনগানের আঙ্গিক খুব জটিল ও বিচিত্র, তার তাল ব্যাপক ও দুরূহ, তার পরিচয় হিন্দুস্থানী গানের চেয়ে বড়ো।'[৯৩]

অন্যত্র তিনি বলেছেন : 'কীর্তন সংগীত আমি অনেককাল থেকেই ভালোবাসি। ওর মধ্যে ভাবপ্রকাশের যে নিবিড় ও গভীর নাট্যশক্তি আছে সে আর কোনো সংগীতে এমন সহজভাবে আছে বলে আমি জানিনে। সাহিত্যের ভূমিতে ওর উৎপত্তি, তার মধ্যেই ওর শিকড়, কিন্তু ওর শাখায় প্রশাখায় ফলেফুলে পল্লবে সংগীতের আকাশে স্বকীয় মহিমা অধিকার করেছে। কীর্তন সংগীতে বাঙালীর এই অনন্যতন্ত্র প্রতিভায় আমি গৌরব অনুভব করি।'[৯৪]

রবীন্দ্র-সংগীত এবং আধুনিক গীতিকবিদের গান যে পদাবলী কীর্তনের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবান্বিত সে কথা অনস্বীকার্য। কীর্তন ব্যতীত বাংলা গানের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অর্জন করা সম্ভব হত কিনা সন্দেহ।

পদাবলী কীর্তন এখনো আমাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এবং সাংস্কৃতিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংগ। সাহিত্যের উপর এর প্রভাবের কথা বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হবে বাংলা লিরিক বা গীতিকবিতার কথা। গীতিকবিতার গোড়ার অর্থ হল গান করবার জন্য রচিত কবিতা। পদাবলীও গান করবার উদ্দেশ্যেই রচিত হয়েছিল। বৈষ্ণব পদাবলী যে শুধুই আধুনিক বাংলা কবিতার মূল উৎসস্বরূপ তাই নয়, পদাবলীর ভাব, ভাষা, ছন্দ, অলংকার ইত্যাদি দীর্ঘকাল যাবৎ বাঙালী কবিরা ব্যবহার করে আসছেন। পদাবলী কীর্তনের প্রভাবের পরিচয় বহন করে ঢপ কীর্তন, পাঁচালী গান, কবিগান প্রভৃতি। অবশ্য একমাত্র কবিগানের কয়েকটি পদ ছাড়া পদাবলী সাহিত্যের গুণগুলি এদের মধ্যে বিশেষ দেখা যায় না। বিকৃতি দেখা যায় বরং বেশি। ভক্তের হৃদয়ের ব্যাকুলতার যে সুর বৈষ্ণব পদাবলীতে আছে তার অনুরণন শাক্ত পদাবলীতেও পাওয়া যায়, বিশেষ করে রামপ্রসাদের গানে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা কাব্যসাহিত্যে নবযুগের সূত্রপাত করেন মধুসূদন। তিনি বৈষ্ণব-পদাবলী শ্রদ্ধার সঙ্গে পাঠ করেছিলেন এবং এই অধ্যয়নের ফল আমরা দেখতে পাই তাঁর বিভিন্ন রচনায়। মধুসূদন পদকর্তাদের মত ভক্ত মহাজন ছিলেন না। তাই তিনি পদাবলী থেকে ভক্তির অংশটুকু বাদ দিয়ে শুধু তার সাহিত্য সৌন্দর্যটুকু নিয়েছেন। রাধাকৃষ্ণ লীলার এবং বৃন্দাবনলীলার পরিবেশের উল্লেখ পাওয়া যায় মধুসূদনের তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, বীরাঙ্গনা কাব্য প্রভৃতি রচনায়। ব্রজাঙ্গনা কাব্যে তিনি বিরহব্যাকুল রাধার মর্মবেদনা প্রকাশ করেছেন। তাঁর রাধা অবশ্য বৈষ্ণব কবির মহাভাব-স্বরূপিনী পরমপুরুষের হ্লাদিনী শক্তি নন। মধুসূদন পদাবলীর আঙ্গিক অংশত গ্রহণ করে বিরহক্লিষ্টা মানবী রাধাকে আমাদের নিকট উপস্থিত করেছেন। ব্রজাঙ্গনা কাব্যে বৈষ্ণব কবিদের মতো মধুসূদন ভণিতা ব্যবহার করেছেন, কোথাও বা বিরহবেদনা জর্জরিতা রাধাকে প্রাচীন মহাজনদের

নতোই সান্ত্বনা দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের মতো মধুসূদন বৈষ্ণব কবিদের ভাষা অনুকরণ করতে চেষ্টা করেননি। বৈষ্ণব কবিতার প্রাণরসকে বাংলা কাব্যের নবরূপ দিতে উদ্যোগী হয়েছিলেন মধুসূদন।

বঙ্কিমচন্দ্র যে বৈষ্ণব তত্ত্ব ও সাহিত্য সুগভীরভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন তার প্রমাণ তাঁর রচনাবলী থেকেই পাই। তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের দিক থেকে কৃষ্ণচরিত্র এক অদ্বিতীয় গ্রন্থ। ধর্মতত্ত্বে বঙ্কিম ভক্তিবাদের ব্যাখ্যা করেছেন। বিদ্যাপতি ও জয়দেব প্রবন্ধে এবং অন্যান্য নিবন্ধে বৈষ্ণব সাহিত্য সম্পর্কিত উল্লেখ থেকে এই বিষয়ে তাঁর গভীর অধ্যয়নের কথা জানা যায়। তাঁর 'আকাঙ্ক্ষা' এবং অন্যান্য কবিতায় বৈষ্ণব কাব্যের প্রভাব সুস্পষ্টরূপে ধরা পড়ে।

নবীনচন্দ্র সেনের 'ত্রয়ী কাব্য' রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস— পৌরাণিক আখ্যায়িকা এবং কল্পনার মিশ্রণে রচিত। পদাবলীর প্রভাব এই ধরনের কাব্যের উপরে পড়বার সুযোগ কম, কিন্তু একেবারে অনুপস্থিত নয়।

রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব পদাবলীর ভাব, ভাষা, অলংকার, উপমা ইত্যাদি যে গ্রহণ করেছেন তার প্রমাণ তাঁর সমগ্র রচনাবলীতে ছড়িয়ে আছে। নিজের রচনাকে পদাবলীর রসে ও সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ করেই রবীন্দ্রনাথ সন্তুষ্ট ছিলেন না; তিনি শিক্ষিত সমাজে পদাবলীর পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য নানাভাবে কাজ করেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষভাগ পর্যন্ত পদাবলী কীর্তন এমন এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল যে ইংরেজ শিক্ষিত সমাজ কীর্তনের পশ্চাদ্‌বর্তী পদাবলীর সাহিত্যমূল্য উপলব্ধি করতে আগ্রহ বোধ করেননি। কালীপ্রসন্ন সিংহ সেকালের কীর্তনীয়াদের সমাজ ও চরিত্র লক্ষ্য করেই হুতোম প্যাঁচার নকশায় পদাবলী কীর্তন সম্বন্ধে বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করেছেন।

পদাবলীর ঈশ্বর-ভজনার দিক বাদ দিলেও বিশুদ্ধ সাহিত্যমূল্য যে অপরিসীম তা শিক্ষিত সমাজকে অবহিত করাবার জন্য বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সহিত রবীন্দ্রনাথ নির্বাচিত পদাবলী পদরত্নাবলী নামে সম্পাদনা করেছিলেন ১২৯২ সালে। পদাবলী যে বাঙালীর নিজস্ব সম্পদ, তা যে আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ভিত্তিভূমি, সে কথা তিনি অননুকরণীয় ভাষায় প্রকাশ করেছেন :

'...প্রেমের শক্তিতে বলীয়সী হইয়া আনন্দ ও ভাবের এক অপূর্ব স্বাধীনতা প্রবল বেগে বাংলা সাহিত্যকে এমন এক জায়গায় উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে যাহা পূর্বাপরের তুলনা করিয়া দেখিলে হঠাৎ খাপছাড়া বলিয়া বোধ হয়। তাহার ভাষা, ছন্দ, ভাব, তুলনা, উপমা ও আবেগের প্রবলতা, সমস্ত বিচিত্র ও নতুন। তাহার পূর্ববর্তী বঙ্গভাষা বঙ্গসাহিত্যের সমস্ত দীনতা কেমন করিয়া এক মুহূর্তে দূর হইল, অলংকারশাস্ত্রের পাষাণবন্ধনসকল কেমন করিয়া এক মুহূর্তে বিদীর্ণ হইল, ভাষা এত শক্তি পাইল কোথায়, ছন্দ এত সংগীত কোথা হইতে আহরণ করিল? বিদেশী সাহিত্যের অনুকরণে নহে, প্রবীণ সমালোচকের অনুশাসনে নহে— দেশ আপনার বীণায় আপনি সুর বাঁধিয়া আপনার গান ধরিল।'[৯৫]

রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন তেরো চৌদ্দ তখন থেকেই তিনি বৈষ্ণব পদাবলী পাঠ করতে আরম্ভ করেন। পদাবলীর ছন্দ, রস, ভাষা, ভাব সমস্তই তাঁকে মুগ্ধ করত।[৯৬] পদাবলীর ভাব ও ভাষায় যখন হৃদয়-মন আচ্ছন্ন সেই অবস্থায় তিনি ব্রজবুলিতে রচনা করেছিলেন কয়েকটি পদ— যা পরে 'ভানুসিংহের পদাবলী'. (১৮৮৪) নামে প্রকাশিত হয়েছিল। ভাব ও ভাষায় এই পদগুলি বৈষ্ণব কবিদের এমনই সার্থক অনুকরণ হয়ে উঠেছিল যে পাঠকের পক্ষে ধারণা করা কঠিন ছিল প্রকৃত কবি সেই যুগের এক নবীন যুবক। বৈষ্ণব কবিদের ভাব অবলম্বনে মধুসূদন এবং আরও বহু কবি কাব্য রচনা করেছিলেন। কিন্তু ব্রজবুলির এরূপ সার্থক প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথের মতো কেউ করতে পারেননি। তাঁর পূর্বে একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্র 'মৃণালিনী' উপন্যাসে ভিখারিণী গিরিজায়ার মুখের দুটি গানে ব্রজবুলি ব্যবহার করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলি এবং অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের বহু কবিতায় পদাবলীর ভাবধারাকে নবরূপে প্রকাশ করেছেন। তাঁর কাব্যের উপর পদাবলী-সাহিত্যের গভীর প্রভাবের কথা কবি স্বীকার করেছেন মানুষের ধর্ম বক্তৃতামালায়।[৯৭]

গিরিশচন্দ্র ঘোষের ভক্তিরসের দুই নাটক 'চৈতন্যলীলা' ও 'বিল্বমঙ্গলে'ও পদাবলীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

বর্তমানকালের কবিদের মধ্যে কালিদাস রায়ের উপর পদাবলীর প্রভাব বোধ হয় সর্বাপেক্ষা বেশি পড়েছে। তাঁর 'বৃন্দাবন অন্ধকার', 'কুসুম শয়নে' প্রভৃতি রচনার বৈষ্ণব কবিদের ছায়া লক্ষণীয়। এই ধারার আর-একজন কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক। তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রাইকমল' উপন্যাস হলেও একটি বৈষ্ণব পদের মতোই করুণ-মধুর রসে স্নিগ্ধ।

দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকজন লেখক ও গ্রন্থের নাম শুধু উল্লেখ করা হল। বিস্তৃত আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। কিন্তু একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি যেসব লেখক শ্রদ্ধাশীল তাঁরা কেউ পদাবলী সাহিত্যকে এড়িয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেননি। প্রভাবটা কোথাও প্রত্যক্ষ; আবার কোথাও তা অন্তরালবর্তী।

পদাবলী সাহিত্যের উপর প্রতি বৎসরই উৎকৃষ্ট সমালোচনা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এর ফলে আমাদের সমালোচনা সাহিত্য বিশেষরূপে সমৃদ্ধ হয়েছে। পদাবলী এখনও পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত এবং পদাবলীর নতুন নতুন সুসম্পাদিত সংকলন গ্রন্থও প্রকাশিত হয়। ভারতের অন্য কোনো আঞ্চলিক ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলী নিয়ে এখনো এমন চর্চা হয় বলে আমরা জানি না।

বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনে আজো পদাবলী সাহিত্য গৌরবের আসন অধিকার করে আছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বৈষ্ণব-পরবর্তী যুগের বাংলা সাহিত্যে পদাবলীর প্রভাব নির্দেশ করা চলে না। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের শব্দ-সম্ভারে, ছন্দে, সংগীতে, রূপকল্পে, উপমায়— সকল ক্ষেত্রেই পদাবলীর গভীর প্রভাব ওতঃপ্রোতভাবে ছড়িয়ে আছে।

হিন্দী কৃষ্ণকাব্য সম্বন্ধে এমন কথা বলা চলে না। বল্লভাচার্যের নেতৃত্বে যে কাব্যধারা বিকাশ লাভ করেছিল তাকে অক্ষুণ্ণ রেখে আরো প্রবল করে তোলবার মতো কোনো প্রেরণার আবির্ভাব হিন্দী সাহিত্যে ঘটেনি। বরং হিন্দী কাব্যে রামের মর্যাদা বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষ্ণের প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়ল। হিন্দী সাহিত্যে ভক্তিযুগের পরে কৃষ্ণ ক্রমশ একটু একটু করে দূরে সরেছেন, তাঁর স্থান অধিকার করতে এগিয়ে এসেছেন রাম।

ভক্তিযুগের কবিরা গোপী-কৃষ্ণের মিলনাকাঙ্ক্ষার মধ্যে জীবাত্মা-পরমাত্মার মিলনের চিরন্তন ব্যাকুলতা উপলব্ধি করেছিলেন। এই দার্শনিকতা রীতিযুগে অনেকটা ম্লান হয়ে গেল। কৃষ্ণকাব্যের কবিদের নিকট কৃষ্ণ শৃঙ্গার রসের নায়ক হিসাবে প্রাধান্য লাভ করলেন। অলৌকিক ভক্তিময় প্রেমরসের স্থানে এল কৃষ্ণনামাঙ্কিত পার্থিব শৃঙ্গার রস। রীতিযুগের অধিকাংশ কবি শব্দ-সম্পদে, ছন্দে এবং উপমা-প্রয়োগে ক্ষমতার পরিচয় দিলেও কৃষ্ণকাব্যের আত্মাকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হননি। নাগরীদাস, ব্রজবাসীদাস, ঘনানন্দ, রত্নকুঁওারী বিবি প্রভৃতি কয়েকজন কবি বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছেন এবং তাঁদের রচনায় কোথাও কোথাও অকৃত্রিম ভক্তির সুর ধ্বনিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে কবি ঘনানন্দের কথা বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য। তিনি মীর মুন্সীর পদ ত্যাগ করে কৃষ্ণোপাসক হন। তিনি লিখলেন,

জান ঘন আনন্দ আনোখো য়হ্ প্রেম-পন্থ,
ভুলে তে চলত রহৈঁ সুধি কে থকিত হৈব।[৯৮]

অর্থাৎ, কবি জানেন অমূল্য এই প্রেম বিষয়াসক্তি ভুলিয়ে কৃষ্ণপ্রেমে মগ্ন করে তোলে। সতর্ক বিষয়ী ব্যক্তি প্রেমহীন জীবন-পথে চলতে গিয়ে সহজেই ক্লান্ত হয়ে পড়েন।

গৌড়ীয় সম্প্রদায়ভুক্ত প্রিয়াদাসের নামও উল্লেখযোগ্য। তিনি নাভাদাসের ভক্তমাল গ্রন্থের ভক্তিরসবোধিনী নামক টীকা রচনা করেন। চৈতন্যদেবের স্তুতি এই টীকাগ্রন্থের এক বিশেষ আকর্ষণ।[৯৯]

রীতিযুগে ভজন ও কীর্তনের প্রাধান্য দেখা যায়। এদের মাধ্যমে কৃষ্ণকাব্যের রচয়িতারা তাঁদের কলাকৌশল-প্রকাশে সচেষ্ট ছিলেন। কাব্যের আঙ্গিক অতিক্রম করে তাঁরা নানা রাগ, তাল ইত্যাদির সাধনাও করতেন।[১০০]

সাহিত্যের কোনো ধারার প্রভাব কত গভীর তার বিচার করা যায় সেই ভাষার লোকসাহিত্য আলোচনা করলে। কারণ সাহিত্যের ভিত্তি লোকমানসে। এই ভিত্তি রচিত হয় দুটি উপায়ে। এক, লোকমানসে সৃষ্ট লোকসাহিত্যের প্রভাব; দুই, সমাজের উপরতলায় রচিত সাহিত্যের লোকমানসের উপর প্রভাবের ফলে সৃষ্ট সাহিত্য। পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন সূরদাসের পদাবলী সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন এই প্রসঙ্গে তা প্রণিধানযোগ্য: 'সূর কে পদো মে ঐসে অনেক স্থল হৈ জো ব্রজপ্রদেশ কী লোকসংস্কৃতি কী ঔর সংকেত করতে হৈ। সূর-সাগর মে লোকোক্তিয়াঁ ঔর মুহাবরো কা সহজ প্রয়োগ দেখকর য়হ স্পষ্ট প্রতীত হোতা হৈ কি সূরদাস নে ভাষা

কো গঢ়নে কা প্রযত্ন নহী কিয়া হৈ, বল্কি লোক মে প্রচলিত টকসালী ভাষা কো জ্যোঁ কা ত্যোঁ উঠাকর রখ দিয়া হৈ।'[১০১] অর্থাৎ, সূরদাসের পদে অনেক স্থানেই ব্রজ-প্রদেশের সংস্কৃতির সংকেত পাওয়া যায়। তা ছাড়া সূরসাগরে এমন সব বাগ্‌ধারা ও প্রবাদবাক্য ব্যবহার করা হয়েছে, যা দেখে স্পষ্টই মনে হয়, সূরদাস ভাষাকে নতুন করে গড়ে তোলার চেষ্টা করেননি, বরং সে যুগে লোকপ্রচলিত ভাষা যে ভাবে ছিল সে ভাবেই ব্যবহার করেছেন। আচার্য রামচন্দ্র শুক্ল বলেছেন যে, সূরদাসের পদাবলী হয়ত কোনো প্রচলিত গীতিকাব্যধারার পূর্ণতম বিকশিত রূপ।[১০২] রাহুলও এ-সিদ্ধান্ত সমর্থন করেছেন।

পরবর্তীকালে হিন্দীর বিভিন্ন উপভাষায় আমরা যেমন কিছু মৌলিক কৃষ্ণ কাহিনীর সন্ধান পাই, তেমনি ভক্তিযুগের ভক্ত কবিদের অনুকরণে লোকগীতি রচনারও প্রমাণ মেলে। মৈথিল লোকসাহিত্যে ঝুমর, শ্রমগীত, ঋতুগীত, বারহমাসা, মধুশ্রাবণী, ছটগীত, বিবাহগীত ইত্যাদি বহুবিধ লোকসংগীতের প্রচলন আছে। এই বহুবিধ লোকগীতের অন্যতম গবালরি। গবালরি-গীতের বৈশিষ্ট্য হল শ্রীকৃষ্ণের বালক্রীড়ার সুচারু চিত্রণ।

যমুনা তীর বসথি বৃন্দাবন,
সংগহিঁ গেলোঁ নহায়
কে এহনি কয়লন্হি অন্যায়,
বংশী লেলন্হি চোরায়।[১০৩]

অর্থাৎ যমুনার তীরে বৃন্দাবন। কৃষ্ণ যশোদাকে বলছেন, মা, আমি নিজের বন্ধুদের সংগে স্নান করতে গিয়েছিলাম। না জানি কে এমন অন্যায় কাজ করেছে, আমার বাঁশী চুরি করে নিয়েছে।

কৃষ্ণের বাঁশী চুরির ব্যাপারটি ভক্তিযুগের কবিদের রচনাতেও পাওয়া যায়। সূরদাসের একটি পদে আছে কৃষ্ণ যশোদাকে সতর্ক করে দিচ্ছেন রাধা যেন তাঁর বাঁশি চুরি করে নিয়ে যেতে না পারেন।[১০৪]

ভোজপুরী লোকগীতে গোপীকৃষ্ণের প্রেমলীলার এমন সব চিত্র পাওয়া যায় যা ভক্তিযুগের কবিরাও অংকিত করেছেন।

লোকগীতি ব্যতীত লোকনাট্যের মধ্যেও কৃষ্ণকাহিনী এক মুখ্য ভূমিকা অধিকার করেছিল। রুক্মিণী হরণ, গোপীকৃষ্ণ নাটক ইত্যাদি এই শ্রেণীর নাটকের দৃষ্টান্ত। এখনও পল্লী অঞ্চলে মেলায় ও নানাবিধ উৎসব উপলক্ষে লোকনাট্যের অভিনয় হয় তার মধ্যে কৃষ্ণকাহিনীর স্থান উপেক্ষণীয় নয়। ভক্তিযুগের বিভিন্ন কবিদের রচনার মাধ্যমে কৃষ্ণ-কেন্দ্রিক যেসব পৌরাণিক কাহিনীর প্রচলন হয়েছিল সেসব কাহিনীই গ্রামাঞ্চলের লোকনাট্যে স্থান লাভ করে।

মধ্যযুগীয় হিন্দী বৈষ্ণব ভক্তিধারা বস্তুবাদী আধুনিক যুগের রূঢ় বাস্তবতার মধ্যেও লুপ্ত হয়ে যায়নি। হিন্দী সাহিত্যে আধুনিক যুগের আরম্ভ সং ১৯০০ বিক্রমাব্দ থেকে। ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রকে যুগসন্ধির কবি বলা যেতে পারে। তাঁর

রচনায় প্রাচীন ও নবীনযুগের সংমিশ্রণ পরিস্ফুট। তিনি তাঁর পূর্বসূরিদের কৃষ্ণকাব্যে অবগাহন করে আধুনিক ধ্যানধারণার সঙ্গে তাকে মিলিত করে নতুন কৃষ্ণচরিত্র সৃষ্ট করলেন। তবে বল্লভ-ভক্তিবাদের প্রতি অনুরক্ত হওয়ায় তাঁর রচনায় বাল্যলীলার প্রত্যেকটি প্রসঙ্গ প্রাধান্য লাভ করেছে। কৃষ্ণের জন্ম, দোলায় দোলা, চলতে শেখা ইত্যাদি প্রসঙ্গ ভক্তিযুগের কবিদের বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়।

সখী রী দেখহু বাল-ৱিনোদ।
খেলত রাম কৃষ্ণ দোউ আঁগন কিলকত হঁসত প্রমোদ॥
ববহুঁ ঘুটরুঅন দৌরত দৌউ, মিসি ধূলধূসরিত গাত।
দেখি দেখি য়হ্‌ বাল-চরিত-ছবি, জননী বলি বলি জাত॥[১০৫]

অর্থাৎ, শিশু কৃষ্ণ অঙ্গনে হামা দিয়ে ছুটে ছুটে বলরামের সঙ্গে খেলা করছেন, কখনও দুজনে আনন্দে হাসছেন। ধূলিধূসরিত শিশু কৃষ্ণের এই খেলা দেখে জননী যশোদা মুগ্ধ হচ্ছেন এবং তাঁর বালাই নেচেছন।

ভারতেন্দু বৈষ্ণব কবিদের ভাষার বৈশিষ্ট্য যথাসম্ভব রক্ষা করেছেন। তা ছাড়া কৃষ্ণলীলার পদগুলিতে সূরদাস, পরমানন্দ দাসের মতো কৃষ্ণজীবনের ক্রমবিবর্তনের ছবিটিও সযত্নে চিত্রিত হয়েছে। তাঁর কৃষ্ণলীলায় ভক্তহৃদয়ের তন্ময়তা যেমন দেখি তেমনি একালের কবি হিসাবে তিনি কৃষ্ণকে রাষ্ট্রনায়ক হিসাবে পাঠকের নিকট উপস্থিত করেছেন। কিন্তু এখানে কৃষ্ণ রামরূপে পরিচিত। ভারতেন্দু রাম এবং কৃষ্ণকে একসঙ্গে মিলিত করেছেন।

এছাড়া তাঁর গীতিনাট্য চন্দ্রাবলীতে প্রাচীন ও নবীন কৃষ্ণ একান্ত হয়ে এক নব-যুগের সূচনা করেছে।

আধুনিক যুগের প্রারম্ভেই আর-একজনকে স্মরণ করা যেতে পারে, তিনি অযোধ্যা-সিংহ উপাধ্যায় (হরিঔধ)। হিন্দী সাহিত্যে ভক্তি ও বৈষ্ণবানুরাগের উজ্জ্বল নিদর্শন হরিঔধের প্রিয়-প্রবাস গ্রন্থ। এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু কৃষ্ণের বৃন্দাবন ত্যাগ ও মথুরা গমন। কৃষ্ণবিরহে ব্রজবাসী, নন্দ-যশোদা ও পশুপক্ষীদের হৃদয়বিদারক বেদনা কবির রচনায় রূপায়িত হয়েছে।

ডঃ ধর্মবীর ভারতীর অন্যতম গ্রন্থ কানুপ্রিয়া আঙ্গিকের দিক থেকে পূর্বসূরিদের বিশেষ রূপে স্মরণ করিয়ে দেয়। তবে প্রেমলীলা, মঞ্জুরীপরিণয়, রাধা বিরহ ইত্যাদির মধ্যে ভক্তিযুগের কবিদের আত্মস্থ ভাবটি খোঁজা ব্যর্থ চেষ্টা মাত্র।

হিন্দী সাহিত্যের আধুনিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি মৈথিলীশরণ গুপ্ত। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ বিষ্ণুপ্রিয়া। এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু চৈতন্যের সন্ন্যাস ও গৃহত্যাগ। কবি বিষ্ণুপ্রিয়ার বেদনার চিত্র অঙ্কনের সঙ্গে সঙ্গে শচীমাতার বেদনাকেও তুলে ধরতে ভোলেননি। অবশ্য নিছক বিষয়বস্তুর দিক থেকে কৃষ্ণকাহিনীর সঙ্গে এ কাব্যের হয়ত যোগ নেই। কিন্তু ভাবের দিক থেকে একগোত্রীয়। এছাড়া দ্বারকা-প্রসাদ মিশ্রের কৃষ্ণায়ণ সাম্প্রতিক হিন্দী সাহিত্যে কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ একথা বলা যেতে পারে। তুলসীদাসের অনুকরণে দোঁহা ও চৌপাইয়ের রীতিতে

লেখা কৃষ্ণজীবনের প্রত্যেকটি ঘটনা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ডঃ রাজেন্দ্র-প্রসাদ 'কৃষ্ণায়ণ' গ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করেছেন সেটিও এখানে গ্রহণ করা যেতে পারে, 'কৃষ্ণায়ণ মে জন্ম সে স্বর্গারোহণ তক কী সভী ঘটনাওঁ কো ক্রম-বন্ধ করকে দর্শায়া গয়া হৈ'।[১০৬] অর্থাৎ, কৃষ্ণায়ণ গ্রন্থে কৃষ্ণের জন্ম থেকে স্বর্গারোহণ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা ক্রমবন্ধ ভাবে দেখানো হয়েছে। কবির উপর সুরদাসের প্রভাব নিঃসন্দেহে প্রবল। এটি লক্ষ্য করে ডঃ শ্রীনিবাস শর্মা 'আধুনিক হিন্দী কাব্য মেঁ বাৎসল্য রস' গ্রন্থে বলেছেন, 'য়হ উল্লেখনীয় হৈ কি জো বাল চরিত কৃষ্ণায়ণ মে বর্ণিত হৈ উস পর সুর কা স্পষ্টতঃ প্রভাব হৈ ঔর উসকে লিয়ে কবি নে স্বয়ং ভী গ্রন্থকে প্রারম্ভ মে সংকেত কর দিয়া হৈ।'[১০৭] এটি উল্লেখনীয় যে কৃষ্ণায়ণ গ্রন্থে বাল্য লীলার বর্ণনায় কবির উপর সুরদাসের প্রভাব স্পষ্ট। স্বয়ং কবিও এই গ্রন্থের আরম্ভে তার ইঙ্গিত দিয়েছেন।

সুরদাস পদজ্যোতি সহারে,
বরণে বাল-চরিত মৈ সারে।[১০৮]

অর্থাৎ সুরদাসের পদজ্যোতির সাহায্যে আমি কৃষ্ণের বাল্যলীলার বর্ণনা করছি।

কাব্য ব্যতীত হিন্দী সাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রেও অল্পবিস্তর বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এই প্রসঙ্গে উদয়শঙ্কর ভট্টের রাধা গীতিনাট্যটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

বৈষ্ণব কাব্যের যে প্রভাব আজ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে লক্ষ্য করা যায় হিন্দী সাহিত্যে তেমন প্রভাব লক্ষণীয় নয় দুটি কারণে। প্রথমত, পূর্বেই বলা হয়েছে ভক্তিযুগের পরে রাম সমগ্র হিন্দীভাষী অঞ্চলে প্রাধান্য লাভ করে কৃষ্ণকে অনেকটা আচ্ছন্ন করেছেন। বৈষ্ণব ধর্ম ও সাহিত্য চৈতন্যদেবের জীবন ও বাণী থেকে যে প্রেরণাধারা বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে তেমন কোনো ব্যক্তিত্ব হিন্দী কৃষ্ণ-কাব্যকে প্রেরণা দান করেনি। দ্বিতীয়ত, বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখবার পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়েছে বাংলার কীর্তন গান। মহাজন পদাবলী সুর সহযোগে বিভিন্ন উপলক্ষে গীত হয়ে জনচিত্তে স্থায়ী আসন লাভ করেছে। কীর্তন হিন্দীভাষী অঞ্চলে এরূপ জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি। সেখানে কীর্তনের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল এবং এখনও আছে রাগসংগীত, যে সংগীতের প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল মোগল সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায়। সুরদাস, মীরা প্রভৃতি ভক্তকবিদের যেসব পদাবলী গীত হয় সে ভজন রাগসংগীতেরই অন্তর্ভুক্ত। বাংলার কীর্তনের মতো তার বিশেষ রূপ বা বিশেষ আবেদন নেই।

নির্দেশিকা

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যোগাযোগ, রবীন্দ্ররচনাবলী, ৯ম খণ্ড, পৃ ১৮৩

২. শাণ্ডিল্যভক্তিসূত্রম্, প্রথম আহ্নিক, ২

৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা, রবীন্দ্ররচনালী, ১৮শ খণ্ড, পৃ ৪২৮

৪. শতপথ ব্রাহ্মণ, প্রথম কাণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়, পঞ্চম ব্রাহ্মণ।

৫. Majumdar, B.B., *Krisna in History and Legend.*

৬. পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী, 'বাসুদেবার্জুনাভ্যাং বুন্'।

৭. Rufus Quintus Curtius, *The History of Alexander the Great*, p. 293

('The image of Hercules was carried before the infantry ; their Supreme incitement to heroic acts.')

৮. Archaeological Survey of India, Annual Report for 1908-1909.

৯. *An Anthology of Sanskrit Court Poetry*, p. 93.

১০. পরবর্তী অধ্যায়ে এই প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

১১. Majumdar, R. C., and others, *An Advanced History of India*, p. 205

১২. গৌড়ীয় দর্শনে পরমার্থের আলোক, পৃ ১৫৬-৫৭

১৩. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সাংস্কৃতিকী, ২য় খণ্ড, ২০৫ পৃ উদ্ধৃত। একটু ভিন্ন রূপ পাওয়া যায় পদ্মপুরাণের (উত্তর খণ্ড) 'ভক্তিনারদসমাগম' অধ্যায়ে। যমুনাতীরে তরুণীরূপী ভক্তি নারদমুনিকে এই শ্লোকে বলেছেন তাঁর জীবনের কথা।

১৪. 'বৈষ্ণবের ক্ষেত্রে এই সাধন-সঙ্গীত রচনা শ্রীরূপ গোস্বামীর প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফল। কিন্তু হুসেন শাহের অন্যতম মন্ত্রী আরবী-ফারসীতে পাবঙ্গম শ্রীরূপ এ বিষয়ে অন্তত অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন সুফী সাধকের দ্বারা। এই প্রসঙ্গে বিশ্ববরেণ্য মনীষী অধ্যাপক ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—Divine worship by means of songs and chants and with music was nothing new in India. But an almost frenzied worship through singing, music and dancing seems to have been a new thing in the mediaeval religious life of India, particularly in Vaishnava Bengal ; and although I do not insist that herein we have an incidence of influence from Sufism on Bengal Vaishnavism, yet it appears quite reasonable to assume that a form of Sufi worship through a sort of frenzied singing or repetition of a divine name (Sikror Zikr) which raised religious

emotion to the highest pitch, acted as a stimulus upon a similar path or line of Vaishnava religious Sadhan in Mediaeval India. (*Islamic Mysticism, Iran and India, Indo-Iranica* ; Vol. I, Oct. 1946.)'

শুকদেব সিংহ, শ্রীরূপ ও পদাবলী সাহিত্য, পৃ. ১৪

১৫. কবি কর্ণপুরের রচিত বলে প্রসিদ্ধ 'শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়' পদ্মপুরাণের শ্লোক হিসাবে উদ্ধৃত। কিন্তু পদ্মপুরাণের কোনো মুদ্রিত সংস্করণে শ্লোকটি পাওয়া যায় না। হয় এটি প্রক্ষিপ্ত অথবা পদ্মপুরাণের এমন কোনো পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্তব্য যা মুদ্রিত হয়নি। দ্রঃ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ, পৃ ১৯৪

১৬. শশিভূষণ দাশগুপ্ত, শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ, দর্শনে ও সাহিত্যে ; ৩য় সংস্করণ, পৃ ৮৬

১৭. Hiriyanna, M., *Outlines of Indian Philosophy*, p. 383.

১৮. বিপিনচন্দ্র পাল, সাহিত্য ও সাধনা, পৃ ১৩৮-৩৯

১৯. দীনেশচন্দ্র সেন, বৃহৎ বঙ্গ, ২য় খণ্ড, পৃ ৬৯০

২০. ক্ষিতিমোহন সেন, চিন্ময় বঙ্গ, পৃ ১৮৬

২১. অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি, ২য় সং, পৃ ১১৮ দ্রষ্টব্য।

২২. রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলা দেশের ইতিহাস, প্রাচীন যুগ, ৩য় সং, পৃ ১৪৩

২৩. *Encyclopaedia of Religion and Ethics*, Vol. II, p. 493.

২৪. De, S. K., *Early History of the Vaisnava Faith and Movement in Bengal* (2nd ed.) p. 5.

২৫. Tattvabhusan, Sitanath, *Krishna and the Puranas*, p.67.

২৬. De, S. K., *op. cit.*, p. 6.

২৭. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণচরিত্র।

২৮. Keith, A. B., *Sanscrit Drama*, p. 45.

২৯, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য ২।৭৭

৩০. বিমানবিহারী মজুমদার, ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য, পৃ ১৮১

৩১. Chatterji, Suniti Kumar, *Jayadeva*, p. 40.

৩১ক. *Gatha-Saptasati*, Ed. by R. G. Basak, p. 5.

৩২. তদেব, ১ম শতক, ৩য় শ্লোক।

৩৩. তদেব, ১ম শতক, ২য় শ্লোক।

৩৪. নীলরতন মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক। চণ্ডীদাসের পদাবলী, পৃ ৩০২

৩৫. *Op. cit.*, Ed. by R. G. Basak, ১ম শতক, ৪৫শ শ্লোক।

৩৬. *Subhashitaratnakosha*, Ed. by Daniel H. H. Ingalls, Introduction.

৩৭. বিমানবিহারী মজুমদার, গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ, পদ নং ৩৬১, পৃ ১৮৬-৮৭।

৩৮. বিমানবিহারী মজুমদার, ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য, পৃ ১৮৪

৩৯. প্রাকৃতপৈঙ্গল, পদনং ৩৮, পৃ ৩৫৮

৪০. তদেব, পদ নং ৯, পৃ ১২

৪১. বড়ু চণ্ডীদাস, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, পদ নং ১৬, পৃ ১৫৭

৪২. Chatterji, S. K., *Jayadeva*, P. 11.

৪৩. বিমানবিহারী মজুমদার, ষোড়শ শতকের পদাবলী সাহিত্য, পৃ ১৭১

৪৪. স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, পদাবলী কীর্তনের ইতিহাস, ১ম ভাগ, পৃ ৬

৪৫. কালিদাস, মেঘদূতম্, উত্তরমেঘ, ২৫

৪৬. শার্ঙ্গদেব, সংগীতরত্নাকর, ৪।৬

৪৭. জয়দেব, গীতগোবিন্দম্, ১।৩

৪৮. সুকুমার সেন, ভাষার ইতিবৃত্ত, ৪র্থ সংস্করণ, পৃ ২০১

৪৯. Sen, Sukumar., *A History of Brajabuli Literature*, Ch. 1.

৫০. *Ibid*, Ch. 14.

৫১. খগেন্দ্রনাথ মিত্র, কীর্তন, পৃ ৪

৫২. বড়ু চণ্ডীদাস, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (বংশীখণ্ড), পৃ ২৯৪

৫৩. কৃষ্ণদাস কবিরাজ, চৈতন্যচরিতামৃত, ১।১৩।৪২, পৃ ২৪৬

৫৪. দীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৮ম সং, পৃ ১৩০

৫৫. নীলরতন মুখোপাধ্যায়, চণ্ডীদাসের পদাবলী, পৃ ৩০

৫৬. দীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৮ম সং, পৃ ১৩১ হইতে উদ্ধৃত।

৫৭. মালাধর বসু, শ্রীকৃষ্ণবিজয়, খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত, পৃ ১৮৯

৫৮. সুখময় মুখোপাধ্যায়, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম, পৃ ৭২

৫৯. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড (পূর্বার্ধ), পৃ ৩৯৭

৬০. বিমানবিহারী মজুমদার, গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ, পদ ৩৬১, পৃ ১৮৭

৬১. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, পৃ ১০৭

৬২. বিমানবিহারী মজুমদার, ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য, পৃ ৫০

৬৩. নামদেব, সন্ত নামদেব কী হিন্দী পদাবলী, পদ নং ২১০, পৃ ৯৯

৬৪. বিদ্যাপতি, বিদ্যাপতির পদাবলী, পদ নং ৩২, পৃ ২৭

৬৫. জয়দেব, গীতগোবিন্দম্, ১।১

৬৬. সুরদাস, সুর সাগর, পদ নং ৬৮৪, পৃ ৫০০

৬৭. প্রভুদয়াল মীতল, চৈতন্য মত ঔর ব্রজসাহিত্য, পৃ ১৯৭

৬৮. মীরাবাঈ, মীরা-মাধুরী, পদ নং ৮, পৃ ৪

৬৯. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড (পূর্বার্ধ), পৃ ৩১৮

৭০. শশিভূষণ দাশগুপ্ত, শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ,দর্শনে ও সাহিত্যে, চতুর্দশ অধ্যায়

৭১. চৈ. চ, মধ্যলীলা ২১।১০১

৭২. *Bombay Sanskrit Series*, II, 36.

৭৩. Keith, A. B., *History of Sanskrit Drama*, J. R. A. S., for 1911, 1912, 1916.

৭৪. Krishnamachariar, M., *History of Classical Sanskrit Literature*, pp. 525-42.

৭৫. ভাগবত, ১১।১১।২৩

৭৬. Keith, A. B., *Sanskrit Drama*, p. 47.

৭৭. Hein, Norvin., *The Miracle Plays of Mathura*, p. 238.

৭৮. শশিভূষণ দাশগুপ্ত, শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ, দর্শনে ও সাহিত্যে, পৃ ১১০

৭৯. Abul Fazl, *Ain-i-Akbari*. Tr. by Col. H. S. Jarret., Rev. Ed., 1948, V. 3. p. 272.

৮০. Sen, D. C., *History of Bengali Language and Literature*, p. 324.

৮১. নীহাররঞ্জন রায়. বাঙ্গালীর ইতিহাস, পৃ ৭৩৩

৮২. তদেব, পৃ ৭৩৩

৮৩. দীনেশচন্দ্র সেন, বৃহৎ বঙ্গ, ২য় খণ্ড, পৃ ৯৭২

৮৪. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড (পূর্বার্ধ), পৃ ৪০৩

৮৫. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোক-সাহিত্য, ১ম খণ্ড, ২য় অধ্যায়।

৮৬. রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলা দেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ, পৃ ৩৭২

৮৭. দীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৮ম সং, পৃ ১০২

৮৮. সুকুমার সেন বৈষ্ণবীয় নিবন্ধ পৃ ৫১

৮৯. Kern J. H. K., *Manual of Indian Buddhism*. p. 124

৯০. হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী, উস যুগ কী সাধনা ঔর তাৎকালিক সমাজ, হরবংশলাল শর্মা সম্পাদিত 'সূরদাস' সংকলন-গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

৯১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জাভাযাত্রীর পত্র, রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৯শ খণ্ড, পৃ ৪৯০

৯২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সংগীতচিন্তা, পৃ ১১০

৯৩. তদেব, পৃ ২৩৮

৯৪. তদেব, পৃ ২৩৮

৯৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্য, রবীন্দ্ররচনাবলী, ৮ম খণ্ড, পৃ ৪৪৩-৪৪

৯৬. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী, ১ম খণ্ড, পৃ ৬১

৯৭· বিমানবিহারী মজুমদার, রবীন্দ্র সাহিত্যে পদাবলীর স্থান, পৃ ৩-৪,

৯৮· ঘনানন্দ, ঘনানন্দ গ্রন্থাবলী, পদ ২৯৬, পৃ ৯৫

৯৯· ভগীরথ মিশ্র, সম্পাদক, হিন্দী সাহিত্য কা বৃহৎ ইতিহাস, ৭ম ভাগ, পৃ ২৩৪

১০০· তদেব, পৃ ২৬৪

১০১· রাহুল সাংকৃত্যায়ন, সম্পাদক, হিন্দী সাহিত্য কা বৃহৎ ইতিহাস, ১৬শ ভাগ. পৃ ১৪

১০২· রামচন্দ্র শুক্ল, হিন্দী সাহিত্য কা ইতিহাস পৃ ১৬০

১০৩, রামইকবাল সিংহ রাকেশ, সম্পাদক, মৈথিলী লোকগীত, পদ ২, পৃ ৩৩৯

১০৪· দ্রষ্টব্য : সুরসাগর, পদ ৩৪৪১, ৪০৫৯, পৃ ১৩০৯

১০৫· ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র. ভারতেন্দু গ্রন্থাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ ৪৭

১০৬· ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ কৃষ্ণায়ণের ভূমিকা, পৃ ২

১০৭· ডঃ শ্রীনিবাস শর্মা, আধুনিক হিন্দী কাব্য মেঁ বাৎসল্য রস, পৃ ২১৪

১০৮· দ্বারকাপ্রসাদ মিশ্র, কৃষ্ণায়ণ, ১৷৩৷৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

বৈষ্ণব সাহিত্যে রস

রসের সংজ্ঞা

সাহিত্য, নাটক, চিত্রকলা, সংগীত প্রভৃতির গুণ ও প্রকৃতি বিচারে রসের প্রসঙ্গ উল্লেখ অপরিহার্য। সুতরাং বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য আলোচনায়ও রসের কথা না তুলে উপায় নেই। শুধু পদাবলী সাহিত্যের মর্ম আস্বাদনের জন্য নয়, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের তাত্ত্বিক কাঠামোর স্বরূপ উপলব্ধি করবার জন্যও রস কী, সে সম্বন্ধে ধারণা থাকা প্রয়োজন। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে ব্যাখ্যাত রসের প্রয়োগকে ধর্মের ক্ষেত্রে প্রসারিত করে গৌড়ীয় শাখার তাত্ত্বিকরা বৈষ্ণব ধর্মের ব্যাখ্যা করেছেন। এই ধর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, ধর্মের ভাব ও অনুভূতিকে শিল্প সাহিত্যের রসানুভূতির মতো বিচার বিশ্লেষণ করা। রসানুভূতির লক্ষণ, ক্রমপর্যায় এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি ধর্মানুভূতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন রূপ গোস্বামী প্রমুখ ভক্ত ও তাত্ত্বিক পণ্ডিতরা। পদাবলীতে সাহিত্য ও ধর্ম অঙ্গাঙ্গি যুক্ত। বাংলার বৈষ্ণব শাস্ত্রানুযায়ী রসের ব্যাকরণ এই উভয় শাখাতেই সমান প্রযোজ্য।

রস শব্দের আভিধানিক অর্থ হল 'রসেন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তু।' 'বিশ্বকোষ'কার এর ব্যাখ্যা করে লিখেছেন, 'রসনেন্দ্রিয় দ্বারা যে বস্তুর আস্বাদ গ্রহণ করা যায় তাহার নাম রস।' মনিয়্যর উইলিয়াম্‌স্‌ সংকলিত সংস্কৃত-ইংরেজী অভিধানেও রস ধাতুর মূল অর্থের উপরে জোর দেওয়া হয়েছে। ঐ অভিধানে 'রস' শব্দের অর্থ পাওয়া যায়: 'to taste, relish.' 'বঙ্গীয় শব্দকোষে' হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যান্য অর্থের সঙ্গে আস্বাদ গ্রহণের উপরেই জোর দিয়েছেন।

রসের প্রাচীনতম ব্যাখ্যাতা ভরতমুনিও আস্বাদনকেই প্রাধান্য দিয়ে বলেছেন,

'অত্রাহ রস ইতি কঃ পদার্থ ? আস্বাদ্যত্বাৎ।'[১] অর্থাৎ, রস কোন পদার্থকে বলা হয় ? যা আস্বাদিত হয় তা-ই 'রস'।

রস শব্দের এই মৌলিক অর্থের উপর ভিত্তি করেই দর্শনশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত এবং আলংকারিকেরা শিল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রে অর্থের বিস্তার ঘটিয়েছেন এবং মূল অর্থকে সমৃদ্ধ ও প্রসারিত করেছেন নব নব ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে। নতুন নতুন ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের ফলে রস আমাদের সমালোচনা সাহিত্যে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করতে পেরেছে।

অধ্যাপক রাধাগোবিন্দ নাথ গোড়ার অর্থ উল্লেখ করে বলেছেন, 'রস শব্দের দুইটি অর্থ— আস্বাদ্য বস্তু এবং রস আস্বাদক বা রসিক। রস শব্দের একরকম সাধারণ অর্থে (রস্যতে আস্বাদ্যতে ইতি রসঃ— এই অর্থে) আস্বাদ্য বস্তুমাত্রকে রস বলিলেও যে আস্বাদ্য বস্তুর আস্বাদনে চমৎকারিত্ব জন্মে তাহাকেই রস-শাস্ত্রে রস বলা হয়। অননুভূতপূর্ব বস্তুর অনুভবে, অনাস্বাদিতপূর্ব বস্তুর আস্বাদনে, চিত্তের স্ফারতা জন্মে, তাহাকেই বলা হয় চমৎকৃতি। এই চমৎকৃতিই হইতেছে রসের সার যা প্রাণ-বস্তু। এই চমৎকৃতি না থাকিলে কোনও আস্বাদ্য বস্তুকেই রস বলা হয় না।'[২]

আনন্দ বা সুখই প্রকৃতপক্ষে আস্বাদ্য বস্তু। 'চমৎকারি সুখং রস।' (অলংকারকৌস্তুভ ৬।৫।৫) অর্থাৎ, আনন্দ বা সুখ যখন চমৎকারিত্ব লাভ করে তখন তা রসে পরিণত হয়।

ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত রস ও কাব্যের স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে লিখেছেন, 'রস শব্দের একটি সাধারণ আর-একটি পারিভাষিক অর্থ আছে। সাধারণ অর্থে রস শব্দে স্বাদ, পারিভাষিক অর্থে রস শব্দে শৃঙ্গার, হাস্য, করুণা প্রভৃতি চিত্তবৃত্তি বুঝায়।'[৩]

অন্যত্র তিনি বলেছেন, 'আলংকারিকেরা বলেন যে, আমাদের চিত্তের মধ্যে কয়েকটি ভাব বা emotions অন্তরের গূঢ় প্রদেশ দিয়া প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে (যেমন রতি, হাস, করুণ ইত্যাদি)।...যখন লৌকিক কারণে ঐ সমস্ত ভাব উৎপন্ন না হইয়া কাব্য বা নাট্যশিল্পের দ্বারা উহা অভিব্যক্ত হয়, তখন ঐগুলিকে রস কহে। রস অর্থে সাধারণ emotion বুঝায় না। শিল্পের দ্বারা অভিব্যক্ত emotion বা ভাবকেই রস কহে।'[৪]

রসের অন্য একটি ব্যাখ্যায় ডঃ দাশগুপ্তের বক্তব্য স্পষ্টতর হয়েছে : 'সংক্ষেপে বলা যায় রস এক প্রকার আনন্দময় মানসিক অবস্থা মাত্র। কাব্যপাঠ, সহৃদয় লোকের মনে কাব্যের অনুরূপ ভাব সঞ্চারিত করিয়া তাঁহাকে এমন এক নৈর্ব্যক্তিক ও আদর্শ জগতে লইয়া যায় যে, তিনি তখন তদ্‌গত হইয়া পড়েন ; ফলে কাব্যের ভাবানুভূতির সহিত তাঁহার একাত্মতা সৃষ্টি হয় অথবা নাটক ইত্যাদির নায়ক নায়িকার মধ্যে তাঁহার আত্মবিলোপ ঘটে। এই আত্মবিলুপ্তির মধ্য দিয়া তিনি যে নির্মল আনন্দময় মানসিক অবস্থায় উপনীত হন, সেই অবস্থাকে রস বলে।'[৫]

বৈষ্ণব রসশাস্ত্রজ্ঞ খগেন্দ্রনাথ মিত্র সরল ভাষায় রসের মূল কথাটি বুঝিয়ে বলেছেন।

তিনি লিখেছেন : 'রস বলিতে আমরা সাধারণত বুঝি আনন্দ ; জড় জগতের রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শের মধ্যে দ্বিতীয়টি আমরা জিহ্বার দ্বারা আস্বাদন করিতে পারি। এইজন্য ইহার এক নাম রসনা। কটু তিক্ত কষায় লবণ অম্ল মধুর এই ছয়টি রসনেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য রস। আবার যাহা মনের আস্বাদ্য তাহাও রস নামে পরিচিত। কোনও বস্তু দর্শন করিলে বা কোনও চিন্তা চিত্তে উদিত হইলে যে অনির্বচনীয় আনন্দ অন্তঃকরণে অনুভূত হয়, তাহাকেও রস বলা হয়। কাব্যপাঠে বা অভিনয়-দর্শনেও এইরূপ আনন্দ মনোমধ্যে উদিত হয়। সেইজন্য অলংকারশাস্ত্রে নয় প্রকার রসের উল্লেখ আছে…।'[৬]

ডঃ সুধীরকুমার দাশগুপ্ত রসের এক সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা দিয়েছেন। সেই সংজ্ঞাটি হল এই : 'শব্দার্থজাত ভাব-তন্ময় চিত্তে আনন্দ-স্বরূপের প্রকাশই রস।'[৭] ডঃ দাশগুপ্তের সংজ্ঞা অনুসারে রস কেবলমাত্র শব্দার্থের আশ্রয়ে নাট্য বা কাব্য প্রভৃতিতে নিষ্পন্ন হতে পারে। কারণ তাঁর মতে সংগীত ও সুকুমার কলায় রসশাস্ত্রের প্রয়োগ লাক্ষণিক মাত্র।

এই প্রসঙ্গে দার্শনিকপ্রবর কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের সংজ্ঞা প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে রসের মোটামুটি দুটি অর্থ : 'এক, রস হল একটা সারাৎসার, যাকে বলে নির্যাস বা এসেন্স, অর্থাৎ কিনা একটা নির্যাসিত সত্ত্ব। দুই, রস হল একটা অনুভবের বিষয়, একটা আস্বাদ্য জিনিস। নন্দনতত্ত্বে এই দুটো অর্থই রস কথাটার মধ্যে একসঙ্গে মিশে আছে। এইরকম মিশ্রণের ফলে রস মানে দাঁড়িয়েছে অনুভূতির সারাৎসার—অনুভূতি—নির্যাস।'[৮]

অনুভূতির প্রাধান্য স্বীকার করেছেন রবীন্দ্রনাথও। সাহিত্যতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, 'আমাদের অলংকারশাস্ত্রে বলেছে, বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্। সৌন্দর্যের রস আছে, কিন্তু একথা বলা চলে না যে, সব রসেরই সৌন্দর্য আছে। সৌন্দর্যরসের সঙ্গে অন্য সকল রসেরই মিল হচ্ছে ঐখানে, যেখানে সে আমাদের অনুভূতির সামগ্রী। অনুভূতির-বাইরে রসের কোনো অর্থই নেই। রস মাত্রই তথ্যকে অধিকার করে তাকে অনির্বচনীয় ভাবে অতিক্রম করে। রসপদার্থ বস্তুর অতীত এমন একটি ঐক্যবোধ যা আমাদের চৈতন্যে মিলিত হতে বিলম্ব করে না। এখানে তার প্রকাশ আমার প্রকাশ একই কথা।'[৯]

এইসব সংজ্ঞায় রসের স্বরূপকে যথাসাধ্য স্পষ্ট করে তুললেও সম্পূর্ণরূপে তার রহস্য উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব হয়নি। কেননা, রসের উৎপত্তি হয় মনের গভীর গোপন অন্ধকার গহ্বরে। অতুলচন্দ্র গুপ্ত এই প্রসঙ্গে বলেছেন, 'কাব্যরসের আধার কাব্যও নয়, কবিও নয়— সহৃদয় কাব্যপাঠকের মন।'[১০] সহৃদয় সামাজিকের আস্বাদনের প্রকৃতির উপরেই রসের প্রকৃতিও নির্ভর করে। আস্বাদন-ক্রিয়া ব্যক্তির মনের সঙ্গে এমনই অচ্ছেদ্যরূপে যুক্ত যে তাকে বাইরে এনে শব্দের সাহায্যে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা যায় না। রস অনুভবের জিনিস ; তাই সংজ্ঞার বন্ধন সে অনেকটাই এড়িয়ে যায়।

রসের যে-সব ব্যাখ্যা উপরে উদ্ধৃত করা হয়েছে, তাদের মূল ভিত্তি সংস্কৃত আলংকারিকদের বহু শতাব্দী ব্যাপী রস-সম্পর্কিত বিচার-বিশ্লেষণ। ভরতমুনির প্রাথমিক সংজ্ঞা নানা আলংকারিকের বিচারে সংশোধিত, পরিবর্তিত ও নবীকৃত হয়েছে। এঁদের সকলের মিলিত ভাবনার নির্যাস পাই রসের উপরোদ্ধৃত ব্যাখ্যার মধ্যে।

রস সম্বন্ধে সুসম্বদ্ধ আলোচনা সর্বপ্রথম পাওয়া যায় ভরতমুনি-রচিত নাট্যশাস্ত্রে। পণ্ডিতদের মতে খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতকের মধ্যে কোনো এক সময়ে তিনি জীবিত ছিলেন। তাঁর কাল নিরূপণে কিছু অনিশ্চয়তা থাকলেও এটা সুনিশ্চিত যে তাঁর আবির্ভাবের পূর্বেই যথেষ্ট সংখ্যক কাব্য-নাটক প্রভৃতি রচিত হয়েছিল এবং সেই জন্যই রচনারীতি ও অভিনয়রীতি নিয়ে সোৎসাহ আলোচনা সম্ভব হয়েছে।

ভরত নাটক সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে নাট্যরস এবং সংশ্লিষ্ট ভাবগুলির ব্যাখ্যা করেছেন নাট্যশাস্ত্রের ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে। ষোড়শ অধ্যায়ে তিনি বিচার করেছেন অলংকার, দোষ, গুণ, লক্ষণ প্রভৃতি। অলংকারশাস্ত্র সম্বন্ধে একটি সার্বিক ধারণা, তা অসম্পূর্ণ হলেও, এখানেই প্রথম পাওয়া যায়। অবশ্য তাই বলে একথা বলা চলে না যে ভরতই অলংকারশাস্ত্রের প্রবর্তক। তাঁর পূর্বেও যে রসশাস্ত্রের অস্তিত্ব ছিল ডঃ সুশীলকুমার দে তা বলেছেন . 'That the Rasa-doctrine was older than Bharata is apparent from Bharata's own citation of several verses in the Arya and the Anustubh metres in support of or in supplement to his own statements, and in one place, he appears to quote two Arya-Verses from a unknown work on Rasa.'[১১]

ভরত অলংকার, গুণ, দোষ লক্ষণ ইত্যাদির আলোচনা করেছেন নাট্যরস সৃষ্টির উপাদান হিসাবে। রসকে প্রাধান্য দিয়ে ভরত বলেছেন, 'ন হি রসাদৃতে কশ্চিদর্থঃ প্রবর্ততে।' [নাট্যশাস্ত্র, ৬।২৭৩]। অর্থাৎ, রস ব্যতীত কোনো অর্থেরই প্রবৃত্তি সম্ভব হতে পারে না। অন্যত্র ভরত বলেছেন :

যথা বীজাদ্ ভবেদ্ বৃক্ষো বৃক্ষাৎ পুষ্পং ফলং তথা।
তথা মূলং রসাঃ সর্বে তেভ্যো ভাবা ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৬।৪২

অর্থাৎ, যেমন বীজ থেকে গাছ, গাছ থেকে ফুল ও ফল হয়, তেমনি রসই সব কিছুর মূল তত্ত্ব, আর সবই বাহ্য। রসই কাব্যের বীজ ও ফল।

এখন প্রশ্ন হল, রসের উৎপত্তি হয় কিভাবে? ভরতমুনি বলেছেন, 'বিভানু-ভাবানুভাব-ব্যভিচারি-সংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তিঃ'। (৬।২৭৪) অর্থাৎ, বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের সংযোগে রসের সৃষ্টি হয়। যে কারণে চিত্তের অনুভূতি জাগ্রত হয় তাকে বলা হয় বিভাব। বিভাব দুই প্রকার— আলম্বন ও উদ্দীপন বিভাব।

যকে আলম্বন বা আশ্রয় করে চিত্তে কোনো ভাবের উদয় হয় তাকে বলে আলম্বন বিভাব। যেমন, দুষ্যন্তের রতিভাবের আলম্বন বিভাব শকুন্তলা। এই চিত্তবৃত্তিকে সংরক্ষণ ও বিবর্ধনে যা সহায়তা করে তা হল উদ্দীপন বিভাব। সাজসজ্জা, সুগন্ধি, সংগীত, বসন্ত ঋতুর পরিবেশ ইত্যাদি রতিভাবের উদ্দীপন বিভাব।

চিত্তবৃত্তির আবেগ শারীরবিক্রিয়ায় বাহিরে যা প্রকাশ পায় তাকে বলে অনুভাব। রতিভাবের অনুভাব হল স্তম্ভ, ঘর্ম, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ প্রভৃতি; তেমনি ক্রন্দন, অশ্রুপাত, মূর্ছা প্রভৃতি শোকভাবের অনুভাব।

ভরত আমাদের চিত্তবৃত্তিগুলিকে দুই প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করেছেন— স্থায়িভাব ও অস্থায়ী বা ব্যভিচারিভাব। সহৃদয় সামাজিক চিত্তে বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাবের সংযোগে রসের নিষ্পত্তি হয়। একমাত্র স্থায়িভাবের সঙ্গে উপরোক্ত তিনটি উপাদানের সংযোগ ঘটলেই রস সৃষ্টি হতে পারে।

নাট্যশাস্ত্রকারের মতে রস আট প্রকার:

শৃঙ্গার-হাস্য-করুণা-রৌদ্র-বীর-ভয়ানকাঃ।
বীভৎসাদ্ভুত সংজ্ঞৌ চেত্যষ্টৌ নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৬।১৬

অর্থাৎ, নাট্যশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতরা যে আটটি রসকে স্মরণ করেন তারা হল— শৃঙ্গার, হাস, করুণা, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভুত। এই আটটি রসের জন্য আটটি স্থায়িভাব নির্দেশ করেছেন ভরত— রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয় জুগুপ্সা ও বিস্ময়। এছাড়া আছে নির্বেদ, গ্লানি, শংকা, অসূয়া, মদ, শ্রম প্রভৃতি তেত্রিশটি ব্যভিচারী ভাব।

আটটি স্থায়িভাবকে রসসৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেবার কারণ কী? অভিনবগুপ্ত ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, প্রাণীমাত্রের মনেই উপরোক্ত আটটি ভাবের প্রথমাবধি প্রাধান্য থাকে। কিন্তু ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাবের ঐরূপ সর্বদাব্যাপী প্রাধান্য থাকে না। এই সব ভাব সাময়িক জাগ্রত হয়ে স্থায়িভাবসমূহকে পুষ্ট ও প্রবল করে তোলে মাত্র।[১১]

সামাজিকের চিত্তে স্থায়িভাবগুলি সুপ্ত অবস্থায় সততই বিদ্যমান থাকে। কাব্য পাঠ করে, আবৃত্তি শুনে, অভিনয় দেখে সেই সুপ্ত ভাব উদ্দীপ্ত হয়ে সামাজিক চিত্ত আচছন্ন করে। বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাবের সহায়তায় অন্তরশায়ী স্থায়িভাব অভিব্যক্তি লাভ করলেই তা রসরূপ পায়।

এই প্রসঙ্গে ষোড়শ শতকের মধুসূদন সরস্বতীর অভিমত উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন, মানুষের হৃদয় লাক্ষার মতো যা উত্তাপের সংস্পর্শে এলে দ্রবীভূত হয়। কাম, ক্রোধ, ভয় স্নেহ, হর্ষ, শোক প্রভৃতি সেই উত্তাপ— যার সংস্পর্শে এসে আমাদের চিত্ত গলে যায়। এই দ্রবীভূত চিত্তে অনুভূতির (কাম, ক্রোধ ইত্যাদি) বিষয় বা আলম্বন প্রতিবিম্বিত হয়। এই সব প্রতিবিম্বকেই বলা হয় বাসনা, সংস্কার, ভাব ভাবনা ইত্যাদি। চিত্ত ক্রমে কঠিন হয় কিন্তু প্রতিবিম্ব থেকেই যায়। প্রতিবিম্ব কখনো হারিয়ে যায় না। বস্তুবিশেষের এই স্থায়ী প্রতিবিম্বই স্থায়িভাব।

বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের সহযোগে চিত্তে প্রতিবিম্বিত বিষয় পরমানন্দরূপে প্রকাশ পেলে রসনিষ্পত্তি ঘটে।[১৩]

মধুসূদনের এই মতবাদ আধুনিক মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্বের কাছাকাছি। অলংকার-শাস্ত্রে রসপ্রস্থানের প্রবর্তক ভরতমুনি। তিনি কিন্তু নাট্যশাস্ত্রে নাট্যরসেরই ব্যাখ্যান করেছেন। পরবর্তীকালের আলংকারিকেরা নাট্যরসের বিশ্লেষণরীতিকে কাব্যবিচারের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করেছেন। নাট্যশাস্ত্রের অভিনব-ভারতী ভাষ্যে অভিনবগুপ্ত এর সমর্থন করতে গিয়ে বলেছেন, নাট্যরস ও কাব্যরস মূলত অভিন্ন। 'ন নাট্যে এব চ রসাঃ, কাব্যেঽপি...'[১৪] অর্থাৎ, রস শুধু নাটকে নয়, কাব্যেও বিদ্যমান।

অভিনবগুপ্ত ব্যতীত লোল্লট, উদ্ভট, শংকুক, ভট্টনায়ক প্রভৃতি অনেক সাহিত্য-মীমাংসক নাট্যশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করেছেন। ভরতোক্ত রসবাদের বিখ্যাত সূত্র 'বিভাবানুভাব ব্যভিচারিসংযোগাদ্রসনিষ্পত্তিঃ' ভাষ্যকারদের আলোচনা, বিশ্লেষণ ও বিতর্কের প্রধান বিষয়। কিন্তু নবম শতাব্দীতে আনন্দবর্ধন ধ্বনিবাদ প্রতিষ্ঠিত করবার পূর্বে আলংকারিকেরা রসবাদকে উপযুক্ত মর্যাদা দেননি।

ভরতের পরেই যে আলংকারিকদের গ্রন্থ পাওয়া যায় তাঁরা হলেন ভামহ ও দণ্ডী। এঁদের উভয়েরই কাল আনুমানিক সপ্তম শতাব্দী। ভরত ও ভামহের মধ্যবর্তীকালের অলংকারশাস্ত্রের ধারাটি লুপ্ত হয়ে গেছে। পরবর্তী যুগের আলংকারিকদের রচনায় এই অন্ধকার অধ্যায়ে রচিত গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া গেলেও তাঁদের সন্ধান পাওয়া যায় না।

ভামহ অলংকারপ্রস্থানের প্রবর্তক। সুতরাং স্বরচিত অলংকারগ্রন্থ কাব্যালংকারে স্বভাবতই কাব্যকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করবার জন্য যে অলংকারের ব্যবহার অপরিহার্য সে কথাই বলেছেন। অলংকারে সজ্জিত না হলে নারীর রূপ যেমন উদ্ভাসিত হয় না তেমনি নিরলংকার কাব্যের দীপ্তি থাকাও সম্ভব নয়। ভামহ রসবাদকে স্বীকার বা অস্বীকারের প্রশ্ন তোলেননি। তিনি কাব্যরসের উল্লেখ করেছেন (৫।৩)। মহাকাব্যে যে সকল রসই থাকা উচিত তা-ও বলেছেন [১।২১]। ভামহ রসের কথা সবচেয়ে স্পষ্ট করে বলেছেন এই সংজ্ঞাটিতে: 'রসবদ্ দর্শিতস্পষ্টশৃঙ্গারাদিরসম্।'[১৫] ভরতের মতে রসনিষ্পত্তি হয় বিভাব, অনুভাব প্রভৃতির দ্বারা। ভামহ রসনিষ্পত্তির এই পর্যায়গুলির কথা উল্লেখও করেননি।[১৬] তিনি অলংকারকেই প্রাধান্য দিয়েছেন, কাব্যে রসের অস্তিত্ব থাকলেও তা অলংকারকে অতিক্রম করতে পারে না। রস অলংকারকে শোভন ও উজ্জ্বল করে তুলতে সহায়তা করে মাত্র।

ভামহের সমসাময়িক রীতিপ্রস্থানের আলংকারিক দণ্ডী কাব্যে রসের স্থান আর একটু স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন এবং রসকে অধিকতর মর্যাদা দিয়েছেন। দণ্ডীর মতে কাব্যের একটি অন্যতম গুণ মাধুর্য এবং রস তার বিশিষ্ট উপাদান।[১৭] দণ্ডী যে রসবাদের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন তা ভরতোক্ত অষ্টরসের উল্লেখ থেকে উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু দণ্ডী রসকে বিশেষ পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার করেন নি, এবং অলংকারের অধিক প্রাধান্য নির্দেশ করতেও পারেননি।

এর পরে অষ্টম-নবম শতকের রীতি প্রস্থানের আলংকারিক বামনাচার্য কাব্যের স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করেছেন। কোন বৈশিষ্ট্যের জন্য কতকগুলি শব্দ ও বাক্যের সমষ্টি কাব্য হয়ে ওঠে, এই প্রশ্ন আলোচনা করে বামন সিদ্ধান্ত করলেন, 'রীতিরাত্মা কাব্যস্য।' (কাব্যালংকার সূত্রবৃত্তি, ১।২।৬)। শব্দবিন্যাসের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পদ্ধতিকেই বলা হয় রীতি। এই বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে দশটি গুণের উপর। অন্যতম গুণ কান্তির সঙ্গে রসের আছে অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ। বামনাচার্য তাই বলেছেন, 'দীপ্তরসত্বং কান্তিঃ।' (কাব্যালংকার সূত্রবৃত্তি, ৩।২।১৫) অর্থাৎ, কান্তিগুণে রস উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হয়।

অলংকারপ্রস্থানের আর-একজন আলংকারিক উদ্ভট। তিনি অলংকারের প্রাধান্য স্বীকার করলেও কাব্যে রসের বিশিষ্ট স্থান সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। পূর্বস্বীকৃত কাব্যের শ্রেণীসমূহের সঙ্গে তিনি দুটি নতুন বিভাগ যোগ করেন— ভাবকাব্য ও রসবৎকাব্য। রতি, ভয়, গর্ব, চিন্তা প্রভৃতি ভাব অবলম্বন করে যে কাব্য রচিত হয় তাই ভাবকাব্য। ভাবের সঙ্গে রসের সংযোগ ঘটলে রসবৎ কাব্যের সৃষ্টি হয়।

উদ্ভট ভাব ও অনুভাব শব্দ দুটির পারিভাষিক অর্থের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং তাদের ব্যবহারও করেছেন। তা ছাড়া তিনি ভরত-ব্যাখ্যাত অষ্টরস সম্বন্ধেও অবহিত ছিলেন। বোধ হয় তিনিই প্রথম অষ্টরসের অতিরিক্ত শান্তরসকে স্বীকৃতি দেন।[১৮]

খ্রীস্টীয় নবম শতাব্দীর অলংকারপ্রস্থানের আলংকারিক রুদ্রট রস সম্বন্ধে সর্বাধিক আলোচনা করলেও শেষ পর্যন্ত কাব্যে অলংকারের প্রাধান্য প্রতিপাদনেরই প্রয়াস করেছেন। ভরতোক্ত আটটি নাট্যরসের সঙ্গে শান্ত ও প্রেয়ঃ এই দুটি রস যুক্ত করেছেন রুদ্রট। কাব্যে রসের বৈচিত্র্য না থাকলে তা শাস্ত্রের মতোই শুষ্ক হবে, পাঠক কাব্যপাঠে আকৃষ্ট হবে না— রুদ্রটের মতে রসের মূল্য এই কারণেই। তিনি কাব্যের দুই উপাদান— শব্দ ও অর্থ, এবং তাদের দীপ্তি বর্ধনকারী অলংকারের কথা বলেছেন বিস্তারিতভাবে। অর্থ-শব্দ-অলংকারের সঙ্গে রসের কি সম্বন্ধ তা রুদ্রট তাঁর গ্রন্থ কাব্যালংকারে আলোচনা করেননি। এজন্য কেউ কেউ মনে করেন রস সম্পর্কিত বক্তব্যগুলি হয়ত প্রক্ষিপ্ত।[১৯]

উপরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মুখ্য আলংকারিকেরা রস সম্পর্কে যা বলেছেন তার শুধু ইংগিত দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য বিষয়ে তাঁদের দান বর্তমান প্রসঙ্গে বিচার্য নয়।

ভরত থেকে রুদ্রট পর্যন্ত অলংকারশাস্ত্রের প্রাচীন যুগ। ভরতের পরে অনেকেই রসের উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তাঁরা কাব্যের বহিরঙ্গের শোভা বিচারের উপরেই বিশেষ প্রাধান্য দিয়েছেন। আনন্দবর্ধনের ধ্বন্যালোক রচিত হবার পর, বিশেষ করে অভিনবগুপ্তের লোচন টীকা প্রচারিত হবার পর থেকে, অলংকারশাস্ত্রে নবযুগের সূচনা হল এবং প্রতিষ্ঠিত হল রসবাদের প্রাধান্য।

ধ্বনিপ্রস্থানের মুখ্য প্রবক্তা আনন্দবর্ধন খ্রীষ্টীয় নবম শতকের মধ্যভাগে

কাশ্মীরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বাহ্যত তিনি ধ্বনিবাদী হলেও প্রকৃতপক্ষে কাব্যে রসের প্রাধান্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'ধ্বন্যালোকে'। ধ্বন্যালোকের দুটি বিভাগ— কারিকা ও বৃত্তি। কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে আনন্দবর্ধন শুধু বৃত্তির অংশ রচনা করেছেন।[২০] কারিকা রচনা করেছেন তাঁর পূর্ববর্তী অন্য কোনো আলংকারিক। আবার সংস্কৃত আলংকারিকেরা এবং কোনো কোনো আধুনিক পণ্ডিত এই মতবাদ খণ্ডন করে দেখিয়েছেন যে কারিকা ও বৃত্তি উভয়ই আনন্দবর্ধনের রচনা। এই বিতর্ক নিয়ে এখানে আলোচনা করবার প্রয়োজন নেই। শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, আনন্দবর্ধন কেবলমাত্র বৃত্তিকার হলেও তাঁর কৃতিত্ব হ্রাস পায় না। কেন না, সূত্রাকারে রচিত কারিকার মর্মার্থ বৃত্তিতে যদি এমন প্রাঞ্জল করে ব্যাখ্যা করা না হত তাহলে অলংকার শাস্ত্রে ধ্বনিবাদের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হত কিনা সন্দেহ।[২১]

আনন্দবর্ধন সাহিত্যের উৎকর্ষ-অপকর্ষ বিচারের জন্য এক সুসংবদ্ধ এবং যুক্তিবাদী পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। তিনি নিজে ধ্বনিপ্রস্থানের আলংকারিক হলেও তাঁর বিচারধারায় কোনো সংকীর্ণতা নেই। পূর্ববর্তী আলংকারিকেরা অলংকারপ্রস্থান রীতিপ্রস্থান প্রভৃতি সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন কাব্য ও নাটকের দোষ-গুণ। আনন্দবর্ধন সমালোচনারীতিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এক বৃহত্তর পট-ভূমিকায়। তাই উত্তরসূরিদের নিকট তাঁর মতবাদ সহজেই গ্রহণযোগ্য হয়েছে। নানা প্রস্থানের দ্বন্দ্বে সাহিত্য মীমাংসকরা যখন বিভ্রান্ত তখন অনন্দবর্ধন তাঁদের দিলেন এক সুনির্দিষ্ট নির্ভরযোগ্য মানদণ্ড। পণ্ডিত জগন্নাথ তাঁর রসগঙ্গাধরে যথার্থই বলেছেন, আলংকারিকেরা সাহিত্য বিচারে কোন রীতি অনুসরণ করবেন তার নিষ্পত্তি করে দিয়েছে ধ্বন্যালোক।

প্রাসাদ নির্মাণের মূল উপাদান যেমন ইট তেমনি শব্দ হল কাব্যদেহ গঠনের মৌলিক উপাদান। শব্দের ত্রিবিধ শক্তি (অভিধা, লক্ষণা ও তাৎপর্য) পূর্ববর্তী কোনো কোনো আলংকারিক উল্লেখ করেছেন। আনন্দবর্ধন দেখিয়েছেন এই তিন শক্তির অতিরিক্ত আর-একটি শক্তি আছে যাকে বলা যায় শব্দশক্তি। শব্দের বাচ্যার্থ বা অভিধেয়ার্থ দীর্ঘকাল ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে বিবর্ণ হয়ে যায়। চিত্রকল্প রচনায় কিংবা অর্থবিস্তারে পাঠকের মনে চমৎকৃতি সৃষ্টি করবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। অথচ কাব্যরস বা নাট্যরস এই চমৎকৃতি ব্যতীত ঘনীভূত হতে পারে না। বহু ব্যবহারে বাচ্যার্থ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে এমন শব্দ কবি তাঁর রচনায় যত কৌশলেই বিন্যস্ত করুন না কেন তা পাঠককে আকৃষ্ট করতে অক্ষম। পুরাতন শব্দে যিনি নতুন ব্যঞ্জনা বা Suggestion-এর সৃষ্টি করতে পারেন তিনিই সার্থক শিল্পী। যেমন পুরনো গাছ বসন্তকালে নতুন রূপে বিকশিত হয় তেমনি কাব্যে রসপরিগ্রহ করে পুরনো বাচ্যার্থ নবরূপে প্রতিভাত হয়:

> দৃষ্ট পূর্বা অপি হ্যর্থাঃ কাব্যে রসপরিগ্রহাৎ।
> সর্বে নবা ইবাভান্তি মধুমাস ইব দ্রুমাঃ॥[২২]

পুরনো বাচ্যার্থকে নবরূপে উদ্ভাসিত করা ব্যঞ্জনা দ্বারাই সম্ভব। আনন্দবর্ধন

বলেছেন, মহাকবিদের রচনার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ব্যঞ্জনা বা প্রতীয়মানার্থের প্রয়োগ। রমণীর লাবণ্য যেমন তার পরিচিত অঙ্গসৌষ্ঠব থেকে আলাদাভাবে চোখে পড়ে তেমনি কাব্যে প্রতীয়মানার্থ বাচ্যার্থের অতীত এক ইঙ্গিত—

প্রতীয়মানং পুনরণ্যদেব বস্ত্বস্তি বাণীষু মহাকবীণাম্।
যত্তৎপ্রসিদ্ধাবয়বাতিরিক্তং বিভাতি লাবণ্যমিবাঙ্গনাসু॥[২৩]

শব্দের ত্রিবিধ শক্তির অতীত যে শব্দশক্তি, যার সাহায্যে কবি ইঙ্গিতময় চমৎকৃতি সৃষ্টি করেন, তাকেই আনন্দবর্ধন বলেছেন ধ্বনি, ব্যঞ্জনা বা প্রত্যায়ন ; এবং ধ্বনির দ্বারা শব্দার্থের যে দ্যোতনা ইঙ্গিতে প্রকাশ পায় তা-ই হল ব্যঙ্গার্থ। আনন্দবর্ধন বলেছেন :

যত্রার্থঃ শব্দো বা তমর্থম্ উপসর্জনীকৃত-স্বার্থৌ।
ব্যঙ্গক্তঃ কাব্যবিশেষঃ স ধ্বনিরিতি সূরিভিঃ কথিয়তঃ॥[২৪]

অর্থাৎ, যেখানে কাব্যের অর্থ ও শব্দ স্ব স্ব প্রাধান্য ত্যাগ করে ব্যঞ্জিত অর্থকে প্রকাশ করে, বিজ্ঞেরা তাকেই ধ্বনি বলেছেন।

এই ধ্বনি তিন প্রকার— বস্তুধ্বনি, অলংকারধ্বনি ও রসধ্বনি। এদের মধ্যে রসধ্বনিই শ্রেষ্ঠ। বস্তু ও অলংকারধ্বনি কখনো কখনো অভিধাশক্তির প্রকাশ হতে পারে, কিন্তু রসধ্বনি সর্বদাই ব্যঙ্গার্থ-সঞ্জাত। রসধ্বনিই সাধারণ শব্দসমষ্টিকে কাব্যের অলৌকিক জগতে নিয়ে যায়। তাই ধ্বনিকার বলেছেন, 'কাব্যস্যাত্মাধ্বনিরিতি ...।'[২৫] যেহেতু কাব্যের আত্মা ধ্বনি এবং ত্রিবিধ ধ্বনির মধ্যে রসধ্বনিই শ্রেষ্ঠ, সেই হেতু কাব্যের প্রাণ যে রস, ধ্বনিবাদীর এই প্রতীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সরাসরি না হলেও, ধ্বনিবাদ প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে আনন্দবর্ধন প্রকৃতপক্ষে রসবাদকেই মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। পরবর্তীকালেও এই মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থেকেছে।

নাটকে রসের প্রাধান্য পূর্বেই স্বীকৃতি পেয়েছিল। কাব্যে রসকে প্রাধান্য দিলেন আনন্দবর্ধন। তিনি বললেন, রসই কাব্যের প্রাণ। ভামহ, দণ্ডী, উদ্ভট প্রভৃতি পূর্বসূরীরা যা অলংকার্য তাকেই অলংকার বলে কল্পনা করেছেন। এই ভ্রমাত্মক ধারণার ফলে কাব্যবিচারে তাঁরা শব্দার্থলংকারকে (উপমা, অনুপ্রাস ইত্যাদি) প্রাধান্য দিয়েছেন। আনন্দবর্ধন দেখালেন কাব্যদেহে রসরূপ প্রাণ না থাকলে শুধু অলংকার প্রয়োগে উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায় না। বরং মৃত রমণীর দেহ অলংকৃত করলে যেমন বীভৎস দেখায় তেমনি রসবিবর্জিত অলংকারভূষিত কাব্য পাঠকের মনে বিরূপতার সৃষ্টি করে। অলংকার কাব্যদেহের বাহ্যিক উপকরণ মাত্র। কাব্যের প্রাণভূত রসের বিকাশে সহায়তা করাতেই অলংকারের একমাত্র সার্থকতা। আনন্দবর্ধন প্রথম দৃঢ় প্রত্যযের সঙ্গে ঘোষণা করলেন যে, অলংকারবিহীন কাব্যও সার্থক হতে পারে যদি থাকে রসপ্রাণতা।

ধ্বন্যালোকের টীকাকার অভিনবগুপ্ত (দশম শতকের শেষ পাদ), রসের প্রাধান্য স্পষ্টতররূপে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর 'লোচন' টীকা ধ্বন্যালোক সমাদৃত হবার পথ প্রশস্ত করেছে। ত্রিবিধ ধ্বনির মধ্যে রসধ্বনিই যে শ্রেষ্ঠ তা অভিনবগুপ্ত যত জোরের

সঙ্গে বলেছেন আনন্দবর্ধন তেমন করে বলেননি। তিনি রসকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে বলেছেন: 'রসেনৈব-সর্ব্বং জীবতি কাব্যম্।' আরো বলেছেন, 'ন হি তচ্ছূন্যং কাব্যং কিঞ্চিদস্তি।' (ধ্বন্যালোক টীকা ২।৩) অর্থাৎ, রসশূন্য কোনো রচনা কাব্য হতে পারে না। আনন্দবর্ধন সূত্রাকারে যা বলেছেন, অভিনবগুপ্ত তা ব্যাখ্যা করে প্রচার করায় রসবাদ প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়েছে।

অভিনবগুপ্ত ভরতের নাট্যশাস্ত্রের অভিনব-ভারতী নামক এক টীকা রচনা করেছেন। ভরতের রসসূত্রের এক মৌলিক ব্যাখ্যা তিনি করেছেন, যা অভিব্যক্তিবাদ নামে পরিচিত। তাঁর মতে রসের সৃষ্টি আকস্মিক নয়; বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হয়ে রস পূর্ণতা লাভ করে। ভাব, বিভাব ইত্যাদির বিবর্তনের এই ধারণাই অভিব্যক্তিবাদের মূল কথা।

অভিনবগুপ্তের পরে রসবাদ সম্বন্ধে কোনো মৌলিক আলোচনা পাওয়া যায় না। মম্মটভট্ট (১১শ-১২শ শতক), বিশ্বনাথ কবিরাজ (১৪শ শতক) ও জগন্নাথ (১৭শ শতক) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য আলংকারিকেরা ধ্বনিবাদ তথা রসবাদের সমর্থক ছিলেন। সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ ধ্বনিবাদের আড়াল থেকে নয়, সরাসরি রসকে কাব্যের আত্মা বলে ঘোষণা করেছেন: 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্।'[২৬]

এই প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। অগ্নিপুরাণে অলংকারশাস্ত্র নিয়ে কিছু আলোচনা আছে। অগ্নিপুরাণ রচনার কাল আনুমানিক খ্রীস্টীয় নবম শতাব্দী, অর্থাৎ আনন্দবর্ধনের সমসাময়িক। অগ্নিপুরাণেও পাই, রসই কাব্যের আত্মা:

'বাগ্‌বৈদগ্ধ্যপ্রধানেঽপি রস এবাত্র জীবিতম্।' (অগ্নিপুরাণ) ৩৩৬।৩৩

গৌড়ীয় ভক্তিরস

যে রস সম্বন্ধে আলোচনা করা হল তা প্রাকৃত বা লৌকিক, পৃথিবীর নরনারীর প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতিকে উপজীব্য করে এই রসের উদ্ভব ও বিকাশ। দুষ্যন্ত-শকুন্তলার কাহিনী বয়ন করে কালিদাস তাঁর নাটকে যে রস সৃষ্টি করেছেন তা প্রাকৃত।

লৌকিক সাহিত্যে যেমন রস আছে তেমনি আছে ভক্তিবাদী সাহিত্যেও। সগুণ ভগবান যখন ভক্তের নিকট সর্বোত্তম নররূপে আবির্ভূত হন তখন উভয়ের সম্পর্ক কমবেশি রসাপ্লুত হয়। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি ধর্মসম্প্রদায় আরাধ্য দেবতাকে 'পার্সোন্যাল গড' বা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'অন্তরের ধন' হিসাবে আরাধনা করেন বলে ভক্তের হৃদয়ে স্বতঃই আবেগ সঞ্চারিত হয়। ঈশ্বর-কেন্দ্রিক আবেগের গভীরতা ধর্মীয় সাহিত্যকে রসসিক্ত করে।

ধর্মীয় সাহিত্যের রস অলৌকিক, কেননা ঈশ্বরাসক্তি এই রসের উৎস। বৈষ্ণবের ধর্মসাধনায় ঈশ্বরানুরক্তির তীব্রতা বোধ হয় সবচেয়ে বেশি। বিপুল পরিমাণ বৈষ্ণব-সাহিত্যে ভগবদ্-প্রেমের যে বিচিত্র প্রকাশ দেখা যায় অন্য সম্প্রদায়ের সাহিত্যে তা নেই।

অবশ্য সকল শ্রেণীর বিষ্ণু-ভক্তের মধ্যেই প্রবল আবেগময় ঈশ্বরাসক্তির প্রকাশ নেই, যেমন, রামানুজ ও মধ্ব ব্রহ্মকে বিষ্ণুর সমার্থক মনে করলেও তাঁরা মূলত জ্ঞানবাদী, তাই এই দুই গোষ্ঠীর বৈষ্ণবদের সাধনায় আবেগাপ্লুত ভক্তির অবকাশ ছিল কম। অপরপক্ষে দাক্ষিণাত্যের আড়্বার, উত্তর ভারতের বল্লভাচার্য সম্প্রদায় এবং চৈতন্য ও তাঁর অনুগামীদের সাধনায় আবেগময় ভক্তির প্রাধান্য। এই আবেগময়তার বৈচিত্র্য ও গভীরতা বাংলা বৈষ্ণব-সাহিত্যের মূল বৈশিষ্ট্য। এর পূর্ণ বিকাশ চৈতন্যের দিব্যোন্মাদে। রূপ-সনাতন-জীব গোস্বামীদের মতো ভক্ত তাত্ত্বিক পণ্ডিতরা বৈষ্ণবীয় রসের অলংকারশাস্ত্র বিধিবদ্ধ করেছিলেন। স্বভাবতই রসশাস্ত্র প্রণয়নে বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্য তাঁদের বিশেষরূপে প্রভাবান্বিত করেছে। এই জন্যই বৈষ্ণবীয় রসের আলোচনায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য প্রাধান্য লাভ করেছে। ভক্তিধর্ম ও তার বিবর্তন সম্পর্কে প্রথম অধ্যায়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। বহু ধর্মসম্প্রদায় ভক্তিবাদকে ঈশ্বর আরাধনার অন্যতম পন্থা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় শুধু স্বীকৃতি দিয়ে সন্তুষ্ট নয় ; ভক্তিকে রসের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন বাঙালী বৈষ্ণব আচার্যেরা। তাঁদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভক্তিরসই একমাত্র রস। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনার মূল বৈশিষ্ট্য হল এই।

কিন্তু রস হিসাবে ভক্তির প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব একমাত্র গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রাপ্য, এ কথা বলা চলে না। কারণ বহু শতাব্দী যাবৎ ভক্তির সঙ্গে রসের একটা অদৃশ্য যোগসূত্র উপলব্ধি করা যায়। ঔপনিষদিক সাহিত্যে ভক্তির বিক্ষিপ্ত উল্লেখ লক্ষ্য করেই হয়ত রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'ব্রহ্মবিদ্যার আনুষঙ্গিক রূপেই ভারতবর্ষে প্রেম-ভক্তির ধর্ম আরম্ভ হয়।'[২৭] 'প্রেম-ভক্তি' কথাটির মধ্যে রসের ইঙ্গিত আছে। যেখানে প্রেম সেখানেই আছে রস।

অবশ্য পৌরাণিক যুগের পূর্বে জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন কোনো নামধারী অবতার বা দেবতাকে কেন্দ্র করে হয়নি। ঔপনিষদিক ভক্তি মূলত ঈশ্বর বা পরমাত্মার জন্য ভক্তের নির্বিশেষ ব্যাকুলতা, সুতরাং নির্গুণ ভক্তি। ভক্তির এই নির্গুণস্বরূপতা প্রথম অবসিত হয় ভগবদ্গীতায়, যেখানে বিশেষ দেবতা এবং বিশেষ ভক্ত প্রাধান্য লাভ করে ভক্তিকে সগুণাত্মক করে তুলেছে।

রামায়ণ, মহাভারত এবং অন্যান্য বহু কাব্য ও নাটকে ভক্তির কথা আছে এবং তার পশ্চাদবর্তী রসের ফল্গুধারাটি সহজেই অনুভব করতে পারা যায়। কিন্তু ভাগবতপুরাণই রসযুক্ত ভক্তিতত্ত্বের সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করেছে। পরবর্তীকালের সকল ভক্তিবাদী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ই ভাগবতকে তাঁদের মুখ্য শাস্ত্রগ্রন্থ হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

অনুমান করা হয়, ভাগবতের রচনাকাল খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ থেকে নবম শতকের মধ্যে। দশম কিংবা একাদশ শতকে অভিনবগুপ্ত ভক্তিরসের উল্লেখ করলেও তাকে পৃথক মর্যাদা দিতে পারেননি ; ভক্তিরস শান্তরসেরই অন্তর্ভুক্ত বলে তিনি মনে করেছেন (নাট্যশাস্ত্র, ৬।১০৯, ভাষ্য), অথচ অন্যত্র তিনিই বলেছেন, রসের আস্বাদ পরব্রহ্ম

আস্বাদের মতো— 'পরব্রহ্মাস্বাদ সচিবঃ।'[২৮] এই রস গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মতে ভক্তিরস। রস বা আনন্দের মধ্য দিয়ে তাঁরা ভগবানকে পাবার জন্য সাধনা করেন। সুতরাং পরোক্ষে অভিনবগুপ্ত ভক্তিরসকে মর্যাদা দিয়েছেন বলা যায়।

মুগ্ধবোধ রচয়িতা বৈয়াকরণ বোপদেব (ত্রয়োদশ শতক) প্রথম সুস্পষ্টরূপে ভক্তিরসের প্রাধান্য স্বীকার করেন। তাঁর সংকলিত ভাগবতমূলক গ্রন্থ 'মুক্তাফলের' একাদশ অধ্যায়ে ভক্তি ও ভক্ত সম্বন্ধে আলোচনা আছে। বোপদেবের মতে যাঁর হৃদয়ে ভক্তিরস জাগ্রত হয়েছে তিনিই ভক্ত। হাস্য, করুণ, শৃংগার, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, শান্ত ও অদ্ভুত— এই নয়টি রূপে ভক্তিরস উপলব্ধি করা যায়; সুতরাং ভক্ত নয় প্রকার। ভাগবতের নির্দেশ— 'তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ'[২৯] অনুসরণ করে বোপদেবও বলেছেন, যে-কোনো উপায়ে কৃষ্ণের প্রতি চিত্ত নিবিষ্ট করাই ভক্তি। হাস্য, শৃংগার প্রভৃতি দ্বারা এই আকর্ষণ সৃষ্টি হতে পারে। ভক্তিরসই মূল রস, শৃংগার প্রভৃতি এরই ভিন্ন প্রকাশ মাত্র।

বোপদেবের ভক্তিবাদ মূলত ভাগবতানুসারী, তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মতো ভক্তিরসকে লৌকিক সম্পর্কচ্যুত করে অলৌকিক স্তরে নিয়ে যেতে পারেননি। তবে একথা অনস্বীকার্য যে বোপদেব ভক্তিকে প্রতিষ্ঠার পথে অনেক দূর এগিয়ে দেওয়ায় বৈষ্ণব আচার্যদের কাজ অনেকটা সহজ হয়েছিল।

যিনি অবাঙ্মনসগোচর, অলৌকিক এবং অতীন্দ্রিয়, সেই ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হবার আকাঙ্ক্ষায় এই পৃথিবীর কোনো ভক্তের পক্ষে আত্মহারা হওয়া সম্ভব, এ কথা প্রাচীন আলংকারিকেরা সম্যক উপলব্ধি করতে পারেননি। লৌকিক জগতে এই ব্যাকুলতার শ্রেষ্ঠ প্রতীক দয়িতের সংগে দয়িতার মিলনাকাঙ্ক্ষার উম্মাদনা। কিন্তু প্রাকৃতজনের মনে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যাতীত অপ্রাকৃত পরমব্রহ্মের জন্য তেমন মিলনাকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হওয়া কি সম্ভব? চৈতন্যদেবের অভূতপূর্ব দিব্যোম্মাদ যাঁরা প্রত্যক্ষ করলেন তাঁদের স্বীকার করতে দ্বিধা রইলো না যে, গভীর ঈশ্বরাসক্তি ভক্তের হৃদয় এমন এক অলৌকিক আনন্দরসে অভিভূত করতে সক্ষম যা পৃথিবীর প্রাকৃত দয়িত-দয়িতার মিলনাকাঙ্ক্ষাকে সহজেই অতিক্রম করতে পারে। ঈশ্বর-প্রণয়িনীর রূপ মূর্ত হয়ে উঠেছিল চৈতন্যের জীবনে। তাঁর রচিত 'শিক্ষাষ্টকের' চতুর্থ পঙ্ক্তিতে এই আত্মনিবেদন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে:

> ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
> কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
> মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
> ভবতাদ্ভক্তির হৈতুকী ত্বয়ি॥

অর্থাৎ, হে জগদীশ্বর, ধন চাই না, জন চাই না, কামিনী চাই না, চাই না কবিত্ব অথবা পাণ্ডিত্য; হে ঈশ্বর, তোমাতে যেন জন্মে জন্মে আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে।

চৈতন্যদেবের লীলা যাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন অথবা চৈতন্য পরিমণ্ডলের সংস্পর্শে

আসবার সুযোগ পেয়েছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভক্ত ও গ্রন্থকার সনাতন গোস্বামী (জন্ম পঞ্চদশ শতকের শেষ পাদে, মৃত্যু ১৫৫৮) ; রূপ গোস্বামী (১৪৮৯-১৫৬৪) ; জীব গোস্বামী (আনু. ১৫১০-১৬০০) ; মধুসূদন সরস্বতী (১৫২৫-১৬৩২) ; পরমানন্দ সেন বা কবি কর্ণপুর (১৫২৫- ?) প্রভৃতি। এঁদের মিলিত সাধনার ফলে বৈষ্ণব রসশাস্ত্র বিশেষ করে ভক্তিরস, প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এই তত্ত্বগত প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন ছিল। পদাবলী সাহিত্যের প্রাণ ভক্তির অনুভূতি। সুতরাং বৈষ্ণব কবিতার উৎকর্ষ তখনই স্বীকৃতি পাবে যখন এই ভক্তি, রস হিসাবে গণ্য হবে। ভক্তির রসপ্রাণতা স্বীকৃতি পেলেই পদাবলী সাহিত্যকে সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের নিরিখে বিচার-বিশ্লেষণ করা সম্ভব। বৈষ্ণব সাহিত্যকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য এই বিচার-বিশ্লেষণ তো আবশ্যকই, তা ছাড়া ভক্তি-সাহিত্যের রীতি অনুযায়ী কবিরা লিখছেন কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখাও ছিল প্রয়োজন। কারণ ভক্ত বৈষ্ণবের দিনচর্যাকে বিধিবন্ধ করবার উদ্যোগ শুরু হয় চৈতন্যের মহাপ্রয়াণের কিছুকাল পরে। বৃন্দাবনের আচার্যেরা এ কাজের প্রধান উদ্যোক্তা। পদাবলী কীর্তন বৈষ্ণবের দিনচর্যার অন্যতম অংগ ; অতএব ভক্তিরস প্রচারের কাব্যিক দায়িত্বটা অসংখ্য কবির ব্যক্তিগত রুচি ও প্রবণতার উপর ছেড়ে দেওয়া যায় না। রসশাস্ত্রের বিধান দিয়ে পদাবলীকে নিয়ন্ত্রণ করা তাই আবশ্যক ছিল।

ভক্তিরস সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যাবে মধুসূদন সরস্বতীর 'ভগবদ্-ভক্তিরসায়নে', জীব গোস্বামীর 'প্রীতি-সন্দর্ভে' এবং রূপ গোস্বামীর 'ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু' ও 'উজ্জ্বলনীলমণি'তে। বৈদান্তিক মধুসূদনের জীবনে ঘটেছিল জ্ঞান ও ভক্তির অপূর্ব সংমিশ্রণ। তিনি ভক্তিরসকে শ্রেষ্ঠ রস হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। 'শ্রীমধুসূদন সরস্বতী কিন্তু, ভক্তিরসকেই শ্রেষ্ঠ রস বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।… ইহার স্থায়িভাব চিত্তের ভগবদ্‌কারকতা। মনের মধ্যে প্রতিবিম্বিত পরমানন্দরূপী যখন ভক্তিরসের স্থায়িভাব, তখন ভক্তিরস যে পরমানন্দস্বরূপ হইবে ইহাতে আর বিস্ময়ের কারণ কি ? পক্ষান্তরে পরমানন্দস্বরূপ বলিয়াই ভক্তিরস রসসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।'[৫০]

ষট্‌সন্দর্ভের শেষ খণ্ড 'প্রীতিসন্দর্ভে' জীব গোস্বামী ভক্তিরস, ঈশ্বরপ্রীতি, কৃষ্ণ-গোপী সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রীতির দ্বারা ভক্তের চিত্তশুদ্ধি না হলে ঈশ্বর লাভ হয় না। সুতরাং ভক্তিরসের মূল উপাদান প্রীতি।

শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী বিরচিত মহাগ্রন্থ 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের আকর-গ্রন্থ। শুধু গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে নয়, ভারতের সর্বত্র ভক্তিবাদী সাধনার ক্ষেত্রে এই গ্রন্থের প্রভাব লক্ষণীয়। রূপ ও তাঁর অগ্রজ সনাতন সংসারজীবনে ছিলেন আলাউদ্দীন হুসেন শাহের (১৪৯৪-১৫২১) উজীর। চৈতন্যদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সংসার ত্যাগ করেন এবং তাঁর আদেশে বৃন্দাবনে বৈষ্ণবগ্রন্থ রচনায় জীবন উৎসর্গ করেন। সংস্কৃত সাহিত্য ও অলংকারশাস্ত্রে ছিল তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য। আরবী-ফার্সী ভাষাতেও দক্ষতা অর্জন করেছিলেন তিনি। রাজদরবারে থাকাকালীন রূপ সুফী মতবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, এমন অনুমান অসংগত নয়, হয়ত এই,

প্রভাব পরবর্তী জীবনে তাঁকে অপ্রাকৃত ঈশ্বরাসক্তিকে শ্রেষ্ঠ রস হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করেছে।[৩১]

শ্রীরূপ ২১৪১ শ্লোক-সম্বলিত 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' সমাপ্ত করেন ১৫৪১ খ্রীস্টাব্দে। এই গ্রন্থ বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের একমাত্র বিধিবন্ধ দিগ্‌দর্শনী। বিষয়বস্তু সংক্ষেপে এই, 'সাধনার প্রথমে কি প্রকারে অসংযত চিত্তবৃত্তিগুলিকে সংযত করিয়া বৈধী ভক্তির সাহায্যে শ্রীভগবচ্চরণে সমাকৃষ্ট করিতে হয়, বৈধীর সুবিধানে কি প্রকারে চিত্ত সুনির্মল হইয়া শ্রীভগবানে রতির উদয় হয় এবং সেই রতিই বা কি প্রকারে রাগানুগায় পরিণত হইয়া সংসার-সুখে বিতৃষ্ণা জন্মাইয়া শ্রীকৃষ্ণভজনকেই একমাত্র সুখকররূপে প্রতিভাত করায়— এই গ্রন্থরত্নে তাহারই বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে। রাগানুগা ভক্তি কি প্রকারে ভাবভক্ত্যাদিতে সঞ্চারিত হয়, কি প্রকারে সাধক ব্রজভাবলাভের অধিকার প্রাপ্ত হয়; ভাব, অনুভাব, বিভাবাদির স্বরূপ— এই সকল বিষয় সাহিত্যিক রসশাস্ত্রে দৃষ্ট হইলেও কি প্রকারে আমরা স্বয়ং অখিল-রসামৃতমূর্তি শ্রীভগবানের ভজনপথে এই সকল রসশাস্ত্রের বিষয় লইয়া অগ্রসর হইতে পারি, সেই আনন্দলীলাময় বিগ্রহের স্বরূপ, গুণাদি বহু বহু বিষয় আমরা এই গ্রন্থে জানিতে পারি।'[৩২]

গৌড়ীয় রসশাস্ত্রানুযায়ী পঞ্চবিধ মুখ্যরসের মধ্যে মধুর বা উজ্জ্বল রস শ্রেষ্ঠ। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে সাধারণভাবে এই রসের আলোচনা করা হয়েছে। শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবীয় রসের এই সাধারণ আলোচনা যথেষ্ট নয়, তাই 'উজ্জ্বলনীলমণিতে' মধুর রসের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছেন রূপ গোস্বামী। নায়ক নায়িকার লক্ষণ, পরকীয়াতত্ত্ব, বিপ্রলম্ভ, মহাভাব ইত্যাদি। রাধা-কৃষ্ণলীলা সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রসঙ্গের আলোচনা দ্বারা উজ্জ্বলরসের স্বরূপ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পঞ্চদশ প্রকরণে সমাপ্ত গদ্য-পদ্যে রচিত এই গ্রন্থ মধুর রসের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাকরণ, যেমন ভক্তিরসামৃতসিন্ধু সাধারণভাবে বৈষ্ণবীয় রসের একমাত্র নির্ভরযোগ্য অলংকারগ্রন্থ।

উপরে বাঙালী বৈষ্ণবাচার্যগণের রচিত যে সব রসশাস্ত্র গ্রন্থের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাঁদের ভাষা সংস্কৃত এবং রচনার স্থান বাংলার বাহিরে বৃন্দাবনে। ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু সম্পূর্ণ হবার প্রায় অর্ধ শতাব্দী পরে কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের রচনা সমাপ্ত হয়। বাঙালী বৈষ্ণবের নিকট অতি অল্পকালের মধ্যেই রসশাস্ত্রের আকর রূপে এই গ্রন্থ গৃহীত হল। 'রূপ গোস্বামী যে রসশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন তাহার পূর্ণ অনুবাদের প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই। সে শাস্ত্রের সার সংগ্রহ করিয়া তাহার তাৎপর্য সমেত কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃত-সম্পুটে ভরিয়া দিয়াছিলেন।'[৩৩]

কৃষ্ণদাসের বৈশিষ্ট্য, তিনি চৈতন্য-জীবনের পটভূমিকায় রসশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করেছেন। পূর্বাচার্যগণের মতো ভক্তিরসের নিছক তাত্ত্বিক আলোচনা তিনি করেননি। 'তাঁহার পূর্বে চৈতন্যদেবের অন্তত তিনখানি বাংলা জীবনীকাব্য এবং তিনখানি সংস্কৃত জীবনী (কাব্য ও নাটক) রচিত হইয়াছিল। তিনি প্রচলিত কাহিনীর পুনরাবৃত্তি না করিয়া চৈতন্য-জীবনাদর্শ, ভক্তিবাদ, দ্বৈতবাদী দার্শনিক চিন্তার

গৌড়ীয় ভাষ্য এবং বৈষ্ণব মতাদর্শকে সংহত, দূরাভিসারী ও মনননিষ্ঠ আকার দিয়া বাঙালী মনীষার এক উজ্জ্বলতম স্মারক চরিত্র হইয়া আছেন।'[৩৪]

ভরত ও গৌড়ীয় মতের বিভিন্নতা

ভরতমুনি যে আটটি রস নির্দিষ্ট করেছেন তার মধ্যে ভক্তিরস অনুপস্থিত। প্রাচীন আলংকারিকদের মতে দেবতার প্রতি ভক্তের যে রতি তা ব্যভিচারী ভাবমাত্র, রসের মর্যাদা তাকে দেওয়া যায় না। মম্মটভট্ট তাঁর 'কাব্যপ্রকাশে' বলেছেন, 'রতির্দেবাদিবিষয়া ব্যভিচারী তথাঞ্জিতঃ। ভাবঃ প্রোক্তঃ' (৪।৪৮)। অর্থাৎ, দেবাদি সম্পর্কিত রতিকে ও ব্যঞ্জিত ব্যভিচারীকে বলা হয় ভাব, রস নয়। ভক্তি যে ভাবমাত্র, রস নয়, তা 'সাহিত্যদর্পণ', 'সরস্বতীকণ্ঠাভরণ' প্রভৃতি অলংকার গ্রন্থেও বলা হয়েছে।

'দেবাদিবিষয়া' রতি ভক্তিরস হিসাবে গণ্য হতে পারে না— প্রাকৃত আলংকারিকদের এই অভিমত মধুসূদন সরস্বতী এবং জীব গোস্বামী খণ্ডন করেছেন। মধুসূদন বলেছেন, মম্মটের উক্তি ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাদের পক্ষে প্রযোজ্য হতে পারে, পরমানন্দ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে নয়।[৩৫] জীবগোস্বামীও বলেছেন, প্রাকৃত রসকোবিদগণের ভক্তিরসকে স্বীকৃতি দিতে আপত্তি 'প্রাকৃতদেবাদিবিষয়মেব সম্ভবেৎ··।'[৩৬]

লৌকিক এবং অলৌকিক এই উভয়বিধ রসেরই প্রাথমিক স্তর ভাব। বিভাব, অনুভাব ইত্যাদির সঙ্গে মিলিত হয়ে ভাব রসে পরিণত হয়। শ্রুতিতে ও পুরাণে বর্ণিত অখিলরসামৃতমূর্তি আনন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ যে ভাবের উৎস তার রসে পরিণত হবার যোগ্যতা নেই, একথা বৈষ্ণব রসশাস্ত্রকারগণ স্বীকার করেন না, অবশ্য এখানেই প্রশ্ন ওঠে এমন মহিমময় ভগবানের সঙ্গে একজন সামান্য ভক্ত মানবের কি এমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠা সম্ভব যা থেকে রসের সৃষ্টি হতে পারে? কারণ মধুর সম্পর্ক সমপর্যায়ের লৌকিক বা অলৌকিক ব্যক্তিত্বের মধ্যেই গড়ে ওঠা সম্ভব।

এ প্রশ্নের উত্তর বৈষ্ণব রসশাস্ত্রেই আছে। ভগবান ও ভক্তের মধ্যে ব্যবধান দূর করা হয় দুই উপায়ে। এক, ভগবানকে মানবীয় গুণে ভূষিত করা। গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যের রূপে তেমন মুগ্ধ হননি, যে-কৃষ্ণ কংস ও পুতনাবধের নায়ক, শক্তিধর যে-কৃষ্ণ গোবর্ধন পর্বত ধারণ করেছিলেন, তাঁকে আমাদের বৈষ্ণব সাধকরা হৃদয়ের ধন হিসাবে গ্রহণ করেননি। কারণ ঐশ্বর্যবোধ দূরত্বকে প্রসারিত করে প্রেমানুভূতিকে শিথিল করে—

ঐশ্বর্য-শিথিল-প্রেমে নাহি মোর প্রীত।[৩৭]

শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের কাছাকাছি এসেছেন তাঁর মানবিক গুণাবলী, প্রসাধনপ্রিয়তা এবং অন্যান্য মানব-সুলভ বৈশিষ্ট্যের জন্য। এই সব মানবিক গুণাবলীর বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাবে বৈষ্ণব শাস্ত্রগ্রন্থে, তা ছাড়া ভক্তের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক মানবিক বন্ধনের দ্বারা চিহ্নিত। প্রভু, সখা, পুত্র এবং পতিরূপে তাঁকে ভজনা করা হয়। চৈতন্য-

চরিতামৃতকার বলেছেন :

মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণপতি।
এই ভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধভক্তি॥
আপনারে বড় মানে আমারে সম-হীন।
সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন॥[৩৮]

ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে পার্থক্য দূরীকরণের দ্বিতীয় উপায় হল ভক্তকে আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত করা। শ্রীকৃষ্ণ অলৌকিক মাধুর্যের অধিকারী হলেও সীমিত শক্তি লৌকিক জীব ভক্ত সেই মাধুর্য কি উপায়ে আস্বাদন করবে? প্রাকৃত আলংকারিকদের এই অভিযোগের উত্তরে বলা চলে, ভজন, কীর্তন প্রভৃতির দ্বারা ভক্তের প্রাকৃত মনোবৃত্তি সচ্চিদানন্দরূপ ভক্তির সঙ্গে মিলিত হয়ে চিন্ময়ত্ব লাভ করে। এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন :

প্রভু-কহে, বৈষ্ণব-দেহ 'প্রাকৃত' কভু নয়।
'অপ্রাকৃত' দেহ ভক্তের চিদানন্দময়॥[৩৯]

এমন-কি, ভজন কীর্তনাদি সাধনায় অসমর্থ ব্যক্তিও শুধু শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হলেই সিদ্ধিলাভ করতে পারেন :

শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ।
কৃষ্ণ তাঁরে করে তৎকালে আত্মসম॥[৪০]

সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের অমেয় মাধুর্যের রসাস্বাদন শরণাগত সামান্য মানুষের পক্ষে অসম্ভব নয়।

বৈষ্ণব রসকোবিদ্‌গণ পক্ষান্তরে বলেন, প্রাকৃত রস প্রকৃত মর্যাদা লাভের অধিকারী নয়। কারণ যে সুখানুভূতি ও পরমানন্দ রসের প্রাণ তা লৌকিক রসের বিষয়াবলম্বনে ক্ষুদ্র পরিসরে সীমাবদ্ধ করা যায় না। ভূমাতেই সুখ, অল্পে সুখ নেই, রসও নেই। প্রাকৃত রসের সামাজিক মায়াবদ্ধ জীব, সুতরাং তার পক্ষে ভূমাকে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। জীব গোস্বামী বলেছেন, 'কিঞ্চ, লৌকিকস্য রত্যাদেঃ সুখরূপত্বং যথাকথঞ্চিদেব। বস্তুবিচারে দুঃখপর্যবসায়িত্বাৎ॥'[৪১]

অর্থাৎ, লৌকিক রত্যাদির সুখরূপতা খুবই অল্প; অর্থাৎ, বস্তুবিচারে (রসের আলম্বন ও রতির প্রকৃত বিচারে) তাহা দুঃখেই পরিসমাপ্ত হয়।

মধুসূদন সরস্বতী এই প্রসঙ্গটি ব্যাখ্যা করে বলেছেন :

কান্তাদিবিষয়া বা যে রসাদ্যাস্তত্র নেদৃশম্।
রসত্বং পুষ্যতে পূর্ণসুখাস্পর্শিত্বকারণাৎ॥
পরিপূর্ণরসা ক্ষুদ্ররসেভ্যো ভগবদ্রতিঃ।
খদ্যোতেভ্য ইবাদিত্য-প্রভেব বলবত্তরা॥[৪২]

অর্থাৎ, কান্তাদি-বিষয়ক রস ভক্তিরসের তুল্য নয়। পূর্ণ সুখ লাভ না হলেও সেখানে নাকি রসের পুষ্টি হয়ে থাকে। শৃঙ্গারাদি ক্ষুদ্র রসের তুলনায় ভগবদ্‌বিষয়ক রতি পরিপূর্ণ রস; সূর্যকিরণের সঙ্গে জোনাকির আলোর যে প্রভেদ, প্রাকৃত ও

অপ্রাকৃত রসের মধ্যে তেমনই পার্থক্য।

ভক্তিরসের অলৌকিকত্ব সম্বন্ধে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণের অভিমত সংক্ষেপে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন ভক্তিভূষণ রাধাগোবিন্দ নাথ। তিনি বলেছেন, 'তাঁহাদের (গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যদের) অলৌকিকত্ব হইতেছে অপ্রাকৃতত্ব, মায়াতীতত্ব। কৃষ্ণরতি বা ভক্তি স্বরূপশক্তির বৃত্তি বলিয়া মায়াতীত— চিৎস্বরূপা। বিষয়ালম্বন-বিভাব শ্রীকৃষ্ণ, আশ্রয়ালম্বন বিভাব শ্রীকৃষ্ণ পরিকরগণ ও অপ্রাকৃত, মায়াতীত চিদ্‌বস্তু; অনুভাব-ব্যভিচারী-ভাবাদিও চিৎস্বরূপ বা চিদ্রূপতাপ্রাপ্ত। এই সমস্তের সংযোগে উদ্ভূত ভক্তিরসও হইবে অপ্রাকৃত, মায়াতীত চিদ্‌বস্তু— সুতরাং অলৌকিক। ইহা বস্তুবিচারেই অলৌকিক; কেননা, ইহা অপ্রাকৃত।'[৪৩]

প্রাকৃত আলংকারিকরা ভক্তিরসকে অস্বীকার করেছেন, আবার বৈষ্ণব আচার্যেরা লৌকিক রসকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছেন। এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের কথা বলেছেন কবি কর্ণপূর এবং মধুসূদন সরস্বতী। কর্ণপূর ভক্তিরসকে মুখ্য স্থান দিলেও প্রাকৃত রসকে উপেক্ষা করেননি। 'অলংকারকৌস্তুভে' তিনি লৌকিক ও অলৌকিক, এই উভয় রসেরই আলোচনা করেছেন, লৌকিক রসই বিবর্তিত হয়ে অলৌকিকে পরিণত হয় তাঁর হয়ত এই বিশ্বাস ছিল। মধুসূদন 'ভক্তিরসায়নে' বলেছেন, 'কান্তাদিবিষয়েঽপ্যাস্তি কারণং সুখচিদ্‌ঘনম্।' (১।১১)। অর্থাৎ, *কান্তাদিবিষয়ক লৌকিক শৃঙ্গার রসে যে আনন্দ লাভ করা যায় তার মূলে রয়েছেন* চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম। তবে প্রাকৃতজন এবং তাদের সুখানুভূতি মায়ায় আচ্ছন্ন থাকে বলে পরমানন্দের স্ফূর্তি ঘটে না। সুতরাং বলা উচিত প্রাকৃত ও অলৌকিক রসের মধ্যে স্তরপর্যায়ের পার্থক্য থাকতে পারে; কিন্তু তাই বলে কোনোটিকেই অস্বীকার করা যায় না। আরো একটি কথা বিশেষরূপে উল্লেখ করতে হয়। উভয় শ্রেণীর রসশাস্ত্রেরই মূল কাঠামোটি প্রায় এক।

ধর্মসাধনার একটি সাধারণ অঙ্গ হিসাবেই ভক্তির স্বীকৃতি ছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণ কিন্তু ভক্তিকেই ঈশ্বরপ্রাপ্তির একমাত্র উপায় হিসাবে গ্রহণ করেছেন। রূপ গোস্বামী প্রথম বৈষ্ণব ভক্তিবাদের গভীর আবেগ ও রসময়তার দিকটি আলোচনার জন্য নির্বাচন করেন। ভক্তের মনে ভক্তিরসের ক্রমবিকাশের স্তর এবং বিকাশের ধারায় *একটি সুনির্দিষ্ট বিধি বা অলংকারশাস্ত্র এমন করে ব্যাখ্যা করেছেন যা প্রামাণিক বলে* বৈষ্ণব সম্প্রদায় গ্রহণ করতে দ্বিধা করেননি। লেখকের বক্তব্যের মধ্যে পাণ্ডিত্য এবং শ্রদ্ধার মিলন না ঘটলে বোধ হয় এমন সহজে এই নতুন ব্যাখ্যা গৃহীত হত না।

রূপ মহৎ সাহিত্য আস্বাদনের শ্রেষ্ঠ আনন্দানুভূতির সঙ্গে সমভাবে বিচার করেছেন ভক্তির ধর্মীয় অনুভূতিকে। সংস্কৃত আলংকারিকেরা সাহিত্যে উপভোগের বিশুদ্ধ আনন্দকে বলেছেন 'রস'। তাঁরা ওই রসের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে স্তরপর্যায় নির্দেশ করেছেন অলংকারশাস্ত্রে। অনুরূপভাবে রূপ গোস্বামী ভক্তের মনে ঈশ্বরানুভূতির অতীন্দ্রিয় আনন্দ থেকে যে রসের সৃষ্টি হয় তাকে প্রাকৃত আলংকারিক-দের মতো ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে ভক্তিরসশাস্ত্র বিধিবদ্ধ করেছেন। প্রাকৃত

আলংকারিকদের রসতত্ত্বের কাঠামো হাতের কাছে প্রস্তুত ছিল, সুতরাং তাকে অবলম্বন করেই রূপ ভক্তিরসশাস্ত্র বিধিবন্ধ করেছেন। এমন-কি, বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে প্রাচীন অলংকারশাস্ত্রের পরিভাষাও গ্রহণ করা হয়েছে। অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই সব পরিভাষার নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন রূপ। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের সংগে বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের মূল পার্থক্য এই :

১. মৌলিক ভিন্নতা হল রসের লৌকিকত্ব ও অলৌকিকত্ব নিয়ে। প্রাচীন আলংকারিকেরা যে রসের ব্যাখ্যান দিয়েছেন তা পৃথিবীর নরনারীকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত। অলৌকিক বৈষ্ণবীয় রস সৃষ্টি হয় অখিলরসামৃতসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণকে অবলম্বন করে।

২. প্রাচীন অলংকারশাস্ত্রে নয়টি রস স্বীকার করা হয়েছে ; রূপ স্বীকৃতি দিয়েছেন বারোটি রস। এই বারোটির মধ্যে সাতটি গৌণরস, মুখ্য রস তাঁর মতে মাত্র পাঁচটি। এই পাঁচটির মধ্যে আবার শৃংগার রসকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

৩. বৈষ্ণব রসশাস্ত্রানুযায়ী একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই নায়ক হতে পারেন এবং রাধা নায়িকা। কিন্তু লৌকিক কাব্য বা নাটকে এরূপ নির্দিষ্ট নায়ক নায়িকা নেই। লেখকের পাত্র পাত্রী নির্বাচনের অবাধ অধিকার আছে। একই নায়ক, একই নায়িকা অবলম্বন করবার ফলে বৈষ্ণব সাহিত্যে একঘেঁয়েমি এসে গেল। তা দূর করবার উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণের নতুন নতুন লীলাকাহিনী যোগ করে বৈষ্ণব কবি শ্রোতা ও পাঠককে আকৃষ্ট করেছেন। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দের' সংগে পরবর্তীকালের কৃষ্ণকাব্যের তুলনা করলে এ কথার সত্যতা উপলব্ধি করা যাবে। দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড ইত্যাদি লীলাকথা পরে যোগ করা হয়েছে।

৪. প্রাচীন অলংকারশাস্ত্রে রস আস্বাদক সহৃদয় সামাজিকের স্থান বৈষ্ণব রস-শাস্ত্রে অধিকার করেছে 'ভক্ত'। অর্থাৎ, শুধু বোদ্ধা হলে চলবে না, হতে হবে ঈশ্বর-প্রেমিক সাধক।

৫. প্রাকৃত রসশাস্ত্রকারগণের মোটামুটি সিদ্ধান্ত এই যে অনুকার্য এবং অনুকর্তাদের রসাস্বাদন হয় না ;[৪৪] সহৃদয় সামাজিকই রস আস্বাদনের অধিকারী। কারণ সামাজিক একাগ্রচিত্তে তন্ময় হয়ে দর্শন, পঠন বা শ্রবণে নিবিষ্ট হন। অনুকর্তা বা অভিনেতা যদি রসাবিষ্ট হয়ে আবেগে অভিভূত হয়ে পড়ে তা হলে অভিনয় করা সম্ভব হয় না। আর অনুকার্য তো সকল আবেগের অতীত।

অপ্রাকৃত রসকোবিদ্‌গণের মতে অনুকার্য, অনুকর্তা এবং সামাজিক রসাবিষ্ট হবেন এটাই স্বাভাবিক। জীব গোস্বামী বলেছেন, অনুকার্য বা শ্রীভগবান এবং তাঁর পরিকরগণের মধ্যে রসবস্তু পূর্ণরূপে বিরাজ করে ; সুতরাং তাঁদের হৃদয়স্থ রস অনুকর্তাগণের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়ে থাকে।[৪৫]

অলৌকিক রসে অভিভূত হয়ে অনুকর্তা যে প্রাণ পর্যন্ত ত্যাগ করতে পারে তা বলেছেন বৃন্দাবন দাস :

পূর্বে দশরথ ভাবে এক নটবর।

রাম বনবাসী শুনি তেজে কলেবর ॥[৪৬]

অর্থাৎ, প্রাচীনকালে দশরথের চরিত্র অভিনয়কারী কোনো এক নট রামচন্দ্র বনবাসে গেছেন শুনে দেহত্যাগ করেছিলেন।

অনুকর্তা রসে অভিভূত হওয়ায় অভিনয় যদি বিঘ্নিত হয় অলৌকিক পরিবেশে তা কোনো বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে না। বরং অভিনেতা অভিভূত রূপ রসের গাঢ়তা বৃদ্ধি করে। লৌকিক ক্ষেত্রে অভিনয়ে এরূপ বিঘ্ন পার্থিব কারণেই বাঞ্ছনীয় নয়।

রাধাকৃষ্ণের লীলাপাঠ শ্রবণ অথবা অভিনয় দর্শন করলেও সামাজিকের চিত্তে রসের সঞ্চার হয়। গীতা পাঠকের রসাবেশের বর্ণনা দিতে গিয়ে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন :

'পুলকাশ্রু, কম্প, স্বেদ, যাবৎ পঠন।'[৪৭]

৬. আর-একটি বড়ো পার্থক্য স্বকীয়া ও পরকীয়া নায়িকার মর্যাদা সম্পর্কিত। প্রাচীন আলংকারিকদের মতে নায়িকা তিন প্রকার : স্বকীয়া, পরকীয়া এবং সামান্যা বা সাধারণী। তৃতীয় শ্রেণীর নায়িকারা রূপোপজীবিনী, অর্থ উপার্জনই তাদের লক্ষ্য, সুতরাং তাদের কেন্দ্র করে রসসৃষ্টির অবকাশ নেই। স্বকীয়া শ্রেষ্ঠ মর্যাদা লাভ করেছে। সীতা-সাবিত্রীর মতো একনিষ্ঠ সতী নারী ভারতের আদর্শ। যে সকল বিবাহিতা নারী সমাজ ও ধর্মের রীতিনীতি অগ্রাহ্য করে পরপুরুষে আসক্ত হয় তারাই পরকীয়া নায়িকা। লৌকিক রসশাস্ত্রকারগণ বলেন, এই শ্রেণীর নায়িকা রসসৃষ্টির কারণ হতে পারে না, তাদের প্রেমের পরিণাম হতে পারে শুধু রসাভাস। তাই বিশ্বনাথ বলেছেন ·

পরোঢ়াং বর্জ্জয়িত্বা তু বেশ্যাঞ্চাননুরাগিনীম্।
আলম্বনং নায়িকাঃ স্যুর্দক্ষিণাদ্যাশ্চ নায়কাঃ ॥[৪৮]

অর্থাৎ (মধুর রসে) পরোঢ়া নায়িকা এবং প্রকৃত অনুরাগহীন বেশ্যাকে বর্জন করে অন্য (স্বকীয়া) নায়িকা এবং দক্ষিণাদি নায়ক হবেন আলম্বন। বিশ্বনাথের প্রায় পাঁচ শতাব্দী পূর্বে আলংকারিক রুদ্রট বলেছেন : 'নহি কবিনা পরদারা এষ্টব্যা নাপিচোপদেষ্টব্যাঃ।'[৪৯] অর্থাৎ, কবি পরদার অভিলাষ করবেন না এবং এ বিষয়ে অন্যের কর্তব্য নির্দেশ করবেন না। পরে তিনি অবশ্য বলেছেন, বিদ্বজ্জনের তৃপ্তির জন্য কবি পরকীয়া সম্বন্ধে কাব্য রচনা করতে পারেন।

বিবাহ বহির্ভূত প্রেম যে অধিকতর মধুর এবং উন্মাদনাময় তার সুন্দর দৃষ্টান্ত 'য়ঃ কৌমারহরঃ' প্রকীর্ণ কবিতাটি। এখানে নায়িকা তার সখীকে আক্ষেপ করে বলছে যিনি আমার কুমারীত্ব হরণ করেছিলেন, এখন তিনিই আমাকে বিবাহ করেছেন। বিবাহপূর্ব প্রথম মিলনের দিনটির মতো আজও চৈত্রমাসের মধুযামিনী উপস্থিত, সেদিনের মতো আজও মালতী ফুলের গন্ধ বাতাসে ভেসে আসছে, আমিও প্রিয়তমকে গ্রহণ করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছি। কিন্তু তবু রেবা নদীর তীরবর্তী কুঞ্জবনে প্রথম মিলনের সুরতক্রীড়ায় উন্মাদনাকর আনন্দানুভূতির জন্য আমার চিত্ত উন্মুখ।

চৈতন্যদেব প্রাকৃত নায়িকার এই উক্তি পাঠ করে ব্রজরস আস্বাদন করতেন।[৫০]

গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্যগণ পরকীয়া রতিকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছেন। অবশ্য তাঁদের অনেক পূর্বে শ্রীমদ্‌ভাগবত পরিণীতা গোপী ও শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়লীলা বর্ণনা করেছেন। সুতরাং পরকীয়া প্রেমকে যে শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হয়েছে তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

ভক্ত বৈষ্ণব ঈশ্বরকে কান্তাভাবে সাধনা করে। কারণ পৃথিবীর যত প্রকার মানবিক সম্পর্ক আছে তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা মধুর এবং আর্তিপূর্ণ পতি-পত্নীর সম্বন্ধ। কিন্তু এর চেয়েও বেশি ব্যাকুলতা প্রকাশ পায় পরকীয়া নায়িকার উপপতির জন্য; যদিও তাদের সম্পর্ক সমাজ-স্বীকৃত নয়। পত্নী স্বামীর করায়ত্তা, কিন্তু পরকীয়া নারী অন্যায়ত্তা। সহজলভ্যা নয় বলেই তার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়। আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা আকর্ষণকে চিরনবীন রাখে। পরকীয়া নায়িকা ধর্ম সমাজ নিন্দা সব কিছু অগ্রাহ্য করে কলঙ্কের ডালি মাথায় নিয়ে দয়িতের জন্য অভিসারে বাহির হয়। নিয়মনিষ্ঠ দাম্পত্যপ্রেমে এরূপ আত্মত্যাগ ও দুঃখবরণ নেই। 'পরকীয়াতে প্রেমের সর্বাধিক স্ফুরণ। এই জন্য প্রেমের ভিতরে শ্রেষ্ঠ যে কান্তাপ্রেম তাহার ভিতরেও শ্রেষ্ঠ হইতেছে পরকীয়া রতি, রাধাপ্রেমেই এই পরকীয়া রতির পর্যবসান। পরকীয়া প্রেমই হইল নিকষিত হেম, কারণ, এ-প্রেম সর্বত্যাগী প্রেম, সর্বসংস্কারবিমুক্ত প্রেম, সর্ব-লজ্জা-ভয়-বাধা-নির্মুক্ত প্রেম; ইহা শুধুমাত্র প্রেমের জন্যই প্রেম, সুতরাং ইহাই হইল বিশুদ্ধ রাগাত্মিকা রতি।'[৫১]

এই সর্বোত্তম প্রেমের পথই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধকরা গ্রহণ করেছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজও বলেছেন এই কথাই :

অতএব মধুর রস কহি তার নাম।
স্বকীয়া-পরকীয়া-রূপে দ্বিবিধ সংস্থান॥
পরকীয়া-ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥[৫২]

রূপ গোস্বামী বলেন, পরকীয়া প্রেমে অনৌচিত্য দোষ ঘটে না, কারণ ইহাতে কামগন্ধ নেই, রাধাকৃষ্ণ জীবাত্মা-পরমাত্মার প্রতীক। পরমাত্মার জন্য জীবাত্মার যে আকুতি তাই কৃষ্ণ-রাধার রূপকের মধ্য দিয়ে ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। চৈতন্যচরিতামৃতে এই প্রসঙ্গটি ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে :

কাম, প্রেম-দোঁহাকার বিভিন্ন-লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ॥
আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
কামের তাৎপর্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণ সুখ-তাৎপর্য মাত্র প্রেমে ত প্রবল॥[৫৩]

এই ভিন্নতার সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে। এই প্রসঙ্গে আরো দু একটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা প্রয়োজন। গৌড়ীয়

ভক্তিরসের মূল উৎস ভাগবতপুরাণ। রামানুজ, নিম্বার্ক, মধ্ব ও বল্লভ সম্প্রদায়ের ভিত্তি ব্রহ্মসূত্রের উপরে। প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে ব্রহ্ম বা বেদান্ত-সূত্রের ভাষ্য রচনা করেছেন এবং সেই ভাষ্য-নির্দেশিত পথেই তাঁদের সাধনা। গৌড়ীয় সম্প্রদায় নিজস্ব ভাষ্যের প্রয়োজন বোধ করেননি। তাঁদের মতে ভাগবতপুরাণই বেদান্তসূত্রের ভাষ্য, ভাষ্যকার স্বয়ং বেদব্যাস। সুতরাং অন্য ভাষ্যের প্রয়োজন কি? গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের ধর্মচিন্তা এবং রসভাবনা--এই উভয়েরই উৎস ভাগবত। শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান। তিনি শুধু অবতার নন, বলেছেন ভাগবতপুরাণ। তবে ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যময় রূপের প্রাধান্য ; বাংলার বৈষ্ণবরা তাঁর মাধুর্যময় মানবিক রূপের পূজারী। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন,

কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্বোত্তম নরলীলা,
নরবপু তাহার স্বরূপ
গোপবেশ, বেণুকর, নবকিশোর, নটবর,
নরলীলার হয় অনুরূপ।[৫৪]

আর সেই জন্যই শ্রীকৃষ্ণরূপী ভগবানের সঙ্গে ভক্ত মানবিক সম্পর্কে আবদ্ধ। (চৈ. চ. ১।৪।২১-২২)

শ্রীকৃষ্ণের ভাগবতানুসারী ঐশ্বর্যময় মূর্তি বাংলা বৈষ্ণব পদাবলীতে আচ্ছন্ন হয়েছে মাধুর্যরসে। শান্ত প্রভৃতি দ্বাদশ রস যাঁর মধ্যে স্ফূর্ত যিনি 'অখিল-রসামৃতমূর্তিঃ', সেই আনন্দঘন ভগবানের নিকট ভক্ত কিসের জন্য প্রার্থনা করবে? সাধারণ মানুষের যা পাবার আকাঙ্ক্ষা, বৈষ্ণবের নিকট সেই চতুর্বর্গের কোনোটিই কাম্য নয়। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ— এই চার বর্গ চেয়ে যারা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করে তারা কৈতব বা বঞ্চক ; বঞ্চনা করে নিজেদেরই :

অজ্ঞানতামর নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম-অর্থ-কাম-বাঞ্ছা আদি এই সব ॥
তার মধ্যে মোক্ষ বাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান ॥[৫৫]

ঈশ্বর-সাধকদের প্রধান লক্ষ্যই মোক্ষপ্রাপ্তি, পরমাত্মার মধ্যে লীন হয়ে যাওয়া। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা পেতে চান পঞ্চমবর্গ— 'প্রেম-মহাধর্ম'

পঞ্চম পুরুষার্থ সেই প্রেম মহাধন।
কৃষ্ণের মাধুর্য রস করায় আস্বাদন ॥
প্রেমা হৈতে কৃষ্ণ হয় নিজ ভক্তবশ।
প্রেমা হৈতে পায় কৃষ্ণের সেবা-সুখরস ॥[৫৬]

মোক্ষ অর্থ নির্বাণ, সব কিছুর সমাপ্তি। ভক্ত বৈষ্ণব প্রেমাস্পদের সঙ্গে লীলা খেলার পরমানন্দ উপলব্ধি করতে চায়। মোক্ষপ্রাপ্তির ফলে পরমাত্মায় লীন হয়ে গেলে লীলাখেলার এই আনন্দ উপভোগ করা যাবে না। শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যরস আস্বাদনের তুলনায় মোক্ষ তৃণবৎ তুচ্ছ।

শুধু যে ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যরস আস্বাদন করে অলৌকিক আনন্দানুভূতিতে আবিষ্ট হন, তাই নয়; স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ নিজের মাধুর্যরস আস্বাদন করবার জন্য ব্যাকুল:

আপন মাধুর্যে হরে আপনার মন।
আপনা আপনি চাহে করিতে আলিঙ্গন ॥[৫৭]

শ্রীকৃষ্ণ আপন মাধুর্যে আপনি কেন মুগ্ধ হন তারও ব্যাখ্যা আছে। তাঁর পূর্ণ-স্বরূপের তিনটি ধর্ম— সৎ, চিৎ ও আনন্দ। এরই ভিত্তিতে ভগবানের স্বরূপশক্তি তিনটি স্তরে বিভক্ত: সন্ধিনী, সংবিৎ ও হ্লাদিনী। শেষোক্তটি তিন শক্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই হ্লাদিনী শক্তি ভগবানকে রসময় করে, রসাস্বাদনে উন্মুখ করে। রস আত্মজ হতে পাবে অথবা ভক্তের হৃদয়জাতও হতে পারে। নিজের মাধুর্যরস তো কৃষ্ণ উপভোগ করেনই, লীলা ছলে ভক্তহৃদয়ের রসাস্বাদনের জন্যও তিনি উন্মুখ। রস সৃষ্টিতে এবং রস আস্বাদনে হ্লাদিনী শক্তির মুখ্য ভূমিকা রয়েছে। এই শক্তি একদিকে কৃষ্ণকে যেমন আহ্লাদিত করে তেমনি অন্যদিকে ভক্তবৃন্দকেও হ্লাদ দান করে। হ্লাদিনী শক্তি পরমাত্মা, জীবাত্মা এই উভযের মধ্যে বর্তমান এবং উভয়ের মধ্যে যোগসূত্রের কারণ। কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই কথাটি সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন:

হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন।
হ্লাদিনীর দ্বাবা করে ভক্তের পোষণ ॥[৫৮]

জীব জগতে রাধার মধ্যে হ্লাদিনী শক্তির শ্রেষ্ঠ বিকাশ। তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণের লীলা খেলার মুখ্যা সঙ্গিনী। ভক্ত ও ভগবানেব মধ্যে ভেদ এবং অভে এই দুই-ই যে বর্তমান তারও সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাধাকৃষ্ণের লীলা খেলা। জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে ভেদ তো থাকবেই। কিন্তু হ্লাদিনীশক্তি সঞ্জাত আনন্দময় মধুররস উভয়ের মধ্যে একাত্মতার অনুভূতি জাগ্রত করেছে। প্রমাণ করেছে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যদেব অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ। কৃষ্ণদাসের কথায়—

রাধা-পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ-পূর্ণ শক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাহি, শাস্ত্র-পরমাণ ॥
মৃগমদ, তার গন্ধ— যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে, যৈছে কভু নাহি ভেদ ॥
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ ॥[৫৯]

ভক্তের নিকটে যে ভগবান নেমে আসেন, ভক্তের সঙ্গে লীলারস সমরূপে আস্বাদন করেন এবং ভক্তের হৃদয়ে যে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম[৬০]— এই তত্ত্ব ভাগবতানুসারী হলেও তা প্রচার ও প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যদের।

সংক্ষেপে বৈষ্ণবীয় রসের স্বরূপ যথার্থরূপে নির্ণয় করা সহজ নয়। কারণ ধর্মানুভূতি, রসানুভূতি, মনস্তত্ত্ব, নন্দনতত্ত্ব, সাহিত্যভাবনা প্রভৃতির মিশ্রণ এই রসশাস্ত্রকে জটিল করে তুলেছে। ডঃ সুশীলকুমার দে এই জটিলতার কথা উল্লেখ

করে বলেছেন : 'The attitude is a curious mixture of the literary, the erotic and the religious, and the entire scheme as such is an extremely complicated one.'[৬১]

প্রাচীন আলংকারিকদের রসশাস্ত্রের সঙ্গে তুলনা করবার পর এবং বৈষ্ণবীয় রসশাস্ত্রের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আলোচনার পর প্রশ্ন জাগে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের রসশাস্ত্রের দান কতটুকু ? ডঃ সুধীরকুমার দাশগুপ্ত কোনো মৌলিক দান স্বীকার না করে বলেছেন : 'কাব্যগত রসতত্ত্বে বৈষ্ণবগণের মৌলিক দান কিছুই নাই, তাঁহারাই বরং আলংকারিকগণের রসতত্ত্ব অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণব ভক্তিতত্ত্বকে রসায়িত ও সঞ্জীবিত করিয়াছেন।'[৬২]

বৈষ্ণব রসকোবিদগণের কৃতিত্বের কথা বোধ হয় এ ভাবে অস্বীকার করা চলে না। সংস্কৃত আলংকারিকরা কাব্য নাটকাশ্রিত যে রসের ব্যাখ্যা করেছেন, বৈষ্ণব রস-শাস্ত্রকারগণ তাকে প্রসারিত করে এনেছেন ধর্মানুভূতির ক্ষেত্রে; আবেগময় ধর্মানুভূতিতে যে অলৌকিক রসের জন্ম তার উদ্ভব ও বিকাশের ধারা বিধিবদ্ধ করাতেই তাঁদের কৃতিত্ব। ভক্তিরসের প্রাধান্য স্থাপনেই ঘটেছে বৈষ্ণব আলংকারিকদের মনীষার পূর্ণ বিকাশ। কাঠামো ও পরিভাষা পূর্বসূরিদের নিকট হতে গ্রহণ করা হলেও ধর্মকেন্দ্রিক অভিনব রস-পরিকল্পনা রচনাতেই তাঁদের মৌলিকত্বের নিদর্শন।

রসনিষ্পত্তি

ভক্তের হৃদয়ে ভক্তিভাব সততই বিরাজ করে। এই ভক্তিভাব কি উপায়ে ভক্তিরসে পরিণত হয় সে সম্বন্ধে রূপ গোস্বামী সাধারণভাবে ভরতমুনির অভিমত গ্রহণ করেছেন। পার্থক্য এই যে, ভরত মূলত লৌকিক ভাবের রসতা প্রাপ্তির পদ্ধতি ব্যাখ্যা করেছেন, রূপ বলেছেন শুধু ভক্তিভাবের কথা। ভরতমুনির মতে 'বিভাবানু-ভাব ব্যভিচারি সংযোগাদ্রসনিষ্পত্তিঃ।'[৬৩] অর্থাৎ, বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাব, —এই তিন উপাদানের মিশ্রণে ভাব রসে পরিণত হয়।

রূপ গোস্বামী রসনিষ্পত্তির অনুরূপ পদ্ধতির কথা বলেছেন :

বিভাবৈরনুভাবৈশ্চ সাত্ত্বিকৈর্ব্যভিচারিভিঃ।
স্বাদ্যত্বং হৃদি ভক্তানামানীতা শ্রবণাদিভিঃ।
এষা কৃষ্ণরতিঃ স্থায়ী ভাবো ভক্তিরসো ভবেৎ॥[৬৪]

এর সরলার্থ হল : শ্রবণ-স্মরণ-কীর্তন প্রভৃতির দ্বারা উদ্বোধিত স্থায়ীভাব কৃষ্ণরতি বিভাব ইত্যাদির সহযোগে ভক্তহৃদয়ে আস্বাদ্য হয়ে উঠলে ভক্তিরসের সৃষ্টি হয়।

রূপ গোস্বামীর রসনিষ্পত্তির সংজ্ঞায় দুটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। প্রথমত, সংস্কৃত আলংকারিকেরা বলেন, প্রিয়বস্তুর প্রতি অনুরাগই রতি।[৬৫] কিন্তু বৈষ্ণবরসশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ একমাত্র রতি। দ্বিতীয়ত, শ্রীকৃষ্ণরতি অলৌকিক, সুতরাং

বিভাব ইত্যাদির সঙ্গে সাত্ত্বিকভাব অচ্ছেদ্যরূপে যুক্ত। ভরতমুনি আটটি সাত্ত্বিক-ভাবের উল্লেখ করলেও রসনিষ্পত্তির ক্ষেত্রে তাদের প্রাধান্য দেননি।[৬৬]

রতির সঙ্গে যে সব সামগ্রীর মিলন ঘটলে রসের সৃষ্টি হয় 'বিভাব' তাদের অন্যতম। ভক্তের হৃদয়স্থিত রতিকে উদ্বোধিত করবার হেতুকে বলা হয় বিভাব। ভগবান বা শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পরিকরগণের নাম, রূপ, গুণ, লীলা প্রভৃতির দ্বারা ভক্তের হৃদয়কে বিভাবিত বা বিশেষরূপে জাগরিত করে এবং এর ফলে স্থায়ীভাবের প্রতিষ্ঠা ত্বরান্বিত হয়।

বিভাব দুরকম, আলম্বন এবং উদ্দীপন। আলম্বন বিভাবকে আবার দু' শ্রেণীতে ভাগ করা যায়,— বিষয়ালম্বন ও আশ্রয়ালম্বন। কৃষ্ণরতির বিষয়ালম্বন হলেন শ্রীকৃষ্ণ; কারণ, তাঁকে অবলম্বন করেই রতির অস্তিত্ব। এই কৃষ্ণরতির অবস্থান কৃষ্ণভক্তের হৃদয়ে। ভক্তের আশ্রয়ে থেকেই রতি বিকাশ ও গাঢ়তা লাভ করে। সুতরাং কৃষ্ণরতির আলম্বনের দুটি দিক, একটি তার বিষয় শ্রীকৃষ্ণ অপরটি তার আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণভক্ত·

> কৃষ্ণশ্চ কৃষ্ণভক্তাশ্চ বুধৈরালম্বনা মতাঃ।
> রত্যাদের্বিষয়ত্বেন তথাধারতয়াপি চ॥ (ভ· র সি ২।১।১৫)

যার সাহায্যে হৃদয়স্থিত শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক ভাব উদ্দীপ্ত হয় তা উদ্দীপন বিভাব। শ্রীকৃষ্ণের মৃদু হাসি, দেহের সুগন্ধ, বংশীধ্বনি, নূপুর, শঙ্খ, পদচিহ্ন প্রভৃতি ভক্তকে উদ্দীপ্ত করে, তাই শ্রীকৃষ্ণ-সংশ্লিষ্ট এ সব বস্তু ও ভাব উদ্দীপন বিভাব।

বিভাবের পরে (অনু) যে ভাবের জন্ম, তা অনুভাব,— 'অনুভাবস্তু চিত্ত-স্থভাবানামববোধকাঃ' (ভ· র· সি ২।২।১) অর্থাৎ, বিভাবের সাহায্যে কৃষ্ণরতি জাগ্রত হলে যে সব পরিচায়ক লক্ষণ বাহিরে প্রকাশ পায় তা হল অনুভাব। হৃদয়ে কৃষ্ণরতি বিক্ষুব্ধ হলে তা বাহিরে স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ পায় নৃত্য, গীত, চীৎকার, দীর্ঘশ্বাস ইত্যাদির মধ্য দিয়ে। হৃদয়স্থিত কৃষ্ণরতির বাহ্যিক প্রকাশে এই মাধ্যমগুলিই অনুভাব।

অনুভাবের সঙ্গে সাত্ত্বিক ভাবের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। কৃষ্ণরতি দ্বারা চিত্ত প্রভাবান্বিত হলে সেই চিত্তকে বলা হয় 'সত্ত্ব'। সত্ত্বগুণান্বিত চিত্তে যে সব ভাবের উদ্রেক হয় তাহারা সাত্ত্বিকভাব। সাত্ত্বিকভাব আটটি: স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, কম্প, বৈবর্ণ, অশ্রু ও প্রলয় বা মূর্ছা। ভরতমুনিও ঠিক এই কটি সাত্ত্বিক ভাবের উল্লেখ করেছেন।

রসসৃষ্টির আর একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় সামগ্রী হল ব্যভিচারীভাব। এর অন্য নাম সঞ্চারীভাব। ব্যভিচারী কথাটির সঙ্গে একটি নিন্দাসূচক ধারণা যুক্ত। কিন্তু অলংকারশাস্ত্রে পারিভাষিক শব্দ হিসাবে বিশেষ অর্থে এটি ব্যবহৃত হয়েছে। যে ভাবের গতি স্থায়ীভাবের অভিমুখে বিশেষরূপে নির্দিষ্ট তা ব্যভিচারীভাব— 'বিশেষণাভি মুখ্যেন চরন্তি স্থায়িনং প্রতি' (ভ· র· সি ২।৪।১)। স্থায়ীভাবকে সঞ্চারী বা ব্যভিচারীভাব উদ্দীপ্ত করে এবং স্থায়ীভাবের মধ্যে লীন হয়ে যায়।

রূপ গোস্বামী এই দুটি ভাবের পারস্পরিক সম্বন্ধ সমুদ্র ও তরঙ্গের সম্পর্কের সঙ্গে তুলনা করেছেন (ভ. র. সি ২।৪।১৭)। স্থায়ীভাবরূপ সমুদ্রে উত্থিত হয়ে পরমুহূর্তে লীন হয়ে যায় যে ভাব তাকে বলা হয় ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাব। রসশাস্ত্রে ব্যভিচারী ভাবকে নির্বেদ, দৈন্য, হর্ষ, বিষাদ, গর্ব, ত্রাস প্রভৃতি তেত্রিশটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। বৃহত্তর অর্থে ব্যভিচারী অনুভাবের সগোত্র।

এসব সামগ্রীর মিলনে রসের উৎপত্তি হয়। প্রত্যেকটি সামগ্রীর নিজস্ব গুণ ও বৈশিষ্ট্য আছে। কিন্তু সুমিশ্রিত হবার পর তাদের পৃথক অস্তিত্ব লুপ্ত হয়। সৃষ্টি হয় এক নতুন বস্তুর এবং রসিকজনের আস্বাদনযোগ্য এই বস্তুই হল রস। ভরতমুনি বিভিন্ন সামগ্রীর সহযোগে রসসৃষ্টির প্রক্রিয়া বোঝাতে ব্যঞ্জনের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, রূপ গোস্বামী দিয়েছেন রসালার উদাহরণ। দধি, সীতা (মিষ্ট দ্রব্য), ঘৃত, মধু, মরীচ, বিট্‌লবণ, কর্পূর ইত্যাদির মিশ্রণে রসালা নামক সুস্বাদু রসযুক্ত পানীয় হয় সামগ্রীগুলির মিশ্রণের ফলে রসের উৎপত্তি হয়। এবং এক অনাস্বাদিতপূর্ব স্বাদ অনুভূত হয়।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ রসনিষ্পত্তির এই পদ্ধতির কথা বলেছেন—

বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ব্যভিচারী।
স্থায়ীভাব রস হয় এই চারি মিলি ॥
দধি যেন খণ্ড-মরিচ-কর্পূর মিলনে।
রসালাখ্য রস হয় অপূর্বা স্বাদনে ॥ (চৈ. চ. ২।২৩।৪৬-৪৫)

স্থায়ীভাব

বিভাব, অনুভাব ইত্যাদির সহযোগে স্থায়ীভাব রসে পরিণত হয়। মানব হৃদয়স্থিত ভাব তিন প্রকার— স্থায়ী, ব্যভিচারী ও সাত্ত্বিক। স্থায়ী ও সাত্ত্বিক ভাবের সংখ্যা আটটি করে। ব্যভিচারী ভাবের সংখ্যা তেত্রিশ। কোনো কোনো প্রাচীন আলংকারিক শান্তভাবকে স্থায়ীভাবের মর্যাদা দিয়েছেন। সুতরাং সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রানুযায়ী ভাবের সংখ্যা পঞ্চাশ। এদের মধ্যে কেবল আটটি, মতান্তরে নয়টি, স্থায়ীভাবেরই রসে পরিণত হবার যোগ্যতা আছে।

আটটি বা নয়টি ভাবকেই কেন স্থায়ী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়? স্থায়িত্বের অর্থই বা এখানে কি? স্থায়িত্ব দু'রকমের হতে পারে: মানব হৃদয়ে অবিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব; অথবা, ভাবটি এমন যার কখনও রূপান্তর ঘটে না। স্থায়ীর দ্বিতীয় ব্যাখ্যা যে এখানে প্রযোজ্য নয় তা আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে বোঝা যাবে। কারণ, বিভাব, অনুভাব প্রভৃতির দ্বারা হৃদয় উদ্বেলিত হলেই স্থায়ীভাব রসে পরিণত হওয়া সম্ভব।[১১]

অলংকারশাস্ত্রে রূপান্তর ঘটবে না অথচ রসে পরিণত হবে এমন কোনো ভাবের কথা আলোচিত হয়নি। তাহলে আমাদের মনে যে কয়টি ভাব অবিচ্ছিন্ন রূপে অবস্থান

করে তারাই স্থায়ীভাব। অভিনবগুপ্ত বলেছেন, জন্মের সঙ্গে সঙ্গে জীব এই সব চিত্তবৃত্তিদ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ে এবং সেই প্রভাবের অস্তিত্ব নিরন্তর উপলব্ধি করা যায়। এই ভাবগুলি জীবের অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ তাই তারা স্থায়ী—'স্থায়িত্বং চ এতাবতামেব। জাত এব হি জন্তুরিয়তীভিঃ সংবিদ্ভিঃ পরীতো ভবতি' (১।২৮৪)।

অবশ্য সব কটি স্থায়ীভাব হৃদয়ে একসঙ্গে অবস্থান করলেও এক এক সময় কোনো একটি বিশেষ ভাব অনুকূল বিভাব, অনুভাব প্রভৃতির প্রভাবে প্রাধান্য লাভ করে। তাই দেখা যায় কোনো নাটকে করুণ রসের, কোথাও হাস্য রসের, আবার অন্যত্র হয়ত বীর রসের প্রাধান্য। একটি স্থায়ীভাব প্রধান হলে অন্য ভাবগুলি, এমন কি স্থায়ী ভাবও ব্যভিচারীভাবের মতো গণ্য হয়।

ব্যভিচারীভাবের সঙ্গে স্থায়ীভাবের সম্পর্ক দু'টি দৃষ্টান্ত দিয়ে ভরতমুনি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। মনুষ্য সমাজে রাজার যে স্থান, শিষ্যদের মধ্যে গুরুর যে আসন, ব্যভিচারী ভাবসমূহের মধ্যে স্থায়ী ভাবের সেই মর্যাদা। প্রজা এবং শিষ্য যেমন রাজা ও গুরুর শক্তি বৃদ্ধি করে তেত্রিশটি ব্যভিচারীভাব তেমনি স্থায়ীভাবকে উদ্বেলিত করে।

স্থায়ীভাবের সঙ্গে নৃপতির তুলনা রূপগোস্বামীও গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন :

অবিরুদ্ধান্ বিরুদ্ধাংশ্চ ভাবান্ যো
বশতাং নয়ন্।
সুরাজেব বিরাজেত স স্থায়ীভাব উচ্যতে ॥[৬৮]

অর্থাৎ, অবিরুদ্ধ [মিত্র] এবং বিরুদ্ধ [শত্রু] ভাব সমূহকে বশীভূত করে যে ভাব সুদক্ষ রাজার ন্যায় আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে তাহাকে 'স্থায়ীভাব' বলে। হাস্য, লজ্জা, উৎসাহ ইত্যাদি অবিরুদ্ধ বা মিত্রভাব ; ক্রোধ, শোক, বিষাদ প্রভৃতি বিরুদ্ধ বা শত্রুভাব।

রূপগোস্বামী স্থায়ীভাব সম্বন্ধে মোটামুটি রূপে সংস্কৃত আলংকারিকদের ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন। মূল পার্থক্য এই যে, রূপ একমাত্র কৃষ্ণরতিকেই স্থায়ীভাব বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন :

'স্থায়ী ভাবোঽত্র স প্রোক্তঃ শ্রীকৃষ্ণবিষয়া রতিঃ'।[৬৯]

অর্থাৎ, ভক্তিরসশাস্ত্রে কৃষ্ণবিষয়ক রতিকেই স্থায়ীভাব বলা হয়।

ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণরতি নিরবচ্ছিন্ন অবস্থিতির জন্য বৈষ্ণবাচার্যগণ একে বলেছেন স্থায়ীভাব।

মুখ্য ও গৌণরতি এবং রস

রূপগোস্বামী কৃষ্ণরতিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছেন—মুখ্য ও গৌণ।[৭০] মুখ্যরতি পাঁচটি, 'মুখ্যস্থ পঞ্চধা[৭১]...।' শান্ত [বা জ্ঞান], দাস্য [বা প্রীত],

সখ্য [বা প্রেয়], বাৎসল্য এবং মধুর [বা উজ্জ্বল]। এই পাঁচটি মুখ্যরতি বিভাব অনুভাব প্রভৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে শান্তরস, দাস্যরস, সখ্যরস, বাৎসল্যরস এবং মধুর বা উজ্জ্বলরসের নিষ্পত্তি করে।

এছাড়া আছে সাতটি গৌণ রতি এবং গৌণ রস— হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক এবং বীভৎস।[৭১] এই সাতটি গৌণ রতি থেকে সৃষ্টি হয় অনুরূপ সাতটি গৌণরস।

এই মুখ্য ও গৌণরসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ :

'শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর রস নাম।
কৃষ্ণ ভক্তিরস মধ্যে এ পঞ্চ প্রধান॥
... ...
হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, বীভৎস, ভয়।
পঞ্চবিধ ভক্তে গৌণ সপ্তরস হয়॥'[৭২]

মুখ্য ও গৌণ রস ও রতি উভয়েরই একমাত্র অবলম্বন কৃষ্ণভক্তি। মুখ্যরতি ও রসের ক্ষেত্রে কৃষ্ণভক্তির উপলব্ধি স্পষ্ট। মুখ্য রতিসমূহের বিকাশ ও রসের পরিণতি শ্রীকৃষ্ণের সহিত ভক্তের পাঁচটি সম্পর্ক কেন্দ্র করে হয়। যে ভক্তের মনে শান্তরস জাগ্রত হয় তিনি শ্রীকৃষ্ণকে পরব্রহ্ম-পরমাত্মা হিসাবে গণ্য করে তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেন। অন্যান্য চারটি সম্পর্ক অতি পরিচিত মানবিক বন্ধন ; যথা দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর।

গৌণরতির উদ্ভবের কারণ এত স্পষ্ট নয়। সাতটি গৌণরতির মধ্যে প্রথমটির কথাই ধরা যাক। শ্রীকৃষ্ণ অথবা তাঁর পরিকরগণের বাক্য, বেশ ও চেষ্টাদির বিকৃতি ঘটলে ভক্তের মনে যে হাসির উদ্রেক হয় তা হাস্যরতি। ভক্তের হাসির পশ্চাতে থাকে ভগবানের প্রতি প্রীতি, যেমন, মা ছেলের বা স্ত্রী স্বামীর পোশাকের বিকৃতি দেখলে হাসেন। এই হাস্যরতি উপযুক্ত বিভাবাদির দ্বারা পরিপোষিত হলে হাস্য ভক্তিরসে পরিণত হয়।

শান্তাদি পঞ্চবিধ মুখ্যরতি ভক্তের হৃদয়ে সতত বিরাজমান থাকে। কিন্তু সাতটি গৌণরতি 'অনিয়তধারা' অর্থাৎ ভক্তের হৃদয়ে সর্বদা উপস্থিত থাকে না। কোনো কারণ উপস্থিত হলে তারা আগন্তুক রূপে উদয় হয় এবং সেই কারণ দূর হলেই অন্তর্হিত হয়ে যায়।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাই বলেছেন,—

পঞ্চরস 'স্থায়ী' ব্যাপি রহে ভক্তমনে।
সপ্তগৌণ আগন্তুক পাইয়ে কারণে॥[৭৩]

মুখ্যরতির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, শান্ত থেকে দাস্য, দাস্য থেকে সখ্য, সখ্য থেকে বাৎসল্য এবং বাৎসল্য থেকে মধুর রতিতে ক্রমশ রসাস্বাদের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়। রূপ বলেছেন—

'যথোত্তরমসৌ স্বাদবিশেষোল্লাসময্যপি।

রতির্বাসনয়া স্বাদ্বী ভাসতে কাপি কস্যচিৎ ॥'[৭৫]

অর্থাৎ পঞ্চবিধ মুখ্য রতির উত্তরোত্তর স্বাদ বিশেষ রূপে আনন্দময় হয়ে ওঠে। প্রাক্তন বাসনা অনুযায়ী ভক্তের নিকট কোনো একটি রতি রুচিকর হয়। কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই তত্ত্বটি সহজ করে বলেছেন :

পূর্ব পূর্ব রসের গুণ পরে পরে হয়।
এক দুই গণনে পঞ্চ পর্যন্ত বাড়য় ॥
গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্যে বাড়ে প্রতি রসে।
শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে ॥[৭৬]

মুখ্য ও গৌণ রসের স্থায়ীভাব

পূর্বে স্থায়ীভাব সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। স্থায়ীভাব রসের ভিত্তিস্বরূপ। সুতরাং মুখ্য বা গৌণ সব রসেরই একটি করে স্থায়ীভাব অবশ্যই থাকবে। যে রতি বিভাবাদি চারটি ভাবের সংযোগে বিকাশ লাভ করে ও আনন্দ চমৎকারিতা সৃষ্টি দ্বারা রসরূপে পরিণত হয় এবং প্রতিনিয়ত সেই রসে যার প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ থাকে, সেই রতিকে ঐ রসের স্থায়ীভাব বলা হয়। প্রত্যেক রসের নিজস্ব স্থায়ীভাবই হল সেই রসের ভিত্তি।

পূর্বে বলা হয়েছে বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে রতি বলতে একমাত্র কৃষ্ণরতিকে বোঝায়। ব্যাপক অর্থে রতি শ্রীকৃষ্ণবিষয়িনী প্রেমকে বোঝায়, যেমন শান্তরতি, দাস্যরতি, ইত্যাদি। এখানে রতিকে একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। কৃষ্ণবিষয়িনী প্রীতির প্রথম আবির্ভাবকেই এখানে রতি বলে নির্দেশ করা হয়েছে। এই প্রীত্যাঙ্কুর বিভাবাদির সঙ্গে মিলিত হয়ে রসের সৃষ্টি করে।

ভক্তির অধিকার ভেদে মুখ্যরতি পাঁচপ্রকার, শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। এই পাঁচটি রতি শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর— এই পঞ্চরসের স্থায়ীভাব। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন

ভক্ত ভেদে রতি ভেদ পঞ্চ পরকার।
শান্ত রতি, দাস্য রতি, সখ্য রতি আর ॥
বাৎসল্য রতি, মধুর রতি— এ পঞ্চ বিভেদ।
রতি ভেদে কৃষ্ণভক্তি রসে পঞ্চভেদ ॥

পাঁচটি মুখ্যরসের ভিত্তিস্বরূপ পাঁচটি রতিকেও বলা হয় মুখ্যরতি। রূপগোস্বামী মুখ্যরতির সংজ্ঞা দিয়েছেন

'শুদ্ধ সত্ত্বাবিশেষাত্মা রতির্মুখ্যেতি কীর্তিতা।'[৭৭]

অর্থাৎ হ্লাদিনীবোধে উদ্দীপ্ত কৃষ্ণের স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষকে বলা হয় মুখ্য রতি। কৃষ্ণবিষয়ক প্রীতি বলেই তা স্বভাবতই 'শুদ্ধসত্ত্ব বিশেষাত্মক' বা স্বরূপ লক্ষণ যুক্ত।

প্রকৃতপক্ষে মুখ্য রতি একটি, কৃষ্ণবিষয়িনী প্রীতি। পাঁচটি রতি কৃষ্ণপ্রীতিরই স্তরভেদ মাত্র। রূপগোস্বামী প্রাচীন আলংকারিকদের মত উদ্ধার করে সমর্থন জানিয়েছেন :

অষ্টানামেব ভাবানাং সংস্কারাধায়িতা মতা।

তত্তিরস্কৃত সংস্কারাঃ পরে ন স্থায়িতোচিতাঃ॥[৭৮]

এর ভাবার্থ হল এই যে, এক মুখ্য রতি এবং হাসাদি সাত গৌণ রতি— এই আটটি ভাবেরই সংস্কারের প্রতিষ্ঠা স্বীকৃত হয়েছে। বিরুদ্ধভাব দ্বারা যাদের সংস্কার পর্যন্ত লোপ পায়, সেই সব ব্যভিচারীভাবের স্থায়িত্ব লাভের যোগ্যতা নেই।

এই ব্যাখ্যা থেকে গৌণরতির স্বরূপ সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্টতর হয়। হাসাদি সাতটি গৌণ রতি হল আগন্তুক এবং বিশেষ পরিস্থিতে তারা লুপ্ত হযে যায়; তা হলে গৌণ রতির স্থায়িভাবত্ব কি করে সম্ভব ?

এই প্রশ্নের দুটি উত্তর দেওয়া যেতে পারে। প্রথমত, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুর টীকায় বলেছেন, কোনো প্রবলতর ভাবের (মুখ্যরতির) সংস্পর্শে গৌণ রতির লয় হলেও সংস্কার থেকেই যায়, তার লুপ্তি ঘটে না। অতএব সংস্কারের স্থায়িত্বকে অবলম্বন করে হাসাদি গৌণ রতির স্থায়িভাবের প্রতিষ্ঠা হয়।

দ্বিতীয়ত, মুখ্য রতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল অন্য ভাবকে আশ্রয় দেওয়া। হাসাদির নিজগুণে রতি হিসাবে মর্যাদালাভের যোগ্যতা নেই।[৭৯] মুখ্য রতির দ্বারা অনুগৃহীত হলেই এরা রতি হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সুতরাং সংশ্লিষ্ট মুখ্য রতির স্থায়িভাবই গৌণরতিকে স্থায়িভাবত্ব দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করে।

বাৎসল্য রস

পাঁচটি মুখ্যরসের মধ্যে মধুররসই সর্বপ্রধান। গৌড়ীয় রসশাস্ত্রে মধুররসের স্থান সকলের উপরে, কারণ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্ত তাঁর আরাধ্য দেবতাকে কান্তাভাবে ভজনা করাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হিসাবে স্বীকার করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কান্ত এবং রাধা বা ভক্ত তাঁর কান্তা। খ্রীস্টান মরমী ভক্তরাও এই সাধন পদ্ধতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। নিউম্যান বলেছেন, 'If thy soul is to go on to higher spiritual blessedness, it must become woman— yes, however manly you may be among men.'[৮০]

ভক্ত বলেন, শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রিয়, আমি তাঁর অনুরাগিনী কান্তা। এই লৌকিক জগতে যে মানবিক সম্বন্ধ সর্বাপেক্ষা মধুর তার সাহায্যে ভক্ত ও ভগবানের প্রগাঢ় প্রীতির বন্ধনকে উপলব্ধি করা যায়। মধুর রসের ভিত্তি মধুর রতি। এই মধুর রতি এবং মধুররস কোনো ভক্ত একেবারেই আয়ত্ত করতে পারেন না। মধুর রতিতে শান্তরতির কৃষ্ণনিষ্ঠা, দাস্যরতির সেবা, সখ্যরতির সম্ভ্রমহীন প্রীতির সম্পর্ক এবং বাৎসল্যরতির সপ্রেম কল্যাণ কামনা ও পরিচর্যা একই সঙ্গে মিলিত হয়েছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাই বলেছেন :

মধুররসে কৃষ্ণনিষ্ঠা, সেবা অতিশয়।
সখ্যের অসংকোচ, লালন মমতাধিক হয় ॥
কান্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন।
অতএব মধুররসের হয় পঞ্চগুণ ॥[৮১]

সাধন পথে ভক্তের প্রথম প্রাপ্তি শান্তরতি। এই রতি সাধনায় অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শান্তরসে পরিণত হয়। ভরতমুনি শান্তরসকে তাঁর উল্লেখিত আটটি রসের মধ্যে স্থান দেননি। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণ শান্তরতি ও শান্তরসকে প্রেমভক্তির সর্বনিম্ন স্তর হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। ধর্ম সাধনায় সর্বপ্রথম দরকার চিত্তকে সকল পার্থিব আকর্ষণ ও বিক্ষোভ থেকে মুক্ত করে প্রশান্তি লাভ করা। এই অবস্থায় ভক্তের হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রতি মমতাবোধ জাগ্রত হয় না। শুধু শ্রীকৃষ্ণে নিষ্ঠা ও পরমাত্মজ্ঞানের উপলব্ধি ভক্তকে পরবর্তী সাধন স্তরের জন্য প্রস্তুত করে। কৃষ্ণদাস কবিরাজের কথায়

শান্তের স্বভাব-কৃষ্ণে মমতা-গন্ধহীন।
পরংব্রহ্ম-পরমাত্মা-জ্ঞান-প্রবীণ।[৮২]

রাগভক্তির দ্বিতীয় পর্ব দাস্যরতি বা দাস্য ভাব। রতি যোগ্য বিভাবাদির সঙ্গে মিলিত হয়ে দাস্যরসে পরিণত হয়। দাসোচিত সেবার সঙ্গে থাকে প্রীতি। প্রকৃতপক্ষে দাস্যরতিতেই শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির প্রথম প্রকাশ। প্রেমভিত্তিক সাধনার সূত্রপাত দাস্যরসে। দাস্যরসে ভক্তের মনোভাব অনেকটা এইরূপ: 'তুমি প্রভু আমি দাস। আমি সেবা না করলে তোমার তৃপ্তি হয় না।' আমার সেবা ছাড়া চলে না এই ভাবের মধ্যে রয়েছে প্রীতির অংকুর। শান্তের নিষ্ঠা ও দাস্যের সেবাবৃত্তি এই উভয়ের মিলন দাস্যরসকে পূর্ণ করে। দাস্যভাবাবিষ্ট ভক্তের মন থেকে সম্ভ্রম বা সংকোচ দূর হয়ে যায় না, তাই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নিজের পার্থক্য সম্বন্ধে সচেতনতাসঞ্জাত দূরত্বের অনুভূতি থেকে যায়। হনুমান, নারদ, প্রহ্লাদ প্রভৃতি দাস্যরসাশ্রিত ভক্ত। কৃষ্ণসাধনার তৃতীয় স্তর সখ্যরতি, যা ক্রমে সখ্যরসে পরিণত হয়। সখ্যপ্রেমে শ্রীকৃষ্ণ ও ভক্তের মধ্যে সংকোচ দূর হয়ে যায়, উভয়ের মধ্যে পার্থক্যবোধ থাকে না। সখা শ্রীকৃষ্ণের সহিত একত্র শয়ন, ভোজন ও খেলা করেন। ভক্তসখা রূপে কৃষ্ণের প্রতি মমতাবুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে ব্যবহার করেন সমকক্ষের মতো। শান্ত ও দাস্যভাবে ভক্ত শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা যে হীন এই অনুভূতি থাকে। কিন্তু সখ্যভাবে শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব অনুপস্থিত। সখ্য প্রেমে শান্তের নিষ্ঠা, দাস্যের সেবা ও সখ্যভাবের সমস্তরের বন্ধুত্বের অসংকোচ প্রীতির অনুভূতি মিশ্রিত দেখা যায়। আদর্শ সখ্যপ্রেমের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় সুবল, মধুমঙ্গল প্রভৃতি ব্রজকিশোরগণের বন্ধুপ্রীতির মধ্যে।

সখ্যরসের সুন্দর ব্যাখ্যা পাওয়া যায় চৈতন্যচরিতামৃতে:

শান্তের গুণ, দাস্যের সেবন— সখ্যে দুই হয়।
দাস্যের সম্ভ্রম-গৌরব-সেবা, সখ্যে বিশ্বাসময় ॥

বিশ্রম্ভ-প্রধান সখ্য— গৌরব-সম্ভ্রম-হীন।
অতএব সখ্যরসের তিনগুণ-চিহ্ন ॥
'মমতা' অধিক, কৃষ্ণে আত্মসম জ্ঞান।
অতএব সখ্যরসের বশ ভগবান্ ॥[৮৩]

রাগভক্তির চতুর্থ পর্ব বাৎসল্য ভাব। ভক্তের হৃদয়ে এই ভাবের উদয় হলে মমতা বুদ্ধি এত অধিক হয় যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে ছোটো ও অসহায় বলে ধারণা জন্মে। মনে হয় বালক শ্রীকৃষ্ণকে সপ্রেমে পালন করা, উপদেশ দেওয়া, বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করা ইত্যাদি নন্দ-যশোদার ন্যায় ভক্তেরও কর্তব্য। শ্রীকৃষ্ণ নিজেও ভক্তের গুরুজনসুলভ আচরণ মাথা পেতে স্বীকার করে নেন।

বাৎসল্য রসের বিস্তৃত আলোচনা আরম্ভ করার আগে অন্য চারটি মুখ্য রতি ও রসের সামান্য পরিচয় দেওয়া হল। শান্ত, দাস্য, সখ্য ও মধুর ভাবের সবিস্তার আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তবে এদের সাধারণ পরিচয় দেওয়ায় রাগভক্তির সাধন পরিকল্পনায় বাৎসল্যরসের স্থান নিরূপণ সহজতর হতে পারে।

বাৎসল্য ভাবের ব্যাপকতা : মধুরভাব গভীর হতে পারে, গুণে শ্রেষ্ঠ স্বীকার করা যায়, কিন্তু বাৎসল্য ভাবের মতো তা ব্যাপক নয়। প্রাণীজগৎ ও মানব জগতের সর্বত্র বাৎসল্য সহজাত প্রবল বৃত্তি। সুতরাং ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে, আরাধ্য দেবতার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে এবং লৌকিক ও ধর্মভিত্তিক সাহিত্য রচনায় স্বাভাবিকরূপেই বাৎসল্যভাবের সুদূর প্রসারী প্রভাব লক্ষণীয়। আরাধ্য দেবতার সঙ্গে যখন রসসিক্ত সম্পর্ক গড়ে ওঠে তখন ভক্তের আকাঙ্ক্ষা হয় সেই সম্পর্ককে কোনো পার্থিব বাস্তব বন্ধন দিয়ে চিহ্নিত করতে। বৈষ্ণব সাধন-পদ্ধতি যেরূপ প্রগাঢ় রসানুভূতিশীল তেমন আর কোনো ধর্মের আরাধন রীতিতে নেই। বালক পুত্র ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত ভক্ত কিংবা ঈশ্বর বিমুখ ব্যক্তি, প্রত্যেকের নিকটই একান্ত প্রিয়। সেজন্য আরাধ্য দেবতাকে পুত্ররূপে কল্পনা করায় অনির্বচনীয় আনন্দরসের সৃষ্টি হয়। পুত্রকে আদর করা যায়, সেবা করা যায়, ভর্ৎসনা করা যায়, নিজের রুচি ও ইচ্ছাকে তার উপর আরোপ করবারও একটা সুযোগ থাকে। মধুরভাব শুধু দয়িত ও দয়িতার মধ্যে সীমাবদ্ধ ; বাৎসল্যভাবের ক্ষেত্র পিতামাতা ও সন্তানের মধ্যে নিবদ্ধ নয়। অগ্রজ-অগ্রজা, অন্যান্য গুরুজন এবং প্রতিবেশী সকলের মনেই বাৎসল্য রস জাগ্রত হতে পারে। বৈষ্ণবের নিকট তাই বালগোপালের আরাধনা এত প্রিয়।

অন্য ধর্মসম্প্রদায়েও বাৎসল্যভাবে আরাধনা করা হয়। শাক্ত সম্প্রদায় উমাকে কন্যারূপে দেখেছে। রামপ্রসাদ প্রভৃতি মাতৃসাধকদের মধ্যে রয়েছে প্রতিবাৎসল্য। অর্থাৎ, ভক্ত আরাধ্যা দেবীকে মাতৃরূপে কল্পনা করেন। তবে শাক্তসাধনায় বৈষ্ণবীয় বাৎসল্যভাবের মতো আবেগের গভীরতা নেই।

যীশুখ্রীস্ট ও বালগোপাল

আমাদের সামাজিক জীবনে বাৎসল্যরসের ব্যাপক অস্তিত্বের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। পৃথিবীর সকল দেশের সাহিত্যেই মানব মনের এই সুগভীর বৃত্তির অল্পবিস্তর প্রতিফলন দেখা যায়। কিন্তু বাৎসল্যভাবকে দেবত্বে প্রতিষ্ঠা করবার বৈশিষ্ট্য বিশেষরূপে লক্ষণীয় বৈষ্ণব ও রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের মধ্যে। যীশুখ্রীস্ট এবং বালগোপাল উভয়েই বাৎসল্য রসের প্রতীক। বাৎসল্যরসে ভাবিত হয়ে বৈষ্ণব ও খ্রীস্টান ভক্তরা কৃষ্ণ ও যীশুর আরাধনা করেন। কৃষ্ণ ও যীশুর বাল্য জীবনে অনেক ক্ষেত্রে সাদৃশ্য দেখা যায়। দুজনেই বড়ো হয়েছেন মাতৃসমা স্নেহময়ী রমণীর কাছে, নিজের মার কাছে নন। অবশ্য ধর্মপ্রাণ খ্রীস্টানরা বিশ্বাস করেন কুমারী মারীই যীশুর প্রকৃত মাতা। কিন্তু বর্তমান যুক্তিশাসিত যুগে বিশ্বাস করা কঠিন যে, এক কুমারী নারী সন্তানের জননী হয়েছিলেন। প্রকৃত ঘটনা হয়ত এই যে, কুমারী মারী অন্য কারো পুত্রকে নিজের পুত্রের মতো সযত্নে মানুষ করেছিলেন। নন্দ ও জোসেফও আপন পুত্রের মতোই যথাক্রমে কৃষ্ণ ও যীশুকে ভালোবেসেছেন, লালন পালন করেছেন। কংস কৃষ্ণকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন; বসুদেব তাই তাঁকে কারাগার থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন যশোদার কোলে। রাজা হেরোদ যীশুকে হত্যা করার জন্য তাঁর সন্ধান করছেন, এই দৈববাণী শুনে জোসেফ ও মারী পুত্রকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন মিশরে। কংস আত্মরক্ষার জন্য মথুরার দশ দিবস বয়স্ক সকল শিশুকে হত্যা করবার পরিকল্পনা করেছিলেন। তেমনি রাজা হেরোদও নিজেকে বিপন্মুক্ত করবার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন দু'বছর বয়স পর্যন্ত সকল বালককে হত্যা করবার। বালক কৃষ্ণের অনেক অলৌকিক ক্ষমতার কাহিনী লেখা আছে নানা পুঁথিতে। যীশুর বাল্যজীবনের কিছু কিছু অলৌকিক ঘটনার কথাও জানা যায়। বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য দীক্ষাস্নানের সময় আকাশ হঠাৎ উন্মুক্ত হয়ে যাওয়া, শয়তানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া এবং মাত্র বারো বৎসর বয়সে দিক্‌পাল সব পণ্ডিতদের সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা করা ইত্যাদি। যীশুর রাখালদের সঙ্গে যোগাযোগ, বনে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ানো প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে কৃষ্ণের জীবন-কথার অনেক মিল অস্বীকার করা যায় না। এছাড়া আরো একটি আশ্চর্যজনক মিল আছে যীশুর সঙ্গে কৃষ্ণের। হিন্দু দেবতাদের মধ্যে একমাত্র কৃষ্ণেরই জন্মোৎসব সাড়ম্বরে পালিত হয়, যীশুখ্রীস্টের জন্মোৎসবেরই মতো।

কিন্তু এসব সাদৃশ্য বাহ্যিক। বালগোপালের আরাধনার কথা আমরা জানি। বালক যীশুকে কিভাবে পূজা করা হত এবং এখনও হয়ে থাকে তা সংক্ষেপে বলা দরকার।

মারী ও জোসেফ দৈববাণী থেকে জেনেছেন যীশু মুক্তিদাতা ঈশ্বরপুত্র। তখন যীশুর মাত্র জন্ম হয়েছে, তখনও তিনি জাব-দানের (manger) মধ্যে শুয়ে। দৈববাণীর দ্বারা নির্দেশিত হয়ে রাখালের দল এসে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে গেল।

তারপর এল প্রাচ্যদেশীয় পণ্ডিতের দল। তাঁরা যীশুকে বন্দনা করে বলে গেলেন, ইনি ঈশ্বরের পুত্র, মানুষের ত্রাণকর্তা। তারপর থেকে ঈশ্বরের পুত্র এবং মুক্তিদাতা হিসাবে বালক যীশু পূজিত হয়ে আসছেন। এই বন্দনা স্থায়িত্ব লাভ করেছে বিশেষ করে ইতালীর 'ব্যাম্বিনো'[৮৪] প্রতিমা রূপের মধ্যে। 'ব্যাম্বিনো' শব্দের অর্থ বেবি বা শিশু। মারীর কোলে কাঁথা জড়ানো একটি শিশুর প্রতিমা শিল্পীদের বিষয়। এই বিষয় অবলম্বন করে রেনেসাঁস যুগে অনেক উৎকৃষ্ট চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতকের একটি ফ্রেস্কো (রোমের সেণ্ট প্রিসিলা গীর্জায়) এই রীতির প্রাচীনতম চিত্র। রোম শহরে ঐ স্টান পর্ব উপলক্ষে আজও দুফুট উঁচু 'পবিত্রতম শিশুর' প্রতিমূর্তি নিয়ে শোভাযাত্রা বের করা হয়; মূর্তিটি তৈরি জলপাই কাঠের। এই শিশুর মূর্তিকে পরানো হয় 'সোয়াডলিং ক্লোদস'[৮৫], মাথায় পরানো হয় মণিমুক্তাখচিত সোনার মুকুট। রথে বসিয়ে রাস্তা দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হয় বালক যীশুর মূর্তি। রথের দুপাশে থাকেন পাদ্রি ও ভক্তের দল। তাঁরা ধর্মসংগীত গাইতে গাইতে পথ চলেন। অনুরূপ শোভাযাত্রা বেথেলহেমেও বার করা হয়। তবে সেখানকার বালক যীশুর মূর্তি কাঠের নয়, মোমের তৈরি।[৮৬]

বালক যীশুর ও বালক কৃষ্ণের আরাধনার মধ্যে দুটি প্রধান পার্থক্য দেখা যায়। প্রথমত, যে কৃষ্ণকে পূজা করা হয় তাঁর কিশোর মূর্তিই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। শ্রীরামকৃষ্ণ কৃষ্ণের মূর্তি এইরূপে কল্পনা করেছিলেন: 'It is a tender female face that Krishna has; in it is the fullness of boyish delicacy and girlish grace.'[৮৭] অপরপক্ষে যে যীশুকে পূজা করা হয় তিনি একেবারে মায়ের কোলের শিশু।

দ্বিতীয়ত, বালক যীশুর আরাধনার মধ্যে বাৎসল্য ভাবের উপস্থিতি সামান্যই উপলব্ধি করা যায়। একবার পথ চলতে মারী যীশুকে হারিয়ে ফেললেন। অনেক পরে তাঁকে ফিরে পেয়ে মারীর উদ্বেগ প্রকাশের মধ্যে একটু বাৎসল্যরসের আবির্ভাবের সম্ভাবনা দেখা দিতে না দিতেই তা দূর হয়ে গেল যীশুর উত্তরে। তিনি দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, 'কেন চিন্তা করছিলে। তুমি কি জান না, পিতার গৃহেই (অর্থাৎ মন্দিরেই) আমি থাকব?'[৮৮]

যীশু যে ঈশ্বরের পুত্র, সাধারণ মানব পুত্র নন, তা ভুলে থাকা যায় না। জন্মের পর থেকেই তিনি দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত। তাই এ ক্ষেত্রে বাৎসল্যভাব জাগ্রত হবার অবকাশ কম। কৃষ্ণও যশোদার কোলে বসেই মুখের মধ্যে তাঁকে বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন, সুতরাং যশোদা ও অন্য অনেকেই অবহিত ছিলেন কৃষ্ণের দেবত্ব সম্বন্ধে। কিন্তু বৈষ্ণব কাব্যে আমরা দেখতে পাই যশোদা, কবি এবং পাঠক বা শ্রোতা, সকলেই তাঁর দেবত্ব বিস্মৃত হয়ে বাৎসল্যরসে আবিষ্ট। কৃষ্ণ এক্ষেত্রে একান্তই মানবপুত্র, স্নেহের বন্ধনে ধরা দেবার জন্য যিনি সর্বদা উন্মুখ।

সংসারের সকল মালিন্যমুক্ত শিশু দেবতার ঘনিষ্ঠতম। হয়ত এইজন্যই শিশুকে দেবতার স্থলাভিষিক্ত করে পূজা করা হয়। জার্মান মরমী সাধক হেনরী সুসো[৮৯]

একদিন সাধনা-নিমগ্ন অবস্থায় মারীর কোল থেকে শিশু যীশুকে কোলে নিয়েছেন। বালক যীশুর অঙ্গ স্পর্শের সুখানুভূতিতে তিনি, 'Uttered a cry of amazement that He who bears up the heavens is so great and yet so small, so beautiful in heaven and so childlike on earth'[১০]

মরমী সাধকের দৃষ্টিতে বালক দেবতার আরাধনার এটি সুন্দর ব্যাখ্যা।

ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধ থেকে কয়েকজন ভাবতবিদ্যাবিদ্ প্রমাণ করতে উদ্যোগী হলেন যীশুর বাল্যজীবন কেন্দ্র করে যে ধর্মচর্যার উদ্ভব হয়েছিল তা বালগোপালের কিংবদন্তীকে বিশেষরূপে প্রভাবান্বিত করেছে। এমনকি, হয়ত বালক যীশুই বালগোপাল কাহিনীর উৎস। বিতর্কের সূত্রপাত করেন ভেবর,[১১] ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণজন্মাষ্টমীর উৎস অনুসন্ধানবিষয়ক একটি প্রবন্ধ লিখে।[১১] এই সূত্র অবলম্বনে হপকিনস,[১২] কেনেডি,[১৪] ম্যাকনিকল,[১৫] প্রভৃতি বেশ কয়েকজন নানা যুক্তি উত্থাপন করেন, কৃষ্ণকাহিনীর উৎপত্তি যে খ্রীস্টান ধর্মীয় ঐতিহ্যে নিহিত তা সমর্থন করে। ম্যাকনিকলের ধারণা যে, নেস্টোরিয়ান[১৬] মিশনারীরা যখন খ্রীস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ভারতে আসেন তখন কৃষ্ণকিংবদন্তীর সঙ্গে যীশুকথা মিলিত হয়ে বালগোপাল কাহিনী ধীরে ধীরে বর্তমান রূপ লাভ করে।

কেনেডি এক দীর্ঘ প্রবন্ধে বলেছেন, দ্বারকার কৃষ্ণ এবং মথুরার বালগোপাল অভিন্ন হতে পারেন না। তাঁর বক্তব্য এই যে, পৌরাণিক উপখ্যান আলোচনা করলে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় একই নামধারী দেবতা বিভিন্ন অঞ্চলে ও বিভিন্ন যুগে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য নিয়ে আবির্ভূত হন। পরবর্তীকালে এই সব ছোটো ছোটো দেবতাদের দেখা যায় সকল বৈশিষ্ট্য ও কিংবদন্তীর সমন্বয় সহ এক মহান পরাক্রান্ত দেবতায় রূপান্তরিত হতে। কৃষ্ণ এমনই এক দেবতা। কিন্তু তাঁর বালগোপাল রূপটি যেন হঠাৎ দ্বারকার কৃষ্ণকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে। খ্রীস্টীয় সপ্তম শতকে তাঁকে প্রথমেই প্রভাবশালী দেবতা হিসাবে দেখা যায়, পৌরাণিক অন্যান্য দেবতার মতো তাঁর ক্রমবিবর্তন নেই। এই জন্যই মনে হয় বালগোপালের রূপকল্পনার উৎস বিদেশে নিহিত এবং তা যীশুর বালরূপকে কেন্দ্র করে বিকাশ লাভ করেছে। অবশ্য এই বিদেশাগত দেবকল্পনার সঙ্গে হিন্দু ধর্মের কিছু ধ্যানধারণা যুক্ত হওয়াতে বালগোপাল এদেশে সহজেই গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছেন।[১৭] এই নতুন দেবতার আগমন হল কোন উপায়ে? কেউ কেউ বলেন শক গোষ্ঠীর যাযাবর উপজাতি গুর্জররা খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতকে যখন মথুরার নিকটে বসবাস আরম্ভ করে তখন থেকে বালগোপালের আবির্ভাব। গ্রীস, জেরুজেলাম ও সন্নিহিত অঞ্চলের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এসেছিল গুর্জরদের সঙ্গে। সে ঐতিহ্যের মধ্যমণি ছিলেন যীশু।

একদা বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রাক্তন কেন্দ্র মথুরায় তখন এই দুই ধর্মের প্রভাব অনেকটা ম্লান হয়ে এসেছে; স্মার্ত—পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম তখন সুপ্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। এই পরিবেশে এক নতুন বালক দেবতার রূপ-কল্পনা আত্মস্থ করে নিতে হিন্দুদের পক্ষে কোনো দ্বিধা হয়নি। কেনেডির বক্তব্যের এই হচ্ছে সামান্য সংক্ষিপ্তসার।

তিনি আরো বলতে পারতেন, এই মথুরা অঞ্চলেই পরবর্তীকালে বল্লভাচার্য বালগোপালের পূজা যেমন জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন দেশের অন্যত্র তা হয়নি।

রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরও[৯৮] বালগোপাল উপাসনার উপর খ্রীস্টান ধর্মের প্রভাব স্বীকার করেছেন। কৃষ্ণ নামটি খ্রীস্ট থেকে আসতে পারে এখন সম্ভাবনাও তিনি দেখেছেন। বাঙালীরা কৃষ্ণকে 'কিস্ট' বা 'কেস্ট' উচ্চারণ করে, যা খ্রীস্টর কাছাকাছি। তাঁর মতে গুর্জররা নয়, আভীর জাতির লোকরাই বালক যীশুর পূজার কাহিনী প্রচার করেছে। ব্রজগোপীদের সঙ্গে কৃষ্ণের লীলাখেলার কাহিনীও এসেছে আভীর সমাজ থেকেই।

একালের ঐতিহাসিক বাশম বলেন, বালক কৃষ্ণের আবির্ভাবের ইতিহাস সম্পূর্ণ অজানা। এটা অসম্ভব নয় যে ভারতের পশ্চিম উপকূলে যাতায়াতকারী খ্রীস্টান বণিকরা এবং নেস্টোরিয়ান পাদ্রিরা যীশুকথা এদেশে প্রচার করেছিলেন। তা থেকে বালগোপালের ধারণা কিছুটা প্রভাবিত হওয়া সম্ভব।[৯৯]

আর্থার বেরিডেল কীথ বিগত শতকের পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের সঙ্গে একমত হতে পারেননি। তিনি বলেছেন, কৃষ্ণ বালগোপালের কথা ষষ্ঠ শতকের অনেক আগেই পাওয়া যায়। যে সব খ্রীস্টানশাস্ত্র প্রমাণ হিসাবে কেনেডি প্রমুখ পণ্ডিতরা উল্লেখ করেছেন, তাদের রচনাকাল অনিশ্চিত। তাছাড়া প্রভাবটা তো পারস্পরিকও হতে পারে। হয়তো কৃষ্ণ কিংবদন্তীই শিশু যীশুর আরাধনাকে প্রভাবিত করেছে।[১০০]

কীথের অভিমত ভেবে দেখবার মতো। তিনি বলেছেন, হয়ত কৃষ্ণকিংবদন্তীই বালক যীশুর আরাধনাকে প্রভাবিত করেছে। তার কারণও যে একেবারে নেই তা বলা যায় না। প্রথমত যীশুর জন্মের অব্যবহিত পর প্রাচ্যদেশের পণ্ডিতরা তাঁকে সোনা ধুনো ও গুগ্‌গুল ইত্যাদি দিয়ে বন্দনা করেন। ধুনো ও গুগ্‌গুল ভারত থেকেই রপ্তানী করা হত। কৃষ্ণকাহিনী হয়ত এই পণ্ডিতরাই বেথেলহেমে নিয়ে গিয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত, রোমে জলপাই কাঠের যে বালক যীশুর মূর্তি নিয়ে শোভাযাত্রা বের করা হয় সেই মূর্তির রঙ কালো। শ্বেতকায়দের দেশে কৃষ্ণমূর্তির পূজা তাৎপর্যপূর্ণ।

ডঃ ভাণ্ডারকর কৃষ্ণ ও খ্রীস্ট নামের মধ্যে ঘনিষ্ঠতার উল্লেখ করে ইঙ্গিত করেছেন যে খ্রীস্টই ভারতে এসে কৃষ্ণ হয়েছেন। কিন্তু আমরা প্রথম অধ্যায়ে দেখিয়েছি যে ঋগ্‌বেদেও কৃষ্ণ নাম পাওয়া যায়। ঋগ্‌বেদ নিঃসন্দেহে যীশুর জন্মের পূর্বে রচিত। সুতরাং ডঃ ভাণ্ডারকরের খ্রীস্টান প্রভাবের এই দৃস্টান্তটি যুক্তিসহ নয় বলেই মনে হয়।[১০১]

গৌড়ীয় রস-তত্ত্ব ও হিন্দী-কৃষ্ণকাব্য

গৌড়ীয় রসশাস্ত্রের প্রভাব বাংলা পদাবলী সাহিত্যেই নিবদ্ধ ছিল না; হিন্দী কৃষ্ণ-কাব্যেও তার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কয়েকটি কারণে এই প্রভাব ছিল স্বাভাবিক।

বাঙালী বৈষ্ণবাচার্যেরা বৈষ্ণবীয় রসশাস্ত্র সম্পর্কিত প্রায় সকল গ্রন্থ বৃন্দাবনে রচনা করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা সেখানে করতেন বৈষ্ণবধর্মের সাধনা। সুতরাং ষড়গোস্বামীর এবং অন্যান্য আচার্যদের ভৌগোলিক সান্নিধ্য হিন্দী কৃষ্ণকাব্যের কবিদের গৌড়ীয় রসশাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট করবার পক্ষে বিশেষরূপে সহায়ক হয়েছে। আরও একটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন : বাঙালী আচার্যেরা তাঁদের মৌলিক গ্রন্থগুলি [ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বলনীলমণি, প্রীতিসন্দর্ভ প্রভৃতি] লিখেছেন সংস্কৃতে, যা ছিল ভক্তিবাদের অন্তঃরাজ্যিক ভাষা। উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম সর্বত্র সংস্কৃতের প্রচলন ছিল। সুতরাং গৌড়ীয় বৈষ্ণব-তত্ত্ব উপলব্ধি করবার পথে ভাষা কখনও অন্তরায় হয়নি।

তাছাড়া ভাবের দিক থেকে বিচার করলেও দেখা যাবে গৌড়ীয় রস-তাত্ত্বিকরা সম্পূর্ণ অপরিচিত বিষয় পরিবেশন করেননি। শিক্ষিত সমাজ সংস্কৃত অলংকার এবং রসশাস্ত্রের কাঠামোর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। রূপগোস্বামী প্রমুখ আচার্যেরা সাহিত্যের রসশাস্ত্রকে ধর্মের ক্ষেত্রে প্রসারিত করেছেন এবং ধর্মীয় সাধনার সঙ্গে মিলিয়ে নেবার জন্য কোথাও কোথাও নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। প্রাচীন আলংকারিকদের রচিত কাঠামোটি সম্পূর্ণ পালটে দিলে হিন্দী ভক্ত কবিরা হয়ত একে গ্রহণ করতে দ্বিধা করতেন। আর একটি কারণ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু প্রভৃতির মতো প্রামাণিক নির্দেশক গ্রন্থ হিন্দীতে ছিল না। হিন্দীভাষী কোনো বৈষ্ণবাচার্য ধর্মচর্যার অথবা রসশাস্ত্রের নতুন কোনো তত্ত্ব বিধিবদ্ধ না করায় বৃন্দাবনে গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্রগ্রন্থের উপরই হিন্দী কৃষ্ণকাব্যের কবিদের নির্ভর করতে হয়েছিল।

বল্লভাচার্য হিন্দী কৃষ্ণকাব্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বললে অত্যুক্তি হবে না। তারই প্রেরণায় অষ্টছাপের কবিরা কৃষ্ণকাব্য সমৃদ্ধ করেছেন। বল্লভাচার্য নিজে ভক্তি রসশাস্ত্র বিধিবদ্ধ করে এমন কোনো গ্রন্থ রচনা করেননি যা হিন্দী সাহিত্যের ভক্ত কবিদের পদ রচনায় পথ-নির্দেশ করতে পারে। জনশ্রুতি এই যে বল্লভাচার্য ৮৪টি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। কিন্তু ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর ন্যায় কোনো গ্রন্থ রচনায় তিনি উদ্যোগী হননি। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর অধিকাংশই এখন অপ্রাপ্য। প্রাপ্তব্য গ্রন্থাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্রীব্রহ্মসূত্রাণুভাষ্য, জৈমিণীসূত্রভাষ্য এবং শ্রীমদ্ভাগবত-টীকা শ্রীসুবোধিনী। এই সব কটিই তিনি অসম্পূর্ণ রেখে গেছেন। পুত্র বিঠলনাথ অণুভাষ্যের অবশিষ্টাংশ রচনা করে গ্রন্থটি সম্পূর্ণ করেছেন।

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের অধিকাংশ কৃষ্ণ ভাবিত হিন্দী কবিদের অবিসংবাদী গুরু ছিলেন বল্লভাচার্য। তাঁর মতবাদের সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতবাদের মৌলিক পার্থক্য থাকলে বাঙালী আচার্যদের রসশাস্ত্রের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা হিন্দী কৃষ্ণকাব্যের কবিদের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হত না। বাহ্যিক কিছু পার্থক্য দেখা গেলেও মূলত বল্লভাচার্য ও গৌড়ীয় দার্শনিক তত্ত্বের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই বলা যায়। বল্লভাচার্য যে চৈতন্যদেবের গুণমুগ্ধ ছিলেন, ত্রিবেণী সঙ্গমে ও অন্যত্র তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে যে গ্রহণ করেছেন, তার উল্লেখ বিভিন্ন গ্রন্থে পাওয়া যায়।[১০২] অপরদিকে সনাতন গোস্বামী

তাঁর বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণীতে বল্লভাচার্যের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। চৈতন্য-দেব ও বল্লভাচার্য— এই দুই গুরুর পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতির সম্পর্ক বাঙালী ও হিন্দী ভক্ত কবিদের এক সূত্রে, এক রসাদর্শে, মিলিত করতে যথেষ্ট সহায়তা করেছিল।

এর চেয়েও বড়ো কথা ধর্ম সাধনায় তাঁদের মতৈক্য। বল্লভাচার্যের মতে ভক্তি দুই প্রকার। মর্যাদাভক্তি ও পুষ্টিভক্তি। প্রথমোক্ত ভক্তি বিধিনির্দিষ্ট রীতি অনুশীলনপূর্বক ভক্তকে ঈশ্বর প্রাপ্তির পথে অগ্রসর করিয়ে দেয়। এই শ্রেণীর ভক্তের লক্ষ্য ভগবানের সঙ্গে একান্ত হয়ে মোক্ষ লাভ করা। মর্যাদাভক্তি অনেকটা বাংলার বৈষ্ণবাচার্যগণ কথিত বৈধীভক্তির ন্যায়। পুষ্টিভক্তি আচার অনুষ্ঠান পালনের উপর নির্ভর করে না, ভগবানের অনুগ্রহ লাভই সেখানে ঈশ্বর প্রাপ্তির অন্যতম পন্থা। পুষ্টি বা পোষণের অর্থ অনুগ্রহ। বল্লভাচার্যের মতে পুষ্টিমার্গ বা রসমার্গই শ্রেষ্ঠ। রূপগোস্বামী একেই বলেছেন রাগানুগা ভক্তি। পুষ্টিমার্গীরা শ্রীকৃষ্ণের সালোক্য প্রাপ্তি লাভ করে তাঁর সঙ্গে গোপ-গোপী, পশু পক্ষী, বৃক্ষ নদী প্রভৃতি নানারূপে অখিলরসামৃতমূর্তি ভগবানের সঙ্গে বিবিধ লীলার সাহায্যে অপরিসীম রসের উল্লাস আস্বাদন করেন।

উপরোক্ত পুষ্টিবাদের ব্যাখ্যা থেকে প্রমাণিত হয় যে বল্লভাচার্যের মতবাদের সঙ্গে বঙ্গীয় বৈষ্ণব সমাজের অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। বাংলার বৈষ্ণব সাধকরাও মোক্ষ কামনা করেন না। তাঁরাও শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে লীলারস আস্বাদনকেই শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি বলে বিশ্বাস করেন।

শ্রীরূপগোস্বামী বলেছেন বল্লভাচার্য ব্যাখ্যাত মর্যাদাভক্তি ও পুষ্টিভক্তি গৌড়ীয় আচার্যগণ কথিত যথাক্রমে বৈধী ও রাগানুগাভক্তি।[১০৩]

পরবর্তীকালের হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাসকার ও সমালোচক বঙ্গ ও ব্রজের পারস্পরিক সম্পর্ক ও প্রভাব স্বীকার করেছেন। বৈষ্ণব সাহিত্যের বিখ্যাত সমালোচক প্রভুদয়াল মীতল বলেছেন, মধ্যযুগে উত্তর ভারতের সকল সাহিত্যের উপর চৈতন্যের প্রবল প্রভাব। এই সময়কার সংস্কৃত, বাংলা, ওড়িয়া, অসমীয়া এবং ব্রজভূমির সাহিত্যের উপর এই প্রভাব স্পষ্টই অনুভূত হয়।[১০৪]

তিনি আরও বলেছেন, রূপগোস্বামীর ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও উজ্জ্বলনীলমণি মহান গ্রন্থ। 'উনকী রচনাওঁ নে বঙ্গ ঔর বঙ্গকে ভক্তি-সাহিত্য কো অত্যাধিক প্রভাবিত কিয়া হৈ। উনকা ধার্মিক ঔর সাহিত্যিক দোনোঁ দৃষ্টিয়োঁ সে বিশেষ মহত্ত্ব হৈ। উনকে কারণ চৈতন্য মত কা প্রভাব বঙ্গ সে ব্রজ তক ব্যাপক রূপ মেঁ হো গয়া থা।'[১০৫] অর্থাৎ, তাঁর [রূপগোস্বামীর] রচনা ব্রজ ও বঙ্গ অঞ্চলের ভক্তি সাহিত্যকে বিশেষরূপে প্রভাবিত করেছে। ধর্ম ও সাহিত্য, এই উভয় দিক দিয়েই তাঁর গ্রন্থের প্রভাব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এর কারণ চৈতন্য-মতবাদের প্রবাহ বঙ্গ থেকে ব্রজ পর্যন্ত ব্যাপক রূপ নিয়েছিল।

ডঃ হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী 'চৈতন্য মত ঔর ব্রজ সাহিত্য' গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের প্রেরণায় কেবল সংস্কৃত ও বাংলায় নয়, হিন্দীতেও অনেক মহত্ত্বপূর্ণ সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে।[১০৬]

দীনদয়াল্ গুপ্ত সম্পাদিত 'হিন্দী সাহিত্য কা বৃহৎ ইতিহাসে' বলা হয়েছে যে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু অষ্টছাপের কবিদের প্রেরণার অন্যতম উৎস ছিল।[১০৭]

আর একজন সমালোচক উল্লেখ করেছেন যে, মধ্যযুগের বৈষ্ণব সাহিত্যে বিশেষ করে হিন্দী সাহিত্যের ভাব ও বিষয়বস্তুর উপর বাংলা সাহিত্যের প্রবল প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।[১০৮]

ডঃ বলদেব উপাধ্যায় সুস্পষ্টরূপে বলেছেন, গোড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় সর্বপ্রথম ভক্তিরসের অবতারণা করেন এবং সাহিত্যে তাকে প্রতিষ্ঠিত করেন।[১০৯]

ডঃ হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী হিন্দী কৃষ্ণকাব্যে রূপগোস্বামীর প্রভাব সম্বন্ধে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি দেখিয়েছেন, উজ্জ্বলনীলমণি রচিত হবার পূর্বে, ১৫৪১ খ্রীস্টাব্দে, কৃপারাম হিততরঙ্গিনী লিখেছিলেন। 'ইসমেঁ রসোঁ কা বিষয় বহুত হী বিস্তার পূর্বক ঔর মনোহর ছন্দোঁ দ্বারা কহা গয়া হৈ। ইস কবি কী ভাষা সুষ্ঠু ব্রজ ভাষা হৈ।' তিনি আরও বলেছেন, এই গ্রন্থে সর্বপ্রথম রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলার লিখিত উদাহরণ পাওয়া যায়।[১১০] এই প্রবন্ধেই ডঃ দ্বিবেদী বলেছেন, বাংলাদেশে রূপগোস্বামী সর্বপ্রথম সংস্কৃতে রচিত উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে এই প্রকার রসের আলোচনা করেছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে এই গ্রন্থেই প্রথম ভক্তি এবং অলংকারশাস্ত্র একই সংগে আলোচিত হয়েছে।

রামচন্দ্র শুক্ল[১১১] এবং হিন্দী সাহিত্য কা বৃহৎ ইতিহাসে[১১২] কৃপারামের গ্রন্থের কথা উল্লেখ করা হলেও তাঁকে হিন্দী কৃষ্ণকাব্যে ভক্তিরস প্রচলনের পথিকৃৎ হিসাবে বলা হয়নি।

উজ্জ্বলনীলমণি হিততরঙ্গিনীর দশ এগারো বছর পরে সম্পূর্ণ হয়েছে সত্য। কিন্তু ভক্তিরসামৃতসিন্ধু হিততরঙ্গিনীর সঙ্গে একই বৎসরে অর্থাৎ ১৫৪১ খ্রীস্টাব্দে সমাপ্ত হয়েছিল। উজ্জ্বলনীলমণির মূল বক্তব্য সংক্ষেপে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বলা হয়েছে। ডঃ হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর কথা উল্লেখ করেননি। শুধু কালানুক্রমিকতায় অগ্রবর্তী হলেই যে সাহিত্যে প্রভাব সৃষ্টি করা যায় না তার বহু দৃষ্টান্ত ইতিহাসে পাওয়া যায়। হিন্দী সাহিত্যের ভক্ত কবি ও ইতিহাসকাররা রূপগোস্বামীর দানের কথাই বারবার উল্লেখ করেছেন; কৃপারামের নয়।

হিন্দী ও বাংলা ভক্তি সাহিত্যে পার্থক্যের কথাও উল্লেখ করা উচিত। হিন্দীতে তুলসীদাসের প্রভাবে দাস্যভাব প্রাধান্য লাভ করেছে; বাংলায় প্রাধান্য মাধুর্যরসের। পরকীয়া নায়িকাকে হিন্দী ভক্ত কবিরা উচ্চ মর্যাদা দেননি; বাংলায় পরকীয়া নারী শ্রেষ্ঠ নায়িকা। বালগোপালের আরাধনা হিন্দী ভক্ত কবিদের বৈশিষ্ট্য। এজন্য হিন্দীতে বাৎসল্যরসের অনেক উৎকৃষ্ট পদ রচিত হয়েছে। বালগোপালের সাধনার প্রবর্তক বল্লভাচার্য। পরে বল্লভাচার্য গদাধর পণ্ডিতের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করে কিশোর কৃষ্ণের [অর্থাৎ মাধুর্যভাবের] পূজারী হন।[১১৩] বল্লভাচার্যের এই দুই কৃষ্ণের সাধনার প্রতিফলন বিশেষ করে দেখা যায় সুরদাসের পদাবলীতে। বাৎসল্য এবং মধুর—এই উভয় রসেরই উৎকৃষ্ট পদ তিনি রচনা করেছেন।

সন্তানের জন্য ব্যাকুলতা হিন্দু সমাজে যত প্রবল এমন আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। জন্মের অনেক আগে থেকেই সন্তানের শুভ কামনায় নানা আচার অনুষ্ঠান শুরু হয়ে যায়। নানাবিধ উৎসবের মধ্য দিয়ে শিশুর জন্ম হবার পর ষষ্ঠী, অন্নপ্রাশন, হাতে খড়ি, উপনয়ন ইত্যাদি আনন্দানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পুত্রকে সংসারে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। দশরথ পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করে রামকে লাভ করেছিলেন। পুত্র শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ হল পিতাকে যে পবিত্র করে, পুৎ নামক নরক থেকে যে উদ্ধার করে। তাই দেবদেবীর কাছে পুত্রের জন্য প্রার্থনার অন্ত ছিল না। ঋগ্বেদে বারবার দেখা যায় পুত্রসন্তানের জন্য ব্যাকুল প্রার্থনা। দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট ভক্তের আবেদন

ইমাং ত্বমিন্দ্র মীঢ়্বঃ সুপুত্রাং কৃণু।
দশাস্যাং পুত্রানা ধেহি পতিমেকাদশং কৃধি ॥[১৪]

অর্থাৎ, হে বৃষ্টিবর্ষণকারী ইন্দ্র; এই নারীকে তুমি উৎকৃষ্ট পুত্রবতী ও সৌভাগ্যবতী কর। এর গর্ভে দশ পুত্র সংস্থাপন কর, পতিকে নিয়ে একাদশ ব্যক্তি কর।

পতিপ্রেমের সঙ্গে বাৎসল্যভাব যে অলক্ষ্যে মিশ্রিত থাকে এখানে তারই সুন্দর ইঙ্গিত। সাহিত্যে বাৎসল্যভাবের প্রাচীনতম দৃষ্টান্ত পাই ঋগ্বেদে। দেবতাদের পুত্রের মতো, শিশুর মতো সস্নেহ দৃষ্টিতে দেখবার উদাহরণ বেশ কয়েকটি পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলেই আছে:

পুত্রো ন জাতো রণ্বো দুরোণে বাজী ন প্রীতো বিশো বিতারীৎ।
বিশো যদহ্বে নৃভিঃ সনীলা অগ্নির্দেবত্বা বিশ্বান্যশ্যাঃ।[১৫]

অর্থাৎ অগ্নি পুত্রের ন্যায় জন্মগ্রহণ করে গৃহ আনন্দময় করেন এবং অশ্বের ন্যায় হর্ষযুক্ত হয়ে সংগ্রামে শত্রুগণকে পরাস্ত করেন।

দশম মণ্ডলে (৮৫।১৮) মিত্র ও বরুণকে শিশু বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই মণ্ডলেই (১২৩।১) দেখতে পাই পূজার্থী বৃষ্টিবর্ষণকারী দেবতাকে বালকের ন্যায় মিষ্ট কথায় তুষ্ট করেন।

সুতরাং দেবতাকে পুত্রের মতো করে দেখা এবং বাৎসল্য ভাবে ভাবিত হয়ে আরাধনা করবার বীজ আমাদের দেশে বহু পূর্ব থেকেই ছিল, বালগোপালের আরাধনায় তার পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে। তাই যীশুর জীবন থেকে বাৎসল্যরসসিক্ত পূজা পদ্ধতি নতুন করে গ্রহণ করা হয়েছে কিনা এ নিয়ে বিতর্ক জরুরি নয়। ঋগ্বেদের পরে ব্রাহ্মণ ও ঔপনিষদিক সাহিত্যে বাৎসল্যের উল্লেখ পাওয়া গেলেও তা অধিকতর পরিস্ফুট হয়নি। রামায়ণে লৌকিক স্তরে বাৎসল্যের প্রথম প্রকাশ দেখা যায়। অযোধ্যাকাণ্ডে বনবাসে যাত্রায় উদ্যত পুত্রের জন্য কৌশল্যার ব্যাকুলতা হৃদয়

স্পর্শ করে। যাত্রার পূর্বে রাম কৌশল্যার কাছে এসেছেন বিদায় নিতে। কৌশল্যা তখনও জানেন না রামকে বনে যেতে হবে। যখন দুঃসংবাদ জানতে পারলেন তখন মাতৃহৃদয়ের বেদনার উৎস উন্মুক্ত হয়ে গেল। নানা রূপে সেই বেদনার প্রকাশ হয়েছে। শোকার্ত কৌশল্যা বলছেন, বন্ধ্যা নারীর পুত্রহীনতার দুঃখের চেয়ে বহুগুণ বেশী যন্ত্রণাদায়ক এই বেদনা। স্বামীর রাজত্বে সুখ পাইনি; আশা ছিল পুত্রের পৌরুষে সুখ পাব। সে আশা মিথ্যা হয়ে গেল। বেদনার্ত কণ্ঠে তিনি বললেন:

যদি হ্যকালে মরণং যদৃচ্ছয়া
লভেত কশ্চিদ্‌গুরু দুঃখকর্ষিতঃ।
গতাহমদ্যৈব পরেতসং সদং
বিনা ত্বয়া ধেনুরিবা ত্যজেন বৈ ॥[১১৬]

অর্থাৎ, যদি কেউ গুরুতর দুঃখে স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ করতে পারত তাহলে তোমার বিরহে বৎসবিহীন ধেনুর ন্যায় আমি আজই প্রাণত্যাগ করতাম।

এর পরে আছে সন্তানের জন্য মা'র স্বাভাবিক খেদোক্তি। রাজপ্রাসাদের ভৃত্যদের যা খাদ্য, বনে রামের তা-ও জুটবে না। ছেলে কি খাবে তাই নিয়ে কৌশল্যার ভাবনা। আর ভাবনা অরণ্যচারী পিশাচ, দৈত্য, রাক্ষস, হিংস্র পশু ইত্যাদিকে। যশোদাও এমনি উদ্বিগ্ন থাকতেন কৃষ্ণ ধেনু চরাতে গেলে।

দশরথের শোকের মধ্য দিয়ে তাঁর পুত্রবৎসল হৃদয়কে উন্মোচন করেছেন বাল্মীকি। অযোধ্যাকাণ্ডের চত্বারিংশ থেকে ত্রিচত্বারিংশ সর্গে দশরথের শোকখিন্ন বাৎসল্যের চিত্র বিশেষরূপে পরিস্ফুট। একটি মর্মস্পর্শী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক: দশরথের চোখে ঘুম নেই। মধ্য রাত্রিতে তিনি কৌশল্যাকে ডেকে বললেন:

ন ত্বাং পশ্যামি কোসল্যে সাধু মাং পাণিনা স্পৃশ।
রামং মেহনুগতা দৃষ্টিরদ্যাপি ন নিবর্ততে ॥[১১৭]

অর্থাৎ, রামকে দেখবার ব্যাকুলতায় আমার চোখের দৃষ্টি তার সঙ্গে সঙ্গে গেছে— সে দৃষ্টি এখনও ফিরে আসেনি। তোমাকে তাই দেখতে পাচ্ছি না। আমাকে তোমার হাত দিয়ে স্পর্শ কর।

বাৎসল্যভাব মহাভারতে বিশেষরূপে প্রাধান্য লাভ করেছে। পুত্রস্নেহে ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ। তাঁর বিচারবুদ্ধি স্নেহ যদি আচ্ছন্ন না করত তাহলে হয়ত কৌরব বংশের ভাগ্য অন্য রকম হত। দুর্যোধনের জন্মের পরমুহূর্তে বিদুর প্রভৃতি শুভার্থীরা ধৃতরাষ্ট্রকে বলেছিলেন, এ পুত্র নিজ বংশ ধ্বংস করবে। এখনই একে ত্যাগ করলে ধ্বংস থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে। ধৃতরাষ্ট্র এ উপদেশ শুনলেন না: 'ন চকার তথা রাজা পুত্রস্নেহসমান্বিতঃ ॥'[১১৮] পরে ধৃতরাষ্ট্র স্বীকার করেছেন, পুত্রস্নেহাতুর আমার জন্যই কৌরবদের পতন ঘটেছে।[১১৯]

গান্ধারী কুমারী জীবনেই শত পুত্রের কামনা করেছিলেন। স্নেহে হৃদয় পূর্ণ থাকলেও গান্ধারী কখনো সত্য ও ধর্মের ঊর্ধ্বে পুত্রবাৎসল্যকে স্থান দেননি। সভাপর্বে তিনি স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেছেন, পুত্রস্নেহে বিচারশূন্য তুমি

দুর্যোধনকে ত্যাগ করতে পারেনি বলেই এই দুর্দশা।[১২০]

অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতে[২১] গৌতমীর পুত্রের জন্য দুর্ভাবনা কৌশল্যার আক্ষেপোক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যে গৌতম স্বর্ণশয্যায় শয়ন করতেন, তূর্য-নিনাদে সকালে জেগে উঠতেন, আজ তিনি পরিহিত বস্ত্রের একাংশ মাত্র মাটির উপর বিছিয়ে কিভাবে নিদ্রা যাবেন।[১২২]

গৌতমকে বনে রেখে তাঁর প্রিয় অশ্ব কন্থক একা প্রাসাদে ফিরে এসেছে। আরোহী-বিহীন কন্থককে দেখে রাজধানী শোকমগ্ন হয়ে পড়ল। অষ্টম সর্গ বিশেষ করে রাজপরিবারের ভাব-গম্ভীর শোক-কাহিনী। পিতা শুদ্ধোদন ও মাতা গৌতমীর গৃহত্যাগী পুত্রের জন্য বেদনাকে কবি মর্মস্পর্শী ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন।

আনুমানিক খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতকে রচিত কালিদাসের কাব্যে ও নাটকে বাৎসল্য-ভাবের কয়েকটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। উমার প্রতি হিমালয়ের গভীর স্নেহের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে কালিদাস বলেছেন : পুত্র থাকা সত্ত্বেও এই কন্যার প্রতি হিমালয়ের স্নেহদৃষ্টি যেন কিছুতেই তৃপ্তি লাভ করত না। বসন্তকালে কত রকমের ফুল ফোটে, কিন্তু ভ্রমরকুল আম্রমুকুলের কাছেই যায়। পর্বতরাজ হিমালয়ও তেমনি অন্য সন্তান থাকা সত্ত্বেও উমার প্রতি বিশেষরূপে আকৃষ্ট।[১২৩]

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে লৌকিক বাৎসল্যরসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাওয়া যায় কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলম্-এ। সর্বদমন তপোবনে সিংহশিশুর সঙ্গে খেলা করছে। প্রথম দর্শনেই বালক হস্তিনাপুররাজের মন কেড়ে নিল। দুষ্যন্ত বালকের দিকে চেয়ে স্বগতোক্তি করলেন :

আলক্ষ্যদন্তমুকুলাননিমিত্তহাসৈরব্যক্ত বর্ণরমণীয়বচঃ প্রবৃত্তীন্।

অঙ্কাশ্রয়প্রণয়িন স্তনয়ান্ বহন্তো ধন্যা স্তদঙ্গরজসাহমলিনী ভবন্তি।[১২৪]

অর্থাৎ যাদের দাঁত অল্প অল্প দেখা দিয়েছে, অকারণে যারা হেসে ওঠে, যারা মধুবর্ষণকারী আধো আধো কথা বলে, যারা কোলে উঠতে পেলে আনন্দিত হয়, যে এমন ধূলিমলিন বালককে কোলে তুলে নিজের দেহ মলিন করবার সুযোগ পায় সে ধন্য।

তাপসীর অনুরোধে দুষ্যন্ত সিংহশিশুকে মুক্ত করতে গিয়ে সর্বদমনের স্পর্শ সুখে অভিভূত হয়ে পড়লেন। তিনি মনে মনে বললেন, আমারই যদি এত সুখ, তাহলে এই বালক যাঁর পুত্র তাঁর না জানি কী গভীর পরিতৃপ্তি।[১২৫]

পুত্রের অঙ্গস্পর্শে পিতার হৃদয়ে অনুরূপ অনির্বচনীয় সুখানুভূতির কথা রঘু-বংশেও আছে।[১২৬]

জনচিত্তে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল পুরাণের যুগে। খ্রীস্টীয় সপ্তম থেকে চতুর্দশ শতক পর্যন্ত পুরাণের কাল বলা যায়। এর মধ্যে অষ্টাদশ প্রধান পুরাণ রচিত হয়েছিল। এদের মধ্যে কৃষ্ণ কথা আছে এই সব পুরাণে : ব্রহ্মপুরাণ ; পদ্ম-পুরাণ ; বিষ্ণুপুরাণ ; বায়ুপুরাণ ; ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ; স্কন্দপুরাণ ; বামনপুরাণ ; কূর্মপুরাণ ও ভাগবতপুরাণ। এছাড়া মহাভারত ও হরিবংশে কৃষ্ণ কথা আছে।

হরিবংশ মহাভারতের পরিশিষ্ট হিসাবে বিবেচিত হয়— অবশ্য কেউ কেউ পৃথক পুরাণ বলেও গণ্য করেন।

মহাভারতের কৃষ্ণ প্রাপ্তবয়স্ক এবং সর্বদা কর্মতৎপর। সেখানে কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে বাৎসল্য রস সৃষ্টির অবকাশ নেই। যে সব পুরাণে কৃষ্ণকথা আছে তাদের কাহিনী অলৌকিক বিবরণে এমনই ভারাক্রান্ত যে কোমল মানবিক অনুভূতিগুলির বিকাশ লাভের সুযোগ অল্প। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ থেকে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।[১২৭] নন্দ কৃষ্ণকে সঙ্গে করে বৃন্দাবনের ভাণ্ডারী বনে গোরু চরাতে গিয়েছেন। হঠাৎ ঘন অন্ধকার নেমে এলো, এবং সেই সঙ্গে প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি। কৃষ্ণ ভয় পেয়ে নন্দর গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে আরম্ভ করলেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগে পিতা পুত্রকে ঘনিষ্ঠ করে বাৎসল্যরস সৃষ্টির যে সুযোগ ছিল তার সদ্ব্যবহার করা যায়নি। কারণ, পুরাণকার আমাদের বলে দিয়েছেন, অকস্মাৎ এই ঝড় বৃষ্টি দেখা দিয়েছে কৃষ্ণেরই দৈব্য মায়ায়।

যশোদার বাৎসল্যের একটি রূপই কয়েকটি পুরাণে বর্ণিত হয়েছে। বালক কৃষ্ণ অনেক অলৌকিক ঘটনার নায়ক। শকটবিপর্যয়, যমলার্জুনভঙ্গ, তৃণাবর্ত, বৎসাসুর, বকাসুর, অঘাসুর বধ, কালীয়দমন, পুতনাবধ প্রভৃতি অলৌকিক ঘটনার সংবাদ পেয়ে যশোদা উদ্বিগ্ন হয়ে ছুটে আসেন, কৃষ্ণের কোনো অনিষ্ট হয়নি তো! কৃষ্ণকে কোলে করে স্তন্য পান করান, গায়ে হাত বুলিয়ে দেন, পুত্রের কোনো আঘাত লেগেছে কিনা বারবার তা জিজ্ঞাসা করেন। নন্দও পুত্রের জন্য ব্যাকুল। একই ঘটনার এবং একই অনুভূতির পুনরাবৃত্তি ঘটেছে বিভিন্ন পুরাণে। তবে এসব ক্ষেত্রে বাৎসল্য রসের যেটুকু প্রকাশ তা হৃদয়কে তেমন স্পর্শ করে না। কেননা, বালক কৃষ্ণ ঐশী শক্তি সম্পন্ন এবং নন্দ যশোদা সাধারণ মানব মাত্র।

একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতে এর কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায়। রচয়িতার লিপিকুশলতার জন্য কৃষ্ণের অলৌকিক ব্যক্তিত্ব আচ্ছন্ন হয়ে লৌকিক বাৎসল্যরসের স্নিগ্ধ অনুভূতি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। অবশ্য শ্রীকৃষ্ণ নিজেই যশোদাকে তাঁর জন্ম কাহিনী শুনিয়ে দেবার ফলে মানবিক মাধুর্য অনেকটাই ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়েছে। যশোদাকে কৃষ্ণ বললেন, দীর্ঘকাল তোমরা আমার ধ্যান করে আমার মতো পুত্র কামনা করেছিলে। আমি বর দিয়েছিলাম।[১২৮] তাই তোমাদের ঘরে জন্ম নিয়েছি।

শকট ওল্টানোর কাহিনী অন্যান্য পুরাণের মতো এখানেও বিবৃত হয়েছে। ক্ষুধা নিবৃত্ত না হতেই যশোদা কৃষ্ণকে স্তনচ্যুত করে কোল থেকে নামিয়ে দেওয়ায় তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে পদাঘাতে দধি, দুগ্ধ ইত্যাদি বহন করবার শকট উল্টে দিলেন। শব্দ শুনে সবাই ছুটে এল ; এতটুকু বালক যে গাড়ি উল্টে দিতে পারে তা কেউ ধারণা করতে পারল না। যশোদা আশংকা করলেন কোন দুষ্ট গ্রহ কৃষ্ণকে আক্রমণ করেছে। গ্রহদোষ প্রশমনের জন্য ব্রাহ্মণদের দিয়ে বেদমন্ত্র পাঠ করানো হল। যশোদা ছেলেকে কোলে করে দুধ খাওয়াতে লাগলেন।[১২৯]

প্রতিবেশীরা কৃষ্ণের নানা দুষ্টুমির কথা বলে যশোদাকে। বাড়ী বাড়ী ঘুরে খাবার জিনিস খেয়ে ফেলেন, ভেঙ্গে দেন বাসনপত্র ; ঘরে মলমূত্র ত্যাগ করেন,—

এমনি সব কত অভিযোগ। কিন্তু স্নেহাস্তু জননী এ সব কথা কানে তোলেন না, শুধু হাসেন। পুত্রকে ভর্ৎসনা করতে ইচ্ছা হয় না।[১৩০]

আর একটি ঘটনা : শ্রীকৃষ্ণ যশোদার উপর ক্রুদ্ধ হয়ে ঢিল ছুঁড়ে দধির ভাঁড় ভেঙ্গে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি উপলব্ধি করলেন, কাজটা ভালো হয়নি। মা'র শাস্তি এড়াবার জন্য তিনি উদুখলের উপরে উঠে ননী খেতে লাগলেন। দইয়ের হাঁড়ি ভাঙ্গা দেখে যশোদার বুঝতে বাকী রইলো না এটা কার কাজ। তিনি লাঠি হাতে করে খুঁজতে খুঁজতে শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে পেলেন উদুখলের উপরে। মা'র হাতে লাঠি দেখে ভয়ে কৃষ্ণ নেমে এলেন। যশোদা তাঁকে ধরে ফেলায় শ্রীকৃষ্ণ কাঁদতে লাগলেন। তাঁর চোখ দুটি ভয়ে বিহ্বল; হাত দিয়ে চোখের জল মুছতে গিয়ে মুখমণ্ডল কাজলের কালিতে লিপ্ত হয়ে গেল। পুত্রের ভয় দেখে যশোদা লাঠি ফেলে দিলেন। কিন্তু শাস্তি দেবার জন্য তাঁকে বেঁধে রাখলেন উদুখলের সঙ্গে। শ্রীকৃষ্ণ কি উপায়ে এই বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করেছিলেন এবং যমলার্জুন ভেঙ্গেছিলেন— সে কাহিনী সুপরিচিত।

বাৎসল্য দুই শ্রেণীর : ঐশ্বর্যজ্ঞানমিশ্রিত বাৎসল্যরতি এবং কেবলা বাৎসল্যরতি। বসুদেব— দেবকীর এবং অংশতঃ নন্দেরও, বাৎসল্যভাব কৃষ্ণের ঐশ্বর্যজ্ঞানকে অতিক্রম করতে পারেনি। যশোদা কৃষ্ণের অলৌকিক ব্যক্তিত্বের কথা জেনেও প্রগাঢ় মানবিক পুত্রস্নেহে উদ্বেলিত। সেই পুত্রস্নেহ এতই প্রবল যে কৃষ্ণ সান্নিধ্যে থাকলেই তাঁর স্তন-যুগল থেকে দুগ্ধ ক্ষরিত হয়।[১৩১] স্বয়ম্ভু রচিত অপভ্রংশ মহাকাব্য রিট্ঠেণেমিচরিউ স্নেহ প্রকাশের এই লক্ষণটিকে আরেকটু এগিয়ে নিয়েছে। কবি বলছেন, যশোদার স্নেহের আবেগ এতই প্রবল যে হৃদয়ে আবদ্ধ থাকতে পারে না, বেরিয়ে আসে স্তনদুগ্ধের ধারার রূপ নিয়ে।[১৩২]

যশোদা কৃষ্ণের দেবত্ব এড়িয়ে যেতে চাইলেও ভাগবতকার সেই দেবত্ব প্রতিষ্ঠার কথা পাঠক বা শ্রোতাকে ভুলতে দেন না। তাই মাতৃহৃদয়ের বাৎসল্যের পূর্ণ উপলব্ধি এখানে হয় না। যশোদার মাতৃস্নেহ পূর্ণ রূপ লাভ করেছে পদাবলীর যুগে। তথাপি একথা স্বীকার করতেই হয় যে, ভক্তি সাহিত্যে এমন সুন্দর বাৎসল্যরসের ছবি ভাগবতের পূর্বে দেখা যায় না। সেজন্য ভারতের সকল আঞ্চলিক সাহিত্যে ভাগবতের গভীর প্রভাব দেখা যায়। কৃষ্ণ যশোদার কাহিনী নানা ভাষায় পদাবলীতে ও ভক্তিসাহিত্যে স্থান পেয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে এ সব কাহিনীর আক্ষরিক অনুবাদ পাওয়া যায়।

আঞ্চলিক ভাষা সমূহের মধ্যে তামিলেই ভক্তি-সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায়। সবচেয়ে পুরনো আড়বার [বা প্রেম পরবশ ভক্ত] কবিদের রচিত পদাবলী। পণ্ডিতদের মতে আড়বার সম্প্রদায়ের আবির্ভাব খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় থেকে অষ্টম শতকের মধ্যে।[১৩৩] নম্মাড়বার প্রমুখ দ্বাদশ বিখ্যাত আড়বার ভাগবত পুরাণ রচনার পূর্বেই আবির্ভূত হয়েছিলেন বলে মনে করা হয়। কারণ ভাগবতে বর্ণিত নদীতীরবর্তী অঞ্চলে তাঁদের জন্ম।[১৩৪] এই সব সাধক কবিদের জন্যই ঐ সব স্থান প্রসিদ্ধি লাভ

করায় ক্রমে ভাগবতে স্থান পেয়েছে। শ্রীমদ্‌ভাগবত হয়ত তামিল ভূমিতেই রচিত হয়েছিল।[১৩৫]

আড়বার কবিরা রাগাত্মিকা ভক্তির সাধক হলেও তাঁরা বাৎসল্যরসের বেশ কিছু সুন্দর পদ রচনা করেছেন। আচার্য যতীন্দ্র রামানুজদাস সহস্র পদাবলীতে যে কটি বাৎসল্যের পদ অন্তর্ভুক্ত করেছেন তাদের মধ্যে ঐশ্বর্যভাবের প্রাধান্য দেখা যায়।[১৩৬] বাৎসল্যরসের গভীরতা পরিস্ফুট হয়েছে কুলশেখর আড়বারের কয়েকটি পদে।

আড়বার সম্প্রদায়েব বাৎসল্যরসের ভাবনায় দুটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। এঁরা বৈষ্ণব হলেও শুধু যশোদার বাৎসল্য বর্ণনা করে নিরস্ত থাকেন নি। বসুদেব, দেবকী, কৌশল্যা, দশরথ প্রভৃতির বাৎসল্যরসে অভিষিক্ত হৃদয়ের আর্তিকেও প্রকাশ করেছেন। তাছাড়া এঁরা শুধু যশোদার কৃষ্ণ স্নেহের মহিমা কীর্তন করেই তৃপ্ত নন; কবি এবং ভক্ত নিজেকে যশোদা, দেবকী, কৌশল্যা, দশবথ বা বসুদেব — ভাবে ভাবিত করে বা রামের আরাধনা করতেন। রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের তৃতীয় সর্গে দশরথ রামকে দেখে দেখে যেন তৃপ্তি পান না। তেমনি ভক্ত কবি বলছেন, বালকৃষ্ণকে দিন, মাস, বৎসর অনুক্ষণ দেখেও আশ মেটে না। এই অতৃপ্তি অমৃতের মতোই উপভোগ্য।

কৃষ্ণকে উদূখলে বন্ধন এবং তাঁর যমলার্জুন ভাঙ্গার কাহিনী আড়বার কবিরাও গীতবন্ধ করেছেন। আড়বার সাধকরা যদি ভাগবত রচনার পূর্বে পদ রচনা করে থাকেন তাহলে ভাগবতকার শুধু এটি নয়, আরও অনেক ঘটনার জন্য এঁদের কাছে ঋণী।

বাৎস্যরসের পদগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দেবকীর আক্ষেপ। নিজের ছেলে হলেও কৃষ্ণ মা'কে জানবার সুযোগ পেলেন না। গোপীরা যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করে, "কৃষ্ণ, তোমার বাবা কে?" তখন তিনি নন্দ গোপকেই দেখিয়ে দেন। ছেলেকে মানুষ করবার যে আনন্দ তা থেকে দেবকী বঞ্চিত। নিজের সন্তানকে খাওয়ানো, স্নান করানো, কোলে করে আদর করা, বিছানায় শুয়ে গায়ে হাত বুলিয়ে গান গেয়ে ঘুম পাড়ানো, এসবের মধ্যে মায়ের কত সুখ, কত তৃপ্তি! দেবকীর ভাগ্যে সে সুখ হল না নিজের ছেলে থাকা সত্ত্বেও।

আড়বার কবিদের মধ্যে পেরিয়াড়বার বাৎসল্যরসের ভক্ত হিসাবে পরিচিত। তাঁর একটি পদে আছে: গোপাল ধুলোয় গড়াগড়ি দিয়ে খেলা করছেন। অলংকার ভূষিত ভূলুণ্ঠিত কৃষ্ণের রূপে কবি মুগ্ধ। তিনি আকাশের চাঁদকে ডেকে বলছেন, তোমার চোখ থাকলে আর এক চাঁদের খেলা দেখে যাও।

কুলশেখর রচিত একটি পদে যশোদার বাৎসল্য সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। কবি বলছেন, মুদিত পদ্মের মতো সুন্দর কোমল হাত দিয়ে কৃষ্ণ মাখন চুরি করে খাচ্ছেন। তাঁর রক্তিম মুখ দই দিয়ে মাখা। পাছে মা চুরি ধরে ফেলেন এই ভয়ে চোখের দৃষ্টি সন্ত্রস্ত। যশোদা শাস্তি দিতে এসে ছেলের এই অপরূপ মূর্তি দেখে অপরিসীম আনন্দ পেলেন।

দক্ষিণ ভারতীয় সাহিত্যে শৈব ভক্তি সাহিত্যের প্রাধান্য এবং সে সাহিত্যে

বাৎসল্যরসের বিকাশ বিশেষ হয়নি। আড়বার কবিরা বহু বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করেছিলেন, যার মধ্যে বেশ কিছু পদ বাৎসল্যভাবের। কন্নড় এবং অন্যান্য পশ্চিমী সাহিত্যে দাস্য ভাবের প্রাধান্য। কন্নড় সাধক কবি পুরন্দর দাসের কয়েকটি পদে বাৎসল্যের কিছু প্রকাশ আছে। এমনি একটিতে আছে: যশোদা সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন, কৃষ্ণ কেঁদো না, ঘুমাও। আমি গান গেয়ে তোমাকে ঘুম পাড়াব। এখন তোমাকে কোলে নিলে ঘরের কাজ করব কি করে?

আর একটি পদে কৃষ্ণ যশোদার কাছে কেঁদে অভিযোগ করছেন: মা, বন্ধুরা বলে আমি নাকি বাড়ী বাড়ী মাখন চুরি করে খাই। বলে, আমার বাবা বসুদেব, মা দেবকী; তোমরা আমার কেউ নও। মামা পাছে হত্যা করে সেই ভয়ে নাকি মা বাবা আমাকে তোমাদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। সুরদাসও অনেকটা এরূপ একটি পদ লিখেছেন। শ্রীপদ রায়ের একটি পদের সঙ্গে সাদৃশ্য দেখা যায় হিন্দী একটি পদের: গোপীরা যশোদার কাছে কৃষ্ণের বিরুদ্ধে নানা নালিশ করতে এসেছে। পাড়াগাঁয়ের স্নেহান্ধ জননীর মতো যশোদা ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, আমার ছোট্ট গোপাল এখনও চার পা চলতে পারে না, সে দড়ি খুলে তোমাদের বাছুর ছেড়ে দিয়েছে? আমার বাড়ী দুধ ক্ষীরের অভাব নেই, তবে সে কেন তোমাদের বাড়ী চুরি করে খেতে যাবে?

তেলেগু ভক্তিসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বমোর পোতন [পঞ্চদশ শতাব্দী] মূলতঃ দাস্যরসের ভাবুক। তেলেগু ভাষায় ভাগবতের অনুবাদ তাঁর এক বিরাট কীর্তি। তাঁর রচনায় বালগোপাল এসেছেন বেশ কয়েকবার। কিন্তু দু'একটি পদ ছাড়া অ ন্যত্র বাৎসল্যরস উজ্জ্বল হয়নি। এমনি একটিতে কবি পুত্র বিচ্ছেদ কাতর যশোদার মাতৃহৃদয়ের ব্যাকুলতা সার্থকরূপে প্রকাশ করেছেন। নন্দ যখন উদ্ধবের নিকট কৃষ্ণের গুণকীর্তন করছিলেন তখন যশোদা নীরবে বেদনাদীর্ণ হৃদয়ে সে সব শুনছিলেন। শুনতে শুনতে শরীর বিবশ হয়ে পড়ল, কৃষ্ণের গুণের কথা তিনিও তো জানেন। কিন্তু কিছুই বলতে পারলেন না। শুধু তাঁর দুই চোখ দিয়ে জলের ধারা আর দুই স্তন থেকে দুধের ধারা নেমে আসতে লাগল।

কেরলে বৈষ্ণবীয় ভক্তি সাহিত্যের প্রাধান্য। রামায়ণ, ভাগবত প্রভৃতি মালয়ালামে রূপান্তর শুধু হয়নি, ভক্ত কবিরা তাঁদের আবেগমিশ্রিত কল্পনা যোগ করে কাহিনীকে অনেক ক্ষেত্রে নবরূপ দিয়েছেন। লীলাশুকের বিখ্যাত কাব্য কৃষ্ণকর্ণামৃত কেরল অঞ্চলেই রচিত। পুন্তানম্ নম্বুতিরি, চেরুশ্শেরি এবং এড়ুত্তচ্ছন— এই তিন ভক্ত-কবির নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। এঁরা এবং অন্যান্য ভক্ত কবিরা মধুররসে ভাবিত, সুতরাং বাৎসল্যের পরিচায়ক পদের সংখ্যা খুবই কম। পুন্তানমের একটি পদে বাৎসল্যরসের চমৎকার প্রকাশ ঘটেছে। কবি বলছেন, একটি দুষ্টু বালক ব্রজে ঘুরে বেড়াচ্ছে; তার গোল পেটের উপরে মাটির দাগ, হাতে ছোট্ট বাঁশী, দুহাতে ধরে আছে এক তাল মাখন। এমন বালকৃষ্ণ যখন আমার হৃদয়ে নিরন্তর খেলা করছেন তখন অন্য পুত্র সন্তানের আমার প্রয়োজন কি?

ভক্তিসাহিত্যে মারাঠী বিশেষরূপে সমৃদ্ধ। চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে জ্ঞানেশ্বর, নামদেব, একনাথ, তুকারাম, রামদাস প্রভৃতি সাধকরা আবির্ভূত হয়েছিলেন। নামদেবের দুটি পদ শিখদের আদি গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। মহারাষ্ট্রে কৃষ্ণ ও বিষ্ণুর আরাধনা হত বিট্ঠলনাথ নামে। কিন্তু সে আরাধনার মূল কথা ছিল ভক্তের দাস্যভাব। তাই বাৎসল্য রসের পদ বিশেষ রচিত হয়নি। একনাথের একটি পদে নিরুদ্দিষ্ট বালকৃষ্ণের জন্য ব্যাকুল হয়েছেন যশোদা। যশোদা বলছেন, এই তো এখানেই ছিল। হাতে ফুল নিয়ে আঙিনায় হামাগুড়ি দিচ্ছিল। আমি রান্নাঘরে উনান নিকোচ্ছিলাম গোবর দিয়ে। এর মধ্যে কোথায় চলে গেল? আমার খোকা সর্বদা গোপবালকদের সঙ্গে থাকে; তাছাড়া নিজে নিজে আপন মনেও খেলা করে।

যশোদা ঘরে ঘরে খুঁজে বেড়াচ্ছেন, কোথায় আমার ছেলে?[১৩৭]

পঞ্চদশ শতকের কবি নরসিংহ মেহ্তা গুজরাটী সাহিত্যে ভক্তিবাদের প্রবর্তক। এঁর পরে ভক্তিবাদী সাহিত্য রচনা করেছেন মীরা, ভালণ প্রভৃতি কবিরা। মীরা মধুর রসের ভক্ত, বাৎসল্য রসের পদ তিনি রচনা করেননি। নরসিংহ মধুর এবং বাৎসল্য এই উভয় রসেরই কবি। ভাগবতের দশম স্কন্ধের অনুসরণে নরসিং কৃষ্ণের বাল্য-লীলায় বিভিন্ন কাহিনী নিয়ে পদ রচনা করেছেন। কৃষ্ণ যশোদার নিকট আবদার করছেন: মা, আকাশ থেকে চাঁদ এনে দাও। কৃষ্ণ নেচে নেচে মা'কে পুলকিত করছেন; ইত্যাদি হল বাললীলার পদাবলীর বিষয়বস্তু। একটি পদে আছে কৃষ্ণের দৌরাত্ম্যে তিক্ত বিরক্ত হয়ে গোপিনীরা নালিশ করায় যশোদা ক্রুদ্ধ হয়ে কৃষ্ণকে প্রহার করলেন, কিন্তু পরমুহূর্তেই পরম স্নেহে পুত্রকে কোলে তুলে নিলেন। স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বলতে লাগলেন, গোপাল আমাকে খুব ভালবাসে। আর কখনও তোমাকে কোথাও যেতে দেব না।

তারপর কোলে বসিয়ে কৃষ্ণকে দুধ খাওয়াতে খাওয়াতে পরম তৃপ্তিতে যশোদার মন পূর্ণ হয়ে যায়।[১৩৮]

পাঞ্জাবী সাহিত্যে পদাবলী রচনায় গুরু নানক পথিকৃতের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। ষোড়শ থেকে সপ্তদশ শতকের পাঞ্জাবী সাহিত্যে ভক্তিবাদমূলক ভজনাবলীর প্রাধান্য ছিল। বাৎসল্যরসের পদাবলী পাওয়া যায় না।

ওড়িয়া সাহিত্যে ১৫০০ থেকে ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রামানন্দ রায়, বলরাম দাস, জগন্নাথ, যশোবন্ত, অনন্ত, অচ্যুতানন্দ, দিনকৃষ্ণ প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণব কবি পদাবলী রচনা করেছেন। ভাগবত ছিল তাঁদের প্রেরণার উৎস। বাৎসল্যরসের উজ্জ্বল পদ বড় একটা পাওয়া যায় না। ওড়িয়া সাহিত্যে বাৎসল্যরসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাওয়া যায় চতুর্দশ শতকের কবি মার্কণ্ড দাসের কেশব কোইলীতে। কোকিল দূতের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। যশোদা অন্তরের বেদনার কথা বলছেন কোকিলকে; শীগ্গীর ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কৃষ্ণ গেছেন মথুরায়। কিন্তু নিজের মা বাবার সঙ্গে দেখা হবার পর সব ভুল হয়ে গেছে, আর ফিরবেন না। বেদনার্ত হৃদয়ে

যশোদা কোকিলকে জিজ্ঞাসা করছেন, কোন্ দুষ্ট লোকের কথায় কৃষ্ণ ফিরছে না ? দুগ্ধ শর্করা এখন কাকে খেতে দেব আমি ? বুকের দুধ খাইয়ে যাকে এত বড় করেছি, এখন সেই কৃষ্ণ আমাকে দেখতে চায় না। বৃদ্ধ বয়সে এ কি যাতনা। যে দেবকী ছেলের জন্য কিছুই করে নি, কৃষ্ণ এখন তাকে দেখে ভুলে গেল ? একি অদ্ভুত বিচার ?[১৩৯]

কবিরাজ মাধব কন্দলী [১৪শ শতক] অসমীয়া সাহিত্যের প্রথম মহৎ কবি। তিনি রামায়ণের অনুবাদ করেছেন এবং কৃষ্ণকাহিনী অবলম্বনে রচনা করেছেন দেবজিৎ কাব্য। শংকরদেব [১৫।১৬শ শতক] অসমীয়া সাহিত্যে ভক্তি আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা। শংকরদেবের শ্রেষ্ঠ রচনা রামবিজয়, কালীয়দমন, পারিজাত হরণ, রুক্মিণী-হরণ, পত্নী প্রসাদ প্রভৃতি। ভাগবত অনুসরণে তিনি কৃষ্ণকাহিনী রচনা করেছেন। তিনি নিজেকে কৃষ্ণের কিংকর হিসাবে প্রচার করেছেন, তাই তাঁর কাব্যে ও নাটকে দাস্য ভাবই প্রবল। কবি মাধব দেবের রচনায় ছোট ছোট বাৎসল্যের চিত্র আছে এবং এই সব চিত্র ভাগবতকারের অনুসরণে আঁকা। চোর ধরা ঝুমুরায় তিনি লিখছেন, কৃষ্ণ ননী চুরী করতে গিয়ে ধরা পড়লেন। "চোর" "চোর" বলে চীৎকার করতে করতে গোপীরা কৃষ্ণকে দেখতে পেল। কৃষ্ণ তখন নিজেকে বাঁচাবার জন্য বললেন, আমাকে মেরে চোর পালিয়ে গেছে : 'হামাকু মারি চোর পলাই।'[১৪০]

মাধবদেবের অংকীয়ানাটে এবং কৃষ্ণ বিষয়ক অন্যান্য রচনায় কৃষ্ণ প্রধান চরিত্র হিসাবে স্থান পেলেও বাৎসল্যের সুন্দর ছবি পাওয়া যায় না। যশোদা কোথাও কৃষ্ণকে গোষ্ঠে যাবার জন্য প্রত্যূষে সস্নেহে ঘুম ভাঙাচ্ছেন, কোথাও বা কোলে বসিয়ে আদর করে খাওয়াচ্ছেন,— এমনি কিছু বাৎসল্য ভাবের ছবি পাওয়া যায়। শ্রীধর কন্দলির [১৬।১৭শ শতক] একটি পদে দেখা যায় যশোদা ভয় দেখিয়ে কৃষ্ণকে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করছেন। যশোদা বলছেন এক কান খেকো দৈত্য এসেছে, দুষ্টু ছেলেদের কান কামড়ে খেয়ে ফেলে। কিন্তু ঘুমিয়ে পড়লে খায় না। শীগ্‌গীর ঘুমো। দাস্যভাবের প্রাধান্যের জন্য অসমীয়া সাহিত্যে বাৎসল্য রসের সুষ্ঠু বিকাশ ঘটতে পারেনি।

পরবর্তী দু'টি অধ্যায়ে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের হিন্দী ও বাংলা সাহিত্যে বাৎসল্যরসের বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। এই কালখণ্ডের পূর্ববর্তী হিন্দী সাহিত্যে বাৎসল্যভাবের প্রকাশের সুযোগ ছিল সামান্য। কারণ কবীর প্রভৃতি সন্তরা ভগবানকে ভজনা করেছেন সেবক হিসাবে, দাস্যভাব তাঁদের ভজনাবলীতে প্রাধান্য লাভ করেছে। পরবর্তী সময়ে রচিত হিন্দী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কাব্য রামচরিত-মানসেও বাৎসল্য ভাবনার অবকাশ ছিল স্বল্প। কারণ তুলসীদাস ছিলেন দাস্যভাবের সাধক।

বাংলা সাহিত্যে আমরা বাৎসল্যরসের অংকুর দেখতে পাই চর্যাপদেই। তরুণী মা দুঃখ করে বলছে :

পহিল বিষাণ মোর বাসনপুড়।
নাড়ি বিআরন্তে সেব বায়ুড়া॥[১৪১]

আমার প্রথম প্রসবকে কেন্দ্র করে কত কামনা-বাসনার সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু

নাড়ী কাটা মাত্র সে সব হাওয়ায় মিলিয়ে গেল [সন্তানের মৃত্যু হল]। এর গূঢ়ার্থ যা-ই হোক না কেন, বাৎসল্যভাবের স্ফুরণ অস্বীকার করা যায় না।

ষোড়শ শতকের পূর্বে বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত, চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল ও মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়। এদের অধিকাংশই সংস্কৃত পুরাণ ও মহাকাব্যের অনুসরণে রচিত। বাৎসল্যের যে সব সামান্য চিত্র পাওয়া যায় তার মধ্যে মৌলিকত্ব নেই এবং তারা হৃদয় স্পর্শ করে না। বাৎসল্যের চিত্র যেটুকু আছে তা প্রায়ই ভাগবতের অনুকরণ। ষোড়শ শতকের চৈতন্য-ভাগবতেও চৈতন্যকে ভাগবতের বালগোপালের মতো করে দেখা হয়েছে। বালগোপালের মতই বালক চৈতন্য আকাশের চাঁদ পেতে চান, না পেলে কেঁদে ধুলায় গড়াগড়ি যান।[১৪২] মা'র সঙ্গে সন্তানের যে নাড়ীর টান তার একটি অপূর্ব দৃষ্টান্ত আছে মনসামঙ্গল কাব্যে। বেহুলা ঘোর বিপদে পড়েছে; নিছুনি নগরে তার মা বাবা সে খবর পায়নি। তবু সন্তানের অমঙ্গল আশংকায় তাদের মন বিচলিত হয়ে উঠেছে। কারণ :

ছয় মাসের দূরে যদি পুত্র মরি যায়।
সকলে জানিবার আগে— আগে জ নে মায়॥[১৪৩]

কৃত্তিবাসের রামায়ণে বাৎসল্যরসের এমন কিছু দৃষ্টান্ত আছে মূল সংস্কৃত রামায়ণে যা পাওয়া যায় না। আদিকাণ্ডের এই চিত্রটি স্নেহপরায়ণ বাঙালী পিতাকে স্মরণ করিয়ে দেয় :

দশরথ পাইলেন যেন হারানিধি।
আনন্দিত তেমনি হইল তাঁর মন॥
পুত্র পুত্র বলিয়া করেন রামে কোলে।
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দেন বদন কমলে॥[১৪৪]

সাহিত্যে বাৎসল্যের পূর্ণ পরিচয় এখানে উপস্থিত করা সম্ভব নয়। তার প্রয়োজনও নেই। ক্রমবিবর্তনের এই আংশিক পরিচিতি থেকেই দুটি কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রাক ষোড়শ শতকের সাহিত্যে বাৎসল্যের বৈশিষ্ট্য এই দুটি : প্রথমতঃ, এই যুগের সাহিত্য ধর্মকেন্দ্রিক, তাই বাৎসল্যের পাত্র পাত্রীরা দেব দেবী অথবা বালগোপাল বা রামের মতো অবতার কিংবা দেবোপম ব্যক্তিত্ব। এ সব ক্ষেত্রে তাই সহজ মানবিক স্নেহ প্রকাশের সুযোগ নেই। বেদে বাৎসল্যের অংকুরোদ্গম হয়েছে দেবতাদের অবলম্বন করে। রামায়ণ মহাভারতে বাৎসল্য মানব হৃদয়ের নিকটতর হয়েছে। ভাগবত পুরাণের বালগোপাল অনেকটা আমাদেরই ঘরের ছেলে। ঐশী শক্তির পটভূমিকা না থাকলে তাঁকে সম্পূর্ণরূপে আপন করে নিতে হয়ত দ্বিধা হত না। সকল দেশের মতো আমাদের দেশের প্রাচীন সাহিত্যেও দেবদেবী ও বীর বীরাঙ্গনাদের আধিপত্য।. সমাজে শিশুদের স্থান ছিল অন্তরালে, সাহিত্যেও তারা তাই যথাযোগ্য স্থানলাভ করেনি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা'; তেমনি আমাদের কবিরা তাঁদের বাৎসল্যানুভূতি দেবতা এবং দেবোপম

ব্যক্তিদের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে কিছুটা তৃপ্তি লাভ করেছেন।

দ্বিতীয় লক্ষণীয় বিষয় হল এই যে, বেদ রামায়ণ মহাভারতের যুগে বাৎসল্যানুভূতিতে যে সংযম ও গাম্ভীর্য দেখা যায় ক্রমশঃ তা শিথিল হয়ে ভাগবত পুরাণে বাৎসল্য আবেগে পরিণত হয়েছে। ভাগবত পুরাণের পরবর্তী কালের আঞ্চলিক সাহিত্যে অনেকক্ষেত্রে এই বাৎসল্য স্নেহে গদ্‌গদ ভাবে রূপান্তরিত হয়েছে এমনও দেখা যায়। আবেগ যে সংযম ও গাম্ভীর্যকে অতিক্রম করেছে তার দৃষ্টান্ত দেখা যাবে সংস্কৃতানুসারী আঞ্চলিক ভাষার কাব্যসমূহে।

বাল্মিকী রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে [২০শ সর্গ] আছে, কৌশল্যা রামের বনবাসের সংবাদ শুনে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। রাম তাঁকে ধরে তুললেন এবং তখন কৌশল্যা নানা বিলাপবাক্য বলতে লাগলেন। কিন্তু কৃত্তিবাসের রামায়ণে আছে—"শুনিয়া পড়িল রাণী মূর্ছিত হইয়া।" রাম মনে করলেন কৌশল্যা বুঝি প্রাণ হারিয়েছেন এবং তিনি ভাবলেন, "মাতৃবধ করি বুঝি ডুবিনু নরকে।"[১৪৫]

মহাভারত থেকেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। গান্ধারী কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে মৃত পুত্রদের দেহ আবিষ্কার করে গভীর শোকে অভিভূত। সেই সময় কৃষ্ণের কথায় উত্তর দিয়ে—

এতাবদুক্ত্বা বচনং মুখং প্রচ্ছাদ্য বাসসা।
পুত্র শোকাভিসন্তপ্তা গান্ধারী প্ররুরোদ হ॥[১৪৬]

কিন্তু কাশীরাম দাস স্ত্রীপর্বে এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বলেছেন,
"গান্ধারী এতেক বলি হৈল অচেতন।"[১৪৭]

মূল মহাভারতের গান্ধারী দৃপ্তময়ী তেজস্বিনী। পুত্রশোক তাঁকে গভীর বেদনা দিলেও তাঁর সুদৃঢ় ব্যক্তিত্ব ভূলুণ্ঠিত করতে পারেনি। সংযম ও গাম্ভীর্যে তাঁর বেদনা মহিমাময় ও মর্মস্পর্শী হয়েছে।

ভারতীয় সাহিত্যে বাৎসল্য ভাবনার এই বিবর্তন ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে বৈষ্ণব পদাবলীতে কি রূপ নিয়েছে তার আলোচনা করা হবে চতুর্থ অধ্যায়ে।

অলংকার শাস্ত্রে বাৎসল্য

নর-নারীর মধ্যে যে আকর্ষণ তাকে যৌনতামূলক বলে মোটামুটিভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু বাৎসল্যভাবকে সহজে ব্যাখ্যা করা চলে না। সন্তানকে ভালোবাসে মা—বাবা প্রকৃতপক্ষে নিজেদেরই ভালোবাসে, সন্তানের মধ্যে দেখতে পায় নিজেদেরই প্রতিফলন। কিন্তু এ কথা সর্বতোভাবে যুক্তিসহ নয়। কারণ জীবনে ও সাহিত্যে আমরা দেখতে পাই মাতাপিতা ছাড়া অন্য গুরুজনরাও শিশুকে ভালোবাসে। অনেক ক্ষেত্রে সে ভালোবাসা মা বাবার স্নেহের মতোই গভীর।

কোনো কোনো মনোবিজ্ঞানী বাৎসল্যভাবের কারণ নির্দেশ করতে চেষ্টা করেছেন। বর্তমান শতকের প্রথম দশকে ম্যাকডুগল ও উইলিয়ম জেমস বলেছেন, বাৎসল্য

ইন্স্টিংক্ট বা সংস্কার। এই সংস্কার নিয়েই আমাদের জন্ম। জন্তুর মধ্যেও এই সংস্কার দেখা যায়।

এই শতকের দ্বিতীয় দশকে ওয়াটসন ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা নিরীক্ষার পর দেখিয়েছেন যে, নবজাত শিশুর মনে ভালোবাসার অঙ্কুর জাগ্রত হতে পারে তার শরীরের স্পর্শকাতর অংশগুলি কারো দ্বারা স্পৃষ্ট হলে। ভয়, ক্রোধ ও ভালোবাসা শিশুর মনে জেগে ওঠে যারা তাকে ঘিরে থাকে তাদের স্নেহস্পর্শে অথবা আচরণে। সন্তানকে পরিচর্যা করবার ফলে এবং প্রতিনিয়ত তার স্পর্শ সুখ পাওয়ায় মা'র মনে বাৎসল্যভাব জাগ্রত হয়। সংস্কার-তত্ত্বকে তিনি প্রাধান্য দেন নি।

ফ্রয়েড তাঁর লিবিডোর তত্ত্ব স্নেহ ভালোবাসার ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করেছেন। আদিম জৈবিক এষণার তাড়নায় উদ্দীপ্ত চিত্ত আকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতা যার মধ্যে খুঁজে পায় তাই ভালোবাসার সামগ্রী এবং অবলম্বন। এই সব সামগ্রীর প্রতি অদৃশ্য সতত আকর্ষণই বাৎসল্য, স্নেহ, প্রেম ইত্যাদি।[১৪৮]

বিদেশী মনোবিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যার সাহায্যে আমাদের বাৎসল্য ভাবের স্বরূপ উপলব্ধি সম্ভব নয়। কারণ তাঁরা শুধু মাতৃস্নেহের কথা নিয়েই বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু আমাদের দেশে যৌথ পরিবারের পরিবেশে বাৎসল্যের পরিধি আরও প্রসারিত। তাঁরা মায়ের স্নেহ দেখেছেন, দেখেননি দিদি, জেঠিমা, খুড়িমা, মাসীমা প্রভৃতির ভালোবাসা।

মানব জীবনে ও জন্তুজগতে বাৎসল্যভাবের ব্যাপক অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও প্রাচীন আলংকারিকেরা একে যোগ্য মর্যাদা দেন নি। ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রে বাৎসল্যরসের উল্লেখ নেই। পরবর্তী আলংকারিকেরাও মানবমনের এই গভীর অনুভূতিকে যে যথার্থ গুরুত্ব দিয়েছেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র তাই সংস্কৃত অলংকারিক-দের রস বিচারের দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করে বলেছেন: "নয়টি বে রস নয়, কিন্তু মনুষ্য চিত্তবৃত্তি অসংখ্য। রতি, শোক, ক্রোধ, স্থায়ীভাব; হর্ষ অমর্ষ প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাব। স্নেহ, প্রণয়, দয়া, ইহাদের কোথাও স্থান নাই,— না স্থায়ী না ব্যভিচারী— কিন্তু একটি কাব্যানুপযোগী কদর্য মানসিক বৃত্তি আদিরসের আকারস্বরূপ স্থায়ীভাবে প্রথমে স্থান পাইয়াছে। স্নেহ, প্রণয়, দয়াদি পরিজ্ঞাপক রস নাই; কিন্তু শান্তি একটি রস।"[১৪৯]

রসের সংখ্যা সীমিত করা যে অযৌক্তিক তা কোনো কোনো টীকাকারও বলেছেন। রুদ্রটের একটি শ্লোকের [কাব্যালংকার—১২/৪] ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে টীকাকার নমিসাধু বলেছেন যে, এমন কোন চিত্তবৃত্তি নেই যা আস্বাদিত হলে রসে পরিণত হয় না।

কিন্তু অভিনব গুপ্তের মতো মনীষাসম্পন্ন আলংকারিকও সিদ্ধান্ত করেছেন, "এবং তে নব রসাঃ।" রস নয়টি, তার বেশী নয়। অথচ ভরতমুনি— স্বীকৃত আটটি রসের সঙ্গে শান্তরসকে যোগ করে রসের সংখ্যা নয় করতে তাঁর দ্বিধা হয় নি। জৈন এবং বৌদ্ধ ধর্মে শান্তরসকে যে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে তার প্রভাবেই হয়ত শান্ত নবম রস হিসাবে অলংকারশাস্ত্রে স্থান লাভ করেছিল। একবার আটটি রসের নির্দিষ্ট সংখ্যার

অতিরিক্ত শান্ত রস স্বীকৃত পাওয়ায় আলংকারিকেরা নতুন নতুন রস সংযোজনের প্রস্তাব দিলেন। এইসব প্রস্তাবের মধ্যে বাৎসল্য রস অন্যতম।

ডঃ রাঘবন বলেছেন, রুদ্রটের কাল থেকেই "বাৎসল্য' অলংকার শাস্ত্রে স্থান পেয়েছে।[১৫০] রুদ্রট বাৎসল্য শব্দটি কিন্তু ব্যবহার করেন নি। তিনি উল্লেখ করেছেন প্রেয়োরসের, যার স্থায়ীভাব স্নেহ। ডঃ সুধীরকুমার দাশগুপ্ত, ডঃ রাঘবনের বক্তব্য স্বীকার করেন নি। তিনি বলেছেন, প্রেয়োরস বলতে সৌহার্দ্যকেই বুঝিয়েছেন রুদ্রট।[১৫১] কিন্তু অন্যত্র নাট্যশাস্ত্রের [৬।১০৯] অভিনবগুপ্ত-ভাষ্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ডঃ দাশগুপ্ত স্নেহ আর বাৎসল্য যে এক তা স্বীকার করেছেন।[১৫২] প্রেয়োরস, স্নেহ ও বাৎসল্য নিয়ে ভিন্ন মতের অবকাশ সৃষ্টি করেছেন রুদ্রট নিজেই। কাব্যালংকারের দ্বাবিংশ অধ্যায়ে প্রেয়োরসের স্থায়ীভাব স্নেহ বললেও পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে স্নেহকে প্রায় রসের মর্যাদা দিয়ে আর্দ্রতাকে নির্দেশ করেছেন তার স্থায়ীভাব হিসাবে। অভিনবগুপ্ত একথা স্বীকার করেন নি।[১৫৩]

রুদ্রট ও অভিনবগুপ্তের মধ্যে অন্ততঃ এক শতাব্দীরও অধিককালের ব্যবধান। এই কালখণ্ডে প্রেয়োরস, স্নেহ বা বাৎসল্যরস সম্বন্ধে আলংকারিকেরা নিশ্চয়ই আলোচনা করেছেন। তাই অভিনবগুপ্ত নাট্যশাস্ত্রের ভাষ্যে স্নেহের প্রকৃতি সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে স্নেহ হল নিছক অভিষঙ্গ বা আসক্তি ভাব সৃষ্টির সহায়ক মাত্র। তার নিজের রসে পরিণত হবার যোগ্যতা নেই ; আসক্তি যখন বিচিত্র পথে রূপান্তর লাভ করে তখনই ভাব এবং রস সৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দেয়। অভিনবগুপ্ত এই প্রসঙ্গে এমন দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যা মেনে নিতে দ্বিধা হয়। মাতাপিতার প্রতি সন্তানের যে স্নেহাসক্তি তাকে অভিনবগুপ্ত করেছেন ভয়ের অন্তর্ভুক্ত।[১৫৪]

প্রকৃত কথা বোধ হয় এই যে, আলংকারিকেরা রসের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেও রক্ষণশীল মনোবৃত্তির জন্য ভরতের অষ্টম সংখ্যার গণ্ডি অতিক্রম করতে তাঁরা ছিলেন দ্বিধান্বিত। ভামহ, রুদ্রট, দণ্ডী, ভোজদেব, কবিকর্ণপুর প্রভৃতি অনেকেই আটটির বেশী রসের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন, প্রেয়স বাৎসল্য, প্রীতি, স্নেহ, ভক্তি, শ্রদ্ধা ইত্যাদি রসের প্রস্তাবও তাঁরা দিয়েছেন। কিন্তু শান্তরস প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে অভিনবগুপ্তের যেরূপ দৃঢ় সমর্থন ছিল তেমন সমর্থন অন্য কোন প্রস্তাবিত রস পায় নি। কালিদাস যে শকুন্তলা নাটকে বাৎসল্য রসের চিত্র অঙ্কিত করেছেন তার উল্লেখ পূর্বে করা হয়েছে। তিনি বাৎসল্য রসের অস্তিত্ব অন্তরে উপলব্ধি করে রচনায় স্থান দিয়েছেন। কিন্তু রক্ষণশীলতা ধরা পড়ে বিক্রমোর্বশীয়ম্ নাটকে [২য় অংক, ২৩শ দৃশ্য] সেখানে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী তিনি আটটি রসের কথাই বলেছেন। অর্থাৎ, উপলব্ধি ও চিরাগত ঐতিহ্যের দ্বন্দ্বে কালিদাসের মতো অনেক মনীষী ভরত-নির্দিষ্ট রসগণনাই সুদীর্ঘকাল যাবৎ স্বীকার করে এসেছেন।

বৈষ্ণব আলংকারিকদের পূর্বে চতুর্দশ শতাব্দীতে কবিরাজ বিশ্বনাথ রচিত অলংকারগ্রন্থ সাহিত্যদর্পণই সুস্পষ্টরূপে বাৎসল্যকে দশম রস হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। সেখানে বলা হয়েছে :

অথ মুনীন্দ্র-সম্মতো বৎসলঃ
বৎসলশ্চ রস ইতি তেন স দশমো রসঃ।
স্ফুটং চমৎকারিতয়া বৎসলং চ রসং বিদুঃ।
স্থায়ী বৎসলতা-স্নেহঃ পুত্রাদ্যালম্বনং মতম্॥[১৭৫]

অর্থাৎ, এর পরে উল্লেখ করতে হয় মুনীন্দ্র [ভরত]-সম্মত বাৎসল্যরস। বাৎসল্যও রস, রসপর্যায়ে এর স্থান দশম। চমৎকারিত্ব থাকার বাৎসল্য রস হিসাবে পরিগণিত। বাৎসল্যের স্থায়ীভাব স্নেহ এবং অবলম্বন পুত্রাদি।

বাৎসল্য রসকে মর্যাদা দেবার সমর্থন করতে ভরতমুনির উল্লেখ কেন করা হয়েছে সে বিষয়ে প্রশ্ন হতে পারে। কারণ অধিকাংশ প্রামাণ্য সংস্করণে নাট্যশাস্ত্র আটটি রসের কথাই বলেছে। একমাত্র কাব্যমালা সংস্করণের সপ্তদশ অধ্যায়ের পাঠে "করুণা-বাৎসল্য" ইত্যাদির উল্লেখ আছে। ডঃ সুধীরকুমার দাশগুপ্তের মতে এই পাঠ দেখেই হয়ত বিশ্বনাথ ভরতমুনির নাম বাৎসল্যরসের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। কিন্তু পাঠটি সম্ভবতঃ ভুল। কারণ গাইকোয়াড় ওরিয়েন্টাল সিরিজে প্রকাশিত নাট্যশাস্ত্রের পাঠ "করুণ-বীভৎস" ইত্যাদি।[১৭৬] 'বাৎসল্য' কথা নেই।

বিশ্বনাথের পূর্বে একাদশ শতাব্দীতে ভোজরাজ শৃঙ্গার প্রকাশে দশম রস হিসাবে বৎসল্যের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এই বৎসল বলতে তিনি ঠিক কি বুঝিয়েছেন, প্রেয়োরস না অন্যকিছু, তা স্পষ্ট নয়।[১৭৭] এই জন্যই বিশ্বনাথকেই বাৎসল্য রসের আদি প্রবক্তার মর্যাদা দেওয়া হয়।

সাহিত্যদর্পণে স্থান পেলেও বাৎসল্য রস সংস্কৃত আলংকারিক সমাজে সমাদৃত হয় নি। কবি কর্ণপুর, রূপগোস্বামী, জীবগোস্বামী প্রভৃতি গৌড়ীয় বৈষ্ণব আলংকারিকেরা বাৎসল্যকে পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বল্লভাচার্য বাল-গোপালের পূজা প্রচলন করায় সাহিত্যে এবং বৈষ্ণব সমাজে বাৎসল্য রসের প্রতিষ্ঠা ব্যাপকতর হল। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম মূলতঃ স্নেহ ভালোবাসায় পূর্ণ ঈশ্বর সাধনা। এই প্রেমের ধর্মে জোয়ার এনেছেন চৈতন্যদেব। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত পদ রত্নাবলীর ভূমিকায় বলা হয়েছে: "চৈতন্যদেব জন্মিবার বহু পূর্ব হইতে বৈষ্ণবধর্ম ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, কিন্তু অপূর্ণভাবে। কেননা তখন সে ধর্ম কেবল রাধাকৃষ্ণের যৌন সম্বন্ধের উপর সংস্থাপিত।...... যে সকল মহাজন শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচ ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়াছেন, তাঁহারা গৌরাঙ্গের সম-সাময়িক বা পরবর্তী জয়দেবাদির অনেক পরে... .. এমত বলিতেছি না যে চৈতন্যের পূর্বেকার বৈষ্ণব ধর্ম কেবল মধুর রসসর্বস্ব-শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্যাদির তখন নাম গন্ধ ছিল না। আমার তর্ক এই যে, মধুর রসের তখন এত বাড়াবাড়ি, যে অন্য রসের ভাবনা ভাবিবার সময় ছিল না।...... যশোদার সেই গোপালময় প্রাণ, অতুল বৎসল ভাব, ব্রজ রাখালের সেই ঢল ঢল বালসুলভ সখ্য, যমুনার কূলে কূলে ব্রজের বনে বনে মধুর সে গোচারণ, সে মোহ যার বলে,—

দুগ্ধ স্রাবি পড়ে বাঁটে, প্রেমের তরঙ্গ উঠে
স্নেহে গাবী শ্যাম অঙ্গ চাটে।

'সৌন্দর্যের এই সব উপকরণ, ভালোবাসার পঞ্চম যে মধুর রস, তাহার নীচেই এই সব পরদা, তাঁহারা একেবারে ছাড়িয়ে গিয়াছেন।......'[১৫৮]

আমাদের আলোচ্য বাৎসল্য অলৌকিক। সংসার জীবনে সন্তানের প্রতি মাতাপিতার যে স্নেহ তাকেই বৈষ্ণব মহাজনরা প্রয়োগ করেছেন কৃষ্ণ আরাধনার ক্ষেত্রে। ভক্ত মনে করেন তিনি পালক, শ্রীকৃষ্ণ পালনীয়। বাৎসল্য রতি দ্বারা প্রভাবান্বিত ভক্ত নিজেকে শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা বড় বলে মনে করেন; অর্থাৎ, তিনি যেন তাঁর গুরুজন। ভক্ত মনে করেন কৃষ্ণ যেন অসহায় বালক, শুধু স্নেহ এবং মমতার পাত্র নন, লালন পালন করাও কর্তব্য। সম্ভ্রমবোধ বাৎসল্যরতিতে সম্পূর্ণ লোপ পায় বলে কৃষ্ণকে একান্তরূপে নিজের করে পাবার পথে কোনো বাধা থাকে না।

মুখ্য রতি পাঁচটি এবং মুখ্য রসও পাঁচটি,— এ কথা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। বাৎসল্য চতুর্থ রস, অর্থাৎ মধুর রসের ঠিক আগেই তার স্থান। রূপ-গোস্বামীর সংজ্ঞা হল এই :

বিভাবাদ্যৈস্ত বাৎসল্যাং স্থায়ী পুষ্টিমুপগতঃ।
এষ বৎসলনামাত্র প্রোক্তো ভক্তিরসো বুধৈঃ॥[১৫৯]

অর্থাৎ, উপযুক্ত বিভাবাদির সাহায্যে বাৎসল্য নামক স্থায়ীভাব পুষ্টি লাভ করলে তাকে বৎসল ভক্তিরস বলেন পণ্ডিতরা।

বাৎসল্য রতি সম্বন্ধে রূপগোস্বামী বলেছেন :

গুরবো যে হরেরস্য তে পূজ্যা ইতি বিশ্রুতাঃ।
অনুগ্রহময়ী তেষাং রতির্বাৎসল্যমুচ্যতে।
ইদং লালনভব্যাশীশ্চিবুকস্পর্শনাদিকৃৎ॥ [১৬০]

অর্থাৎ, গুরুস্থানীয়েরা শ্রীহরির পূজ্য। এই গুরুজনদের অনুগ্রহ পূর্ণ রতিকে বলে বাৎসল্য। বাৎসল্যের লক্ষণ হল লালন পালন, মঙ্গলকামনায় নানা ক্রিয়া সম্পাদন, আশীর্বাদ এবং চিবুক স্পর্শাদি।

শ্রীকৃষ্ণ ভগবান। তাঁর পূজনীয় কেহ থাকতে পারে না তথাপি বাৎসল্যরস আস্বাদনের জন্য তিনি বাললীলার আশ্রয় নিয়েছেন। বহু ভক্ত ও পরিকরগণ শ্রীকৃষ্ণকে সন্তানের মতো লালন পালনে, মঙ্গলকামনায় এবং স্পর্শসুখে আহ্লাদিত এই সব ভাবে আবিষ্ট হয়ে পড়েন।

অন্যান্য ভাবের মতো বাৎসল্য ভাবও বিভাবাদির সহায়তায় রসতা লাভ করে। বাৎসল্যরসের স্থায়ী ভাব হল বৎসল রতি। কবি কর্ণপুর অলংকারকৌস্তভে বলেছেন, বাৎসল্যের স্থায়ীভাব "মমকার"।[১৬১] ডঃ সুধীরকুমার দাশগুপ্ত এই মমকারকে স্নেহাস্ত মমতা হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন।[১৬২] মাতাপিতার সন্তান সম্বন্ধে যে "আমার আমার" ভাব থাকে তাই মমকার। সংস্কৃত আলংকারিকেরা বাৎসল্য রসের বিভিন্ন স্থায়ীভাব নির্দেশ করেছেন। বিশ্বনাথ কবিরাজ বলেছেন, বৎসলতারূপ স্নেহঃ;

সম্বারমরন্দচম্পূর মতে করুণা ; হরিপালদেবের সংগীত সুধাকরে বলা হয়েছে প্রীতি এবং রুদ্রট কোথাও স্নেহ কোথাও আর্দ্রতাকে বলেছেন বাৎসল্যের স্থায়ীভাব।[১৬৩]

বাৎসল ভক্তিরসের আলম্বন হলেন শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর গুরুজন। শ্রীকৃষ্ণই বাৎসল্যের বিষয়, এই জন্য তিনি বিষয়ালম্বন। বাৎসল্য থাকে গুরুজনদের হৃদয়ে, সেখানেই বাৎসল্যের অংকুরোদ্‌গম এবং বিকাশ। তাই শ্রীকৃষ্ণের গুরুজনরা হলেন বাৎসল্যের আশ্রয়ালম্বন।

শ্রীকৃষ্ণের গুরুজনদের মধ্যে আছেন যশোদা, নন্দ, দেবকী, বসুদেব প্রভৃতি। বৎসলভাবে ভাবিত ভক্তরা শ্রীকৃষ্ণের গুরুজন মনে করে নিজেদের কৃষ্ণ অপেক্ষা বড় বলে মনে করেন।

বাৎসল্য ভক্তিরসের উদ্দীপন বিভাব হল :

কৌমারাদি-বয়ো-রূপ-বেশাঃ শৈশবচাপলম্‌।

জল্পিত স্মিত-লীলাদ্যা বুধৈরুদ্দীপনা : স্মৃতাঃ ॥[১৬৪]

অর্থাৎ কৃষ্ণের বয়স, রূপ, বেশ, শৈশব চাপল্য, মধুর বাক্য, মৃদু হাসি, লীলাখেলা ইত্যাদি গুরুজনদের মনে [বা ভক্তের হৃদয়ে] বাৎসল্যরস উদ্দীপ্ত করে। বাৎসল্যরসের বিষয়ালম্বন শ্রীকৃষ্ণের বয়স বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ওয়াটসন ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, দৈহিক ঘনিষ্ঠতার ফলেই মা ও সন্তানের মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ জন্মে। সর্বদা মা'র কোলে যে সন্তান থাকে তাকে কেন্দ্র করে বাৎসল্যরসের বিচিত্র রূপ প্রকাশিত হবার সুযোগ নেই। এই জন্যই মাবি ও বালক যীশুর বাৎসল্য রসবৈচিত্র্যের বিশিষ্টতা লাভ করে নি এবং তাকে কেন্দ্র করে সাহিত্য সৃষ্টিও হয় নি।

গৌড়ীয় বাৎসল্যরসের নায়ক শ্রীকৃষ্ণের বয়স জন্ম থেকে পনেরো বছর পর্যন্ত। এই কাল তিনটি ভাগে বিভক্ত। কৌমার পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত ; পৌগণ্ডের সীমা দশম বর্ষে শেষ ; তারপর পনেরো বছর পর্যন্ত কৈশোর। এই বয়সের বালককে কোলে করা যায়, আদর করা যায়, ভর্ৎসনা করা যায়, প্রয়োজন হলে প্রহারও করা যেতে পারে। যে বালক শয্যায় অথবা মা'র কোলে থাকে তাকে নিয়ে কোন সমস্যা যেমন নেই তেমনি নেই আকর্ষণের তীব্রতা। যে বালক প্রতিবেশীদের বাড়ীতে গিয়ে ননী চুরি করে খায়, নিজের বাড়ীর দধিভাণ্ড ভাঙে, গোপবালকদের সঙ্গে কলহ করে, —তাকেই ভর্ৎসনা করা যায়, শাসন করা যায়। শ্রীকৃষ্ণ গোচারণে গেলে যশোদা সন্তানের অদর্শনে কাতর হবার সুযোগ পান, বাড়ী ফিরতে বিলম্ব হলে মাতৃহৃদয় উৎকণ্ঠিত হয়। এ সমস্তের মধ্য দিয়ে বাৎসল্য প্রকাশের সুযোগ ঘটে।

বৎসল্য ভক্তিরসের অনুভাব হল শ্রীকৃষ্ণের গায়ে হাত বুলানো, মঙ্গলকামনা, মস্তিষ্ক আঘ্রাণ, স্নান করানো, খাওয়ানো, পোশাক পরানো, নাম ধরে কারণে অকারণে ডাকা, আলিঙ্গন, চুম্বন ইত্যাদি।

অন্যান্য রসের সাত্ত্বিক ভাবের সংখ্যা আট। কিন্তু বাৎসল্য ভক্তিরসের সাত্ত্বিক ভাব নয়টি। বালগোপালের জন্য প্রবল স্নেহে যশোদা এবং গোপরমণীগণ অভিভূত

হয়ে পড়লে তাঁদের বক্ষ থেকে স্বতঃই স্তন্যধারা প্রবাহিত হতে থাকে। এই স্বতঃস্ফূর্ত স্তন্যস্রাবই নবম সাত্ত্বিক ভাব, যা একমাত্র বাৎসল্য ভক্তিরসেরই বৈশিষ্ট্য।

বাৎসল্য ভক্তিরসের স্থায়ী ভাবের কথা উপরে বলা হয়েছে। দাস্যরসের তেত্রিশটি ব্যভিচারী ভাব বাৎসল্য রসের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।[১৬৫] গৌড়ীয় অলংকারশাস্ত্রে বাৎসল্যরসকে যে ভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে তার মোটামুটি পরিচয় দেওয়া হল। এরই সংক্ষিপ্তসার প্রাঞ্জল ভাষায় দিয়েছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ ;

বাৎসল্যে শান্তের গুণ, দাস্যের সেবন।
সেই সেই সেবনের ইহাঁ নাম পালন ॥
সখ্যের গুণ "অসঙ্কোচ" "অগৌরব" সার।
মমতাধিক্যে তাড়ন-ভৎর্সনা-ব্যবহার ॥
আপনারে "পালক" জ্ঞান, কৃষ্ণে "পাল্য" জ্ঞান।
"চারি" গুণে বাৎসল্য রস অমৃত সমান ॥

মধুর রসের ক্ষেত্রে যেমন পূর্বরাগ, মিলন, বিরহ, শৃঙ্গার প্রভৃতি নানা স্তর আছে বাৎসল্য রসেও তেমনি বৈচিত্র্য দেখা যায়। ঐ বৈচিত্র্য না থাকলে বাৎসল্য ভক্তিরসে ভাবিত ভক্তদের সাধনার পথ হত ক্লান্তিকর এবং বাৎসল্যমূলক পদাবলী পাঠকের মনে আকর্ষণ সৃষ্টি করতে সক্ষম হত না। সংযোগ-বাৎসল্য বাৎসল্যভাবের এমনি একটি বিশেষ অবস্থা। এই অবস্থায় সন্তানকে ঘিরে মাতাপিতার আনন্দ, গর্ব, ভবিষ্যতের স্বপ্ন, অনিষ্টের আশংকা, প্রভৃতি নানা ভাবনা। সুরদাসের একটি পদে এরই খানিকটা ধরা পড়েছে :

নন্দ-ঘরনি আনন্দ ভরী, সুত স্যাম খিলাবৈ।
কবহি ঘুটুরুবনি চলহিঁগে, কহি বিধিহিঁ মনাবৈ
কবহিঁ দঁতুলি দ্বৈ দুধ কী, দেখোঁ ইন নৈননি
কবহিঁ কমল-মুখ বোলিহৈঁ, সুনিহোঁ উন বৈননি।
চূমতি কর-পগ-অধর-ভ্রূ, লটকতি লট চূমতি।
কথা বরনি সুরজ কহৈ, কহঁ পাবৈ সো মতি ॥[১৬৬]

অর্থাৎ, আনন্দিত নন্দরাণী শ্যামসুন্দরের সঙ্গে খেলছেন আর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছেন, 'কবে আমার ছেলে হামা দেবে' কবে ওর দুধের ছোট ছোট দাঁত দুটি দেখতে পাব! কবে ওর সুন্দর কোমল মুখে কথা ফুটবে?" স্নেহাপ্লুত হয়ে তিনি কৃষ্ণের হাত, পা, অধর, ভ্রূ এবং ঝুলে পড়া চুলের গুচ্ছ চুম্বন করতে লাগলেন।

বালগোপালের মধুর নৃত্য দেখে ব্রজরমণীরা বাৎসল্যভাবে আবিষ্ট। বংশীবদন সেই অবস্থার কথা বলেছেন :

হেরইতে পরশিতে লালন করাইতে
স্তন ঘিরে ভীগল বাস ॥

শ্রীকৃষ্ণের বিরহ যশোদা এবং অন্যান্য গোপবধূদের হৃদয় বাৎসল্যরসে উচ্ছ্বসিত হয়ে

ওঠে। এই বিয়োগ-বাৎসল্য নিয়ে অনেক সুন্দর পদ রচিত হয়েছে। বলরাম দাস যশোদার বেদনা উপলব্ধি করে বলেছেন :

এ হেন দুধের বাছা বনেতে বিদায় দিয়া
কেমনে ধরিবে প্রাণ মায় ॥[১৬৭]

দীন চণ্ডীদাস বলেছেন, কৃষ্ণ মথুরা চলে যাবার পর যশোদা—

কানাই কানাই বলিয়া বলিয়া
নিরবধি রাণী কান্দে।

হিন্দী পদকর্তারাও মথুরা-প্রবাসী কৃষ্ণের জন্য যশোদার আর্তি মর্মস্পর্শী ভাষায় রূপায়িত করেছেন।

বৈষ্ণবীয় বাৎসল্যরসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল পরকীয়াকে প্রাধান্য দেওয়া। মধুররসে পরকীয়ার যে গুরুত্ব বাৎসল্যেও তেমনি সমান গুরুত্ব। শ্রীকৃষ্ণের আপন মাতাপিতা দেবকী ও বসুদেব। কিন্তু তাঁর গভীর স্নেহের সম্পর্ক যশোদা নন্দ এবং অন্যান্য ব্রজবাসী গুরুজনদের সঙ্গেই গড়ে উঠেছিল। পরকীয়া প্রেমের ব্যাকুলতা যেমন তটপ্লাবী এবং উন্মাদক, পরকীয়া বাৎসল্যও তদনুরূপ। বৈষ্ণব পদকর্তারা এই পরকীয়া বাৎসল্যের চিত্রই এঁকেছেন।

পদাবলী সাহিত্যে পরকীয়া বাৎসল্যের এই প্রাধান্যই হয়ত পরবর্তীকালের বাংলা সাহিত্যে প্রভাব বিস্তার করেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলীতে বাৎসল্য প্রায় অনুপস্থিত বলা চলে। রবীন্দ্রনাথের গল্পে-উপন্যাসে-নাটকে পরকীয়া বাৎসল্যের দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যায়। গোরার প্রতি আনন্দময়ীর স্নেহ, গোবিন্দমাণিক্যের তাতা ও তার দিদির প্রতি স্নেহ এবং জয়সিংহের জন্য রঘুপতির ভালোবাসা এরই কয়েকটি দৃষ্টান্ত মাত্র। তাঁর অতিথি, আপদ, সম্পত্তি সমর্পণ প্রভৃতি অনেক গল্পে এমনি পরকীয়া বাৎসল্যের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

শরৎচন্দ্রের গল্প উপন্যাসেও এর অনেক উদাহরণ ছড়িয়ে আছে। পল্লীসমাজের বিশ্বেশ্বরী, মেজদিদির হেমাঙ্গিনী, রামের সুমতির নারায়ণী, বিন্দুর ছেলের বিন্দু, পণ্ডিতমশাইয়ের কুসুম প্রভৃতি নায়িকারা অপরের সন্তানকে শুধু প্রাণ দিয়ে ভালো-বেসেছে তাই নয়, সেই ভালোবাসার জন্য অনেক দুঃখ ও নির্যাতন বরণ করতে দ্বিধা করে নি। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের এই পরকীয়া বাৎসল্য যেন পদাবলীর পরকীয়া বাৎসল্যের সঙ্গে এক সূত্রে বাঁধা।

নির্দেশিকা

১. নাট্য শাস্ত্র ৬।৩৫

২. রাধাগোবিন্দ নাথ, গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন, ৫ম খণ্ড, পৃ ২৭০৫

৩. সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, কাব্য-বিচার, পৃ ৬৭

৪. তদেব, পৃ ৯১-৯২

৫. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য, সংস্কৃত সাহিত্যের ভূমিকা, পৃ ৪৮৪

৬. খগেন্দ্রনাথ মিত্র, কীর্তন, পৃ ৫৯

৭. সুধীরকুমার দাশগুপ্ত কাব্যালোক, পৃ ৯৩

৮. কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য, রসতত্ত্ব, শিল্পসম্ভোগ, বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ, ১৩৭৪, পৃ ৮১

৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্যের পথে, রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৩শ খণ্ড, পৃ ৪৩৭

১০. অতুলচন্দ্র গুপ্ত, কাব্য-জিজ্ঞাসা, পৃ ১৭

১১. De, S. K., *History of Sanskrit Poetics*, Vol. II, p. 17. ডঃ পি. ভি. কানে তাঁর সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের ইতিহাসেও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। দ্রষ্টব্য : নাট্যশাস্ত্রের উপর অধ্যায়টি।

১২. "স্থায়িত্বং চ এতাবতামেব। জাত এব হি জন্তুরিয়তীভিঃ সংবিদ্ভিঃ পরীতো ভবতি।" [নাট্যশাস্ত্রের অভিনব ভারতী টীকা ১।২৮৪]

১৩. ভক্তিরসায়ন ১।১, পৃ ১

১৪. নাট্যশাস্ত্র ৬।৩৬, ভাষ্য।

১৫. ভামহ, কাব্যলংকার, ৩।৬ পৃ ১৯

১৬. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ ২৩৫

১৭. মধুরং রসবদ্বাচি বস্তুন্যপি রসস্থিতিঃ, কাব্যাদর্শ, ১।৫১, পৃ ২৭

১৮. সুধীরকুমার দাশগুপ্ত, কাব্যালোক, ৪র্থ সং, পৃ ১৪৮

১৯. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ ২৩৬

২০. অতুলচন্দ্র গুপ্ত, কাব্য-জিজ্ঞাসা, ভূমিকা, পৃ পাঁচ

২১. Kane, P. V., *History of Sanskrit Poetics*, 3rd Ed. ১৬২-১৯০ পৃষ্ঠায় দু'টি মতের বিস্তৃত আলোচনা আছে।

২২. ধ্বন্যালোক, ৪।৪

২৩. তদেব, ১।৪

২৪. তদেব, ১।১৩

২৫. তদেব, ১।১

২৬. সাহিত্যদর্পণ, ১।৩

২৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভরতবর্ষে ইতিহাসের ধারা, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৮ খণ্ড, পৃ. ৪২৯

২৮. ধ্বন্যালোক, লোচনটীকা, ২।৪

২৯. শ্রীমদ্ভাগবতম্, ৭।১।৩১

৩০. রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রসসমীক্ষা, পৃ. ১৭৩

৩১. Chatterji, S. K., *Islamic Mysticism, Iran and India*, In *Indo-Iranica*, V. I. Oct. 1946.

৩২. শ্রীহরিদাস দাস সম্পাদিত "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু", দ্বিতীয় সংস্করণ ভূমিকা, পৃ. ১

৩৩. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, অপরার্ধ ২য় সং, পৃ. ২১

৩৪. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ২য় খণ্ড, ২য় সং ; পৃ. ৪০৫-০৬

৩৫. ভগবদ্ভক্তিরসায়ন, ২।৭৫-৭৬

৩৬. প্রীতিসন্দর্ভঃ, পৃ. ৬৭৩-৭৪

৩৭. চৈতন্যচরিতামৃত, আদি ৪।১৭

৩৮. তদেব, ১।৪।২১-২২

৩৯. তদেব, অন্ত্য ৪।১৯১

৪০. তদেব মধ্য ২২।৯৯

৪১. প্রীতিসন্দর্ভঃ, ১১০, পৃ. ৫৮০

৪২. ভগবদ্ভক্তিরসায়ন, ২।৭৭-৭৮

৪৩. রাধাগোবিন্দ নাথ, গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন, ৫ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. ১৩

৪৪. সাহিত্যদর্পণ, ১।১৮

৪৫. প্রীতিসন্দর্ভঃ, ১১১

৪৬. চৈতন্যভাগবত আদি, ৮ম সং, পৃ. ৫৩

৪৭. চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য ৯।৯৬

৪৮. সাহিত্যদর্পণ, ৩।১৮৩

৪৯. কাব্যালংকার, ১৪।১২, পৃ. ১৬০,

৫০. অনন্তদাস বাবাজী মহারাজ, রসদর্শন, পৃ. ৫৪-৫৫

৫১. শশিভূষণ দাশগুপ্ত, শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ দর্শনে ও সাহিত্যে, পৃ. ২৪৮

৫২. চৈতন্যচরিতামৃত, আদি ৪।৪৬-৪৭

৫৩. তদেব, আদি ৪।১৬৪-৬৬

৫৪. তদেব, মধ্য ২১।১০১

৫৫. তদেব, আদি ১।৯০-৯২

৫৬. তদেব, আদি ৮।১৪৪-৪৫

৫৭. তদেব, মধ্য ৮।১৪৭

৫৮. তদেব, আদি ৪।৬০

৫৯. তদেব, আদি ৪।৯৬-৯৮

৬০. তদেব, আদি ১।৬১

৬১. *The Bhakti-Rasa-Sastra of Bengal Vaisnavism.* In the *Indian Historical Quarterly*, December, 1932, p. 646

৬২. কাব্যালোক, ৪র্থ সং প়ৃ ২০৯

৬৩. নাট্যশাস্ত্র, ১।২৭৪

৬৪. ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ, ২।১।৫

৬৫. সাহিত্যদর্পণ, ৩।১৭৬ টীকা

৬৬. নাট্যশাস্ত্র, ৬।২৩

৬৭. বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, প্রাচীন ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রের ভূমিকা, পৃ ৩১ উদ্ধৃত।

৬৮. ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ, ২।৫।১

৬৯. তদেব, ২।৫।২

৭০. "মুখ্যা গৌণী চ সা দ্বেধা রসজ্ঞৈঃ পরিকীর্তিতা", ২।৫।২

৭১. ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ, ২।৫।১১৫

৭২. তদেব, ২।৫।৪০

৭৩. চৈতন্য চরিতামৃত, ২।১৯।১৮৫, ১৮৭

৭৪. তদেব, ২।১৯।১৮৮

৭৫. ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ, ২।৫।৩৮

৭৬. চৈতন্যচরিতামৃত, ২।১৯।১৮৩-৮৪

৭৭. ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ, ২।৫।৩

৭৮. তদেব, ২।৫।৫১

৭৯. রাধাগোবিন্দ নাথ, গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন ; ৫ম খণ্ড, পৃ ২৯৪৯

৮০. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রেমধর্ম, পৃ ৪১০ উদ্ধৃত।

৮১. চৈতন্যচরিতামৃত, ২।১৯।২৩০-৩১

৮২. তদেব, ২।১৯।২১৭

৮৩. তদেব, ২।১৯।২২১, ২২৩, ২২৪

৮৪. 'ব্যাম্বিনো' শিল্প সম্বন্ধে তথ্য পরিবেশিত হয়েছে, *Encyclopedia of Religion and Ethics*, Vol. II, p. 341-42.

৮৫. Swaddling clothes.

৮৬. Forlong I. G. R., *Encyclopedia of ˉeligions*, Vol. I., Bambino.

৮৭. Majumdar, Pratap Chandra, *Paramahansa Ramakrishna*, 3rd. Ed p. 5.

৮৮. পি, ফার্লো, অনুবাদক, মুক্তিদাতা, পৃ ১৬-১৭

৮৯. Henry Suso (b. 1295)

৯০. Inge, W. R., *Christian mysticism.* p. 176.

৯১. Weber. A.

৯২. *Indian Antiquary*, 1874.

৯৩. Hopkins, A. W.

৯৪. Kennedy. J.

৯৫. Macnicol, Hiciol.

৯৬ Nestorias-এর শিষ্য সম্প্রদায়।

৯৭. Kennedy, J. *The Child Krishna, Christianity and the Gujars* in *J. R., A. S. Great Britain & Ireland*, 1907. p. 951-991.

৯৮. Bhandarkar R. G , Vaisnavism, Saivism and minor Religions Systems, p. 38.

৯৯. Basham, A. L., The Wonder that was India, p. 308.

১০০. Keith, A. B., *The Child Krishna.* in *J. R. A. S. Great Britain and Ireland*, June 1908 ; p 169-175.

১০১. এ প্রসংগে আরো উল্লেখযোগ্য রমাপ্রসাদ চন্দ একটি শিলালেখে প্রমাণ উদ্ধার করে দেখিয়েছেন যে 'কৃষ্ণ' নামটি যীশুখ্রীষ্টের জন্মের প্রায় দুই শতাব্দী পূর্বে প্রচলিত ছিল। দ্রষ্টব্য Chanda, Ramaprasad *Memoirs of the Archaeological Survey of India No. 5 ; Archaeology and Vaishnava. Tradition.*

১০২. সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ, পরিশিষ্ট, পৃ ৪৭-৫১

১০৩. ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ, ১।২।২৬৯ ও ৩০৯

১০৪. প্রভুদয়াল মীতল, চৈতন্য মত ঔর ব্রজ সাহিত্য, পৃ ১২

১০৫. তদেব, পৃ ২৯

১০৬. তদেব, ভূমিকা, পৃ ১

১০৭. দীনদয়ালু গুপ্ত, হিন্দী সাহিত্য কা বৃহৎ ইতিহাস, ৫ম ভাগ ; পৃ ৪২

১০৮. হরবংশলাল শর্মা, ভাগবত দর্শন, পৃ ৩৪৪

১০৯. বলদেব উপাধ্যায়, ভাগবত সম্প্রদায়, পৃ ৫২৬

১১০. হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী, উস যুগ কী সাধনা ঔর তৎকালিক সমাজ, হরবংশলাল শর্মা সম্পাদিত সুরদাস গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধ, পৃ ৪৯

১১১. রামচন্দ্র শুক্ল, হিন্দী সাহিত্য কা বৃহৎ ইতিহাস, পৃ ১৯১-১৯২

১১২. দীনদয়ালু গুপ্ত, সম্পাদনা, হিন্দী সাহিত্য কা বৃহৎ ইতিহাস, ৫ম ভাগ, পরিশিষ্ট খ, পৃ ৫০০

১১৩. সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ, পরিশিষ্ট, পৃ ৫০-৫১
১১৪. ঋগ্বেদ. ১০।৮৫।৪৫
১১৫. তদেব, ১৬৯।৩
১১৬. বাল্মীকি রামায়ণম্, অযোধ্যাকাণ্ড ২০।৫৩
১১৭. তদেব, ৪২।৩৪
১১৮ মহাভারতম্, আদি, ১১৫।৩৯
১১৯. তদেব, আশ্রমিক, ৩।১৭-২৫
১২০. তদেব, সভা, ৭৫।৮-৯
১২১. আনুমানিক ১০০।২০০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত
১২২. অশ্বঘোষ, বুদ্ধচরিত ৮।৫৮
১২৩. কুমারসম্ভবম্, ১।২৭
১২৪. অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, ৭।১৭
১২৫. তদেব, ৭।১৯
১২৬. রঘুবংশ, ৩।২৬
১২৭. ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড, ১৫শ অধ্যায়, ৭ম শ্লোক
১২৮. শ্রীমদ্‌ভাগবতম্, ১০ম স্কন্ধ ; ৩য় অধ্যায়, পৃ ৩৭-৩৮
১২৯. তদেব, ১০।৭।৬-১২
১৩০. তদেব, ১০।৮।২৯-৩১
১৩১. তদেব, ১০।৯।৩
১৩২. স্বয়ম্ভূ রিট্ঠেণেমিচরিউ, সন্ধি, ৫।৯-১০
১৩৩. যতীন্দ্র রামানুজদাস, আড়বার, পৃ ৩
১৩৪. বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, ভারতীয় ভক্তিসাহিত্য
১৩৫. Sastri, K. A., Nilakanta. *A History of South India* p. 321
১৩৬. যতীন্দ্র রামানুজদাস, সহস্র পদাবলী, পৃ ৮৫-৮৯
১৩৭. একনাথ, জগন্নাথ শ্যামরাও দেশপাণ্ডে সম্পাদিত নবে নবনীত, পৃ ১৩৮-৩৯
১৩৮. নরসিং মেহ্‌তা, শ্রীকৃষ্ণ বাললীলা, পদ নং ১৩
১৩৯. Mansinha, Mayadhar. *History of Oriya Leterature*, p. 282.
১৪০. সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, অসমীয়া সাহিত্য, পৃ ৪১
১৪১. নীলরতন সেন সম্পাদিত, চর্যাগীতিকোষ, ২০ নং চর্যা, পৃ ১৩৮
১৪২. বৃন্দাবন দাস, চৈতন্য-ভগবত, ১।৫
১৪৩. দীনেশচন্দ্র সেন, সরল বাঙ্গালা সাহিত্য, ১০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত
১৪৪. কৃত্তিবাস, রামায়ণ (আদিকাণ্ড), পৃ ১০০
১৪৫. তদেব, অযোধ্যাকাণ্ড, পৃ ১১৫
১৪৬. মহাভারতম্, শল্যপর্ব, ৩৬।৬৮
১৪৭. কাশীরাম দাস, মহাভারত (স্ত্রীপর্ব) ২য় খণ্ড, পৃ ১১৯৮

১৪৮. Sills, David L. ed., *International Encyclopedia of the Social Sciences*. Vol-1. p. 121-124.

১৪৯. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিবিধ প্রবন্ধ ১ম খণ্ড, পৃ ১৮৪-১৮৫

১৫০. Raghavan. V., *The Number of Rasas* 2nd ed. p. 63 & 118. আরো দ্রঃ কাব্যালংকার ২২।৩

১৫১. সুধীরকুমার দাশগুপ্ত, কাব্যালোক, ৪র্থ সং, পৃ ১৪৯

১৫২. তদেব, কাব্যালোক, ৪র্থ সং, পৃ ১৪৮

১৫৩. ভরত, নাট্যশাস্ত্র অভিনব ভাষ্য, ৬।১০৯

১৫৪. তদেব, অভিনব ভাষ্য

১৫৫. বিশ্বনাথ কবিরাজ, সাহিত্যদর্পণ, ৩।২১৩

১৫৬. সুধীরকুমার দাশগুপ্ত, কাব্যালোক, ৪র্থ সং, পৃ ১৮৫

১৫৭. তদেব, পৃ ১৮৬

১৫৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, সংকলক 'পদরত্নাবলী' ভূমিকা, পৃ ১৫-১৭

১৫৯. রূপগোস্বামী, ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ, ৩।৪।১

১৬০. তদেব, ২।৫।৩৩

১৬১. কবিকর্ণপূর, অলংকারকৌস্তভ, ৫ম কিরণ

১৬২. সুধীরকুমার দাশগুপ্ত, কাব্যালোক, ৪র্থ সং. পৃ ১৮৭

১৬৩. Raghavan. V. *The Number of Rasas* 2nd ed. p. 118-122.

১৬৪. রূপগোস্বামী, ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ, ৩।৪।১৭

১৬৫. দাস্যরসের ব্যভিচারীভাবের জন্য দ্রঃ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ, ৩।২।৬৯-৭০

১৬৬. সুরদাস, সুর সাগর, ১ম খণ্ড, পৃ ২৮৬, ৭৪।৬৯২

১৬৭. ব্রহ্মচারী অমরচৈতন্য, সম্পাদক, বলরামদাসের পদাবলী, পৃ ৩৯

তৃতীয় অধ্যায়

বাৎসল্যরসের মুখ্য পদকর্তাগণ

এ অধ্যায়ে বাৎসল্যরসের দশজন বিশিষ্ট পদকর্তা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এঁদের মধ্যে পাঁচজন বাঙালী এবং পাঁচজন হিন্দী কবি। এঁরা কেউ একমাত্র বাৎসল্যরসের পদ রচনা করেন নি। পদকর্তারা ছিলেন বৈষ্ণব সাধক। তাঁরা শান্ত, দাস, সখ্য ও বাৎসল্য রস একে একে আস্বাদন করার পর পঞ্চম ও শ্রেষ্ঠ মধুর রস আস্বাদন করে সাধনার শেষ পর্যায়ে উপনীত হন। মধুর রস আস্বাদনেই সাধনার চরম পরিণতি,—এই জন্য বৈষ্ণব পদকর্তারা একে তাঁদের রচনায় প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁদের শ্রেষ্ঠ পদগুলি মধুর রসের হলেও অন্য চারটি রসপর্যায়ের উপরও তাঁরা কিছু কিছু পদ রচনা করেছেন। লক্ষ্য যদিও মধুর রস আস্বাদন করা তবু অন্য রসাস্বাদনের মধ্যে দিয়েই তাঁদের সাধনার পথ এবং সেই যাত্রাপথের কিছু অভিজ্ঞতার নিদর্শন পাওয়া যায় বাৎসল্য ও অন্যান্য রসাশ্রিত পদাবলীতে।

চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাস মূলতঃ মধুররসের কবি। তাঁদের প্রতিভার বিকাশ এই শ্রেণীর পদাবলীকে কেন্দ্র করে। বাৎসল্যরসের অনেকগুলি পদ যদিও এঁদের নামে প্রচলিত, তবু তাঁদেরই রচিত মধুর রসের পদাবলীর তুলনায় এগুলি বিবর্ণ মনে হতে পারে। অন্যদিকে বাসুদেব ঘোষ ও বলরাম দাস বাৎসল্যের পদাবলীতেই রচনার উৎকর্ষতা প্রমাণ করেছেন। অন্ততঃ বলা যায় তাঁদের রচিত মধুর রসের পদ অপেক্ষা বাৎসল্যের পদ কম উজ্জ্বল নয়। এদিক থেকে বিচার করলে হিন্দী কবি সুরদাস এক অনন্য স্থান অধিকার করে আছেন। তিনি বাৎসল্য ও মধুর— এই উভয় রসের পদেই সমান প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। সুরদাস ভারতের শ্রেষ্ঠ বাৎসল্য রসের কবি। এই জন্য তাঁর সম্বন্ধে একটু বিস্তৃততর আলোচনা করা হয়েছে।

নিম্নে আলোচিত কবিদের সমগ্র রচনার পর্যালোচনা করা হয় নি। তাঁদের রচিত বাৎসল্য রসের পদগুলির সমীক্ষাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া মধ্যযুগের কবিদের স্থান, কাল ও ভণিতা নিয়ে যে অমীমাংসিত বিতর্ক চলে আসছে তার ব্যাখ্যা বা সমাধানের চেষ্টাও করা হয় নি।

বাংলা

চণ্ডীদাস :

বাংলা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে চণ্ডীদাসের নাম আপন মহিমায় ভাস্বর। প্রায় পাঁচশত বৎসর পরেও তাঁর পদাবলীর মাধুর্য ম্লান হয় নি। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাংলার এই জাতীয় কবির সঠিক পরিচয় জানা যায় না। নানা সূত্র থেকে যতটুকু জানা যায় তা নিয়েও পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। চণ্ডীদাস নামে ক'জন কবি ছিলেন, কোন সময়ে তাঁরা জীবিত ছিলেন এই সব প্রশ্ন নিয়েই পণ্ডিতদের সমস্যা।

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত চৈতন্যচরিতামৃতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন :

চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক-গীতি,
কর্ণামৃত, শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ-রামানন্দ-সনে মহাপ্রভু রাত্রি-দিনে,
গায়, শুনে পরম আনন্দে ॥[১]

চণ্ডীদাসের পদ চৈতন্যদেবের যে প্রিয় ছিল তার প্রমাণ এখানে পাওয়া যায়। এর অর্থ এই যে একজন চণ্ডীদাস নিঃসন্দেহে চৈতন্যের পূর্বে অথবা সমসাময়িক কালে পদ রচনা করেছেন। ইনি খুব সম্ভব বড়ু চণ্ডীদাস। বড়ু চণ্ডীদাস ছাড়া দ্বিজ, অনন্ত, দীন ভণিতাযুক্ত চণ্ডীদাসের অনেক পদ পাওয়া যায়। এ সব ভণিতা একই চণ্ডীদাসের অথবা চণ্ডীদাস নামধেয় বিভিন্ন কবির, সে সম্বন্ধে তথ্য প্রমাণাদি সব সুনিশ্চিতরূপে কিছু বলা যায় না। তবে অন্ততঃ এইটুকু নিশ্চিত যে দু'জন চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব ছিল : একজন চৈতন্যের পূর্ববর্তী, অন্যজন সমসাময়িক কিংবা পরবর্তী। ভাব, ভাষা ও রচনারীতির বিচারে এই সিদ্ধান্ত সমর্থিত হয়। দ্বিজ, দীন, আদি, অনন্ত ইত্যাদি বিশেষণ ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব একই কবি বিভিন্ন সময়ে ব্যবহার করতে পারেন। শুধু এই বিশেষণের পার্থক্য ভিন্ন ব্যক্তিত্বের নিঃসংশয় প্রমাণ নয়। এই সমস্যা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের অভিমত স্মর্তব্য : "আমরা এ পর্যন্ত দু'জন চণ্ডীদাসের পরিচয় পাইয়াছি। একজন চৈতন্যদেবের পূর্ববর্তী বড়ু চণ্ডীদাস, অন্যজন শ্রীচৈতন্য-পরবর্তী দীন চণ্ডীদাস। একটু অভিনিবেশ সহকারে আলোচনা করিলেই এই দুইজন কবির পদ পৃথক করা যায়। কিন্তু বড়ু ও দীন চণ্ডীদাস ভিন্ন "চণ্ডীদাস" এই নামের অন্তরালে যে অন্য কবিদের পদ চলিতেছে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে সেগুলিকে চিনিয়া লওয়া একরূপ দুঃসাধ্য ব্যাপার।"[২]

দীনেশচন্দ্র সেন মনে করেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বড়ু চণ্ডীদাস এবং পদাবলীর কবি চণ্ডীদাস অভিন্ন ব্যক্তি। তিনি উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছিলেন যে কালক্রমে লোকের মুখে মুখে কিছু রূপ বদল হলেও চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত বহু প্রচলিত পদাবলীর মূল উৎস বড়ু চণ্ডীদাসের রচনাতেই পাওয়া যায়।[৩] কিন্তু বড়ু চণ্ডীদাসের রচনায় যে দেহ প্রাধান্য লাভ করেছে একথা অস্বীকার করা চলে না। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা নিজেই বিলাপ করছেন :

কি কৈলি কি কৈলি বিধি নিরমিআঁ নারী
আপনার মাঁসে হরিণী জগতের বৈরী ॥[৪]

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এমন সব অশ্লীল উক্তি আছে যা এযুগে একান্তরূপে রুচি বিগর্হিত বলে মনে হবে। চৈতন্যদেব এইরূপ গ্রন্থের পাঠ বা শ্রবণে মুগ্ধ হতেন তা বিশ্বাস করতে দ্বিধা হয়। তিনি সম্ভবতঃ সহজিয়া চণ্ডীদাস বা পদাবলীর চণ্ডীদাসের পদাবলীর রস আস্বাদন করতেন। দুই কবির রাধার তুলনা করলেই মূল পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বড়ু চণ্ডীদাসের রাধা দেহ-সচেতন; পদাবলীর রাধা অপার্থিব অনুভূতিতে আত্মস্থা। এই রাধা "বিরতি আহারে রাঙ্গা বাস পরে যেন যোগিনীর পারা।" পদাবলীর চণ্ডীদাস দেহের জগৎ অতিক্রম করে রাধার অন্তরে প্রবেশ করে মর্মোদ্ঘাটন করতে সক্ষম হয়েছেন। বড়ু চণ্ডীদাস দেহের দ্বারে দাঁড়িয়ে নায়িকার অন্তরলোকের আভাস পাবার ক্ষীণ প্রয়াস করেছেন। বিদ্যাপতির রাধার সঙ্গে এই রাধার সমধিক সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

কাব্যগুণের সামগ্রিক ঐশ্বর্যের জন্য চণ্ডীদাসের পদাবলী এতদিন পরেও আমাদের মুগ্ধ করে। কিন্তু একথা চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত বাৎসল্যরসের পদগুলি সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। মনে হয় এই শ্রেণীর পদগুলি পালাগানের অংশ হিসাবে রচিত হয়েছিল। সুর সহযোগে গীত হলে এগুলি হয়ত শ্রোতার মনে রসের সঞ্চার করতে পারে। কিন্তু পাঠ করে মনে হয় না যে কবি রাধা-কৃষ্ণের লীলা অবলম্বনে মাধুর্যমণ্ডিত অপরূপ পদ রচনা করেছেন, বাৎসল্যের পদগুলি তাঁরই সৃষ্টি। এগুলি হয়ত চৈতন্য পরবর্তী অন্য কোন চণ্ডীদাসের রচনা।

যে চণ্ডীদাসই লিখুন না কেন, তাঁর বাৎসল্যরসের পদ অনেকগুলি। অন্য কোনো বাঙালী বৈষ্ণব কবি এ বিষয়ের উপর এত পদ রচনা করেছেন কিনা সন্দেহ। বাৎসল্যের অধিকাংশ পদ গ্রথিত হয়েছে নীলরতন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত চণ্ডীদাসের পদাবলীতে এবং মণীন্দ্রমোহন বসু সম্পাদিত [কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত] দীন চণ্ডীদাসের পদাবলীতে। অন্যান্য সংকলনে বাৎসল্যের পদ বেশী অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। এই রসাশ্রিত পদগুলি যে দীন চণ্ডীদাসেরই রচনা তার কোনো নিশ্চিত প্রমাণ নেই। প্রথমতঃ দীন চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত পদের সংখ্যা খুবই কম, অধিকাংশের ভণিতায় আছে শুধু চণ্ডীদাসের নাম। দ্বিতীয়তঃ, দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয় ১৩৪১ বঙ্গাব্দে। এর দুই দশক পূর্বে নীলরতন মুখোপাধ্যায়

সংকলিত চণ্ডীদাসের পদাবলী প্রকাশিত হয়। উভয় সংকলনের বাৎসল্য রসের পদগুলি প্রায় অভিন্ন।

তাঁর এই শ্রেণীর পদগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় চণ্ডীদাস ভাগবত কাহিনী থেকে দূরে সরে স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে বাৎসল্যরসের স্বাধীন চিত্র আঁকতে উৎসাহ বোধ করেননি। ভাগবতই তাঁর মূল উৎস, কিন্তু তাই বলে অনুবাদ বা অনুসৃতি নয়। বাৎসল্যের পদগুলি মোটামুটি নিম্নলিখিত পর্যায়ে বিভক্ত: ১। সূতিকাগৃহে কৃষ্ণকে পেয়ে নন্দ ও যশোদার বাৎসল্যের প্রকাশ, ২। পূতনা ও তৃণাবর্তবধের পৌরাণিক কাহিনীর মধ্য দিয়ে যশোদার মাতৃসুলভ উৎকণ্ঠা, ৩। গোষ্ঠ ও উত্তর-গোষ্ঠ লীলা এবং যশোদার বাৎসল্য, ৪। অক্রুরের সঙ্গে কৃষ্ণের মথুরা যাত্রা। পুত্রের বিচ্ছেদে নন্দ যশোদার বেদনা, ৫। নন্দ মথুরা গেলেন কৃষ্ণ বলরামকে ফিরিয়ে আনতে। ব্যর্থ হওয়ায় নন্দর বেদনা, ৬। নন্দ একা ফিরে আসায় যশোদার বিলাপ। এছাড়া আছে কৃষ্ণ জন্মের পৌরাণিক বৃত্তান্ত, দেবকী ও বসুদেবের পুত্রের নিরাপত্তা ভাবনায় উৎকণ্ঠা, ভাগবত পুরাণে বর্ণিত মৃত্তিকা ভক্ষণ ইত্যাদি কাহিনীর মধ্য দিয়ে কৃষ্ণের ঐশ্বর্যরূপের প্রকাশ; মথুরা এসে কৃষ্ণ কর্তৃক বসুদেব ও দেবকীর উদ্ধার;—এ সবই শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা। এসব লীলায় বাৎসল্যরস সামান্যই পাওয়া যায়।

কংসের কারাগারে অষ্টম সন্তান কৃষ্ণের জন্ম হবার পর—

পুত্রমুখ হেরি দৈবকী সুন্দরী
কান্দিয়া আকুল বড়।
"এমত ছাআলে কিরূপে রাখিব
আমারে হইল পাড়॥"
ভাবএ অন্তরে দৈবকী সুন্দরী
দেখিয়া পুত্রের মুখ।
হরস অন্তর বিকল হইছে
আন চান করে বুক॥
"কি বুদ্ধি করিব কেমত উপায়ে
বাঁচএ এ হেন শিশু।"

পুত্রের অপরূপ মুখের দিকে চেয়ে দেবকীর মন আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। কিন্তু পরমুহূর্তে ভাবনায় ব্যাকুল হন কংসের হাত থেকে কোন্ উপায়ে একে রক্ষা করা যাবে? উপায় নির্দেশ করল দৈববাণী। বসুদেব কৃষ্ণকে নিয়ে এলেন গোকুলে নন্দ গোপের গৃহে।

যশোদা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন। কৃষ্ণময় হয়ে গেল তাঁর জীবন ও জগৎ।

কর পদ নাড়ি গোলক ঈশ্বর
করেন আনন্দে খেলা॥
খেনে গৃহকর্ম করে নন্দরাণী
খেনেক দেখএ মুখ।

পুত্র হেরি হেরি জসদা সুন্দরী
বাড়এ মনের সুখ ॥[৬]

মাতৃস্নেহের এই সুন্দর ছবিটির মাধুর্য অনেকটা হ্রাস পেয়েছে "গোলক-ঈশ্বর" কথাটি ব্যবহার করায়। এই ঐশ্বর্যরূপ লৌকিক বাৎসল্যের প্রকাশকে ক্ষুণ্ণ করেছে।

অন্যান্য কবির বাৎসল্যরসের পদে নন্দ প্রায় অনুপস্থিত। চণ্ডীদাসের বৈশিষ্ট্য নন্দের বাৎসল্যকে উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়ায়। পুতনাবধের ঘটনা শুনে নন্দ ছুটে এলেন—

শুনি নন্দ ঘোষ ধাইঞা আইল
"পুত্র পুত্র" করি বলে।
"ও মোর দুলাল, বাছনি" বলিয়া
তুরিত করিলা কোলে ॥[৭]

কৃষ্ণের এখন গোষ্ঠে যাবার বয়স হয়েছে। যশোদা চিন্তিত, গোষ্ঠে গিয়ে কি বিপদ ঘটে কে জানে। কিন্তু গোপবংশের ছেলেদের ধেনু চরানো অবশ্য কর্তব্য; সুতরাং যেতেই হবে। যশোদা বলরামকে বললেন,—

পুনঃ পুনঃ কহি রে।
শুন বাপু হলধরে ॥
কেবল আঁখির আঁখি।
তারার পুতলি সাথী ॥
তুমি ত প্রবীণ বট।
আমার যাদুয়া ছোট ॥
আপনার ক্ষুধার বেলে।
খাইতে দিও ত ভালে ॥
সম্মুখে রাখিও কানু।
তুমি চরাইবে ধেনু ॥
কানুর ধরাতে বাঁধি।
ক্ষীর ছেনা ননী চাঁছি ॥
যাদুরে করিয়া কোলে।
আপনি খাইবে বলে ॥
দুখিনী অভাগী আমি।
কেবল ভরসা তুমি ॥
তিলে না দেখিলে মরি।
এই নিবেদন করি ॥[৮]

সন্তানের জন্য মা'র সতর্ক ও সযত্ন স্নেহদৃষ্টির সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে কৃষ্ণের ঐশ্বর্যরূপের উল্লেখ করে কবি বাৎসল্যের স্বাভাবিক পরিবেশ ক্ষুণ্ণ করেন নি।

পুত্রকে গোষ্ঠে পাঠিয়ে যশোদা মৃত বৃক্ষের মতো পড়েছিলেন। শিঙ্গা-শব্দে বুঝতে পারলেন কৃষ্ণ বাড়ী ফিরে আসছেন। যশোদা তখন নতুন জীবন পেলেন, যেমন বর্ষার জলধারায় গ্রীষ্মের দাবদাহে শুষ্ক বৃক্ষ সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে।

সোনার পুতলি বনে পাঠাইয়া
আছিল চেতন হরি।
মরা তরু যেন বরিষ পাইলে
সে যেন মঞ্জরী সরি॥
কতক্ষণ হেরি সে চাঁদ বদন
তবে সে জুড়াই প্রাণ।
আঁখির তারাটি খসিয়া গেছিল
পুন সে বৈঠল ঠাম॥[৯]

কৃষ্ণ যেন যশোদার চোখের মণি ; গোষ্ঠে চলে যাওয়ায় চোখের মণিও সঙ্গে সঙ্গে চলে গিয়েছিল। কৃষ্ণ বাড়ী ফিরে আসায় চোখের দৃষ্টি ফিরে পেলেন যশোদা। কত সহজ কথায় কবি মায়ের গভীর স্নেহের কথা বলেছেন। চোখের সঙ্গে পুত্রের তুলনা অন্যত্রও আছে। কৃষ্ণ মথুরা চলে যাবার পর যশোদা বিলাপ করছেন :

আঁখি গেলে তার কি ছার জীবনে
বাঁচিতে কি আর সাধ।[১০]

গোষ্ঠ থেকে ফিরে আসার পর যশোদা পুত্রকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন :

এতক্ষণ কোথা হিয়া দিয়া ব্যথা
গেছিলে কোন বা বনে।
এখানে এ ধর গৃহ মাঝে ছিল
পরাণ তোমার সনে॥[১১]

কৃষ্ণ নিকটে না থাকলে চোখের তারা যেমন হারিয়ে যায় তেমনি যশোদার প্রাণও পুত্রের সঙ্গে চলে যায় গোষ্ঠে, দেহ পড়ে থাকে গৃহে।

তুমি মোর প্রাণ পুথলি সমান
যতক্ষণ নাহি দেখি।
হৃদয় বিদরে তোমার অগোচরে
মরমে মরিয়া থাকি॥[১২]

উত্তর-গোষ্ঠের এই পদটিতে গৃহ-প্রত্যাগত কৃষ্ণের মলিন মুখ দেখে যশোদা ব্যাকুল হয়ে উঠলেন—

আহা মরি মরি পরাণ পুথলি
বাছনি কালিয়া সোনা।
কত না পেয়েছ ক্ষুধায় পীড়িত
বনে যেতে করি মানা॥

এ দুঃখে না জীব নন্দে কি বলিব
এ শিশু পাঠায়ে বনে।
এ ঘর কারণে আনল ভেজাব
কি বা সে করয়ে ধনে ॥[১৩]

যশোদা সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকেন—

না জানি কখন কিবা জানি হয়
হেন লয় মোর মনে ॥
বনে ভয়ংকর বৈসে ভয়ংকর
শার্দুল ভুজঙ্গ রহে।
জানিবা কখন করয়ে দংশন
এ বড় বিষম মোহে ॥[১৪]

যশোদার যত রাগ নন্দের উপরে। কারণ নন্দই গোপালকে গোষ্ঠে পাঠাতে ব্যগ্র। তাই যশোদা কৃষ্ণকে বলছেন,

তোমারে লইয়া আন দেশে যাব
না রব নন্দের ঘরে।
তোমা হেন ধন আর কোথা পাই
বিধাতা দিয়াছে মোরে ॥
কত কত বার ছেনা ননী সর
পিয়াই রজনী জাগি।
কটোরা ভরিয়ে রাখিয়ে থালিয়ে
রাখিয়ে যাহার লাগি ॥
এ জন কেমনে এই ধেনু সনে
ফিরিবে বনেতে বনে।
অভাগী মায়ের বিষম অন্তর
ক্ষেণ কত উঠে মনে ॥[১৫]

এর পরে অক্রূর এলেন কৃষ্ণ ও বলরামকে মথুরা নিয়ে যেতে। এই খবর শুনে যশোদা মূর্ছিত হয়ে পড়লেন ; সমগ্র গোকুলে পড়ল শোকের ছায়া।

একথা শুনিয়া নন্দ পানে চেয়ে
পড়িল ধরণীতলে।
কি হল কি হল গোকুল নগরে
কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে ॥[১৬]

কৃষ্ণ তখন গোষ্ঠে ; মথুরা যাবার খবর তিনি তখনও জানেন না।

যশোদা—

কোলে লয়ে কানু এ ক্ষীর নবনী
পিয়ায় মনের সুখে।

বিবিধ শাকর　　　　চিনি ছানা সর
দিছেন ও চাঁদ মুখে ॥[১৭]

বাড়ীর সামনে রথ কেন জিজ্ঞাসা করায় কৃষ্ণ জানতে পারলেন তাঁকে মথুরা যেতে হবে এবং সেই কথা ভেবে যশোদা ব্যাকুল। কৃষ্ণ মাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, ভয় করো না।

কিন্তু কৃষ্ণের আশ্বাসে যশোদা শান্ত হতে পারেন না। তিনি বলেন—

কিবা দেখ নন্দ　　　　ঘুচিল আনন্দ
বেড়ল আপদ আসি।
সুখ গেল দূর　　　　দুখ রহে পাশে
কেমনে বঞ্চিব নিশি ॥[১৮]

আসন্ন বিচ্ছেদ-বেদনার কথা মনে করে যশোদার স্নেহ উদ্বেল হয়ে ওঠে। তিনি—

কোলে লয়ে যাদুমণি　　　　বদন চুম্বয়ে রাণী
দর দর বহে প্রেমবারি।
ধরিয়া গোপাল করে　　　　কাতর হইয়া বলে
দুই বাহু ধরিয়া পসারি ॥
…　　　　…　　　　…
কে আর করিবে খেলা　　　　হইয়া বালকমেলা
কাবে দিব ছেনা ননী সর।
কে আর যাইয়া ঘরে　　　　মহটা লইয়া করে
এ সর নবনী দিব মুখে।
এ সব ছাড়িয়ে মায়　　　　কোথারে যাইতে চায়
মায়ের অন্তরে দিতে দুখে ॥[১৯]

যশোদা যতই বিলাপ করুন না কেন, কৃষ্ণ বলরামকে মথুরা যেতে হল। নন্দ ঘোষ সঙ্গে গেলেন ; আশা, কৃষ্ণকে ফিরিয়ে আনবেন। মথুরায় কিছুদিন কেটে যাবার পর কৃষ্ণ বলরামের সঙ্গে পরামর্শ করলেন কি উপায়ে নন্দকে বাড়ী পাঠানো যায়। বলরামের সঙ্গে আলোচনার সময় প্রমাণ পাওয়া যায় কৃষ্ণও নন্দ ও যশোদার প্রতি কত আসক্ত।

নন্দ হেন পিতা　　　　কি কহিব কথা
যার স্নেহে নাহি সীমা।
বহু সুখ অতি　　　　কি আর পীরিতি
যশোমতী অতি সমা ॥
যশোদার স্নেহ　　　　কি করিব এই
এ দেহ পূরিত সুখে।
এ জন বিদায়　　　　কেমনে করব
না লয় আমার মুখে ॥[২০]

এরূপ প্রীতি-বাৎসল্যের দৃষ্টান্ত বেশী নেই। কৃষ্ণ যশোদার কথা ভেবে চোখের জলও ফেলেছেন।

নন্দ ঘোষকে ও'রা বললেন, আপনি বাড়ী যান, আমরা পরে যাব।

দু'ভাইকে রেখে বাড়ী ফিরতে নন্দর বুক বেদনায় দীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। কৃষ্ণ বলরাম যাবেন না শুনে নন্দ—

ভূমে গড়ি যায় কান্দে নন্দ রায়
সম্বিত নাহিক চিতে।[২১]

তাঁর ভাবনা—

কেমনে যাইব গোকুল নগরে
কৃষ্ণ বলরাম রাখি।[২২]

নন্দ একা ফিরে আসায় গোকুলে শোকের ছায়া নেমে এল। যশোদা তাঁকে অভিযোগ করে বললেন—

কি লয়ে আইলা তুমি ঘরে।
ছাড়ি মোর কৃষ্ণ হলধরে॥
কান্দে রাণী ভূমে অচেতন।
ধায়ে যত গোপ গোপীগণ॥[২৩]

সহজ সরল ভাষায় উপমা অলংকারে বক্তব্য ভারাক্রান্ত না করে চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলাশ্রিত বাৎসল্যের কথা এমন সরাসরিভাবে প্রকাশ করেছেন যা হৃদয় স্পর্শ করে। এই পদগুলি পালাগানের অংশ হিসাবে রচিত হয়েছিল, তাই সুরারোপিত হলে এদের মাধুর্য অনেক গুণ বৃদ্ধি পাবে। বৈষ্ণব পদকর্তারা সাধারণতঃ যশোদার বাৎসল্যকেই প্রাধান্য দেন। চণ্ডীদাসের বৈশিষ্ট্য তিনি দেবকী, বসুদেব, নন্দ প্রভৃতির বাৎসল্যকেও মর্যাদা দিয়েছেন। এমনকি, শ্রীকৃষ্ণও যে নন্দ ও যশোদার প্রতি আকৃষ্ট তারও পরিচয় পাওয়া যায়। শুধু যশোদার বাৎসল্যের মধ্যে নিবদ্ধ থাকলে বাৎসল্যের এই সামগ্রিক পরিবেশটি প্রকাশ করা সম্ভব হত না।

বাৎসল্যরসাশ্রিত বাংলা বৈষ্ণব পদাবলীতে চণ্ডীদাসের এই পদগুলির বিশেষ মূল্য আছে। কিন্তু রাধা-কৃষ্ণলীলা বর্ণনায় তিনি যে অনন্যসাধারণ রচনাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন সেই তুলনায় বাৎসল্যরসের পদগুলির কাব্যগুণ একটু ম্লান।

বাসুদেব ঘোষ

বাসুদেব ঘোষের জীবনকথা সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য তথ্য বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। যেটুকু পাওয়া যায় সে সম্বন্ধেও ইতিহাসকাররা ভিন্নমত পোষণ করেন। তবে দু'টি বিষয়ে সবাই একমত। প্রথমতঃ, গোবিন্দ, মাধব ও বাসুদেব— এই তিন ভাইয়ের মধ্যে বাসুদেব কনিষ্ঠ। তিনজনই ছিলেন কবিত্বশক্তির অধিকারী এবং সুদক্ষ কীর্তনীয়া। তাঁদের কীর্তনের গুণগান কৃষ্ণদাসও করেছেন:

গোবিন্দ, মাধব, এই বাসু ঘোষ।
তিন ভাই'র কীর্তনে প্রভু পায়েন সন্তোষ ॥[২৪]

বাসুদেব নিজে দুই অগ্রজ সম্বন্ধে লিখেছেন :

গোবিন্দ মাধব ঘোষের গান,
শুনিয়া কেবা ধরয়ে পরাণ।[২৫]

দ্বিতীয়তঃ, এঁরা তিনজনই ছিলেন চৈতন্যদেবের সমসাময়িক। তাঁর লীলা প্রত্যক্ষ করবার সৌভাগ্য এঁদের হয়েছিল। কৌমার্যব্রতধারী তিন ভ্রাতার একান্ত আগ্রহ ছিল চৈতন্যদেবের সঙ্গে থেকে তাঁর পরিচর্যা করা। কিন্তু প্রেমধর্ম প্রচারের জন্য মহাপ্রভু বাংলাদেশে নিত্যানন্দের নিকট তিন ভাইকে নীলাচল থেকে পাঠিয়ে দিলেন। নিত্যানন্দের সহচর হিসাবেই তাঁদের পরবর্তী জীবন কেটেছে।

বাসুদেবের জন্ম ও মৃত্যুর কোন তারিখ পাওয়া যায় না ; তিনি যে চৈতন্যদেবের সমসাময়িক এবং তাঁর তিরোধানের পরেও যে কিছুকাল জীবিত ছিলেন সে বিষয়ে মতদ্বৈধতা নেই।

দীনেশচন্দ্র সেনের মতে বাসুদেবের পূর্ব নিবাস ছিল কুমারহট্ট। শ্রীহট্টের বুড়ন গ্রামে মাতুলালয়ে তাঁব জন্ম হয়েছিল এমন কথাও শোনা যায়।[২৬] সুকুমার সেনও বলেছেন, বাসুদেবরা কুমারহট্ট থেকে নবদ্বীপে এসে বসবাস শুরু করেছিলেন। তাঁদের মাতুলালয় শ্রীহট্টে এবং পিত্রালয় চট্টগ্রামে ছিল বলে তাঁর ধারণা।[২৭] কিন্তু অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, বাসুদেবের পিতা বল্লভ ঘোষ ছিলেন মুর্শিদাবাদের অধিবাসী, পরে তাঁরা নবদ্বীপবাসী হন।[২৮] আবার অনেকে মনে করেন বাসুদেবের আদি নিবাস ছিল বর্ধমান কিংবা মেদিনীপুরে।[২৯]

গোবিন্দ, মাধব ও বাসুদেব— এই তিন ভাই চৈতন্য জীবনীমূলক পদ রচনা করেছেন। বিশেষ করে সন্ন্যাস গ্রহণ বিষয়ক করুণরসের পদগুলি মর্মস্পর্শী। তিনজনের মধ্যে পদকর্তা হিসাবে শ্রেষ্ঠ কনিষ্ঠ বাসুদেব। চৈতন্যের পরবর্তীকালে বাংলা পদাবলী সাহিত্যে একটি নতুন শাখার প্রবর্তন হল। এই শাখার মূল বিষয়বস্তু গৌরাঙ্গের জীবন, সন্ন্যাসগ্রহণ এবং প্রেমধর্মের প্রচার। এই শ্রেণীর পদাবলী রচনায় বাসুদেব শীর্ষস্থানীয় বললে অত্যুক্তি হয় না। কবি চৈতন্যলীলার প্রত্যক্ষদর্শী, সুতরাং তাঁর পদাবলীর ঐতিহাসিক মূল্য অবশ্য স্বীকার্য। সবচেয়ে বড় কথা সেই প্রেমলীলার সাক্ষী হিসাবে কবির উদ্বেলিত হৃদয়ের অনুভূতি তাঁর পদাবলীতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এই আবেগাপ্লুত পদগুলি যখন গীত হত তখন শ্রোতার পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হয়ে যেত। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাই বলেছেন :

বাসুদেব গীতে করে প্রভুর বর্ণনে
কাষ্ঠ-পাষাণ দ্রবে যাহার শ্রবণে ॥[৩০]

বাসুদেব রচিত পদের সংখ্যা আনুমানিক দুই শতাধিক।[৩১] সুকুমার সেনের মতে এই সংখ্যা প্রায় আশী।[৩২] ভণিতার সমস্যা সংখ্যা নির্ণয়ে বাধা হয়ে দেখা দেয়। কারণ বাসুদেবের পদ সংগ্রহে কবি বল্লভ, বাসুদেব, বাসু ঘোষ, বাসু প্রভৃতি

ভণিতা পাওয়া যায়। বাসুদেব বাঙালী বৈষ্ণবদের মধ্যে একটি সাধারণ নাম। একাধিক কবির এই নাম থাকতে পারে। পদগুলির গুণগত বিভিন্নতা লক্ষ্য করেও মনে হয় সংকলিত পদগুলি হয়ত একাধিক কবির রচনা। বাসুদেব ব্রজবুলিতেও বারোটি পদ রচনা করেছিলেন।

তাঁর রচনা প্রধান দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এ দু'টি শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন: "বাসুদেব চৈতন্য-জীবন কথাকে দুইটি পৃথক পর্যায়ে বর্ণনার সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। একটি পর্যায়ে অলংকারশাস্ত্র ও পূর্ব প্রচলিত বৈষ্ণব পদাবলীর শ্রেণী ও পালা অনুসারে চৈতন্যলীলাকে সেই ছাঁচে ঢালিয়া তিনি রাধাকৃষ্ণলীলার পটভূমিকায় চৈতন্যকাহিনী স্থাপন করিয়াছিলেন। আর একটি পর্যায়ে তিনি চৈতন্যদেবের নবদ্বীপের জীবনলীলাকে ঐতিহাসিক ও বাস্তব দৃষ্টিকোণ হইতে অংকন করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে প্রথম পর্যায়টি নিছক কাল্পনিক, বাস্তবের সঙ্গে ইহার ততটা সম্পর্ক নাই; কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ের পদগুলিতে চৈতন্যের দৈনন্দিন জীবনের অধিকতর ছায়াপাত হইয়াছে।"[৩৩]

বাসুদেব বৈষ্ণবীয় রীতিসম্মত কিছু বিশুদ্ধ কৃষ্ণলীলার পদ রচনা করেছেন, যে সব পদে আছে গোষ্ঠলীলা, পূর্বরাগ, মিলন, বিরহ, ঝুলন, রাসলীলা, জলকেলি, দানলীলা প্রভৃতির বর্ণনা। বর্ষার রাত্রিতে রাধার অভিসারচিন্তা নিয়ে কবি এই পদটি রচনা করেছেন:

ওহে নব জলধর
বরিষ হরিষ বড় মনে
শ্যামের মিলন মোর সনে।
বরিষ মন্দ ঝিমানি
আজু সুখে বঞ্চিব রজনী
গগনে সঘনে গরজনা
দাদুরি দুন্দুভি-বাজনা।
শিখরে শিখণ্ডিনী বোল
বঞ্চিব সুরনাথ-কোল
দোহার পিরীতি-রস আশে
ডুবল বাসুদেব ঘোষে॥[৩৪]

কৃষ্ণলীলার পটভূমিকায় গৌরাঙ্গের কৃষ্ণপ্রেমের বিভিন্ন স্তর বর্ণনা করা হয়েছে অনেকগুলি পদে। এ সব ক্ষেত্রে গৌরাঙ্গ রাধার স্থান অধিকার করেছেন, রাধার মতোই তিনি কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত। আবার ভাগবত অনুসরণে যশোদার বাৎসল্যের ছবিও বাসুদেব এঁকেছেন। গোপরমণীরা যমুনায় জল আনতে গেছে; সেই সুযোগে কৃষ্ণ শূন্যগৃহে প্রবেশ করে ননী চুরি করে খেয়েছেন। প্রতিবেশিনীরা নালিশ করায় কৃষ্ণকে শাস্তি দিতে বেঁধে রাখলেন যশোদা। কৃষ্ণের কান্না দেখে তাঁকে বন্ধনমুক্ত

করতেই তিনি গিয়ে উঠলেন কদম গাছে। যশোদার ভয় হল ছেলে যদি পড়ে যায়। তখন যশোদা লোভ দেখিয়ে বিলাপ করছেন :

যশোদা বলেন, কোলে আয় রে যাদুমণি
দুকর পুরিয়া তোরে দিব রে ননী ॥
কান্দে তখন নন্দরাণী হায় রে বাছা যাদুমণি
আমি ত পাষণ্ডী তোর মাতা।
কি ছার নবনী তরে বান্ধিলাম যুগল করে
পাষাণ হৃদয় তোর পিতা।
... ...
আমার পাষাণ হিয়া যুগল করেতে বান্ধিয়া
প্রহার করিলাম নানা ছলে।
তুমি ভাগ্যবতী রাণী শ্রীকৃষ্ণের চরণ ভাবি
বাসুঘোষ ইহা বলে ॥[৩৫]

বাসুদেবই গৌরাঙ্গের জীবনকাহিনী অবলম্বন করে বাৎসল্যরসের বাংলা পদ প্রথম রচনা করেছিলেন। যশোদা কৃষ্ণকে যতই স্নেহ করুন না কেন, কবিরা সেই স্নেহকে যতই মানবিক রূপ দেবার জন্য প্রয়াস করুন না কেন, আমরা সম্পূর্ণ ভুলতে পারি না যে কৃষ্ণ সংসার-জগতের কেউ নন। তাঁর ঐশ্বর্যরূপ বারবার ভক্তের নিকট আত্মপ্রকাশ করে। তাই যশোদার বাৎসল্যে একটু ফাঁক থেকে যায়,— সেটা মানব-জননী ও ভগবানের মধ্যেকার ব্যবধান। কিন্তু শচীমাতার গৌরাঙ্গের জন্য যে স্নেহের ব্যাকুলতা তা পরিপূর্ণরূপে মানবিক এবং অতি সহজেই তা আমাদের অন্তর গভীরভাবে স্পর্শ করে। পুত্র গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হওয়ায় মায়ের মনের যে বেদনা তা প্রায় পাঁচশত বৎসর যাবৎ বাঙালীর বাৎসল্যভাবনাকে করুণ রসে সিক্ত করছে। এই বেদনাকে কাব্যে রূপায়িত করেছেন বাসুদেব, এক্ষেত্রে তিনিই পথিকৃৎ। বাৎসল্যের পরবর্তী কবিরা তাঁর দ্বারা বিশেষরূপে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বাংলা পদাবলী সাহিত্যে বাৎসল্যরস মর্যাদা পেয়েছে শচীমাতার বিয়োগান্ত স্নেহের বাস্তব দৃষ্টান্ত থেকেই।

চৈতন্যের লীলাসঙ্গী ছিলেন বাসুদেব। তিনি গৌরাঙ্গের সমগ্র জীবনের প্রধান ঘটনাবলীকে বিষয়বস্তু করে পদ রচনা করেছেন। তাঁর গৌরাঙ্গবিষয়ক পদাবলী সম্বন্ধে যথার্থই বলা হয়েছে :

বাসু ঘোষ ঠাকুরের বিচিত্র বর্ণন।
শুনিতেই যুড়ায় শ্রোতার কর্ণ মন ॥
গৌরাঙ্গের জন্ম আদি যত যত লীলা।
বিস্তারি অশীতি পদে সকল বর্ণিলা ॥
কীর্তনের আরম্ভে রসের অনুসারে।
গৌরচন্দ্র সেই পদ গাও সমাদরে।[৩৬]

বাসুদেব বাৎসল্যরসের এমন কতকগুলি অন্তরঙ্গ। বাস্তব চিত্র এঁকেছেন যা প্রথাসিদ্ধ কৃষ্ণলীলার পদে অনুপস্থিত। মাতা পুত্রের এমনি একটি কৌতুক-ক্রীড়ার ছবি—

শচীর আঙ্গিনায় নাচে বিশ্বম্ভর রায়।
হাসি হাসি ফিরি ফিরি মায়েরে লুকায়॥
বয়ানে বসন দিয়া বোলে লুকাইনু॥
শচী কোলে বিশ্বম্ভর আমি না হেরিনু॥
মায়ের অঞ্চল ধরি চঞ্চল-চরণে।
নাচিয়া নাচিয়া যায় খঞ্জন-গমনে॥
বাসুদেব ঘোষে কহে অপরূপ শোভা।
শিশুরূপে দেখি হয় জগ-মন-লোভা॥[৩৭]

নিমাই আমাদেরই ঘরের নিত্যপরিচিত দুরন্ত শিশু এবং শচী বাঙালী ঘরের মমতাময়ী মা:

মায়ের অঞ্চল ধরি শিশু গৌরহরি।
হাঁটি হাঁটি পায় পায় যায় গুড়ি গুড়ি।[৩৮]

কখনও গোরা মা'র হাত ধরে দ্রুত হাঁটার চেষ্ট করেন, কখনও 'ঠেকার' দেখিয়ে পড়ে যান; আবার কখনও "আখুটি করিয়া গোরা ভূমে দেয় গড়ি।" শচী তাড়াতাড়ি ছেলেকে কোলে তুলে গায়ে হাত বুলিয়ে দেন, ব্যথা পেয়েছে মনে করে 'আহা' বলে ছেলেকে সান্ত্বনা দেন এবং "চুম্বন দেয় বদন কমলে।"

বাসুদেব অবশ্য ভাগবত-বর্ণিত বাৎসল্যের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করতে পারেননি। নিমাই যখন "চাঁদ দে মা বলি শিশু কাঁদে উভরায়" তখন কৃষ্ণের চাঁদের জন্য এমনি বায়নার কথা মনে পড়ে। শচী যখন দেখলেন চাঁদের জন্য নিমাই "কাঁদিয়া ধুলায় পড়ে হাতে ছিঁড়ে চুল" তখন ঘর থেকে রাধা-কৃষ্ণের ছবি এনে ছেলের হাতে দিলেন তিনি। আর,

চিত্র পাঞা গোরাচাঁদের মনে বড় সুখ।
বাসু কহে পটে পহু হেরে নিজ মুখ॥[৩৯]

কবি এখানে বাস্তবতার পথ ত্যাগ করে অলৌকিকের আভাস দিয়েছেন।

যশোদা কৃষ্ণ সম্বন্ধে বলেছেন,

দামালিয়া যাদু মোর না মানে আপন পর
ভালমন্দ নাহিক গেয়ান।[৪০]

এর মধ্যে আমরা শচীমাতার দুরন্ত পুত্রকেই দেখতে পাই। আবার শাস্তি পেয়ে ক্ষুব্ধ কৃষ্ণ যখন বলছেন,

পরের ছেলে হয়ে পরের মায়ে মা বলিব
উদর পুরিয়ে আমি নবনী খাইব।[৪১]

এবং তিনি যে যশোদার নিজের ছেলে নন সেই কথা উল্লেখ করে আঘাত দেন—

আপনার মা বিনে বেদনা নাহি জানে।

কৃষ্ণ যদি চলে যান তাহলে যশোদার জীবন কেমন হবে?

নয়নের তারা তুমি তোমারে হারায়ে আমি
গাভী যেন বাছা হারাইল।[৪২]

বাসুদেবের কৃষ্ণ ও যশোদার পশ্চাতে প্রায়ই দেখতে পাই নিমাই ও শচীমাতাকে।

কবির বাৎসল্যরসের পদাবলীগুলিকে মোটামুটি দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এক, নিমাইয়ের বাল্যলীলা; দুই, গৃহত্যাগী নিমাইয়ের জন্যে শচীর বেদনা। প্রথম পর্যায়ের পদগুলির সঙ্গে কৃষ্ণলীলার কিছু কিছু সাদৃশ্য অবশ্যই আছে। কিন্তু গৌরাঙ্গের সন্ন্যাসমূলক পদগুলি একাধারে বাস্তব ও মৌলিক রচনা। এগুলি কবির উজ্জ্বলতম সৃষ্টি।

বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখে নিমাইয়ের গৃহত্যাগের কথা শুনে শচী—

আউদড়-কেশে ধায় বসন না রহে গায়
শুনিয়া বধুর মুখের কথা॥[৪৩]

আলুলায়িত কেশে স্খলিত বসনে ছুটে এলেই বা কি হবে? নিমাই নিরুদ্দেশ। তখন—

গৌরাঙ্গ গিয়াছে ছাড়ি বিষ্ণুপ্রিয়া আছে পড়ি
শচী কাঁদে বাহির দুয়ারে॥[৪৪]

এই দুটি ছত্রে শূন্য গৃহ এবং দু'টি নারী হৃদয়ের বেদনার্ত শূন্যতা মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে। অথচ কবি এর জন্য উপমা, অনুপ্রাস বা বাগ্‌বিস্তার কিছুই করেননি। সহজ কথায় হৃদয় স্পর্শ করাতেই বাসুদেবের কৃতিত্ব।

সারাদিন তো শচীদেবী নিমাইয়ের কথা ভেবে ভেবে আকুল। রাত্রিতেও ছেলের স্বপ্ন দেখেন। একদিন দেখলেন, নিমাই আঙিনায় দাঁড়িয়ে তাঁকে 'মা' বলে ডাকছেন; শচী ব্যাকুল হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই নিমাই পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে মা'র গলা জড়িয়ে কাঁদতে লাগলেন।

কিন্তু হায়, এমন মধুর স্বপ্ন ভেঙে গেল।

আইস মোর বাছা বলি হিয়ার মাঝারে তুলি
হেনকালে নিদ্রাভঙ্গ হৈল।
পুন না দেখিয়া তারে পরাণ কেমন করে
কান্দিয়া রজনী পোহাইল॥[৪৫]

যখন কল্পনার চোখে দেখেন, কৌপীন পরিহিত নিমাই দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করছেন তখন তা শচীদেবীর কাছে অসহ্য হয়ে ওঠে:

এ ডোর কৌপীন পার কি লাগিয়া দণ্ডধারী
ঘরে ঘরে খাবে ভিক্ষা মাগি।
জীয়ন্তে থাকিতে মায় ইহা নাকি সহা যায়
কার বোলে হইলা বৈরাগী॥[৪৬]

চৈতন্যদেব অনেকদিন পর নবদ্বীপে ফিরে এসেছেন। শচীর সঙ্গে দেখা হল। মা'র বেদনা অনুভব করে তিনি প্রবোধ দিতে লাগলেন। কিন্তু শচীর বেদনা পুত্রের উপদেশামৃতে দূর হল না :

প্রভু স্বতিবাণী কহে শচী নির্বচনে রহে
পড়ে জল নয়ন বহিয়া ॥[৪৭]

ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাসু ঘোষের রচনার যে মূল্যায়ন করেছেন তা আমরা সমর্থন করি। তিনি বলেছেন : 'এই পদগুলির বাস্তবতা ও ঐতিহাসিকতা অতিশয় মূল্যবান, অনেক সময় চৈতন্যজীবনীকাব্যের তথ্য অপেক্ষা এগুলি অধিকতর নির্ভরযোগ্য নহে। কিন্তু বাসু ঘোষের সরল রচনাভঙ্গী ও প্রাণের গভীর বেদনার এমন একটা আকর্ষণ আছে যে, ইহার মানবিক রূপটা আমাদের নিকট অধিকতর উপভোগ্য বোধ হয়। শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার অন্তর্বেদনার এমন মর্মস্পর্শী চিত্র অন্য কোথাও মিলিবে না। অথচ এই পদগুলির ভাষায় কিছুমাত্র রং-রূপের ঐশ্বর্য নাই ; অলংকারের উজ্জ্বলতা নাই, নিতান্ত সরল প্রাণের নিরাভরণ-উক্তি আমাদের মন জয় করিয়াছে। তাই মাঝে মাঝে মনে হয়, গভীর কথা গভীর বেদনার মতোই আভরণহীন। বাসু ঘোষের পদগুলি তাহার প্রধান সাক্ষী।"[৪৮]

বলরামদাস

চৈতন্য পরবর্তীকালের বৈষ্ণব পদকর্তাদের মধ্যে বলরামদাস অন্যতম। শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হয় না। কারণ গুণগত উৎকর্ষে তাঁর বেশ কিছু পদ চণ্ডীদাস-জ্ঞানদাস এবং গোবিন্দদাসের পদাবলীর প্রায় সমকক্ষ। ব্রজবুলিতেও তিনি অনেক পদ রচনা করেছেন, কিন্তু এদের অধিকাংশই দ্বিতীয় শ্রেণীর বলা যায়।

ব্রহ্মচারী অমরচৈতন্য বলরামদাস ভণিতাযুক্ত ২৪৩টি পদ সংগ্রহ করে প্রকাশ করেছেন। অনেক ভণিতায় অবশ্য বলরামদাস নামটির কিছু হেরফের আছে। যেমন 'দাস বলরাম', 'বসু বলরাম', 'দাস বলাই' ইত্যাদি। ভণিতার এই একাধিক রূপ জটিলতার সৃষ্টি করেছে। প্রশ্ন উঠেছে, বলরাম দাস ক'জন ? এরূপ জিজ্ঞাসা চণ্ডীদাস সম্বন্ধেও উঠেছে। জগদ্বন্ধু ভদ্র গৌরপদতরঙ্গিণীর ভূমিকায় উনিশজন বলরাম দাসের কথা উল্লেখ করেছেন। ডঃ সুকুমার সেন এই নামের পাঁচজন কবির কথা বলেছেন।[৪৯] ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন, বলরামদাস নামধেয় কবির সংখ্যা বোধ হয় দুই। একজন জাহ্নবাদেবীর শিষ্য ও নিত্যানন্দের সেবক, অন্যজন পরবর্তীকালের—সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে তিনি হয়ত জীবিত ছিলেন। নিত্যানন্দের পরিকর প্রাচীনতর বলরামই বাৎসল্যরসের পদাবলীর রচয়িতা, যাঁর 'বাৎসল্যরসের পদের সমকক্ষ কোন রচনা সমগ্র পদাবলী সাহিত্যে পাওয়া যায় না…।'[৫০] এই কবি কৃষ্ণনগরের নিকটবর্তী তাঁর দোগাছিয়া গ্রামের বাড়িতে বালগোপালের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সুতরাং বালগোপালের উপাসক হিসাবে তাঁর পক্ষে বাৎসল্যরসের পদ রচনা করা

স্বাভাবিক। অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলরামদাসের জন্ম সময় নির্দেশ করেছেন ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পূর্বে ; সতীশচন্দ্র রায় 'পদকল্পতরুতে' জন্ম সন উল্লেখ করেছেন আনুমানিক ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দ। কোনো অব্দের সমর্থনেই সুনির্দিষ্ট প্রমাণ নেই।

বৈষ্ণব পদকর্তারা সচরাচর যে সব প্রসঙ্গ নিয়ে লেখেন বলরামদাসও সেই সব বিষয় অবলম্বন করেছেন। চৈতন্য ও নিত্যানন্দের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ রচনা করেছেন ; কৃষ্ণলীলার বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে তাঁর অনেকগুলি পদ আছে। পূর্বরাগ, অভিসার, মিলন, বিরহ, রসোদ্গার, বাসকসজ্জা প্রভৃতি কয়েকটি প্রসঙ্গের উপব কিছু পদ আছে যা প্রকৃতই প্রথম শ্রেণীর। কিন্তু নৌকাবিলাস ও দানলীলাব পদগুলি বৈচিত্র্যহীন। তাঁর বাৎসল্যভাবের পদগুলিই বিশেষরূপে সমৃদ্ধ।

সাধারণত বলরামদাসের রচনা সহজ, সরল ও মর্মস্পর্শী। কোথাও কোথাও তিনি ছন্দ ও অলংকারের বৈচিত্র্য আনলেও তাঁর রচনাশৈলী মূলত প্রাঞ্জল ও আভরণ-বর্জিত। কিন্তু তাঁর যে ছন্দ ও অলংকাব প্রয়োগে দক্ষতা ছিল সে সম্বন্ধে ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন 'Like Govindadasa Kaviraj, Balaram was a skilled metrician and could write ornamental poetry.'[৫১]

চৈতন্যদেবের প্রশস্তিমূলক নিম্নোদ্ধৃত পদটিতে বাসুদেব ঘোষের মানুষ গৌরাঙ্গেব পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না। কৃষ্ণের মতো গৌরাঙ্গেব ঐশ্বর্যময় রূপই অধিকতর পরিস্ফুট। তাছাড়া কবিকে এখানে মনে হয় সচেতন শিল্পী, স্বতঃস্ফূর্ত আবেগের কিছু অভাব আছে।

তাল রঙ্গে নাচে মোব শচীব দুলাল।
সব অঙ্গে চন্দন দোলয়ে বনমাল॥
বিশাল হৃদয়ে গজমুকুতাব হার।
পদতলে তাল উঠে নূপুর ঝঙ্কার॥
ছন্দ বিছন্দে কত জাগে অঙ্গভঙ্গী।
নদীয় নগরে নাই এত বড় রঙ্গী॥[৫২] ইত্যাদি।

অন্যদিকে অন্তঃপুরবাসিনী রাধার গভীর মনোবেদনা এমন কবে প্রকাশ করেছেন যা পাঠকের হৃদয় ভাবাবেগে উদ্বেল করে :

দুখিনীর ব্যথিত বন্ধু শুন দুখের কথা।
কাহারে মরম কব কে জানিবে বেথা॥
কান্দিতে না পাই পাপ নন্দদীর তাপে।
আঁখির লোর দেখি কহে, কান্দে বন্ধুর ভাবে॥
বসনে মুছিয়া ধারা ঢাকি যদি গায়।
আন ছল করি গুরুজনেরে দেখায়॥
কালা নাম লৈতে না দেয় দারুণ শাশুড়ী।
কাল হার কাড়িয়া লয় কাল পাটের শাড়ী॥

দুখের উপরে বন্ধু আধিক আর দুখ।
দেখিতে না পাই বন্ধু তোমার চাঁদ মুখ॥
দেখা দিয়া যাইতে বন্ধু কিবা ধন লাগে।
না যায় নির্লজ্জ প্রাণ দাঁড়াই তোমার আগে॥[৫৩] ইত্যাদি।

কৃষ্ণ নিকটে নেই, রাধা তাঁর মধুর স্মৃতির দংশন-জ্বালায় কাতর। কৃষ্ণবিহীন গৃহে বাস করতে মনে হয় কে যেন শেল বিঁধছে তাঁর মনে।

এ ঘরে বসতি মোর লাগে যেন শলি।
ঝুরিয়া ঝুরিয়া কাঁদে পরাণ পুতলি॥
যতেক পিরিতি পিয়া করিয়াছে মোরে।
আখরে আখরে লেখা হিয়ার ভিতরে॥
হাসিয়া পাঁজর-কাটা যে বল্যাছে বাণী।
সোঙারিতে চিতে উঠে আগুনের খনি॥
নিরবধি বুকে থুঞা চাহি চোখে চোখে।
এ বড় দারুণ শেল ফুটি রৈল বুকে॥[৫৪]

রাধাকে পেয়েও কৃষ্ণ শঙ্কিত— কখন আবার তাঁকে হারাতে হয়:

হিয়ার ভিতর থুইতে নহে পরতীত।
হারাই হারাই হেন সদা করে চিত॥

বিশ্বের সকল প্রেমিকের অন্তরের ব্যাকুলতা কবি কৃষ্ণের উক্তির মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেছেন।

রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক বহু পদেই বলরামদাসের কবি-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যাবে। বাৎসল্যরস আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয়; সুতরাং অন্য প্রসঙ্গের পদাবলী নিয়ে বিস্তৃত পর্যালোচনার অবকাশ নেই।

বাসুদেব ঘোষ বাৎসল্যরসের পদ রচনা করেছেন চৈতন্যের বাল্যলীলা অবলম্বনে। বলরাম বৈষ্ণবীয় ধারানুযায়ী কৃষ্ণের বাল্যলীলাকেই বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

যশোদা সূতিকা গৃহে প্রথম যখন কৃষ্ণকে দেখতে পেলেন তখনও তিনি প্রকৃত ব্যাপার কি জানেন না। কৃষ্ণ তাঁর নিজের ছেলে মনে করে আনন্দে আত্মহারা হলেন। সবাইকে ডেকে ডেকে ছেলেকে দেখাচ্ছেন তিনি:

দেখসিয়া পুত্রের বদন।
নীল বরণ শশী উদয় করিল আসি
দেখি কর সফল জীবন।[৫৫]

'নীল বরণ শশী' পাঠকের মনে এক চমৎকার ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে।

বলরামদাসের বাৎসল্যের পদগুলি অধিকাংশই গোষ্ঠলীলা-সংক্রান্ত। ছেলেকে গোষ্ঠে পাঠিয়ে যশোদার নানা আশঙ্কা। যদি কোনো বিপদ-আপদ ঘটে! সন্তানের মঙ্গলকামনায় মায়ের মন সর্বদা যে ব্যাকুলতায় আলোড়িত হয় তারই সুন্দর ছবি এঁকেছেন বলরামদাস। গোষ্ঠলীলা ছাড়া কয়েকটি পদে ঘরোয়া ছবি পাওয়া যায়।

বাল্যলীলার একটি পদে আছে, সকালে ঘুম থেকে উঠে যশোদা দধি মন্থন করছেন। এদিকে কৃষ্ণ জেগে উঠে পালঙ্কের উপর বসেই মাকে ডেকে বলছেন, আমার খিদে পেয়েছে, কিছু খেতে দাও। তারপরেই—

মা মা বলিয়া তবে বাহিরে আইলা।
কি খাব বলিয়া কৃষ্ণ কাঁদিতে লাগিলা॥
দেহ দেহ ননী দেহ বলে বারম্বার।
ক্ষুধায় ব্যাকুল প্রাণ হইল আমার॥[৫৬]

আজও নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারে এমন ছবি বিরল নয়। কৃষ্ণ যশোদার উপর অভিমান করে লুকিয়ে আছেন। যশোদা তাকে খুঁজে না পেয়ে গোপ-বালকদের জিজ্ঞাসা করছেন। তোমরা দেখেছ তাকে? আর আক্ষেপ করছেন:

গোপাল না লৈনু কোলে ভুলিনু রোহিণী বোলে
সে কোপে কুপিত যাদুমণি।
কোপিত নয়ন কোণে চাইয়াছিল আমা পানে
আমি কি এমন হবে জানি।[৫৭]

শ্রীকৃষ্ণের যে সব লীলার কথা ভাগবতের দশম স্কন্ধের নবম অধ্যায়ে বিবৃত হয়েছে তার কোন কোনটি অবলম্বন করে বলরামদাস পদ রচনা করেছেন। কিন্তু সর্বত্র হুবহু অনুকরণ নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ ননী চুরির অপরাধে কৃষ্ণকে বাঁধবার সুপরিচিত ঘটনাটি উল্লেখ করা যেতে পারে। ভাগবতে আছে, কৃষ্ণ তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার সাহায্যে বন্ধন মুক্ত হলেন এবং প্রমাণ করলেন তিনি সাধারণ বালক নন, দেবাদিদেব ভগবান কৃষ্ণ।[৫৮] কৃষ্ণের দেবত্ব প্রমাণ করেই ভাগবতকার তুষ্ট; কিন্তু বলরামদাস এই ঘটনার সমাপ্তি দেখিয়েছেন অন্যভাবে। কৃষ্ণের অলৌকিকত্বের পরিবর্তে তিনি এক মানবিক চিত্র দিয়েছেন, যাকে মনে হয় বাস্তব এবং পরিচিত। কৃষ্ণ নন্দের নিকট কাঁদতে কাঁদতে বললেন:

না থাকিব তোমার ঘরে অপযশ দেহ মোরে
মা হইয়া বলে ননি-চোরা॥
ধরিয়া যুগল করে বাঁধিয়া ছান্দন-ডোরে
বাঁধে রাণী নবনী লাগিয়া।
আহীরী রমণী হাসে দাঁড়াইয়া চারি পাশে
হয় নয় দেখ সুধাইয়া॥
অন্যের ছাওয়াল যত তারা ননি খায় কত
মা হইয়া কেবা বান্ধে করে।
যে বল সে বল মোরে না থাকিব তোর ঘরে
এ না দুঃখ সহিতে না পারে॥[৫৯]

কৃষ্ণকে শান্ত করবার জন্য—

যশোদা আসিয়া কাছে গোপালের মুখ মুছে
অপরাধ ক্ষমা কর মোরে॥[৬০]

গোষ্ঠলীলার পদাবলীতে পুত্রের কল্যাণ ভাবনায় যশোদার উৎকণ্ঠা প্রাধান্য লাভ করেছে। ভাগবতের যশোদা কৃষ্ণের অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে সচেতন। বলরামদাসের যশোদা কৃষ্ণের দেবত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। তাই যশোদা আমাদেরই ঘরের মাতৃমূর্তি এবং কৃষ্ণ সাধারণ মানব-শিশু মাত্র।

কৃষ্ণ গোষ্ঠে যাবেন। যশোদার মনে নানা ভাবনা। তাই যাবার আগে—

হের আরে বলরাম হাত দে মায়ের মাথে
দেহ রাখিয়া প্রাণ দিলাম তোমার হাতে॥

যশোদার ভয়—

দণ্ডে দশবার খায় তার নাহি লেখা।
নবনী লোভিত গোপাল পাছে আইসে একা॥[৬১]

ক্ষুধায় কাতর হলে ননী খাবার লোভে যদি একা বাড়ী আসে তবে পথে নানা বিপদ ঘটতে পারে। সুতরাং বলরাম, তুমি লক্ষ্য রেখ।

যশোদা বলরামকে তাঁর দুর্ভাবনার কথা বলছেন :

বলরাম তুমি মোর গোপাল লৈয়া যাইছ।
যারে ঘুমে চিয়াইযে দুগ্ধ পিয়াইতে নারি।
তারে তুমি গোঠে সাজাইছ॥
কত জন্ম ভাগ্য করি আরাধিযা হর-গৌরী
পাইলাম এ দুখ পসরা।
কেমনে ধৈরজ ধরে মায়ে কি বলিতে পারে
বনে যাও এ দুগ্ধ কোঙরা॥
বসন ধরিয়া হাতে ফিরে গোপাল সাথে সাথে
দণ্ডে দণ্ডে দশবার খায়।
এ হেন দুধের বাছা বনেতে বিদায় দিয়া
কেমনে ধরিবে প্রাণ মায়॥[৬২]

ছেলেকে এত ভালোবাসেন বলেই তাকে ঘিরে এত বেদনা, এত উৎকণ্ঠা। তাই কৃষ্ণ যশোদার কাছে শুধু আনন্দের নন, "দুঃখেরও পসরা"। "বসন ধরিয়া হাতে, ফিরে গোপাল সাথে সাথে" মা ও সন্তানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের এক অপরূপ ঘরোয়া ছবি।

শুধু বলরামের উপর কৃষ্ণের দায়িত্ব দিয়ে যশোদা নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না। তিনি অন্য সঙ্গীদেরও ডেকে বলছেন :

শ্রীদাম সুদাম দাম শুন ওরে বলরাম
মিনতি করিয়ে তো সভারে।
বন কত অতি দূর নব তৃণ কুশাংকুর
গোপাল লইয়া না যাইহ দূরে॥

সখাগণ আগে পাছে গোপাল করিয়া মাঝে
ধীরে ধীরে করিহ গমন।
নব তৃণাঙ্কুর আগে রাঙ্গা পায় জানি লাগে
প্রবোধ না মানে মোর মন ॥

গোষ্ঠে যাবার আগে যশোদা বলে দিলেন ঃ

নিকটে গোধন রাখা মা বল্যা শিঙ্গায় ডাকা
ঘরে থাকি শুনি যেন রব ॥[৬৩]

শিঙ্গার মধ্য দিয়ে 'মা' ডাক শুনতে পেলে নিশ্চিন্ত হবেন যশোদা ॥

পদাবলী সাহিত্যে প্রতিবাৎসল্যের চিত্র খুব কমই পাওয়া যায়। যশোদাই কৃষ্ণকে ভালোবাসেন, কৃষ্ণের তাঁর প্রতি আকর্ষণের দৃষ্টান্ত বিরল। বলরামদাসের কৃষ্ণ আমাদেরই ঘরের বালক, তাই যশোদার প্রতি তাঁর ভালোবাসার প্রকাশ স্বাভাবিক। তাই গোষ্ঠ থেকে বাড়ী ফিরতে বিলম্ব হওয়ায় কৃষ্ণ সখাদের বলছেন ঃ

আজি মাঠে আমাদের বিলম্ব দেখিয়া।
হেন বুঝি কান্দে মায় পথ পানে চাইয়া ॥
বেলি অবসান হৈল চল যাই ঘরে।
মায়ে না দেখিয়া প্রাণ কেমন জানি করে ॥[৬৪]

বিলম্ব করে কৃষ্ণ যখন বাড়ী ফিরে এলেন তখন—

রতন প্রদীপ লৈয়া আইলা নন্দরাণী।
একদিকে দেখে রাঙ্গা চরণ দুখানি ॥
নেতের আঁচলে রাণী মোছে হাত পা।
তোমার মুখের নিছনি লৈয়া মরি যাউক মা ॥[৬৫]

প্রদীপের আলোয় যশোদা খুঁটিয়ে দেখেন কৃষ্ণের কোমল দু'টি পায়ে বনের কাঁটা ফুটেছে কিনা। তারপর আঁচলে মুখ মুছিয়ে "চুম্ব দেয় মুখ-সুধাকরে।" তারপর—

ক্ষীর ননী ছেনা সর আনিয়া সে থরে থর
আগে দেই রামের বদনে।
পাছে কানাইয়ের মুখে দেয় রাণী মন সুখে
নিরখয়ে চাঁদমুখ পানে ॥[৬৬]

বলরাম দাসের কৃষ্ণ ঐশী শক্তির আবরণ থেকে মুক্ত। এর ফলে যশোদার বাৎসল্যও একান্ত স্বাভাবিক মনে হয়। কৃষ্ণকে মাতৃস্নেহ লোভাতুর চিরপরিচিত বালক হিসাবে সার্থক চিত্রণেই কবির কৃতিত্ব।

জ্ঞানদাস

ষোড়শ শতকের তিনজন প্রধান বৈষ্ণব কবি—বৃন্দাবনদাস, বলরামদাস ও জ্ঞানদাস ছিলেন নিত্যানন্দ অথবা তাঁর পত্নী জাহ্নবী দেবীর শিষ্য। বৃন্দাবনদাস

চৈতন্যের জীবনীকাব্য চৈতন্য ভাগবত রচনা করে ভক্ত কবি হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। বলরামদাস ও জ্ঞানদাস কৃষ্ণলীলা বর্ণনার কবি। বলরামদাস বাৎসল্যরসের উৎকৃষ্ট পদ রচনা করেছেন; জ্ঞানদাস কৃতিত্ব দেখিয়েছেন মধুর রসের পদাবলীতে।

জ্ঞানদাসের জীবন সম্বন্ধে সামান্য তথ্যই পাওয়া যায়। চৈতন্যচরিতামৃতে[৬৭] এবং নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নাকর'[৬৮] ও নরোত্তমবিলাসে[৬৯] জ্ঞানদাসের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সব উল্লেখ থেকে জানা যায় যে কবির জন্মস্থান ছিল বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কাঁদরা গ্রামে। সেখানে এখনও জ্ঞানদাস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মঠ বর্তমান। সুতরাং জন্মস্থান নিয়ে মতদ্বৈত নেই।

সমস্যা তাঁর আবির্ভাবের কাল নিয়ে। নরহরি চক্রবর্তীর উল্লেখ থেকে জানা যায় জ্ঞানদাস খেতরী ও কাটোয়ার বৈষ্ণব সমাবেশে যোগ দিয়েছিলেন এবং জাহ্নবী দেবীর সঙ্গে তীর্থ করতে বৃন্দাবন গিয়েছিলেন। নিত্যানন্দ সম্পর্কে যে তিনটি পদ তিনি রচনা করেছেন তাদের বিশ্লেষণ করে পণ্ডিতরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে কবি নিত্যানন্দকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এই সব তথ্য থেকে ধারণা করা যেতে পারে যে ১৫২০ থেকে ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দ কালখণ্ডের মধ্যে জ্ঞানদাস জীবিত ছিলেন। ডঃ সুকুমার সেনের মতে জ্ঞানদাসের জন্ম হয়েছিল আনুমানিক ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে।[৭০] ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের অভিমতও তাই।[৭১]

জ্ঞানদাস বাংলা এবং ব্রজবুলি এই উভয় ভাষাতেই পদ রচনা করেছেন। ব্রজবুলিতে রচিত পদের সংখ্যা শতাধিক। স্বভাবতঃই ব্রজবুলি অপেক্ষা বাংলা পদে জ্ঞানদাসের প্রতিভার পরিচয় অনেক বেশী স্পষ্ট। ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন: "With the exception of Govindadasa Kaviraja, Jnanadasa was the most careful writer of Brajabuli though there are a few poems where Brajabuli is greatly mixed up with Bengali."[৭২]

ব্রজবুলিতে পদ রচনায় দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় নিম্নলিখিত পদটিতে:

লহু লহু মুচকি হাসি চলি আওলি
পুন পুন হের সি ফেরি।
জনু রতিপতি সঙ্গে মিলন রঙ্গভূমে
ঐছন কয়ল পুছেরি॥[৭৩]

কাব্য রচনার প্রথম পর্বে জ্ঞানদাস বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও বসু রামানন্দের পদাবলীর দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। বিদ্যাপতির প্রভাব বিশেষ করে লক্ষ্য করা যায় তাঁর ব্রজবুলিতে রচিত পদাবলীতে। পরবর্তীকালে এই প্রভাব দূর হয়ে কবির নিজস্ব কাব্যপ্রতিভা প্রস্ফুটিত হলেও চণ্ডীদাসের রচনারীতির প্রভাব থেকে জ্ঞানদাস কখনও সম্পূর্ণ মুক্তি পাননি। চণ্ডীদাসের মতো তিনিও সহজ কথায় হৃদয়ের গভীরতম অনুভূতি প্রকাশ করেছেন। সরল গ্রাম্য ভাষাতেও মিলনের ব্যাকুলতা কেমন মর্মস্পর্শী হয়ে ফুটে উঠেছে "দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা" চরণটিতে। জ্ঞানদাসের রচনা থেকে এমনি অসংখ্য পদ বা পদাংশ উদ্ধার করা যেতে পারে।

জ্ঞানদাসের পদাবলীর ঐশ্বর্য পর্যালোচনা করতে গেলে যে বৈশিষ্ট্য প্রথমেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হল বিষয়-বৈচিত্র্য। তিনি কৃষ্ণ ও রাধার বাল্যলীলা, যশোদার বাৎসল্য, পূর্বরাগ, আক্ষেপানুরাগ, বাসকসজ্জা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, দান, নৌকাবিলাস প্রভৃতি বিষয়বস্তু অবলম্বন করে হৃদয়ের বিচিত্র অনুভূতি শতদল পুষ্পের মতো প্রকাশ করেছেন। এছাড়া কয়েকটি পদে তিনি চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দ প্রভুর প্রতি অন্তরের ভক্তি অর্ঘ নিবেদন করেছেন। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বলেছেন: "পূর্বরাগের পদে শ্রীচৈতন্য-পরবর্তী কবিগণের মধ্যে জ্ঞানদাস সর্বশ্রেষ্ঠ, একথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।"[৭৪]

একথা স্বীকার করেও বলা যায় যে, রাধাকৃষ্ণলীলার অন্যান্য বিভাগেও জ্ঞানদাসের উৎকৃষ্ট পদ পাওয়া যাবে। ভাষার সংযম, ছন্দের লালিত্য, ভাবের গভীরতা, অনুভূতির প্রাখর্য এবং রসের স্নিগ্ধ মাধুর্য জ্ঞানদাসের প্রথম শ্রেণীর পদগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য। জ্ঞানদাস রাধাকে নতুন রূপে উপস্থিত করেছেন। তাঁর পূর্ববর্তী কবিদের, বিশেষ করে চণ্ডীদাসের রাধা কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারা, তিনি আত্মবিস্মৃত হয়ে কৃষ্ণের জন্য যোগিনী। কিন্তু জ্ঞানদাসের রাধা প্রেমিকা হয়েও আত্মহারা নন। কৃষ্ণের জীবনে যে তাঁর বিশেষ ভূমিকা আছে সে সম্বন্ধে তিনি সচেতন। তিনি জানেন, কৃষ্ণেরও তাঁকে প্রয়োজন। কৃষ্ণের প্রেম এবং ব্যক্তিত্বের স্বরূপ উপলব্ধি করবার জন্য জ্ঞানদাসের রাধিকা উৎসুক। তাই তিনি কৃষ্ণের বেশ ধারণ করে দেখতে চান—

তোমার পীতধটি আমারে দেহ পরি।
উভ করি বাঁধ চূড়া আউলাইয়া কবরি।[৭৫]

এই কারণেই জ্ঞানদাসের রাধা বাঁশী বাজাবার কৌশল আয়ত্ত করতে চান। যে বাঁশীর আহ্বান তাঁকে উন্মাদ করে, সমাজ সংসার কুল মান সবকিছু ভুলিয়ে দেয়, তার মধ্যে কি জাদু আছে বুঝতে হবে। কৃষ্ণ বাঁশী শেখাতে শেখাতে এমন অবস্থা হল যখন—

এক রন্ধ্রে ফুঁক তবে দেয় রাধা কানু।
রাধাশ্যাম দুটি নাম বাজে ভিনু ভিনু॥[৭৬]

জ্ঞানদাসের এই বংশী শিক্ষার পরিকল্পনাটি পদাবলী সাহিত্যে অভিনব।

জ্ঞানদাসের রাধা প্রগলভাও। কৃষ্ণপ্রেমে গরবিনী রাধা তাঁর সৌভাগ্যের কথা সখীদের নিকট বিস্তারিত করে বলতে ভালবাসেন। কৃষ্ণকে আকৃষ্ট করবার জন্য চতুরতার আশ্রয় নিতেও তাঁর দ্বিধা নেই—

ছলে দরশায়ল উরজক ওর
আপনি নেহারি হেরল মোহে থোর॥[৭৭]

জ্ঞানদাস বাৎসল্যরসের পদও রচনা করেছিলেন সে কথা পূর্বে বলা হয়েছে। "যশোদার বাৎসল্যলীলা" নামক একটি পুঁথি আবিষ্কৃত হবার পর এই শ্রেণীর পদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় সমালোচকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। সুকুমার সেন এই

পুঁথির[৭৮] কুড়িটি পদ সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন : "অত্যন্ত বর্ণহীন।"[৭৯] বাৎসল্যরসের পদগুলিতে ভাব ও ভাষার এমন দৈন্য দেখা যায় যে লীলারসের কবি জ্ঞানদাসকে এদের রচনাকার বলে চিহ্নিত করা কঠিন। কেহ কেহ বলেন হয়ত জ্ঞানদাস নামধারী অন্য কোন কবি এই সব পদের রচয়িতা। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সংশয় সত্ত্বেও "যশোদার বাৎসল্যলীলা" এবং গোষ্ঠলীলার কয়েকটি পদ তাঁর সম্পাদিত জ্ঞানদাসের পদাবলীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[৮০]

ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাৎসল্যরসের পদগুলিতে সাহিত্যগুণের অভাবের জন্য জ্ঞানদাস এদের রচয়িতা বলে স্বীকার করেননি। বিশেষ করে 'যশোদার বাৎসল্যলীলা' পুঁথির অন্তর্গত পদে যে ভণিতা পাওয়া যায় তাতে সংশয় বৃদ্ধি পায়। তিনি দেখিয়েছেন যে, 'জ্ঞানদাস কন' এরূপ ভণিতা কবি নিজে ব্যবহার করতে পারেন না। কারণ 'কন' সম্মানবাচক ; কবির নিজেকে এরূপে সম্মানিত করা রীতিবিরুদ্ধ। সুতরাং 'যশোদার বাৎসল্যলীলা' অন্য কোন কবির রচনা ; তিনি প্রসিদ্ধ অগ্রজ কবির নাম যুক্ত করে নিজের রচনাকে রসিক সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে আগ্রহী ছিলেন। বাৎসল্যরসের পদাবলী আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয়। এইজন্য সাহিত্যগুণের স্বল্পতা সত্ত্বেও জ্ঞানদাসের এই শ্রেণীর পদ নিয়ে একটু আলোচনার প্রয়োজন আছে। অনেকে এগুলি জ্ঞানদাসের রচিত নয় সিদ্ধান্ত করলেও কয়েকটি কারণে এঁদের আলোচনার যোগ্য বলে মনে হয় :

১। দ্বিতীয় জ্ঞানদাসের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এখন পর্যন্ত কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

২। বাৎসল্যরসের পদগুলি হয়ত জ্ঞানদাসের শিক্ষানবিশী যুগের রচনা, তাই কাব্যগুণে সমৃদ্ধ নয়।

৩। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ভণিতার যুক্তি দেখিয়ে জ্ঞানদাসের রচনা নয় বলে যে সিদ্ধান্ত করেছেন তা 'যশোদার বাৎসল্যলীলা' সম্বন্ধে প্রযোজ্য হলেও গোষ্ঠলীলার সমান বর্ণহীন পদগুলি সম্বন্ধে নয়। সে সব পদে 'জ্ঞানদাস কহে' 'জ্ঞানদাসেতে বলে' প্রভৃতি প্রচলিত ধরনের ভণিতাই আছে।

যশোদার বাৎসল্যলীলা পালাপুঁথিতে কিন্তু সর্বত্র 'জ্ঞানদাস কন' ভণিতা নেই। ২, ১৫-১৮ সংখ্যক পদে 'জ্ঞানদাস বলে বা কহে' ইত্যাদি স্বাভাবিক ভণিতাই আছে।

সুতরাং একমাত্র ভণিতার যুক্তিতে এই পদগুলিকে অগ্রাহ্য করা চলে না।

৪। যশোদার বাৎসল্যলীলা হয়ত কোন বৃহৎ পালাগানের অংশ, তাই বিচ্ছিন্ন পদের গুণগুলি প্রস্ফুটিত হয়নি এবং কবি নিজেও তার জন্য সচেষ্ট ছিলেন না। পালাগানে কাহিনী প্রাধান্য লাভ করে সঙ্গীতের সহায়তায়, —কখনও বা অভিনয় যুক্ত হয়ে। তাছাড়া বর্ণনাত্মক পালাগানে কাব্যগুণ প্রকাশের সুযোগও সীমিত। জ্ঞান-দাসের নৌকাখণ্ডের পদগুলিও কাব্যগুণে উৎকৃষ্ট নয়।

কবি সহজ মানবিক বাৎসল্যরসের অনুভূতিকে প্রায়ই কৃষ্ণের দেবত্ব এবং ঐশ্বর্যের রূপ এনে ক্ষুণ্ণ করেছেন। একদিন প্রভাতে যশোদা কৃষ্ণকে কোলে করে ননী তৈরীর

জন্য দুগ্ধ মন্থন আরম্ভ করেছেন, তখন—

হেনকালে ধরে কৃষ্ণ মন্থনের ডারি।
ননী দে মা বল্যা কর পাতএ মুরারি।
জঞ্জাল না কর গোপাল খেল গিঞা নাছে।
হাণ্ডির ভিতরে এক কানা লাগা আছে॥
অসাধনে পান্যু তোমা মরি বালাই লঞা।
হাসিতে মিলায় শশী চাঁদ মুখ দিঞা॥[৮১]

কিন্তু এর পরেই কৃষ্ণের গিরিগোবর্ধন ধারণ এবং দেব দেবীদের কথা উত্থাপন করায় স্বাভাবিক বাৎসল্যের সুরটুকু হারিয়ে যায়।

পরবর্তী পদটি বাৎসল্যের সুন্দর পরিবেশ দিয়ে কবি আরম্ভ করেছেন। যশোদা পুত্রকে বাড়ীর বাইরে পাঠাতে অনিচ্ছুক। এখনও কৃষ্ণ শিশু, বড় হলে তাঁকে গোরু চরাতে পাঠাবেন। ব্রজপুরীর যত গোয়ালিনী আছে তারা কৃষ্ণের মতো রত্ন পেলে গলার "হার করে" নিয়ে যাবে। সুতরাং যশোদা পুত্রকে ভুতের ভয় দেখাচ্ছেন—

গোকুলের মাঝে এক হৈল্য মহাভয়।
আস্যাছে দারুণ হাঁউ লোকে জনে কয়॥
কৃষ্ণ কহে একথা শুনিলে কার ঠাঁঞি।
হাঁউ কেমন মা যশোদা আমি দেখি নাঞি॥
অবোধ ছাওয়াল মোর কি পুছিস মোকে।
বলবান হাঁউ এক ঝাউবনে থাকে॥[৮২]

গ্রাম্য রমণী সন্তানকে ভয় দেখিয়ে নিবৃত্ত করবার যে কৌশল অবলম্বন করে যশোদা ঠিক সেই পথ অবলম্বন করেছেন। এই পরিচিত চিত্রটিকে "বর্ণহীন" বলে বাতিল করা যায় না। কিন্তু এই সহজ সুন্দর সুরটি অকস্মাৎ ছিন্ন হয়ে যায় যখন শিশু কৃষ্ণ গর্ব করে বলেন, তিনি দৈত্য নিধন করেছেন; দৈত্যদের তুলনায় হাঁউ আর কী। বাৎসল্যরসের পদ লিখতে বসেও কবি ভুলতে পারেন না কৃষ্ণের ঐশ্বর্যের রূপ। তাই হৃদয় স্পর্শ করবার মতো বাৎসল্যরসের একটি স্নিগ্ধ পরিমণ্ডল সৃষ্টি হওয়া মাত্র কৃষ্ণের ঐশ্বর্যরূপ তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। মনে হয় কবি কৃষ্ণকে ভক্ত হিসাবে ভজন করতে অভ্যস্ত, তাঁকে বাৎসল্যের আবেগে একান্ত আপনার করে নিতে পারেন না।

সর্বত্রই কৃষ্ণের ঐশী ক্ষমতা বাৎসল্যরসকে ব্যাহত করেছে দেখা যায়। যশোদা বললেন, "না নাচিলে মোর ঠাঁঞি না পাবে নবনী।"[৮৩] কিন্তু কৃষ্ণ বলছেন, আমি ক্ষুধায় কাতর, নাচতে পারব না। তুমি যদি না দাও ব্রজবাসীদের ঘরে ঘরে যাব, মা বলে ডাকব বাড়ীর মেয়েদের, তাহলে আমার ননীর অভাব থাকবে না। যশোদা ঈর্ষায় "মুর্ছিত" হয়ে তৎক্ষণাৎ ঘরে যত ননী ছিল এনে দিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ তো সাধারণ শিশু নন; ঘরের সব ননী খেয়েও তাঁর ক্ষুধা মেটে না দেখে যশোদা অন্য বাড়ী থেকে ননী চেয়ে আনতে গেলেন। কিন্তু কৃষ্ণের মায়ায় কোথাও এক বিন্দু ননী পাওয়া গেল না। শূন্য হাতে বাড়ী ফিরে যশোদা দেখলেন, কৃষ্ণ বাড়ী নেই। যশোদা উন্মাদিনী,

উম্মাদনার মধ্যেও আছে ঈর্ষা, —এখন না জানি কৃষ্ণ কোন রমণীকে মা বলে ডাকছেন। সাত সংখ্যক পদটিতে পুত্রের জন্য যশোদার আর্তি অনেকটা স্বাভাবিক। এখানে কৃষ্ণ অনুপস্থিত বলে ঐশ্বর্যের চিত্র হৃদয়ের অনুভূতিকে পশ্চাৎপটে ঠেলে দিতে পারে নি।

বলরাম যশোদাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, আমি কৃষ্ণকে ফিরিয়ে আনব, তুমি অস্থির হয়ো না। বলরামের উদ্যোগে কৃষ্ণ বাড়ী ফিরে এলেন। কিন্তু আসবার পূর্বে কৃষ্ণ দেখালেন তাঁর ঐশী ক্ষমতার অনেক প্রমাণ। এই প্রসঙ্গে ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন, "বলরামের ভয়ে কৃষ্ণের যমুনা জল মধ্যে পাষাণ রূপ প্রাপ্তি—এই আখ্যান প্রচলিত পদাবলী বা শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্যে পাই নাই।'[৮৪] আঠারো সংখ্যক পদে অবশ্য ঐশ্বর্যের কোন লীলা নেই, সেখানে কবি এঁকেছেন যশোদার সঙ্গে কৃষ্ণের মিলনের ছবি। যশোদার অভিমানক্ষুব্ধ অভিযোগ— "কেমনে পরের মাকে মা বলিলে তুমি।" অন্যকে মা বলে ডাকলেও সে আমার মতো তোমাকে যত্ন করেনি, তাই "মলিন হয়েছে কেন চাঁদ মুখখানি॥"[৮৫]

যশোদার বাৎসল্যলীলায় বলরামকে যেরূপ প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে অন্য কোন কবির রচনায় তা পাওয়া যায় না। পালার ১০-১৭ পদে কৃষ্ণের সন্ধানরত বলরামের চরিত্রের খানিকটা পরিচয় পাওয়া যায়। বলরামকে প্রাধান্য দেওয়া জ্ঞানদাসের বাৎসল্যরসের পদাবলীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

এই পালার বাইরেও জ্ঞানদাস কয়েকটি বাৎসল্যরসের পদ রচনা করেছেন। সর্বাপেক্ষা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পদ রাধার প্রতি বাৎসল্যের প্রকাশ। রাধার চিরন্তনী প্রিয়ার রূপ বৈষ্ণব কবিদের আকৃষ্ট করেছে, কোনো কবি তাঁর জন্ম বা বাল্যলীলার কথা ভাবেননি। জ্ঞানদাস রাধার সেই উপেক্ষিত বাল্যলীলার কথা বলেছেন। তাঁর জন্মের পর প্রতিবেশিনীরা রাধার মা কীর্তিকাকে বলছে—

ও তোর বালিকা চান্দের কলিকা
দেখিয়া জুড়ায় আঁখি।
হেন মনে লয়ে সদাই হৃদয়ে
পসরা করিয়া রাখি॥[৮৬]

জ্ঞানদাস মায়ের হৃদয়ের গোপন বেদনার কথাও অনুভব করেছেন। মেয়ে যত সুন্দরী ও সুলক্ষণাই হোক, পুত্র সন্তানই অধিক কাম্য। তাই মেয়ে কোলে এলে মা একটু দুঃখিত হয়। কীর্তিকাকে প্রবোধ দিয়ে তাঁর বান্ধবীরা বলছেন, "দুহিতা বলিয়া দুখ না ভাবিহ।"[৮৭] দুঃখ করতে নিষেধ করা হল কেন? কারণ, এই কন্যা মহাপুরুষের প্রেয়সী হবে এবং বংশ উদ্ধার করবে। সেই ঐশ্বর্যভাবের পুনরুক্তি। বাঙালী মায়ের মনের বেদনাকে যথার্থ রূপে ব্যবহার করতে না পারায় কবি এক মৌলিক অনুভূতি সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যশোদার পালায় যেমন, এখানেও তেমনি ঐশ্বর্যবোধ বাৎসল্যরস ঘনীভূত হবার পরিপন্থী হয়েছে।

অন্যত্র কিছুক্ষণের জন্য রাধা অনুপস্থিত থেকে বাড়ী প্রত্যাবর্তন করবার পর কীর্তিকার মাতৃহৃদয়ের ব্যাকুলতা প্রকাশ করে জ্ঞানদাস বলেছেন—

প্রাণ নন্দিনী রাধা বিনোদিনী
কোথাগিয়াছিলা তুমি।
এ গোপ-নগরে প্রতি ঘরে ঘরে
খুঁজিয়া ব্যাকুল আমি॥
বিহান হইতে কাহার বাটীতে
কোথা গিয়াছিলা বল।
এ ক্ষীর মোদক চিনি কদলক
কে তোর আঁচরে দিল॥[৮৮]

এখানে অবশ্য ঐশ্বর্যবোধ মাতৃস্নেহের প্রকাশকে ক্ষুণ্ণ করেনি।

মা'র প্রশ্নের উত্তরে রাধিকা জানালেন, যশোদা তাঁকে বাড়ী ডেকে নিয়ে কৃষ্ণের বাম পাশে বসিয়ে—

এক পিঠে রহি তাঁহার আমার
রূপ নিরীক্ষণ করে॥[৮৯]

এখানে যশোদার রাধার প্রতি বাৎসল্যের পরিচয় পাওয়া যায় এবং রাধা-কৃষ্ণ দু'জনকে পাশাপাশি বসিয়ে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকার মধ্যে হয়ত একটি গোপন কামনার প্রতি ইঙ্গিতও আছে। হয়ত এই ইঙ্গিতের আভাস কীর্তিকার মনেও কবি দেখতে পান—

ঝিয়ের কাহিনী শুনি গোয়ালিনী
মুচকি মুচকি হাসে।[৯০]

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত জ্ঞানদাসের পদাবলীতে সাতটি গোষ্ঠলীলার পদ সংকলিত হয়েছে। বাৎসল্যরস এবং সখ্যরসের সামান্য পরিচয়ই এই পদগুলিতে পাওয়া যায়। শ্রীদাম ও অন্যান্য বন্ধুরা গোষ্ঠে যাবার জন্য কৃষ্ণকে ডাকতে এসে যশোদা তাঁকে পাঠাতে চান না। শিশুপুত্রকে দূরে যেতে দিতে মা'র মনে নানা আশংকা। তাই—

রাণী বলে কি বলিলি না পাঠাইব বনমালী
তোমরা সবাই যাও বনে।
বড় হইলে লালনে লইয়ে যেও কাননে
পাঠাইব তোমা সভা সনে॥[৯১]

গোষ্ঠলীলার কয়েকটি পদেও জ্ঞানদাস বলরামকে এনেছেন। কৃষ্ণের জন্য তাঁর স্নেহের প্রকাশও আছে— "না দেখিয়া ঘনশ্যাম প্রেমে ছল ছল দু' নয়ন।"

শেষ করবার পূর্বে একটি কথা বিশেষরূপে উল্লেখ করতে হয়। কৃষ্ণের জন্য দেবকীর স্নেহের প্রকাশের সুযোগ নেই বললেই চলে। জন্মের প্রায় সংগে সংগেই কৃষ্ণকে মা'র কাছ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়। তাই বৈষ্ণব পদকর্তারা দেবকীর বাৎসল্যের কথা বলেন নি। জ্ঞানদাস দেবকীর বাৎসল্যের কথা বলেছেন—

দেবকীরে বসুদেব কহয়ে বচন।

'দাও পুত্র' শুনি দেবী ভাসে দু'নয়ন ॥
দেবকী বলয়ে আগে প্রাণ ছাড়ি।
যাউক প্রাণ তবু পুত্র দিতে আমি নারি ॥

অনেক বোঝাবার পর দেবকী কৃষ্ণকে বসুদেবের কোলে তুলে দিলেন।

জ্ঞানদাস মূলত রাধা-কৃষ্ণ লীলার কবি। পূর্বরাগ, মিলন, বিরহ, রসোদ্গার প্রভৃতি পর্যায়ের পদেই তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ। মধুর রসই কবির নিকট শ্রেষ্ঠ রস; গোষ্ঠ বা বাৎসল্যলীলার অল্প কয়েকটি পদ তিনি রচনা করেছেন প্রথানুসারে, অন্তরের তাগিদে নয়। তাই তাঁর বাৎসল্যের পদগুলি মধুর রসের পদের মতো উৎকর্ষ লাভ করতে পারেনি।

রায়শেখর

চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাসের পর যেসব বৈষ্ণব কবিদের নাম স্মরণীয়, রায়-শেখর তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

বাংলার বৈষ্ণব পদকর্তাদের নাম নিয়ে যে সাধারণ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, রায়শেখরের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। শেখর, শশিশেখর, শেখর রায়, কবি শেখর রায়, দুঃখী শেখর প্রভৃতি বিভিন্ন ভণিতাযুক্ত পদগুলি রায়শেখরের রচনা বলে মনে করা হয়। তবে এর সমর্থনে নিশ্চিত প্রমাণ নেই।

এই সঙ্গে আরও একটি সমস্যার কথা উল্লেখ করতে হয়। বিদ্যাপতিও তাঁর অনেক পদের ভণিতায় 'কবিশেখর' নামটি ব্যবহার করেছেন। উভয় কবির রচিত ব্রজবুলি পদও পাওয়া যায় এবং এই পদগুলির মধ্যে যথেষ্ট মিল থাকায়, পার্থক্য নির্ণয় করা অনেক ক্ষেত্রে কঠিন হয়ে পড়ে। সমস্যাটিকে কঠিনতর করেছেন নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 'কবিশেখর' ভণিতাযুক্ত পদগুলি নির্বিচারে বিদ্যাপতির পদ সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করে। তবে এর সমাধানের পথ নির্দেশ করেছেন পদকল্পতরুর সম্পাদক সতীশচন্দ্র রায়। অভ্যন্তরীণ প্রমাণ উপস্থিত করে তিনি দেখিয়েছেন যে, বিদ্যাপতির পদে রাধা-কৃষ্ণের সেবক-সেবিকা, দাস-দাসী প্রভৃতির উল্লেখ নেই। কারণ দাস-দাসী, বিশেষ করে সখা ও সখী হিসাবে ভজনারীতি চৈতন্যোত্তর কালে প্রবর্তিত হয়। রূপ গোস্বামীই সর্বপ্রথম সখীভাবের সাধনা বা মঞ্জরী সাধনার ব্যাখ্যা করেন। চৈতন্য-পরবর্তী কবিদের মধ্যে সাধনার এই পদ্ধতি বিশেষ প্রিয় ছিল। তাঁদের রচনাতেও এর প্রতিফলন দেখা যায়। রায়শেখরও মঞ্জরীভাবের সাধক। তাঁর একটি পদে আছে, রাধা অভিসারে চলেছেন, রায়শেখর অন্তরঙ্গ সখী হিসাবে তাঁর অলঙ্কার ইত্যাদি বহন করে চলেছেন।

যতনহিঁ নিঃসরু নগর দুরন্তা।
শেখর অভরণ ভেল বহন্তা ॥[১২]

মিথিলার কবি বিদ্যাপতি এবং বাংলার কবি রায়শেখরের ব্যবহৃত ব্রজবুলি পর্যা-লোচনা করলেও দু'জন পৃথক পৃথক কবিকে চিহ্নিত করা যায়। বিদ্যাপতি ব্রজবুলিতে

শুদ্ধ মৈথিল শব্দের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। এছাড়া তাঁর ভাষা ব্যাকরণসিদ্ধ। কিন্তু বাঙালী কবি রায়শেখর শব্দের প্রয়োগে এবং ছন্দের ব্যবহারে তেমন শুদ্ধতা রক্ষা করতে পারেন নি। যদিও রায়শেখরের রচনার লালিত্যগুণে আপাতদৃষ্টিতে এই ত্রুটি ধরা পড়ে না এবং মনে হতে পারে বিদ্যাপতিরই রচনা। সন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে দেখলে পার্থক্য ধরা পড়ে এবং সংশয় থাকে না যে 'কবিশেখর' পৃথক ব্যক্তি।[৯৩] ডঃ অসিত-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই অভিমত সমর্থন করেন।[৯৪]

বিভিন্ন 'শেখর' ভণিতাযুক্ত বাঙালী পদকর্তাদের মধ্যে রায়শেখর কে, অথবা এই সবগুলি তাঁরই ভণিতা কিনা তা নির্ধারণ করা দুরূহ ব্যাপার। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এ সম্পর্কে বলেছেন: "দণ্ডাত্মিকা নামক পদ সংগ্রহে যে শেখরের ভণিতা আছে, তিনিই রায়শেখর, কারণ 'দণ্ডাত্মিকা' পদের সঙ্গে 'পদকল্পতরু' ধৃত রায়শেখর, শেখর ইত্যাদি ভণিতাযুক্ত পদের সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য আছে। সুতরাং 'দণ্ডাত্মিকা' পদাবলী ও 'পদকল্পতরু'র পাঠ মিলাইয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে— কবির যথার্থ নাম ছিল শেখর। রায়-নৃপ-কবি সমস্তই কবি নিজ নামের বিশেষণ হিসাবে ব্যবহার করিয়াছেন।'[৯৫]

জগদ্বন্ধু ভদ্র গৌরপদতরঙ্গিণীতে বলেছেন, রায়শেখরের প্রকৃত নাম শশিশেখর। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন নিত্যানন্দের বংশে, গোবিন্দদাস কবিরাজের কিছু পরে। জন্মস্থান বর্ধমান জেলার পড়ান গ্রামে। সতীশচন্দ্র রায় মনে করেন, ১৫০৪ শকে খেতুরীতে যে মহোৎসব হয় তার পূর্বেই রায়শেখরের মৃত্যু হয়েছিল। এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে তিনি নানা যুক্তি দেখিয়েছেন।[৯৬] দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন, ইনি প্রায় মহাপ্রভুর সমসাময়িক কবি।[৯৭] বিমানবিহারী মজুমদার রায়শেখরকে ষোড়শ শতকের কবি বলেছেন।[৯৮] তিনি আরও বলেছেন: "শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকারের ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুনন্দনের শিষ্য রায়শেখর গোবিন্দদাস কবিরাজের মতন অষ্টকালীয় নিত্যলীলার পদ লিখিয়াছেন। রায়শেখর শ্রীকৃষ্ণলীলার, বাল্যলীলা, গোষ্ঠ, পূর্বরাগ, অভিসার, মান, খণ্ডিতা, রসোদ্গার, আক্ষেপানুরাগ বিষয়ে পদ রচনা করিয়াছেন। ইনি ভণিতায় শেখর বা রায়শেখর লিখিতেন।"[৯৯]

যেসব তথ্য বর্তমানে পাওয়া যায়, তার সাহায্যে রায়শেখরের কাল ও ব্যক্তিজীবন সম্বন্ধে চূড়ান্তরূপে কিছু বলা চলে না। আমরা অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূল বক্তব্য স্বীকার করে নিতে পারি। সে বক্তব্য হল এই যে, রায়শেখর গোবিন্দদাসের পরবর্তী সময়কার সপ্তদশ শতকের কবি।[১০০]

পদাবলী সাহিত্যের নানা শাখায় রায়শেখর বিচরণ করেছেন। কৃষ্ণের বাল্য ও গোষ্ঠলীলা, পূর্বরাগ, অভিসার, মান, খণ্ডিতা, আক্ষেপানুরাগ প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর পদ পাওয়া যায়। গোবিন্দদাস কবিরাজের মতো দণ্ডাত্মিকা পদে তিনি রাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীয় নিত্যলীলার পদ রচনা করেছেন। এই সব পদে রাধা-কৃষ্ণের প্রতি দণ্ডের লীলা বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তীকালে এই পদগুলি রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পালাগান রচয়িতাদের প্রভাবান্বিত করেছে।

রায়শেখর যে প্রকৃত কবি-প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, তা নিম্নোদ্ধৃত ব্রজবুলিতে রচিত অভিসার পদটি থেকে উপলব্ধি করা যেতে পারে।

ঝরঝর বরিখে সঘনে জল-ধারা।
দশ দিশ সবহুঁ ভেল আন্ধিয়ারা॥
এ সখি কীয়ে করব পরকার।
অব জনি বাধয়ে হরি অভিসার॥
অন্তরে শ্যাম চন্দ পরকাশ।
মনহি মনোভব লেই নিজ পাশ॥
কৈছনে সংকেতে বঞ্চয়ে কান।
সোঙবিতে জর জর অথির পরাণ॥
ঝলকই দামিনি দহন সমান।
ঝনঝন শব্দ কুলিশ ঝনঝন॥
ঘর-মাহা রহইতে রহই না পার।
কি করব এসব বিঘিনি বিথার॥[১০১] ইত্যাদি

কবির অন্যান্য বিষয়ক পদের পরিচয় নেবার এখানে প্রয়োজন নেই। বাৎসল্য রসের প্রকাশ তাঁর রচনায় কিভাবে কতটা হয়েছে তা এখন দেখা যেতে পারে।

পুরনো বিষয়, বাঁধা ছক,— সুতরাং বিশেষ প্রতিভাশালী না হলে শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-লীলা বর্ণনাকে চিত্তাকর্ষক করে তোলা যে কোনো কবির পক্ষেই কঠিন। রায়শেখরের অনেক পদই গতানুগতিক ; চমৎকৃতি— যা রসের মূলকথা— তার অভাব অনুভূত হয়।

যশোদা কঠোর তপস্যা করে কৃষ্ণের মতো পুত্র লাভ করেছেন। পুত্রের 'সুধানন' দেখে তাঁর মনে 'প্রেম-সুখ-সিন্ধু' উথলে ওঠে।

জশোমতি বোলত ভাষ।
এ বিধু বদনে মা বোল বোলইতে
ষুনইতে শ্রবণ উল্লাস॥[১০২]

ছেলের মুখে 'মা' ডাক শুনতে পাবার আকাঙ্ক্ষা খুবই স্বাভাবিক। যশোদা এখানে আমাদের আপনজন।

তারপর কৃষ্ণ কথা বলতে শিখেছেন। তাঁর মুখের কথা শুনে যশোদা আনন্দে আত্মহারা। সেই আনন্দে কৃষ্ণকে তিনি সুস্বাদু খাদ্য খাওয়াতে লাগলেন।

আধ আধ বালক সত বোল বোলত
জননি বদন তঁহি চাই।
মাখন ক্ষির স্বর উদর পুরী দেহ
নবনিত খাই তথাই॥[১০৩]

কৃষ্ণের গোষ্ঠে যাবার বয়স হয়েছে। নানা আশঙ্কায় যশোদার হৃদয় পূর্ণ। দৈবানুগ্রহে পুত্র পেয়েছি, তবে আর ভয় কেন? যশোদা নিজেকে একবার প্রবোধ দেন, আবার বিচ্ছেদ ভাবনায় কাতর হয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়েন—

নে রে রাম ধর বাড়াইয়া কর
গোপালে সোপিঞে দি ॥
রাম করে ধরি জশোদা সুন্দরি
সোপিছে যাদব রায়।
নয়নের জল করে ছল ছল
বসন তিতিয়ে জায়।
রাম করে হরি সমর্পণ করি
জশোদা মুরছা হইল।[১০৪]

যশোদার ভয় কিছুতেই দূরে হয় না—

বলরামেব কর লৈয়া, গোপালেরে সমর্পিয়া,
পুন পুন বলে নন্দরাণী।
এই নিবেদন তোরে, না যাবে কালিন্দী তীরে,
সাবধান মোর নীলমণি।
রামেরে লইয়া কোরে, সিঞ্চিয়ে আঁখির নীরে,
পুন পুন চুম্বে মুখখানি।[১০৫]

কৃষ্ণ এখনও বালক, পথঘাট চেনেন না, এখনই কেন তাঁকে গোষ্ঠে পাঠানো হবে ?

ঘব পর যে না জানে সে জনা চলিল বনে
এ তাপ কেমনে সহে মায় ॥
আমার জীবন দুলালিযা।
কিবা ঘরে নাহি ধন কেনে বা যাইবে বন
রাখালে রাখিবে ধেনু লৈযা ॥
আমার নয়নের তারা হাপুতীর পুত তোরা
আঞ্চল করিয়া যাবি মোবে।
দুধের ছাওয়াল হৈয়া বনে যাবে ধেনু লৈয়া
কি দেখি রহিব যাই ঘরে।
ননী জিনি তনুখানি আতপে মিলায় জানি
সে ভয়ে সঘন প্রাণ কাঁপে।
... ...
শিরীষ-কুসুম-দল জিনিয়া-চরণ তল
কেমনে ধাইবে হেন পায় ॥[১০৬]

কিন্তু গোচারণ যে কুলের ধর্ম, গোষ্ঠে যেতেই হবে। তাই—

ধরিয়া মায়ের কর কহে রাম দামোদর
শুভ কাজে না করিহ দুখ।
আমার কুলের ধর্ম গোচারণ নিজ কর্ম
করিতে পাই যে বড় সুখ ॥[১০৭]

গোষ্ঠে যাওয়া যখন বন্ধ করা গেল না, তখন যশোদা কৃষ্ণ ও বলরামকে 'রক্ষামন্ত্র' দিলেন তাদের নিরাপত্তার জন্য। এমনকি বেদে ডেকে 'ঝাড়ফুঁক'ও করিয়ে নিলেন।

ডাকিনী শাকিনী ভয়ে ধড় প্রাণ নাহি রহে
বান্দিয়া সাধিয়া আনি মায়।
অক্ষয়-অমর-তনু হয় যেন রাম কানু
এমতি বান্ধিয়া দিবে গায়॥[১০৮]

যশোদা এখানে এক সংস্কারাচ্ছন্ন স্নেহান্ধ গ্রাম্য রমণী হিসাবে আমাদের নিকট উপস্থিত হন।

রায়শেখর বাৎসল্যের যেসব চিত্র এঁকেছেন সেগুলি আমাদের নিকট পরিচিত। অন্যান্য পদকর্তারাও অনেকটা এই ভাবেই বাৎসল্য ভাবনাকে প্রকাশ করেছেন। রায়-শেখরের মধ্যে ভাবগত অনুসরণের উৎসাহ কম দেখা যায়। তাঁর বৈশিষ্ট্য রাধার প্রতি যশোদার স্নেহের চিত্রণে। কৃষ্ণ গোষ্ঠে চলে গেছেন, গৃহ শূন্য, যশোদার মন উদাস। মনের এই অবস্থায় রাধার প্রতি তাঁর স্নেহের সঞ্চার হল। কৃষ্ণ যে রাধার প্রতি আকৃষ্ট তার ইঙ্গিত তিনি আগেই পেয়েছেন। এটাও রাধার প্রতি তাঁর আকর্ষণের অন্যতম কারণ।

কানুরে পাঠাইয়া বনে যশোদা বিষাদ মনে
আসিয়া রাইরে করে কোরে।
দুখে আউলাইছে গা মুখে না নিঃসরে রা
বসন ভিজিয়া গেল লোরে॥
গদগদ-স্বরে রাণী কহয়ে বিষাদ-বাণী
ধরিয়া রাধার দুটি করে।
কীর্তিদা সমান হেন আমারে জানিবা তেন
সে ঘর এ ঘর সব তোরে॥
কি আর করিব সাধ সকলে পড়িল বাদ
দিনেক রাখিতে নারি তোমা।
এমনি বিষম লোক জীয়ন্তে পাড়য়ে পোক
তিলেক নাহিক কারু ক্ষেমা।
বিবিধ মোদক আনি রাইয়ের আঁচলে রাণী
দিলা কত যতন করিয়া।
ফুকার করিয়া কান্দে হিয়া থির নাহি বান্ধে
ধারা বহে মুখ বুক বাইয়া॥[১০৯]

রাধার প্রতি যশোদার এমন স্নেহের পরিচয় পাওয়া যায় জ্ঞানদাসের রচনায়—

রাধিকারে লয়ে কোরে রাণীর অতি সুখ।
মন সাধে চায়্যা রৈল রাধার চাঁদমুখ॥
প্রতি অঙ্গে হাত দিয়া অনিমেখে রাণী।

এমন সোনার বাছা মুই যাই নিছনি ॥
ভাসায়ে আনন্দে রাণী রাধা কোলে লয়ে।
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দেই বদন কমলে ॥[১১০]

কৃষ্ণের বয়স বাড়লেও যশোদা তাঁকে শিশুর মতোই দেখেন। রাধা এবং কৃষ্ণ দু'-জনেই তাঁর স্নেহের পাত্র। তাঁদের বিলাসলীলা তাঁর চোখে পড়ে না, তাঁদের বিলাস-লীলাকে বালক-বালিকার খেলা হিসাবেই দেখেন যশোদা। কৃষ্ণ সারারাত বিলাস-কুঞ্জে অনিদ্রায় থেকে প্রত্যূষে বাড়ী ফিরে ঘুমিয়ে পড়েন, উঠতে দেরী হয়। সখারা গোষ্ঠে যাবার জন্য ডাকতে আসে। যশোদা তখন যান ছেলের ঘুম ভাঙ্গাতে। সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠবার পর শরীর সজীব দেখাবার পরিবর্তে মনে হয় কত ক্লান্ত। স্নেহাতুর যশোদা সম্ভোগচিহ্নগুলির অন্য ব্যাখ্যা দেন। এমনকি, রাত্রির অন্ধকারে রাধা-কৃষ্ণের পরিধেয় বস্ত্র যে পরিবর্তিত হয়ে গেছে তার প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করতে চান না যশোদা।

রামের বসন পরিলা কখন
কে নিল বসন তোর।
রাতা উতপল নয়ন-যুগল
কি লাগি দেখিয়ে ঘোর ॥
নীল-মলিন আতপে মলিন
কেন বা এমন দেহ।
উনমত হৈয়া বুলহ ধাইয়া
কুদিঠি দিলে বা কেহ ॥
হিয়ার উপর কণ্টকে আঁচড়
গিয়াছিলা কোন বনে।
আমার কপালে না জানি কি ফলে
পরানে মরিব মেনে ॥[১১১]

বিলাসলীলার ক্লান্ত পুত্রকে অসুস্থ মনে করে এবং কেউ অশুভ দৃষ্টি দিয়েছে ভেবে, যশোদা দেবতার নিকট গেলেন পুজা দিতে।

রায়শেখর প্রথম শ্রেণীর কবি না হলেও বাৎসল্যরসের পদকর্তা হিসাবে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। অলংকারবিহীন শাদামাঠা ভাষায় তিনি বাৎসল্যরসের অনুভূতি সহজরূপে প্রকাশ করেছেন। তাঁর যশোদা স্নেহান্ধ রমণী। কৃষ্ণের ঐশ্বর্যরূপ যশোদাকে আকৃষ্ট করেনি। রায়শেখরের বাৎসল্য পার্থিব, অলৌকিক নয়।

উপরোক্ত পাঁচজন কবি ছাড়া আমাদের আলোচ্য কালখণ্ডের মধ্যে আর যাঁরা বাৎসল্য রসের কিছু কিছু পদ রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গোবিন্দদাস, ঘনরামদাস, উদ্ধবদাস, যদুনন্দন দাস, বংশীবদন প্রভৃতি। অবশ্য বিমানবিহারী মজুমদার মনে করেন, গোবিন্দদাস নামাঙ্কিত বাৎসল্যরসের অধিকাংশ পদই খ্যাতনামা পদকর্তা গোবিন্দদাস কবিরাজের কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

হিন্দী

কৃষ্ণদাস

কুম্ভনদাস, সুরদাস, পরমানন্দ দাস ও কৃষ্ণদাস,— অষ্টছাপের এই চারজন সাধক কবি বল্লভাচার্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। কুম্ভনদাসই দীক্ষা নেন সকলের আগে। তিনি অষ্টছাপের বিশিষ্ট কবি। কিন্তু তাঁর জীবন সম্বন্ধে প্রামাণিক তথ্য বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। ডঃ দীনদয়ালু গুপ্ত বলেছেন,— কিছু কিছু পদে কুম্ভনদাস তাঁর গুরু এবং গুরুর পরিবারবর্গের পরিচিতি দিয়েছেন, কিন্তু নিজের সম্বন্ধে কোথাও কিছু লিখে যাননি।[১১২]

হরিরায়জী রচিত চৌরাসী বৈষ্ণব কী বার্তা থেকে তাঁর সম্বন্ধে দু'একটি-কথা জানা যায়। জানা যায়, ব্রজভূমির গোবর্ধন পর্বতের নিকটবর্তী জমুনাবতো গ্রামে তিনি বাস করতেন। পরাসোলী চন্দ্র সরোবরের কাছে তাঁর পৈত্রিক কিছু জমি ছিল। এই জমি দেখাশুনাও করতেন কুম্ভনদাস। মাঝে মাঝে যেতেন শ্রীনাথজীর মন্দিরে কীর্তন গাইতে। কবির জন্ম 'গোরবা' ক্ষত্রিয় কুলে।[১১৩] মাতা-পিতার কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। এই প্রসঙ্গে প্রভুদয়াল মীতল বলেছেন : "ইন বার্তাওঁ মেঁ [চৌরাসী বৈষ্ণব কী বার্তা এবং অষ্ট সখান কী বার্তা] উনকে নিবাস স্থান ঔর উনকী জাতি কা তো উল্লেখ হুয়া হৈ, কিন্তু উনকে পূর্বজ কুটুম্বী এবং মাতা-পিতা কা কোঈ বিবরণ নহীঁ দিয়া গয়া হৈ।"[১১৪]

আমরা আরও জানতে পারি যে, কুম্ভনদাসের প্রথম জীবন কেটেছে তাঁর ধর্মপ্রাণ পিতৃব্য ধর্মদাসের সাহচর্যে।[১১৫] অল্প বয়সেই তিনি কীর্তনে পারদর্শিতা লাভ করেন, তাই দীক্ষা নেবার পর বল্লভাচার্য তাঁকে শ্রীনাথজীর মন্দিরে কীর্তনসেবার ভার দেন। কুম্ভনদাস নিজে কতকগুলি মধুর পদ রচনা করে গান করতেন। তাঁর কীর্তনের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল দূরে দূরান্তরে। স্বামী হরিদাসের মতো সাধকও তাঁর মধুবর্ষী কীর্তন শুনতে আসতেন।[১১৬]

সম্রাট আকবরও নাকি কীর্তন শোনার জন্য একবার তাঁকে দিল্লীতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কুম্ভনদাস এই আমন্ত্রণ পেয়ে উল্লসিত হননি। কারণ দিল্লী গেলে কৃষ্ণের সেবায় ছেদ পড়বে। শ্রীনাথজীর বিচ্ছেদ-বেদনা সইতে হবে। তাই আকবর যখন গাইতে অনুরোধ করলেন তখন কবি শোনালেন—

ভক্তন কো ক্যা সীকরী সোঁ কাম।
আবত জাত পন্হৈয়াঁ টূটী বিসরি গয়ো হরিনাম ॥
জাকো মুখ দেখী অঘ লাঘে তাকো করন পরী পরনাম।
কুম্ভনদাস লাল গিরধর বিন য়হ সব ঝুঠো ধাম ॥[১১৭]

অর্থাৎ, ভক্তের সোনার হারে কি প্রয়োজন ? আসতে যেতে জুতো ক্ষয়ে গেল, হরি

নাম ভুলে গেলাম। যার মুখ দেখলে পাপ হয় তাকেও প্রণাম করতে হয়। কুম্ভনদাস বলেন, গিরিধারী ছাড়া পৃথিবীতে সব মিথ্যা।

কুম্ভনদাসের জন্ম-মৃত্যুর তারিখ জানা যায় না। শুধু কয়েকটি প্রাসঙ্গিক ঘটনা থেকে তাঁর জীবিতকাল অনুমান করা যেতে পারে। বল্লভাচার্য শ্রীনাথজীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন ১৫৪৯ বিক্রমাব্দে বা ১৪৯১ খ্রীস্টাব্দে। গোবর্ধননাথজীর ৱার্তা থেকে এই তথ্য পাওয়া যায়। ঐ সময় কুম্ভনদাস দীক্ষা গ্রহণ করেন। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, ১৪৯১ খ্রীস্টাব্দে কবি অন্তত নবযুবক ছিলেন। তাঁর মত্যুর সময় সম্বন্ধে এই বক্তব্যটি যথেষ্ট আলোকপাত করে: "পরমানন্দদাসজী [অষ্টছাপের কবি] কা নিধনকাল সম্বৎ ১৬৪০ বি. মানা গয়া হৈ ঔর সূরদাসজী কা গোলোকবাস সম্বৎ ১৬৩৮-৩৯ বি. কে লগভগ নির্ধারিত কিয়া গয়া হৈ। অতঃ ইসসে স্পষ্ট অনুমান লগায়া জা সকতা হৈ কি কুম্ভনদাস জী কা নিধন কাল সম্বৎ ১৬৩৮ য়া ১৬৩৯ বি. হোগা। চৌরাসী ৱার্তা ঔর ৱল্লভ সম্প্রদায় মেঁ য়হ প্রচলিত হৈ কি কুম্ভনদাস কী আয়ু ১১৩ বর্ষ কী থী। সম্বৎ ১৬৩৮ য়া ১৬৩৯ বি. নিধন তিথি মাননে পর ইনকী জন্মতিথি সং ১৫২৫ য়া সং ১৫২৬ বি. আতি হৈ।"[১১৮] অর্থাৎ, পরমানন্দদাসের মৃত্যু ১৬৪০ বিক্রমাব্দে এবং সূরদাসের মৃত্যু ১৬৩৮-৩৯ বিক্রমাব্দের কাছাকাছি কোনো সময়ে হয় বলে মনে করা হয়। সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে, কুম্ভনদাসের মৃত্যুও ১৬৩৮ বা ১৬৩৯ বিক্রমাব্দে হয়েছিল। একটি প্রচলিত মত অনুসারে— যার সমর্থন চৌরাসী ৱার্তা ও বল্লভ সম্প্রদায়েও পাওয়া যায়— কুম্ভনদাস ১১৩ বৎসর জীবিত ছিলেন। যদি ১৬৩৮ বা ১৬৩৯ বিক্রমাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়ে থাকে, তাহলে প্রচলিত ধারণার ভিত্তিতে কুম্ভনদাসের জন্মসাল দাঁড়ায় ১৫২৫ বা ১৫২৬ বিক্রমাব্দ।

কুম্ভনদাসের পদাবলী যথেষ্ট সমাদৃত হলেও তাঁর জীবিতকালে সেগুলি গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়নি বলেই মনে হয়। সেজন্য তাঁর অনেক পদ হয়ত লুপ্ত হয়ে গেছে। কবির রচনায় মধুর রসের নিপুণ ও বিচিত্র প্রকাশ দেখা যায়। তবে বাৎসল্য রসের পদ রচনায়ও তিনি কম পারদর্শী নন। মধুর রসই হোক কি বাৎসল্য রসই হোক, মূল বিষয় এক— 'শ্রীকৃষ্ণ'। রামচন্দ্র শুক্ল তাই বলেছেন: "ৱিষয় ৱহী কৃষ্ণ কী বাললীলা ঔর প্রেমলীলা হৈ।"[১১৯] রাসলীলা প্রভৃতি নানা উৎসব কেন্দ্র করে কৃষ্ণলীলার টুকরো টুকরো বিচ্ছিন্ন ছবি এঁকেছেন কবি। সূরদাস কিংবা পরমানন্দদাসের পদে অনেকটা পালাগানের মতো যে পারম্পর্য লক্ষ্য করা যায়, কুম্ভনদাসের পদাবলীতে তা নেই। রাসোৎসবের একটি পদে কবি বলেছেন—

রাস মেঁ গোপাল লাল নাচত, মিলি ভামিনী।
অংস-অংস ভুজনি মেলি, মণ্ডল-মধি করত কেলি,
কনক-বেলি মনু তমাল স্যাম-সঙ্গ স্বামিনী॥[১২০]

অর্থাৎ, রাস উৎসবের নৃত্যে, সুন্দর গোপাল এবং ভামিনী এক সঙ্গে নাচছেন। নাচতে নাচতে কাঁধের উপর হাত রাখার জন্য মনে হয় যেন শ্যামল তমাল বৃক্ষে কনকলতা জড়িয়ে আছে। শুধু রাস নয়, কবি দানলীলা, কুঞ্জলীলা, বসন্তলীলা,

ঝুলনোৎসব প্রভৃতি উপলক্ষ করেও পদ রচনা করেছেন। তাছাড়া শুধু বসন্ত নয়, বৎসরের সব ঋতুর মধ্যেই তিনি আবিষ্কার করেছেন সৌন্দর্য এবং মধুরলীলার উপযোগী পরিবেশ। বর্ষার রূপ কবিকে মুগ্ধ করে। বৈষ্ণব কবিদের রচনায় বর্ষার সঙ্গে থাকে একটু বেদনার সুর। আশঙ্কা হয়, রাধার অভিসারে বেরোবার প্রয়াস ব্যর্থ করে দেবে। কুম্ভনদাসের মধ্যে কিন্তু সে আশঙ্কা নেই। রবীন্দ্রনাথের মতো তিনি বর্ষার বারিধারায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন।

রিমি-ঝিমি ৱরষত মেহ প্রীতম সঙ্গরী!
চলো সখী! ভীজত সুখ লাগেগো॥
তৈসেঈ বোলত চাতক, পিক, মোর।
তৈসেঈ গরজ মধুরী তৈসোঈ পৱন সীতল লাগেগো॥[১২১]

অর্থাৎ, রিম্ ঝিম্ করে বৃষ্টি পড়ছে। একদিকে যেমন চাতক, কোকিল ও ময়ূর ডাকছে, অন্যদিকে মেঘের মৃদু মধুর গর্জন। শীতল বাতাস বইছে। সখী চলো, এমন সময় প্রিয়তমের সঙ্গে বৃষ্টিতে ভিজতে খুব ভালো লাগবে।

কুম্ভনদাস শুধু বর্ষার রূপ দেখে মুগ্ধ হননি। তাঁর রাধা বর্ষাকে নিবিড়ভাবে ভালোবেসেছেন। এই ভালোবাসার প্রকাশ বারবার পাওয়া যায়। যেমন এখানে—

স্যাম! সুনু নিয়রেঁ আয়ৌ মেহু
ভীঁজেগী মেরী সুরঙ্গ চুনরী ওট পীতাম্বর দেহু॥
দামিনি তেঁ ডরপতি হোঁ মোহন নিকট আপুনী লেহু।[১২২]

অর্থাৎ, শ্যাম শোন, বর্ষা এসে গেছে; আমার সুন্দর রঙিন ওড়না ভিজে যাবে। তুমি তোমার হলুদ উড়ানি দিয়ে আমাকে ঢেকে দাও।

কবির মধুর রসের পদগুলি ভাষার স্বচ্ছতায় ও সৌকর্যে এবং বিষয়বৈচিত্র্যে হিন্দী কৃষ্ণকাব্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। রাধা-কৃষ্ণের সংলাপের মধ্যে তিনি যথেষ্ট নাটকীযতা সৃষ্টি করতে সক্ষম হওয়ায় পাঠকদের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।

কুম্ভনদাসের মধুররসের রচনাবলীর বিস্তৃত আলোচনার স্থান এখানে নেই। তাঁর বাৎসল্যরসের পদগুলিই আমাদের আলোচ্য বিষয়। এই বিভাগেও কুম্ভনদাস সার্থক কবি।

কৃষ্ণকে কোলে পেয়ে নন্দ, যশোদা এবং সকল ব্রজবাসী আনন্দে উচ্ছ্বল। কিন্তু যশোদার আনন্দের তুলনা নেই।

ফুলে আনন্দরাইজু, ফুলী জসুমতি মাই।
গোদ লিএ ফুলসতি বডী কমলনৈন সুখদাই॥[১২৩]

অর্থাৎ, পুত্র কোলে পেয়ে যশোদার গর্বের অন্ত নেই। তিনি কমলনয়ন কৃষ্ণকে কোলে নিয়ে আদর করছেন আর আনন্দে উৎফুল্ল হচ্ছেন।

কৃষ্ণকে পেয়ে যশোদা অন্য সব কাজের কথা বুঝি ভুলে গেছেন। ছেলেকে নিয়েই তাঁর দিন কেটে যায়। তাঁকে কোলে করা, দোলনায় দোলানো, আদর করা, খাওয়ানো—এসব করতেই সময় শেষ হয়।

রতন খচিত কঞ্চন কো পালনা, তা-মধি ঝুলত গিরিধরলাল।
জসুমতি হরষি ঝুলবাতি, গাবতি সুন্দর-গুণ দৈ-দৈ কর তাল॥
করি গুলগুলী হঁসাবতি হঁার কোঁ, কবহুঁক মুখ সোঁ চুম্বতি গাল।[১২৪]

কবি বলেছেন, রত্নখচিত মনোহর দোলনায় গিরিধারীলাল ঝুলছেন। যশোদা আনন্দিত হয়ে কৃষ্ণের গুণগান করছেন এবং দোলনা দোলার সঙ্গে সঙ্গে হাতে তাল দিচ্ছেন। কখনো সুড়সুড়ি দিয়ে হরিকে হাসাচ্ছেন, কখনো বা মুখ চুম্বন করছেন।

রত্নখচিত দোলনার কথা না থাকলে এটি আমাদেরই ঘরের ছবি হতে পারত। তবে যশোদার যে খাঁটি মায়ের প্রাণ তা সুস্পষ্টরূপেই অনুভব করা যায়। দোলনার কথা বারবার এসেছে কবির পদে। মায়ের হৃদয়দোলারই প্রতীক হয়ত।

কুম্ভনদাসের বাৎসল্যভাবনা নানা উৎসব কেন্দ্র করে প্রকাশ পায়। কৃষ্ণের জন্মের পর ষষ্ঠী-পূজার অনুষ্ঠানে কত সমারোহ। কত লোকের আনাগোনা, কত কলরব। তবু যশোদার অন্যদিকে মন নেই, ছেলের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে পরম সুখে মগ্ন তিনি— "নিরখি-নিরখি সুখ পাঈ॥"[১২৫]

দশহরার শুভদিনে কৃষ্ণ যবের অঙ্কুর ধারণ করেছেন; তাঁর কপালে কুমকুমের তিলক শোভা পাচ্ছে। পুত্রের কল্যাণ কামনায় যশোদা মঙ্গল আরতি করছেন, তাঁর সব বালাই দূর করবার জন্য দান করছেন মুক্তার হার।[১২৬]

এর পরে দেখা যায় গোপাল ও বলরামকে বসন-ভূষণ, তিলক প্রভৃতিতে সজ্জিত করে যশোদা তাঁদের হাতে রাখী বাঁধছেন।[১২৭] যশোদা রাখী বাঁধছেন পুত্রের মঙ্গল কামনায়—

রাখী বাঁধতি হৈ নন্দরাণী।
রত্নজটিত কী সুভগ বনী অতি মোহন কে মন মানী॥[১২৮]

অর্থাৎ, কল্যাণ কামনায় নন্দরাণী পুত্রের হাতে রত্নখচিত রাখী বেঁধে দিলেন, ব্রাহ্মণদের দক্ষিণা দিয়ে তুষ্ট করলেন এবং তাঁরা খুশি মনে আশীর্বাদ করে গেলেন কৃষ্ণকে।

আবার, কার্তিক মাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশীর-রাত্রির উৎসবেও যশোদা কৃষ্ণের মঙ্গল কামনায় নানা অনুষ্ঠান পালন করছেন দেখা যায়।[১২৯] যশোদার কাছে এইসব উৎসবের দিনগুলির নিজস্ব কোন মূল্য নেই; পুত্রের কল্যাণ কামনার সুযোগ এনে দেয় বলেই তাদের গুরুত্ব।

কৃষ্ণ বড় হয়েছেন। মা'র কোল ছেড়ে বাড়ীর প্রাঙ্গণে খেলা করেন, আর তা দেখে যশোদার মন আনন্দে পূর্ণ হয়ে যায়। কুম্ভনদাস বলেছেন—

ক্রীড়ত কাহ্ন কনক আঁগন মাঁহী।
নিজ-প্রতিবিম্ব বিলোকি, কিলক করি, ধাবত পকরন কোঁ পরছাঁহী॥
পকরি ন পাবত ভ্রমিত হোত জব, আবত-উলটি লাল তিহি ঠাঁহী।
'কুম্ভনদাস' প্রভু কী য়হ লীলা নিরখি জসোমতি হঁসি মুসিক্যাহী॥[১৩০]

অর্থাৎ, কৃষ্ণ সোনার মতো রৌদ্র ঝলমল আঙিনায় খেলা করছেন। খিলখিল

করে হাসতে হাসতে নিজের ছায়াকে ধরবার জন্য কৃষ্ণ ছুটোছুটি করছেন, কিন্তু ধরতে পারছেন না। তখন শ্রান্ত হয়ে আগের জায়গায় ফিরে আসছেন। কুম্ভনদাস বলেন, প্রভুর এই লীলা দেখে যশোদা মৃদু মৃদু হাসছেন।

কৃষ্ণের খেলা দেখে যশোদা নিজে আনন্দ পান ; সে আনন্দ ব্রজবাসী সবাই যাতে পেতে পারে সেজন্য তিনি উৎসুক। তাই তিনি কৃষ্ণকে বলছেন :

নন্দ কে লাল ! মন-হরণ সুন্দর স্যাম !
জাউঁ বলি-বলি অব কীজিএ কলেৱা ॥
বিৱিধ পকৱান, দধি, দুধ, মাঁখন, মিশ্রী,
পহরি লেউ বসন, কটি বাঁধি লেহু মেৱা ॥
বলরাম-সংগ মিলি জাউ খেলন লাল !
সকল ব্রজ-জন আনন্দ-দেবা।
"দাস কুম্ভন" প্রভু নন্দ নন্দন কুঁৱর—
জসোদা কে প্রাণ, মেবে দেৱধিদেৱা ॥[১৩১]

অর্থাৎ হে নন্দনন্দন, মনোহর শ্যামসুন্দর, আমি বলিহারি যাই। এখন উঠে জলখাবার খেয়ে নাও। সবরকম মিষ্টান্ন দুধ, দই, মাখন, মিছরি প্রস্তুত। কাপড় পরে নাও, কটিতে মেওয়া বাঁধো, তারপর বলরামের সংগে খেলতে যাও। তোমার খেলা দেখে ব্রজবাসীরা আনন্দ পাবে। কুম্ভনদাস বলেন, তুমি নন্দ নন্দন, যশোদার প্রাণপ্রিয় এবং ভক্তের দেবাদিদেব।

সন্তানের গুণ মা অন্যকে ডেকে এনে দেখাতে চান। এখানেও যশোদা কৃষ্ণের মনোমুগ্ধকর খেলা ব্রজবাসীদের দেখাবার জন্য ব্যগ্র। কিন্তু কৃষ্ণ যে ভক্তের নিকট দেবাদিদেব, এই কথা উল্লেখ করাতে লৌকিক বাৎসল্যেরসের পরিবেশ ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

কৃষ্ণের বাড়ী ফিরতে বিলম্ব হলে যশোদা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। একদিন সখীকে অনুরোধ করছেন, তুমি কৃষ্ণকে কুঞ্জগৃহ থেকে নিয়ে এস। তাঁকে সঙ্গে না নিয়ে কিছুতেই ফিরবে না। মনে রেখো, আমি তোমার পথ চেয়ে অপেক্ষা করব।[১৩২]

অন্যত্র দেখছি, কৃষ্ণ দেরী করে বাড়ী ফেরায় যশোদা বলছেন—

ললারে ! আজু অৱেরো আয়ো ?
বড়ীয় বার কী মারগ জোৱতি, তৈঁ কিত গহরু লগায়ো ॥
অব কহুঁ বাহরি জান ন দৈহোঁ মেরো হিয়ো জুড়ায়ো।
ঘর হী বোহোত খিলৌনা তেরে কাহেকোঁ বাহরি ধায়ো ॥
এক ঠৌঙ্গি দৈন উরাহনো আঈ, "মৈঁ কাহু কো দহি নহীঁ খায়ো।"
"কুম্ভনদাস" গিরিধর য়োঁ কহেঁ তৱ করত আপুনো ভায়ো ॥[১৩৩]

অর্থাৎ, বাছা ! আজ এত দেরী করে কেন ফিরলে ? কখন থেকে আমি তোমার পথ চেয়ে রয়েছি। আর কখনো আমি তোমাকে বাইরে যেতে দেব না। তোমাকে দেখে আমার প্রাণ জুড়াল। ঘরেই তো কত খেলনা, বাইরে যাবার কি দরকার ! এখনই এক গোপিনী এসে তোমার জন্য আমাকে কথা শুনিয়ে গেল।

কুম্ভনদাসের বাৎসল্যরসের বেশী বৈচিত্র্য নেই। তথাপি তিনি সরল অনাড়ম্বর ভাষায় সন্তানের জন্য মা'র বাৎসল্যের অনুভূতি সুচারুরূপেই প্রকাশ করেছেন।

সুরদাস

হিন্দী বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে সূরদাসের স্থান নির্ণয় প্রসঙ্গে অধ্যাপক বিজয়েন্দ্র স্নাতক বলেছেন— "মধ্যকালীন বৈষ্ণব ভক্ত কবিয়োঁ মেঁ সূরদাস কা স্থান শীর্ষ পর হৈ।"[১৩৪] অর্থাৎ, মধ্যযুগীয় বৈষ্ণব ভক্তকবিদের শীর্ষস্থানীয় সূরদাস। শুধু মধ্যযুগের নয়, সর্বকালের হিন্দী বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ, একথা বলতে দ্বিধা করবার কোনো কারণ নেই।

সূরদাসের প্রতিভা সম্বন্ধে পণ্ডিত রামচন্দ্র শুক্লের অভিমত হল: "জিস প্রকার রামচরিত কা গান করনেবালে ভক্তকবিয়োঁ মেঁ গোস্বামী তুলসীদাসজী কা স্থান সর্বশ্রেষ্ঠ হৈ উসী প্রকার কৃষ্ণচরিত গানেবালে ভক্ত কবিয়োঁ মেঁ মহাত্মা সূরদাসজী কা। বাস্তব মেঁ য়ে হিন্দী কাব্যগগন কে সূর্য ঔর চন্দ্র হৈঁ।[১৩৫] অর্থাৎ, রামচরিত অবলম্বনে যেসব কবি কাব্য রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে যেমন তুলসীদাস শ্রেষ্ঠ, তেমনি কৃষ্ণলীলার কবিদের মধ্যে সূরদাস শ্রেষ্ঠ। এই দুই কবি হিন্দী সাহিত্যাকাশের সূর্য ও চন্দ্র।

সূরদাসের জীবন সম্বন্ধে নিঃসংশয় তথ্য বেশি কিছু জানা যায় না। ভক্তমাল প্রভৃতি পাঁচটি বৈষ্ণবীয় গ্রন্থে সুরদাস সম্পর্কে কিছু তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। এদের মধ্যে হরিরায়জী রচিত চৌরাসী বৈষ্ণবন বার্তায় বলা হয়েছে, সুরদাসের জন্ম হয়েছিল দিল্লীর নিকটবর্তী সীহী গ্রামে। আবার কোথাও কোথাও বলা হয়েছে, আগ্রা ও মথুরার মধ্যবর্তী রুনকতা তাঁর জন্মস্থান। এই দুটি ভিন্ন মতবাদের সমন্বয় সাধন করেছেন হিন্দী সাহিত্যের এক প্রখ্যাত ইতিহাসকার। তাঁর মতে সুরদাসের জন্মস্থান সীহী গ্রামই, তিনি আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন। পরে তিনি মথুরা আসেন এবং তারও পরে আগ্রা ও মথুরার মাঝামাঝি যমুনা তীরবর্তী গউঘাটে বসবাস আরম্ভ করেন।[১৩৬] হরিরায়জীর চৌরাসী বৈষ্ণবন কী বার্তা গ্রন্থের বিবরণই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য। তিনি সুরদাসের জন্মস্থান, মাতাপিতা, গৃহত্যাগ প্রভৃতির বিবরণ বাল্যকাল থেকে বৃদ্ধকাল পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করেছেন।

সুরদাসের জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ নিয়েও বিভিন্ন মত প্রচালিত আছে। এইসব মতামত বিচার করে একজন বিদগ্ধ সমালোচক সিদ্ধান্ত করেছেন: "সুরদাস কে জন্মকাল, মৃত্যুকাল আদি কে বিষয় মেঁ বিভিন্ন মন্তব্য প্রকট কিএ জাতে হৈ। উন সবকা পরীক্ষণ করনে পর হম ইস নিষ্কর্ষ পর পহুঁচে হৈঁ কি উনকা জন্ম ১৫৩৫ বি. মেঁ হুআ থা, লগভগ সংবৎ ১৫৬৬ মেঁ বে শ্রীবল্লভাচার্য জী কী শরণ মেঁ গএ ঔর উনকী মৃত্যু অনুমানতঃ ১৬৩৮ অথবা ১৬৩৯ বি.। মেঁ হুঈ।"[১৩৭] এর মূল ভাবার্থ হল এই যে, সুরদাসের জন্ম ১৫৩৫ বিক্রমাব্দে এবং তাঁর মৃত্যু হয়েছিল ১৬৩৮ থেকে ১৬৩৯ বিক্রমাব্দের কোনো এক সময়ে। ১৫৬৬ বিক্রমাব্দের কাছাকাছি সময়ে তিনি বল্লভাচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

প্রচলিত ধারণা এই যে, সুরদাসের তিন ভাই ছিল। মা বাবার উপেক্ষা ও উদাসীনতায় সংসারের প্রতি বীতরাগ হয়ে তিনি গৃহত্যাগ করেন। কেন এই উপেক্ষা? তিনি অন্ধ ছিলেন বলেই কি? তাঁর অন্ধত্ব সম্বন্ধেও নিশ্চিতরূপে কিছু জানা যায় না। কবির রচনা থেকে তাঁর অন্ধত্ব সম্বন্ধে কোনো সুস্পষ্ট ইঙ্গিতের অভাব সমস্যাকে আরও জটিল করেছে। কোনো কোনো পদে অবশ্য 'অন্ধে' কিংবা 'নিপট অন্ধে' পাওয়া যায়। কিন্তু 'অন্ধ' কথাটি এখানে শারীরিক না দার্শনিক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, ঠিক বোঝা যায় না। তাঁর মতো অনুভূতিপ্রবণ কবি নিজের অন্ধত্ব সম্বন্ধে কোনো আভাস দেননি, এটা আশ্চর্যের বিষয়। বহুদিনের কিংবদন্তী এই যে, সুরদাস অন্ধ ছিলেন, কিন্তু জীবন ও জগতকে তিনি দেখতে পেতেন ঈশ্বরের অনুগ্রহে দিব্যদৃষ্টির সাহায্যে। তাই তাঁর রচনা জীবনের বাস্তব অনুভূতিতে এমন প্রাণবন্ত। ডঃ কৃষ্ণচন্দ্র গুপ্ত মনে করেন, মধ্যযুগের ভক্তরা এই অলৌকিক ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং সেই বিশ্বাস এখনও ভক্তমহলে বিদ্যমান।[১৩৮]

কিন্তু এ যুগে এই সমস্যা দিব্যদৃষ্টির যুক্তি দিয়ে সমাধান করা চলে না। আমরা ডঃ দেবেন্দ্রনাথ শর্মার সিদ্ধান্ত সমীচীন বলে মনে করি। তিনি বলেন, সুরদাস অন্ধ ছিলেন কিনা তা বিতর্কের বিষয়। কেউ কেউ বলেন, তিনি ছিলেন জন্মান্ধ, আবার অন্যরা তাঁর কাব্যের সজীবতা এবং চিত্রকল্পের যথার্থ প্রয়োগ দেখে মনে করেন, কবি পরবর্তী জীবনে দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছিলেন। কিন্তু এই দুটি বক্তব্যই অনুমান নির্ভর। তবে তাঁর রচনার বাস্তবতা ও সজীবতা অনুধাবন করলে সন্দেহ থাকে না যে, কবি তাঁর জীবনের কোনো এক পর্বে পৃথিবীর রূপ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাঁর কল্পনাশক্তি প্রখর হতে পারে, হয়ত লোকের মুখ থেকে অনেক জেনেছেন, কিন্তু শুধু এরই সাহায্যে জীবনের বিচিত্র লীলা এমন জীবন্ত করে তোলা যায় না।[১৩৯]

আনুমানিক ১৫৬৬ বিক্রমাব্দে সুরদাস বল্লভাচার্যের সংস্পর্শে আসেন। তার পূর্বেই নানা সাধু-সন্ন্যাসীর সাহচর্যের ফলে তাঁর মনে ঈশ্বরাসক্তি গভীর হয়েছিল। তাছাড়া, স্বরচিত ভক্তিগীতি যখন তিনি গাইতেন তখন লোকে মুগ্ধ হয়ে তা শুনত। মনে হয় তাঁর সংগীত-প্রতিভা শুধু সহজাত নয়, তিনি হয়ত গুরুর কাছে সংগীতের চর্চা করেছেন।[১৪০]

প্রথম সাক্ষাতের পর বল্লভাচার্যের অনুরোধে সুরদাস তাঁকে বিনয়পদের কয়েকটি গান শুনিয়েছিলেন। এ থেকে স্বভাবতই মনে হয়, সুরদাস ছিলেন দাস্যভাবের উপাসক। বল্লভাচার্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণের পর তিনি গুরু-প্রচারিত পুষ্টিমার্গের ভক্ত হন। দাস্যভাবে সম্ভ্রমবোধের জন্য ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে যে দূরত্ব থাকে, পুষ্টি-মার্গে তা নেই। মধুর রসের মতোই পুষ্টিমার্গে ভক্ত ও ভগবানের নিবিড় সম্পর্ক। পুষ্টিমার্গ সম্প্রদায়ের প্রধান উপজীব্য গ্রন্থ ভাগবত। সুতরাং সুরদাকের রচনায় স্বভাবতই ভাগবতের প্রভাব খুব বেশি। কবি নিজেই তা স্বীকার করে বলেছেন—

ব্যাস কহে সুকদেব সো দ্বাদস স্কন্ধ বনাই।
সূরদাস সোঈ কহে পদ ভাষা করি গাই॥[১৪১]

অর্থাৎ, ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্দের কাহিনী যেমন ব্যাস শুকদেবকে শোনালেন, তেমনি আমি দেশীয় ভাষায় সেই কথা গেয়ে শোনাচ্ছি।

কিন্তু তাই বলে একথা ধারণা করা ভুল যে, সুরদাস শুধুই ভাগবতানুসারী পদ রচনা করেছেন। তাঁর রচনায় যথেষ্ট মৌলিকত্ব না থাকলে তিনি কখনোই এরূপ বিপুল খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারতেন না।

সুরদাসের রচিত মুখ্যগ্রন্থ তিনটি: সুর-সাগর, সুর সারাবলী, এবং সাহিত্য-লহরী। তাছাড়া প্রাণপ্যারী, নল দময়ন্তী, রামজন্ম, একাদশী মাহাত্ম্য প্রভৃতি গ্রন্থ সুরদাস নামাংকিত হলেও এগুলি যে প্রসিদ্ধ ভক্ত কবি সুরদাসের রচনা, এমন কোনো নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় না। যদি সত্যি তাঁর রচনাই হয়, তবু এদের বিষয়বস্তু আমাদের আলোচনার বহির্ভূত।

সুর সাগরই সুরদাসের প্রামাণিক পদসংকলন। চৌরাসী বার্তা থেকে জানা যায়, সুরদাসের জীবিতকালেই সুরসাগর সংকলিত হয়। বারটি স্কন্ধে রাধাকৃষ্ণের লীলা বিষয়ক পদগুলি এই গ্রন্থে বিন্যস্ত করা হয়েছে। সুর সাগরের পদগুলি নাগলীলা, গোবর্ধনলীলা, সুরপচ্চীসী, ভ্রমরগীত, দানলীলা, মানলীলা প্রভৃতি পৃথক পুঁথি হিসাবেও পাওয়া যায়।

সুরসারাবলী সুরসাগরের সংক্ষিপ্ত রূপ। সাহিত্যলহরীর পদগুলি ভিন্ন গোত্রের। এগুলি দুরূহ প্রহেলিকা পদ। হিন্দীতে বলা হয় 'উলটবাসিয়া' বা 'দৃষ্টিকূট' পদ। অর্থাৎ, আপাতদৃষ্টিতে যে অর্থ প্রতিভাত হয় তার অন্তরালে থাকে কোনো গূঢ় অর্থ। এইসব পদেও রাধাকৃষ্ণের লীলাকাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এই রীতিতে তুলসীদাস, কবীর এবং আরও অনেক হিন্দী কবি পদ রচনা করেছেন। সুরসাগরেও দৃষ্টিকূট পদের কিছু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।[১৪২]

পূর্বেই বলা হয়েছে, সুরদাস ছিলেন দাস্যভাবের সাধক। প্রথম সাক্ষাতের সময় তিনি বল্লভাচার্যকে স্বরচিত বিনয়পদের এই গানটি গেয়ে শোনান: "প্রভু হোঁ সব পতিতন কো টীকো।" অর্থাৎ, পতিতদের মধ্যে আমি সবচেয়ে পতিত। গান শুনে বল্লভাচার্য বলেন— "জো সুর হৈব কৈঁ এসো ঘিঘিয়াত কাহে কো হৈ।" যিনি সূর্য [সুর] তিনি কেন বিলাপ করছেন। এর অর্থ এই নয় যে, বল্লভাচার্য দাস্যভাবকে স্বীকৃতি দেননি। তাঁর মতে সাধকের যাত্রাপথে দাস্যভাবে ভাবিত হওয়া প্রথম ধাপ, শেষ লক্ষ্য নয়। দাস্যভক্তি অহংকার বিনষ্ট করে, সাধককে মহত্তর সাধনার পথে এগিয়ে দেয়। এই পথ ধরেই তিনি সর্বোত্তম মধুরভাবে উপনীত হতে সক্ষম হন। বল্লভাচার্য তাই নির্দেশ দিলেন, কৃষ্ণলীলার সকল পর্যায় নিয়ে পদ রচনা করতে। শুধু দাস্যভাব নিয়ে থাকলে সাধনা পূর্ণ হবে না।

বল্লভাচার্য ও তাঁর সম্প্রদায় ছিলেন ভক্তিবাদের পুষ্টিমার্গে বিশ্বাসী। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ডঃ ভাণ্ডারকর পুষ্টিভক্তির চারটি স্তর নির্দেশ করেছেন: প্রবাহ-পুষ্টিভক্তি, মর্যাদা-পুষ্টিভক্তি, পুষ্টি-পুষ্টিভক্তি ও শুদ্ধ-পুষ্টি ভক্তি। সুরদাস ছিলেন চতুর্থ পর্যায়ের সাধক। এই পর্যায় হল: "The

fourth is of those who through more love devote themselves to the singing and praising of God as if it were a haunting passion."[১৪৩]

বল্লভাচার্য সাধক-জীবনের প্রথম ভাগে ছিলেন বালগোপালের একনিষ্ঠ উপাসক। শেষ জীবনে তিনি মধুররসে ভাবিত হয়েছিলেন। সূরদাসও বালগোপালকে অবলম্বন করে যেমন বাৎসল্যরসের পদ লিখেছেন, তেমনি রাধা-কৃষ্ণলীলার মধুর রসাশ্রিত পদও রচনা করেছেন। এই উভয় বর্গের পদাবলীতেই তাঁর কবি প্রতিভার উজ্জ্বল বিকাশ ঘটেছে। তাঁর কাব্য সাধনার এই দুটি পর্ব পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। সূরদাসের কৃষ্ণলীলার বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি কৃষ্ণের জীবনের ধারাবাহিক বর্ণনা দিয়েছেন। জন্ম থেকে যৌবন এবং মথুরা গমন পর্যন্ত দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনাও তাঁর পদাবলীতে অতি নিপুণভাবে বর্ণিত হয়েছে। সুর সাহিত্যে কৃষ্ণ শুধু 'পতিত পাবন' নন, কখনও তিনি শিশু, সখা, আবার তিনিই কখনও "চিত্ত চোর-মদন মোহন।" সূরদাস একদিকে যেমন কৃষ্ণের একটি সামগ্রিক রূপ উপস্থিত করেছেন, তেমনি অন্যদিকে কৃষ্ণ দেবতার আসন থেকে নেমে এসেছেন পৃথিবীর লৌকিক পরিবেশে। আমাদের বক্তব্য প্রাঞ্জল করে প্রকাশ করেছেন একজন সমালোচক। তিনি বলেছেন— "সুর সাগর মেঁ কৃষ্ণ জন্ম সে লেকর শ্রীকৃষ্ণ কে মথুরা জানে তক কী কথা অত্যন্ত বিস্তার সে ফুটকল পদোঁ মেঁ গাঈ গঈ হৈ। ভিন্ন ভিন্ন লীলাওঁ কে প্রসংগ কো লেকর সচ্চে রসমগ্ন কবি নে অত্যন্ত মধুর ঔর মনোহর পদোঁ কী ঝড়ী সী বাঁধ দী হৈ।"[১৪৪] অর্থাৎ, সুর-সাগর গ্রন্থে কৃষ্ণের জন্ম থেকে মথুরা যাত্রা পর্যন্ত কাহিনী ছোট ছোট পদে কীর্তিত হয়েছে; ভিন্ন ভিন্ন লীলার প্রসংগ নিয়েও রসমগ্ন কবি সুন্দর ও মনোরম কবিতার ঝাড় বেঁধে দিয়েছেন।

সূরদাসের মধুররসের পদ আস্বাদন করবার জন্য তাঁর রাধার দুটি বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করা প্রয়োজন। প্রথমত, শিশুকাল থেকেই রাধা কৃষ্ণের খেলার সঙ্গিনী, তিনি কৃষ্ণের শুধু যৌবন-সঙ্গিনী নন। রাধা নন্দের বাড়ী এসে কখনও পুতুল খেলেন, কখনও বা কানামাছি। কৃষ্ণ যশোদার কাছে নালিশ করেন, রাধা তাঁর বাঁশী চুরি করে নেবে। আবার রাধা তাঁর মা'র কাছে অভিযোগ করেন যে, কৃষ্ণ ধাক্কা দিয়ে তাঁর দই ফেলে দিয়েছেন। রাধা-কৃষ্ণের এই বাল্যলীলার ছবি, সূরদাসের পূর্বে কেউ আঁকেন নি। পরবর্তীকালেও এমন উজ্জ্বল ছবি কোথাও পাওয়া যায় না। হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী যথার্থই বলেছেন "বিদ্যাপতি কী রাধা ঔর চন্ডীদাসকী রাধা ইসকে পহলে নহী দিখাঈ দেতী। বাল-কেলী কী বর্ণনা মেঁ সূরদাস অকেলে হৈঁ।"[১৪৫] অর্থাৎ, বিদ্যাপতি-চন্ডীদাস রাধার বাল্যলীলা দেখান নি; সূরদাস এ বিষয়ে অনন্য। তাঁর রাধা-কৃষ্ণের বাল্যের প্রীতি ধীরে ধীরে প্রেমে পরিণত হয়েছে দানলীলা, জলকেলি ইত্যাদির মধ্য দিয়ে।

দ্বিতীয়ত, বল্লভাচার্য সম্প্রদায় স্বকীয়া নায়িকায় বিশ্বাসী। গৌড়ীয় মতে, পরকীয়া ভজনে আকর্ষণের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। অষ্টছাপের কবিরা এবং কৃষ্ণকাব্যের অন্যান্য কবিরাও স্বকীয়াবাদের সমর্থক। এই সম্বন্ধে ডঃ দ্বিবেদী বলেন: "রাধা ঔর কৃষ্ণ

সম্বন্ধী প্রেমকে গানে তো ইস্ প্রদেশ মেঁ চল পড়ে, পরন্তু রাধা কৃষ্ণ কী রাণী হী সমঝী গঈ, সূরদাস নে রাধা ঔর কৃষ্ণ কা বিবাহ বড়ী ধূমধাম সে করায়া হৈ।"[১৪৬] অর্থাৎ, রাধা-কৃষ্ণের প্রেমগীতি এদেশেও প্রচলিত হল। কিন্তু রাধাকে কৃষ্ণের রাণী হিসেবেই মনে করা হয়। সূরদাস খুব ধূমধামের সঙ্গে রাধা-কৃষ্ণের বিয়ে দিয়েছেন।

আরেকজন সমালোচক বলেছেন যে, রাসলীলার পূর্বে সূরদাস রাধা-কৃষ্ণের বিবাহ দিয়ে রাধা যে পরকীয়া নায়িকা নন, স্বকীয়া— তার প্রমাণ দিলেন।[১৪৭]

সূরদাস যে বিবাহ দিয়েছেন তা গন্ধর্ব বিবাহ। তিনি বলেছেন—

জাকৌঁ ব্যাস বরনত রাস।
হৈ গন্ধর্ব বিবাহ চিত দৈ, সুনৌ বিবিধ বিলাস॥
কিয়ৌ প্রথম কুমারিকনি ব্রত, ধরি হৃদয় বিশ্বাস।
নন্দ-সুত পতি দেহ দেবী, পূজি মন কী আস॥[১৪৮]

অর্থাৎ, ব্যাসদেব যে উৎসবকে রাস বলে বর্ণনা করেছেন, প্রকৃতপক্ষে তা হল গন্ধর্ব বিবাহ। রাধা হৃদয়ে বিশ্বাস নিয়ে প্রথম করলেন কুমারী ব্রত এবং পরে "নন্দসুতকে 'আমি যেন পতিরূপে লাভ করি"— এই ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্য দেবী পূজা করলেন।

এই বিবাহ সম্বন্ধে সূরদাসের মধ্যে যে সংযমের পরিচয় পাওয়া যায়, নন্দদাস ও পরমানন্দদাসের রচনায় তা নেই। তাঁরা সাড়ম্বরে রাধা-কৃষ্ণের বিবাহ দিয়েছেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব কবিদের মতো পরকীয়াতত্ত্বে বিশ্বাসী না হলেও কৃষ্ণকাব্যের হিন্দী কবিরা তাঁদের মতোই মনে করতেন, বিরহে প্রেমের চরম স্ফূর্তি। সূরদাসের ভ্রমরগীতি বা উদ্ধব-সংবাদের পদগুলিতে রাধার বিরহ-বেদনার গভীরতা মর্মস্পর্শী ভাবে রূপায়িত হয়েছে। ভাগবতেও ভ্রমরগীত আছে।[১৪৯] সূরদাস ভাগবতের রীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হলেও তাঁর রচনায় মৌলিকত্বের অভাব নেই। হিন্দী সাহিত্যে ভ্রমরগীতের প্রথম প্রবর্তক সূরদাস। অন্যান্য হিন্দী কবিরা এই ক্ষেত্রে তাঁকেই অনুসরণ করেছেন। ভ্রমরগীতগুলি সূরদাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। একটিমাত্র বাক্যে এদের মূল্য নির্ধারণ করেছেন দেবেন্দ্রনাথ শর্মা: "ভ্রমরগীত সূর-সাহিত্য কা প্রাণ হৈ; 'সাগর' কী উৎকৃষ্টতম রত্নরাশি হৈ।"[১৫০] অর্থাৎ, ভ্রমরগীত সূর-সাহিত্যের প্রাণ, সাগরের [সূর সাগরের] উৎকৃষ্ট রত্নরাজি।

ভ্রমরগীত ঠিক মাথুর পদাবলীর সমার্থক নয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্যে মাথুর পর্যায়ের পদাবলী প্রধানত রাধা ও কৃষ্ণের বিচ্ছেদ-বেদনা অবলম্বনে রচিত। ভ্রমরগীতে এই বেদনা ব্যাপকতর। রাধা, গোপনারী এবং সকল বৃন্দাবনবাসী কৃষ্ণের বিচ্ছেদে কাতর। কৃষ্ণ মথুরায় আছেন, নানা কাজে ব্যস্ত। সখা উদ্ধবকে বৃন্দাবনে পাঠালেন তাঁর খবর জানতে এবং নন্দ-যশোদা-রাধা ও অন্যান্য পরিচিতজনের সংবাদ সংগ্রহ করে আনতে। উদ্ধব যখন কথা বলছেন, তখন সেখানে গুনগুন করে গান করতে করতে এক ভ্রমর উড়ে এল। গোপিনীরা তাকে প্রশ্ন করল, তোমাকে কি কুব্জা পাঠিয়েছে? তুমি কি শ্যামসুন্দরের খবর জান?[১৫১]

গোপিনীরা বক্রোক্তির সাহায্যে ভ্রমরকে লক্ষ্য করে প্রকৃতপক্ষে উদ্ধবকেই শোনালেন,

কৃষ্ণবিহীন জীবনের নানা বেদনার কথা। উদ্ধবের ব্রজধামে আগমন এবং মথুরা প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত সকল ঘটনা ও আলোচনা প্রায় সাড়ে-সাতশ' পদে বর্ণনা করা হয়েছে। এইসব পদাবলী ভ্রমরগীতি হিসাবে চিহ্নিত।

উদ্ধব মথুরা ফিরে যাচ্ছেন; গোপিনীরা নিজেদের কত কথা কৃষ্ণকে বলে পাঠালেন। রাধার চোখে জল, ভালো করে কথা বলতে পারছেন না। শেষ পর্যন্ত শুধু বলতে পারলেন—

ইতনী বিনতী সুনহু হমারী, বারক হূঁ, পতিয়া লিখি দীজৈ।
চরণকমল দরসন নব নবকা, করুণাসিন্ধু জগত জস লীজৈ॥[১৫২]

অর্থাৎ, আমার একান্ত মিনতি শোন, কৃষ্ণকে চিঠি লিখে দাও, একবার অন্তত তাঁর চরণকমল দর্শন দিয়ে জগতে করুণাসিন্ধু বলে তিনি যশস্বী হোন।

এখানে রাধা কৃষ্ণের দয়িতা নন, একান্তরূপে ভক্তা কেলি-কলাবতী-বিরহিনী রাধাকে এখানে খুঁজে পাওয়া যায় না।

কিন্তু সে যাই হোক, আবেগে রুদ্ধকণ্ঠ্য রাধাকে কবি উপস্থিত করায় পাঠক বিরহিনীর মর্মবেদনা গভীরভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হন।

অন্যত্র বিরহবিধুরা রাধার মনের কথা বলেছেন গোপিনীরা—

বিনু হরি ক্যোঁ রাখৈঁ মন ধীর।
এক বের হরিদরস দিখাবহু, সুন্দর স্যাম সরীর॥
তুম জু দয়াল দয়ানিধি কহিয়ত, জানত হৌঁপবপীর।
বিছুরৈঁ প্রাণ, নাথ ব্রজ আবৈঁ, কটিত হম কত জদুবীর॥
মত অপজস আনৌ সির অপনৈঁ, কঠিন মদন কী পীর।
'সূরদাস' প্রভু মিলন কহত হে, রবিতনয়া কে তীর॥[১৫৩]

—হে উদ্ধব, হরি বিনা মন কি করে স্থির রাখি। একবার তাঁর শ্যামল-সুন্দর মূর্তি নিয়ে তিনি দেখা দিয়ে যান। হে কৃষ্ণ, তুমি দয়াল, দয়ানিধি, সাধুসন্ত সকলেই একথা বলে থাকেন। বিরহে আমাদের প্রাণ যায়. হে প্রিয়, তুমি একবার এসো, হায়, নিজের মাথায় অপবাদ নিও না, আমরা যে মদন-পীড়িত॥ সুরদাস বলেন, মিলন হবে।

ভ্রমরগীতের বহির্ভূত কিছু সুন্দর বিরহের পদ লিখেছেন সুরদাস। এমনি একটি পদ—

নিসি দিন বরষত নৈন হমারে।
সদা রহতি বরষা রিতু হম পর, জব তৈঁ স্যাম সিধারে॥
দৃগ অঞ্জন ন রহত নিসি বাসর, কর কপোল ভএ কারে।
কঞ্চুবিপট সুখত নহিঁ কবহুঁ, উর বিচ বহত পনারে॥
আসূঁ সলিল সবৈ ভই কায়া, পল ন জাত রিস টারে।
'সূরদাস' প্রভু য়হৈ পরেখৌ, গোকুল কাহৈঁ বিসারে॥"[১৫৪]

অর্থাৎ, আমার গৃহ থেকে যেদিন শ্যাম চলে গেছেন সেদিন থেকে ব্রজধামে একমাত্র

বর্ষা ঋতুই চলছে। আমাদের চোখে দিনরাত অবিশ্রাম বর্ষা ঝরছে। চোখে কাজল থাকে না, চোখের জলে সেই কাজল ধুয়ে যায় এবং হাত ও গাল কালিমালিপ্ত হয়। বস্ত্রের আঁচল শুকোবার অবকাশ হয় না, বুক ভিজে যায়। সমস্ত দেহ চোখের জলে সিক্ত। সময় কাটে না, বিক্ষুব্ধ মন শান্ত হয় না। সুরদাস বলেন প্রভুর এটি পরীক্ষা; কিন্তু হে কৃষ্ণ, তুমি কেন গোকুলকে ভুলে আছ?

সুরদাসের রাধা প্রগল্‌ভা নন, নিজের হৃদয় উন্মুক্ত করবার ভাষা তাঁর নেই। তাঁর এই মূক বেদনা আমাদের স্পর্শ করে। অবশ্য ব্রজগোপিনীদের আর্তির মধ্য দিয়ে কবি রাধার বিরহ-যন্ত্রণা আংশিক প্রকাশ করেছেন।

সুরদাসের কবি-সত্তার সামগ্রিক আভাস দেবার জন্য তাঁর ভ্রমরগীত এবং মধুররসের পদাবলী সম্বন্ধে সামান্য উল্লেখ করা হল। এবার আমাদের মুখ্য আলোচ্য বিষয় আরম্ভ করা যেতে পারে।

সুরদাস বাৎসল্য অনুভূতির বর্ণনায় অনন্যসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। আপাতদৃষ্টিতে যা তুচ্ছ বলে মনে হয়, তা-ও তিনি উল্লেখ করেছেন বাৎসল্যের পরিবেশকে পূর্ণতা দানের জন্য। মাতা যশোদা, পিতা নন্দ, ব্রজবাসিনী গোপিনীদের,— এমনকি পথযাত্রী পথিকেরও বালগোপালের বাল্যলীলা দেখে যে সহজ স্নেহ উৎপন্ন হয়, তার মনোরম চিত্র সুরদাস সার্থকভাবে রূপায়িত করেছেন। তাঁর বাৎসল্য একমাত্র নন্দ-যশোদাকে কেন্দ্র করেই বিবর্তিত হয়নি।

বাৎসল্যের সর্বব্যাপী প্রভাব থেকে কঠোর-হৃদয় কংসও যে মুক্ত নন, সুরদাস তা-ও দেখিয়েছেন। প্রতিজ্ঞানুসারে বসুদেব তাঁর সদ্যোজাত প্রথম পুত্রকে কংসের নিকট নিয়ে যান—

পহিলো পুত্র দেবকী জায়ো, লৈ বসুদেব দিখায়ো।
বালক দেখি কংস হঁসি দীন্যো, সব অপরাধ ক্ষমায়ো॥[১৫৫]

অর্থাৎ, দেবকীর পুত্রকে দেখে কংস হাসলেন এবং [স্নেহবশত] তার সব অপরাধ ক্ষমা করলেন।

কিন্তু কংসের এই মমতাবোধ ক্ষণস্থায়ী। কিছুক্ষণ পরে নিজের স্বার্থের কথা চিন্তা করে পুত্রটিকে হত্যা করেন। এর পর থেকে একে একে সব পুত্রই প্রাণ হারাল কংসের হাতে। অষ্টম গর্ভের পুত্র কৃষ্ণ যাতে রক্ষা পান, সেজন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন দেবকী। স্বামীকে তিনি বললেন, এমন কিছু উপায় কর যাতে এই সন্তানটিকে রক্ষা করা যায়। কংসকে কথায় ভোলানো যাবে না। তাই বুদ্ধি, বল, ছল, কৌশল দিয়ে একে অন্যত্র সরিয়ে ফেল। আমরা এমন ভাগ্য করিনি যে সন্তানকে কাছে রেখে নিত্য স্নেহরস পান করব।[১৫৬]

বৃন্দাবনে নিরাপদ আশ্রয়ে কৃষ্ণকে রেখে আসবার জন্য বসুদেব যখন প্রস্তুত, তখন দেবকী কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। পুত্রের প্রাণের আশঙ্কায় তিনি যেমন ব্যাকুল, তেমনি আবার পুত্রের বিচ্ছেদ ভাবনায়ও বেদনাক্লিষ্ট। দেবকী বিলাপ করে স্বামীকে বলছেন, তুমি কেন কংসের হাত থেকে আমাকে সেদিন রক্ষা করেছিলে? বিবাহের

দিনই কংস কেন আমাকে হত্যা করল না? এমন ছেলের বিচ্ছেদে মা কেমন করে বাঁচে?[১৫৭]

নন্দের গৃহে কৃষ্ণকে রেখে এলেন বসুদেব। বৃন্দাবনে সাড়া পড়ে গেল, যশোদার ছেলে হয়েছে। সমগ্র জনপদ উৎসবমুখর। কত লোক ছুটে এলো কৃষ্ণকে দেখতে। কোনো গোপিনী এসে বলছে, যশোদা, গোপালকে একটু আমার কোলে দাও; আমি ও'র কমলমুখ একবার ভালো করে দেখে নিই, তারপর তুমি ছেলেকে কোলে নিও।[১৫৮]

নন্দ কর্তৃক আয়োজিত পুত্রোৎসবে দূর-দূরান্তর থেকে কত লোক দান গ্রহণ করতে এসেছে। তারা কৃষ্ণের অনুপম মূর্তি দেখে মুগ্ধ। কিছু লোক কৃষ্ণকে একবার দেখে ফিরে গেল; আবার, অনেকেই কৃষ্ণকে নিত্য দেখবার সুযোগ পাবার জন্য নন্দের গৃহদ্বারে পড়ে থাকতে চাইছে। গোবর্দ্ধনবাসী এমনি একজন নিজের মনোবাসনা প্রকাশ করে বলল—

দীজৈ মোহিঁ কৃপা করি সোঈ, জো হৌ আয়ো মাঁগন।
জসুমতি-সুত অপনৈঁ পাইনি চলি, খেলত আবৈ আঁগন।
জব হঁসি কৈ মোহন কছু বোলৈঁ, তিহিঁ সুনি কৈ ঘর জাউঁ ॥[১৫৯]

অর্থাৎ, কৃপা করে আমার প্রার্থনা পূর্ণ করুন। যশোদার পুত্র যখন খেলতে খেলতে আঙিনায় আসবেন, কৃষ্ণ যখন হেসে কিছু বলবেন, তা দেখে ও শুনে আমি ঘরে ফিরে যাব।

একদিন দোলনায় শুয়ে শুয়ে খেলতে খেলতে শিশু কৃষ্ণ উপুড় হয়ে পড়লেন। দৃশ্যটি অতি সাধারণ। এই অতি সাধারণ দৃশ্যও কিন্তু মায়ের অন্তরে অপূর্ব আনন্দ দেয়। ভক্ত কবি সুরদাস এই তুচ্ছ ছবিটিও অবহেলা করেন নি। তিনি যশোদার আনন্দকে বর্ণনা করে বলেছেন—

মহরি মুদিত উলটাই কৈ মুখ চুমন লাগী।
চিরজীবৌ মেরৌ লাড়িলৌ, মৈঁ ভঈ সভাগী ॥
এক পাখ এয়-মাস কৌ মেরৌ ভয়ৌ কহ্নাঈ।
পটকি রাল উলটৌ পর্যৌ, মৈঁ করৌঁ বধাঈ ॥[১৬০]

—যশোদা প্রসন্ন হয়ে শিশু কৃষ্ণকে উল্টে নিয়ে মুখ-চুম্বন করতে লাগলেন। বললেন —"আমার আদরের বাছা, তুমি দীর্ঘজীবী হও। আমি সৌভাগ্যবতী। আমার কানাই আজ সাড়ে-তিন মাসের হল, হাঁটুতে ভর দিয়ে উল্টে গেছে। আমি (ওর) কল্যাণ কামনা করি।"

কয়েকমাস পর দোলনায় দুলতে দুলতে একদিন শিশু কৃষ্ণ মাটিতে পড়ে গিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। যশোদা আকুল হয়ে ছুটে এলেন। তাড়াতাড়ি কৃষ্ণকে কোলে তুলে গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করে শান্ত করলেন।

কখনো আবার যশোদা শিশু কৃষ্ণকে ঘুম পাড়াবার জন্য দোলনা দুলিয়ে আবোল-তাবোল গান করেন—

জশোদা হরি পালনৈঁ ঝুলাবৈ।

হলরাবৈ, দুলরাই মল্থাবৈ, জোই-সোই কছু গাবৈ ॥
মেরে লাল কৌঁ আউ নিঁদরিয়া, কাহেঁ ন আনি সুবাবৈ।
তু কাহেঁ নহি বেগিহি আবৈ, তোকৌঁ কাহ্ন বুলাবৈ।[১৬১]

অর্থাৎ, যশোদা কৃষ্ণকে দোলনায় দোলাচ্ছেন। কখনও দোলা দিচ্ছেন, কখনও তিনি আদর করতে করতে মুখে নানারকম শব্দ করছেন। আর যা মনে আসছে তা-ই গেয়ে চলেছেন : ঘুম, তুই আমার বাছার কাছে আয়। তুই কেন ওকে ঘুম পাড়াচ্ছিস না! তুই কেন তাড়াতাড়ি আসিস না? তোকে কানাই ডাকছে।

ঘুমপাড়ানী গান শুনে কৃষ্ণ ঘুমের আবেগে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে চোখ বুঁজে থাকেন। কৃষ্ণ ঘুমিয়ে পড়েছেন ভেবে যশোদা গান থামিয়ে সকলকে ইশারায় চুপ করতে বলেন। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে কৃষ্ণ জেগে ওঠেন, যশোদা আবার সুর করে গাইতে থাকেন—

কবহুঁ পলক হরি মুঁদি লেত হৈঁ কবহুঁ অধর ফবকাবৈ।
সোবত জানি মৌন হৈব কৈ রহি, করি-করি সৈন বতাবৈ।
ইহিঁ অন্তব অকুলাই উঠে হরি, জসুমতি মধুরৈঁ গাবৈ ॥[১৬২]

—কৃষ্ণ আর একটু বড় হয়েছেন, মুখে দু'একটি অস্ফুট কথা শোনা যায়। কখনো যশোদার কোলে শুয়ে অর্থহীন শব্দ করেন; কখনও বা খিলখিল করে হাসেন।

অবোধ শিশুর এইসব শৈশবলীলা দেখে যশোদার হৃদয় পুত্রস্নেহে আপ্লুত হয়ে যায়—

নিরখি-নিরখি মুখ কহতি লাল সোঁ, মো নিধনী কে ধনিয়াঁ।[১৬৩]

বারবার ছেলের মুখের দিকে চেয়ে যশোদা বলেন – বাছা, তুই আমার কাঙালিনীর ধন।

কৃষ্ণকে নিয়ে মায়ের মনে নানা ইচ্ছা জেগে ওঠে—

নন্দ-ঘরনি আনন্দ ভরী, সুত স্যাম খিলাবৈ।
কবহিঁ ঘুটুরবনি চলহিঁগে, কহি, বিধিহিঁ মনাবৈ ॥
কবহিঁ দঁতুলি দ্বৈসুধ কী দেখোঁ ইন নৈর্ননি।
কবহিঁ কমল-মুখ, বোলিহৈঁ সুনিহৌ উন বৈননি ॥
চুমতি কর-অধর-ভ্রূ লটকতি লট চুমতি।
কহা বরনি সূরজ কহৈ, কহঁ পাবৈ সো মতি ॥[১৬৪]

আনন্দ-মগ্ন নন্দরাণী পুত্র শ্যামসুন্দরকে খেলা দিচ্ছেন। তিনি বিধাতার কাছে প্রার্থনা করেন "আমার ছেলেটা কবে হামা দেবে। কবে আমি নিজের চোখে ওর দুধের ছোট দুটি দাঁত দেখব। আর কবে ওর কোমল মুখের কথা শুনব।" স্নেহে আপ্লুত হয়ে তিনি হাত, পা, অধর, এবং ঝুলে পড়া চুল চুম্বন করেন। সুরদাস বলেন, মা'র এই স্নেহ-অভিলাষ প্রকাশ করবার শক্তি তিনি কোথায় পাবেন!

যশোদা শুধু বিধাতার কাছেই প্রার্থনা করেন না, আবেগের বশে তিনি পুত্রের কাছেও তাঁর অভিলাষ ব্যক্ত করেন—

নান্হরিয়া গোপাল লাল, তু বেগি বড়ো কিন হোহি।

ইহি ম্ুখ মধ্ুর বচন হঁসি কৈ ধোঁ, জননি কহৈ কব মোহি ॥
য়হ লালসা অধিক মেরে জিয় জো জগদীস করাহি ।
মো দেখত কান্হ্ুর ইহি আঁগন, পগ দ্বৈ ধরনি ধরাহি ॥
খেলহি হলধর সঙ্গ, রংগ-র্ুচি, নৈন নিরখি সুখ পাঁউ ।
ছিন-ছিন ছ্ুধিত জানি পয় কারণ, হঁসি-হঁসি নিকট ব্ুলাউঁ ॥
জাকৌ সিব-ব্রিরঞ্চি-সনকাদিক ম্ুনিজন ধ্যান ন পাবৈ ।
স্ুরদাস জস্ুমতি তা স্ুত-হিত, মন অভিলাষ বঢ়াবৈ ॥[১৬৫]

—আমার গোপাল, তুই কেন তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যাসনা ! না জানি কবে ত্ুই হাসি ম্ুখে মধ্ুর কণ্ঠে 'মা' বলে ডাকবি ! আমার অন্তরের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ঈশ্বর কবে প্ূর্ণ করবেন ! যখন কানাই এই আঙিনায় মাটির উপর নিজের দ্ুটি পা রেখে চলবে, আমি দ্ু'চোখ ভরে দেখে স্ুখী হব । যেদিন বড় ভাই বলরামের সঙ্গে আনন্দে খেলবে । এবং ক্ষণে ক্ষণে খিদে পেয়েছে ভেবে আমি হেসে ওকে দ্ুধ খাওয়াবার জন্য কাছে ডাকব, সে কী আনন্দ !

অভিলাষের শেষ এখানেই হয় না । বলা যেতে পারে এখন তো অভিলাষের আরম্ভ । দিন দিন তাঁর ইচ্ছা বেড়েই যায় । স্ুরদাস মায়ের অন্তরের নানা ইচ্ছার ছবিও অপ্ূর্বভাবে ত্ুলে ধরেছেন—

জস্ুমতি মন অভিলাষ করৈ ।
কব মেরো লাল ঘ্ুট্ুর্ুনি রেঁগে, কব ধরণী পগদ্বৈ ক ধরৈ ।
কব দ্বৈ দাঁত দ্ুধকে দেখৌঁ, কব তোতরেঁ ম্ুখ বচন ঝরৈ ॥
কব নন্দহিঁ বাবা কহি বোলৈ, কব জননী কহি মোদিঁহ ররৈ ।
কব মেরৌ অঁচরা গহি মোহন জোই-সোই কহি মোসোঁ ঝগরৈ ॥
কব ধোঁ তনক-তনক কছ্ু খৈ হৈ, অপনে কর সোঁ ম্ুখহিঁ ভরৈ ।
কব হঁসি বাত কহৈগৌ মোসোঁ, জা ছবি তৈঁ দ্ুখ দ্ুরি হরৈ ॥[১৬৬]

—যশোদা মনে মনে আকাঙ্ক্ষা করেন, আমার ছেলেটা কবে হামা দেবে, কবে মাটিতে দ্ু'পা রাখবে । কবে আমি ওর দ্ুধের দ্ুটি দাঁত দেখব । কবে ওর ম্ুখের আধো আধো কথা শ্ুনতে পাব । কবে নন্দকে বাবা, আমাকে বারবার মা বলে ডাকবে ! কবে মোহন আমার অঞ্চল ধরে মনে যা আসবে তাই বলে আমার সঙ্গে ঝগড়া করবে ; কবে একট্ু একট্ু খাবে, কবে নিজের হাতে ম্ুখে গ্রাস ত্ুলবে ; কবে হেসে আমার সঙ্গে কথা বলবে, আর সেই সৌন্দর্যে আমার সমস্ত দ্ুঃখ দ্ূর হয়ে যাবে !

কিছ্ুদিনের মধ্যেই যশোদার অভিলাষ প্ূর্ণ হয় । কৃষ্ণ হামা দিতে আরম্ভ করেন ; তারপর ধীরে ধীরে কথা বলতে আরম্ভ করেছেন, কিন্ত্ু কৃষ্ণ কিছ্ুতেই দরজার চৌকাঠ পের্ুতে পারেন না । মা তাই দেখেই খ্ুব খ্ুশি ।

চলত দেখি জস্ুমতি স্ুখ পাবৈ ।
ঠুম্ুকি-ঠুম্ুকি পগ ধরণী রেঁগত, জননী দেখি দিখাবৈ ॥[১৬৭]

—কৃষ্ণকে চলতে দেখে যশোদা আনন্দিত । কৃষ্ণ মাটিতে ঠমকে ঠমকে পা রেখে

চলছেন, আর মাকে নিজের চলা দেখাচ্ছেন।

মাটিতে চলতে শিখে কৃষ্ণ মাটি খেতেও শিখলেন। একদিন অবোধ শিশু নিজে মাটি খেয়ে মাকেও এলেন মাটি খাওয়াতে। মা শিশুর কাণ্ড দেখে একদিন হাসলেন, পরে সমস্ত শরীর ধূলি-মলিন কৃষ্ণকে একটি লাঠি উঁচিয়ে ধমক দিতে শুরু করলেন—

মোহন কাহেঁ ন উগিলৌ মাটী।
বার-বার অনরুচি উপজাবতি, মহরি হাথ লিএ সাঁটী॥[১৬৮]

—মোহন, মুখ থেকে মাটি ফেলছ না কেন? মাটি খাওয়া যে ঘৃণার কাজ, যশোদা তা কৃষ্ণকে বোঝাতে চাইলেন।

কৃষ্ণের মুখে মাটি আছে কিনা দেখতে গিয়ে যশোদা কৃষ্ণের মুখগহ্বরে বিশ্বরূপ দর্শন করলেন। বহুক্ষণ তিনি অপলকনেত্রে সে দৃশ্য দেখলেন। ভাবলেন আমি মা, আর এ আমার ছেলে! যশোদার আশ্চর্য বোধ হতে লাগল। তিনি নন্দরাজকে গিয়ে সব কথা বললেন।

কিন্তু নন্দ বিশ্বাস করলেন না কৃষ্ণের এই ঐশ্বর্যস্বরূপের কথা।

কহত নন্দ জসুমতি সৌঁ বাত!
কহা জানি ঐ, কহ তৈঁ দেখ্যৌ, মেরৈঁ কাণ্ড রিসাত।
পাঁচ বরষ কো মেরো কাহ্নৈয়া, অজরজ তৈরী বাত।
বিনহীঁ কাজ সাঁটি লৈ ধাবতি, তা পাছেঁ বিললাত,
কুসল রহৈঁ বলরাম স্যাম দোউ, খেলত-খাত-অহ্নাত।
সূর স্যাম কৌঁ কহা লগাবতি, বালক কোমল-বাত॥[১৬৯]

যশোদার কথা শুনে নন্দরাজ বললেন— কি জানি, আমার কানাইয়ের মধ্যে তুমি কি দেখেছ, আর তাই নিয়ে কানাইয়ের উপর রাগ করছ। পাঁচ বছরের আমার ছোট কানাই, আশ্চর্য তোমার কথা। অকারণে তুমি লাঠি নিয়ে ওদের পেছনে ছুটছ। আমার বলরাম ও শ্যামসুন্দর খেলছে, স্নান করছে, খাচ্ছে, কুশলে আছে। পিতা নন্দ তো তাই চান।

যশোদার অপত্যস্নেহের বর্ণনা সকল ভক্ত বৈষ্ণব কবিই দিয়েছেন। কিন্তু পিতৃ-স্নেহের এই উদাহরণ সুরদাসের কাব্যের অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য; অন্যান্য কবিদের রচনায় নন্দর বাৎসল্য এরূপ প্রাধান্য লাভ করেনি।

কৃষ্ণকে যশোদা এবার হাত ধরে চলতে শেখাচ্ছেন—

সিখবতি চলন জসোদা মৈয়া।
অরবরাই কর পানি গহাবত, ডগমগাই ধরণী ধরেঁপৈয়া॥[১৭০]

—যশোদা [কৃষ্ণকে] চলা শেখাচ্ছেন। কৃষ্ণ টলমল চরণে যখন মাটিতে পা রাখছেন; টলমল করে পড়ে যাবার উপক্রম হলে যশোদা তাঁর হাত ধরে ফেলছেন। এর পর কৃষ্ণের মুখে কথা ফুটল—

কহন লাগে মোনে মৈয়া মৈয়া।
নন্দ মহর সৌঁ বাবা বাবা, অরু হলধর সৌঁ ভৈয়া॥[১৭১]

—মোহন এখন 'মা' 'মা' বলেন, ব্রজরাজ নন্দকে 'বাবা', 'বাবা' বলেন এবং বলরামকে 'ভৈয়া' বলেন।

কৃষ্ণের এক বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়ায় তাঁর জন্মোৎসব পালনের আয়োজন করা হয়েছে। যশোদা, নন্দ এবং ব্রজের সমস্ত গোপ-গোপীনীরা আনন্দে উৎফুল্ল। কৃষ্ণকে স্নান করাতে গেলে তিনি কান্নাকাটি করছেন। যশোদা মুখে নানা শব্দের ধ্বনি তুলে পুত্রকে ভুলিয়ে সুন্দর পোশাক পরাচ্ছেন। কৃষ্ণকে যশোদা কিভাবে সাজ-সজ্জা করাচ্ছেন তার নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন কবি। এই কাজের মধ্যে কবি যশোদার মাতৃহৃদয়ের আনন্দকে তুলে ধরতেও ভোলেন নি। কৃষ্ণের কর্ণছেদ উৎসবেও যশোদার মানসিকতাকে সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন সুরদাস। যশোদার মনের দুটি দিকই কবি সুস্পষ্ট করেছেন। পুত্রের কর্ণছেদ উৎসবের অঙ্গ, তা একদিকে যশোদাকে যেমন উৎসব করেছে, অন্যদিকে কর্ণছেদের মুহূর্তে পুত্রের শারীরিক যন্ত্রণার ভাবনা তাঁকে পীড়িত করেছে।

একটু বড় হবার পর থেকে কৃষ্ণ মা'র কাছে নানা আবদার করেন। যশোদা মুখে বিরক্তি প্রকাশ করেন, কিন্তু মনে মনে আনন্দ উপভোগ করেন। কিছুতেই স্নান করবেন না কৃষ্ণ; তেলের বাটি নিয়ে যশোদা তাঁর পিছে পিছে ছোটেন। হেরে গিয়ে কৃষ্ণ কেঁদে মাটিতে গড়াগড়ি যান। যশোদা তখন ভয় দেখান, তুমি স্নান করো না,— আমি মরে যাই। শেষ পর্যন্ত অনেক বুঝিয়ে স্নান করিয়ে নন্দের সংগে খেতে বসান। শিশুর প্রথম খাওয়া শেখার চমৎকার বাস্তব বর্ণনা দিয়েছেন সুরদাস—

জেঁবত কাহ্ন নন্দ ইকঠৌরে।
কছুক খাত লপটাত সোউ কর বালকেলি অতি ভোরে॥
বরা কৌর ফেলত মুখ ভীতর, মিরিচ দসন টকটৌরে।
তীছন লগী নৈন ভরি আএ, রোৱত বাহর দৌরে॥
ফুঁকতি বসন রোহিনী ঠাঢ়ী, লিএ লগাই অঁকোরে।
সূর-স্যাম কৌ মধুর কৌর দৈ কৃষ্ণে তাত নিহোরে॥[১৭২]

অর্থাৎ, নন্দ এবং কৃষ্ণ এক থালাতে খাচ্ছেন। বালকসুলভ স্বভাবে অবুঝ কৃষ্ণ কিছু খাচ্ছেন এবং কিছু দু'হাতে মাখছেন, কখনো মুখে বড় বড় গ্রাস দিচ্ছেন, খেতে খেতে লঙ্কা চিবানোতে ঝাল লেগেছে। চোখে জল ভরে এল, কাঁদতে কাঁদতে দৌড়ে বাইরে চলে এলেন। রোহিনী মা [তাই দেখে] তাঁকে কোলে তুলে নিলেন এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুখে ফুঁ দিতে লাগলেন। নন্দ তখন শ্যামসুন্দরের মুখে মিষ্টি গ্রাস তুলে দিয়ে তাঁর কান্না থামাচ্ছেন।

অতি পরিচিত ছবি। নিত্য-পরিচিত কিছু বস্তু আছে, যা কখনও পুরাতন বা বিবর্ণ হয় না। মাতৃস্নেহ এবং শিশুর লীলা তেমনি পুরাতন। অথচ চিরনূতন। কবি এই সত্য উপলব্ধি করেছেন। তাই বারবার তাঁর কাব্যে এই সব ছবি ধরা দিয়েছে।

কৃষ্ণের বয়স বাড়লেও ছেলেমানুষী দূর হয়নি। এখনও মায়ের বুকের দুধ খান। যশোদা বুঝিয়ে বলছেন, এবার এ অভ্যাসটা ছাড়। তোমার বন্ধুরা দেখলে হাসবে,

অমন সুন্দর দাঁতে পোকা হবে। কৃষ্ণের কিন্তু এসব কথা মনঃপূত নয়। তিনি দুষ্টুমির হাসি হেসে মায়ের বুকে মুখ লুকান।[১৭৩]

মায়ের দুধ ছেড়ে কি খাবেন কৃষ্ণ? কালো গোরুর দুধ। গোরুর দুধ খেতে কৃষ্ণ নারাজ। তাই যশোদা তাঁকে লোভ দেখাচ্ছেন—

কজরী কো পয় পিয়হু লাল, জাসোঁ তেরী বেনি বঢ়ৈ।
জৈসে দেখি ঔর ব্রজ বালক, ত্যৌঁ বল বৈস চঢ়ৈ।[১৭৪]

অর্থাৎ, কালো গোরুর দুধ খেলে তোমার বেণী বড় হবে। আর ব্রজবালকদের মতো গায়ে খুব জোর হবে।

মা'র কথা বিশ্বাস করে কৃষ্ণ দুধ খেতে রাজী হলেন। কিন্তু গরম দুধ খেতে গিয়ে জিভ পুড়ল, তিনি কাঁদতে লাগলেন। তখন যশোদা সস্নেহে সান্ত্বনা দিয়ে শান্ত করলেন ছেলেকে।

যশোদা কৃষ্ণকে কোলে বসিয়ে মুখের দিকে চেয়ে চেয়েই তৃপ্ত নন। ছেলে আপন মনে একা একা কেমন করে খেলা করে, তা তিনি আড়াল থেকে দেখে আনন্দ পেতে প্রয়াসী। কৃষ্ণ ছোট ছোট পা ফেলে উঠোনে নাচেন, গান করেন, দু'হাত তুলে নাম ধরে গোরুদের ডাকছেন, কখনো একটু একটু করে মাখন মুখে দিচ্ছেন, আবার মণিময় স্তম্ভে নিজের ছায়া দেখে অন্য কোনো বালক এসেছে ভেবে তাকে তাড়া করতে ছোটেন। যশোদা আড়াল থেকে এইসব দেখে পুলকিত হন॥

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের সুপরিচিত চাঁদের প্রসঙ্গটি সুরদাস বিস্তৃতরূপেই বিবৃত করেছেন। কৃষ্ণ বায়না ধরেছেন চাঁদ এনে দিতে হবে, তার সঙ্গে খেলা করবেন। যশোদা অনেক বোঝালেন, মিঠাই-মেওয়া দিয়ে ভোলাতে চাইলেন, বললেন, তোমাকে সুন্দর কনে এনে বিয়ে দেব,— কিছুতেই কৃষ্ণের মন ভোলে না, কান্না থামে না। হঠাৎ চাঁদের দিকে চেয়ে নতুন বায়না। বললেন, আমার খিদে পেয়েছে, চাঁদ খাব।[১৭৫] কত ভালো ভালো খাবার এনে সামনে রাখলেন যশোদা। কৃষ্ণ চাঁদ ছাড়া কিছুই খাবেন না বলে কাঁদতে লাগলেন। তখন যশোদা এক বুদ্ধি আঁটলেন। তিনি জল-ভরা একটি পাত্র এনে রাখলেন, তাতে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব পড়ল। সেই প্রতিবিম্ব দেখিয়ে যশোদা কৃষ্ণকে বলছেন—

লৈ লৈ মোহন, চন্দা লৈ।
কমল নৈন বলি জাউঁ সুচিত হৈব, নীচৈঁ নৈকুঁ চিতৈ॥
জা কারণ তৈঁ সুনিসুত সুন্দর, কীন্থী ইতী অরৈ।
সোই সুধাকর দেখি কন্থৈয়া ভাজন মাহিঁ পরৈ॥
নভ তৈঁ নিকট জানি রাখ্যৌ হৈ, জল-পুট জতন জুগৈ।
লৈ অগনে কর কাঢ়ি চন্দ কৌঁ জো ভাবৈ সো কৈ॥
গগন-মণ্ডল তৈঁ গহি আন্যৌ হৈ, পঞ্ছী এক পঠৈ।
সুরদাস প্রভু ইতী বাত কোঁ, কত মেরো লাল হঠৈ॥[১৭৬]

অর্থাৎ, মা বলছেন, মোহন, এবার চাঁদ নাও। তোমার আবদার দেখে একটা পাখিকে

আকাশে পাঠিয়ে চাঁদ ধরে এনে জলে রেখে দিয়েছি। এখন তুমি ওকে নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করো।

কৃষ্ণ কিছুতেই চাঁদ ধরতে পারছেন না। চেষ্টা করে করে তিনি শ্রান্ত। যশোদা পুত্রের অবস্থা দেখে বললেন— "তুব মুখ দেখি ডরত সসি ভারী।"[১৭৭] তোমার মুখ দেখে চাঁদ ভয়ানক ভয় পেয়েছে, তাই সে চোরের মতো পাতালে পালিয়ে গেল।

এ কথায় বালকের মন আত্মগৌরবে পূর্ণ হল। কেউ তাঁকে ভয় করে না, শুধু চাঁদ তাঁর মুখে বীরত্বের ব্যঞ্জনা দেখেই পালিয়েছে। সুতরাং অবুঝ ছেলের মতো কান্না সাজে না তাঁর। সুরদাস যে শিশুর মানসিকতা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন, এই পদটিতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

কৃষ্ণ এখন বন্ধুদের সঙ্গে পথে বেড়াতে বের হন। মাথায় নানা দুষ্টুমি ভরা। সখাদের সঙ্গে ঘরে ঘরে গিয়ে দই, ননী খেয়ে ফেলেন, আবার ভাঁড়গুলি ভেঙে দেন। গোপিনীরা যশোদার কাছে নালিশ করতে এলে তিনি চটে যান। নিজের ঘরে কত খাবার, কৃষ্ণ কেন যাবেন অন্যের বাড়ী চুরি করতে? আর অতটুকু ছেলে কি শিকেয় তোলা খাবারের নাগাল পান? উল্টে তিনি গোপিনীদের তিরস্কার করেন: "হাথ নচাৱত আৱতি গ্বারিনি, জীভ করৈ কিন থেরী।"[১৭৮] হাত নাচিয়ে, মুখ খিঁচিয়ে সব গোয়ালিনীরা ঝগড়া করতে এসেছে।

প্রথম প্রথম এমনি করেই গোয়ালিনীদের ফিরিয়ে দেওয়া হত। কিন্তু বারবার একই অভিযোগ পেয়ে যশোদা একদিন ক্রুদ্ধ হয়ে লাঠি নিয়ে তাড়া করে কৃষ্ণকে ধরে উদূখলের সঙ্গে বাঁধলেন। তাঁর কোমল হাত কঠোর বন্ধনে পীড়িত হল। কৃষ্ণের বেদনা দেখে গোপিনীরাও বলল, ওকে ছেড়ে দাও; আর কৃষ্ণ তো কাঁদতে কাঁদতে হেঁচকি তুলছেন। তখন যশোদা ছেলের বাঁধন খুলে দিলেন।

এই প্রসঙ্গটি সুরদাস বিস্তৃতভাবে বিবৃত করেছেন। স্বাভাবিকরূপেই ভাগবত পুরাণের ছায়া পড়েছে। তবে, পৌরাণিক পটভূমিকায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে আমাদের অতি পরিচিত একটি দুষ্টু ছেলে আর তার স্নেহান্ধ জননী,— যে মা কেউ ছেলের দোষ বলতে এলে ক্রুদ্ধ হয় এবং কখনো কখনো ছেলেকে ধরে মারে, যেন অভিযোগকারীদেরই শাস্তি দিতে।

গোচারণ কুলধর্ম। এখন কৃষ্ণের গোচারণে যাবার বয়স হয়েছে। তিনি নিজেও বাইরে যাবার জন্য উৎসুক। দাদা বলরাম এবং সখাদের সঙ্গে তিনিও গোচারণে যাবেন। যশোদা এ প্রস্তাবে বড়ই উদ্বিগ্ন। বনের মধ্যে কতদূরে চলে যাবেন, বিপদে পড়বেন, যমুনার জলে একা একা স্নান করতে গিয়ে হয়ত ডুবে যাবেন। তাছাড়া, সঙ্গে মণ্ডা-মেঠাই বেঁধে দিলেও ছেলেমানুষ নিজে নিজে কি খেতে পারবেন? হয়ত সারাদিন উপবাসেই কাটবে। তিনি চান, কৃষ্ণ সর্বদা তাঁর চোখের সামনে থাকবেন। তাই তাঁকে নিবৃত্ত করবার জন্য ভয় দেখান—

দূরি খেলন জনি জাহু ললা মেরে, বনমৈ আএ হাউ।[১৭৯]

—বাছা, আজ দূরে খেলতে যেও না, বনে আজ 'হাউ' এসেছে। কৃষ্ণ প্রশ্ন করলেন—

মা, হাউকে কে পাঠিয়েছে? নিকটে দাঁড়িয়ে বলরাম ভাবছিলেন, যে কৃষ্ণ পাতালে শেষনাগের শয্যায় থাকেন, তাঁকে ভয় দেখিয়ে কি হবে? বলরামের ভাবনা লৌকিক জগৎ থেকে সুরদাসকে উত্তীর্ণ করল ভক্তির জগতে। ভক্তির জয় হল, কিন্তু লৌকিক জগতের সহজ সুন্দর চিত্রটি গেল হারিয়ে।

একদিন বাড়ী ফিরে কৃষ্ণ যশোদার নিকট অভিযোগ করলেন—

মৈয়া মোহিঁ দাউ বহুত খিঝায়ৌ।
মোসোঁ কহত মোলকো লীন্হৌ, তু জসুমতি কব জায়ৌ!
কহা করৌঁ ইহি রিসকে মারে খেলন হোঁ নহিঁ জাত॥
পুনি-পুনি কহত কোন হৈ মাতা, কো হৈ তেরোঁ তাত।
গোরে নন্দ, জসোদা গোরী, তু কত স্যামল গাত।
চুটকী দৈ-দৈ গ্বাল নচাৱত, হঁসত সবৈ মুসুকাত॥
তু মোহী কোঁ মারণ সীখী, দাউহিঁ কবহুঁ ন খীঝৈ।
মোহন-মুখ রিস কীয়ে বাতেঁ, জসুমতি সুনি-সুনি রীঝৈ।[১৮০]

অর্থাৎ, মা, দাদা [বলরাম] আমাকে খেপায়। বলে তোমাকে কেনা হয়েছে। যশোদা তোমাকে কবে জন্ম দিয়েছেন? কি বলব। রাগে আমি খেলতে পর্যন্ত পারি না। দাদা বারবার জিজ্ঞাসা করে, তোর মা কে? বাবা কে? যশোদা ও নন্দ উভয়েই ফর্সা। তুমি তাঁদেব ছেলে হলে গায়ের রঙ শ্যামবর্ণ হল কেন? গোপ বালকেরা আমাকে ভুলিযে তুড়ি দিয়ে নাচায়, পরে তারাই আমাকে দেখে হাসাহাসি করে এবং মুচকে হাসে। তুমি তো শুধু আমাকে মারতে পার; বলরাম দাদাকে বকুনি পর্যন্ত দাও না।

কৃষ্ণের মুখে এইসব অভিমানের কথা শুনতে যশোদার ভালোই লাগে। কিন্তু কৃষ্ণ যখন দুঃখে কাঁদতে থাকেন তখন যশোদা তাঁকে বুকের উপর টেনে নেন এবং সান্ত্বনা দিয়ে বলেন— "হোঁ মাতা তু পুত।"[১৮১] অর্থাৎ, আমি মা এবং তুমি আমার পুত্র। যশোদার কাছে এর চেয়ে বড় সত্য নেই। আর সেই সত্য কত সংক্ষেপে, কত গভীর ও সুন্দর করে বলেছেন কবি।

বাৎসল্যের পরিবেশে নন্দ-যশোদা-কৃষ্ণ-বলরামের দিন ভালোই কেটে যাচ্ছিল। হঠাৎ এক রাত্রিতে নন্দ স্বপ্ন দেখলেন, হরি কোথায় হারিয়ে গেছেন; বলরাম ও মোহনকে [কৃষ্ণকে] কেউ কোথাও নিয়ে গেছে। স্বপ্নের কথা ভেবে নন্দ চিন্তিত—

উত নন্দহিঁ সপনৌ ভয়ৌ, হরি কহুঁ হিরানে।
বলমোহন কোউ লৈ গয়ো, সুনি কৈ বিলখানে॥[১৮২]

—নন্দের স্বপ্নের কথা শুনে যশোদা মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। দুঃস্বপ্ন কয়েক দিনের মধ্যেই সত্য হয়ে দেখা দিল। কংসের যজ্ঞশালায় যেতে হবে কৃষ্ণকে, অক্রুর তাঁকে নিতে এসেছেন। যে কংস কৃষ্ণকে জন্মকালেই হত্যা করতে চেয়েছিল, যার নিষ্ঠুর হৃদয় বজ্রের মতো কঠোর, সেই কংসের কাছে পুত্রকে পাঠালে পরিণতি কি হবে, তা ভেবে যশোদা মৃতপ্রায়। এদিকে রোহিণী বলছেন, কানাই-বলাই আমার প্রাণ। তাঁরা

মথুরা চলে গেলে কি নিয়ে বাঁচব ? শোকের আবেগে একবার তিনি মাটিতে গড়াগড়ি যান, আবার উঠে বসে চিৎকার করে কাঁদতে থাকেন।[১৮৩] নন্দ বোঝান, কংস কৃষ্ণের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। পূতনাবধ, অঘাসুর বধ প্রভৃতি কাহিনী বর্ণনা করে কৃষ্ণের অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় দিয়ে যশোদাকে নিশ্চিন্ত করতে চাইলেন; যশোদা তাতে খুব আশ্বস্ত হলেন না; অথচ শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যরূপ সহজ লৌকিক শোকের পরিবেশকে লঘু করে দিল।

শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণকে মথুরা যেতেই হল। নন্দ সঙ্গে গেলেন। অভিপ্রায় ছিল কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করে সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসবেন। কিন্তু ফিরলেন একা। যশোদা জিজ্ঞাসা করলেন— "কহাঁ রহ্যো মেরো মনমোহন।"[১৮৪] আমার মনোমোহনকে কোথায় রেখে এলে? কানাই-বলাইকে রেখে আসবার জন্য বারবার তিনি ধিক্কার দিতে লাগলেন নন্দকে।

যশোদা সর্বদা উন্মুখ হয়ে আছেন, কখন ফিরবেন কৃষ্ণ! ক্ষণে ক্ষণে ঘর-বাহির করেন। প্রতিবেশিনীরা বলে, শান্ত হও, সময় হলেই ছেলে ফিরে আসবে। কিন্তু কি করে তিনি শান্ত হবেন। যেদিকে চোখ ফেরান, পুত্রের স্মৃতিবিজড়িত চিহ্ন দেখতে পান।

জদ্যপি মন সমুঝাবত লোগ।
সূল হোত নবনীত দেখি মেরে, মোহন কে মুখ জোগ॥[১৮৫]

যশোদা বলছেন, লোকে আমাকে প্রবোধ দেয়; কিন্তু মাখন দেখলেই আমার হৃদয় শূলবিদ্ধ হয়; কারণ মাখন কৃষ্ণের বড় প্রিয় ছিল।

এদিকে কৃষ্ণ কংসকে বধ করে মথুরার রাজা হয়েছেন। দেবকী ও বসুদেবকে নিজের মাতা-পিতা হিসাবে চিনেছেন। রাজকার্যে ব্যস্ত। কৃষ্ণের বৃন্দাবনে আসবার সময় নেই। যশোদা সব কথা শুনে উন্মাদিনী।

ব্রজরাণী বলছেন—

হোঁ তৌ মাঈ মথুরা হী পৈ জৈ হোঁ
দাসী হৈব বসুদেব রাই কী, দরসন দেখত রৈহোঁ॥[১৮৬]

—যশোদা বিলাপ করছেন, আর তো কোনো উপায় নেই, আমি মথুরা যাব। সেখানে বসুদেবের বাড়ীতে দাসী হব। তাহলে মোহনকে সারাক্ষণ দেখতে পাব।

ব্রজের রাণী দাসী হতে চান পুত্রস্নেহের আকর্ষণে। তিনি কৃষ্ণকে খবর পাঠালেন—

কহিয়ো স্যাম সোঁ সমুঝাই।
য়হ নাতো নহিঁ মানত মোহন, মনৌ তুম্ভারী ধাই॥
এক বার মাঁখন কে কাজৈঁ রাখে মৈঁ অটকাই।
বাকৌ বিলগ ন মানো মোহন, লাগৈঁ মোহি বলাই॥
বারহিঁ বার য়হৈ লৌ লাগী, গহৈ পথিক কে পাইঁ।
'সূরদাস' য়া জননী কৌ জিয়, রাখৌ বদন দিখাই॥[১৮৭]

শ্যামকে বুঝিয়ে বলবে, যদি অন্য কোনো সম্বন্ধ মোহন স্বীকার না করতে চান, তবে অন্তত আমাকে যেন ধাত্রী হিসেবে স্বীকৃতি দেন। একবার মাখন চুরির জন্য বেঁধে রেখেছিলাম, কৃষ্ণের কি এখনো সেকথা মনে রয়েছে? কৃষ্ণের সব অমঙ্গল আমি মাথা পেতে নিচ্ছি, তাঁর মঙ্গল হোক। সুরদাস বলছেন, একবার দেখা দিয়ে জননীর প্রাণরক্ষা কর।

যশোদা কৃষ্ণকে মায়ের মতো পালন করেছেন, প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছেন। অথচ জঠর-জাত সন্তান নয় বলে তাঁর মাতৃত্বের অধিকার নেই। এই মর্মান্তিক বেদনা প্রকাশ করা যায় না। নিজের ছেলে নয়। তার জন্য এত শোক কেন, বলবে সবাই। যশোদা সর্বদা ভাবছেন, তাঁকে ছাড়া কৃষ্ণের না জানি কত অসুবিধা হচ্ছে। কারণ, কৃষ্ণের অভ্যাসের সঙ্গে তিনি পরিচিত। তাঁর ভালোলাগার জিনিস কি, কি তাঁর দরকার এবং কখন তা হাতে তুলে দিতে হবে— এসব তো একমাত্র যশোদাই জানেন। অতি বিনীতভাবে দেবকীকে তিনি বলে পাঠালেন—

সন্দেসো দেবকী সোঁ কহিয়ৌ।
হোঁ তো ধাই তিহারে সুত কী, ময়া করত হী রহিয়ৌ॥
জদপি টেব তুম জানতি উনকী, তউ মোহি কহি আবৈ।
প্রাত হোত মেরে লাল লড়ৈতৈ, মাখন রোটী ভাবৈ॥
তেল উবটনো অরু তাতো জল, তাহি দেখি ভজি জাতে।
জোই জোই মাঁগত সোই সোই দেতী, ক্রম ক্রম করি কৈন্থাতে॥
'সুর' পথিক সুনি মোহি রৈনি দিন, বচয়ে রহত ওর সোচ।
মেরো বালক লড়ৈতো মোহন, হৈবহৈ করত সঁকোচ॥[১৮৮]

—হে পথিক, দেবকীকে আমার এই কথা বলবে: আমি তোমার ছেলের ধাত্রী। আমি কৃষ্ণ সম্বন্ধে যেকথা জানাচ্ছি তাতে ক্ষুণ্ণ হয়ো না। স্নানের জন্য তেল, গরম জল ইত্যাদি দেখলেই কৃষ্ণ পালিয়ে যেতেন। তাঁর সব আবদার পূরণ করে তাঁকে স্নান করাতাম। তুমি তো ওর অভ্যাসগুলির সঙ্গে পরিচিত, তবু একান্ত মমতা-বশেই তাঁর রুচি সম্বন্ধে দু'একটি কথা জানাচ্ছি। সকালে ঘুম থেকে উঠেই আমার বাছার রুটি-মাখন খেতে ভালো লাগে। সুরদাস বলছেন, যশোদার ভাবনা তাঁর চোখের মণি বুঝি সর্বদাই সঙ্কোচ বোধ করছেন নতুন জায়গায়।

দেবকীকে পাঠানো খবর গিয়ে পোঁছল কৃষ্ণের কাছে। কৃষ্ণ উদ্ধবকে পাঠালেন বৃন্দাবনে। যশোদাকে বলে পাঠালেন, বলরাম দাদাকে নিয়ে আমি শীগগিরই যাচ্ছি তোমাকে দেখতে। তুমি শুধুই আমার ধাত্রী বলে নিজের পরিচয় দিয়েছ, এতে আমি বড় বেদনা পেয়েছি। তোমার স্তন্য পান করেছি সেকথা ভুলব কি করে? এখানে অনেক সুখ, তবু এখানে থাকা যায় না। কৃষ্ণ এইসব কথাই বলে পাঠালেন—

ঊধো ইতনী কহিয়ৌ জাই।
হম আবেঁগে দোউ ভৈয়া, মৈয়া, জনি অকুলাই॥
য়াকো বিলগ বহু হম মান্যো, জো কহি পঠয়ো ধাই।

বহু গুণ হমকোঁ কহা বিসরিহৈ, বড়ে কিএ পয় প্যাই ॥
অরুত জব মিল্যো নন্দ বাবাসোঁ, তব কহিয়ো সমুঝাই।
তোঁ লোঁ দুখী হোন নহি পারেঁ, ধোরী ধুমরি গাই ॥
জদ্যপি ইহাঁ অনেক ভাঁতি সুখ তদপি রহ্যো নহিঁ জাই।
'সূরদাস' দেখোঁ ব্রজবাসিনি, তব হাঁ হিয়ো সিরাই ॥[১৮৯]

কৃষ্ণ উদ্ধবকে এই বার্তাও যশোদাকে পৌঁছে দিতে বললেন—

নীকেঁ রহিয়ো জসুমতি মৈয়া
আবৈঁগে দিন চারি পাঁচ মেঁ, হম হলধর দোউ ভৈয়া ॥
নোঈ, বেঁত, বিষাণ, বাঁসুরী, দ্বার, আবের সবেরেঁ।
লৈ জনি জাই চুরাই রাধিকা, কছুক খিলৌনা মেরে ॥
জা দিন তৈঁ হম তুমভেঁ বিছুরে, কোউ ন কহত কন্হৈয়া।
উঠি ন সবেরে কিয়ো কলেউ, সাঁঝ ন চাষী ঘৈয়া ॥
কহিয়ে কহা নন্দ বাবা সোঁ, জিতো নিঠুর মন কীন্হো।
'সূরদাস' পহুচাই মধুপুরী, ফেরি ন সোধো লীন্হো ॥[১৯০]

—মা, তুমি ভালো থেকো, আমি ও দাদা চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই যাচ্ছি। তোমাকে ছেড়ে আসার পর থেকে আমাকে কানাই বলে কেউ ডাকেনি। সকালে কোনোদিন জলখাবার খাইনি। আর, বিকেলে দুধ দুইবার সময় দুধের ধারা সরাসরি আমার মুখে পড়ত, এখন তেমনটি আর হয় না। মা, আমার বাঁশীটি সামলে রেখো। আমার দড়ি, বিষাণ এবং ছোট লাঠিটিও সাবধানে রেখো। রাধা যেন চুরি করে না নিয়ে যায়। নন্দ বাবাকে বলো তাঁর এত কঠোর প্রাণ যে, মথুরা পৌঁছে দিয়ে আমাদের আর কোনো খবর নিলেন না।

শুধু বার্তা পেয়ে যশোদার বেদনার উপশম হয় না। তিনি বারবার উদ্ধবকে অনুরোধ জানালেন, একবার যেন কৃষ্ণ এসে দেখা দিয়ে যান। দই, ঘি, বাঁশী প্রভৃতির সঙ্গে যশোদা কৃষ্ণকে পাঠালেন বুকভরা আশীর্বাদ।

কৃষ্ণ তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেন নি। আর আসতে পারেন নি বৃন্দাবনে। শুধু আর একবাব দেখা হয়েছিল যশোদার সঙ্গে। সূর্যগ্রহণ উপলক্ষে গোপ-গোপিনীরা এলেন কুরুক্ষেত্রে। নন্দ যশোদাও এলেন পুত্রের সঙ্গে দেখা করতে। বহুজন বেষ্টিত কৃষ্ণকে একান্তে পাবার কোনো সুযোগ ছিল না।

যশোদার দুঃখ মাতৃহৃদয়ের চিরন্তন বেদনার প্রতীকী রূপও বলা যেতে পারে। সংসারের কর্মস্রোত একদিন মায়ের কোল থেকে সন্তানকে টেনে নিয়ে যায়, সে আর কখনো ফেরে এসে মায়ের শূন্য হৃদয় তেমন করে পূর্ণ করতে পারে না।

সূরদাস প্রথম শ্রেণীর বাৎসল্য রসের পদাবলী রচনা করেছেন একথা অনস্বীকার্য। সঙ্গে সঙ্গে তিনি যে যশোদার মাতৃহৃদয় সার্থক উন্মোচনে পারদর্শিতার প্রমাণ দিয়েছেন, তাও স্বীকার করতে হয়। হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী এই প্রসঙ্গে বলেছেন : "কহা জাতা হৈ কি সূরদাস বাল-লীলা বর্ণন করনে মেঁ অদ্বিতীয় হৈঁ ; মৈঁ কহুঁগা,

সূরদাস মাতৃ-হৃদয়কা চিত্র খীঁচনে মেঁ অপনা সানী নহীঁ রখতে।”[১৯১] অর্থাৎ, বলা যায়, বাল্যলীলা বর্ণনায় সূরদাস অদ্বিতীয় ; আমি বলি, মাতৃহৃদয় চিত্রণে তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।

যশোদার স্নেহ ছিল স্বার্থলেশহীন : “In the love of Yasoda and Nanda for Krishna, parental affection (Vatsulya Bhava), is displayed. This parental love is considered to be Prototype of true and selfless love.”[১৯২]

সূরদাস যশোদার বাৎসল্যকে অবশ্যই প্রাধান্য দিয়েছেন কিন্তু একমাত্র তাঁর বাৎসল্যই কবির উপজীব্য নয়। নন্দ, রোহিনী, এবং ব্রজবাসীদের কৃষ্ণের জন্য যে বাৎসল্যবোধ, তার চিত্রও সূরদারের রচনায় পাওয়া যায়। কৃষ্ণের এই সর্বজনপ্রিয়তার মধ্যে তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্বের কিছুটা আভাস পাওয়া যায়।

পূর্বেই বলা হয়েছে, সূরদাস প্রধানত ভাগবত অনুসরণ বরে কৃষ্ণেব বাল্যলীলার কাহিনী বর্ণনা করেছেন। কোথাও কোথাও ভাগবতানুসারী কৃষ্ণের ঐশ্বর্যরূপের আবির্ভাব বাৎসল্যের অনুভূতিকে ব্যাহত করেছে সত্য, কিন্তু তা সাময়িক। সূরদাসের বচনাবলীতে লৌকিক ও বাস্তবানুগ বাৎসল্যের অনুভূতি প্রাধান্য লাভ করেছে, কৃষ্ণের ঐশ্বর্যরূপ সরে গেছে পশ্চাতে।

এটা সম্ভব হয়েছে সূরদাসের রচনার গুণে। তিনি তুচ্ছ অথচ বাস্তব ঘটনা দক্ষতায় সঙ্গে চিত্রায়িত করে সৃষ্টি করেছেন ঘরোয়া পরিবেশ। অলৌকিক পরিমণ্ডল থেকে কৃষ্ণ নেমে আসেন আমাদের গৃহে। মা’র স্তন্যপানলোভী, স্নানে অনিচ্ছুক, লংকা চিবিয়ে ক্রন্দনরত বালক আমাদের সুপরিচিত যে কৃষ্ণ যশোদাকে নানা বিচিত্র আবদারে উত্যক্ত করেন, যিনি মথুরা গিয়েও তাঁর ছোট লাঠি ও দড়িটির কথা ভুলতে পারেন না, সেই বালককে আমরা অসীম শক্তিধর ভগবানের রূপভেদ হিসাবে ততটা নয়, যতটা ঘরের ছেলে হিসাবে গ্রহণ করতে উৎসুক।

এইসব বাস্তবানুগ বাৎসল্যরসসিক্ত ঘটনার মধ্য দিয়ে যশোদার মাতৃহৃদয় অশেষ নিপুণতার সঙ্গে উন্মোচন করেছেন সূরদাস। সেই দৃশ্যটি কী সুন্দর! যেখানে কৃষ্ণ একা একা উঠোনে খেলা করছেন, নেচে নেচে বেড়াচ্ছেন আর আড়াল থেকে যশোদা তা দেখে মুগ্ধ হচ্ছেন। সামনে আসছেন না, হয়ত কৃষ্ণ তাঁকে দেখে সংকোচ বোধ করে আপনমনে এই খেলা বন্ধ করবেন। কৃষ্ণের আবদার মেটাতে, তাঁকে স্নান করাতে, খাওযাতে কত কৌশল অবলম্বন করতে হত যশোদাকে। কখনো বলছেন সুন্দরী বৌ এনে দেব, আবার কখনো লোভ দেখাচ্ছেন, কৃষ্ণ ও বলরামের মধ্যে যে আগে ছুটে এসে খেতে বসবে সে রাজা হবে ; অনিচ্ছুক ছেলেকে দুধ খাওয়াবার জন্য বোঝাচ্ছেন, কালো গোরুর দুধ খেলে গায়ে খুব জোর হয়, আর তাহলে অন্য ছেলেরা কেউ তাঁর সঙ্গে লড়াইয়ে পেরে উঠবে না ; চাঁদ ধরতে পারছেন না বলে কৃষ্ণ যখন কাঁদছেন তখন যশোদা বুঝিয়ে বললেন, কৃষ্ণকে দেখে চাঁদ ভয় পেয়েছে, তাই পালিয়ে গেছে। একথা শুনে কৃষ্ণের মনে আত্মগৌরবের ভাব জেগে উঠল, তিনি শান্ত হলেন। এইসব প্রসঙ্গ

থেকে উপলব্ধি করা যায়, যশোদার তথা সূরদাসের শিশু-মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে বাস্তব জ্ঞান ছিল।

বাৎসল্যের পদগুলি যে সহজেই শ্রোতা বা পাঠকের মন গভীরভাবে আকৃষ্ট করতে পারে, তার একটি প্রধান কারণ সূরদাসের ভাষার বৈশিষ্ট্য। ব্রজমণ্ডলের লোকমুখে প্রচলিত ভাষাকেই কাব্যরচনার জন্য সূরদাস গ্রহণ করেছিলেন। ব্রজভাষাকে সাহিত্যের আসরে প্রথম মর্যাদা দিলেন তিনিই। প্রথম, কিন্তু তাই বলে ভাব প্রকাশে অপটু নয়। উপমা, অলংকার এবং বাগ্‌বাহুল্যে বিড়ম্বিত নয় তাঁর ভাষা। স্বচ্ছতা ও সাবলীলতাই এ ভাষার শক্তি। পাঠকের মন সরাসরি স্পর্শ করবার যোগ্যতাই এর অনন্যতা।

বাংলা সাহিত্যে সূরদাসের আলোচনায় অন্যতম পথিকৃৎ নলিনীমোহন সান্যালের বক্তব্য দিয়ে এই প্রসঙ্গটি শেষ করা যেতে পারে: "এই অপত্যস্নেহের নানা বৈচিত্র্য সূরদাস এমন তন্ন তন্ন করিয়া এবং এমন মধুরভাবে দেখাইয়াছেন যে উহা অমর হইয়া থাকিবে। যদি তিনি শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা মাত্র লিখিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন, তাহা হইলেও তিনি একজন শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া স্বীকৃত হইতেন।"[১৯৩]

পরমানন্দদাস

অষ্টছাপের আটজন কবির মধ্যে সূরদাসের পরেই পরমানন্দদাসের স্থান। শ্রীব্রজভূষণ শর্মা সম্পাদিত পরমানন্দ-সাগর গ্রন্থের প্রস্তাবনায় ডঃ দীনদয়ালু গুপ্ত পরমানন্দদাস সম্পর্কে বলেছেন— "হিন্দী মেঁ কৃষ্ণভক্তি সে সম্বন্ধিত কাব্য প্রচুর মাত্রা মেঁ উপলব্ধ হৈ। ...কৃষ্ণভক্ত কবিয়োঁ মেঁ বল্লভ সম্প্রদায় কে 'অষ্টছাপ' আঠ ভক্ত কবি বহুত প্রসিদ্ধ হৈ। য়ে হৈঁ সূরদাস, পরমানন্দদাস, কুম্ভনদাস, কৃষ্ণদাস অধিকারী, নন্দদাস, চতুর্ভুজদাস, ছীতস্বামী ঔর গোবিন্দস্বামী। ...ইন মেঁ ভী সূরদাস ঔর পরমানন্দ দাস অগ্রগণ্য হৈঁ। য়ে পরমভক্ত পরম দার্শনিক, পরম সংগীতজ্ঞ তথা পরম প্রতিভাসম্পন্ন কবি হৈঁ।[১৯৪] অর্থাৎ হিন্দীতে কৃষ্ণভক্তি সম্বন্ধীয় পদ প্রচুর আছে। কৃষ্ণভক্ত কবিদের মধ্যে বল্লভ সম্প্রদায়ের অষ্ট-ছাপের আটজন ভক্তকবি বিশেষ প্রসিদ্ধ। তাঁরা হলেন সূরদাস, পরমানন্দদাস প্রভৃতি। ...এঁদের মধ্যে সূরদাস এবং পরমানন্দ দাস অগ্রগণ্য। এঁরা পরম ভক্ত, পরম দার্শনিক, পরম সংগীতজ্ঞ এবং প্রতিভাসম্পন্ন কবি।

ডঃ দীনদয়ালু গুপ্তের কথার প্রতিধ্বনি পাওয়া যাবে প্রামাণিক বৈষ্ণব গ্রন্থ শ্রীহরি রায়জীব চৌরাসী বৈষ্ণব কী বার্তাতেও: "বৈষ্ণব তো অনেক শ্রী আচার্য জী কে কৃপাপাত্র হৈঁ পরন্তু সূরদাস ঔর পরমানন্দদাস য়ে দোউ সাগর ভয়ে।[১৯৫] অর্থাৎ, আচার্যের ঘৃণা তো অনেক বৈষ্ণবই পেয়েছেন, কিন্তু সূরদাস ও পরমানন্দ দাস ঘৃণা পেয়ে হলেন সাগর।

অষ্টছাপের অন্যান্য কবিদের মতো পরমানন্দদাসও তাঁর মাতা-পিতা, জন্মের তারিখ ও স্থান এবং কোথায় প্রথম জীবন কেটেছে, ইত্যাদি সম্পর্কে নীরব। তাঁর

রচনা থেকে কবির জীবন সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। তাই অনুমানের উপর নির্ভর করতে হয়। বল্লভ সম্প্রদায়ে একটি মত প্রচলিত আছে যে, পরমানন্দ দাস বল্লভাচার্য অপেক্ষা পনেরো বছরের ছোট ছিলেন এবং তিনি সুরদাসের প্রায় সমবয়সী। বল্লভাচার্যের জন্ম হয় ১৫৩৫ বিক্রমাব্দে। সে হিসাবে পরমানন্দদাসের জন্ম হয় ১৫৫০ বিক্রমাব্দে। চৌরাসী বৈষ্ণবন কী বার্তা অনুসারে কবির জন্মস্থান ফরুখাবাদের অন্তর্গত কনৌজে। এই গ্রন্থ থেকেই জানা যায় কবির মাতা-পিতা দরিদ্র ছিলেন। তাঁর জন্ম দিনে এক বণিক কবির মাতাপিতাকে অনেক দ্রব্য উপঢৌকন দিয়ে যান তাঁরা খুবই আনন্দিত হন এবং তাই নবজাত পুত্রের নাম রাখলেন পরমানন্দ দাস। কবি বাল্যকাল থেকেই জীবন সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন, বিবাহ করেন নি। বল্লভ-সম্প্রদায়ভুক্ত হবার আগে পরমানন্দদাস কীর্তন সমাজে সুপরিচিত ছিলেন তাঁর গানের জন্য। কবির শিক্ষা সম্পর্কেও কিছু জানা যায় না। তবে চৌরাসী বৈষ্ণবন কী বার্তা থেকে এইটুকু স্পষ্ট যে, বাল্যকাল থেকেই তাঁর পদ-রচনা এবং গান গাইবার দক্ষতা ছিল।[১৯৬]

পরমানন্দদাসের দীক্ষা সম্পর্কে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। বলা হয়, একবার মকর-স্নান উপলক্ষ্যে তিনি প্রয়াগে আসেন। সেখানে তিনি স্বপ্নাদেশ পান অড়েল গ্রামে গিয়ে বল্লভাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার। বল্লভাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পর কবি তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা দেখে অভিভূত হন।[১৯৭]

প্রথম সাক্ষাতেই পরমানন্দদাস বল্লভাচার্যকে গুরু হিসাবে বরণ করেন। সংবৎ ১৫৭৬-এ বল্লভাচার্য তাঁকে দীক্ষা দেন। এতদিন কবি মাথুর ইত্যাদি মধুরভাবের পদ রচনা করতেন এবং গাইতেন। বল্লভাচার্যের নির্দেশে তিনি কৃষ্ণের বাল্যলীলার পদ রচনা আরম্ভ করলেন।[১৯৮]

কিছুদিন অড়েল থাকার পর পরমানন্দদাস বল্লভাচার্যের সঙ্গে ব্রজ অভিমুখে যাত্রা করেন। এবং পরবর্তীকালে কবি পদ রচনা এবং মন্দিরে গোবর্ধননাথের সেবা ও কীর্তনগানের মধ্যে দিয়েই জীবন অতিবাহিত করেন। প্রভুদয়াল মীতল পরমানন্দ-দাসের শেষ জীবন প্রসঙ্গে এই মন্তব্য করেছেন।[১৯৯] কবির মৃত্যু সময় সম্পর্কেও কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তবে এইটুকু জানা যায় যে, পরমানন্দদাসের মৃত্যু কুম্ভনদাসের মৃত্যুর পরই হয়। কবি কুম্ভনদাসের মৃত্যু হয় ১৬৩৯ বিক্রমাব্দে; তাই অনুমান করা হয়, পরমানন্দ দাসের মৃত্যু হয় সুরদাস ও কুম্ভনদাসের মৃত্যুর পর ১৬৪০ বিক্রমাব্দের কাছাকাছি কোনো সময়।[২০০]

পরমানন্দদাসের পদগুলি বিচার করলে দেখা যায় কবি মূলতঃ বাৎসল্যভাব, কান্তাভাব ও দাস্যভাবে ভাবিত। ডঃ দীনদয়ালু গুপ্ত মন্তব্য করেছেন :

"পরমানন্দদাসকে কাব্য মেঁ ভগবদ্ প্রেম কে বিবিধ ভাবোঁ সে উদ্‌ভূত ভক্তি রস কে সাথ উচ্চ কোটি কা কাব্যানন্দ ভী হৈ জো জন-মন কো রস মগ্ন কর দেতা হৈ। উস কাব্য মেঁ বাৎসল্য, দাস্য ঔর মাধুর্য কী অবিরল প্রসন্নকারিণী ধারা প্রবাহিত হৈ। উসমেঁ প্রেম কী বহুরূপিণী অবস্থাওঁ কে মনোরম চিত্র অঙ্কিত হুএ হৈ।"[২০১] অর্থাৎ,

পরমানন্দদাসের কাব্যে ভগবৎ প্রেম উদ্‌ভূত বিচিত্র ভাব এবং ভক্তির সঙ্গে উচ্চ পর্যায়ের কাব্যানন্দ মিলিত হয়ে জনগণের মন রসমগ্ন করে তোলে। তাঁর কাব্যে বাৎসল্য, দাস্য এবং মাধুর্যের প্রসন্নকারিণী ধারা অবিরল প্রবাহিত। প্রেমের বিচিত্র রূপের মনোরম চিত্রও উদ্‌ভাসিত হয়েছে তাঁর কাব্যে।

হিন্দী সাহিত্যে বেশ কয়েকটি গ্রন্থ পরমানন্দদাসের নামে প্রচলিত। এ সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে পরমানন্দসাগর প্রামাণিক পদসংগ্রহ। প্রভুদয়াল মীতল স্পষ্টই বলেছেন: "ইন গ্রন্থো মেঁ কেৱল পরমানন্দসাগর হী উনকী স্বতন্ত্র এবং প্রামাণিক রচনা হৈ।"[২০২] অন্য একজন বিশেষজ্ঞও বলেছেন যে, পরমানন্দদাসের যেসব রচনা পাওয়া গিয়েছে তাদের মধ্যে পরমানন্দসাগর সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক।[২০৩]

পরমানন্দদাসের পদগুলির প্রাণবস্তু কৃষ্ণের ব্রজলীলা। কবির ভক্তহৃদয় তন্ময় হয়ে রচনা করেছে কৃষ্ণের বাল্য লীলা, গোপিনীদের আসক্তি, গোপী বিরহ তথা ভ্রমর গীত প্রভৃতি। পরমানন্দদাসের পদের মূল্যায়ন করতে গিয়ে অধ্যাপক বলদেব উপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন: 'অষ্টছাপ মেঁ সূরদাস ঔর পরমানন্দদাস য়ে দো হী সর্বশ্রেষ্ঠ মানে জাতে হৈঁ ক্যোঁ কি ইন দোনোঁ নেহী কৃষ্ণকী সম্পূর্ণ লীলায়োঁ কা গান সব সে অধিক মার্মিক শব্দোঁ মেঁ কিয়া থা।"[২০৪] অর্থাৎ, অষ্টছাপের কবিদের মধ্যে সূরদাস এবং পরমানন্দদাস উভয়কে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করা হয় কারণ, এঁরা অপূর্ব হৃদয়গ্রাহী কাব্যে কৃষ্ণের সম্পূর্ণ লীলাগান করেছেন।

সূরদাসের মতো পরমানন্দদাসও বাল্য-প্রীতি থেকে আরম্ভ করে যৌবনাবস্থার প্রণয় পর্যন্ত রাধাকৃষ্ণের প্রেমের বিচিত্র ছবি এঁকেছেন। শিশু কৃষ্ণ ও শিশু রাধা পরস্পরের খেলার সঙ্গী, কৃষ্ণ রাধাকে বলেন— "রাধে, ইহ নী কো হে খেলু।"[২০৫] রাধা, সেই ভালো আমরা খেলি। আবার, দুই শিশুর মধ্যে প্রচণ্ড ঝগড়াও হয়। দুরন্ত শিশুকৃষ্ণ খেলতে খেলতে রাধার গলার মালা ছিঁড়েছেন, রাধা ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন—

তুম মেরী মোতিন দর ক্যোঁ তোরী।
রহে ঢোটা, তোসোঁ নন্দমহর কহা করন কহী হে জোরী।[২০৬]

—তুমি আমার মোতির হার ছিঁড়েছ। নন্দকুমার, তোমায় কি বলব, তোমার জুড়ি নেই।

শুধু রাধার সঙ্গে শিশুকৃষ্ণের খেলার বর্ণনা দিয়েই কবি ক্ষান্ত হননি, বন্ধুদের সঙ্গে শিশুকৃষ্ণের নানা ধরনের খেলার বর্ণনাও রয়েছে। যেমন—

গোপাল মাঈ খেলত হৈঁ চৌগান।
ব্রজকুমার বালক সঙ্গ লীনে বৃন্দাবন মৈদান॥[২০৭]

অর্থাৎ, গোপাল বল নিয়ে ব্রজকুমারদের সঙ্গে বৃন্দাবনের মাঠে খেলছেন।

যদিও পরমানন্দদাসের বাৎসল্য-রসাশ্রিত পদগুলি সর্বাপেক্ষা সমাদৃত তথাপি রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা-বিষয়ক বেশ কিছু উৎকৃষ্ট পদও তিনি রচনা করেছেন। প্রভুদয়াল মীতল এই প্রসঙ্গে বলেছেন: "যদ্যপি পরমানন্দদাস কে কাব্য কা প্রধান বিষয় শ্রীকৃষ্ণ কী বাল-লীলাওঁ কা গায়ন হৈ, তথাপি উনোঁনে শৃঙ্গার-ভক্তি কে বিবিধ

অংগো কা ভী বিস্তার পূর্বক গায়ন কিয়া হৈ।"[২০৮]

কৃষ্ণের মোহনরূপে রাধা মুগ্ধ: "হরি কৌ মুখ-কমল দেখে লাগত নহিঁ পলক॥"[২০৯] হরি-মুখ-কমল দেখে চোখের পলক পড়ছে না। ধীরে ধীরে রাধার অন্তরে অনুরাগ সঞ্চারিত হচ্ছে। কিন্তু কৃষ্ণ-অনুরাগের যন্ত্রণাও আছে। পরমানন্দদাস পূর্বরাগের বেদনাকে প্রকাশ করেছেন:

জব তেঁ প্রীতি স্যাম সোঁ কীনী।
তা দিন তেঁ মেরে ইন নৈননি নেঁকহু নীঁদ ন লীনী॥[২১০]

—যেদিন থেকে শ্যামের সঙ্গে প্রেমে পড়েছি, সেদিন থেকে আমার চোখে ঘুম নেই।

শুধু পূর্বরাগ নয়, বাসকসজ্জা, অভিসার, সম্ভোগ এবং মান ইত্যাদির নিপুণ বর্ণনাও পরমানন্দদাস করেছেন: এবং বিভিন্ন ঋতু, বিশেষ করে বর্ষা, শরৎ ও বসন্ত পরমানন্দদাসের পদে উল্লেখযোগ্য স্থান পেয়েছে। তাঁর রচনায় ঋতুচক্রের আবির্ভাব সম্বন্ধে ডঃ দীনদয়ালু গুপ্ত বলেছেন: ভারতবর্ষের ঋতুগুলির মধ্যে বর্ষা, শরৎ ও বসন্ত তিনটি ঋতুই সুখকর। এই তিনটি ঋতুর উল্লাস ও উৎসাহে ভরা আনন্দোৎসবের বর্ণনা অষ্টছাপের সব কবিই করেছেন, কিন্তু এদিক দিয়েও সুরদাস ও পরমানন্দদাস প্রতিভায় ও নৈপুণ্যে অদ্বিতীয়।...বর্ষার ঝুলন-দোলা ও বর্ষা বিহারের রাস, শরতের বিমলচন্দ্র এবং পুষ্প সজ্জায় সুসজ্জিতা সুন্দরী রাধিকা, তাঁর চারিপাশে সখীরা উল্লাসে নৃত্য-গীত করছেন, কিংবা প্রকৃতির বিবিধ মনোরম প্রফুল্ল পরিবেশে দোলোৎসবের রঙিন বাসন্তীরাস, এই তিনটি রাসের সুখপ্রদ ছবি সুরদাসের রচনার মতো পরমানন্দসাগরেও পাওয়া যায়।[২১১]

অষ্টছাপের অন্যান্য কবিরা রাধাকৃষ্ণের মিলনের ছবি আঁকতেই ভালোবাসেন। কিন্তু সুরদাস, কুম্ভনদাস এবং পরমানন্দদাস তার ব্যতিক্রম।[২১২] বিরহবেদনায় আজ বিস্মৃত রাধা কিংবা অন্য গোপিনীরা পরমানন্দদাসের পদে করুণ অথচ মোহিনী মূর্তি নিয়ে আমাদের নিকট উপস্থিত হন। বেদনায় অন্যমনা রাধার একটি ছবি:

অনমনা বৈঠীএ রহৈ।
অন্তরগত কী বিথা মোহিনী কাহু সোঁ না কহৈ॥[২১৩]

—রাধা অন্যমনা হয়ে বসে আছেন। সুন্দরী নিজের অন্তরের ব্যথা কাউকে বলতে পারছেন না।

এই পদে রাধার অন্তরের অব্যক্ত যন্ত্রণার ছবিটি সুন্দরভাবে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে কয়েকটি সরল অনাড়ম্বর শব্দসমষ্টির সাহায্যে। প্রভুদয়াল মীতলও পরমানন্দদাসের বিরহের পদগুলিকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন: "পরমানন্দদাসকে কাব্য মেঁ শৃংগার ভক্তিকে সংযোগ ঔর বিয়োগ দোনোঁ পক্ষোঁ কা কথন হুআ হৈ, কিন্তু উনকে বিরহকে পদ অত্যন্ত উৎকৃষ্ট এবং প্রভাবোৎপাদক হৈঁ।"[২১৪] অর্থাৎ, পরমানন্দদাসের কাব্যে শৃংগার-ভক্তির মিলন ও বিরহ দুদিকের কথাই বলা হয়েছে; কিন্তু তাঁর বিরহের পদগুলি উৎকৃষ্ট, যা পাঠকের চিত্তে প্রভাব বিস্তার করে। বিরহ পূর্ণরূপে প্রকাশিত

হয়েছে ভ্রমরগীত বা গোপী-উদ্ধব-সংবাদে। ভ্রমরকে উপলক্ষ্য করে ব্রজাঙ্গনারা উদ্ভবকে নিজেদের অন্তরবেদনা জ্ঞাপন করেছেন। ডঃ দীনদয়াল গুপ্ত ও পরমানন্দ-দাসের ভ্রমরগীত-বিষয়ক পদগুলি খুবই মর্মস্পর্শী ও হৃদয়গ্রাহী বলে মনে করেন।[২১৫]

পরমানন্দদাস রাস, দোল বা ঝুলন ছাড়া অন্যান্য উৎসবের বর্ণনাও করেছেন। যেমন, দীপান্বিতা কিংবা গিরিগোবর্ধন-পূজো ইত্যাদি উৎসব সম্বন্ধেও পদ রচনা করেছেন।

অষ্টছাপের প্রত্যেক কবিই ব্রজভাষা ব্যববার করেছেন, কিন্তু সুরদাস ও পরমানন্দ-দাস এই ভাষার সাহিত্যরূপায়ণে অগ্রণী। তাছাড়া, পরমানন্দদাসের ভাষার সজীবতা, চিত্রময়তা ও সরসতা লক্ষণীয়।[২১৬] ভাষার এই গুণের জন্য কবি অল্প কয়েকটি কথায় গভীর কথা বলতে পেরেছেন। যেমন—

জা দিন তেঁ জাঁগন খেলত দেখ্যো জসোমতি কোপূতরী।
তব তেঁ গৃহ সোঁ নাতো টুটো জৈসে কাচো সুতরী।[২১৭]

—যেদিন থেকে যশোমতির পুত্রকে অঙ্গনে খেলতে দেখেছি, সেদিন থেকেই কাঁচের সুতোর মতো সংসারের বন্ধন ছিন্ন হয়ে গিয়েছে।

হিন্দী কৃষ্ণকাব্যে পরমানন্দদাস বাৎসল্যের কবি হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। অষ্টছাপের কবিরা প্রত্যেকেই কৃষ্ণকে অবলম্বন করে বাৎসল্যের ছবি এঁকেছেন। কিন্তু সুরদাসের পর পরমানন্দদাসই অষ্টছাপের কবিদের মধ্যে বাৎসল্য রসের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন।

সুরদাসের শিশু-কৃষ্ণ ও বাৎসল্য সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে S. M. Pandey and Norman Zide সমালোচকদ্বয়ও পরমানন্দদাসের বৈশিষ্ট্যকে স্বীকৃতি দিয়েছেন, —"All the poets of this sect have written poems on this subject (Vatsalya) and among these the poems of Surdas and of Paramanandadas are the most important.'[২১৮]

পরমানন্দদাসের পদে বাৎসল্য-রস সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে প্রভুদয়াল মীতল তাঁর যে বক্তব্যটি রেখেছেন সেটিও প্রণিধানযোগ্য: "ব্রজভাষা কাব্য মেঁ সুর ঔর পরমানন্দ বাৎসল্য রসকে সব শ্রেষ্ঠ কবি হৈঁ"[২১৯] অর্থাৎ, ব্রজভাষা-কাব্যে সুরদাস ও পরমানন্দদাস বাৎসল্য রসের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। পরমানন্দদাসের বাৎসল্যের বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি শুধু যশোদা ও নন্দের অপত্য স্নেহের ছবি এঁকেই ক্ষান্ত হননি; কৃষ্ণকে অবলম্বন করে দেবকী, বসুদেব, বলরাম, রোহিণী ও অন্যান্য গোপিনীদের বাৎসল্যের কথাও বলেছেন। তাছাড়া, কৃষ্ণের জন্ম থেকেই তাঁর কৃষ্ণলীলার কাহিনী আরম্ভ হয়েছে। পরমানন্দদাসের বাৎসল্যরসের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেই ডঃ দীনদয়াল গুপ্ত মন্তব্য করেছেন: "বাল চিত্রণ মেঁ সুর কী ভাঁতি পরমানন্দ স্বামী নে ভী বাল-স্বভাব, বাল-চেষ্টা ঔর বাল ক্রীড়াওঁ কা মনোবিজ্ঞানিক ঢঙ্গ সে চিত্রণ কিয়া হৈ।"[২২০] অর্থাৎ বালকের চরিত্র-চিত্রণে সুরদাসের মতো পরমানন্দদাসও বালকের স্বভাব, বালকের চেষ্টা এবং বালকের ক্রীড়া ইত্যাদির ছবি মনোবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিবৃত করেছেন।

পরমানন্দদাসের রচনায় মাতা-পিতার হৃদয়ের অপরিসীম স্নেহের প্রকাশ পেয়েছে কৃষ্ণের জন্ম মুহূর্ত থেকেই। কারাগারে কৃষ্ণের জন্ম হয়েছে, দেবকী ও বসুদেব পুত্রের জীবন রক্ষার জন্য ব্যাকুল :

বসুদেব দেবকী মতো উপায়ো পলনা মেলি লয়ো।[২২১]

—দেবকীর পরামর্শে বসুদেব উপায় ঠিক করলেন। তিনি কৃষ্ণকে ঝুলনায় নিলেন।

দুর্যোগপূর্ণ রাত্রি, অথচ পুত্রের জীবনরক্ষায় ভীত স্নেহ-ব্যাকুল মা দেবকীর অনুনয়ে চিন্তিত বসুদেব সেই ভয়াবহ রাত্রে যমুনা পার করে কৃষ্ণকে গোকুলে রেখে এলেন। পরমানন্দদাসের ভক্তহৃদয় কিন্তু শিশু কৃষ্ণকে দেবকী ও বসুদেবের স্নেহ ক্রোড়ে রেখেও তাঁর ঐশ্বর্যময় রূপের কথা বিস্মৃত হতে পারেন নি।[২২২]

অধিক বয়সে সন্তান পেয়ে নন্দের অপরিসীম আনন্দ— "আজু নন্দরায়কে আনন্দ ভয়ো।" সমস্ত গোকুলও আনন্দে মগ্ন, কিন্তু মা যশোদার আনন্দ অতুলনীয়। তিনি তাঁর পুত্র কৃষ্ণের মুখের দিকে শুধু চেয়েই আছেন: "বদন নিহারতি হৈ নন্দরাণী।" আবার কখনো তিনি কৃষ্ণকে দোলায় শুইয়ে আদর করছেন এবং দোলা দিচ্ছেন—

ঝুলো পালনে হো লালন লেহুঁ বলৈয়াঁ তেরী।
গাউঁ গীত কহি জসুমতি রাণী চুটকী দে-দে রীঝেরী॥[২২৩]

—যশোদা কৃষ্ণকে দোলনায় দোলাচ্ছেন এবং বলছেন বাছা, তুমি দোলনায় দোল; আমি তোমার বালাই নিই। আচ্ছা, আমি গান করি বলে যশোমতি রাণী প্রসন্ন অন্তরে গানের সঙ্গে তুড়ি দিচ্ছেন। পরিচিত ঘরোয়া আবহাওয়ার আমেজটি খুব ভালোভাবে ফুটে ওঠে পরমানন্দদাসের পদে।

পালনা ঝুলত বাল গোপাল।
গাদী বৈঠি ঝুলাবতি জসুমতি অতি ফুলী দেখতি ব্রজবাল॥
কবহুঁক গোদ রোহিনী লৈ কৈ বোলতি মৈঁ বলিহারী লাল।
কবহুঁক কনিয়াঁ লেতি গোপিকা ঝুঁঝনা দৈজু খিলাত উতাল॥[২২৪]

অর্থাৎ গোপাল দোলনায় দুলছেন। যশোদা গদিতে বসে দোলাচ্ছেন, আনন্দিত চিত্তে ব্রজবালারা তা দেখছেন। কখনো রোহিনী তাঁকে কোলে নিয়ে বলছেন— বাছা, আমি তোমার বলিহারী যাই, আবার কখনো গোপীনীরা কোলে তুলে ঝুনঝুনি দিয়ে তাঁকে খেলিয়ে আনন্দ দিচ্ছেন।

এমনি অজস্র সহজ সুন্দর ছবি ছড়িয়ে আছে পরমানন্দদাসের পদাবলীতে। তাঁর আর একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কৃষ্ণের জীবন কাহিনীর বিবরণ দেওয়া। কৃষ্ণের জন্মের ষষ্ঠদিনে ষষ্ঠীপূজা হবে। সকাল থেকে যশোদার ব্যস্ততার অন্ত নেই। তিনি—

কুঁবর নুৱাই জসোদা রাণী কুল দেব্যা কে পাই পরায়ো।[২২৫]

অর্থাৎ, কৃষ্ণকে স্নান করিয়ে যশোদা কুল-দেবতাকে প্রণাম করাচ্ছেন। সমস্ত ব্রজধাম আনন্দে উৎফুল্ল। আর ব্রজরাজ নন্দ ও মা যশোদা, "আনন্দে ব্রজরাজ জসোদা

মানহুঁ অধন ধন পায়ো ॥"[২২৬]

অর্থাৎ, আনন্দিত ব্রজরাজ ও যশোদাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন নির্ধন ধন পেয়েছেন।

এমনি নানা আনন্দ-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শিশু কৃষ্ণ ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠছেন। এবার যশোদা পুত্রের জন্য—

অনুপ্রাসন— দিন নন্দলাল কো করতি জসোদা মাঈ।[২২৭]

—যশোদা নন্দলালের অন্নপ্রাশনের দিন ঠিক করলেন। শুভদিনে পুত্রের মংগলাকাংক্ষায় কুলদেবীর বন্দনা করে, ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ ভিক্ষা করলেন। তারপর কোলে বসিয়ে পায়েস খাওয়ালেন— "জসুমতি রাণী খীর খবাৱত প্রথম শুভ দিন মানী।"[২২৮] এর কিছুদিন পরেই হ'ল কৃষ্ণের কর্ণচ্ছেদ অনুষ্ঠান। এমনি করে নবজাতককে কেন্দ্র করে পরিবারে যত অনুষ্ঠান হয় তার প্রত্যেকটি অবলম্বন করে পরমানন্দ দাস বাৎসল্যানুভূতির ক্রমবিকাশ বর্ণনা করেছেন।

এদিকে কৃষ্ণ ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠছেন। তাঁর প্রতিটি কাজ অন্যের চোখে যত অর্থহীন হোক না কেন, যশোদার কাছে তা পরম আশ্চর্যজনক। মাতৃহৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত স্নেহধারার বৈচিত্র্য রূপায়িত হয়েছে পরমানন্দদাসের রচনায়। তাই প্রতিটি উৎসব-অনুষ্ঠানেই যশোদার ভূমিকাটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। কৃষ্ণকে অবলম্বন করে প্রতিটি অনুষ্ঠানে তাঁর স্নেহকোমল মাতৃমূর্তি প্রত্যেকবার নবীনতর ও উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে। কৃষ্ণের কর্ণচ্ছেদ উৎসবের বর্ণনাতেও যশোদার স্নেহময়ী মাতৃরূপের অতুলনীয় প্রকাশ দেখা যায়। আর সেই সংগে রোহিণীর স্নেহ-কোমল রূপটিও মুগ্ধ করে—

কণক সূচী লৈ স্রৱননি দীনী বেধ ত বার ন লাগী।
বাল রুদন জব করনহি" লাগ্যো রোহিণী মাত লৈ ভাগী ॥
চুচকারতি চুম্বতি চাপতি হিয় লেউ বলৈয়া তেরী।
দেত দান নন্দরায় বিপ্রনি কোঁ কহে" পরমানন্দ টেরী ॥[২২৯]

—সোনার ছুঁচ দিয়ে কান বিঁধতে দেরী হ'ল না। সেই বেদনায় বালক কাঁদতে লাগলেন, অমনি রোহিণী তাঁকে নিয়ে গেলেন এবং মুখে শব্দ করে আদর করে চুমা দিয়ে বুকে চেপে ধরে বললেন, আমি তোমার সব যন্ত্রণা, সব অমংগল নিলাম। পরমানন্দদাস বলেন, এই উপলক্ষ্যে নন্দরাজ ব্রাহ্মণদের প্রচুর দক্ষিণা দিলেন।

কৃষ্ণের এক বৎসর পূর্ণ হ'ল। ব্রজরাজের গৃহে উৎসব। যশোদা আজ নানা কাজে ব্যস্ত। কখনো পুত্রকে স্নান করাচ্ছেন, কখনো সাজাচ্ছেন আবার কখনো— "তিলক করতি অচ্ছিত দৈ জসুমতি সুতকী লেত বলাঈ।"[২৩০] অর্থাৎ, যশোদা কৃষ্ণের কপালে তিলক পরিয়ে তাঁর সব অমংগল দূর করছেন।

পরমানন্দদাসের রচনায় শুধু যশোদার স্নেহকোমল মাতৃমূর্তি দেখতে পাই না, ব্রজের অন্যান্য গোপিনীদের বাৎসল্যের পরিচয়ও পাওয়া যায়। অন্য গোপিনীরাও যে কৃষ্ণের প্রতি স্নেহাসক্ত এবং সেজন্য যশোদার একটু ঈর্ষার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায় এই পদটিতে :

রহে রী ! গ্বালি জোবন মদমাতী।
মেরে ছগন মগন সে লালহি' কত লৈ উছঙ্গ লগাৰতি ছাতী
খীজত তেঁ অবহী রাখে হৈ' নাহ্নী নাহ্নী উঠতি দ্বৈ দুধকী দাঁতী
খেলনি দৈ ঘর জাই আপনেঁ ডোলতি কহা ইতৌ ইতরাতী ॥
উঠি চলী গ্বালি লাল লাগে রোৰন তব জসুমতি লাঈ বহু ভাঁতী।
পরমানন্দ ৰে ওট দৈ অঁচর ফির আঈ নৈননি মুসকাতী ॥[২৩১]

—যশোদা বলছেন, যৌবন মদমত্ত ব্রজবালা, কেন তুমি আমার ছোট বাছাকে এত জোরে বুকে জড়িয়ে ধরে রেখেছ? তিনি রাগ করে বলছেন, সবে ওর দুটো মাত্র দুধের দাঁত উঠেছে ; ওকে খেলা করতে দাও, তুমি বাড়ী যাও তো ! যৌবনোচ্ছ্বাসে কেন এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছ ? এই কথা শুনে ব্রজবালা উঠে যাবার উপক্রম করতেই কৃষ্ণ কাঁদতে আরম্ভ করলেন। বাধ্য হয়ে যশোদা গোপিনীকে অনুনয় করে ফিরিয়ে আনলেন। পরমানন্দ দাস বলেন গোপিনী মুখের উপর আঁচল টেনে দিলেন, আর তাঁর চোখে মৃদু হাসির আভাস দেখা দিল। পরমানন্দদাসের কাব্যে স্নেহাতুর গ্রাম্যরমণীর ভয় ও সংস্কার যশোদার চরিত্রে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

মার কাছে সন্তানের সামান্য কাজও অসামান্য। যেমন, কৃষ্ণ নিজে নিজে পাশ ফিরেছেন। যশোদার কাছে কৃষ্ণের এই কাজটি অসাধারণ কৃতিত্বের তাই আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে শুধু এ জন্যই উৎসব পালন করছেন :

করৰট প্রথম লঈ নন্দ নন্দন।
তাকৌ মহরি মহোচ্ছৱ মানত ভরন লিপায়ো চন্দন ॥[২৩২]

—নন্দ নন্দন প্রথম পাশ ফিরতে শিখেছেন। সেই আনন্দে মা যশোদা গৃহের সর্বত্র চন্দন লেপন করে মহোৎসব পালন করছেন।

শিশু কৃষ্ণ এখন আধো-আধো কথা বলেন, দুধের দাঁত দেখান, যশোদা তাতেই মুগ্ধ :

বারী মেরে লটকন পগু ধয়ো দুতিয়াঁ।
কমল নয়ন বলি জাও' বদন কী
সোহতি হৈ' নাহ্নী নাহ্নী দুধ কী দ্বে দঁতিয়াঁ।
ইহ মেরী ইহ তেরী ইহ বাবা নন্দ কী ইহ বলভদ্র কী
ইহ তাকী জ্যী ঝুঁলাবৈ তেবৌ পলনা।[২৩৩]

—মরে যাই ! আমার বুকের উপর তোমার টলমল পা দু'খানি রাখো। যশোদা বলছেন — কমল-নয়ন তোমার সুন্দর মুখে ছোট ছোট দুটি দুধের দাঁতের শোভা দেখে আমি আনন্দে আত্মহারা। এটা আমার, এটা তোমার, এটা বাবা নন্দের, এটা বলরাম দাদার আর এটা যে তোমার দোলনা দোলাবে তার।

কৃষ্ণ মাটিতে বসে খেলতে খেলতে সারা গায়ে ধুলো মেখেছেন আর সেই ধুলি-মলিন পুত্রকে কোলে তুলে নিয়েও যশোদা অভিভূত হয়ে পড়েন :

জনম-ফল মানতি জসোদা মাঈ।

জব নন্দলাল ধূরি-ধূসর বপু গরৈঁ রহত লপটাঈ ॥
গোদ বৈঠি গহি চিবুক মনোহর বাত কহত তুতরাঈ।
অতি আনন্দ প্রেম পুলকিত তন মুখ চুম্বতি ন অঘাঈ ॥[২৩৪]

—যশোদা নিজের জন্ম সার্থক মনে করেন যখন ধূলি-ধূসরিত-দেহ নিয়ে নন্দলাল তাঁর কোলে বসেন, গলা জড়িয়ে, চিবুক তুলে চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে আধো আধো কথা বলেন। যশোদার সমস্ত শরীর আনন্দে প্রেম-পুলকিত হয়ে ওঠে এবং তাঁর [কৃষ্ণের] মুখচুম্বন করেও যেন তিনি তৃপ্তি পান না।

যশোদার মনে নানা চিন্তা। তিনি ভাবেন কবে তাঁর ছেলে মাটিতে পা রেখে চলবে, কবে তাঁকে মা বলে ডাকবে, বাড়ীর নানা কাজে সাহায্য করবে। প্রত্যেক মায়ের মতো যশোদারও আকাঙ্ক্ষা তাঁর পুত্র তাড়াতাড়ি বড় হয়ে উঠুক। পরমানন্দদাস মায়ের অন্তরের ভাবনাগুলি তাঁর রচনায় সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন :

এক সমৈ জসুমতি অপনী সখী সোঁ বাত কহতি মুসিকাঁই।
মো দেখত কব ধোঁ মেরো ললনা ভূমি ধরহিঁগে পাঁই ॥
ফিরি মোসোঁ মঈয়া কব কহিহৈঁ কুঁবর কছুক তুতরাই।
অরিহৈঁ কবহুঁ দুধ দধি কারণ তন গোরজ লপটাই ॥
খরিক দুহাবন জাত মোহি কব আনি মিলহিঁগে ধাই।
বহ ধোঁ দ্যৌস হোইগো কবহুঁ ললন দুহেঁগে গাই ॥
সৌঁপি দেহুঁগী স তহি চরাবন গৈয়াঁ ঘর বনরাই।
ইহি অভিলাষ করতি জসুমতি জিয় পরমানন্দ বলি জাই ॥[২৩৫]

যশোদার আকাঙ্ক্ষা ধীরে ধীরে পূর্ণ হচ্ছে। কৃষ্ণ এখন সারা আঙিনায় খেলে বেড়ান, যশোদাও মাঝে মাঝে পুত্রের খেলায় যোগ দিয়ে অপরিসীম আনন্দ উপভোগ করেন :

মনিমৈ আঁগন নন্দকে খেলত দোউ ভৈয়া।
গোর স্যাম জোরী বনী বল কুঁবর কন্হৈয়া ॥
. .   . .
সঙ্গ-সঙ্গে জসোমতি রোহিণী হিত জহৈয়া।
চুটকী দৈ দৈ নচাবহী সুত জানি নহৈয়া ॥[২৩৬]

কৃষ্ণ মায়ের সঙ্গ ছাড়তে চান না। সমস্ত সময় মাকে তাঁর সঙ্গী হিসাবে চাই। কিন্তু যশোদা সংসারের নানা কাজে ব্যস্ত থাকেন ; কৃষ্ণ তাঁকে বিরক্ত করেন, কখনো আঁচল চেপে ধরেন, কখনো দধি মন্থন দণ্ড। তাই যশোদা বলছেন :

দধি-মাখন করৈ নন্দ-রাণী হো।
বাবে কন্হৈয়া অরি ন কীজৈ ছাঁড়ি ন দেহু মথানী হো ॥[২৩৭]

—বাছা কানাই, জিদ করো না, মন্থনদণ্ড ছেড়ে দাও। মা যশোদা কৃষ্ণকে শান্ত করার জন্য আরো বলছেন :

বারী মেরে মোহন কর পিরায়ঁগে কোন চিত্ত মেঁ ঠানী হো।

হঁসিমুসিকাই জননী-তনচিতয়ো বুবিসাগর কী আনীহো ॥[২৩৮]

—আমার বাছা মোহন, অমন করো না। তোমার হাত ব্যথা করবে। এমন জিদ কেন ধরেছ? কৃষ্ণ মায়ের দিকে চেয়ে হাসেন. তাঁর সাগর-মন্থনের কথা মনে পড়ছে।

পরমানন্দদাস একটি বাস্তব ছবি তুলে ধরেছিলেন, কিন্তু শেষ মুহূর্তে ভক্তির আতিশয্যে কৃষ্ণের উপর দেবত্ব আরোপ করে বাস্তব সৌন্দর্যের সবটুকু রক্ষা করতে পারেন নি। পরমানন্দদাসের রচনা পর্যালোচনা করলেই এ সত্যটি উপলব্ধি করা যায় যে সর্বপ্রথম তিনি ভক্ত, তাই ভক্তির প্লাবনে তাঁর সব কিছু ভেসে যায়। তিনি পার্থিব জগৎ ভুলে যান, কৃষ্ণকে সাধারণ মানব-শিশুর পর্যায় থেকে দেবতার আসনে বসিয়েই তিনি আনন্দে ও ভক্তিতে অভিভূত হন। কৃষ্ণ মাটি খেয়েছেন দেখে যশোদা সন্তানকে শিক্ষা দেবার জন্যে লাঠি হাতে এগিয়ে এলেন। ভয় দেখানোই যশোদার উদ্দেশ্য। পরমানন্দদাস কৃষ্ণলীলায় মুগ্ধ হয়ে কৃষ্ণের গুণ-গান করে বললেন, যশোমতীর হাতে দাড়ি-লাঠি দেখে ব্রহ্মা, মহাদেব বিস্মিত হয়ে চেয়ে আছেন।[২৩৯] কৃষ্ণের মহিমান্বিত রূপ প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে কবি তাঁর মুখ গহ্বরে বিশ্বরূপ দেখালেন যশোদাকে। "বদন উঘারি আভ্যন্তর দেখ্যো ত্রিভুবন রূপ বৈরাটী ॥"[২৪০]

অন্যদিকে পরমানন্দদাসের রচনার মধ্যে গ্রামীণ জীবনের অতি পরিচিত বাস্তব ছবিও সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। যেমন:

সকাল হতেই গোপ পরিবারে গো-দোহনের পালা শুরু হয়। স্বয়ং ব্রজরাজ গো-দোহন করেন। কৃষ্ণের ইচ্ছা হয় গো-দোহনে পিতার সঙ্গী হতে, এমনকি তিনি দোহন করতে চান। যশোদাকে গিয়ে তাই বলেন:

তনক কনক কী দোহনী দৈ দৈ রী মৈয়া।
তাত দুহন সিখবনি কহ্যো মোহি ধৌরী গৈয়াঁ ॥[২৪১]

—মা, আমাকে ছোট সোনার দুধ দুইবার পাত্র দাও। বাবা আমাকে ধবলী গোরুটি দুইতে শেখাবেন। যশোদা কৃষ্ণকে দুধ দুইবার পাত্র দিলেন। কৃষ্ণ পিতার কাছে এসে উপস্থিত। পুত্র দুধ দুইতে শিখুক, এই উদ্দেশ্যে নন্দ কৃষ্ণকে গোরু দুইতে দিয়ে সরে দাঁড়ালেন। কৃষ্ণ অপটু হস্তে দুধ দুইতে চেষ্টা করছেন। ঠিকভাবে বসতেও তিনি জানেন না, দুধের ধারা এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ছে, আর স্নেহমুগ্ধ পিতা দূর থেকে পুত্রের অপটুতা দেখে হাসছেন।

কৃষ্ণের নিত্যনতুন ইচ্ছা জাগে। একদিন সকালে তিনি যশোদাকে বললেন:

মৈয়া গাঁই চরাবন জৈ-হোঁ।
তু কহে নন্দ মহর বাবা সোঁ বডো ভয়ো ন ডরৈ হোঁ ॥
শ্রীদামা আদি সখা সব অপনে অরু দাউ সঙ্গ লৈহোঁ।
দহ্যো ভাতকাবরি ভরি লৈহোঁ ভুখেঁলাগে খৈহোঁ ॥
বংসীবট কী সীতল ছহিয়াঁ খেলত অতি সুখ পৈহোঁ।[২৪২]

—মা, আমি গোরু চরাতে যাবো। তুমি বাবাকে বলো আমি বড় হয়েছি, ভয় পাবো না। শ্রীদাম প্রভৃতি সখা এবং দাদার [বলরাম] সঙ্গে যাবো। সঙ্গে পাত্র ভরে দই

ভাত নেব, খিদে পেলে খাব। বংশীবটের শীতল ছায়ায় খেলতে খুবই ভালো লাগবে।

পুত্রের ইচ্ছার কথা শুনে যশোদা উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন। কৃষ্ণ ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠছেন, নানা কাজের দায়িত্ব তুলে নিচ্ছেন, যশোদার কাছে এর চেয়ে বেশি আনন্দের কি থাকতে পারে ; তাই আজ আনন্দিত চিত্তে তিনি গোচারণের জন্যে কৃষ্ণকে সাজাতে বসেছেন :

গাঁই চরাবন কৌ দিনু আয়ো।
ফুলী ফিরতি জসোদা অঙ্গ অঙ্গ লালন উবটি নুৱায়ো॥
ভূষণ বসন বিবিধ পহিরাত্র কজ্জর তিলকু বনায়ো।[২৪৩]

—গোচারণের দিন এসেছে। যশোদা গর্বিত চিত্তে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। পুত্রকে উবটন দিয়ে স্নান করাচ্ছেন। বিবিধ ভূষণ পরিয়ে চোখে কাজল ও কপালে তিলক দিচ্ছেন।

রোহিণীর সঙ্গে কৃষ্ণের স্নেহের সম্পর্কও কবির রচনায় স্থান পেয়েছে। কৃষ্ণ গোচারণে যান, বলরাম ও অন্যান্য সখারা কৃষ্ণকে খেপান। এর বিরুদ্ধে নালিশ কিন্তু যশোদার কাছে নয়, কারণ কৃষ্ণ জানেন তাঁর কাছে বলরামের বিরুদ্ধে কিছু বলে কোনো লাভ নেই। তাই কৃষ্ণ নালিশ করতে এসেছেন বলরামের মা রোহিণীর কাছে। কৃষ্ণকে অবলম্বন করে রোহিণীর স্নেহের প্রকাশ কবি দক্ষতার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন :

দেখিরী রোহিণী মইয়া ! ঐসে হেঁ বল ভঈয়া।
জমনা কে তীর মোকোঁ জুজু আ বুলায়ো॥
সুবল শ্রীদামা সাথ হঁসি-হঁসি মিলৱত হাথ।
আপ ডরপ্যো অরু হোঁ হী ডরপায়ো॥
জহাঁ জহাঁ বোলেঁ মোর, চিত্তৱৈ তিনকী ওর।
ভাজোরে ভাজোরে ! ভঈয়া ও হৈ দেখি আয়ো॥
আপু চঢ়ে তরু মোহি ছাঁড়ি ধরু।
ধর-ধর ছাতী কিয়ে ঘরহুঁ কো ধায়ো॥[২৪৪]

—দেখ গো রোহিণী মা, বলরাম দাদা কি রকম ! যমুনার তীরে ডেকে এনে আমাকে ভয় দেখায়। সুবল শ্রীদামের সঙ্গে হেসে হেসে যুক্তি করে আমাকে খেপায়। নিজেরা ভয় পায়, আমাকেও ভয় দেখায়। যেদিকে ময়ূর ডাকে সেদিকেই ওদের মন যায়। "পালারে পালা ভাই, ঐ দেখ এলোরে" বলে নিজেরা গাছের উপর চড়ে যায়। আমাকে গাছের তলায় রেখে দেয়। আমি ছুটে বাড়ী এসেছি। দেখ আমার বুক কেমন ধুকপুক করছে।

লপকি লিয়ো উঠাই, উরসোঁ রহী লগাই।
মেরো রী ! মেরো কহি হিয়ো ভরি আয়ো॥
'পরমানন্দ' বোল দ্বিজ বেদ মন্ত্র পঢ়ি পঢ়ি।
বছিয়া কী পুছসোঁ হাথ দিৱায়ো॥[২৪৫]

—রোহিণী তাঁকে কোলে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। মরি মরি বাছা, তোমার কষ্টে আমারও যে কষ্ট হচ্ছে। পরমানন্দ বলেন, তখনই রাণী ব্রাহ্মণ ডেকে বেদমন্ত্র পাঠ করালেন এবং কৃষ্ণকে বাছুরের লেজ হাতে ধরালেন।

কৃষ্ণের সকালে সহজে ঘুম ভাঙ্গে না, বিছানা ছেড়ে তিনি উঠতে চান না। তাই যশোদাকে প্রত্যেক দিন নানা প্রলোভন দেখিয়ে, কখনও বা আদর করে, ঘুম থেকে তুলতে হয় :

উঠু গোপাল ! প্রাতকাল দেখোঁ মুখ ভেবোঁ।
পাছেঁ গৃহ কাজ করোঁ নিত্য নেমঁ মেরোঁ ॥[২৪৬]

—যশোদা কৃষ্ণকে আদর করে বলছেন, গোপাল ওঠো, সকালে তোমার মুখ দেখে তারপর আমি আমার গৃহকাজ আরম্ভ করি, এটাই আমার নিয়ম। যশোদা কৃষ্ণকে জাগাবার জন্য আদর করে আরো বলেন— "রবি কী কিরণ প্রকট ভঈ উঠৌ লাল নিসা গঈ।"[২৪৭] সূর্যকিরণ প্রকাশিত হচ্ছে, বাছা রাত শেষ হয়েছে।

শুধু ঘুম থেকে তোলা নিয়ে নয়, কৃষ্ণকে নিয়ে মা'র নানা জ্বালা। খেলার আকর্ষণে কৃষ্ণ খেতে ভুলে যান। "কাহ্ন কহাঁ হৈ খেলত।" —দেখতো কানু কোথায় খেলছে ? যশোদাকে নানা জায়গায় খুঁজে বেড়াতে হয়। —"ঢূঁঢতি ফিরতি জসোদা মাতা," —খাওয়াবার জন্যে ডাকাডাকি করতে হয়।

ভোজন কোঁ বোলতি মহতারী।
বল-সমেত আবহু মেরে লালন। বৈঠে নন্দ পরোসেঁ থারী ॥
খীর সিরাত স্বাদ নহিঁ আৱৈ বেগি গসা তুম লেহু মুরারী।[২৪৮]

—খাওয়ার জন্যে মা ডাকছেন। বলদেবের সঙ্গে আমার মোহন এসো। নন্দ থালার সামনে তোমাদের অপেক্ষায় বসে আছেন। ক্ষীর ঠাণ্ডা হয়ে গেলে ভালো লাগবে না। তাড়াতাড়ি মুখে গ্রাস তুলে নাও, মুরারী।

কৃষ্ণ খেলা ছেড়ে আসতে চান না। তাই যশোদা বলেন, খেয়ে শরীর সুস্থ করে সুবল শ্রীদামের সঙ্গে খেলা করো। আবার কখনো নিজের হাতে তিনি কৃষ্ণকে খাইয়ে দিচ্ছেন :

হরি ভোজন করত বিনোদ সোঁ।
করি করি কৌর মুখারবিন্দ মেঁ দেতি জসোদা মোদ সোঁ ॥[২৪৯]

—হরি আনন্দে ভোজন করছেন। মা আনন্দে ভাত গ্রাস করে কৃষ্ণের মুখে তুলে দিচ্ছেন। তাছাড়া, নানা খাদ্যের প্রলোভনও তিনি দেখান যাতে কৃষ্ণ সহজে খেয়ে নেয়। "মধু মেৱা পকৱান মিঠাঈ দুধ দহী ঘৃত ওদ সোঁ।"[২৫০] অর্থাৎ, মধু নেওয়া, মিষ্টি দুধ, দই যা তাঁর ইচ্ছা করে তাই কৃষ্ণ খেয়ে নিন। আবার কখনো কৃষ্ণ খেতে আসছেন না দেখে ভয় দেখিয়ে যশোদা তাঁর মোক্ষম অস্ত্র প্রয়োগ করে বলেন, যে তিনি আর তাঁর মা হবেন না, বলভদ্রের মা হবেন। তখন কৃষ্ণ সব খেলা ফেলে ছুটে এসে যশোদার গলা জড়িয়ে ধরেন, আর মা শান্তি পান : "দৌরি কে' কণ্ঠ লগে মনমোহন মেরী সোঁ, মেরী সোঁ মেরো কহ্যো।"[২৫১]

—মনমোহন ছুটে এসে যশোদাকে জড়িয়ে ধরলেন, আর যশোদা আমার সোনা, আমার সোনা, আমার কানাই, বলে আদর করতে লাগলেন।

কৃষ্ণ বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে যশোদার কৃষ্ণকে নিয়ে আরো নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। কৃষ্ণ তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে বৃন্দাবনের ঘরে ঘরে গিয়ে চুরি করেন। শিকেয় তোলা দুধ-দই-ননী নামিয়ে এনে খান, যা খেতে পারেন না তা ছড়িয়ে ছিটিয়ে নষ্ট করেন। অতিষ্ঠ হয়ে হয়ে শেষ পর্যন্ত গোপিনীরা যশোদার কাছে নালিশ করে বললেন— "তেরে লাল মেরোঁ মাখনু খায়ো।"[২৫২] তোমার ছেলে আমার মাখন খেয়েছে। কিন্তু যশোদা তাঁদের কথা বিশ্বাস করেন না। কৃষ্ণ কোনো অন্যায় করতে পারে, একথা তাঁর কাছে অবিশ্বাস্য। স্বভাবতই তিনি গোয়ালিনীর উপরই ক্ষুব্ধ হন।

গ্বালিনি। তোপেঁ ঐসোঁ ক্যোঁ কহি আয়ো।
মেরে ঘর-ঘর বাত স্যামঘন তাহি তেঁ দোসু লগায়ো॥
ঘর হি কোঁ মাখন দুধ ন ভাবৈ তেরোঁ দহোঁ ক্যোঁ খায়ো।[২৫৩]

—গোয়ালিনী, তুমি এমন কথা কি করে বললে? ঘনশ্যাম সবার ঘরে যায় তাই তোমরা দোষ দিচ্ছ। অথচ, ও বাড়ীর মাখন, দুধই খায় না তোমার দই কেন খাবে? কৃষ্ণের উপর দোষারোপ করায় যশোদা এত ক্রুদ্ধ হয়েছেন যে তিনি নন্দরাজের গো-সম্পদের অহংকার প্রকাশ করে বলেছেন, কৃষ্ণ তাঁদের দুধ দই যা খেয়েছেন, তা সব তিনি ফিরিয়ে দেবেন:

গোরস কহা দিখাবনি আঈ।
ইতনো লৈ খায়ো নন্দজুকে ঢোটা বদলি লেহি মেরী মাঈ॥[২৫৪]

যশোদা সাধারণ গ্রাম্য মেয়েদের মত পুত্রের হয়ে প্রতিবেশিনীদের সঙ্গে কোমর বেঁধে ঝগড়া করছেন। এবং সব বাগবিতণ্ডার মধ্য দিয়ে তাঁর মাতৃহৃদয়ের বাস্তবোচিত প্রকাশ ঘটেছে। কবি দেখাচ্ছেন যশোদা স্নেহান্ধ, ছেলের কোন দোষ থাকতে পারে এটা তাঁর বিশ্বাসের অতীত। মাতৃ-হৃদয়ের এই সব চিত্রের সাহায্যে কবি লৌকিক ও অলৌকিক বাৎসল্যের মধ্যে মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। যশোদা গোয়ালিনীদের আবার বলছেন:

ইতনক—সোঁ গোপাল কহা করি জানে দধি কী চোরী।
কাহে কোঁ আবতি হাথ নচাবত জীভ ন করহী থোরী॥[২৫৫]

আরে, আমার ছোট্ট গোপাল দই চুরি করতে জানেই না। হাত নাচিয়ে ঝগড়া করতে তোমাদের জিভে আটকায় না?

ছেলে ধীরে ধীরে বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে মা'র মনে গোপন আকাঙ্ক্ষা জাগে একটি মনের মতো বৌ ঘরে আনবার। কৃষ্ণ একদিন আবদার করে মাকে বললেন,— মা, আমার এমন বৌ চাই যে তাঁকে কোলে বসিয়ে আদর করবে, নানা রকম মিষ্টি রান্না করে আদর করে নিজের হাতে খাওয়াবে। শুনে যশোদা বললেন— "ওহো মেরে লাল। কহোঁ বাবা সোঁ তেরা কহ্যোঁ করাবৈ॥"[২৫৬] — আহা বাছা, তোমার বাবাকে বলবো কোথাও বিয়ে ঠিক করতে।

এরপরই বৃষভানুর কন্যার সঙ্গে কৃষ্ণের বিবাহের দিন নির্ধারিত হচ্ছে। এবং "আজু লাল কী হোত সগাই।"—আজ আমার বাছার বিয়ে, তাই মা যশোদা আনন্দে ও অহংকারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন— "ফুলী ফিরতি জসোদা রানী।"[২৫৭] যশোদা রাণী গর্বে চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। পুত্রের বিয়ে, নন্দগৃহে উৎসব, নানা বাদ্য বাজছে, সবাই আনন্দে মত্ত, যশোদা কর্মব্যস্ত হয়েও আনন্দে বিভোর।

এমনি করেই শৈশব কৈশোরের দিনগুলি মাতৃস্নেহচ্ছায়ায় কেটে যায়। এর পর কৃষ্ণকে মথুরায় যেতে হ'ল। কৃষ্ণহীন-বৃন্দাবনে নেমে এলো চিরন্তন অন্ধকার। রাধা ও ব্রজের অন্যান্য গোপিনীরা অসহনীয় বিরহ যন্ত্রণা ভোগ করছেন। বয়স্কা গোপিনীরা কৃষ্ণহীন বৃন্দাবনে পুত্রের বিচ্ছেদ বেদনা অনুভব করেন। বেদনাতুর এক বৃদ্ধা বলছেন :

গোপাল-বিনু কৈসে কৈ ব্রজ রহিবে।
ধুসর-ধূরি উঠাই গোদ লৈ লাল বরন সোঁ কহিবে।[২৫৮]

—গোপাল ছাড়া ব্রজে কিভাবে থাকব, ধূলি ধূসরিত দেহ কোলে তুলে 'বাছা' বলে কাকে ডাকব !

পুত্রের বিচ্ছেদে মা বেদনা পাবেন এটা স্বাভাবিক। কিন্তু কবির বৈশিষ্ট্য এই যে, বৃন্দাবনের স্নেহাসক্ত অন্য নারীরাও কৃষ্ণের জন্যে ব্যাকুল। ডঃ দীনদয়ালু গুপ্ত এই প্রসঙ্গে বলেছেন : "শৃঙ্গার-রতি কী বিয়োগ-দশা কে চিত্রণ কে সাথ পরমানন্দদাস নে কুছ পদ বাৎসল্য-বিয়োগ পর ভী লিখে হৈ। ইন পদোঁ মেঁ যশোদা তথা মাতৃ-হৃদয়া, বাৎসল্য ভাব ধারিণী অন্য ব্রজাঙ্গনাওঁ কী বিরহ বেদনা কে চিত্র ভী অঙ্কিত কিয়ে গয়ে হৈ।"[২৫৯] অর্থাৎ, শৃঙ্গার-রতির বিরহদশার বর্ণনা কবি যেমন দিয়েছেন, তেমনি বাৎসল্যরসাশ্রিত কিছু বিরহের পদও তিনি রচনা করেছেন। এসব পদে যশোদার পুত্রের জন্য যে বেদনা অনুরূপ বেদনার ব্যাকুলতা অন্যান্য ব্রজরমণীদের অন্তরে মূর্ত হয়ে উঠেছে। দীর্ঘদিন হয়ে গেছে কৃষ্ণ মথুরা চলে গেছেন। বাৎসল্য-বিরহে অধীর একজন গোপিনী যশোদাকে এসে প্রশ্ন করছেন

জসোদা! মধুবন তেঁ আজু— কালি তেরে হু কোউ আযৌ ?
বহুত দ্যোস বিদিত গএ সঁদেসৌ ন পায়োঁ॥
কৈসে তোহি নীন্দ পরে কৈসে গৃহ ভাবৈ।
জাকী নিধি ছুটি জাই ধীরজ কৈসে আবৈ॥
গোপিনি কে বচন সুনত বিলখাতি নন্দরাণী।
পরমানন্দ প্রীতি জানি নয়ন স্রবৈ পানী॥[২৬০]

অর্থাৎ, যশোদা, মথুরা থেকে আজ-কালের মধ্যে কেউ এলো? কতদিন হয়ে গেল, কৃষ্ণের কোনো সংবাদ পাচ্ছি না। কেমন করে যে তোমার ঘুম হচ্ছে, কেমন করে যে তুমি ঘরে আছ! যার অন্তরের নিধি চলে যায়, সে যে কি করে ধৈর্য ধরে থাকে! গোপিনীর কথা শুনে নন্দরাণীর দুচোখ থেকে উচ্ছ্বসিত অশ্রুধারা পড়তে লাগল।

তবু যশোদার যন্ত্রণা হৃদয়বিদারক। অন্য বয়স্কা-গোপিনীদের সঙ্গে তাঁর

বেদনার তুলনা চলে না। তিনি দিনরাত শুধু পথ চেয়ে আছেন কবে তাঁর পুত্র তাঁর কোলে ফিরে আসবে। কৃষ্ণের নাম উচ্চারিত হলেই তাঁর চোখ জলে পূর্ণ হয়ে যায়।

প্রাত জসোদা পন্থ নিহারতি নিরখতি সাঁঝ-সকারে।
জো কোউ কাহু-কাহু কঁহি টেরত অঁখিয়ান বহত পনারে॥[২৬১]

উদ্ধব বৃন্দাবন এসেছেন কৃষ্ণের সংবাদ দিতে। কাজ শেষ হতেই তিনি ফিরে চলেছেন মথুরায়। গোপিনীরা তাঁদের বেদনার কথা কখনো প্রচ্ছন্নভাবে, কখনো শ্লেষাত্মকভাবে, আবার কখনো বা চোখের জলের মধ্য দিয়ে কৃষ্ণের কাছে বলে পাঠাচ্ছেন। কিন্তু যশোদার কণ্ঠে শ্লেষ নেই, ক্রোধ নেই, তাঁর হৃদয় যন্ত্রণাক্লিষ্ট, চোখ অশ্রুপূর্ণ; কোনো অভিযোগ না করে তিনি পুত্রের জন্যে আন্তরিক আশীর্বাদ পাঠাচ্ছেন।

কহিয়ো জসোদা কী আসীস।
জহাঁ রহহু তহাঁ লাড লডহু মেরে জীবহু কোটি বরীস॥[২৬২]

—উদ্ধব, কৃষ্ণকে যশোদার আশীর্বাদের কথা বলো। আমার আদরের বাছা যেখানেই থাক সেখানেই সে কোটি বর্ষ আয়ু লাভ করুক।

কবি নন্দের পুত্র বিচ্ছেদের যন্ত্রণাময় অন্তরও তুলে ধরতে ভোলেন নি। উদ্ধবের হাতে পুত্রকে তিনি কি পাঠাবেন? স্নেহের পাত্র, হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ ধন তাঁকে দেওয়ার কি শেষ আছে? তিনি উদ্ধবের হাত দিয়ে দুধ দুইবার পাত্র ভরে কৃষ্ণের সবচেয়ে আদরের ধবলী গোরুর দুধে তৈরী ঘি পাঠালেন।[২৬৩]

উদ্ধব যখন মথুরা ফিরে চলেছেন তখন নন্দ আর চোখের জল রোধ করতে পারলেন না:

কহত নন্দ উধো কে আগে নেন নীর ভরি আবত।
মন্দ-ভাগ হম ব্রজ কে বাসী কৃষ্ণ-বিনা দুখ পাবত॥[২৬৪]

—অশ্রুসজল চোখে নন্দ উদ্ধকে বললেন— আমরা ব্রজবাসীরা মন্দভাগ্য, কৃষ্ণ বিনা দুঃখ পাচ্ছি।

সত্যি কৃষ্ণ বিনা যশোদা ও নন্দের কাছে সমস্ত ব্রজপুরীই অন্ধকার। নন্দ উদ্ধবের সংগে কৃষ্ণের কাছে যে খবর পাঠিয়েছেন, তা থেকেই নন্দ-যশোদার অন্তরের তীব্র বেদনা সুস্পষ্ট:

নন্দ নিহোরৌঁ বহুত কিয়ো।
সুনহু স্রবন দৈ স্যাম-মনোহর! মুখ সঁদেস দিয়ো॥
এক বার মুখ-কমল দিখাবহু হিত করি গোকুল আবহু।
জননী-তাত কো নাঁতো মানৌঁ সো কাহে বিসরাবহু॥[২৬৫]

অর্থাৎ, শ্যামসুন্দর মন দিয়ে শোনো, নন্দ অনেক অনুনয় করে আমাকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছেন। একবার অন্তত তোমার মুখ-কমল গোকুলে এসে দেখিয়ে যাও। যাঁদের জনক জননীর মতোই মনে কর, তাঁদের কি করে ভুলে গেলে।

ব্রজ গোপিনীদের বিরহের সংগে যেমন রাধার বিরহবেদনার তুলনা চলে না,

তেমনি বৃন্দাবনের অন্যান্য বয়স্ক ও বয়স্কা গোপ-গোপিনীদের দুঃখের সঙ্গে নন্দ-যশোদার যন্ত্রণার তুলনাও বাতুলতা। পরমানন্দ অসামান্য কৃতিত্বের সঙ্গে নন্দ যশোদার স্নেহাতুর আর্ত হৃদয়ের হাহাকার মূর্ত করেছেন।

তবে সূর্যগ্রহণ উপলক্ষে কুরুক্ষেত্রে বৃন্দাবনের গোপ-গোপিনীর সঙ্গে নন্দ-যশোদাও কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। সুরদাসের মতো পরমানন্দদাসও এই প্রসঙ্গটি উল্লেখ করে বলেছেন :

নন্দ-জসোদা উঠি-উঠি ভেটত আপুনে ললনু।[২৬৬]

—নন্দ-যশোদা উঠে নিজের পুত্রের সঙ্গে দেখা করলেন।

সমস্ত হিন্দী বৈষ্ণব সাহিত্যে সুরদাসের পর পরমানন্দদাসই কৃষ্ণের জন্ম থেকে মথুরায় রাজা হওয়া পর্যন্ত, কৃষ্ণের জীবনখণ্ডের মধ্যে বাৎসল্যের ক্রমবিবর্তনটি তুলে ধরেছেন।

পারমানন্দদাসের পদাবলী পাঠকের বারবারই সুরদাসের রচনার সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্যের কথা মনে পড়বে। এই সাদৃশ্যের কারণ সহজেই অনুমেয়। দুই পদকর্তারই কাব্যরচনার উৎস ছিল ভাগবত। কিন্তু ভাগবতের বিভিন্ন প্রসঙ্গ বিবৃত করতেও তাঁরা একই ধারা অবলম্বন করেছেন। দুই কবির মধ্যে মূল পার্থক্য হ'ল এই যে, সুরদাসের রচনা কাব্য-সুষমায় অধিকতর সমৃদ্ধ, পরমানন্দদাসের পদাবলীতে ভক্তিরসের প্রাধান্য।

নন্দদাস

রচনার উৎকর্ষের দিক থেকে বিচার করলে, অষ্টছাপের কবিদের মধ্যে সুরদাসের পরেই নন্দদাসের স্থান। প্রভুদয়াল মীতলও এই কথা বলেছেন: অষ্টছাপকে কবিয়োঁ মেঁ সুরদাসকে উপরান্ত নন্দদাস কী হী বিশেষ প্রসিদ্ধি হৈ।"[২৬৭] রামকুমার বর্মাও এই কথারই প্রতিধ্বনি করেছেন।[২৬৮] নন্দদাসের রচনা থেকে তাঁর জীবন-বৃত্তান্ত কিছুই পাওয়া যায় না। ভক্তমাল গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, তিনি রায়পুর গ্রামে থাকতেন। 'দো সৌ বাবন বৈষ্ণবনকী বার্তা' গ্রন্থে তাঁকে পূর্বদেশের লোক বলা হয়েছে। 'অষ্টসখান কী বার্তা'র একটি হস্তলিখিত পুঁথিতে নন্দদাসকে রামপুরের লোক বলা হয়েছে। এই রামপুর কোথায় বলা কঠিন। এই প্রসঙ্গে 'হিন্দী সাহিত্য কা বৃহৎ ইতিহাসে' বলা হয়েছে: "ইনকে আধার পর কেবল ইতনা কহা জা সকতা হৈ কি নন্দদাস গোকুল, মথুরা সে পূর্ব কী ওর স্থিত রামপুর গ্রামকে রহনেবালে থে। রামপুরস্থান কী ঠীক ঠীক স্থিতি কা পতা নহীঁ লগ সকা হৈ।"[২৬৯] অর্থাৎ, উপরোক্ত গ্রন্থগুলির উপর নির্ভর করে কেবল এটুকু বলা যায় যে, নন্দদাস গোকুল এবং মথুরা থেকে পূর্বদিকে অবস্থিত রামপুর গ্রামে থাকতেন। রামপুর ঠিক কোথায় অবস্থিত তা জানা যায় না।

ভক্তমাল গ্রন্থে তাঁকে উচ্চকুলের ব্রাহ্মণ বলা হয়েছে। বার্তা গ্রন্থেও তাঁকে ব্রাহ্মণ বলা হয়েছে, কিন্তু এ দুই গ্রন্থেই তাঁর মা-বাবার কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। 'দো সৌ বাবন বৈষ্ণবন বার্তা' গ্রন্থে নন্দদাসকে রামচরিত মানসের রচয়িতা

তুলসীদাসের ভ্রাতা বলা হয়েছে। তবে নন্দদাস তুলসীদাসের সহোদর ভাই ছিলেন, কি জ্ঞাতি ভাই ছিলেন, সে সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট উল্লেখ নেই। 'অষ্টসখান কী ৰার্তা' গ্রন্থে বলা হয়েছে, বিঠ্ঠলনাথের শরণাপন্ন হবার পর তিনি নন্দদাসকে কিছুদিন সুরদাসের সংসর্গে রাখেন। কাঁকরোলীর বৈষ্ণবদের মধ্যে কিংবদন্তি আছে, সুরদাস এই সময় সাহিত্য-লহরী গ্রন্থটি রচনা করেন নন্দদাসের মনে একাগ্রতা আনার জন্যে এবং তাঁর বিদ্যার অহমিকা চূর্ণ করার জন্যে। ডঃ দীনদয়ালু গুপ্ত প্রমাণ করেছেন যে, সুরদাসের সাহিত্য-লহরী ১৬১৭ বিক্রমে লিখিত হয়।[২৭০] এ থেকেই অনুমান করা যায়, নন্দদাস বিঠ্ঠলনাথের শরণাপন্ন হন আনুমানিক ১৬১৬ বিক্রমের কাছাকাছি কোনো সময়। কিংবদন্তি আছে, নন্দদাস এরপর সাংসারিক জীবনে ফিরে যান। গোস্বামী বিঠলনাথ গোকুলে স্থায়ী বসবাসের পর আনুমানিক ১৬২৪ বিক্রমের কাছাকাছি সময়ে নন্দদাস আবার গোস্বামী বিঠ্ঠলনাথের শরণাপন্ন হন এবং এরপর কখনো গোবর্ধন ছেড়ে কোথাও যাননি। 'দো সৌ বাৱন বৈষ্ণৱন কী বার্তা'তে বলা হয়েছে, যখন নন্দদাস গোস্বামী বিঠ্ঠলনাথের শিষ্য হন তার অব্যবহিত পূর্বেও তাঁর লৌকিক জীবনের প্রতি প্রচণ্ড আকর্ষণ ছিল। তিনি সে সময় তুলসীদাসের সঙ্গে কাশীতে থাকতেন। তখন তিনি বিবাহিত ছিলেন কিনা তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। অনুমান করা হয় যে, বিবাহের কিছুদিন পর বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নেন এবং রামানন্দ সম্প্রদায়ভুক্ত হয়ে কাশীতে বসবাস আরম্ভ করেন। এ সময় তিনি সংসার-বিরাগী হয়ে তুলসীদাসের সঙ্গে থাকতেন। নন্দদাসের বয়স তখন পঁচিশ বা ছাব্বিশ বছর ছিল বলে অনুমান করা হয়। ১৬১৬ বিক্রমাব্দে বিঠ্ঠলনাথের শরণাপন্ন হয়েছিলেন নন্দদাস। আগে-পরে যেসব সাল তারিখের উল্লেখ আছে নানা প্রসঙ্গে তা থেকে মনে হয়, তাঁর জন্ম ১৫৯০ বিক্রমে। কিন্তু সব কিছুই আনুমানিক।[২৭১] ডঃ দেবেন্দ্রনাথ শর্মা মন্তব্য করেছেন: "নন্দদাসকে জন্ম ঔর মৃত্যুকে সময়কে সম্বন্ধ মেঁ নিশ্চিত রূপ সে কুছ কহনা অসম্ভব হৈ।"[২৭২] অর্থাৎ, নন্দদাসের জন্ম ও মৃত্যুর সময় সম্বন্ধে নিশ্চিতরূপে কিছুই বলা যায় না। তবে দো সৌ বৈষ্ণৱ কী ৰার্তাতে আছে নন্দদাসের মৃত্যু বীরবল ও গোস্বামী বিঠ্ঠলনাথের জীবিতকালেই বীরবলের মৃত্যু হয় ১৬৪২ বিক্রমে। নন্দদাস-এর আগেই মারা যান। ঐতিহাসিকেরা বলেন, আকবর তাঁর উদার মতবাদ দীন-ইলাহী প্রচারের পূর্বে বীরবলের সঙ্গে প্রায়ই হিন্দুদের দেবমন্দিরে যেতেন এবং সাধক ও ভক্তদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁদের উপদেশ শুনতেন। খুব সম্ভব আকবর বীরবলের সঙ্গে গোবর্ধনেও আসতেন। এবং নন্দদাসের পদ দ্বারাও বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন। ঐতিহাসিকেরা ১৬৩৯ বিক্রমের দু' তিন বৎসর পূর্বেই আকবরের এই মানসিক অবস্থার নির্দেশ দিয়েছেন। এসব থেকে অনুমান করা যেতে পারে, ১৬৩৯ বিক্রমের কাছাকাছি সময়ে নন্দদাস মারা যান।[২৭৩]

কবির প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কেও কিছুই জানা যায় না। তবে তাঁর রচনা পাঠ করে স্পষ্টই বোঝা যায়, তাঁর পাণ্ডিত্য কত গভীর ছিল। ব্রজভাষায় নন্দদাসের

বিশেষ অধিকার ছিল তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। তাছাড়া সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল, তা না হলে ভাগবতের দশম স্কন্দের এমন অপূর্ব ভাবানুবাদ করা সম্ভব হতো না।

নন্দদাসের নামাঙ্কিত প্রায় ২৮টি গ্রন্থ পাওয়া যায়। তবে, প্রমাণ ও তথ্যাদির অভাবে সমস্ত গ্রন্থগুলি নন্দদাসের রচিত কিনা তা নিশ্চিত করে বলা চলে না। বিষয়বস্তু ও ভাষার বৈশিষ্ট্য পরীক্ষা করে চৌদ্দটির লেখক যে নন্দদাস, এমন সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। এই চৌদ্দটি গ্রন্থের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দুটি গ্রন্থ হ'ল: 'রাস-পঞ্চাধ্যায়ী' এবং 'সিদ্ধান্তপঞ্চধ্যায়ী'।

সুরদাসের মতো নন্দদাসের পদাবলীও ভক্তিরস-সমৃদ্ধ; কিন্তু নন্দদাসের রচনায় কাব্যগুণের ঔজ্জ্বল্য হয়তো অধিকতর আকৃষ্ট করে। দেবেন্দ্রনাথ শর্মা নন্দদাসের রচনা আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন: "ইন রচনাওঁ কো দেখনে সে য়হ স্পষ্ট হৈ কি সুরদাস কী ভাঁতি নন্দদাস কে লিয়ে কবিতা কেবল ভক্তি কা সাধন হী নহীঁ থী; বহ স্বয়ং সাধ্য ভী থী— অর্থাৎ শুদ্ধ কবিতাকে উদ্দেশ্য সে ভী উন্‌হোনে কবিতা কী হৈ, জিসমেঁ ভক্তি কা কোঈ স্পর্শ নহীঁ হৈ...।'[২১৪] অর্থাৎ, এঁর রচনা দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায়, সুরদাসের মতো কবিতা কেবলমাত্র ভক্তিসাধনার পথ নয়, এগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থাৎ শুদ্ধ কবিতা হিসাবেও সার্থক, তাতে ভক্তির কোনো স্পর্শ নেই।

সমালোচক হয়তো বোঝাতে চাইছেন যে, ভক্তি-নিরপেক্ষ মানদণ্ডেও নন্দদাস কবি হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভের অধিকারী।

এসব গ্রন্থ ছাড়া নন্দদাসের অ-গ্রন্থিত পদাবলী তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি; অবশ্য সব পদগুলিই প্রথম শ্রেণীর নয়। তবে, সাধারণত এইসব পদ নিঃসন্দেহে কাব্য সুষমা-মণ্ডিত হয়ে একটি সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে।

কবির মঙ্গলচরণের পদগুলিতে তাঁর ভক্ত হৃদয়ের প্রকাশ:

> বেদ রটত, ব্রহ্ম রটত, সম্ভু রটত, সেস রটত,
> নারদ-সুক-ব্যাস রটত পারত নহিঁ পার রী॥[২১৫]

—তাঁর গুণগান বেদ রটনা করছেন, ব্রহ্মা রটনা করছেন, শিব রটনা করছেন, শেষনাগ রটনা করছেন। নারদের মুখ থেকে শুনে ব্যাসদেব রটনা করেও এর শেষ করতে পারছেন না।

নন্দদাসের ভক্তহৃদয়ের পরিচয় শুধু মঙ্গলাচরণ পদেই নয়, তাঁর গুরুস্তবগুলির মধ্যেও উপলব্ধি করা যায়।[২১৬]

নন্দদাস হনুমানেরও জয়গান রচনা করেছেন। সুতরাং অনুমান করা হয়, নন্দদাস রামচরিত-মানস রচয়িতা তুলসীদাসের ভ্রাতা। কবি দীর্ঘদিন তাঁর কাছে ছিলেন। ফলে, গোস্বামী বিঠ্‌ঠলনাথের শিষ্যত্ব গ্রহণ করার পরও তুলসীদাসের প্রভাব সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। আর তাই কৃষ্ণভক্ত কবি, যাঁর কাব্যপ্রেরণা ভাগবত, তিনি হনুমানের জয়গান করেছেন:

> সিন্ধু পার পহুঁচ্যো পবনপুত দূত শ্রীরঘুনাথ কো।

ছুট্যো জানো ধনুখ তে সর পরম সুভট হাথ কো ॥[২৭৭]

—শ্রীরঘুনাথের দূত হয়ে পবননন্দন সিন্ধু পার হয়ে পৌঁছালেন [লংকায়], যেন পরম শ্রেষ্ঠ হস্তের ধনুকের বাণ ছুটে এলো ।

বল্লভ সম্প্রদায়ের কোনো কবিই এ ধরনের পদ রচনা করেন নি। ব্রজরত্নদাস কবির এই বৈশিষ্ট্য আলোচনা করে বলেছেন : "ঐসা জ্ঞাত হোতা হৈ কি অপনে ভাই গোস্বামী তুলসীদাসজীকে প্রভাব কে কারণ হী ইনহোনে ঐসা কিয়া হৈ ক্যোঁকি অষ্টছাপকে অন্য কবিয়োঁ নে ঐসে পদ নহীঁ বনাএ হৈঁ।"[২৭৮]

নন্দদাস মূলত মধুররসের কবি। তাঁর সমস্ত কাব্যধারা আলোচনা করলে এটি সহজেই সুস্পষ্ট হয়। তাছাড়া, কবির রচনার মধ্যে মিলনাত্মক পদগুলিই প্রাধান্য পেয়েছে। তবে, অন্যান্য বিষয়ক পদও তিনি রচনা করেছেন। সেদিক থেকে নন্দদাসের পদে বৈচিত্র্যের অভাব নেই।

যেমন কৃষ্ণের গুণগান শুনেই রাধার অন্তরে পূর্বরাগ উৎপন্ন হয়। কবি রাধার অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন :

কৃষ্ণ নাম জব তৈঁ স্রবণ সুন্যো রী আলী,
ভূলী রী ভৱন হোঁ তো বাৱরী ভঈ রী
ভরি ভরি আৱৈঁ নৈন, চিতহূঁ ন পরৈ চেন,
মুখহূ ন আৱৈ বৈন, তন কী দসা কছু ঔর ভঈ রী।[২৭৯]

—রাধা বলছেন, সখি, কৃষ্ণনাম যবে থেকে শুনেছি ঘর ভুলেছি, পাগলিনী হয়েছি, চোখে জল ভরে আসছে, হৃদয়ে শান্তি পাচ্ছি না, মুখে কথা সরছে না, দেহের অবস্থার কথা কিছু বলার নয়।

কৃষ্ণ অনুরাগিণী রাধার বর্ণনায় নন্দদাস অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ফলে, রাধা হয়ে উঠেছেন স্পষ্ট ও জীবন্ত। এরপরেই দেখা যায়, রাধা কৃষ্ণের রূপে মুগ্ধ। চোখের পলকও বাধা সৃষ্টি করছে। চোখ ভরে কৃষ্ণের রূপমাধুরী রাধা দেখতে পাচ্ছেন না। "দেখন দৈ মেরী বৈরন পলকৈঁ।"[২৮০] —কৃষ্ণের রূপ দেখতে আজ চোখের পলকও আমার শত্রুতা করছে।

রাধার রূপ বর্ণনাতেও নন্দদাস পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর অনন্য-সাধারণ রূপ শুধু কৃষ্ণকে নয়, যে তাঁকে দেখে সেই সম্মোহিত হয়। একটি পদে নন্দদাস বলছেন— রাধা মান করেছেন, একজন সখী তাঁকে ডাকতে এসেছেন। সখী এসে রাধাকে দেখে এত মুগ্ধ হয়েছেন যে, তিনি স্বয়ং রাধার রূপ দেখবেন না কৃষ্ণকে ডেকে এনে দেখাবেন, তা ভেবে পাচ্ছেন না।

নন্দদাস প্রভু দোউ বিধি হী কঠিন পরী।
দেখিবোঁ করোঁ, কিধোঁ লাল হী দিখাউঁ ॥[২৮১]

বল্লভাচার্য ও তাঁর পুত্র গোস্বামী বিঠ্ঠলনাথ স্বকীয়া প্রেমে বিশ্বাসী। স্বভাবতই তাঁর সম্প্রদায়ভুক্ত সকলেই এই মত বিশ্বাস করতেন। নন্দদাসও তাঁর ব্যতিক্রম নন। তাই তিনি সাড়ম্বরে রাধা-কৃষ্ণের বিবাহ দিয়েছেন :

দুলহ গিরিধরলাল ছবীলো দুলহিন রাধা গোরী।[২৮২]

—বর গিরিধারীলাল, বধূ গৌরবর্ণা সুন্দরী রাধা।

বল্লভ সম্প্রদায়ের অষ্টছাপের প্রত্যেক কাব্য সংগ্রহ নিয়ে যদি আলোচনা করা যায়, তবে নিঃসন্দেহে সুরদাসের কাব্য সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর কাব্যের গভীরতা অনস্বীকার্য। কিন্তু কাব্যের সুষমা ও সৌন্দর্য বিচারে নন্দদাস সর্বোৎকৃষ্ট। 'হিন্দী সাহিত্য কা বৃহৎ ইতিহাসে' নন্দদাসের কবিকৃতি সম্পর্কে আমাদের উপরোক্ত বক্তব্যের অনেকটাই সমর্থিত হয়েছে: "যদি হম ভক্তিভাব কী গহনতা ঔর সর্বহিতকারী প্রভাবকে দৃষ্টিকোণোঁ সে সুরদাস, পরমানন্দদাস তথা নন্দদাস, ইন তীন কবিয়োঁ কী উপলব্ধ রচনাওঁ কা তুলনাত্মক অধ্যয়ন করেঁ তো সর্বপ্রথম স্থান সুর কো, দ্বিতীয় স্থান পরমানন্দদাস কো ঔর তৃতীয় স্থান নন্দদাস কো দেঙ্গে। পরন্তু কেবল পদলালিত্য ঔর ভাষামাধুর্য পর দৃষ্টি রখী জায় তো নন্দদাস অপনে কুছ চুনে হুএ গ্রন্থো কী ভাষা কে কারণ প্রথম স্থান ঔর পরমানন্দদাস তৃতীয় স্থান পর রখে জায়েঙ্গে।"[২৮৩]

নন্দদাসের কবি-প্রতিভার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ভাবানুগ শব্দের ব্যবহার ও প্রসাদগুণ। তাঁর ভাষাগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ডঃ দীনদয়ালু গুপ্ত যে মন্তব্য করেছেন, সেটি এখানে স্মরণ করা যেতে পারে: "ভাষা কী শক্তি, ভাবকে অনুসার শব্দচয়ন পর বহুত নির্ভর রহতী হে। নন্দদাস কী ভী ভাষা মেঁ ভাবকে অনুসার শব্দোঁকে প্রয়োগ কা এক ভারী গুণ হৈ, জিসসে ভাব কা এক চিত্র পাঠককে সামনে আ জাতা হৈ।"[২৮৪]

যেমন ফুল-দোলায় রাধা দুলছেন, শব্দ ঝংকারের মধ্য দিয়ে সেই দোলা পাঠক বা শ্রোতার মনের মধ্যেও দোলা জাগায়:

ফুলন কে তরোঁ না, কুন্তল লসৈঁ ফুলন কে
ফুলন কী কিঙ্কিণী সরস সঁৱারী
ফুল-মহল মেঁ ফুলী শ্রীরাধা,
ফুলন কবোঁ নন্দদাস জায় বলিহারী।[২৮৫]

—সুন্দরী রাধার কানে ফুলের অলংকার ও কুণ্ডল কোমরে ফুলের কিঙ্কিণী, ফুল-মহলে রাধা আনন্দে বসে আছেন, আর নন্দদাস তা দেখে বাহবা দিচ্ছেন।

নন্দদাসের এই কান্তকোমল পদের জন্য তিনি জয়দেবের সঙ্গে তুলনীয়।

নন্দদাসের মধুর রসের পদের তুলনায় বাৎসল্যরসের পদ অল্প। বিশেষ করে সুরদাস ও পরমানন্দদাসের বাৎসল্যরসের পদের তুলনায় তাঁর বাৎসল্যের পদ সামান্যই বলা চলে। বাৎসল্যের ক্ষেত্রে সুরদাস বা পরমানন্দদাসের মতো তাঁর কাব্য প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ ঘটেনি। দীনদয়ালু গুপ্ত নন্দদাসের বাৎসল্যের পদ প্রসঙ্গে বলেছেন: "ইন পদোঁ মেঁ বালস্বভাব ঔর বাল-চেষ্টাওঁ কা বৈসা সুক্ষ্ম ঔর মোহক চিত্রণ নহী হৈ জৈসা সুরদাস ঔর পরমানন্দদাস কী রচনাওঁ মেঁ মিলতা হৈ।"[২৮৬] অর্থাৎ, এসব পদে বাল-সুলভ স্বভাবের ও বাল্যলীলার সূক্ষ্ম এবং মনোমুগ্ধকর চিত্র যা সুরদাস ও পরমানন্দ-

দাসের রচনাতে পাওয়া যায়— তা নন্দদাসের পদে নেই।

নন্দদাস অবশ্য তাঁর পূর্বসূরীদের মতো কৃষ্ণের জন্ম থেকেই বাৎসল্যরসের পদ রচনা আরম্ভ করেছেন। যেমন, গোকুলে নন্দগৃহে কৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছেন। এই সংবাদে ব্রজবাসীরা উৎফুল্ল, আর যশোদা অপরিসীম আনন্দে আত্মহারা

ফুলো ফুলো পুত্র দেখি, লয়ো উর লুমি কৈ।

ফুলী হে জসোদা-মায়, ঢোটা মুখ চুমি কৈ॥[২৮৭]

—যশোদা পুত্র দেখে দেখে উল্লসিত এবং উৎসাহের সঙ্গে বুকে জড়িয়ে ধরছেন, আর পুত্র মুখ চুম্বন করে আনন্দ লাভ করছেন।

নন্দদাস শুধু যশোদার আনন্দের কথা বলেন নি, নন্দের আনন্দকেও অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন

ফুলে হৈঁ ভণ্ডার সব দ্বার দয়ে খোলি কৈ।

... ...

নন্দরায় দেত ফুলে 'নন্দদাস' বোলি কৈ॥[২৮৮]

—নন্দদাস বলছেন, আনন্দে নন্দ সমস্ত পরিপূর্ণ ভাণ্ডারের দ্বার খুলে দিয়েছেন। অর্থাৎ, পুত্রের মঙ্গলকামনায় স্নেহময় পিতা অবারিত হস্তে প্রার্থীদের দান দিচ্ছেন।

নন্দদাস যশোদার অপত্য স্নেহের পূর্ণ পরিচয় দিতে গিয়ে কৃষ্ণের শৈশব ও যশোদার পুত্র পালনের রীতিনীতিগুলি সুন্দরভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। কৃষ্ণের উপর অযথা দেবত্ব আরোপ করে বাস্তব জীবনকে বিশেষ ক্ষুণ্ণ করা হয়নি। যেমন—

বাল গোপাল ললন কোঁ, মোদভরী, জসুমতি হুলরাবতি।

মুখ চুমতি, দেখতি সুন্দর তন, আনন্দ ভরি ভরি গাবতি॥

কবহুঁক পালনা মেলি বুঝাবতি কবহুক অস্তন পান করাবতি।

নন্দদাস প্রভু গিরিধর কোঁ বাণী নিরখি নিরখি সুখ পাবতি॥[২৮৯]

—যশোদা বালক গোপালকে আদর করে আনন্দময় তৃপ্তি লাভ করছেন। কখনো মুখ চুম্বন করছেন, কখনো সুন্দর দেহটি দেখছেন, আবার কখনো আনন্দে গান করছেন। কখনো দোলায় শুইয়ে দোলা দিচ্ছেন, কখনো স্তন্য পান করাচ্ছেন। নন্দদাস বলছেন, গিরিধারীকে দেখে দেখে যশোদার সুখের অন্ত নেই।

যশোদা কৃষ্ণকে কখনো দোলায় দুলিয়ে, কখনো নানাভাবে সাজিয়ে আনন্দ পেতে চান। সন্তানকে পরিচর্যার মধ্যে মায়ের স্নেহাসক্ত অন্তর আনন্দ পায়। মায়ের এই মনস্তত্ত্বকে নন্দদাস সুন্দরভাবে বুঝেছিলেন। তিনি বলেন—

নন্দ কো লাল, ব্রজ পালনৈঁ ঝুলৈঁ।

কুটিল অলকাবলী, তিলক গোরোচন,

চরণ-অঙ্গুঠা মুখ কিলক-কিলক কুলৈঁ॥[২৯০]

—নন্দের দুলাল ব্রজভূমিতে দোলায় দুলছেন। কুঞ্চিত কেশদাম, কপালে চন্দনের তিলক, পায়ের বুড়ো আঙ্গুল মুখে দিয়ে খিলখিল করে হাসছেন।

কৃষ্ণ একটু একটু করে বড় হয়ে উঠছেন। সকালে যশোদা তাঁকে ঘুম থেকে ডেকে তোলেন। "জগাবতি অপনে সুত কো রাণী।"[২৯১] রাণী যশোদা আপন পুত্রকে ঘুম থেকে জাগাচ্ছেন। কখনো ঘুম থেকে তোলার জন্যে পুত্রকে নানা খাবারের লোভ দেখাচ্ছেন :

মাখন, মিশ্রী ঔর মিঠাঈ দুধ মলাঈ আনী।

ছগন মগন তুম করহু কলেউ, মেরে সব সুখদানী॥[২৯২]

—মাখন, মিছরি, মিষ্টি, দুধ, সর সব এনে দিয়েছি, সর্বসুখদাতা আমার বাছা, তুমি জলখাবার খেয়ে নাও। আবার কখনো মা বলছেন—

চিবৈয়া-চুহচানী, সুন চকঈ কী বাণী,

কহত-জসোদা-রাণী জাগো মেরে লালা।[২৯৩]

—যশোদা বলছেন, পাখী কিচমিচ করে ডাকছে, আমার বাছা, তুমি জাগো!

কৃষ্ণকে বিছানা থেকে তোলার জন্যে যশোদা আরও বলেন, দেখ, সূর্যকিরণ ছড়িয়ে পড়েছে, ব্রজবালারা দধি মন্থন করছে, গোপ-বালকেরা তোমার জন্যে দ্বারে দাঁড়িয়ে আছে। মায়ের কথা শুনে কৃষ্ণ উঠে পড়েন এবং আধো আধো স্বরে মা'র সঙ্গে নানা কথা বলেন।

জননি-বচন সুনি তুরত উঠে হরি কহত বাত তুতরাণী।[২৯৪]

শিশুরা সাধারণত বেশভূষা, দেহের পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। কৃষ্ণ এর ব্যতিক্রম নন। যশোদা কৃষ্ণকে বোঝাচ্ছেন এবং সাজসজ্জা করে দিতে চেষ্টা করছেন। কিন্তু কৃষ্ণের এসব ভালো লাগে না ; তিনি যশোদাকে নানাভাবে বাধা দিয়ে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করছেন :

ছগন-মগন বারে, কন্হৈয়া! নৈকু উরৈঘৌ আই রে।

বন মেঁ খেলন জাত, হৈব বহে সব মলিন গাত,

অপনে লালা কী লৈহুঁ বলাই রে।

সঙ্গ কে লরিকা সব বনি-ঠনি আএ

য়ো কহিহৈঁ কৈসী হৈ তব মাঈ রে।

জসুদা গহতি ধাই বৈয়াঁ, মোহন করত,

নহৈঁয়া নহৈঁয়া নন্দদাস বলি জাই রে।[২৯৫]

—আমার ছোট সোনা কানাই, কাছে এসো, স্বজনেরা নালিশ করে গেছে, তুমি ধুলোবালি মাখা শরীরে বনে খেলতে চলে যাও। তোমার সব অমঙ্গল, তোমার নিন্দা, আমি মাথায় করে নেবো। দেখ তোমার সখারা সকলে কত সেজেগুজে এসেছে ; তারা বলবে, তোমার মা কেমন মানুষ! বলে যশোদা দৌড়ে গিয়ে কৃষ্ণের হাত ধরলেন। কৃষ্ণ যত না না, করছেন, নন্দদাস তত আনন্দিত হচ্ছেন।

এই পদে নন্দদাস গ্রামের মা ও শিশুর একটি জীবন্ত ছবি তুলে ধরেছেন,—একটি সজীব নিত্য পরিচিত ছবি। কোথাও অতিশয়োক্তি নেই, নেই অলৌকিকতা।

নন্দদাসের রচনায় মধুর রসের তুলনায় বাৎসল্যের পদ অল্প হলেও বাস্তবতার

অভাব নেই। কবির পদে গ্রাম্য জীবনের সুন্দর চিত্রও সহজলভ্য। যেমন—

অতি আছী তনক কনক কী দোঁহনী সোহিনী
গড়াই দৈ রী মৈয়া ;
জাই কহেঁগো নন্দ-ববা সোঁ, আছে পাট কী
মহি দুহন সিখাই দৈ গৈয়া।
মেরী দাঁঈ কে ঢোটা সব ছোটে, তেউ সীখেঁ রী
করত বন-ধৈয়া ;
'নন্দদাস' প্রভু হঁসত, লোটত অরু ভরত
নৈন জল জসুমতি লেতি বলৈয়া ॥[২২৬]

—কৃষ্ণ যশোদাকে বলেছেন, মা, আমাকে অতি সুন্দর সোনার ছোট্ট দুধের বাটি গড়িয়ে দাও। আমি নন্দ বাবাকে বলবো— "নতুন পাত্রে গোরু দোহন ভালো করে শিখিয়ে দাও।" আমার চেয়ে ছোট্ট বালকেরা বনে গিয়ে গোরু দোহন করে দুধের ধারা পান করে। এই আবদার যাতে পূর্ণ হয়, সেজন্যে কৃষ্ণ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কান্না শুরু করে দিয়েছেন। তাই দেখে যশোদা তাঁর বালাই নিচ্ছেন, আর নন্দদাস প্রভুর লীলা দেখে হাসছেন।

কবি শুধু যশোদার বাৎসল্যরসের চিত্র এঁকেই ক্ষান্ত নন ; কৃষ্ণের প্রতি তিনি নিজেও অপত্য স্নেহে আপ্লুত।

মাধো জু ! তনিক সো বদন সদন-সোভা কোঁ
তনিক ভৃকুটি পৈ তনিক দিঠোনা।[২২৭]

—মাধব তোমার ছোট্ট সুন্দর মুখচ্ছবি গৃহের শোভা বর্ধন করছে। তোমার উপর যাতে কু-নজর না পড়ে, তার জন্যে ভ্রূর উপর কাজল পরানো হয়েছে।

কৃষ্ণকে দেখে নন্দদাসের অন্তরের অপত্যস্নেহ স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎসারিত হয়। তাই, কৃষ্ণের মুখের উপর ভ্রমরের মতো চূর্ণ কুন্তল, গলার বাঘনখের মালা, চোখের কাজল সব কিছুর দিকে নন্দদাস মমতায় মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। কখনো কৃষ্ণের আবোল-তাবোল কথাও শুনছেন মুগ্ধ চিত্তে।

অলবল-কল কছু কহতি বনাঈ।[২২৮]

বাৎসল্যরসে অভিভূত নন্দদাসের কৃষ্ণের রূপ দেখে তৃপ্তি হয় না, যেমন যশোদার কৃষ্ণের রূপ দেখে মন ভরে না। যশোদা কৃষ্ণের প্রত্যেকটি কাজই সৌন্দর্যের দীপ্তিতে দেখতে পান, তেমনি নন্দদাসও মমতায় কৃষ্ণের প্রতি পদক্ষেপে রূপমাধুরী আকণ্ঠ পান করেন।

অপত্যস্নেহে কাতর কবির অন্তরের বাৎসল্য নিঃসন্দেহে নন্দদাসের কবিসত্তা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করে তুলেছে। তাছাড়া নন্দদাসের বাৎসল্যের পদ অল্প হলেও, বাস্তব রসে সিঞ্চিত হয়ে সে-সব পদ সজীব সুষমায় বিশিষ্টতা লাভ করেছে।

হিন্দী সাহিত্যে যে কয়েকজন মুসলমান ভক্তকবির নাম পাওয়া যায়, তাঁদের মধ্যে রসখান বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদীজী রসখান সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, সেটি আমাদের আলোচনার প্রারম্ভে স্মরণ করা যেতে পারে : "শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তিকে সাহিত্য মেঁ জিস মধুর ভাব পর বহুত অধিক বল দিয়া গয়া হৈ উসমে বিশ্ব-জনীন তত্ত্ব হৈ। ধর্ম সম্প্রদায় ঔর বিশ্বাসোঁ কে বাহরী বন্ধন উস বিশ্বজনীন মাধুর্য তত্ত্ব কে আকর্ষণ কো রোক নহীঁ সকে হৈঁ। উন দিনোঁ অনেক মুস্লিম সহৃদয় ইস মধুর ভাব কী ভক্তিসাধনা সে আকৃষ্ট হুএ থে। ইন সব মেঁ প্রমুখ হৈঁ বাদসা বংশ কী ঠসক ছোড়নে বালে সুজান রসখানি।"[২৯৯] অর্থাৎ, কৃষ্ণভক্তি সাহিত্যে যে মধুররসের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে বিশ্বজনীন তত্ত্ব বর্তমান। সাম্প্রদায়িকতা বা বাহ্যিক বন্ধন এই বিশ্বজনীন মাধুর্য তত্ত্বের আকর্ষণকে ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি। ফলে, সেযুগে বহু সহৃদয় মুসলমান মধুর ভাবের ভক্তি সাধনায় আকৃষ্ট হলেন। এঁদের মধ্যে সর্বপ্রধান বাদশা বংশের কুলমর্যাদা পরিত্যাগকারী সুজন রসখান।

হিন্দীর মধ্যযুগীয় ভক্ত কবিদের মতো রসখানের জীবন-বৃত্তান্তও অন্ধকারাচ্ছন্ন। এমনকি কবির নিজের লেখার মধ্যেও তাঁর বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। শুধুমাত্র রসখানের 'প্রেমবাটিকা' কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি পদে রসখান নিজের সম্পর্কে দু'একটি ইঙ্গিত দিয়েছেন। যেমন—

দেখি গদর হিত সাহিবী, দিল্লী নগর মসান।
ছিনহি বাদসা বংশ কী, ঠসক ছোরি রসখান ॥[৩০০]

—অত্যাচার বা বিপ্লবে মান, প্রতিষ্ঠা সব ধূলিসাৎ হয়ে দিল্লী শ্মশান ভূমিতে পরিণত হতে দেখে, বাদশাহী বংশজাত রসখান মিথ্যা অহংকার মুহূর্তে ত্যাগ করলেন।

রসখানের জীবন সম্পর্কে শুধু এইটুকু জানা যায় যে, তিনি দিল্লীতে থাকতেন এবং বাদশাহ বংশের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ ছিল। দিল্লীকে শ্মশান হতে দেখে রসখান স পদ ও সম্মান ত্যাগ করে ব্রজভূমিতে চলে আসেন।

কিন্তু 'বাদশাহ' শব্দটি নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। কেউ বলেন, তিনি ছিলেন মোগল রাজবংশের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত ; আবার কেউ কেউ ভিন্ন মত পোষণ করেন। এই বিতর্কিত বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছেন শ্রীকৃষ্ণ গুপ্ত,[৩০১] দুর্গাশংকর মিশ্র[৩০২] ও রামচন্দ্র শুক্ল[৩০৩] প্রভৃতি আরো অনেকে। বিতর্ক যাই থাক না কেন, তিনি যে সম্ভ্রান্ত বংশীয় ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই।

কবির লেখাতেই পাওয়া যায়, দিল্লীতে তাঁর নিবাস। তবে, শ্রীশিব সিংহ তাঁর 'শিবসিংহ সরোজ'[৩০৪] গ্রন্থে কবির বাসভূমি পিহানী বলেছেন। কিন্তু এ নিয়েও যথেষ্ট মতভেদ আছে। ডঃ ভবানীশংকর যাজ্ঞিক তাঁর 'রসখান রত্নাবলী' গ্রন্থে রসখানের জীবন বৃত্তান্ত আলোচনা করতে গিয়ে এই মতের প্রতিবাদ করেছেন।[৩০৫]

তাঁর মতে রসখানের জন্মের সময় পিহানী গ্রামের অস্তিত্ব ছিল না।

সুতরাং রসখানের বৃত্তান্ত কিছুই জানা যায় না। তৎকালীন কবিরা আত্মপ্রচার সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন এবং ভক্ত কবিদের মধ্যে জীবন-বৃত্তান্ত লেখার প্রচলনও ছিল না।

'দো সৌ' বাবন বৈষ্ণবন বার্তা' গ্রন্থ থেকে এইটুকু জানা যায় যে, গোস্বামী বিঠ্‌ল-নাথের ২৫২ জন ভক্ত-শিষ্যের মধ্যে রসখান ছিলেন অন্যতম। রামচন্দ্র শুক্ল তাঁর 'হিন্দী সাহিত্য কা ইতিহাস' গ্রন্থে এই কথাই বলেছেন : "য়ে বড়ে ভারী কৃষ্ণভক্তি ঔর গোস্বামী বিঠ্‌লনাথজী কে বড়ে কৃপাপাত্র শিষ্য থে। দো সৌ' বাবন বৈষ্ণবোঁ কী বার্তা মেঁ ইনকা বৃত্তান্ত আয়া হৈ।"[১০৬] এই গ্রন্থ থেকে আরো জানা যায় রসখান এক বণিকের সুন্দর ছেলের প্রতি প্রচণ্ড আসক্ত ছিলেন। একদিন তিনি শুনতে পান, একজন অপরজনকে বলছেন— বণিকপুত্রের প্রতি বসখানের যেমন তীব্র ভালোবাসা, ঈশ্বরের প্রতিও তেমনি ভালোবাসা থাকা উচিত। একথা শুনে মর্মাহত হয়ে রসখান শ্রীনাথজীকে খুঁজতে গোকুলে আসেন এবং গোস্বামী বিঠ্‌লনাথের কাছে দীক্ষা নেন। বসখানের নামে অন্য একটি আখ্যায়িকাও প্রচলিত। শোনা যায়, তিনি একটি সুন্দরী বমণীব প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত ছিলেন। কিন্তু সেই রমণী নিজের সৌন্দর্য সম্পর্কে এতই সচেতন ছিলেন যে, ভালোবেসে কাউকে আত্মসমর্পণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। এই সময় রসখান ফারসীতে ভাগবতের অনুবাদ পাঠ করে মুগ্ধ হন। গোপিনীদের অলৌকিক প্রেম ও গভীর অনুরাগ তাঁকে আকৃষ্ট করে। তাঁর মনে হয়, কৃষ্ণের নিকট আত্মসমর্পণই শান্তির পথ। তিনি বৃন্দাবনে এসে বিঠলনাথের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন।[১০৭]

রসখান পদ রচনা আরম্ভ করেন খুব সম্ভব ১৬৪০ সংবতের কাছাকাছি। কারণ বিঠ্‌লনাথের মৃত্যু হয় ১৬৪৩ সংবতে। তার আগেই নিশ্চয় কবির দীক্ষা হয়। তাছাড়া তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'প্রেমবাটিকা' রচনাকাল ১৬৭১ সংবতে। এই কাব্যগ্রন্থেই এর ইঙ্গিত রয়েছে। যেমন—

> বিধু সাগর রস ইন্দু সুভ, ববস সরস রসখান।
> প্রেমবাটিকা রুচি রুচিব, চির হিয় হরিখ বখান॥[১০৮]

—রসখান বলেন, আমি সর্বদা উল্লসিত-হৃদয়ে শুভবর্ষ ১৬৭১ 'প্রেমবাটিকা' রচনা করি। অর্থাৎ, ১৬৭১ বিক্রমাব্দে 'প্রেমবাটিকা' রচিত হয়।

রামচন্দ্র শুক্ল এই মতটি স্বীকার করেছেন।[১০৯] এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে, রসখানের পদাবলীর রচনাকাল সং ১৬৪০ থেকে সং ১৬৭১ পর্যন্ত। কিন্তু কবির রচনা খুব বেশি পাওয়া যায় না। ছোট ছোট পদ বা দোঁহা একত্রিত করে 'প্রেমবাটিকা' নামে একটি কাব্যগ্রন্থ প্রচলিত আছে, এবং তাঁর অন্য কাব্যগ্রন্থের নাম 'সুজন রসখান' বা 'কবিত সবৈয়া'।

গেয় কাব্যগ্রন্থ 'সুজন রসখান' কবির অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। রামচন্দ্র শুক্ল এই সম্বন্ধে বলেন—"ইনকী কৃতি পরিমান মেঁ তো বহুত অধিক নহী হৈ পর জো হৈ বহ

প্রেমিয়োঁ কে মর্ম কো স্পর্শ করনেৱালী হৈ। ইনকী দো ছোটী ছোটী পুস্তকে অব তক প্রকাশিত হুঈ হৈঁ—'প্রেম ৱাটিকা' [দোহা] ঔর 'সুজন রসখান' [কৱিত সৱৈয়া]। ঔর কৃষ্ণভক্তোঁ কে সমান ইনহোনে 'গীতকাৱ্য' কা আশ্রয় ন লেকর কৱিত সৱৈয়োঁ মেঁ অপনে সচ্চে প্রেম কী ৱাঞ্জনা কী হৈ।"[৩১০]

'সুজন রসখান' গ্রন্থে ছোট ছোট পদে কবি কৃষ্ণ ভক্তি, ব্রজানুরাগ, কৃষ্ণপ্রেম, রাধা-কৃষ্ণের রূপ-বর্ণনা, মিলন-বিরহ ইত্যাদি কৃষ্ণের বিচিত্র লীলা বর্ণনা করেছেন।

সুজন-রসখান নামটি পরবর্তী যুগে প্রচলিত হয়। মনে হয়, কবি পদ-রচনার প্রয়োজনে রসখান নামটি গ্রহণ করেছেন। কারো কারো মতে, কবির প্রকৃত নাম সৈয়দ ইব্রাহিম। কিন্তু কবি নিজের রচনায় এ নাম ব্যবহার করেন নি। ব্রজ-সাহিত্যে তিনি রসখান নামেই সুপরিচিত।

রসখানের রচনার অনুভূতিগুলি বড় তীব্র। 'হিন্দী সাহিত্য কা বৃহৎ ইতিহাস' গ্রন্থে এই সম্বন্ধে বলা হয়েছে : "হিন্দী কে মুসলমান কৃষ্ণভক্তোঁ মেঁ সর্বাধিক লোকপ্রিয় কৱি রসখান নে নীতিপরক উক্তিয়াঁ ভী প্রস্তুত কী হৈঁ, জিনমেঁ মুখ্য রূপ সে জীৱন কে প্রেমতত্ত্ব কী বড়ী মার্মিক অভিব্যক্তি হুঈ হৈ।"[৩১১] অর্থাৎ, হিন্দী সাহিত্যে কৃষ্ণ-ভক্ত মুসলমান কবিদের মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় কবি রসখান। কবি নীতি-পদ রচনা করেছেন। কিন্তু, প্রধানত তাঁর প্রেমতত্ত্বমূলক পদগুলি বিশেষরূপে মর্মস্পর্শী।

রসখানের পদে ভক্তির মধ্যে আত্ম নিবেদনের তন্ময়তা লক্ষণীয়। তিনি ভক্তিতে এত তন্ময় যে, পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গে রূপান্তরিত হতেও তাঁর আপত্তি নেই, শুধু নিজের উপাস্যের লীলাভূমিতে থাকতে পারলেই তিনি সৌভাগ্য বলে মনে করেন।

মানুষ হোঁ তো ৱহী রসখান
বসোঁ মিলি গোকুল গাঁৱ কে গ্বারন।
জো পসু হোঁ তো কহা বস মেরো
চরোঁ নিত নন্দ কী ধেনু মঁঝারন॥
পাহন হোঁ তো ৱহী গিরি কো
জু কিয়োঁ ব্রজ ছত্র পুরন্দর ধারন॥
জো খগ হোঁ তো বসেরো করোঁ
নিত কালিন্দী কূল কদম্ব কী ডারন॥[৩১২]

—রসখান বলেন, যদি তাঁর পুনর্জন্ম হয়, তিনি যেন গোপবালক হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। আর যদি পশু হয়ে তাঁর জন্ম হয়, তবে যেন তিনি নন্দের যে সমস্ত গোরু গোষ্ঠভূমিতে চারণ করে তার মধ্যে থাকেন; যদি পাথর হয়ে জন্মগ্রহণ করেন, তবে যেন সেই পর্বতের অংশ হন— যে পর্বতকে ইন্দ্রের কোপ থেকে গোকুলবাসীদের রক্ষার জন্যে কৃষ্ণ ছত্র রূপে ধারণ করেছিলেন; আর যদি পক্ষী হয়ে জন্মান, তবে যেন যমুনার কূলবর্তী কদম্ববৃক্ষে গৃহ নির্মাণ করেন।

পদটিতে কবির ভক্তির প্রগাঢ়তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। ভক্তির আতিশয্যে রসখান কৃষ্ণকে মাঝে মাঝে বাস্তব জীবন থেকে বহুদূরে সরিয়ে এনেছেন। ভক্তির

প্রাবল্যে কৃষ্ণ অলৌকিক শক্তির অধিকারী ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে উঠেছেন।-

সেস, গনেস মহেস দিনেস সুরেসহু জাহি নিরন্তর গাবৈঁ।
জাহি অনাদি অনন্ত অখণ্ড অছেদ অভেদ সুবেদ বতাবৈঁ ॥[৩১৩]

—শেষনাগ, শিব, গণেশ, সূর্য, ইন্দ্র প্রভৃতি যাঁর নিরন্তর গুণগান করেন, যাঁকে [কৃষ্ণকে] বেদ ও অনাদি, অনন্ত, অখণ্ড, অচ্ছেদ্য ও অভেদ্য বলে বর্ণনা করেছেন, তাঁকে অভিবাদন করি।

কিন্তু কৃষ্ণের এই ব্রহ্মময় মূর্তিতে রসখান ততটা মুগ্ধ নন। কৃষ্ণের স্বাভাবিক নয়নাভিরাম রূপই কবিকে আকৃষ্ট করে রেখেছে। যেরূপ—

কল কাননি কুণ্ডল মোর পখা উর পৈ বনমাল বিরাজতি হে।
মুরলী কর মৈঁ অধরা মুসকানি তরঙ্গ মহা ছবি ছাজতি হৈ ॥[৩১৪]

—নিজের সখীকে কোন গোপিনী কৃষ্ণের সৌন্দর্য বর্ণনা দিয়ে বলছেন, কৃষ্ণের দুই কানে সুন্দর কুণ্ডল, মাথায় ময়ূরের পালকের মুকুট, বুকের উপর বনমালা শোভিত, তাঁর হাতে বাঁশী, অধরে মৃদু হাসি অপরূপ সৌন্দর্য সৃষ্টি করছে।

কৃষ্ণের প্রেমময় রূপ কবিকে যেমন আকুল করেছে, তেমনি সৌন্দর্য-শিরোমণি রাধার ভুবনমোহিনী-রূপও তাঁকে সমানভাবে আকৃষ্ট করেছে। তাই রসখান রাধার রূপ বর্ণনায়ও সমান দক্ষ।

কৌন কী নাগরি রূপ কী আগরি জাতি লিয়ে সংগ কোন কী বেটী।
জা কো লসৈ মুখ চন্দ সমান সুকোমল অঙ্গনি রূপ লপেটী।[৩১৫]

—রাধাকে যেতে দেখে কৃষ্ণ একজন গোপিনীকে জিজ্ঞাসা করছেন, সৌন্দর্যের আধার এই যে যুবতী, যাঁর মুখ চন্দ্রের মতো সুকোমল, লাবণ্যময় অঙ্গে যেন রূপ ওতপ্রোত-ভাবে মিশে আছে, যাঁর সঙ্গে চলেছ, তিনি কার কন্যা, কার স্ত্রী?

কৃষ্ণের মুগ্ধ দৃষ্টি অবলম্বন করে কবি রাধার সৌন্দর্য সজীব করে তুলেছেন।

রসখান চীরহরণ, দানলীলা ইত্যাদি কৃষ্ণলীলার অঙ্গগুলিও অতি নিপুণভাবে বর্ণনা করেছেন। যেমন—

আজু মহঁ দধি বেচন জাত হী মোহন রোখ লিয়োঁ মগ আয়োঁ।[৩১৬]

—আজ আমার দধি বিক্রি করতে যাবার সময় মোহন পথ রোধ করে দাঁড়াল।

রসখানের বংশী-বিষয়ক পদগুলি খুবই সুন্দর। সুরদাস ও নন্দদাসের গোপিনী-দের মতো রসখানের গোপিনীরাও বাঁশীকে নিজেদের সতীন ভাবেন, ঈর্ষা করেন। কারণ, বাঁশী সর্বদা কৃষ্ণের ওষ্ঠে লেগেই আছে এবং মুহূর্ত সঙ্গছাড়া হয় না।[৩১৭]

কিন্তু রসখানের সর্বাপেক্ষা কৃতিত্ব মিলনের পদ-চিত্রণে। রাধা-কৃষ্ণ লীলা-কেলির কমনীয়তা ও বিলাসিতার বর্ণনায় তাঁর অসাধারণ নৈপুণ্য।

আজু অচানক রাধিকা রূপ নিধান সোঁ ভেট ভঈ বন মাঁহী।
দেখত দীঠ জুরী রসখান মিলে ভরি অংক দিয়ে গর বাঁহী ॥
প্রেম পগী বতিয়াঁ দুহুঁধাঁ কী দুহুঁ কো লগী অতি হী চিত চাহী।
মোহনী মন্ত্র বসীকর জন্ত্র হহা পিয় কী তিয় কী নহিঁ নাহীঁ ॥[৩১৮]

—আজ হঠাৎ রাধা এবং সৌন্দর্যের ভাণ্ডারী কৃষ্ণের দেখা হয়ে গেল। আনন্দ-সাগর-কৃষ্ণ তাঁকে দেখামাত্র গলা জড়িয়ে বাহুপাশে বেঁধে ফেললেন। দু'জনেই প্রেমের কথা বলতে লাগলেন। দু'জনের মনেই মিলনের প্রবল ইচ্ছা। প্রিয়তম কৃষ্ণের হাঁ, হাঁ করা যদি মোহিনী মন্ত্র হয়, তবে রাধার না, না করা বশীকরণ মন্ত্র।

আপাতদৃষ্টিতে চিত্রটি লৌকিক বলেই মনে হয়। কিন্তু, ভক্ত-কবি লৌকিক জগতকে অবলম্বন করেই অলৌকিক ধামে প্রবেশ করেছেন। রসখানের রচনার এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেই বোধ হয় শ্রীহংসরাজ অগ্রবাল মন্তব্য করেছেন: "ইন্‌হোনে অপনী কবিতাও মে প্রেম কা বহুত সুন্দর চিত্রণ কিয়া হৈ; পরন্ত য়হ প্রেম লৌকিক বসনা সে উচাঁ উঠা হৈ, ঔর ইসমে শারীরিকতা কো নিয়ন্ত্রিত কর বিশ্বজনীন বনানে কা প্রযত্ন কিয়া গয়া হৈ। একাঙ্গী ঔর নিস্বার্থ প্রেম হী ইনকা আদর্শ হৈ।"[৩১৯] অর্থাৎ, কবি তাঁর কবিতাগুলিতে প্রেমের অপূর্ব সুন্দর চিত্র এঁকেছেন। এবং কবি লৌকিক প্রেমের বাসনাকে উন্নততর করে, দৈহিক কামনাকে নিয়ন্ত্রিত করে বিশ্বজনীন করে তোলার সাধনা করেছেন। এদিক দিয়ে নিঃস্বার্থ প্রেমই তাঁর আদর্শ।

কবির সমস্ত পদেই রয়েছে ভাববিহ্বল ঈশ্বর-নিবিষ্ট ঐকান্তিক প্রেম।

রসখান গোস্বামী বিঠ্‌ঠলনাথের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করলেও সুরদাস ও পরমানন্দ-দাস প্রভৃতি অষ্টছাপের কবিদের মতো কৃষ্ণলীলার ধারাবাহিক বৃত্তান্ত রচনা করেন নি। কৃষ্ণের বিভিন্ন লীলার অল্প দু'একটি করে পদ তিনি রচনা করেছেন। তবে তাঁর বিরহের পদ অপেক্ষাকৃত কম।

রসখানের পদে ভাষার নৈপুণ্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর কবিতার ভাষা সরস, সুবোধ্য ও কোমল। কবির এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে বিয়োগী হরি মন্তব্য করেছেন: "ইন্‌হোনে, মুসলমান হোকর ভী ব্রজভাষা মেঁ বড়ী হী উত্তম কবিতা রচী। ইনকী কবিতা মে শব্দাড়ম্বর শায়দ কহী হো। উসমে প্রসার ঔর ভাবগাম্ভীর্য কুটকুট ভরা হুআ হে।"[৩২০] অর্থাৎ, কবি মুসলমান হয়েও ব্রজভাষায় উত্তম কবিতা রচনা করেছেন। তাঁর কবিতায় শব্দাড়ম্বর নেই। অথচ ঔদার্য ও ভাব-গাম্ভীর্যে পূর্ণ। মনে হয়, শব্দ-চয়নের জন্যে যেন বিশেষ পরিশ্রমই করতে হয়নি কবিকে।

রসখান সুরদাস ও নন্দদাসের মতো ভাব ও রূপ-চিত্রণে পারদর্শিতা দেখাতে হয়তো পারেন নি। কিন্তু ভাষার ক্ষেত্রে ব্রজ-সাহিত্যে রসখান একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। তাই হিন্দী সাহিত্য কা বৃহৎ ইতিহাসে তাঁর ভাষা-প্রসঙ্গে বলা হয়েছে "ইনকী রচনাএঁ অপনী ভাষাশৈলী কী সরসতা ঔর প্রভাবোৎপাদকতা কে কারণ বড়ী লোকপ্রিয় হুঈ হৈঁ।"[৩২১] অর্থাৎ, রসখানের ভাষা সরস ও প্রভাবশালী বলে খুবই জনপ্রিয়।

রসখান বাৎসল্যের পদ মাত্র কয়েকটি রচনা করেছেন। অষ্টছাপের অন্যান্য কবিদের মতো, বিশেষ করে সুরদাস বা পরমানন্দদাসের মতো, রসখানের বাৎসল্যের পদে কৃষ্ণের বাল্যলীলার পূর্ণাঙ্গ চিত্র নেই। বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে শিশু-কৃষ্ণের ধীরে ধীরে বড় হয়ে ওঠা, সেই সঙ্গে যশোদার স্নেহ-মমতার বিচিত্র অনুভূতির পরিচয়

পাওয়া যায়। একটি দুটি পদে দেখা যায় যে, কবি কৃষ্ণের বাল্যলীলা দেখে বাৎসল্য রসে আপ্লুত হয়েছেন।

ধুরি ভরে অতি সোভিত স্যাম জু তৈসী বনীসির সুন্দর চোটী।
খেলত খাত ফিরৈঁ অঁগনা পগ পৈঁজনী বাজতি পীরী কাছোটী॥
ৱা ছবি কৌ রসখান ৱিলোকত বারত কাম কলানিধি কোটী।
কাগ কে ভাগ বড়ে সজনী হরি হাথ সোঁ লৈ গয়ো মাখন রোটী॥[৩২২]

—ধূলিলিপ্ত কৃষ্ণের দেহ অত্যন্ত সুন্দর দেখাচ্ছে। তাঁর মাথায় সুন্দর বেণী, তিনি আঙ্গিনায় কখনো খেলছেন, আবার কখনো মাখন রুটি খেতে খেতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাঁর পায়ে নূপুর বাজছে, তিনি হলুদ-বরণ কাপড় পরে আছেন। কৃষ্ণের এই সময়ের সৌন্দর্য দেখে কামদেবও নিজের সৌন্দর্যকে তুচ্ছ মনে করছেন; আর ঐ কাকটা বড়ই ভাগ্যবান যে কৃষ্ণের হাত থেকে মাখন রুটী ছোঁ মেরে নিয়ে গেছে।

রসখান শুধু নিজের অন্তরের বাৎসল্য প্রকাশ করে ক্ষান্ত হননি। কৃষ্ণের জন্মের পর যশোদা ও পিতা নন্দের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দকেও সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন। কৃষ্ণকে দেখে অন্যান্য গোপিনীদের অন্তরও যে স্নেহমুগ্ধ হয়, সেকথাও তাঁর পদাবলীতে স্থান পেয়েছে।

লোগ কহৈঁ ব্রজকে রসখান আনন্দিত নন্দ জসোমতি জু পর।
ছোহরা নাজ নয়ো জনম্যো তুম সো কোউ ভাগ ভরয়ো নহিঁ ভু পর॥
ৱারি কৈ দান সঁৱার করো অপনে অপচাল কুচাল ললু পর।
নাচত রাৱরো লাল গুপাল সো কাল সোঁ ব্যাল কপাল কে উপর,॥[৩২৩]

—কবি নন্দ-যশোদার আনন্দে উল্লসিত। আজ তোমাদের পুত্র জন্মগ্রহণ করেছেন, তোমাদের মতো ভাগ্যবান পৃথিবীতে কেউ নেই। নন্দ যশোদা তাঁদের ছোট্ট ও দুষ্টু ছেলের বালাই নিয়ে সকল প্রার্থীকে নানাবিধ দান বিতরণ করছেন।

রসখান ভোলেন নি যশোদা বাৎসল্যের শিরোমণি। যশোদার বাৎসল্য রূপায়ণেও কবি যথার্থ সার্থকতা লাভ করেছেন। যেমন, যশোদা কৃষ্ণের পরিচর্যা করছেন, তিনি কৃষ্ণের সমস্ত দেহে তেল মাখাচ্ছেন, চোখে কাজল পরাচ্ছেন, ভ্রূ এঁকে দিচ্ছেন, আবার পরম স্নেহে মাঝে মাঝে আদর করছেন।

আজু গঈ হুতী ভোর হী হোঁ
রসখানি রঈ হিত নন্দ কে ভৌনহিঁ।
ৱাকো জিয়ো জুগ লাখ করোর
জসোমতি কো সুখ জাত কহ্যো নহি॥
তেল লগাই লগাই কৈ অঞ্জন
ভৌঁহ বনাই বনাই ডিঠৌনহিঁ।
ডারি হমেল নিহারতি আনন
ৱারতি জ্যো চুচুকারতি ছৌনহিঁ॥[৩২৪]

—একজন গোপিনী অন্য গোপিনীকে বলছেন, আমি আজ সকালবেলা নন্দগৃহে

গিয়েছিলাম। কৃষ্ণের মতো পুত্র পেয়ে যশোদা যে সুখ পেয়েছেন, তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তাঁর পুত্র লক্ষ-কোটি যুগ জীবিত থাকুন। যশোদা তাঁর মাথায় তেল মাখিয়ে দিলেন, চোখে কাজল পরালেন এবং ভ্রু এঁকে দিলেন, যাতে কারো কুনজর না লাগে তার জন্যে কালো টিপ পরালেন। তারপর ছেলের গলায় হার পরিয়ে তার রূপের বাহার দেখছেন, আর ছেলের বালাই নিয়ে তাঁকে আদর করছেন।

কৃষ্ণ এখন একটু বড় হয়েছেন; যশোদা নিজেই ছেলের সঙ্গে খেলা করেন। আর এই খেলার মধ্যে মা সহজ আনন্দ লাভ করেন। সেই আনন্দে ভাস্বর হয় তাঁর বাৎসল্য রসাসিক্ত রূপ।

> 'তা' জসুদা কহ্যো ধেনু কী ওট ঢিঁঢোরত তাহি ফিরৈঁ হরি ভূলৈঁ।
> ঢূঢ়ন কুঁপগ চারি চলেঁ মচলৈঁ রজ মাঁহি বিথূরি দুকূলৈঁ ॥
> হেরি হঁসে রসখান তবৈ উর ভাল তৈঁ টারি কৈ ব্বার লটূলৈঁ।
> সো ছবি দেখি অ নন্দ নন্দজু অঙ্গনি অঙ্গ সমাত ন ফূলৈঁ ॥৩২৫

—কৃষ্ণের বাল্যলীলা দেখে কোনো গোপিনী তাঁর সখীকে বলছেন— কৃষ্ণকে খেলা দেবার জন্যে যশোদা গোরুর পেছনে লুকিয়ে শব্দ করলেন, যা শুনে কৃষ্ণ নিজের অন্য সব কথা ভুলে যশোদাকে খুঁজতে লাগলেন। তিনি যশোদাকে খোঁজার জন্যে অল্প কয়েক পা এগোলেন, কিন্তু মাকে না পেয়ে বায়না ধরেন এবং মাটিতে লুটিয়ে লুটিয়ে নিজের বস্ত্র ধুলোয় মলিন করেন। ছেলের এই অবস্থা দেখে যশোদা তার কাছে আসেন। মাকে দেখে কৃষ্ণের মুখে হাসি ফুটে ওঠে। আর, যশোদা কৃষ্ণের লম্বা লম্বা চুলগুলি সরিয়ে তাঁর মুখ-চুম্বন করতে থাকেন। এই দৃশ্য দেখে নন্দের আনন্দের সীমা নেই।

ছেলের সঙ্গে যশোদার এই খেলাটি বাস্তব জীবনের পরিচিত ঘটনা। তাই এত মনোরম। সেই সঙ্গে পিতা নন্দের অন্তরও কবি অল্প কথায় উদ্ভাসিত করেছেন। তাছাড়া পদটির বৈশিষ্ট্য এই যে, মাতা-পুত্রের খেলার এরূপ বর্ণনা অন্য কোনো হিন্দী বৈষ্ণব কবির রচনায় পাওয়া যায় না।

সন্তানের বিপদের মধ্যে মাতৃস্নেহ একটি অনন্যসাধারণ রূপধারণ করে। সন্তানকে বিপন্ন দেখে মা অধীর হয়ে তাকে রক্ষা করবার জন্যে ব্যাকুল হন। আর, মায়ের স্নেহ-ব্যাকুলতার মধ্যেই ময়ের সার্থক রূপ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। কবি একটি পদে বলেছেন, কৃষ্ণ কালীয়দমনের জন্যে যমুনার জলে নেমেছেন। সাপ তাঁকে জড়িয়ে ধরেছে। যশোদা এ সংবাদ পেয়ে ছুটে এসেছেন যমুনার কূলে। কিন্তু তাঁর পুত্র কৃষ্ণকে সাপের হাত থেকে রক্ষার জন্যে যশোদাকে কেউ সাহায্য করল না। শোকাকুলা যশোদা তাই আক্ষেপ করে তাঁর এক সখীকে বলছেন:

> অপুনো সো ঢোটা হম সব হী কে সদা চাহেঁ,
> দোউ প্রাণী সব হী কে কাজ নিত ধাবহীঁ ॥
> তে তৌ রসখান অব দূর তেঁ তমাসো দেখে,

তরণি তনুজা কে নিকট নহি আবহী॥
অদিন পরে তে অনুহিতু সব হয়ে লোগ,
রহে তো অজোগ দেখি লোচন দরাবহী॥
কহা কহোঁ আলী খ্যালী দেত সব টালী হায়,
মেরে বনমালী কোন কালী তে ছুড়াবহী॥[৩২৬]

—সখি, আমরা [নন্দ ও যশোদা] দু'জনে সমস্ত ব্রজ-বালকদের নিজের ছেলের মতো মনে করি, এবং প্রতিদিন দু'জনে অন্যের কাজে ছুটে যাই। অর্থাৎ, সর্বদা অন্যের সাহায্যে তৎপর থাকি। যশোদা বলছেন— তারাই আজ দূর থেকে তামাশা দেখছে, কেউ যমুনার কাছে পর্যন্ত যাচ্ছে না। আজ দুর্দিন, তাই সবাই মমতাহীন; আর দুঃসময় বলেই সবাই মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। কি বলব, সবাই তামাশা দেখছে, নিজেদের গা বাঁচাচ্ছে, কেউ আমার বনমালীকে কালীয়নাগের কাছ থেকে ছাড়িয়ে আনতে যাচ্ছে না।

কবি কালীয়-দমনের প্রসঙ্গটির মধ্য দিয়ে যশোদার বাৎসল্যের একটি সার্থক রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। যিনি ব্রজের সকলকে নিজের সন্তানতুল্য ভালোবাসেন, আজ তাঁর বিপদে কেউ তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসছে না। ব্রজবাসীর এই উদাসীনতা যশোদাকে আজ চরম বেদনা দিচ্ছে। রসখানের ভাষা-মাধুর্যে প্রতিটি শব্দের মধ্য দিয়ে মায়ের বাৎসল্য রসের যন্ত্রণা মূর্ত হয়ে উঠেছে।

দুঃখের বিষয়, এমন হৃদয়গ্রাহী বাৎসল্যের পদ কবি অল্প কয়েকটি মাত্র রচনা করেছেন। রসখান মূলত মধুররসের কবি।

উপরে যে, পাঁচজন হিন্দী কৃষ্ণকাব্যের কবির কথা বলা হ'ল, তাঁরা ছাড়াও আলোচ্য কালখণ্ডে আরো কিছু কবি বাৎসল্যের পদ রচনা করেছেন। এ'দের মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য অষ্টছাপ সম্প্রদায়ভুক্ত কবি কৃষ্ণদাস, ছীতস্বামী, গোবিন্দস্বামী ও চতুর্ভুজ দাস। চৈতন্য-সম্প্রদায়ের পদকর্তা গদাধর ভট্টও কয়েকটি বাৎসল্যরসের পদ রচনা করেছেন। এছাড়া, হিন্দী-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভক্ত কবি তুলসীদাসের কয়েকটি কৃষ্ণ-বিষয়ক বাৎসল্যের পদ পাওয়া যায় তাঁর গ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণগীতাবলীতে। তবে তিনি মূলত রামকথার কবি, রামকাহিনী বর্ণনায়ই তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ। তাঁর রচিত কৃষ্ণকথায় তেমন ঔজ্জ্বল্য নেই।

নির্দেশিকা

১. চৈতন্যচরিতামৃত, ২।২।৭৭

২. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সম্পাদিত, চণ্ডীদাস-পদাবলী; ভূমিকা, পৃ ৬

৩. দীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৮ম সং, পৃ ১৩২-৩৩

৪. বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ সম্পাদিত, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, দান খণ্ড, পৃ. ৮৮

৫. মণীন্দ্রমোহন বসু সম্পাদিত, দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী, ১ম খণ্ড, পদ সংখ্যা ১৫

৬ তদেব, পদসংখ্যা ৩৬

৭. দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী, ১ম খণ্ড, পদ সংখ্যা ৬১

৮ নীলরতন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, চণ্ডীদাসের পদাবলী, পৃ. ২৩১

৯ তদেব, পৃ. ২৫২

১০ তদেব, পৃ. ২৪৩-৪৪

১১. তদেব, পৃ. ৯০

১২. তদেব. পৃ. ৯১

১৩. তদেব, পৃ. ৯৩

১৪. তদেব, পৃ. ৯১-৯২

১৫. তদেব, পৃ. ৯৩

১৬ তদেব, পৃ. ২৩৭

১৭ তদেব, পৃ. ২৩৮

১৮ তদেব, পৃ. ২৪৪

১৯. তদেব, পৃ. ২৪৬

২০. তদেব, পৃ. ২৯২

২১ তদেব, পৃ. ২৯৩

২২. তদেব, পৃ. ২৯৫

২৩. তদেব, পৃ. ২৯৬

২৪ চৈতন্যচরিতামৃত, ২।১১।৮৮

২৫. পদকল্পতরু, ৩য় খণ্ড, ৪র্থ শাখা, পদসংখ্যা ২২।২৩১৫

২৬. দীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৮ম সং, পৃ. ১৮৭

২৭ সুকুমার সেন, বাংগলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড পূর্বার্ধ, ৫ম সং, পৃ. ৪১৩

২৮. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ২য় খণ্ড, ২য় সং, পৃ. ৬৫৮-৫৯

২৯. মালবিকা চাকী সংকলিত, বাসু ঘোষের পদাবলী, ভূমিকা

৩০. চৈতন্যচরিতামৃত, ১।১১।১৯

৩১. মালবিকা চাকী সংকলিত, বাসু ঘোষের পদাবলী, ভূমিকা

৩২. Sen, Sukumar. A History of Brajabuli Literature, p. 35

৩৩. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ২য় খণ্ড, ২য় সং, পৃ. ৬৬১

৩৪. নটবর দাস, রসকলি

৩৫. মালবিকা চাকী সংকালত, বাসু ঘোষের পদাবলী, পদসংখ্যা ২০৮
৩৬. দীনবন্ধু দাস, সংকীর্তনামৃত, পৃ ২
৩৭. পদকল্পতরু, ২য় খণ্ড, ৩য় শাখা, পদসংখ্যা ১১।১১৫১
৩৮ মালবিকা চাকী সংকলিত, বাসু ঘোষের পদাবলী, পদসংখ্যা ৬
৩৯. তদেব, পদসংখ্যা ৯
৪০. তদেব, পদসংখ্যা ১৬০
৪১. তদেব, পদসংখ্যা ২০৮
৪২. তদেব, পদসংখ্যা ২০৮
৪৩. পদকল্পতরু, ৩য় খণ্ড, ৪র্থ শাখা, পদসংখ্যা ৪।২২২১
৪৪. তদেব, ৫।২২২২
৪৫. মালবিকা চাকী সংকলিত, বাসু ঘোষের পদাবলী, পদসংখ্যা ১৩৯
৪৬. তদেব, পদসংখ্যা ১৬৬
৪৭. তদেব, ১৬৮
৪৮ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ২য় সং, পৃ ৬৬৫
৪৯. ব্রহ্মচারী অমরচেতন্য সম্পাদিত, বলরামদাসের পদাবলী, ভূমিকা
৫০. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ২য় সং, পৃ ৬৭৯
৫১. Sen, Sukumar. A History of Brajabuli Literature, p. 77
৫২. নরহরি চক্রবর্তী, ভক্তিরত্নাকর, দ্বাদশ তরঙ্গ, পৃ ৮৩৭
৫৩. পদকল্পতরু, ৩য় শাখা, ২য় খণ্ড, ৮১৭ নং পদ, পৃ ১২৩
৫৪. অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী, পৃ ৫৭
৫৫. ব্রহ্মচারী অমরচেতন্য সম্পাদিত, বলরামদাসের পদাবলী, পৃ ৩৩
৫৬. তদেব, পৃ ৩৪
৫৭. তদেব, পৃ ৩৪
৫৮. ভাগবত, ১০ম স্কন্দ, ৯ম অধ্যায়, ১৪-১৮ শ্লোক
৫৯. ব্রহ্মচারী অমরচৈতন্য সম্পাদিত, বলরামদাসের পদাবলী, পৃ ৩৪
৬০. তদেব, পৃ ৩৫
৬১. তদেব,, পৃ ৩৭
৬২. তদেব, পৃ ৩৯
৬৩. পদকল্পতরু ২য় খণ্ড, ৩য় শাখা, পদ সংখ্যা ৩।১২১৮
৬৪. তদেব, ২২।১২০৭
৬৫. তদেব, ২৫।১২১০
৬৬. তদেব, ২৯।১২১৪
৬৭ চৈতন্যচরিতামৃত, ১।১১।৫২
৬৮ ভক্তিরত্নাকর, তরঙ্গ ৯।১০।১৪
৬৯. নরোত্তমবিলাস, ষষ্ঠ ও অষ্টম বিলাস।

৭০. Sen, Sukumar. A History of Brajabuli Literature, p. 67

৭১. দীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পৃ. ১৮৪

৭২. Sen, Sukumar. A History of Brajabuli Literature, p. 67-68

৭৩. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, জ্ঞানদাসের পদাবলী, পৃ. ১৭০, পদ ১৬

৭৪ তদেব, ভূমিকা, পৃ. ১৬

৭৫ তদেব, পৃ. ১০১, পদ ১৪

৭৬ তদেব, পৃ. ১২৮, পদ ৯

৭৭. তদেব, পৃ. ১৬২, পদ ৫

৭৮ সুকুমার ভট্টাচার্য সম্পাদিত, জ্ঞানদাস, যশোদার বাৎসল্যলীলা

৭৯. সকুমার সেন, বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড পূর্বার্ধ, ৫ম সং, প, ৪২৮, পাদটীকা

৮০. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, জ্ঞানদাসের পদাবলী, ভূমিকা

৮১. সুকুমার ভট্টাচার্য সম্পাদিত, জ্ঞানদাস যশোদার বাৎসল্যলীলা, পৃ. ১, পদ ১

৮২. তদেব, পৃ. ২, পদ ২

৮৩. তদেব, পৃ. ৪, পদ ৪

৮৪. তদেব, সুকুমার সেনের ভূমিকা, প ৫

৮৫. তদেব, পৃ. ১৯, পদ ১৮

৮৬. হরেকৃষ্ণ ও মুখোপাধ্যায় শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, জ্ঞানদাসের পদাবলী, পৃ. ৩৩, পদ ১

৮৭. তদেব, পৃ. ৩৩, পদ ১

৮৮. তদেব, পৃ. ৩৩, পদ ২

৮৯ তদেব, পৃ. ৩৪, পদ ৩

৯০. তদেব, পৃ. ৩৪, পদ ৩

৯১. তদেব, পৃ. ২৭, পদ ১

৯২. যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, দ্বারেশচন্দ্র শর্মাচার্য সংকলিত, রায়শেখর পদাবলী, পৃ. ২৭৪, পদ সংখ্যা ১৮০

৯৩. সতীশচন্দ্র রায়ের অভিমতের জন্যে, দ্র. পদকল্পতরু, ৫ম খণ্ড

৯৪ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬২৩

৯৫. তদেব, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬১৮

৯৬. পদকল্পতরু, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২১৮

৯৭ দীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৮ম সং, পৃ. ১৮৮

৯৮. বিমানবিহারী মজুমদার, ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য, পৃ. ৬১

৯৯· বিমানবিহারী মজ্‌মদার, ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য, পৃ ১৩৫

১০০· অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিব ত্ত· পৃ ৬১৬, রায়শেখর অনুচ্ছেদ

১০১· পদকল্পতরু, ২য় খণ্ড, ৩য় শাখা, পদসংখ্যা ১৩।৯৮৫

১০২· যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সংকলিত, রায়শেখরের পদাবলী, পৃ ১· পদ সংখ্যা ১

১০৩· তদেব, পৃ ২, পদ সংখ্যা ২

১০৪· তদেব, পৃ ৮-৯, পদসংখ্যা ৯

১০৫· তদেব, পৃ ৯, পদ সংখ্যা ১০

১০৬· যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সংকলিত, রায়শেখরের পদাবলী· পৃ ১৪৫-৪৬, পদ সংখ্যা ১১২

১০৭· তদেব, পৃ ১৪৭, পদসংখ্যা ১১৩

১০৮· তদেব, পৃ ১৪৪, পদ সংখ্যা ১১১

১০৯· তদেব, পৃ ১৫৩-৫৪, পদ সংখ্যা ১১৬

১১০· বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত, জ্ঞানদাস ও তাঁহার পদাবলী· পৃ ৫৮

১১১· যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সংকলিত, রায়শেখরের পদাবলী, পৃ ১১৪, পদ সংখ্যা ৯৮

১১২· দীনদয়ালু গুপ্ত সংকলিত· হিন্দী সাহিত্য কা বৃহৎ ইতিহাস· ৫ম ভাগ, পৃ ৭৫

১১৩· তদেব, পৃ ৭৫

১১৪ প্রভুদয়াল মীতল অষ্টছাপ পরিচয়, পৃ ৯৭

১১৫· দীনদয়ালু গুপ্ত সংকলিত, হিন্দী সাহিত্য কা বৃহৎ ইতিহাস, ৫ম ভাগ· পৃ ৭৫

১১৬ বলদেব উপাধ্যায়, ভাগবত সম্প্রদায়, পৃ ৪৩২

১১৭· দীনদয়ালু গুপ্ত সংকলিত, হিন্দী সাহিত্য কা বৃহৎ ইতিহাস, ৫ম ভাগ· পৃ ৭৫

১১৮· তদেব, পৃ ৭৬

১১৯ রামচন্দ্র শুক্ল, হিন্দী সাহিত্য কা ইতিহাস, পৃ ১৭২

১২০· ব্রজভূষণ শর্মা ও অন্যান্য সম্পাদিত, কুম্ভনদাস, পৃ ২৪, পদ ৪২

১২১· তদেব, পৃ ৪২, পদ ৯১

১২২· তদেব, পৃ ৪৫, পদ ১০৪

১২৩· তদেব, পৃ ২, পদ ৩

১২৪· তদেব, পৃ ৩, পদ ৫

১২৫· তদেব, পৃ ৩, পদ ৬

১২৬· তদেব, পৃ ১৮, পদ ২৪

১২৭· তদেব, পৃ ৫৩, পদ ১২৫

১২৮· তদেব, পৃ ৫৩, পদ ১২৬

১২৯ তদেব, পৃ ২৭, পদ ৪৮

১৩০· তদেব, পৃ ৫৫; পদ ১৩২

১৩১· তদেব, পৃ ৫৪, পদ ১২৮

১৩২· তদেব, পৃ ৫৫, পদ ১৩৩

১৩৩· তদেব, পৃ ৫৫-৫৬, পদ ১৩৪

১৩৪· বিজয়েন্দ্র স্নাতক, সূর-সাহিত্যক-এক-সর্বেক্ষণ— হরবংশলাল শর্মা সম্পাদিত, সূরদাস গ্রন্থের অন্তর্গত প্রবন্ধ, পৃ ৬৩

১৩৫· রামচন্দ্র শুক্ল, হিন্দী সাহিত্য কা ইতিহাস, পৃ ১৬৩

১৩৬· দীনদয়ালু গুপ্ত, হিন্দী সাহিত্য কা বৃহৎ ইতিহাস, ৫ম খণ্ড, পৃ ৫৬

১৩৭· তদেব, পৃ ৫৭

১৩৮· কৃষ্ণচন্দ্র গুপ্ত, সূরদাস কে অন্ধত্ব কা রূপান্তরণ [রামস্বরূপ আর্য ও গিরিরাজ শরণ অগ্রবাল সম্পাদিত, সূর সাহিত্য সন্দর্ভ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত], পৃ ৬৬৪

১৩৯· দেবেন্দ্রনাথ শর্মা, ব্রজভাষা কী বিভূতিয়াঁ, পৃ ১৬

১৪০· দীনদয়ালু গুপ্ত, হিন্দী সাহিত্য কা বৃহৎ ইতিহাস, ৫ম খণ্ড, পৃ ৫৬-৫৭

১৪১· নন্দদুলারে বাজপেয়ী সম্পাদিত, সূর সাগর, ১ম ভাগ, পৃ ৭৩, পদ ১২৫

১৪২· দীনদয়ালু গুপ্ত, হিন্দী সাহিত্য কা বৃহৎ ইতিহাস, ৫ম খণ্ড, পৃ ৫৯-৬০

১৪৩ Bhandarkar, R. G. Collected Works, vol. IV, p. 113

১৪৪· রামচন্দ্র শুক্ল, হিন্দী সাহিত্য কা ইতিহাস, পৃ ১৬০

১৪৫· হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী, সূরদাস কী রাধা ; সূর সাহিত্য গ্রন্থের অন্তর্গত প্রবন্ধ, পৃ ৯০৮

১৪৬· হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী, উস যুগ কী সাধনা ঔর তাত্কালিক সমাজ— [হরবংশলাল শর্মা সম্পাদিত সূরদাস গ্রন্থের অন্তর্গত প্রবন্ধ], পৃ ৫৬

১৪৭· সত্যদেব চৌধুরী, সূর কা সংযোগ-শৃঙ্গার-বর্ণন ; উপরোক্ত গ্রন্থের অন্তর্গত প্রবন্ধ, পৃ ১০৩

১৪৮· নন্দদুলারে বাজপেয়ী সম্পাদিত, সূর সাগর, ১ম খণ্ড, পৃ ৬২৯, পদ ১০৭১।১৬৮৯

১৪৯· ভাগবত, ১০ম স্কন্ধ, ৪৭ অধ্যায়

১৫০· দেবেন্দ্রনাথ শর্মা। ব্রজভাষা কী বিভূতিয়াঁ, পৃ ২৯

১৫১ নন্দদুলারে বাজপেয়ী সম্পাদিত, সূর সাগর, ২য় খণ্ড, পৃ ৩৭১, পদ ৩৪৯৭।৪১১৫

১৫২· তদেব, পৃ ৩২৬, পদ ৩১৯০।৩৮০৮

১৫৩· তদেব, ২য় খণ্ড, পৃ ৪৩৪, পদ ৩৭১৮।৪৩৩৬

১৫৪· তদেব, ২য় খণ্ড, পৃ ৩৩৫-৩৬, পদ ৩২৩৬।৩৮৫৪

১৫৫ তদেব, ১ম খণ্ড, পৃ ২৫৭, পদ ৪।৬২২

১৫৬. তদেব, পৃ. ২৬০, পদ ৯।৬২৭
১৫৭. তদেব, পৃ. ২৬১, পদ ১১।৬২৯
১৫৮. তদেব, পৃ. ২৭৯, পদ ৫৫।৬৭৩
১৫৯. তদেব, পৃ. ২৭২, পদ ৩৫।৬৫৩
১৬০. তদেব, পৃ. ২৮৪, পদ ৬৮।৬৮৬
১৬১. তদেব, পৃ. ২৭৬, পদ ৪৩।৬৬১
১৬২. তদেব, পৃ. ২৭৬, পদ ৪৩।৬৬১
১৬৩. তদেব, পৃ. ২৮৮, পদ ৮১।৬৯৯
১৬৪. তদেব, পৃ. ২৮৬, পদ ৭৪।৬৯২
১৬৫. তদেব, পৃ. ২৮৬, পদ ৭৫।৬৯৩
১৬৬. তদেব, পৃ. ২৮৬-৮৭, পদ ৭৬।৬৯৪
১৬৭. তদেব, পৃ. ৩০৩, পদ ১২৬।৭৪৪
১৬৮. তদেব, পৃ. ৩৪৬, পদ ২৫৪।৮৭২
১৬৯. তদেব, পৃ. ৩৪৭, পদ ২৫৭।৮৭৫
১৭০. তদেব, পৃ. ৩০০, পদ ১১৫।৭৩৩
১৭১. তদেব, পৃ. ৩১৩, পদ ১৫৫।৭৭৩
১৭২. তদেব, পৃ. ৩৩৭, পদ ২২৪।৮৪২
১৭৩. তদেব, পৃ. ৩৩৬, পদ ২২২।৮৪০
১৭৪. তদেব, পৃ. ৩১৯, পদ ১৭৪।৭৯২
১৭৫. তদেব, পৃ. ৩২৫, পদ ১৮৮।৮০৬
১৭৬ তদেব, পৃ. ৩২৭-২৮, পদ ১৯৫-৮১৩
১৭৭. তদেব, পৃ. ৩২৮, পদ ১৯৬।৮১৪
১৭৮. তদেব, পৃ. ৩৫৯, পদ ২৯৩।৯১১
১৭৯. তদেব, পৃ. ৩৩৫, পদ ২২১।৮৩৯
১৮০. তদেব, পৃ. ৩৩৩-৩৪, পদ ২১৫।৮৩৩
১৮১. তদেব, পৃ. ৩৩৪, পদ ২১৫।৮৩৩
১৮২. তদেব, পৃ. ২৬৯, পদ ২৯৩৫।৩৫৫৩
১৮৩. তদেব, পৃ. ২৭৮, পদ ২৯৭৮।৩৫৯৬
১৮৪. তদেব, পৃ. ৩১৫, পদ ৩১৩৭।৩৭৫৫
১৮৫. তদেব, পৃ. ৩২১, পদ ৩১৬৬।৩৭৮৪
১৮৬. তদেব, পৃ. ৩২২, পদ ৩১৭০।৩৭৮৮
১৮৭. তদেব, পৃ. ৩২২-২৩, পদ ৩১৭২।৩৭৯০
১৮৮. তদেব, পৃ. ৩২৩, পদ ৩১৭৫।৩৭৯৩
১৮৯. তদেব, পৃ. ৩৭৫, পদ ৩৪৩৮।৪০৫৬
১৯০. তদেব, পৃ. ৩৭৫, পদ ৩৪৩৯।৪০৫৭

১৯১. হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী, সূরদাস কী যশোদা, সূর সাহিত্য গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধ, পৃ ১২০

১৯২. Panday, S. N. & Zide, Norman. Suradas and his Krishna Bhakti, in 'Krishna', ed. by Milton Singer, p. 181

১৯৩. নলিনীমোহন সান্যাল, ভক্তপ্রবর মহাকবি সূরদাস, পৃ ৩০

১৯৪. ব্রজভূষণ শর্মা সম্পাদিত, পরমানন্দ সাগর, প্রস্তাবনা, পৃ ১-২

১৯৫. তদেব. প্রস্তাবনায় উদ্ধৃত, পৃ ২

১৯৬. ডঃ দীনদয়ালু গুপ্ত, হিন্দী সাহিত্য কা বৃহৎ ইতিহাস, ৫ম ভাগ, পৃ ৭৭-৭৮

১৯৭ তদেব, ৫ম ভাগ, পৃ ৭৮

১৯৮. তদেব, ৫ম ভাগ, পৃ ৭৮

১৯৯. প্রভুদয়াল মীতল, অষ্টছাপ পরিচয়, পৃ ১৮০

২০০. ডঃ দীনদয়ালু গুপ্ত, হিন্দী সাহিত্য কা বৃহৎ ইতিহাস, ৫ম ভাগ, পৃ ৭৯

২০১. ব্রজভূষণ শর্মা, পরমানন্দ সাগর, প্রস্তাবনা, পৃ ২

২০২. প্রভুদয়াল মীতল, অষ্টছাপ পরিচয়, পৃ ১৮২

২০৩. ডঃ দীনদয়ালু গুপ্ত, হিন্দী সাহিত্য কা বৃহৎ ইতিহাস, ৫ম ভাগ, পৃ ৮১

২০৪. বলদেব উপাধ্যায়, ভাগবত-সম্প্রদায়, ১ম সং, পৃ ৪১০

২০৫. ব্রজভূষণ শর্মা ও অন্যান্য সম্পাদিত, পরমানন্দ সাগর, পৃ ১০৪, পদ ২২৮

২০৬. তদেব, পৃ ১০৬, পদ ২৩১

২০৭. তদেব, পৃ ১০৭, পদ ২৩৫

২০৮. প্রভুদয়াল মিতল, অষ্টছাপ পরিচয়, পৃ ১৮১

২০৯. ব্রজভূষণ শর্মা ও অন্যান্য সম্পাদিত, পরমানন্দ সাগর, পৃ ২৩৭, পদ ৫৩৬

২১০. তদেব, পৃ ১৮৫, পদ ৪১৭

২১১ তদেব, পৃ ৮-৯

২১২. তদেব, পৃ ৯

২১৩. তদেব, পৃ ৩২৮, পদ ৭৫৩

২১৪. প্রভুদয়াল মীতল, অষ্টছাপ পরিচয়, পৃ ১৮২

২১৫. ব্রজভূষণ শর্মা ও অন্যান্য সম্পাদিত, পরমানন্দসাগর, প্রস্তাবনা, পৃ ১১

২১৬. তদেব, প্রস্তাবনা, পৃ ১১

২১৭. তদেব, পৃ ২০১, পদ ৪৫৩

২১৮. S. M. Panday and Norman Zide. Surdas and his Krishna-bhakti, in 'Krishna', ed. by Milton Singer, p. 179

২১৯. প্রভুদয়ালু মীতল, অষ্টছাপ পরিচয়, পৃ ১৮১

২২০. ব্রজভূষণ শর্মা ও অন্যান্য সম্পাদিত, পরমানন্দ সাগর, প্রস্তাবনা, পৃ ৬

২২১. তদেব, পৃ ৪, পদ ৮

২২২. তদেব, পৃ ৩, পদ ৭

২২৩ তদেব, পৃ. ২০, পদ ৪১
২২৪ তদেব, পৃ. ১৯, পদ ৪০
২২৫. তদেব, পৃ. ২৬, পদ ৫৭
২২৬. তদেব, পৃ. ২৬, পদ ৫৭
২২৭. তদেব, পৃ. ৩০, পদ ৬৬
২২৮. তদেব, পৃ. ৩১, পদ ৬৮
২২৯ তদেব, পৃ. ৩৩, পদ ৭১
২৩০. তদেব, পৃ. ১৩, পদ ৩১
২৩১. তদেব, পৃ. ৫৫, পদ ১১৮
২৩২. তদেব, পৃ. ৫৮, পদ ১২৩
২৩৩. তদেব, পৃ. ১৮, পদ ৩৬
২৩৪ তদেব, পৃ. ৪৬, পদ ১০০
২৩৫. তদেব, পৃ. ৪৯, পদ ১০৬
২৩৬ তদেব, পৃ. ৪১-৪২, পদ ৯১
২৩৭. তদেব, পৃ. ৬১, পদ ১৩২
২৩৮ তদেব, পৃ. ৬১, পদ ১৩২
২৩৯. তদেব, পৃ. ৬১, পদ ১৩১
২৪০ তদেব, পৃ. ৬১, পদ ১৩১
২৪১ তদেব, পৃ. ১৬৯, পদ ৩৮১
২৪২. তদেব, পৃ. ১২১, পদ ২৬৩
২৪৩. তদেব, পৃ. ১২১, পদ ২৬৪
২৪৪. তদেব, পৃ. ১১১-১২, পদ ২৪৩
২৪৫. তদেব, পৃ. ১১২, পদ ২৪৩
২৪৬. তদেব, পৃ. ৩৯, পদ ৮৫
২৪৭. তদেব, পৃ. ৩৫, পদ ৭৮
২৪৮. তদেব, পৃ. ১৪২-৪৩, পদ ৩১৭
২৪৯. তদেব, পৃ. ১৪৪, পদ ৩২১
২৫০. তদেব, পৃ. ১৪৪, পদ ৩২১
২৫১. তদেব, পৃ. ১৪০, পদ ৩১১
২৫২. তদেব, পৃ. ৮০, পদ ১৭২
২৫৩. তদেব, পৃ. ৮৫, পদ ১৮৩
২৫৪. তদেব, পৃ. ৮৮, পদ ১৯০
২৫৫. তদেব, পৃ. ৯২, পদ ১৯৮
২৫৬. তদেব, পৃ. ৭০, পদ ১৫১
২৫৭. তদেব, পৃ. ৭১, পদ ১৫২

২৫৮. তদেব, পৃ. ৪১৬, পদ ৯৫৭

২৫৯. দীনদয়াল্ গুপ্ত, অষ্টছাপ ঔর বল্লভ সম্প্রদায়, ২য় ভাগ, পৃ. ৭৩৫

২৬০. ব্রজভূষণ শর্মা ও অন্যান্য সম্পাদিত, পরমানন্দসাগর, পৃ. ৪২২, পদ ৯৭৩

২৬১ তদেব, পৃ. ৫০০, পদ ১১৪২

২৬২. তদেব, পৃ. ৪৯৮, পদ ১১৩৮

২৬৩ তদেব, পৃ. ৪৯৮, পদ ১১৩৮

২৬৪ তদেব, পৃ. ৪৯৯, পদ ১১৪০

২৬৫ তদেব, পৃ. ৫০০-৫০১, পদ ১১৪৩

২৬৬. তদেব, পৃ. ৫১০, পদ ১১৬৫

২৬৭ প্রভুদয়াল মীতল, অষ্টছাপ পরিচয়, পৃ. ৩১৬

২৬৮. রামকুমার বর্মা, হিন্দী সাহিত্য কা আলোচনাত্মক ইতিহাস, ৩য় সং, পৃ. ৫৪৭

২৬৯ দীনদয়াল্ গুপ্ত, হিন্দী সাহিত্য কা বৃহৎ ইতিহাস, ৫ম ভাগ, পৃ. ৯০

২৭০. তদেব, পৃ. ৯১

২৭১. তদেব, পৃ. ৯০

২৭২. দেবেন্দ্রনাথ শর্মা, ব্রজভাষা কী বিভূতিয়াঁ, পৃ. ৫১

২৭৩ দীনদয়াল্, গুপ্ত, হিন্দী সাহিত্য কা বৃহৎ ইতিহাস, ৫ম ভাগ, পৃ. ৯১

২৭৪ দেবেন্দ্রনাথ শর্মা, ব্রজভাষা কী বিভূতিয়াঁ, পৃ. ৫১

২৭৫ ব্রজরত্নদাস সম্পাদিত, নন্দদাস পদাবলী, পৃ. ২৭৯, পদ ১

২৭৬. তদেব, পৃ. ২৮১, পদ ৬

২৭৭ তদেব, পৃ. ২৮৫. পদ ২০

২৭৮. তদেব, ভূমিকা, পৃ. ১১৮

২৭৯ তদেব, পৃ. ২৯৭, পদ ৫৪

২৮০ তদেব, পৃ. ৩০৩, পদ ৭৯

২৮১. তদেব, পৃ. ৩২০, পদ ১৪৩

২৮২. তদেব, পৃ. ২৯৯, পদ ৬০

২৮৩ দীনদয়াল্, গুপ্ত, হিন্দী সাহিত্য কা বৃহৎ ইতিহাস, পৃ. ৯৯

২৮৪ দীনদয়াল্ গুপ্ত, অষ্টছাপ ঔর বল্লভ সম্প্রদায়, ২য় ভাগ, পৃ. ৮৭৬

২৮৫. ব্রজরত্নদাস, সম্পাদক, নন্দদাস পদাবলী, পৃ. ৩২৮, পদ ১৭২

২৮৬. দীনদয়াল্ গুপ্ত, অষ্টছাপ ঔর বল্লভ সম্প্রদায়, ২য় ভাগ, পৃ. ৮৬৯

২৮৭. ব্রজরত্নদাস সম্পাদিত, নন্দদাস গ্রন্থাবলী, পৃ. ১৮৯, পদ ২৮

২৮৮. তদেব, পৃ. ২৯০, পদ ২৮

২৮৯. উমাশঙ্কর শুক্ল সম্পাদিত, নন্দদাস, ২য় ভাগ, পৃ. ৩৩১, পদ ৭৫

২৯০. ব্রজভূষণ শর্মা সম্পাদিত, নন্দদাস গ্রন্থাবলী, পৃ. ২৯২, পদ ৩৪

২৯১ তদেব, পৃ. ২৯১, পদ ৩১

২৯২. তদেব, পৃ ২৯১, পদ ৩১

২৯৩. তদেব, পৃ ২৯১, পদ ৩২

২৯৪. তদেব, পৃ ২৯১, পদ ৩১

২৯৫. ব্রজরত্নদাস সম্পাদিত, নন্দদাস গ্রন্থাবলী, পৃ ২৯২, পদ ৩৬

২৯৬. তদেব, পৃ ২৯৩, পদ ৩৯

২৯৭. তদেব, পৃ ২৯৩, পদ ৪০

২৯৮. তদেব, পৃ ২৯৪, পদ ৪১

২৯৯. হজাবীপ্রসাদ দ্বিবেদী, দুর্গাশংকর মিশ্রেব রসখান কা অমব কাব্য, (১ম সং), পরিশিষ্ট, পৃ ৯১

৩০০. ভবানীশংকর যাজ্ঞিক সম্পাদিত, রসখান রত্নাবলী, পৃ ৭১, পদ ৪৮

৩০১. শ্রীকৃষ্ণ গুপ্ত, রসখান, পৃ ৭৩

৩০২. দুর্গাশংকর মিশ্র, রসখান কা অমব কাব্য, পৃ ১২

৩০৩ বামচন্দ্র শুক্ল, হিন্দী সাহিত্য কা ইতিহাস, পৃ ১৮৫

৩০৪. শিবসিংহ, শিবসিংহ সবোজ, পৃ ৪৮১

৩০৫ ভবানীশংকব যাজ্ঞিক, রসখান রত্নাবলী, ভূমিকা, পৃ ৯-১০

৩০৬ বামচন্দ্র শুক্ল, হিন্দী সাহিত্য কা ইতিহাস, পৃ ১৮৫

৩০৭. তদেব, পৃ ১৮৫

৩০৮ ভবানীশংকব যাজ্ঞিক সম্পাদিত, রসখান গ্রন্থাবলী, পৃ ৭১, পদ ৫১

৩০৯. বামচন্দ্র শুক্ল, হিন্দী সাহিত্য কা ইতিহাস পৃ ১৮৫

৩১০. তদেব, পৃ ১৮৫-৮৬

৩১১. দীনদযালু গুপ্ত, হিন্দী সাহিত্য কা বৃহৎ ইতিহাস, ৫ম ভাগ, পৃ ৪৯১

৩১২ ভবানীশংকর যাজ্ঞিক সম্পাদিত, রসখান রত্নাবলী, পৃ ৭৩, পদ ১

৩১৩ তদেব, পৃ ৭৫, পদ ৮

৩১৪. তদেব, পৃ ১১২, পদ ১১৭

৩১৫. তদেব, পৃ ১০৩, পদ ৯১

৩১৬ তদেব, পৃ ১০৭, পদ ১০৪

৩১৭. তদেব, পৃ ১১৩, পদ ১২০

৩১৮. তদেব, পৃ ১৫৪, পদ ২২৭

৩১৯. শ্রীহংসরাজ অগ্রবাল, দুর্গাশংকব মিশ্রের রসখান কা অমর কাব্য গ্রন্থের পরিশিষ্ট, পৃ ৯৫

৩২০. বিয়োগী হরি, দুর্গাশংকব মিশ্রের রসখান কা অমব কাব্য গ্রন্থেব পরিশিষ্ট, পৃ ৯০

৩২১. দীনদয়ালু গুপ্ত সংকলিত, হিন্দী সাহিত্য কা বৃহৎ ইতিহাস, ৫ম ভাগ, পৃ ৪৯১

৩২২. ভবানীশংকর যাজ্ঞিক সম্পাদিত, রসখান রত্নাবলী, পৃ ৮৪, পদ ৩২

৩২৩. তদেব, পৃ. ৮৪-৮৫, পদ ৩৪
৩২৪. তদেব, পৃ. ৮৩, পদ ৩১
৩২৫. তদেব, পৃ. ৮৩, পদ ৩০
৩২৬. তদেব, পৃ. ৮৪, পদ ৩৩

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলা ও হিন্দী বাৎসল্যরসের পদাবলী তুলনামূলক আলোচনা

তুলনামূলক আলোচনা সম্পর্কে দুটি পরস্পরবিরোধী অভিমত আছে। জন ডান বলেছেন— 'Comparisons are odious'।[১] প্রত্যেক লেখক ও শিল্পী নিজস্ব ভাবনা ও ব্যক্তিত্বের দ্বারা শিল্প রচনা করেন। সুতরাং যে শিল্পকর্মের রচয়িতাদের মধ্যে মূলগত পার্থক্য রয়েছে সেখানে ভালো-মন্দ, ছোট-বড়, বিচার করতে যাওয়া বিরক্তিকর।

কিন্তু আমাদের আলোচ্য বিষয়ের ক্ষেত্রে তুলনা করবার সুবিধা আছে। সেটা হ'ল এই যে, বাংলা ও হিন্দী বৈষ্ণব কবিরা একই সূত্র থেকে নানা কাহিনী আহরণ করে কৃষ্ণ-কেন্দ্রিক কাব্য রচনা করেছেন। সুতরাং এই ক্ষেত্রে আমাদের পক্ষে তুলনা করে দেখানো সম্ভব,—কোথায় কোন কবি একই বিষয় প্রস্ফুটিত করতে গিয়ে সফলতা অর্জন করেছেন, অথবা উভয়ভাষী কবির দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পার্থক্যই বা কোথায়। এরূপ তুলনামূলক আলোচনা বিরক্তিকর নয়, বরং আনন্দদায়ক— যাকে শেক্সপিয়র বলেছেন : Comparisons are odorous.[২]

ভাগবতের অনুসরণ বৈষ্ণব ভক্ত-কবিদের মূল উদ্দেশ্য ছিল কৃষ্ণের লীলাগান। তা তিনি বাঙালি-কবিই হোন, অথবা হিন্দী-ভাষী কবিই হোন। নিছক কাব্য রচনার উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁরা পদ রচনা করেন নি। কবির ভক্তি মানসিকতাই মুখ্য ; এবং বাংলা ও হিন্দী ভাষার বৈষ্ণব কবিদের ভক্তির উৎসভূমি ভাগবত। বাংলা ও হিন্দী বৈষ্ণব পদ-সাহিত্যে ভাগবত যে অঙ্গাঙ্গি সম্পর্কান্বিত এবং তা এতই সুপ্রকাশ যে প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। উভয় ভাষার কবিরা ভাগবতের পীঠভূমিতে দাঁড়িয়ে যে কৃষ্ণলীলার কাহিনী বর্ণনা করেছেন, তা অভিনবরূপে বাংলা ও হিন্দী বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

হিন্দী বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদকর্তা সূরদাস কৃষ্ণলীলা গানের সূচনাতেই ভাগবতের নিকট তাঁর অপরিসীম ঋণের স্বীকৃতি দিয়েছেন:

ব্যাস কহে সুকদের সোঁ দ্বাদস-স্কন্ধ বনাই।
সূরদাস সোঁঙ্গ কহে পদ ভাষা করি গাই॥[৩]

—ব্যাসদেব দ্বাদশ স্কন্দে শুকদেবকে যা বলেছেন, সূরদাস সেই কথাই দেশীয় ভাষায় গাইবেন।

এছাড়া, তাঁর রচনার বহু স্থানে তিনি ভাগবতের প্রভাবের কথা স্বীকার করেছেন, "সূর কহ্যা ভাগবত অনুসার"।

বাংলা ও হিন্দী পদাবলী-সাহিত্যে বর্ণিত প্রসঙ্গগুলি মোটামুটি ভাগবতানুগ বলা যায়। কৃষ্ণের জন্মলীলা থেকে আলোচনার সূত্রপাত করা যেতে পারে। কৃষ্ণের আবির্ভাবের সময় আসন্ন, সমস্ত পরিবেশ রমণীয়, শুভক্ষণ উপস্থিত। বিষ্ণু দেবকীর গর্ভ থেকে আবির্ভূত হলেন— "তমদ্ভুতং বালকমম্বুজেক্ষণং চতুর্ভুজং শঙ্খগদাদ্যুদায়ুধম্।"[৪] অর্থাৎ বালকের কমল-নয়ন চতুর্ভুজের শঙ্খচক্রগদাপদ্ম।

পরমপুরুষের আবির্ভাবে, "সূতিকাগৃহং বিরোচয়ন্তং গতভাঃ প্রভাববিৎ।"[৫] অর্থাৎ বালক নিজের অঙ্গ-প্রভায় সূতিকাগৃহ আলোকিত করে রেখেছেন। বসুদেব ও দেবকী নতমস্তকে তাঁর স্তব করতে লাগলেন। বিষ্ণু চতুর্ভুজ মূর্তি পরিহার করে প্রাকৃত মানব-শিশুর রূপধারণ করলেন। ভগবানের আদেশে নিষ্ঠুর কংসের হাত থেকে রক্ষার জন্যে বসুদেব নবজাত শিশুকে নিয়ে যাত্রা করলেন বৃন্দাবনে। কারাগারের দ্বার আপনি উন্মুক্ত হ'ল। ভয়ংকর দুর্যোগপূর্ণ রাত্রি, নিরুপায় বসুদেব তারই মধ্যে যমুনা পার হলেন। শেষনাগ তার ফণা বিস্তার করে শিশুকে রক্ষা করলেন বর্ষণের হাত থেকে। ভগবানের আদেশে বৃন্দাবনে নন্দগৃহে যশোদার ক্রোড়ে জন্ম নিয়েছেন যোগমায়া। বসুদেব নন্দগৃহে এসে গোপদের নিদ্রিত দেখে কৃষ্ণকে যশোদার শয্যায় রেখে তাঁর কন্যাকে নিয়ে ফিরে এলেন।

বাংলা ও বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে একমাত্র দীন চণ্ডীদাস ছাড়া কোনো প্রথম শ্রেণীর কবিই কৃষ্ণের জন্ম সম্পর্কে কিছুই বলেন নি। এই প্রসঙ্গে ডঃ গীতা চট্টোপাধ্যায় বলেছেন: "বিস্ময়কর, কোনো প্রথম শ্রেণীর কবিপ্রতিভা কৃষ্ণের জন্মলীলার প্রতি আকৃষ্ট হননি। বোধ করি, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের বৈশিষ্ট্যবশত কৃষ্ণের নিত্যলীলায় বিশ্বাসী পদকর্তা কৃষ্ণ-জন্মের প্রসঙ্গে আগ্রহহীন।"[৬] দীন চণ্ডীদাস তার পদ রচনায় ভাগবতকে বিশেষভাবে অবলম্বন করেছেন। তাই তাঁর রচনায় কৃষ্ণের জন্ম, বাল্যলীলা, গোষ্ঠ ইত্যাদির মধ্যে ভাগবতের প্রভাব সুস্পষ্ট। দীন চণ্ডীদাস সম্পর্কে ডঃ গীতা চট্টোপাধ্যায় তাই বলেছেন— "ভাগবতীয় ঘটনা বিবরণের নৈষ্ঠিক অনুবর্তনে উৎসাহী ছিলেন।"[৭]

দীন চণ্ডীদাসের পদাবলীতেও ভাগবতের মতোই জন্মের পর কৃষ্ণের অলৌকিক জ্যোতিতে চতুর্দিক উদ্ভাসিত হয়েছিল:

রূপের ছটায়ে আন্ধার ঘরেতে

জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠে।[৮]

বসুদেব ও দেবকী অনুভব করেন তাঁদের সন্তান—

দেবের দেবঁতা   পরম ঈশ্বর[৯]

এবং দেবতা জ্ঞানেই তাঁরা ঈশ্বরের আরাধনা শুরু করেন। কৃষ্ণ বৈষ্ণবী মায়ায় দেবকী ও বসুদেবের দেব-জ্ঞান হরণ করলেন :

চতুর্ভুজ ছাড়ি
দ্বিভুজ হইলা পূর্ণ।[১০]

তখন দেব-মহিমা ভুলে কৃষ্ণকে দেবকী নিজের সন্তান জ্ঞানে কোলে তুলে নিলেন; কিন্তু কংসের হাত থেকে পুত্রকে রক্ষার জন্যে বসুদেব ও দেবকী ভাবনায় আকুল হয়ে পড়লেন। সেই মুহূর্তে দৈববাণী হ'ল :

নন্দ ঘোষ-ঘরে   রাখিহ ছাবালে
ঘুচক হিবার বেথা।[১১]

ভাগবতে আছে, গভীর রাত্রে প্রসবক্লান্ত মূর্ছিত যশোদার কোলে কৃষ্ণকে রেখে পরিবর্তে তাঁর সদ্যোজাত কন্যাকে নিয়ে বসুদেব ফিরে এলেন। সকালে ঘুম ভাঙলে যশোদা পুত্রের মুখ দেখে উৎফুল্ল হলেন এবং সমস্ত গোকুলে নন্দ-যশোদার পুত্র হয়েছে, এই সংবাদে উৎসব শুরু হয়ে গেল। ভাগবতের এই বিস্তৃত বর্ণনা অন্যান্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব কবিদের পদে সামগ্রিক ভাবে না হলেও কিছু কিছু ইঙ্গিত আছে।

নিদ্রা অচেতন রাণী কিছুই না জানে,
চেতন পাইয়া পুত্র দেখিল নয়নে॥
...   ...
একথা শুনিয়া নন্দ আনন্দিত মন।
একে একে চলিলেন সূতিকা ভবন।[১২]

দীন চণ্ডীদাস ভাগবত অনুসারী হয়েও নন্দগৃহে কৃষ্ণকে রেখে যাওয়ার ঘটনায় তাঁর স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয়। গভীর রাত্রে সম্পূর্ণ গোপনে (দীন চণ্ডীদাসের পদে) বসুদেব একাজ করেন নি। বসুদেব নন্দগৃহে এসে নন্দ এবং যশোদাকে তাঁর শিশুপুত্রের অলৌকিকত্ব সম্পর্কে বলছেন :

বসুদেব বলে—   ...লেহ
দিলাঙ তোমার ঠাঞি॥
লালন পালন   করিবে ছাআলে
এই সে তোমার পুত্র।
মনের আনন্দে   ...দিলাঙ
কহিল ইহার সূত্র॥[১৩]

বসুদেব একথাও স্বীকার করেছেন যে, তিনি কংসের হাত থেকে পুত্রকে রক্ষা করবার জন্যে তাঁদের কাছে এসেছেন। তারপরই দেখি—

এ বোল শুনিঞা   আনন্দে জসদা

বালক লইঞা কোলে ॥[১৪]

হিন্দী বৈষ্ণব কবিরাও ভাগবতেরই পুনরাবৃত্তি করেছেন। বসুদেব ও দেবকী অত্যাচারী কংসের হাত থেকে পুত্রকে রক্ষা করার জন্যে ব্যাকুল। তখন কৃষ্ণ তাঁর চতুর্ভুজ মূর্তি নিয়ে প্রত্যক্ষ হলেন তাঁদের কাছে। "দুখিত দেখি বসুদেব দেবকী, প্রগট ভএ ধরি কৈ ভুজ চারে।"[১৫]— বসুদেব ও দেবকীকে দুঃখিত দেখে কৃষ্ণ তাঁর চতুর্ভুজরূপ ধারণ করলেন। দেবকী ও বসুদেব পুত্রের অলৌকিক রূপ দেখে বিস্মিত হলেন। কৃষ্ণ তাঁদের বললেন—

তুরত মোহি গোকুল পহুঁচাবহু,' য়হ কহি কৈ সিসু বেষ ধরয়ৌ।[১৬]

—তাড়াতাড়ি আমাকে গোকুলে পৌছাও, একথা বলেই তিনি শিশুরূপ ধারণ করলেন। পুত্রের জীবন রক্ষার জন্যে পিতা বসুদেব নবজাত শিশু কৃষ্ণকে নিয়ে বৃন্দাবনের পথে যাত্রা করলেন।

ভাদৌঁ কী রয়নি অঁধিয়াবী
গরজত গগন দামিনী কৌঁধতি গোকুল চলে মুরারী।[১৭]

—ভাদ্র মাসের অন্ধকার রাত্রি, মেঘ গর্জন করছে, ক্রুদ্ধ বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, মুরারী গোকুলে চলেছেন। ভয়ংকর অন্ধকারে ও প্রবল বৃষ্টির মধ্যে বসুদেব কৃষ্ণকে নিয়ে যমুনা পার হলেন। প্রচণ্ড বর্ষণের হাত থেকে শিশুকে রক্ষা করার জন্যে—

"সেস সহস্র ফণ বূঁদ নিবারত সেত ছত্র সির তান্যোঁ।"[১৮]

—শেষনাগ শ্বেত ছত্রের মতো নিজের সহস্র ফণা বিস্তার করে তাঁর [কৃষ্ণের] মাথার উপর মেলে তাকে বৃষ্টি থেকে রক্ষা করলেন। বসুদেব শিশুকে মূর্ছিত যশোদার কাছে রেখে ফিরে এলেন মথুরায়। সকালে নিদ্রাভঙ্গের পর কোলের কাছে যশোদা কৃষ্ণকে দেখে নিজের পুত্র মনে করে তাঁকেই বক্ষে টেনে নিলেন এবং আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে নন্দকে সংবাদ পাঠালেন।

জাগী মহরি, পুত্র মুখ দেখ্যৌ, পুলকি অংগ উব মৈঁ ন সমাই।
গদ-গদ কণ্ঠ, বোল নহি আবে, হরষবন্ত হেব নন্দ বুলাই ॥[১৯]

—জেগে উঠে পুত্রমুখ দেখে যশোদার অঙ্গ পুলকিত হ'ল; তাঁর আনন্দের সীমা নেই। গদ্‌-গদ্‌ কণ্ঠ, কথা বলতে পারছেন না, হরষিত হয়ে তিনি নন্দকে ডেকে পাঠালেন।

অধিক বয়সে নন্দের পুত্র-সন্তান হয়েছে। স্বভাবতই নন্দগৃহে আজ উৎসব। সমস্ত বৃন্দাবন আনন্দে মগ্ন।

কোন গোপ ধেয়া গিয়া দধি দুগ্ধ ঘৃত লয়্যা
উভারয়ে নন্দের ভবনে।
দুজনে দুজন মেলি বাহু যুদ্ধ পেলাপেলি
কোন গোপ করয়ে নর্তনে।[২০]

ভাগবতেও এই নন্দ মহোৎসবের বর্ণনা রয়েছে, যা বাংলা পদাবলীর মতোই উচ্ছ্বাসমুখর।

গোপাঃ পরস্পরং হৃষ্টা দধিক্ষীরঘৃতাম্বুভিঃ।
আসিঞ্চন্তো বিলিম্পন্তো নবনীতৈশ্চ চিক্ষিপুঃ॥[২১]

—গোপগণ পরমানন্দে দধি দুগ্ধ ঘৃত ও জল দ্বারা পরস্পরের দেহে অভিষিক্ত করে এবং পরস্পরের দেহে মাখন লিপ্ত করছেন ও মাখন একে অন্যের প্রতি নিক্ষেপ করছেন। হিন্দী বৈষ্ণব পদাবলীতেও এই উৎসবের বর্ণনা ভাগবতানুসারী।

বাংলা ও হিন্দী বৈষ্ণব পদাবলীতে কৃষ্ণের মৃত্তিকা ভক্ষণ ও যশোদাকে বিশ্বরূপ প্রদর্শনের প্রসঙ্গটি সম্পূর্ণ ভাগবতকে অনুসরণ করেই রচিত। বাংলা পদে আছে—

বদন মেলিয়া গোপাল রাণী পানে চায়।
মুখ মাঝে অপরূপ দেখিবারে পায়॥
এ ভূমি আকাশ আদি চৌদ্দ ভুবন।
সুরলোক নাগলোক নরলোকগণ॥
... ...
দেখি নন্দ ব্রজেশ্বরী বচন না স্ফুরে।
স্বপ্ন প্রায় কি দেখিনু হেন মনে করে॥
নিজ-প্রেমে পরিপূর্ণ কিছুই না মানে।
আপন তনয় কৃষ্ণ প্রাণ মাত্র জানে॥
ডাকিয়া কহয়ে নন্দে আশ্চর্য বিধান।
পুত্রের মঙ্গল লাগি বিপ্রে কর দান॥[২২]—উদ্ধবদাস

হিন্দী বৈষ্ণব পদাবলীতে অনুরূপ বর্ণনাই পাওয়া যায়, কোনো ব্যতিক্রম নেই। এখানে সুরদাস যে রূপান্তর করেছেন, তা উদ্ধৃত করা যেতে পারে—

অখিল ব্রহ্মাণ্ড-খণ্ড কী মহিমা, দিখরাঈ মুখ মাহি।
সিন্ধ-সুমের-নদী-বন-পর্বত চকিত ভঈ মন চাহি॥

—যশোদা কৃষ্ণের মুখের ভিতর, অখিল ব্রহ্মাণ্ডের মহিমা দেখলেন এবং তিনি আশ্চর্য হয়ে আরো দেখলেন সমুদ্র, নদী, বন ও পর্বত ইত্যাদি।

ভাগবতে মৃত্তিকা ভক্ষণের প্রসঙ্গে আছে—

সা তত্র দদৃশে বিশ্বং জগৎ স্থাস্নু চ খং দিশঃ।
সাদ্রিদ্বীপাব্ধিভূগোলং সবাম্বগ্নীন্দুতারকম্॥
জ্যোতিশ্চক্রং জলং তেজো নভস্বান্ বিয়দেব চ।
বৈকারিকানীন্দ্রিয়ানি মনোমাত্রা গুণাস্ত্রয়ঃ॥[২৩]

—কৃষ্ণের মুখগহ্বরে যশোদা বিশ্বরূপ দর্শন করলেন। সেই মুখবিবরে স্থাবর, জঙ্গম, অন্তরীক্ষ, দশদিক, পর্বত, দ্বীপ, সাগর সহ ভূগোলক এবং প্রবাহবায়ু, বিদ্যুতের ঝলক, চন্দ্র, তারকামণ্ডল, জ্যোতিষচক্র, জল, তেজ, বায়ু আকাশ, মহৎ, অহংকার, ইন্দ্রিয়সকল এবং তাদের নিয়ন্ত্রণকারী দেবতাসমূহ, মন শব্দাদি বিষয় সকল ও সত্ত্বাদিগুণ— এই সমস্ত একই সঙ্গে যশোদা দেখতে পেলেন।

আর, সেই অকল্পনীয় বিরাট সর্বব্যাপী বিশ্বচিত্রের এক পাশে যশোদা দেখতে

পেলেন ব্রজধাম এবং নিজেকে। বিশ্বরূপ দর্শন করে ভীতিবিহ্বল যশোদা ভাবছেন: "কিং স্বপ্ন এতদূত দেবমায়া কিংবা মদীয়ো বত বুদ্ধিমোহঃ।"[২৪] অর্থাৎ, একি স্বপ্ন? না, ভগবানের মায়া, অথবা আমারই বুদ্ধি বিভ্রমের লক্ষণ?

বিশ্বরূপ দর্শনের ফলে যশোদার মন যখন ক্রমশ তত্ত্বজ্ঞান প্রাধান্য লাভ করছিল, তখনই কৃষ্ণ যশোদার উপর অপত্য-স্নেহের বৈষ্ণবী মায়া বিস্তার করায় যশোদা বিশ্বরূপ দর্শনের স্মৃতি বিস্মৃত হয়ে স্নেহবিগলিত চিত্তে পুত্রকে কোলে তুলে নিলেন। তিনি আবার ফিরে এলেন লৌকিক জগতে।

ভাগবতে বিশ্বরূপ বর্ণনায় যে গাম্ভীর্য, ভয়, বিস্ময় এবং অসীম ব্রহ্মাণ্ড কল্পনায় যে কবিত্ব উপলব্ধ হয়, বাংলা বা হিন্দী পদাবলীতে তার একান্তই অভাব। তাছাড়া, মূল ভাগবতের ঐশ্বর্যবোধের চিত্র অনেকটা ফিকে হয়েছে। পদাবলীর বর্ণনা অনেক সহজ ও স্বাভাবিক। বাৎসল্যের অনুভূতি কৃষ্ণকে ঐশ্বর্যলোক থেকে একেবারে বাস্তবলোকে এনে উপস্থিত করেছে।

প্রসঙ্গত সুরদাসের একটি পদের উল্লেখ করা যেতে পারে। যশোদা কৃষ্ণের মুখের ভিতরে বিশ্বরূপ দর্শনের বিবরণ দেবার পর নন্দ বলছেন—

কহত নন্দ জসুমতি সোঁ বাত।
কহা জানিঐ, কহতেঁ দেখ্যৌ, মেরেঁ কান্হ বিসাত॥
পাচ বরষ কো মেরো কন্হেয়া, অজবজ তেরী বাত।
বিনহী কাজ সাঁটি লে ধাবতি, তা পাছেঁ বিললাত॥
কুসল রহেঁ বলরাম স্যাম দোউ খেলত-খাত-অন্হাত।[২৫]

—যশোদার কাছে বিশ্বরূপ দর্শনের কথা শুনে নন্দ যশোদাকে বলছেন, কি জানি আমার কানাইয়ের মধ্যে তুমি কি দেখেছ, তাই নিয়ে শুধু শুধু কানাইয়ের উপর রাগ করছ। পাঁচ বছরের আমার ছোট্ট কানাই, আশ্চর্য তোমার কথা। বিনা কারণেই তুমি লাঠি নিয়ে ওদের পেছনে ছুটছ। বলরাম-শ্যাম দু'জনে খেলছে, স্নান করছে, খাচ্ছে, কুশলে আছে। পিতা নন্দ তো তাই চান।

নন্দ লৌকিক পুত্র স্নেহে এমনই অন্ধ যে, তিনি কৃষ্ণের ঐশ্বর্যরূপ কল্পনা করতে পারেন না এবং চানও না।

বাংলা পদাবলীতেও মানবিক স্নেহ অলৌকিকত্বকে অবিশ্বাস করবার প্ররোচনা দেয়। তবে, গৌড়ীয় পদকর্তারা নন্দের স্নেহকে বড় করে দেখেন নি। যশোদা কৃষ্ণের মুখে বিশ্বরূপ দেখেও বিশ্বাস করতে পারছেন না:

নিজ-প্রেমে পরিপূর্ণ কিছুই না মানে।
আপন তনয় কৃষ্ণ প্রাপ মাত্র জানে॥
ডাকিয়া কহয়ে নন্দে আশ্চর্য বিধান।
পুত্রের মঙ্গল লাগি বিপ্রে কর দান॥
এ দাস উদ্ধবে কবে ব্রজেশ্বরীর প্রেম।
কিছু না মিশায় যেন জাম্বুনদ হেম॥[২৬]

পদাবলী সাহিত্যে যশোদার বাৎসল্য অতুলনীয়। মাতৃহৃদয়ের এই স্নেহোৎকণ্ঠই যশোদাকে প্রতি মুহূর্তে মহিমান্বিত করেছে। কিন্তু ভাগবতে বাৎসল্যের যে সর্বোৎকৃষ্ট চিত্র অঙ্কিত হয়েছে এমন কথা বলা কঠিন। কারণ, কৃষ্ণের ঐশ্বর্যময় মহিমা প্রায়ই যশোদা ও নন্দকে বিভ্রান্ত করেছে; কিন্তু পদাবলীতে যশোদার স্নেহ, "কিছু না মিশায় যেন জাম্বুনদ হেম।" এই প্রসঙ্গে ডঃ গীতা চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্যটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে: "ভাগবতে যে মাতৃহৃদয় অর্ধোন্মোচিত, বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে তাই পূর্ণ প্রস্ফুটিত।"[২৭]

বাংলা পদাবলী সাহিত্যে ভাগবতের প্রভাব অপেক্ষাকৃত কম। অথচ হিন্দী কৃষ্ণকাব্য অপেক্ষা বাংলা কাব্যে অধিকতর প্রভাব থাকা ছিল স্বাভাবিক। কারণ, অন্যান্য বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ব্রহ্মসূত্রের নিজস্ব ব্যাখ্যা করেছেন। বল্লভাচার্য শ্রীব্রহ্মসূত্রাণুভাষ্য রচনা করে নিজস্ব ব্যাখ্যা প্রচার করেছেন। কিন্তু গৌড়ীয় পদাবলী সাহিত্যের প্রাণপুরুষ চৈতন্যদেব নিজে কোনো গ্রন্থ রচনা করেন নি। গৌড়ীয় সম্প্রদায় প্রয়োজন বোধ করেন নি ব্রহ্মসূত্রের নতুন কোনো ভাষ্যের। তাঁরা ভাগবতকেই বেদান্তসূত্রের প্রামাণ্য ভাষ্য হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এমন নির্ভরতা সত্ত্বেও গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদাবলী হিন্দী কৃষ্ণকাব্যের মতো ভাগবত দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হয়নি।

সুরদাস, পরমানন্দদাস প্রভৃতি কবিরা ভাগবতে বর্ণিত কৃষ্ণ-কথা ধারাবাহিক ভাবে বিবৃত করেছেন। কিন্তু বাঙ্গালি বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে একমাত্র দীন চণ্ডীদাস কৃষ্ণকাহিনীর ধারাবাহিকতা রক্ষায় সচেষ্ট ছিলেন। অন্য বাঙ্গালি পদকর্তারা ভাগবতের কয়েকটি প্রসঙ্গ নিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে পদ রচনা করেছেন। ভাগবত কাহিনী সামগ্রিকরূপে পদাবলীতে স্থান দেবার উদ্দেশ্য তাঁদের ছিল না।

সুরদাস এবং অন্যান্য হিন্দী বৈষ্ণব কবিরা অনেক ক্ষেত্রে ভাগবতের আক্ষরিক অনুবাদ করেছেন। আক্ষরিক অনুবাদ যেখানে নেই, সেখানেও কবিরা ভাগবতের বর্ণনার প্রতি মোটামুটি বিশ্বস্ততার স্বাক্ষর রেখেছেন।

ভাগবত ও বাংলা পদাবলী

ভাগবতের বিস্তৃত বিবরণ ভাষান্তর করায় উৎসাহ ছিল না গৌড়ীয় পদকর্তাদের। বিশ্বস্ততার কথা দূরে থাক, কৃষ্ণ-কাহিনীর কোনো একটি প্রসঙ্গের সার্বিক উপস্থাপনেও তাঁদের যত্নবান দেখা যায় না। বিশ্বরূপ দর্শনের যে বর্ণনা ভাগবতে আছে, তার সঙ্গে উপরে উদ্ধৃত বাংলা বিবরণটি অনুধাবন করলেই এর সত্যতা উপলব্ধি করা যাবে।

হিন্দী পদকর্তাদের ভাগবতের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার পরিচয় সুস্পষ্ট। কিন্তু তেমন স্পষ্ট নয় বাংলা পদাবলী সাহিত্যে। বিশেষ করে পদ রচনার ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য।

কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে বাৎসল্যরসের যে বিস্তার ঘটেছে, বাংলা ও হিন্দী পদাবলী সাহিত্যে তার একটু তাত্ত্বিক ভূমিকা প্রয়োজন। হিন্দীভাষী বৈষ্ণব কবিদের একমাত্র

উপাস্য দেবতা কৃষ্ণ। কৃষ্ণ ও পদকর্তার মধ্যে কোনো দেবোপম মহামানবের আবির্ভাব ঘটেনি,— যে আবির্ভাব ভক্তের মন মূল লক্ষ্য থেকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারে। তাই তাঁরা ভাগবত-বর্ণিত কৃষ্ণের প্রতি বিশ্বস্ততা রক্ষা করে তাঁর লীলাকীর্তন করেছেন। পদকর্তা ও কৃষ্ণের মধ্যে ছিলেন দীক্ষাগুরু। অধিকাংশ বিশিষ্ট হিন্দী বৈষ্ণব কবি ছিলেন বল্লভ সম্প্রদায়ভুক্ত। তাঁরা দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন বল্লভাচার্যের কাছ থেকে। কেউ কেউ বা পুত্র বিঠ্‌ঠলনাথকে গুরুপদে বরণ করেছেন।

বল্লভাচার্য পাণ্ডিত্যে এবং ধর্মসাধনায় আদর্শ পুরুষ। সকল বৈষ্ণবের শ্রদ্ধার পাত্র। প্রসিদ্ধি এই যে, বল্লভাচার্য ৮৪ খানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। বর্তমানে মাত্র শ্রীব্রহ্মসূত্রাণুভাষ্য, জৈমিনীসূত্রভাষ্য ও ভাগবতের সুবোধিনী টীকা— এই তিনখানি অসম্পূর্ণ গ্রন্থ পাওয়া যায়। একটি বিশেষ দার্শনিক মতবাদের প্রবক্তা হিসাবে বল্লভাচার্য সম্মানিত।

চৈতন্যদেব বহুভাষাবিদ পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু কোনো গ্রন্থ রচনা করেন নি। শুধু কয়েকটি শ্লোক তার নামে চিহ্নিত। পাণ্ডিত্য ও তত্ত্বগত দার্শনিকতা তাঁর ব্যক্তিত্বের উপর সামান্যই প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে। তার জীবনই তাঁর বাণী। সে জীবন করুণাঘন ও প্রেমময়। তাকে দেখে, তার কথা শুনে, তার জীবনকথা জেনে লোকে মুগ্ধ হতো। চৈতন্যের প্রভাব সীমিত সংখ্যক সহচরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। এবং শুধু ধর্ম নয়, সামাজিক ক্ষেত্রেও তার প্রভাব পড়েছিল। কেবল বাংলা দেশে নয়, ভারতের বিস্তৃত অঞ্চলে চৈতন্যের ব্যক্তিত্বের মহিমা প্রচার লাভ করেছিল।

এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয় অবশ্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব কবিদের উপর চৈতন্যদেবের প্রভাব এবং পদাবলীতে তার প্রতিফলন। এটা আগেই বলা দরকার, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় দুটি শাখায় বিভক্ত। একটি নবদ্বীপ কেন্দ্রিক, আর একটির কেন্দ্র বৃন্দাবন। বৃন্দাবনের বাঙালী বৈষ্ণবরা ছিলেন পণ্ডিত, তাদের কাজ ছিল বৈষ্ণব ধর্মের তাত্ত্বিক ভূমিকা বিধিবদ্ধ করা। ষড়গোস্বামীদের অনেকেই পদাবলী রচনা করেছেন, কিন্তু তা প্রায় সবই সংস্কৃতে। তাঁরা চৈতন্যদেবের লীলা প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ পেয়েছেন কম। তাই তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও বৃন্দাবনের বৈষ্ণবাচার্যগণ চৈতন্যদেবকে অতিমানব হিসাবে গণ্য করেন নি। সুতরাং এঁদের উপাস্য দেবতা ছিলেন কৃষ্ণ ; তাঁদের উপর চৈতন্যের প্রভাব কখনো এমন প্রবল হতে পারেনি যার ফলে কৃষ্ণের মূর্তি আচ্ছন্ন হতে পারে।

কিন্তু যেসব বাঙালী পদকর্তা চৈতন্যের দিব্যোন্মাদ প্রত্যক্ষ করেছেন, অথবা সমকালের কিংবা অব্যবহিত পরবর্তীকালের যেসব ভক্ত-কবি চৈতন্য-প্রভাবান্বিত পারমণ্ডলে বাস করেছেন, তাঁদের নিকট মহাপ্রভু ছিলেন অবতার স্বরূপ। নবদ্বীপ কেন্দ্রিক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নিকট তিনিই ভক্তের পরম আরাধ্য, তাঁর মধ্যে একাধারে মিলন ঘটেছে রাধা ও কৃষ্ণের। নরহরিদাসের 'গৌরনাগর' তত্ত্ব অনুসারে চৈতন্য 'নাগর' এবং ভক্তেরা নাগরীরূপে তাঁর ভজনা করেন,— রাগানুগা ভক্তির শ্রেষ্ঠ পরিণতি। মুরারিগুপ্ত চৈতন্যকে বলেছেন 'যুগাবতার'। কবি কর্ণপুর চৈতন্যকে দ্বি-ভুজ কৃষ্ণ বলে বিশ্বাস

করতেন।[২৮] প্রায় সকল চৈতন্য-জীবনীকারই বলেছেন, শ্রীকৃষ্ণই শচীনন্দন রূপে জন্ম-গ্রহণ করেছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজকেই উদ্ধৃত করা যাক—

ভাগবত ভারত শাস্ত্র আগম পুরাণ।
চৈতন্যকৃষ্ণ অবতার প্রকট প্রমাণ ॥[২৯]

বৃন্দাবনের গোস্বামীরা চৈতন্যের অবতারত্ব সম্বন্ধে নীরব। তাঁরা ভাগবতের নির্দেশ মান্য করতেন— 'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং'।

সুতরাং বাঙালী পদকর্তাদের কাছে চৈতন্যের অবতাররূপ ছিল নিকটতর; কৃষ্ণ কিছুটা দূরের এবং কিছুটা বা চৈতন্যের দ্বারা আচ্ছন্ন। তাই, বাংলা পদাবলীতে ভাগবতের কৃষ্ণ তেমন উজ্জ্বল হয়ে ওঠেন নি। বরং চৈতন্যের প্রতি শচীর বাৎসল্যের চিত্র উজ্জ্বলতর রূপে প্রতিভাত। হিন্দীর বাৎসল্য রসাশ্রিত পদাবলী মূলত কৃষ্ণ-কেন্দ্রিক। কোথাও কোথাও রাধার প্রতি ছিটেফোঁটা স্নেহ বর্ষিত হয়েছে। কোনো অবতারের মূর্তি কৃষ্ণের স্বরূপ মূর্তিকে ভক্তের হৃদয় থেকে আড়াল করতে পারেনি।

অবশ্য বল্লভাচার্যকেও কেউ কেউ অবতার হিসাবে দেখেছেন। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত এই প্রসঙ্গে বলেছেন: "এই 'পুষ্টি' সম্প্রদায়ের ভক্তগণের বিশ্বাস ছিল বল্লভাচার্য এবং তৎপুত্র বিঠ্‌ঠলনাথ শ্রীকৃষ্ণের অবতার ছিলেন এবং অষ্টছাপের আটজন কবি ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের অষ্ট সখাসখির অবতার।"[৩০] কিন্তু এই অবতার-ভাবনা শুধু বল্লভাচার্যের দীক্ষিত শিষ্যদের মধ্যে গণ্ডিবদ্ধ ছিল। প্রত্যেক শিষ্যের নিকটই তাঁর দীক্ষাগুরু ঈশ্বরের প্রতিনিধি। এই চিরাগত বিশ্বাসের জন্যেই সুরদাস, কুম্ভনদাস, প্রভৃতি অষ্টছাপের কবিরা গুরুকে অবতার হিসাবে দেখেছেন। যেমন, কুম্ভনদাস বলেছেন:

আজু বাধাঈ শ্রীবল্লভ-দ্বার।
প্রগট ভএ পুরণ পুরুষোত্তম প্রগট করন লীলা-অবতার ॥[৩১]

—আজ বল্লভ-দ্বারে বন্দনা করি। নিজের অবতারলীলা দেখাবার জন্যে পুরু-ষোত্তমের নতুন করে আবির্ভাব ঘটেছে।

এই সংকীর্ণ কবিগোষ্ঠীর বাইরে বল্লভাচার্যের অবতারত্বের সামগ্রিক স্বীকৃতি পাওয়া যায় না। এমনকি অষ্টছাপের কবিরাও তাঁকে অবলম্বন করে সার্থক পদ রচনা করেছেন, তারও বড় একটা দৃষ্টান্ত নেই। অপরদিকে, চৈতন্যদেবের সমকালীন এবং পরবর্তী কালের বহু কবি চৈতন্যের জীবন ও সাধনাকে বিষয় করে অনেক উৎকৃষ্ট পদ রচনা করেছেন। একজন হিন্দী সমালোচকের মন্তব্য থেকে আমাদের উপরোক্ত মত সমর্থিত হবে: "হিন্দী বৈষ্ণব সাহিত্য মে বল্লভাচার্য পর ভী কুছ পদ মিলতে হৈ। উনমে উন্‌হে পরব্রহ্ম কৃষ্ণ অবতার সব বাতায়া হৈ। উক্তিয়ো কী সমানতা হোতে হুএ ভী উনমে সে উনকে ঈশ্বরত্ব কী ভাবনা দৃঢ় বিশ্বাস কে রূপ মে পরিলক্ষিত নহী হোতী।"[৩২] অর্থাৎ, হিন্দী বৈষ্ণব সাহিত্যেও কিছু পদ পাওয়া যায় যাতে বল্লভা-চার্যকে পরব্রহ্ম কৃষ্ণের অবতার বলা হয়েছে। উক্তির মধ্যে মিল থাকা সত্ত্বেও অর্থাৎ হিন্দী ও বাংলা-বৈষ্ণব কবিতায় গুরু-বন্দনার পদে মিল থাকা সত্ত্বেও বল্লভচার্যকে ঈশ্বরের

সঙ্গে একাত্ম করার ভাবনাটি দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হয়নি।

এই কারণেই হিন্দী পদকর্তারা ভাগবত-বর্ণিত কৃষ্ণ-কাহিনী যথাযথরূপে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে নিজেদের রচনায় স্থান দিয়েছেন। সুতরাং বাংলা কাব্যে ভাগবতের প্রতি যে বিশ্বস্ততার অভাব, হিন্দী পদাবলীতে তা নেই।

শচীমাতার বাৎসল্য বাংলার পদকর্তাদের অন্যতম অবলম্বন। গৌরাঙ্গকে অবলম্বন করে রচিত বাৎসল্যের পদগুলি মানবিক গুণে উজ্জ্বলতর মনে হয়। / ভাগবতের প্রসঙ্গগুলির বাংলা রূপান্তরে কোথাও কোথাও কৃষ্ণের পরিবর্তে গৌরাঙ্গকেই নায়ক করা হয়েছে। যেমন, ভাগবতে কৃষ্ণের চাঁদের জন্যে বায়না বাসুদেব ঘোষের পদে হয়েছে গৌরাঙ্গের বায়না।[৩৩] এমনি বহু ক্ষেত্রেই কৃষ্ণ ও চৈতন্য প্রায় অভিন্ন। এই অভিন্নতা-বোধের প্রমাণ তাঁর বহুল প্রচলিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে।

হিন্দী কবিরা ঐশ্চর্যলোকের কৃষ্ণকে একেবারে ঘরের ছেলে করেছেন ; আর বাঙালী কবিরা এক অসাধারণ মানবপুত্রকে দেবত্বের পথে এগিয়ে নিয়েছেন। অবশ্য, বাৎসল্যের পদাবলীতে দেবত্বের পরিবেশ সৃষ্টিতে কবিরা তেমন উৎসুক ছিলেন না। কিন্তু গৌরাঙ্গের জীবন ও সাধনা অবলম্বন করে অন্যান্য প্রসঙ্গের পদাবলীও রচিত হয়েছে। বাংলা পদাবলীতে গৌরাঙ্গের প্রভাবের সবচেয়ে বড় প্রমাণ গৌরচন্দ্রিকা, যা কীর্তনের পূর্বে অবশ্যই গীত হয়। বাংলায় গৌরাঙ্গকেন্দ্রিক বাৎসল্য ও অন্যান্য বিষয়ক পদাবলীর মতো রচনা হিন্দীতে নেই।

বাংলা ও হিন্দী পদাবলীর মধ্যে আর একটি বড় পার্থক্য এই যে, বাংলায় মধুর রসের প্রাধান্য এবং হিন্দীতে প্রাধান্য বাৎসল্যের। চৈতন্যদেব ছিলেন মধুর-রসের সাধক। রাধাভাবে ভাবিত হয়ে তিনি কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হতেন। অতএব তাঁর অনুগামী কবিরা স্বভাবতই মধুরভাবের সাধনাকেই ঈশ্বরানুভূতির চরম ও শ্রেষ্ঠ স্তর হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। তাঁরা অন্য চারটি রসের পদাবলীও রচনা করেছেন, কিন্তু লক্ষ্য ছিল মধুর রস। মধুর রসে পৌঁছতে হলে শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য রস আস্বাদন করে যেতে হবে— এই হ'ল সাধনার রীতি। সুতরাং বাঙালী পদকর্তাদের নিকট বাৎসল্য, যাত্রাপথে বিরামভূমি বলা যায়।

হিন্দী কবিদের বাৎসল্য রসাশ্রিত পদাবলীর প্রাচুর্য, বৈচিত্র্য ও উৎকর্ষ বিচার করলে প্রতীয়মান হবে, বাৎসল্যকে তাঁরা শুধু বিরামভূমি হিসাবে গণ্য করেন নি। হিন্দী ভক্ত-কবিদের সাধনায় বাৎসল্য ভাবনার বিশেষ স্থান ছিল। কেননা, অষ্টছাপের কবিদের গুরু বল্লভাচার্য ছিলেন বালগোপালের উপাসক। কবিদের তিনি বাৎসল্যের পদ রচনায় উৎসাহ দিতেন। সুরদাস যখন দীক্ষা নিতে এসে জানান এ পর্যন্ত তিনি শুধু বিনয়-পদ রচনা করেছেন, তখন বল্লভাচার্য তাঁকে বাৎসল্যের পদ লিখতে উপদেশ দেন। এ ধরনের উপদেশ চৈতন্য কাউকে দেননি। জীবনের শেষ ভাগে চৈতন্যপন্থী গদাধর পণ্ডিতের সাহচর্যে বল্লভাচার্য মধুররসে শ্রীকৃষ্ণ আরাধনার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।[৩৪] কিন্তু বালগোপালের মূর্তি পূজা বন্ধ হয়নি।

আমাদের বক্তব্য এই নয় যে, হিন্দী কবিরা অন্য রসের পদ রচনায় মনোযোগী

ছিলেন না। তাঁরা সব রসেরই, বিশেষ করে মধুর রসেরও উৎকৃষ্ট পদাবলী রচনা করেছেন। সুরদাস বাৎসল্য ও মধুর— এই উভয় রসের পদ রচনাতেই সমান পারদর্শিতার স্বাক্ষর রেখেছেন। তবে বাৎসল্যের পদ রচনায় হিন্দী ভক্ত-কবিদের যে শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা ও ঔৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়, বাঙালী পদকর্তাদের মধ্যে স্পষ্টই তার অভাব লক্ষণীয়। বিশেষ করে সুরদাসের বাৎসল্যরসের পদাবলী গুণে ও প্রাচুর্যে অতুলনীয়। এই প্রসঙ্গে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন: "বাঙলায় বাৎসল্য রসের ভাল ভাল পদ কিছু কিছু থাকিলেও হিন্দী বাৎসল্য রসের পদের তুলনায় তাহা অনেক কম। বাৎসল্য রসের পদেই হিন্দী শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবি সুরদাসের বৈশিষ্ট্য।"[৩৫]

হিন্দী ও বাংলা মধুর রসের পদাবলীর সাদৃশ্য ও পার্থক্য নিয়ে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে হিন্দী মধুররসের একটি বৈশিষ্ট্য বাৎসল্য রসের পদেও লক্ষণীয়। বাংলা পদাবলীতে রাধা প্রধান নায়িকা, গোপিনীরা তাঁর সহচরী। রাধা-কৃষ্ণের মিলনেব পথ প্রশস্ত করে দেওয়াতেই তাঁদের মূল ভূমিকা। কিন্তু হিন্দী পদাবলী সাহিত্যে রাধার এই প্রাধান্য নেই। তিনি অন্য গোপিনীদের মতোই কৃষ্ণের একজন প্রেমাকাঙ্ক্ষিনী। অন্য গোপিনীরাও কৃষ্ণের প্রণয়িনী। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেন: "হিন্দীতে আবার কান্তা প্রেমের পদ রাধাকে লইয়া বেশী নয়, বেশীই হইল গোপীগণকে লইয়া। সুরদাসের এই জাতীয় পদগুলির ভিতরে প্রসিদ্ধতম পদ হইল 'উদ্ধব-সংবাদের' পদ।...হিন্দী বৈষ্ণব কবিতায় গোপীগণেরও যথেষ্ট স্থান রহিয়াছে।"[৩৬]

অনুরূপভাবে কৃষ্ণ শুধু নন্দ ও যশোদার পুত্র নন, তিনি সকল গোপিনীরও স্নেহের পাত্র। জন্মের পর থেকে মথুরা যাত্রা পর্যন্ত গোপিনীরা শুধু কৃষ্ণকে কেন্দ্র করেই পদাবলীতে স্থান পেয়েছেন। কৃষ্ণের প্রতি তাঁদের স্নেহ, যত্ন ও আগ্রহ কখনো শিথিল হয়নি। বাংলা পদাবলীতে কৃষ্ণের প্রতি গোপিনীদের এই সর্বজনীন বাৎসল্য কখনো সোচ্চার হয়ে উঠতে দেখা যায় না। সেখানে যশোদাই বলতে গেলে একমাত্র নায়িকা। কিন্তু হিন্দী পদাবলীতে কৃষ্ণ সমগ্র ব্রজভূমির বাৎসল্যে লালিত।

বাৎসল্যের নানা প্রসঙ্গ ॥ হিন্দী বাৎসল্যরসের পদাবলীতে কৃষ্ণ-কাহিনী শুরু হয়েছে তাঁর কারাগারে জন্ম থেকে। দেবকী, বসুদেব, এমনকি কংসেরও স্নেহের প্রকাশ দেখানো হয়েছে। কংস নৃশংস, তবু তাঁর হৃদয় যে একেবারে স্নেহশূন্য নয়, তার প্রমাণ রেখেছেন সুরদাস। তাই, দেবকীর প্রথম পুত্রকে দেখে কংস হাসলেন এবং মায়ের কোলে তাকে ফিরিয়ে দিলেন।[৩৭] পরে অবশ্য নিজের নিরাপত্তার কথা ভেবে এই শিশুকে তিনি হত্যা করেছিলেন। বসুদেব ও দেবকীর বাৎসল্যও কৃষ্ণকাব্যের হিন্দী কবিরা বিবৃত করেছেন। অষ্টম গর্ভের পুত্র কৃষ্ণের প্রাণ রক্ষার জন্যে তাঁকে যখন বৃন্দাবন নিয়ে যাচ্ছেন বসুদেব, তখন একদিকে পুত্রের মঙ্গলের জন্যে স্বস্তি, অন্যদিকে পুত্রকে লালন করবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবার বেদনায় দেবকীর হৃদয় দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পীড়িত। সুরদাস দেবকীর এই বিক্ষুব্ধ অন্তরের কথা বলেছেন।[৩৮]

বাংলা কৃষ্ণ-কাহিনীর শুরু সাধারণত নন্দের গৃহে। যশোদা ঘুম থেকে জেগে

দেখলেন কৃষ্ণ তাঁর শয্যায় শুয়ে আছেন—

নিদ্রা অচেতন রাণী কিছুই না জানে।
চেতন পাইয়া পুত্র দেখিল নয়নে ॥[৩৯]

বাঙালী কবিদের মধ্যে বোধ হয়, দীন চণ্ডীদাসই ভাগবত অনুসরণে নন্দগৃহে আগমনের পূর্ববর্তী কাহিনী বর্ণনা করেছেন। কোথাও কোথাও কবির বর্ণনায় মৌলিকত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ভয়ংকর দুর্যোগের রাত্রিতে যমুনা নদী পার হবার সময় হঠাৎ বসুদেবের হাত থেকে কৃষ্ণ জলে পড়ে গেলেন—

হাত হইতে পিছলিআ কুথারে পড়িল গিআ
কোনখানে দেখিতে না পাই।
আকুল হইয়া চিত্তে —গেলা শিশু কোন ভিতে
মাঝপথে তুমারে হারাই ॥"

দেবকীকে তিনি কি কৈফিয়ৎ দেবেন?

কি বলিব ঘরে গিআ হেন পুত্র হারাইআ
দেবকীরে কি বোল বলিব।

জল থেকে পুত্রকে যখন উদ্ধার করলেন, তখন বসুদেবের পিতৃস্নেহের কিছু পরিচয় পাওয়া গেল:

ঘুচিল অশেষ তাপ কুথারে গেছিলে বাপ
অভাগারে বধিয়া পরাণে।[৪০]

মাতৃস্নেহের প্রাবল্য পিতার স্নেহকে প্রায় আচ্ছন্ন করে রেখেছে। হিন্দী বাৎসল্য পদাবলীতেও যশোদার প্রাধান্য। কিন্তু নন্দের অপত্যস্নেহ অবহেলিত নয়। বসুদেবের পিতৃ-হৃদয়ের কোমল অনুভূতির প্রতি উভয় ভাষার কবিরাই প্রায় সমান উদাসীন। দীন চণ্ডীদাস এইদিক থেকে বিশিষ্টতার দাবি করতে পারেন।

যশোদা অধিক বয়সে পুত্রসন্তান লাভ করেছেন। তাই, নিজের আনন্দ একটু বেশি বলা যায়। ধাত্রী যখন তাঁর কাছে নাড়ী কাটার জন্যে পুরস্কার প্রার্থনা করল তখন যশোদা, "মন মেঁ বিহঁসি তবৈ নন্দরাণী, হার হিয়ে কো দীনৌ।"[৪১] অর্থাৎ, নন্দরাণী খুশি হয়ে গলার হার তাকে দিয়ে দিলেন।

ঠিক এভাবে পুরস্কৃত করবার ঘটনা না থাকলেও যশোদা যে সবাইকে তাঁর আনন্দের অংশীদার করবার জন্যে ব্যগ্র, বাংলা পদাবলীতেও তার চিত্র পাওয়া যায়। প্রথমেই আহ্বান করছেন স্বামীকে—

কোথা গেল নন্দরাজ পড়িল মানস কাজ
দেখসিয়া পুত্রের বদন।
নীল বরণ শশী উদয় করিল আসি
দেখি কর সফল জীবন।[৪২]

পুত্রলাভ করায় যশোদা-নন্দের আনন্দ তো খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রতিবেশী গোপ-গোপিনীরাও উল্লসিত। এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী গোপিনীদের সংগে এসে কৃষ্ণকে

দেখে স্নেহমুগ্ধ কণ্ঠে বলছেন :

কহে জসদায়— তোমার বালক
দেখিয়া হইলুঁ সুখী।
কোথা আরাধিলে কি দেব পূজিলে
ধন্য করি তোরে লিখি ॥
এমত ছায়ালে হেদে গো জসদা
নিছনি লইআ মরি।[৪৩]

হিন্দী কৃষ্ণকাব্যে নবজাতকের প্রতি ব্রজবাসীদের সস্নেহ আগ্রহ আরো গভীর ও ব্যাপক। গোবর্ধনের এক নাগরিক সংবাদ পেয়েই কৃষ্ণকে দেখতে এসেছে, পেয়েছে প্রচুর পারিতোষিক। কিন্তু এতে সে সন্তুষ্ট নয়, কৃষ্ণকে দেখে তার আশ মেটেনি। কৃষ্ণকে নব নব রূপে দেখে সে নিজেকে ধন্য করতে চায়। তাই তার একান্ত আবেদন—

নন্দরাই, সুনি বিনতী মেরী, তবহিঁ বিদা ভল হ্বৈ হৌঁ।
দীজৈ মোহিঁ কৃপা করি সোঈ, জো হৌঁ আয়ৌ মাঁগন।
জসুমতি-সুত অপনৈঁ পাইনি চলি, খেলত আবৈ আঁগন।
জব হঁসি কৈ মোহন কছু বোলৈঁ, তিহি সুনি কৈ ঘর জাউঁ।[৪৪]

অর্থাৎ, হে নন্দরাজ, দয়া করে আমাকে এখানে কিছুদিন থাকার অনুমতি দাও। মোহন নিজের পায়ে চলছে, আঙ্গিনায় খেলা করছে এবং হেসে কথা বলছে,— এই মধুর দৃশ্য দেখেই আমি চলে যাবো।

বাংলা পদাবলীর প্রতিবেশিনীরাও কৃষ্ণকে দেখে মুগ্ধ হয়—

দেখিঞা বালকে এক দিঠে থাকে
নঅন পালট নহে।[৪৫]

এখানে কৃষ্ণ দৃষ্টি-নন্দন। তাকে দেখে সুখ হয়। কিন্তু হিন্দী পদাবলীতে ভক্ত হৃদয়ের যে গভীর অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়, এখানে তার অভাব। সুরদাস লিখেছেন, একজন কৃষ্ণের জন্ম-সংবাদ পেয়ে "অতি আতুর উঠ ধায়ো"। 'আতুর' শব্দটির মধ্যে দর্শনার্থীর অন্তরের ব্যাকুলতা মূর্ত হয়ে উঠেছে। এমন ঐকান্তিক ব্যাকুলতা বাংলা পদাবলীতে কদাচিৎ দেখা যায়।

বিভিন্ন অনুষ্ঠানের পটভূমিকায় কৃষ্ণ-বাৎসল্য পরিস্ফুট করায় হিন্দী পদকর্তারা অধিকতর আগ্রহী। এই অনুষ্ঠানগুলি দুই শ্রেণীর : প্রথমত, কৃষ্ণের ব্যক্তিজীবন সম্পর্কিত অনুষ্ঠান, দ্বিতীয়ত, সামাজিক অনুষ্ঠান। ষষ্ঠী, অন্নপ্রাশন, জন্মোৎসব কৃষ্ণকে কেন্দ্র করেই অনুষ্ঠিত হয়। কৃষ্ণের জন্মের ছয় দিন পরে ষষ্ঠী পূজার অনুষ্ঠান। পরমানন্দদাস বলছেন—

মঙ্গল দ্যোস ছঠী কৌ আয়ো।
আনন্দে ব্রজরাজ জসোদা মানহুঁ অধন ধন পায়ো ॥[৪৬]

অর্থাৎ, মাঙ্গলিক ঘোষণার মধ্যে ষষ্ঠী পূজার দিন বোঝা যাচ্ছে। আনন্দে ব্রজরাজ ও যশোদার মনে হচ্ছে যেন নির্ধন আজ ধন লাভ করেছে।

তারপর "আজু কাহ্ন করি হৈ অন্নপ্রাসন"। আজ কানাইয়ের অন্নপ্রাশন হবে, তাই যশোদা ব্যস্ত ; পুত্রকে উবটন ইত্যাদি দিয়ে স্নান করাচ্ছেন, পট্টবস্ত্র পরাচ্ছেন, নানাভাবে ছেলেকে সাজাচ্ছেন, বারবার পুত্রের মুখ চুম্বন করে তাঁর সব অমঙ্গল দূর করে দিচ্ছেন। আর কোলে বসিয়ে পুত্রের মুখে প্রথম গ্রাস তুলে দিচ্ছেন নন্দ :

বার বার মুখ নিরখি জসোদা, পুনি-পুনি লেত বলাই।
ঘরী জানি সুত-মুখ-জুঠরান্ন নন্দ বেঠে লে গোদ।[৪৭]

তারপর এলো কৃষ্ণের এক বৎসর পূর্তির উৎসব। "অরী, মেরে লালন কী আজু বরস-গাঁঠি, সবৈ সখিনি কোঁ বুলাই মঙ্গল-গান করাবৌ॥"[৪৮] অর্থাৎ, আজ আমার বাছার বর্ষপূর্তির উৎসব। সব সখীদের ডেকে মঙ্গল গান করাবো।

যখন মঙ্গল-গীত শুরু হ'ল তখন যশোদা সানন্দে সখীদেব সঙ্গে যোগ দিলেন, —"জসোদা আপুন মঙ্গল গাবৈ"।[৪৯]

এছাড়া রাখী, দশহরা, দীপান্বিতা ইত্যাদি বিভিন্ন পূজাপার্বণের দিনে যশোদা তাঁর শত কাজের মধ্যেও সর্বপ্রথম পুত্রের কল্যাণ কামনা করেন। এমনি একটি ছবি পাই পরমানন্দদাসের রচনায়—

রচ্ছা বাঁধতি জসুদা মৈয়া
... ..
রতন-কনক রাখী বন্ধন করি ফুনি ফুনি লেতি বলৈয়া॥[৫০]

—যশোদা কৃষ্ণের হাতে রত্নখচিত সোনার রাখী বেঁধে দিচ্ছেন। আর, পুত্রের শুভ কামনায় তাঁর সমস্ত আপদ-বালাই নিজে নিচ্ছেন।

হিন্দী বাৎসল্যের পদে দোলনার প্রাধান্য, বাংলা পদাবলীতে দোলনা উপেক্ষিত। হিন্দী ভাষার বৈষ্ণব কবিরা প্রায় সকলেই যশোদা কৃষ্ণকে দোলনায় দোলাচ্ছেন,— এর বর্ণাঢ্য চিত্র এঁকেছেন। পুত্রের জন্যে অনেক যত্নে দোলনা তৈরি করতে হবে। মা তাই কাঠের মিস্ত্রিকে বলছেন :

পালনৌ অতি সুন্দর গঢ়ি ল্যাউ রে বঢ়েয়া।
সীতল চন্দন কটাউ, ধরি খরাদ রঙ্গ লাউ॥[৫১]

দোলনা তৈরি হয়ে এলো। কৃষ্ণকে দোলনায় রেখে আস্তে আস্তে দোলা দিচ্ছেন, আর গুন-গুন করে ঘুম পাড়ানী গান করে চলেছেন যশোদা। এই ছবিটি সুরদাস প্রভৃতি অনেক কবিরই প্রিয়। পরমানন্দদাসের একটি পদ এই ·

ঝুলৌ পালনে হো লালন লেহুঁ বলৈয়াঁ তেরী।
গাউঁ গীত কহি জসুমতি রাণী চুটকী দে-দে রীঝেরী॥[৫২]

অর্থাৎ যশোদা বলছেন, আমার বাছা, দোলনায় দোল ; আমি তোমার বালাই নিই। তারপর তিনি আঙ্গুলে তুড়ি দিয়ে দিয়ে সুর করে গান গাইতে লাগলেন।

হিন্দী বাৎসল্যরসের পদাবলীতে শিশু-কৃষ্ণের সঙ্গে দোলনার প্রসঙ্গ প্রায় অভিন্ন। অথচ বাংলা পদাবলীতে দোলনা প্রায় অনুপস্থিত। শুধু দীন চণ্ডীদাস একবার উল্লেখ করেছেন :

দোলার উপরে সুতাইঞা রাণী
করেন গৃহের কাজ ॥[৫৩]

দোলনা এখানে মাতৃস্নেহের সমুদ্রে দোলা দেয় না। গৃহকাজের সুবিধার জন্যে পুত্রকে নিরাপদে রাখার আশ্রয় মাত্র।

বাঙালী কবিদের আছে মায়ের কোল, যা মাতা-পুত্রের দেহস্পর্শের মধ্য দিয়ে নিবিড়তর একাত্মবোধ গড়ে তোলে। রায়শেখর বলেছেন—

জশোমতি ডোরে কোরে করি লালন
অম্বরে মুছায় মুখ ইন্দু।
হেরি যদুনন্দন মন্দহি হসিত
উথলে প্রেম সুখ সিন্ধু ॥
জশোমতি বোলত ভাষ।
এ বিধু বদনে মা বলি বোলইতে
শুনইতে শ্রবণ উল্লাস ॥[৫৪]

ছেলেকে কোলে করে তার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে নানা স্বপ্ন দেখতে কত সুখ! ছেলের চাঁদপানা মুখে কবে আধো-আধো স্বরে 'মা' বলে ডাক শুনবেন যশোদা!

মাতৃস্নেহ ভৌগোলিক গণ্ডিতে আবদ্ধ নয়। সুরদাসের যশোদাও অনুরূপ ভাবে পুত্রের মুখে 'মা' ডাক শোনবার জন্য উৎসুক হয়ে আছেন…"কব তোতরেঁ মুখ বচন ঝরৈ। কব নন্দহিঁ বাবা কহি বোলে, কব জননী কহি মোহি হ রৈ।"[৫৫] অর্থাৎ, কবে ওর মুখে আধো-আধো কথা ফুটবে, কবে আমার বাছা নন্দকে বাবা এবং আমাকে মা বলে ডাকবে।

শিশুর জীবনে ক্রমবিকাশের দৈনন্দিন রূপ মাতৃহৃদয়কে যে গভীররূপে মুগ্ধ করে, তা হিন্দী কবিদের দৃষ্টি এড়ায় নি। শিশু-কৃষ্ণ শুয়ে শুয়ে খেলা করতে করতে নিজের পায়ের বুড়ো আঙুলটি মুখে দিয়েছেন, সেই দৃশ্য দেখে যশোদা যেন এক নতুন আবিষ্কারের আনন্দে গান গেয়ে উঠলেন :

চরন গহে অ গুঠা মুখ মেলত।
নন্দ-ঘরনি গাৱতি, হলরাৱতি, পলনা পর হরি খেলত ॥[৫৬]

আর একদিনের কথা। সেদিন প্রথম কৃষ্ণ নিজে নিজে দোলনার উপর পাশ ফিরে শুয়েছেন। কবি বলছেন :

করবট প্রথম লঈ নন্দ-নন্দন।
তাকো মহরি মহোচ্ছৱ মানত ভৱন লিপায়ো চন্দন ॥[৫৭]

অর্থাৎ, প্রথম যেদিন নন্দ-নন্দন নিজে নিজে পাশ ফিরলেন, সে দিনটি যশোদা মহোৎসব রূপে পালন করলেন, সমস্ত গৃহ চন্দনলিপ্ত করলেন।

আর যেদিন কৃষ্ণ নিজেই সম্পূর্ণ উপুড় হতে সক্ষম হলেন, সেদিন যশোদা পুত্রের কৃতিত্বে মুগ্ধ :

মহরি মুদিত উলটাই কৈ মুখ চুমন লাগী।

চিরজীবৌ মেরৌ লাড়িলৌ, মৈঁ ভঈ সভাগী ॥[৫৮]

অর্থাৎ, আনন্দিত যশোদা কৃষ্ণকে চিৎ করে শুইয়ে মুখ চুম্বন করে বললেন, আমার বাছা, চিরজীবী হও ; আমি আজ ভাগ্যবতী।

পুত্রের প্রতি গভীর ভালোবাসা, এমন গভীর আকর্ষণ, কৃষ্ণের কোন ক্ষতি করবে না তো ? মা নিজেকেই বিশ্বাস করতে পারছেন না। তাই, যশোদা বলছেন :

লালন, বারী য়া মুখ উপর।

মাঈ মেরিহি দীঠি ন লাগে, তাতৈঁ মসি বিন্দা দিয়ৌ ভ্রূপর ॥[৫৯]

—বাছা, তোমার মুখের দিকে চেয়ে আমার আনন্দের সীমা নেই। সখি, আমার চোখের নজর যাতে বাছার অমংগল না করে, সেইজন্যে ভ্রূর উপর কাজলের টিপ লাগিয়ে দিয়েছি।

বায়শেখরের যশোদাও পুত্রের উপর 'কুদীঠি'[৬০] পড়বার আশংকায় ভীত। তবে সেটি নিজের নয়, অপরের কু-দৃষ্টি।

কৃষ্ণ ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠছেন। যশোদা তাঁকে নিয়ে এখন খেলা করছেন :

নন্দ-ঘরনি আনন্দ ভরী, সুত স্যাম খিলাবৈ।
কবহিঁ ঘুটুরুবনি চলহিঁগে, কহি, বিধিহিঁ মনাবৈ ॥
কবহিঁ দঁতুলি দ্বৈ দুধ কী, দেখৌঁ ইন নৈননি।
কবহিঁ কমল-মুখ বোলিহৈঁ, সুনিহৌ উন বৈননি ॥
চুমতি কর-পগ-অধর-ভ্রূ, লটকতি লট চুমতি।
কহা বরনি সূরজ কহৈ, কহঁ পাবৈ সো মতি ॥[৬১]

অর্থাৎ, নন্দ-ঘরণী আনন্দে পূর্ণ হয়ে পুত্রকে খেলা দিচ্ছেন, আর মনের আকাংক্ষা ঈশ্বরকে জানিয়ে প্রার্থনা করছেন, কবে আমার বাছা হামা দেবে, কবে দুধের দুটি দাঁত দেখতে পাবো, কবে ঐ কমল মুখের বাণী শুনতে পাবো ! যশোদা কৃষ্ণের হাত, পা, অধর, ভ্রূ, ঝুলে পড়া চুল চুমায় চুমায় ভরে দিচ্ছেন। সুরদাস বলেন, এই স্নেহ বর্ণনা করবার মতো শক্তি আমার কোথায় !

যশোদার মনের এই আকাংক্ষা অনেকটাই পূর্ণ হ'ল, যখন—

ঘুটুরুনি চলত স্যাম মণি-আঁগন, মাতু-পিতা দোউ দেখত রী।
কবহুঁক কিলকি তাত-মুখ হেরত, কবহুঁ মাতু-মুখ পেখত রী ॥
... ...
কবহুঁক দৌরি ঘুটুরুবনি লপকত, গিরত, উঠত পুনি ধাবৈ রী।
ইততৈঁ নন্দ বুলাই লেত হৈঁ, উততৈঁ জননি বুলাবৈ রী ॥[৬২]

—শ্যাম মণি-মাণিক্যের আভায় উজ্জ্বল আঙিনায় হামা দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আর মা-বাবা দুজনে তা দেখছেন। পুত্র কখনো এসে বাবার দিকে, কখনো বা মা'র দিকে চাইছেন। কখনো তিনি দ্রুত হামা দিতে গিয়ে পড়ে যাচ্ছেন, আবার উঠে চলছেন। একবার নন্দ ডাকছেন (আমার কাছে এসো), আবার যশোদা ডাকছেন তাঁর কাছে যেতে। কৃষ্ণ দু'দিকেই ছুটে ছুটে আসা-যাওয়া করছেন।

শিশুর স্বভাব ও জীবনধারা ভাষার গণ্ডি স্বীকার করে না। তাই, হিন্দী বাংলা কিংবা অন্য যে কোনো ভাষার সাহিত্যে কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ পাওয়া যায়। হিন্দী কৃষ্ণ-কাব্যে যেমন, বাংলা পদাবলীতে তেমনি হামাগুড়ির কথা কবিরা বর্ণনা করেছেন দেখা যায়। কেননা, শিশু বড় হবার পথে এটি একটি স্বাভাবিক স্তর। তাই; উদ্ধবদাস বলেছেন :

বাল গোপাল রঙ্গে মন-বয় সখা সঙ্গে
হামাগুড়ি আঙিগনায় খেলায়।[৬৩]

হামাগুড়ি দিয়ে আঙিগনায় ঘুরতে ঘুরতে কৃষ্ণ "মৃত্তিকা মনের সুখে খায়"। অর্থাৎ, যশোদা কিংবা নন্দ কেউ কৃষ্ণের চলাফেরা সস্নেহ দৃষ্টিতে অনুসরণ করেন নি, এটাই বোঝা যায়। হিন্দী পদকর্তারা কিন্তু দেখিয়েছেন যে, কৃষ্ণের প্রতিটি কাজই তাঁরা বিশেষরূপে লক্ষ্য করে আনন্দ লাভ করেছেন। উদ্ধবদাস এই অবাধ হামাগুড়ি দেওয়াকে বিশ্বরূপ দর্শনের ভূমিকা হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

কিন্তু বাসুদেব হামাগুড়ির শুধুই একটি সুন্দর ছবি এঁকেছেন।

এক মুখে কি কহব গোরাচান্দের লীলা।
হামাগুড়ি যায় নানা রঙ্গে শচীব বালা॥
লালে মুখ ঝর ঝর দেখিতে সুন্দর।
পাকা বিম্বুফল জিনি সুরঙ্গ অধর॥[৬৪]

সুরদাসের যশোদা কৃষ্ণের দুটি দুধের দাঁত দেখার জন্যে ব্যাকুল। বাঙালী পদকর্তা বংশীবদন বলেছেন, কৃষ্ণ নিজেই হেসে হেসে মাকে তাঁর দাঁত দেখাচ্ছেন।

নন্দ সুনন্দ যশোমতি রোহিণি
আনন্দে সুত-মুখ চায়।
অরুণ দৃগঞ্চল কাজরে রঞ্জিত
হাসি হাসি দশন দেখায়॥[৬৫]

যদুনাথ দাস মায়ের কোলে কৃষ্ণের একটি সুন্দর বাস্তব ছবি এঁকেছেন। কোলে বসে কৃষ্ণ আধো-আধো কথা বলছেন। মুখ দিয়ে লালা ঝরছে, কখনো উঠছেন, কখনো বসছেন, আর মাঝে মাঝে মাকে বকছেন—

জননী কোরে বিলসিত নন্দ দুলাল
আধহি আধ, বোলত দোলত
মুখ মে চোয়ায়ত লাল॥
ক্ষণে ক্ষণে উঠত, ক্ষণে বিঠত মোহন,
ক্ষণে ক্ষণে দেয়ত গারি।[৬৬]

বাঙালী পদকর্তাদের এইসব দৃশ্য অপেক্ষা হিন্দী কবিদের বাৎসল্যের চিত্রগুলি অধিকতর মর্মস্পর্শী। পরমানন্দদাস বলেছেন, যশোদা কৃষ্ণকে বুকের উপর তুলে তাঁর নতুন ওঠা দাঁত দেখছেন। সেই দুধের দাঁত কার ভাগে কোনটা পড়বে, তার হিসাবটা শোনাচ্ছেন ছেলেকে। কৃষ্ণের সঙ্গে এই অর্থহীন প্রলাপের মধ্যে ফুটে উঠেছে

যশোদার মাতৃরূপ। কবির কথাচিত্রটি এই :

বারী মেরে লটকন পগু ধরো ছতিয়াঁ
কমল-নয়ন বলি জাউঁ বদন কী
সোহাঁত হেঁ নান্হী নান্হী দুধ কী দ্বৈ দতিয়াঁ।
ইহ মেরী ইহ তেরী ইহ বাবা নন্দ কী ইহ বলভদ্র কী।
ইহ তাকী জু ঝলাবৈ তেরো পলনা।[৬৭]

—আমার বাছা, তোমার টলমলে পা দুটি আমার বুকের উপর রাখো। কমল-নয়ন, তোমার সুন্দর মুখের ছোট ছোট দুটি দুধের দাঁতের বলিহারী যাই। এ দাঁতটা আমার, ওটা তোমার, এটা বাবা নন্দের, এটা বলভদ্র দাদার, আর এটা যে তোমার দোলনা দোলায় তার।।

চৈতন্যের সমকালীন ও পরবর্তীকালের বাংলা পদাবলীতে কৃষ্ণলীলার রসবৈচিত্র্য গৌরাঙ্গে আরোপিত হয়েছিল। যশোদার স্থান অধিকার করেছিলেন শচীমাতা। কৃষ্ণ-লীলা ও চৈতন্যলীলার বাৎসল্য রসের পদ বিচার করলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। যেমন, কৃষ্ণ এখন হাঁটতে শিখছেন। তার টলমল পা দুটি মাটিতে রাখছেন, যশোদা তাঁর হাত ধরে আছেন। কিন্তু কৃষ্ণের কাছে মাটিতে কষ্ট করে হাঁটার চেয়ে মায়ের কোল অনেক ভালো :

যশোমতী সুন্দরী, কর অঙ্গুলি ধরি,
শিশুকে শিখায়ত ঠারি॥
কবহি যশোমতি, মুখ হেরি রোয়ত,
পুন পুন মাগই কোর।[৬৮]—যদুনাথ দাস

অনুরূপ চৈতন্যলীলার পদও আছে। শচীমায়ের অপত্যস্নেহ রসে সিক্ত সেই পদগুলি। শিশু নিমাই মায়ের আঁচল ধরে একটু একটু করে হাঁটছেন। মায়ের আঁচল ধরে মায়ের পায়ে-পায়ে হাঁটতে শিশুদের ভালো লাগে এবং একটা নির্ভরতাবোধও থাকে।

মায়ের অঞ্চল ধরি শিশু গৌরহরি।
হাঁটি হাটি পায় পায় যায় গুড়ি-গুড়ি॥
টানি লৈঞা মার হাত চলে ক্ষণে জোরে।
পদ আধ যাইতে ঠেকার করি পড়ে॥
শচীমাতা কোলে লৈতে যায় ধুলা ঝাড়ি।
আখুটি করিয়া গোরা ভূমে দেয় গড়ি॥
আহা আহা বলি মাতা মুছায় অঞ্চলে।
কোলে করি চুম্ব দেয় বদন কমলে॥[৬৯]

গোরা 'আখুটি করে মাটিতে পড়ে যাচ্ছেন, আর শচীমা গোরার আঘাত লাগলো মনে করে তাড়াতাড়ি কোলে তুলে নিচ্ছেন, একটি সহজ ও স্বাভাবিক সৌন্দর্য আছে ছবিটির মধ্যে। তাছাড়া যে মুহূর্তে কবি বাসু ঘোষ বলেন, "আখুটি করিয়া গোরা ভূমে দেয় গড়ি", সেই মুহূর্তে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে একটি জেদী, দুরন্ত শিশু, যে শচীমায়ের

আঙিনায় আবদার করছে। হিন্দী বৈষ্ণব পদে কিন্তু বল্লভাচার্য বা বিঠ্‌ঠলনাথ কেউই কৃষ্ণলীলা গানের সঙ্গে মিশে এক হতে পারেন নি।

শিশু-কৃষ্ণকে যশোদা হাত ধরে হাঁটতে শেখাচ্ছেন, কখনো বা নন্দ শেখাচ্ছেন; হিন্দী বৈষ্ণব কবিরাও বিষয়টি নিয়ে বহু পদ রচনা করেছেন। বহু পদ রচিত হবার ফলে শিশুর হাঁটতে শেখার ক্রমবিকাশের ধারা বর্ণিত হয়েছে বিভিন্ন রূপে—

ধনি জসুমতি বড়ভাগিনী, লিএ কাহ্ন খিলাবৈ।
তনক-তনক ভুজ পকরি কৈ ঠাঢ়ো হোন সিখাবৈ॥
লরখরাত গিরি পরত হৈ, চলি ঘুটুরুনি ধাবৈ।
পুনি ক্রম-ক্রম ভুজ টেকিকৈ, পগ দ্বৈক চলাবৈ॥[৭০]

—মহাভাগ্যবতী যশোদা, তিনি কানাইকে খেলা দিচ্ছেন। তাঁর ছোট ছোট হাত ধরে দাঁড়াতে শেখাচ্ছেন। কৃষ্ণ টলমল করে পড়ে যাচ্ছেন, তারপর হামা দিয়ে চলতে শুরু করেছেন। কিন্তু যশোদা আবার ধীরে ধীরে তাঁর হাত ধরে দু'পা হাঁটাচ্ছেন।

শুধু যশোদা নন, পিতা নন্দও পুত্রকে হাত ধরে চলতে শেখান:

গহে অঁগুরিয়া ললন কী, নন্দ চলন সিখাবত।
অরবরাই গিরি পরত হৈঁ, কর টেকি উঠাবত।[৭১]

—নন্দ নিজে ছেলের আঙুল ধরে চলতে শেখাচ্ছেন। শ্যাম টলমল করে পড়ে যাচ্ছেন। তখন নন্দ তাঁর হাত ধরে তুলছেন।

এরপরই হিন্দী কবি বর্ণনা করছেন, কৃষ্ণ এক পা দু'পা করে চলছেন: "কাহ্ন চলত পগ দ্বৈ-দ্বৈ ধরণী।" কৃষ্ণ এবার মাটিতে পা রেখে চলছেন। কিন্তু এই হাঁটতে শেখার মধ্যে কখনো 'তনক-তনক' অর্থাৎ, ছোট ছোট হাত ধরে যশোদা তাঁকে দাঁড়াতে শেখাচ্ছেন। কখনো "লরখরাত গিরি পরত হৈ", কিংবা "অরবরাই গিরি পরত হৈঁ"। অর্থাৎ, দাঁড়াতে গিয়ে টলমল করে পড়ে যাচ্ছেন; কৃষ্ণের দাঁড়াতে গিয়ে টলমল করে পড়ে যাওয়ার ভঙ্গিমাটি বোঝাতে দুটি সহজ ও চলিত শব্দ 'লরখরাত' ও 'অরবরাই' খুবই সুষ্ঠু প্রয়োগ হয়েছে। এই দুটি শব্দের দ্বারা কৃষ্ণের টলমল করে দাঁড়ানো ও টলে টলে চলার দৃশ্যটি চিত্রময় হয়ে উঠেছে।

কৃষ্ণ শিশু হলেও বোঝেন তাঁকে চলতে দেখে যশোদার খুব আনন্দ হয়। তাই, তিনি দু-এক পা হাঁটেন এবং ফিরে ফিরে দেখেন যশোদা দেখছেন কিনা। কবি শিশুর মানসিকতাকে সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন:

চলত দেখি জসুমতি সুখ পাবৈ।
ঠুমুকি ঠুমুকি পগ ধরণী রেঁগত, জননী দেখি দিখাবৈ।[৭২]

—কৃষ্ণকে চলতে দেখে মা যশোদা অত্যন্ত আনন্দিত। কৃষ্ণ ঠমকে-ঠমকে মাটিতে পা রেখে চলেছেন এবং মাকে নিজের চলা দেখাচ্ছেন।

ক্রমে সময় এলো যখন কৃষ্ণ শুধু হাঁটেন না, ছুটে ছুটে খেলাও করেন, নাচেন। আর যশোদা নিজেই পুত্রের খেলায় যোগ দেন। কখনো করতালি দেন নৃত্যের সঙ্গে, কখনো বা গান করেন। বাঙালী কবির চোখে ছবিটি এই:

ভাল নাচে রে নাচে রে নন্দ-দুলাল
ব্রজ রমণীগণ চৌদিগে বেঢ়ল
যশোমতি দেই করতাল ॥[৭৩] —বংশি

যশোদা ননীর লোভ দেখিয়ে কৃষ্ণকে নাচান, আর এই নৃত্যে মাতৃ হৃদয় উদ্বেলিত হয়।

দধি-মন্থ-ধ্বনি শুনইতে নীলমণি
আওল সঙ্গে বলরাম।
যশোমতী হেরি মুখ পাওল মরমে সুখ
চুম্বয়ে চান্দ-বয়ান ॥
কহে শুন যাদুমণি তোরে দিব ক্ষীর ননী
খাইয়া নাচহ মোর আগে।[৭৪] —ঘনরামদাস

যশোদা পুত্রের কৃতিত্বে মুগ্ধ, তাই দধি-মন্থন ছেড়ে পুত্রের নৃত্য দেখার জন্যে মুগ্ধ কণ্ঠে সবাইকে ডাকছেন

খাইতে খাইতে নাচে কটিতে কিঙ্কিণী বাজে
হেরি হরষিত ভেল মায় ॥
নন্দ-দুলাল নাচে ভালি।
ছাড়িল মন্থন-দণ্ড উথলিল মহানন্দ
সঘনে দেই করতালি ॥
দেখ দেখ রোহিণি গদ গদ কহে রাণী
যাদুয়া নাচিছে দেখ মোর।[৭৫] —ঘনরাম দাস

বাংলা বৈষ্ণব পদাবলীতে কৃষ্ণের নৃত্যের নানা বর্ণনা পাওয়া যায়। কখনো এমনি খেলার ছলে তিনি নাচেন, কখনো বা ননীর লোভে। আর, যশোদা পুত্র গর্বে গরবিনী। কারণ কৃষ্ণের নৃত্য দেখার জন্য 'ব্রজ রমণীগণ চৌদিকে বেঢল ;' যশোদার অহংকারের শেষ নেই, "যাদুয়া নাচিছে দেখ মোর"! বাংলা বৈষ্ণব পদাবলীতে নৃত্যকে কেন্দ্র করে যশোদার আনন্দোচ্ছ্বাসের নানা রূপ দেখা যায়।

শুধু যশোদার নয়, সমস্ত ব্রজবধূরাও কৃষ্ণের প্রতি স্নেহাসক্ত—

ব্রজ-বধূ মেলি দেওই করতালি
বোলই ভালি রে ভাল।
... ...
বংশি কহই সব ব্রজ রমণীগণ
আনন্দ-সায়রে ভাস।
হেরইতে পরশিতে লালন করইতে
স্তন খিরে ভীগল বাস ॥[৭৬] —বংশি

হিন্দী বৈষ্ণব পদাবলীতেও কৃষ্ণের নৃত্যের মনোরম ছবি আছে।—

আঁগন স্যাম নচাবহীঁ, জসুমতি নন্দরাণী।
তারী দৈ-দৈ গাবহীঁ, মাধুরী মৃদুবাণী ॥[৭৭]

—অঙ্গনে নন্দরাণী যশোদা শ্যামকে হাততালি দিয়ে নাচাচ্ছেন এবং মৃদু-মধুর স্বরে গান করছেন। অথবা,

লট লটকনু মটকনু কর পহুঁচী নূপুর বাজহিঁ পাই।
চুটকী দৈ-দৈ নচাৱাতি হরি কোঁ হঁসতি জসোদা মাই ॥[৭৮]

—কোঁকড়া চুলের গোছা ঝুলছে, হাতে বাজু এবং পায়ের নূপুর বাজছে। যশোদা হেসে হেসে কৃষ্ণকে তুড়ি দিয়ে নাচাচ্ছেন।

নৃত্যের প্রসঙ্গ বর্ণনায় বাঙালী পদকর্তারা বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। নৃত্যে ছেলের কৃতিত্ব যশোদা সকলকে ডেকে এনে দেখান। নৃত্যের তাল রাখবার জন্যে হাততালি দিয়ে নিজেই উৎসাহিত করেন ছেলেকে। কৃষ্ণের মতো গৌরাঙ্গও নৃত্যপটু ছিলেন। বাসুদেব ঘোষের নিম্নোদ্ধৃত পদটি নৃত্যের প্রসঙ্গ দিয়ে আরম্ভ হলেও মাতৃ-স্নেহের ক্ষেত্রে এর ব্যঞ্জনা সুদূরপ্রসারী।

শচীর আঙিনায় নাচে বিশ্বম্ভর রায়।
হাসি হাসি ফিরি ফিরি মায়েরে লুকায়॥
বয়ানে বসন দিয়া বোলে লুকাইলুঁ।
শচী বোলে বিশ্বম্ভর আমি না দেখিলুঁ॥
মায়ের অঞ্চল ধরি চঞ্চল-চরণে।
নাচিয়া নাচিয়া যায় খঞ্জন গমনে॥[৭৯]

নৃত্যের আনন্দোল্লাস ব্যতীত এই কটি চরণের মধ্যে মাতা-পুত্রের সহজ অন্তরঙ্গতার যে ছবি আছে, ভারতীয় পদাবলী সাহিত্যে তার দৃষ্টান্ত বেশি নেই। স্নেহের তাগিদে মা তাঁর প্রবীণতার গাম্ভীর্য ত্যাগ করে ছেলের সঙ্গে কানামাছি খেলতে নেমেছেন। কবি অনবদ্য ভাষায় মাতা-পুত্রের স্নেহসম্পর্ক মুক্তাবিন্দুর মতো তুলে ধরেছেন আমাদের সামনে। মা ছেলের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছেন,— এমনি একটি ছবি রসখানের পদেও পাওয়া যায়। তবে, বাসু ঘোষের পদের মতো তা মাধুর্যমণ্ডিত নয়।

রসখান বলছেন,—

'তা জসুদা কহ্যো ধেনু কীওঁ টিঁঢোরত তাহি ফিরৈ হরি ভূলেঁ।
ঢুঁঢ়ণ কুঁপগ চারি চলৈ মচলৈঁ রজ নাঁহি বিথুরি দুকূলৈ॥
হেরি হঁসে রসখান তবৈ উর ভাল তৈঁ টারি মৈরার লটূলৈঁ।
সো ছবি দেখি আনন্দ নন্দজু অঙ্গনি অঙ্গ সমাত ন ফুলৈঁ॥[৮০]

—কৃষ্ণের বাল্যলীলা দেখে কোনো গোপিনী তাঁর সখীকে বলেছেন, কৃষ্ণকে খেলা দেবার জন্যে যশোদা গোরুর পেছনে লুকিয়ে শব্দ করলেন, যা শুনে কৃষ্ণ নিজের অন্য সব কথা ভুলে যশোদাকে খুঁজতে লাগলেন। তিনি যশোদাকে খোঁজার জন্যে অল্প কয়েক পা এগোলেন, কিন্তু মাকে না পেয়ে বায়না ধরেন এবং মাটিতে লুটিয়ে লুটিয়ে নিজের বস্ত্র ধূলোয় মলিন করেন। ছেলের এই অবস্থা দেখে যশোদা তাঁর কাছে আসেন। মাকে দেখে কৃষ্ণের মুখে হাসি ফুটে ওঠে। আর, যশোদা কৃষ্ণের লম্বা লম্বা

চুলগুলি সরিয়ে তার মুখ চুম্বন করতে থাকেন। এই দৃশ্য দেখে নন্দের আনন্দের সীমা নেই।

হিন্দীভাষী বৈষ্ণব কবিরা কৃষ্ণের প্রথম কথা বলাকে যথেষ্ট মূল্য দিয়েছেন। সন্তান প্রথম যখন কথা বলতে আরম্ভ করে, মা তখন অর্ধস্ফুট কথা শুনে বিস্ময়মুগ্ধ হন। বাঙালী বৈষ্ণব কবিরা এই প্রসঙ্গটিকে ততটা প্রাধান্য দেননি। অথচ এটি খুবই বাস্তব বা স্বাভাবিক। হিন্দীভাষী কবিরা শিশু ধীরে ধীরে বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর পরিবর্তনে মাতৃ-হৃদয়ে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, তার নিপুণ বিশ্লেষণ করেছেন। কৃষ্ণ একটু একটু কথা বলতে আরম্ভ করেছেন, তখন যশোদা পুত্রের গুণাবলী সবাইকে ডেকে বলছেন—

কহন লাগে মোহন মৈয়া মৈয়া।

নন্দ মহর সোঁ বাবা বাবা, অরু হলধর সোঁ ভৈয়া ॥[৮১]

—মোহন এখন মা-মা বলে, নন্দকে বাবা-বাবা, আর হলধরকে দাদা।

সুরদাসের বাস্তববোধের জন্যে যশোদা পৃথিবীর মমতাময়ী মা হিসাবে সার্থক হয়েছেন। কোথাও অস্বাভাবিকতা নেই। কৃষ্ণ বড় হয়েও মায়ের স্তন্য পান করেন; যশোদা কিছুতেই তা বন্ধ করতে পারছেন না। যশোদা কৃষ্ণকে বেশ করে বুঝিয়ে বলছেন,—

জসুমতি কান্হহিঁ য়হৈ সিখাৱতি।

সুনহু স্যাম, অব বড়ে ভএ তুম, কহি স্তন-পান ছুড়াৱতি ॥

ব্রজ-লরিকা তোহিঁ পীৱত দেখত, হঁসত, লাজ নহিঁ আৱতি।

জৈহৈঁ বিগরি দাঁত যে আছে, তাতেঁ কহি সমুঝাৱতি ॥[৮২]

—যশোদা কানাইকে শেখাচ্ছেন, শোন শ্যাম, এখন তুমি বড় হয়েছ। একথা বলে তার স্তন্য পান ছাড়াবার চেষ্টা করছেন। তিনি আরো বলেন, ব্রজ-বালকেরা তোমাকে স্তন্য পান করতে দেখে হাসে, তোমার লজ্জা করে না? তোমার এত সুন্দর দাঁত নষ্ট হয়ে যাবে। এসব কথা বলে তাঁকে বোঝাচ্ছেন।

খাওয়া নিয়ে কৃষ্ণের নানা বায়না। যশোদা নিজের হাতে দুধ গরম করে কৃষ্ণকে খাওয়াতে চেষ্টা করেন, কিন্তু তিনি খেতে চান না। নানা ঝামেলা করেন। তখন অনন্যোপায় হয়ে যশোদা কৃষ্ণকে নানাভাবে ভোলাতে থাকেন। দুধ খেলে গায়ে জোর হবে, বলরামের মতো লম্বা চুল হবে, ইত্যাদি:

কজরী কৌ পয় পিয়হু লাল, জাসোঁ তেরী বেনি বঢ়ৈ।

জৈসেঁ দেখি ঔর ব্রজবালক, ত্যোঁ বল বৈস চঢ়ৈ ॥

য়হ সুনি কৈ হরি পীৱন লাগে, জ্যোঁ ত্যোঁ লয়ৌ লঢ়ৈ।

অঁচৱত পয় তাতৌ জব লাগ্যৌ, রোৱত জীভি ডঢ়ৈ ॥[৮৩]

—মা যশোদা বলছেন, বাছা কালো গোরুর দুধ খাও, দেখবে তোমার চুলের বেণী কত বড় হবে। আর দেখবে; ব্রজের অন্যান্য বালকদের মতো তোমার গায়ে খুব জোর হবে এবং তুমিও দীর্ঘায়ু হবে। একথা শুনে মা'র কথা রক্ষার জন্যে দুধ খেতে

লাগলেন। কিন্তু দুধ গরম থাকায় জিভ পুড়ে গেল। কৃষ্ণ কাঁদতে লাগলেন।

তারপর হঠাৎ কান্না থামিয়ে মাথায় হাত দিয়ে কৃষ্ণ দেখেন তাঁর চুল যেমন ছিল তেমনি আছে, এতটুকুও বড় হয়নি। তখন মায়ের কাছে তাঁর বিষণ্ণ প্রশ্ন :

মৈয়া, কবহি বঢ়েগী চোটী ?
কিতী বার মোহি' দুধ পিয়ত ভঈ, য়হ অজহু' হৈ ছোটী।
তু জো কহতি বল কী বেণী, জেঁয়া, হেবহে লাম্বী মোটী॥
কাঢ়ত-গুহত নহৱাৱত জৈহৈ নাগিনি সী ভুই লোটী।
কাঁচো দুধ পিয়াৱতি পচি পচি দেতি ন মাখন রোটী।[৮৪]

—মা, আমার বেণী কবে বড় হবে ? আমার দুধ খাওয়া তো কতক্ষণ হয়ে গেছে, কিন্তু চুল এখনো ছোটই রয়েছে। তুমি যে বলেছিলে বলরাম দাদার বেণীর মতো আমার বেণীও লম্বা ও মোটা হবে এবং আঁচড়াতে, বাঁধতে ও স্নানের সময় নাগিনীর মতো মাটিতে লোটাবে ? তুমি আমাকে বারে বারে জোর করে কাঁচা দুধই খাওয়াও, মাখন-রুটি দাও না।

শিশু-কৃষ্ণকে যশোদার নানা কথা বোঝাতে হয় দুধ খাওয়ার জন্যে। দুধ খেয়েও তাঁর চুল বড় হচ্ছে না দেখে এই যে দুঃখবোধ, তা মাতা-পুত্রের ঘনিষ্ঠতার প্রতীক। শিশুকে লালন-পালনের মধ্যে মায়ের যে ঐকান্তিক চেষ্টা ও যত্নের প্রয়োজন থাকে, হিন্দীভাষী কবিরা সে বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন। তাই সকালে ঘুম থেকে কৃষ্ণকে তোলা, সকালের খাবার খাওয়ানো, খেলা থেকে ডেকে আনা, প্রয়োজন হলে দূরে যেতে না দিয়ে নিজে সঙ্গ দেওয়া, স্নান করানো, দুপুরে খাওয়ানো, রাত্রিতে শোয়ানো ইত্যাদি প্রত্যেকটি বিষয়ের বর্ণনা তো আছেই, আর সেই সঙ্গে আছে যশোদার বাৎসল্য রসের পূর্ণ পরিচয়। নন্দদাসের একটি পদে যশোদার কৃষ্ণকে ঘুম থেকে তোলার ছবিটি বড় মনোরম :

জগাৱত অপনে সুত কো রাণী।
উঠৌ মেরে লাল, মনোহর সুন্দর, কহি কহি মধুর বাণী॥[৮৫]

—আমার বাছা সুন্দর-মনোহর ওঠ ; মধুর স্বরে রাণী যশোদা নিজের পুত্রের ঘুম ভাঙাচ্ছেন। ঘুম থেকে তোলার জন্যে যশোদা কৃষ্ণের যা যা প্রিয় খাদ্য, সেই সব খাদ্য তাঁর সামনে এনেছেন :

মাখন, মিশ্রী ঔর মিঠাঈ দুধ মালাঈ আনী।
ছগন মগন তুম করহু কলেউ মেরে সব সুখদানী॥
জননী-ৱচন সুনি তুরত উঠে হরি কহত বাত তুতরাণী।[৮৬]

—মাখন, মিছরি, মিঠাই, দুধ, সর এনে বলছেন : আমার বাছা, তুমি জলখাবার খেয়ে নাও। জননীর কথা শুনে হরি তৎক্ষণাৎ উঠলেন এবং আধো-আধো কথা বলতে লাগলেন।

কৃষ্ণ বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে খেলতে দূর বনে চলে যান। যশোদা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হন। সব সময় চোখের সামনে না থাকলেই তিনি ব্যাকুল হয়ে পড়েন। কিন্তু

কৃষ্ণকে তিনি কিছুতেই আটকাতে পারেন না। তাই তাঁকে ভয় দেখিয়ে বলেন—

দূরি খেলন জনি জাহু ললা মেরে, বন মেঁ আও হাউ।
তব হঁসি বোলে কাহ্নর, মৈয়া কৌন পঠাএ হাউ ?[৮৭]

—আমার বাছা, অনেক দূরে খেলতে যেও না, বনে একটা হাউ এসেছে। কৃষ্ণ মার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে হেসে জিজ্ঞাসা করেন— "মা, হাউ কে পাঠিয়েছে ?"

সন্তানের জন্যে মাতৃহৃদয়ের ভয়-ভাবনা ভৌগোলিক সীমা মানে না। বাংলা বৈষ্ণব কবির যশোদাও কৃষ্ণকে দূর বনে যেতে দিতে অনিচ্ছুক। উদ্বিগ্ন-হৃদয় যশোদা কৃষ্ণকে নিবৃত্ত করবার জন্যে জ্ঞানদাস একই উপায় গ্রহণ করেছেন :

গোকুলের মাঝে এক হেল্য মহাভয়।
আস্যাছে দারুণ হাঁউ লোকে জনে কয়॥
কৃষ্ণ বলে একথা শুনিলে কার ঠাঞি।
হাঁউ কেমন মা যশোদা আমি দেখি নাঞি॥
অবোধ ছাওয়াল মোর কি পুছিস মোকে।
বলবান হাঁউ এক ঝাউবনে থাকে॥[৮৮]

শিশু চৈতন্যকে ভয় দেখাবার জন্যে শচীমাতাকেও একই উপায় অবলম্বন করতে দেখি। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে চৈতন্যের শৈশব-লীলার বিশদ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। শিশু গোরা খেলতে গিয়ে বস্ত্র ও দেহ মলিন করে ঘরে ফিরে আসেন ; শচীকে তাই বলতে হয়

সাজিয়া কাজিয়া পাঠাইল আমি।
ধূলায় ধূসর হইলা তুমি॥
রজনী প্রভাতে ছাড়িলে ঘর।
রড় দিয়া আইস হাউর ডর॥[৮৯]

ভয় পেয়ে নিমাইও ঘরে ফিরে আসেন—

হাউর ডর শুনি আইলা ঘরে।[৯০]

প্রসঙ্গত বলা যায় যে, ভাগবতের বিভিন্ন কাহিনী যে নিমাইয়ের জীবনে আরোপিত হয়েছে এটি তারই একটি দৃষ্টান্ত।

বৈষ্ণব কবি মায়ের মনস্তত্ত্ব ভালো করেই উপলব্ধি করেছিলেন। বাংলার কবির সঙ্গে হিন্দীভাষী বৈষ্ণব কবির এ বিষয়ে মিল আছে।

কৃষ্ণ যাতে দূরে খেলতে না যান তার জন্য কখনো কখনো যশোদা তাঁর কাজ ফেলে কৃষ্ণের সঙ্গে খেলাতেও যোগ দেন। আর এই খেলার মধ্যে মা ছেলের সঙ্গ দিয়ে শুধু কৃষ্ণকে আনন্দ দেন না, পুত্রের সঙ্গে খেলার মধ্যে তিনি নিজেও স্নেহে আপ্লুত হন। তাই তিনি কৃষ্ণকে বলছেন—

মেরে আগেঁ খেল করৌ কছু, সুখ দীজৈ মৈয়া কৌঁ।[৯১]

—আমার সামনে কিছু খেলা করে আমাকে আনন্দ দাও।

যশোদা কৃষ্ণ ও তাঁর সখাদের সঙ্গে চোর চোর খেলছেন। যশোদা স্বয়ং হয়েছেন

বুড়ি। কৃষ্ণকে বলছেন—

মৈঁ মূঁদৌঁ হরি আঁখি তুমহারী, বালক রহৈঁ লুকাঈ।[৯২]

—হরি, আমি তোমার চোখ বেঁধে রাখব, অন্য বালকেরা লুকিয়ে থাকবে। মা স্বয়ং খেলবেন, এই আনন্দে কৃষ্ণ সখাদের দৌড়ে ডেকে আনলেন।

কৃষ্ণ খেলতে গিয়ে সমস্ত দেহে ধুলো মেখে আসেন, জামা কাপড় মলিন হয়ে যায়। কিন্তু স্নানে তাঁর প্রচণ্ড ভীতি। তাই যশোদা কৃষ্ণকে নানাভাবে বোঝাচ্ছেন :

মেরে ছগন মগন ব্বারে কহৈয়া বনমেঁ খেলন জাত।
নেঁক উরে ধোঁ আই লাল হৈব রহে মলিন গাত॥
সংগ কে লরিকা বনি-বনি আয়ে য়োঁ কহেংগে কৈসী হৈ তেরী মাত।[৯৩]

—আমার আদরের বাছা, তোমার বালাই নিই, কোথায় বনে খেলতে গিয়েছিলে? বাছা, এমন মলিন দেহ নিয়ে ফিরে এসেছ। তোমার সংগে ছেলেরা কেমন সুন্দর সেজে এসেছে। তোমার এমন মলিন বেশ দেখলে তারা বলবে, কেমন তোমার মা?

কৃষ্ণকে স্নান করবার জন্যে যশোদা এসব বলছেন। কিন্তু কৃষ্ণ কিছুতেই স্নান করতে চান না। যশোদার হাতে তেল উবটন দেখলেই কান্না জুড়ে দেন। কৃষ্ণের কান্না থামাবার জন্যে তাঁকে ছলনার আশ্রয় নিতে হয়।

জসুমতি জবহিঁ কহ্যো অন্হাবন, রোই গএ হরি লোটত রী।
তেল উবটনৌ লৈ আগেঁ ধরি, লালহিঁ চোটত-পোটত রী।
মৈঁ বলি জাউঁ ন্হাউ জনি মোহন, কত রোবত বিনু কাজৈঁ রী।
পাছেঁ ধরি রাখ্যো ছপাঈ কৈ উবটন-তেল সমাজৈঁ রী।
মহরি বহুত বিনতী করি রাখতি, মানত নহীঁ কন্হৈয়া রী॥[৯৪]

—যশোদা কৃষ্ণকে স্নানের কথা বলতেই হরি কেঁদে লুটিয়ে পড়লেন। তেল উবটন রেখে দিয়ে মা ছেলেকে আদর করে বোঝাতে লাগলেন। আমি তোমার বলিহারী যাই মোহন, তুমি স্নান করো না, কিন্তু বিনা কারণে কেন কাঁদছ? তেল উবটন ইত্যাদি সব পেছনে লুকিয়ে রেখে অনেক করে বোঝাতে লাগলেন। কিন্তু কৃষ্ণ কিছুতেই শান্ত হলেন না।

সকাল বেলাকার জলখাবারের সময় অনেক স্নেহে যত্নে যশোদা কৃষ্ণকে খেতে দিচ্ছেন, এ বর্ণনা হিন্দীতে প্রায়ই পাওয়া যায়। যেমন, "করহু কলেউ রাম-কৃষ্ণ মিলি কহতি জসোদা মৈয়া।"[৯৫]

—যশোদা বলছেন, রাম-কৃষ্ণ, তোমরা জলখাবার খেয়ে নাও।

শুধু সকালবেলার খাওয়ার কথা বলেই কবি সুরদাস ক্ষান্ত হন না। বিভিন্ন সময়ে কৃষ্ণের খাওয়া এবং তা নিয়ে যশোদার নানা ঝঞ্ঝাটের সমস্ত ছবিরই নিখুঁত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। তুচ্ছ বিষয়ও তাঁর নিপুণ প্রকাশভঙ্গিতে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। বন্ধুদের সংগে খেলতে খেলতে দুপুরের খাওয়ার কথা কৃষ্ণের মনে থাকে না। ফলে যশোদাকে খুঁজে বেড়াতে হয় কোথায় কৃষ্ণ। তিনি ছেলেকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন সম্ভাব্য সকল জায়গায়:

নন্দ বুলাৱত হৈঁ গোপাল।

আবহু বেগি বলৈয়া লেঁউ হোঁ, সুন্দর নৈন বিসাল।[৯৬]

—মা সস্নেহে ডাকছেন, সুন্দর বিশাল লোচন গোপাল, তাড়াতাড়ি এসো আমি তোমার বালাই নিই। তোমাকে নন্দ-বাবা ডাকছেন।

কিন্তু কৃষ্ণ আসছেন না দেখে যশোদা ডেকে বলছেন,— "ভাত সিরাত তাত দুখ পাৱত, বেগি চলৌ মেরে লাল।"[৯৭]

—ভাত ঠাণ্ডা হচ্ছে, বাবা নন্দ রুষ্ট হচ্ছেন, আমার বাছা ছুটে চলে এসো। তিনি আরো বলছেন— "হোঁ বারী নান্হে পাইনি কী দৌরি দিখাৱহু চাল।"[৯৮]

—আমি তোমার ছোট ছোট পায়ের বলিহারি যাই দৌড়ে তোমার চলা দেখাও।

সুরদাস পিতা নন্দের বাৎসল্যের ছবি আঁকতেও সিদ্ধহস্ত। তাঁর বর্ণনায় আছে নন্দের দুপুরের খাওয়াই হয় না যদি রাম ও কৃষ্ণ সঙ্গে না বসেন :

মেরৈঁ সঙ্গ আই দোউ বৈঠৈঁ, উন বিনু ভোজন কৌনে কাম।[৯৯]

—আমার সঙ্গে দুজন [রাম কৃষ্ণ] খেতে বসে। ওদের ছাড়া খাওয়া অর্থহীন হয়ে পড়ে।

কৃষ্ণ এসে খেতে বসেছেন। বড় বড় গ্রাস মুখে তোলার চেষ্টা করছেন। কিছু খাচ্ছেন, কিছু গায়ে হাতে মাখছেন। হঠাৎ মুখের ভিতব লঙ্কা পড়ে যাওয়াতে ঝাল লেগেছে। কাঁদতে কাঁদতে ছুটে বাইরে চলে গেলেন, তাই দেখে রোহিণী তাঁকে কোলে তুলে মুখে ফুঁ দিয়ে আদর করতে লাগলেন :

"ফুঁকতি বদন রোহিণী ঠাঢ়ী লিএ লগাই অঁকোরে।"[১০০]

বাংলার বৈষ্ণব কবিরা মানব জীবনের প্রতিদিনের খুঁটিনাটি প্রতিটি বিষয় হয়তো তাঁদের পদে গ্রহণ করেননি। তবে জীবনের প্রধান প্রধান বিষয়গুলি উপেক্ষা করা হয়নি। অনেক সময় একই বিষয় উভয় ভাষাব কবিরা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু বলার ভঙ্গিমায়, কিংবা দৃষ্টিভঙ্গিতে পার্থক্য দেখা যায়। হিন্দী বৈষ্ণব কবিরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখিয়েছেন, কৃষ্ণকে খাওয়ানো নিয়ে যশোদাকে নানাভাবে চেষ্টা করতে হচ্ছে। বাঙালী কবিদের কৃষ্ণ একটু লোভী। তাঁরা দেখিয়েছেন কৃষ্ণ সকালে ঘুম থেকে উঠেই খাবার জন্যে বায়না শুরু করেন ·

রজনী প্রভাতে উঠি নন্দের গৃহিণী।
দধির মন্থন করে তুলিতে নবনী॥
নিদ্রাগত ছিল কৃষ্ণ শয়ন মন্দিরে।
নিদ্রাভঙ্গ হইল বৈসে পালঙ্ক উপরে॥
আমার হয়েছে ক্ষুধা শুনগো জননী।
স্তন কিম্বা দেহ মোরে খাইতে নবনী॥
মা মা বলিয়া তবে বাহিরে আইলা।
কি খাব বলিয়া কৃষ্ণ কাঁদিতে লাগিল॥[১০১]

হিন্দী বৈষ্ণব সাহিত্যে যশোদা যেখানে কৃষ্ণকে খেয়ে নেবার জন্য অনুনয়

করছেন, বাংলা বৈষ্ণব কাব্যে কৃষ্ণ অসহ্য ক্ষুধার জ্বালায় যশোদাকে অতিষ্ঠ করছেন।

মাখন কারণ লালত বোবত

তোর্বাহ ধরনি লোটাই।[102]

কবিরা ঘরে ঘরে এ রূপটি প্রত্যক্ষ করছেন বলেই ক্ষুধার্ত শিশুর এমন জীবন্ত ছবি আঁকা সম্ভব হয়েছে :

একদিন বিহানে উঠিঞা নন্দরাণী।
যাদুরে লইযা কোলে মথিছে নবনী॥
হেনকালে ধবে কৃষ্ণ মন্থনেব ডারি।
ননী দে মা বল্যা কর পাত এ মুরারি॥[103] —জ্ঞানদাস

অথবা, যশোদা কৃষ্ণকে তার অনুপম নৃত্য দেখাতে বললে কৃষ্ণ তার উত্তরে বলেন—

বসিযা মায়ের কোলে, আধ আধ বাণী বোলে,
শুন শুন ওগো নন্দরাণী।
ক্ষুধাতে হালিছে গা, নাচিতে না উঠে পা,
খাইতে দে মা খীর সর ননী॥
শুনিয়া গোপালের কথা মরমে পাইলা ব্যথা,
ভাসে রাণী নয়নের জলে।
হাতে লেযা খীর ননী, চাঁদ মুখে দেয় রাণী,
চুম্ব দেয় বদন কমলে॥[104] —বংশীবদন

এমনকি নিজের ভাণ্ডার শূন্য থাকলে ক্ষুধার্ত কৃষ্ণকে অনেক সময় শান্ত করার জন্যে যশোদার অন্য বাড়ী থেকে ননী চেয়ে আনতে যেতে হয়।

একদিন মাতৃ-স্তন্য পানে ইচ্ছুক দুরন্ত শিশু কৃষ্ণকে শান্ত করতে কোলে তুলে নিয়ে যশোদা বসেছেন, এমন সময় দুধ উথলিয়ে উঠছে দেখে তিনি কৃষ্ণকে কোল থেকে নামিয়ে দুধের কাছে চলে যান। স্তন্যপানে অতৃপ্ত কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে ঘরে প্রবেশ করেন। যশোদা ফিরে এসে কৃষ্ণকে না দেখে চিন্তিত হলেন।

আমি কি এমন জানি কোলে করি যাদুমণি
যাদুরে করাই স্তন পান।
মোরে বিধি বিড়ম্বিল গোরস উথলি গেল
তা দেখি ধরিতে নারি প্রাণ॥
গোপাল না লৈনু কোলে ভুলিনু রোহিণী বোলে
সে কোপে কোপিত যাদুমণি।[105]

যশোদা কৃষ্ণকে খুঁজে পাচ্ছেন না। মা'র স্তন্য পান করে ক্ষুধা মেটাবার সুযোগ না পাওয়াতেই কৃষ্ণের এই ক্রোধ। এদিকে তিনি নানা পাত্র ভেঙে ক্ষীর, ননী ইত্যাদি চুরি করে খেয়ে নিয়েছেন। কিন্তু যশোদার কাছে চুরি করাটা বিশেষ অপরাধ নয়, তিনি ব্যস্ত পুত্রকে না দেখতে পেয়ে। তাই বন্ধুদের প্রশ্ন করেন :

তোমরা করিছ খেলা গোপাল কোথায় গেলা

দৃঢ় করি বল এ বোল।[১০৬]

কৃষ্ণ মায়ের দুর্বলতা বোঝেন। ঘনরামদাস একটি বিশেষ ঘটনার মধ্যে যশোদার দুর্বলতাকে আরো সুন্দর করে স্পষ্ট করেছেন। একদিন—

যমুনার জলে গেলা যশোদা রোহিণী।
শূন্য ঘর পাঞা লুটে এ ক্ষীর নবনী॥
পিঁড়ির উপর পিঁড়ি উদুখল দিয়া।
তমু ত শিকার ভাণ্ড লাগি না পাইয়া॥
নাড়িতে ছেঁদিয়া ভাণ্ড হেটে পাতে মুখ।
হেনই সময় দেখে জননী সম্মুখ॥[১০৭]

হঠাৎ মাকে দেখে কৃষ্ণ ছুটে পালান। আর—

দু বাহু পসরি আগে যায় নন্দরাণী।
ধরিতে ধরিতে ধরা না দেয় নীলমণি॥
গৃহে পড়ি গড়ি যায় দধি নবনীত।
কোপ-নয়নে রাণী চাহে চারিভীত॥[১০৮]

এবং তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে রোহিণীকে প্রশ্ন করেন— "হেদে গো রামের মা, ননী চোরা গেল কোন পথে।" কারণ কৃষ্ণের অত্যাচারে ঘরে "ক্ষীর রস যত হয়, কিছুই নাহিক রয়"।[১০৯]

কৃষ্ণের আহার সম্বন্ধে বাংলা পদাবলী থেকে যেসব উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে দুটি বৈশিষ্ট্যের মিশ্রণ দেখা যায়। একটি বাঙালীর ভোজন বিলাসিতা, অন্যটি মধ্যযুগীয় বাঙালী সমাজের দারিদ্র্য। ঘুম ভাঙার পরেই কৃষ্ণ যখন খাবার জন্য বায়না শুরু করেন তখন এই সিদ্ধান্ত করাই স্বাভাবিক যে, পূর্বরাত্রে তাঁর খাওয়া যথেষ্ট হয়নি। ক্ষুধার জ্বালায় খাদ্যের প্রতি লোভ স্বাভাবিক এবং এইদিক থেকে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে দারিদ্র্যের যেসব চিত্র আছে, তার সঙ্গে বলরামদাসের উদ্ধৃত পদটির যোগ আছে বলে মনে হয়।

শিবায়ন কাব্যে দেখা যায়, পার্বতী পুতুল-কন্যার বিবাহের পর বিদায়ের মুহূর্তে পুতুল-বরকে অনুরোধ করছেন: "আটিং ঢাক্যা বস্ত্র দিয় পেট ভরা ভাত।"[১১০] শুধু দু'বেলা পেট ভরে ভাত খাওয়াটার মধ্যেই ছিল সকল সুখের উৎস। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম নিজের দৈন্য সম্বন্ধে বলেছেন:

তৈল বিনা কৈল স্নান করিনু উদক পান
শিশু কাঁদে ওদনের তরে।[১১১]

দু'মুঠো ভাতের জন্য এমনি হাহাকার, মধ্যযুগের কাব্যে অনেক জায়গাতেই পাওয়া যায়।

কিন্তু উপরে উদ্ধৃত পদাবলী থেকে এ-ও দেখা যায়, দারিদ্র্য ছাড়াও কৃষ্ণ আদুরে বাঙালী ছেলের মতো ভোজনবিলাসী ছিলেন এবং স্নেহাতুরা যশোদা সেই বিলাসকে সমর্থন করতে দ্বিধা করতেন না। তবে, দুধ ননী ক্ষীর ইত্যাদি খাওয়ার যে ছবি বাংলা পদাবলীতে পাওয়া যায়, সেটা যে প্রাচুর্যের চিত্র এমন কথা বলা যায় না। কারণ নন্দ

জাতিতে গোয়ালা, দুধ, ননী ক্ষীর বিক্রয় করাই তাঁর ব্যবসা। তাই, ব্যবসার পণ্য কৃষ্ণ খেয়ে নিঃশেষ করলে কখনো কখনো জননীকে ক্রুদ্ধ হতেও দেখা যায়; কারণ এই পণ্য হ'ল তাঁদের জীবিকার্জনের সম্বল।

চুরি করে দুধ ননী, ক্ষীর খাওয়ায় যশোদা ক্রুদ্ধ হন। মায়ের ক্রুদ্ধ মূর্তি দেখে কৃষ্ণ ভয়ে পালিয়ে থাকেন কিছুক্ষণ। যে কোনো কারণেই হোক না কেন, ছেলেকে কিছুক্ষণ দেখতে না পেলে তাঁর রাগ জল হয়ে যায়, কৃষ্ণকে ফিরে কোলে পাবার জন্যে তিনি ব্যাকুল হন। সেই ব্যাকুলতা ধরা পড়েছে কবির রচনায়:

তোমা না দেখিয়া প্রাণ হইল আকুল ॥
কার ঘরে আছে গোপাল বোল ডাক দিয়া।
তোমার মায়ের প্রাণ যায় বিদরিয়া ॥[১১২] —ঘনরামদাস

ভাগবতের যশোদা প্রয়োজনে রুদ্রাণী হতে পারেন। পদাবলীর যশোদা 'বাংলা দেশের মা'। এইটিই তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয়। তিনি সন্তান-অন্ত প্রাণ, একটু অদর্শনে ব্যাকুল হয়ে পড়েন। আর তাই—

ঘরে ঘরে উকটিতে পদচিহ্ন দেখি পথে
সকরুণ-নয়ানে নেহারে।
আহা মরি হায় হায় মূরছিয়া পড়ে তায়
কান্দে পদচিহ্ন লৈয়া কোরে।[১১৩] —ঘনরামদাস

এবং শেষপর্যন্ত দেখি যশোদা পুত্রকে কোলে পেয়ে জীবন ফিরে পেয়েছেন:

মরণ-শরীরে যেন পাইল পরাণ দান
শুনিতেই নূপুরের ধ্বনি ॥
বসিয়া মায়ের কোলে গদ গদ বাণী বোলে
অনেক সাধের যাদুমণি।[১১৪] —ঘনরামদাস

ভাগবতে এই চুরি করার অপরাধে যশোদা কৃষ্ণকে উদুখলে বেঁধে রেখেছেন, তিরস্কার করেছেন।[১১৫] বাঙালী মা এত রূঢ় হতে পারেন না, তাই বোধ হয় বাঙালী বৈষ্ণব কবিরা এ বিষয়ে তেমন দৃষ্টি দেননি। মনে হয়, সন্তানের অন্যায় আচরণের জন্যেও মায়ের কঠোর ব্যবহার তাঁরা চিন্তাই করতে পারেন না। স্নেহ-ব্যাকুল চিরন্তন বাঙালী মা, যশোদা সম্পর্কে এর চেয়ে বেশি কিছু চিন্তাই করা যায় না।

বলরামদাসের একটি পদে কৃষ্ণ নন্দের কাছে নালিশ করছেন যে, ননী চুরির জন্যে যশোদা তাঁকে দড়ি দিয়ে বেঁধেছেন:

দাঁড়াইয়া নন্দের আগে গোপাল কান্দে অনুরাগে
বুক বাহিয়া পড়ে ধারা।
না থাকিব তোমার ঘরে অপযশ দেহ মোরে
মা হইয়া বলে ননি-চোরা ॥
ধরিয়া যুগল করে বাঁধিয়া ছান্দন-ডোরে
বাঁধে রাণী নবনী লাগিয়া।[১১৬]

প্রচণ্ড অভিমানে যশোদার সবচেয়ে দুর্বল স্থানে আঘাত করে কৃষ্ণ বলেন যে, তিনি যশোদার নিজের জঠরজাত সন্তান নন, তাই তিনি কৃষ্ণের প্রতি রূঢ় হতে পারেন :

পরের ছাওয়াল পাইয়া মারেন আসেন ধাইয়া
শিশু বলি দয়া নাহি তার ॥[১১৭]

তিনি মাকে আঘাত দেবার জন্যেই বলেন— "এ দুঃখে যমুনা হব পার।" কিন্তু কৃষ্ণ যশোদার গর্ভজাত সন্তান না হয়েও সন্তানাধিক। যাঁকে প্রতি মুহূর্তে যশোদা হারান সেই কৃষ্ণ তাঁকে ত্যাগ করে যাবেন, তিনি চিন্তাই করতে পাবেন না। তিনি ছুটে কৃষ্ণকে কোলে তুলে নেন—

যশোদা আসিয়া কাছে গোপালের মুখ মুছে
অপরাধ ক্ষমা কর মোরে ॥[১১৮]

কৃষ্ণকে কোলে ফিরে পেতে যশোদা সব কিছুই কবতে প্রস্তুত। তাই পুত্রের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করতেও তিনি দ্বিধা করেন না।

হিন্দী বৈষ্ণব কবি কৃষ্ণকে উদূখলে বন্ধনের ঘটনাটি অন্যভাবে ব্যবহার করেছেন। কৃষ্ণ অন্যের গৃহে গিয়ে মাখন, ননী, দই চুরি করে খান, আরো নানা রকম অত্যাচার করেন। অতিষ্ঠ হয়ে ব্রজগোপিনীরা যশোদার কাছে নালিশ করছেন। প্রথমে স্নেহান্ধ যশোদা অভিযোগ বিশ্বাসই করছেন না। তিনি গোপিনীদের বলেন, "গ্বালিনি! তোপেঁ ঐসো ক্যোঁ কহি আয়ো।"[১১৯] গোয়ালিনী, তোমরা এমন কথা কি করে বলতে এসেছ! কারণ, "মেরে কানহ কোঁ কছু অ ন লাগৈ গঙ্গা কোঁ সো পান্যোঁ।"[১২০] অর্থাৎ, আমার কানুকে কোনো দোষই স্পর্শ করেনি, সে গঙ্গা জলের মতো পবিত্র। তাছাড়া যশোদা গোয়ালিনীদের বলেন, পাঁচ বছরের ছেলে সে কি করে চুরি করবে? মা সাধারণতঃ সন্তানেব বয়স কম করে বলেন। বিশেষ করে ছেলেকে নিয়ে যেখানে ঝগড়া, সেখানে নিজের সন্তানকে শিশু প্রতিপন্ন করে দোষ স্খালনের চেষ্টার মধ্যে কবির বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি যে খুবই সজাগ, সেটি উপলব্ধি করা যায়। মাখন চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে যশোদা যখন গোয়ালিনীদের সঙ্গে ঝগড়া করেন, তখন তাঁকে গ্রামের একজন সাধারণ মা ছাড়া কিছুই ভাবা যায় না। তিনি স্নেহান্ধ হয়ে কোমর বেঁধে অন্যান্য গোপিনীর সঙ্গে ঝগড়া করছেন। তিনি বলছেন, তাঁর পুত্রকে গোপিনীরা মিথ্যা দোষারোপ করছেন। কৃষ্ণকে চুরির অপবাদ দেওয়ায় তিনি প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়েছেন। তাই তিনি বলেন,—

গোরস কহা দিখাবনি আঈ।
ইতনৌ লৈ খায়ো নন্দজু কে ঢোটা বদলি লৌহি মেরী মাঈ।[১২১]

—দুধ কোথায় দেখাতে এসেছ? নন্দপুত্র যতটা দুধ তোমাদের খেয়েছে ততটা দুধ নিয়ে যাও বাছারা। সুবদাসের পদে যশোদার পাড়াগাঁয়ের স্নেহান্ধ মাতৃরূপটি আরো বেশি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তিনি বলছেন, মাত্র পাঁচ বছরের তাঁর ছেলে, তাঁর পক্ষে চুরি করা কখনোই সম্ভব নয়। গোপিনীদের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি তিরস্কার করছেন :

মেরো গোপাল তনক সো, কহা করি জানৈ দধি কী চোরী

হাত নচাবত আৱতি গ্বারিনি, জীভ করৈ কিন থোরী।
কব সৌকৈ চাঢ় মাখন খায়ো, কব দধি-মটুকী ফোরী।
অঁগুরী করি কবহূঁ নহিঁ চাখত, ঘরহী ভরী কমোরী।[১২২]

—আমার ছোট্ট গোপাল দই চুরি করতে জানেই না। অথচ এই গোয়ালিনীদের দেখ, কিভাবে হাত নাচিয়ে জিভ চালাচ্ছে [ঝগড়া করছে]। কবে কৃষ্ণ তোমাদের শিকেয় চড়ে মাখন খেয়েছে, কবে দইয়ের হাঁড়ি ভেঙেছে? ঘরে হাঁড়ি ভর্তি দই রয়েছে তা কৃষ্ণ আঙুল দিয়ে চেখেও দেখে না।

কিন্তু নালিশ শুনে শুনে যশোদা ক্রমে উত্যক্ত হয়ে উঠলেন। নানাভাবে ছেলেকে বোঝান, "অনত সুত গোরস কোঁ কত জাত।"[১২৩] —বাছা, দুধের জন্যে অন্যত্র কোথায় যাও? ঘরেই তো কৃষ্ণা ও ধবলী গাইয়ের দুধের মাখন আছে, কেন চেয়ে নাও না! গোপিনীরা কটু কথা বলে যায়, ব্রজরাজ তাতে অসন্তুষ্ট হন। আবার কখনো বলেন—

ঔগুন ছাঁড়ি মানি কহ্যো মেরো।
চপল চোর ঘর-ঘর ডোলত হো কৌন বিৱাহ করৈ গো তেরো।[১২৪]

—আমার কথা শোন, এসব ছাড়; না হলে এমন চঞ্চল চোরকে কে বিয়ে করবে? কখনো বা কৃষ্ণকে ধমক দিয়ে বলেন— "কন্হৈয়া তু নাহিঁ মোহিঁ ডরাত।"[১২৫] কানাই, তুমি আমাকে ভয় পাও না? ঘরে এত মাখন, দই থাকতে তুমি অন্যের ঘরে চুরি করে বেড়াও? যশোদা কৃষ্ণকে এত বুঝিয়ে, ধমকেও সংশোধন করতে পারলেন না। একদিন চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়লে গোপিনীরা কৃষ্ণকে যশোদার কাছে নিয়ে এলেন, তখনো তাঁর মুখে মাখন লেগে আছে। কৃষ্ণ তাড়াতাড়ি মুখ মুছে বলছেন,—

মৈয়া মৈঁ নহিঁ মাখন খায়ো।
খ্যাল পরৈঁ য়ে সখা সবৈ মিলি, মেরৈঁ মুখ লপটায়ো।[১২৬]

—মা, আমি মাখন খাইনি। মনে পড়েছে, সব সখারা মিলে আমাকে হাস্যাস্পদ করার জন্যে মুখে মাখন লাগিয়ে দিয়েছে।

যশোদা ক্রুদ্ধ হয়ে ছড়ি হাতে এগিয়ে এসে কৃষ্ণকে ধরলেন। রাগে তাঁর শরীর কাঁপছে। "সাঁটিয়া লিএ হাথ নন্দরাণী, থরথরাত রিস গাত।"[১২৭] তিনি কৃষ্ণকে দড়ি দিয়ে উদূখলের সঙ্গে বাঁধতে লাগলেন। কৃষ্ণের শাস্তি ও কান্না দেখে গোপিনীরা তাঁর সব দোষ ভুলে গেলেন, তাঁরা মমতার বশীভূত হয়ে বারবার যশোদাকে অনুরোধ করতে লাগলেন, কৃষ্ণকে ছেড়ে দেবার জন্যে: "কমল নয়ন হরি হলকনি রোৱৈ বন্ধন ছোরি জসোৱৈ॥"[১২৮] —কমল নয়ন হরি হেঁচকি তুলে কাঁদছেন; যশোদা, বাঁধন খুলে দাও। কেউ বলছেন, "বজ্রহূ কে কঠিন হিয়ো তৈরো হৈ জসোৱৈ"।[১২৯] যশোদা গোপিনীদের কথায় ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। কারণ এই গোপিনীদের নালিশ শুনে শুনেই উত্যক্ত হয়ে তিনি আজ কৃষ্ণকে কঠিন শাস্তি দিতে বাধ্য হয়েছেন। পুত্রকে শাস্তি দিয়ে তিনি নিজে মর্মান্তিক যন্ত্রণা ভোগ করছেন। ফলে, স্নেহাতুরা জননীর সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ে গোপিনীদের উপর।

কহন লগী অব বঢ়ি— বঢ়ি বাত।

ঢোটা মেরো তুমহি বঁধায়ো, তুনকহি মাখন খাত ॥[১৩০]

—যশোদা গোপিনীদের বলছেন, এখন তোমরা বড় বড় কথা বলছ। অথচ তোমরাই তো সামান্য মাখন খাবার জন্যে আমার ছেলেটাকে বেঁধে রাখতে বাধ্য করেছ।

বন্দী অবস্থাতেই কৃষ্ণ অলৌকিক ক্ষমতাবলে গৃহাঙ্গনের দুই বৃহৎ বৃক্ষ উৎপাটিত করায় ভীত শঙ্কিত যশোদা পুত্রকে বন্ধনমুক্ত করে কোলে তুলে নিলেন।

"নৈন জল ভরি ঢারি অসুমতি, সুতহি-কণ্ঠ লগাই।"[১৩১]

—চোখের জলে যশোদা পুত্রকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

গৃহে ফিরে নন্দ সমস্ত ঘটনা শুনে যশোদার উপর ক্রুদ্ধ হলেন :

"বাঁধি রাখ্যিত সুতহি মেরে, দেত মহরিহিঁ গারি।"[১৩২]

—ছেলেকে আমার বেঁধে রেখেছিলে? বলে স্ত্রীকে তিরস্কার করলেন। আর কৃষ্ণ 'বাবা' বলে নন্দের কাছে ছুটে গেলেন।

"তাত কহি তব স্যাম দৌরে, নহব লিয়ৌ অঁকবারি।"[১৩৩]

যশোদার অনুশোচনার সীমা নেই। নিজেকেই তিনি দোষারোপ করছেন :

মোহন হোঁ তুম উপর বারী।
কণ্ঠ লগাই লিএ, মুখ চুমতি, সুন্দর স্যাম বিহারী।
কাহে কোঁ উখল সোঁ বাঁধো, কৈসী মৈঁ মহতারী ॥[১৩৪]

—মোহনকে বুকে জড়িয়ে মুখ চুম্বন করে যশোদা বলছেন— মোহন, আমি তোমার বলিহারি যাই, শ্যামসুন্দর বিহারী, আমি কি রকম মা যে তোমাকে উদুখলে বেঁধে রেখেছিলাম।

বাসুদেব ঘোষ বোধ হয় একমাত্র বাঙালী পদকর্তা, যিনি মাখন চুরির প্রসঙ্গ নিয়ে কয়েকটি পদ রচনা করেছেন। যেমন, গোপিনীরা যমুনায় জল আনতে যাবার অবকাশে কৃষ্ণ তাদের ঘরে ঢুকে চুরি করে ননী খেয়ে নিয়েছেন। গোপিনীরা বিশেষ করে কুটিলা, যশোদার কাছে গিয়ে কৃষ্ণ সম্পর্কে নানা কটূক্তি করে এলেন। যশোদা ক্রুদ্ধ হয়ে—

একথা শুনিয়া রাণীর ক্রোধ উপজিল।
কৃষ্ণের যুগল করে বন্ধন করিল ॥
কদম্বের ডালে রাণী করিল বন্ধন।[১৩৫]
প্রহার করেন কৃষ্ণে করেন ক্রন্দন ॥

কৃষ্ণ ননী মাখন চুরি করার অপরাধে হিন্দী ও বাংলা কবিরা সকলেই কৃষ্ণকে উদুখলে বেঁধেছেন। কিন্তু বাসু ঘোষ একমাত্র কবি যাঁর পদে, কদম্বের ডালের সঙ্গে কৃষ্ণকে বাঁধা হয়েছে। তাছাড়া, ক্রন্দনরত কৃষ্ণের সঙ্গে যশোদার কথোপকথনও লক্ষণীয় :

তোমার চরণে ধরি বলি নন্দরাণী।
চুরী করি আর আমি খাব না নবনী ॥
বন্ধনেতে প্রাণ যায় বলেন কানাই।
যশোদা প্রহার করে কথা শুনে নাই ॥[১৩৬]

তখন কৃষ্ণ যশোদাকে নিরস্ত করার জন্যে তাঁর দুর্বল স্থানে আঘাত দিয়ে বলেছেন যে, তিনি যমুনা পার হয়ে চলে যাবেন, অন্যের সন্তান হয়ে অন্য রমণীকে 'মা' বলে ডাকবেন। সে অন্ততঃ তাঁকে ভালো করে ননী-মাখন খেতে দেবে। তাছাড়া কৃষ্ণ যে যশোদার যথার্থ সন্তান নন, তা যশোদার নিষ্ঠুর আচরণেই বোঝা যায়। নিজের মা কখনই সন্তানকে এমন নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করতে পারতেন না। কৃষ্ণের এই কথায় যশোদা স্থির থাকতে পারেন না। তিনি কৃষ্ণকে মুক্তি দেন এবং তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকে। তিনি বলেন— "দুকর পুরিয়া তোরে দিব রে নবনী।" কৃষ্ণ যে তাঁর অনেক তপস্যার ধন। তাই কৃষ্ণকে শাস্তি দিয়ে আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হচ্ছেন :

অনেক তপের ফলে তোমা ধনে পেয়েছি কোলে
আজি মোর কুমতি হইল।[১৩৭]

সন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষায় যশোদা কি কঠিন তপস্যা করেছেন সে কথা তিনি স্মরণ করে বলেন :

অনেক তপের ফলে পেয়েছি তোমারে।
কাত্যায়নী পুজেছিলাম সাগরের ধারে॥
গ্রীষ্মকালে চারিদিকে জ্বালিয়া আগুনি।
গায়ের মাংস কাটি দিতাম করি খানি খানি॥[১৩৮]

কিন্তু অভিমানে রুষ্ট হয়ে কৃষ্ণ যশোদার কোলে কিছুতেই যাবেন না। যশোদা কৃষ্ণকে নানাভাবে বোঝাচ্ছেন :

নয়নের তারা তুমি তোমারে হারায়ে আমি
গাভি যেন বাছা হারাইল।[১৩৯]

যশোদা কৃষ্ণকে শান্ত করাব চেষ্টা করেন। আর সেই সঙ্গে নিজেকে সহস্রবার ধিক্কার দেন। শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণ যশোদার কোলে এলেন .

অনেক যতনে রাণী কৃষ্ণে বুঝাইল।
গোলোকের নাথ কৃষ্ণ কোলেতে আইল॥[১৪০]

আর পুত্র কোলে পেয়ে যশোদারও চিত্ত শান্ত হল। পুরনো প্রসঙ্গটি একটু নতুন ভাবে সাজিয়েছেন বাসুদেব।

হিন্দী কবিরা এই প্রসঙ্গটি যেভাবে বিবৃত করেছেন, তার একটু বিস্তৃত বিবরণ উপরে দেওয়া হয়েছে। একটি ঘটনার সূত্রপাত এবং পরিণতি এখানে যেমন করে দেখানো হয়েছে, অন্যত্র তা করা হয়নি। এখানে কৃষ্ণ, যশোদা, বলরাম ও গোপিনীরা সকলেই নিজ নিজ ভূমিকায় যথোপযুক্ত অংশ গ্রহণ করেছেন। সব মিলিয়ে একটি সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যায়। এক দুরন্ত পুত্রের স্নেহাসক্ত গ্রাম্য মায়ের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন যশোদা। তিনি পুত্রের দুরন্তপনায় উত্যক্ত। অন্যের নালিশে ক্ষিপ্ত, পুত্রকে শাস্তি দেবার মধ্যে যেন অভিযোগকারিণীদের সাজা দেবার এক কুটিল বাসনা গুপ্ত হয়ে আছে। নিজে তো অনুতপ্ত হনই। এবং শাস্তির পর ছেলেকে শতগুণ বেশি আদর করেন।

বাসু ঘোষের এই প্রসঙ্গটি বর্ণনায় এমন সামগ্রিক ব্যাপ্তি নেই। একটি সুন্দর লিরিকধর্মী ছবিতেই তার সমাপ্তি।

পুত্রের জন্যে অজানা আশঙ্কা সুরদাসের পদে প্রায়ই পাওয়া যায়। যেমন, একদিন কৃষ্ণ হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে চেঁচিয়ে জেগে উঠলেন ; তাঁর চিৎকারে নন্দ যশোদারও ঘুম ভেঙ্গে গেল। কৃষ্ণ বলছেন, তাঁকে যেন কেউ কালীদহে ফেলে দিচ্ছে, এই রকম স্বপ্ন দেখেছেন। যশোদা শুনে বলছেন, গোরু স্নান করাতে যমুনার ঘাটে যায়, বাছা আমার ভয় পেয়েছে। তিনি তাড়াতাড়ি কৃষ্ণকে কোলে তুলে নিয়ে বললেন— "বৃন্দাবনমে ফিরত জহাঁ—তহাঁ কিহি কারণ তু জাই।"[১৪১] —বৃন্দাবনে এখানে-সেখানে কেন যে তুমি ঘুরে বেড়াও! পুত্রের স্বপ্নের কথায় যশোদা ভীত ও চিন্তিত—"সপনৌ সুনি জননী অকুলানী।"[১৪২] তখন নন্দ ও যশোদা চিন্তিত হয়ে নিজেদের মাঝখানে পুত্রকে শোয়ালেন। কৃষ্ণ বাবা ও মায়ের মাঝখানে শুয়ে শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।[১৪৩]

ঘুমের মধ্যে শিশুর ভয় পাওয়া, কোনো দুঃস্বপ্ন দেখায় মাতাপিতার আতঙ্ক, ইত্যাদি সাধারণ ঘটনা। সুরদাসের বৈশিষ্ট্য অতি সামান্যের মধ্যেই তিনি বাৎসল্যের যথার্থ পরিচয় তুলে ধরেন।

আর যেদিন সত্যি কৃষ্ণ কালীয়-দমনের জন্যে জলে নামলেন, সেই সংবাদ পেয়ে যশোদা ও নন্দ ছুটে এলেন কালীদহের তীরে এবং সমস্ত দৃশ্য দেখে যশোদা মাটিতে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। রসখান পুত্রের জন্যে মাতৃ-হৃদয়ের ভয় ও যন্ত্রণাকে অপূর্ব কৌশলে প্রকাশ করেছেন। কৃষ্ণ কালীয়কে দমনের জন্যে জলে নেমেছেন, সাপ তাঁকে জড়িয়ে ধরেছে। ব্রজের সবাই তীরে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখছে, অথচ কেউ কৃষ্ণকে সাহায্য করতে এগিয়ে যাচ্ছে না দেখে যশোদা ব্যাকুল হয়ে সখীকে বলছেন—

> আপনো সো ঢোটা সবহী কে সদা চাহেঁ,
> দোউ প্রাণী সবহী কে কাজ নিত ধাবহীঁ॥
> তে তৌ রসখানি তব দূরেতেঁ তমাসো দেখে,
> তরনি তনূজা কে নিকট নহিঁ আবহীঁ॥
> আঁদিন পরে তে অনহিতু সব ভয়ে লোক,
> রহে তো অজোগ দেখি লোচন দুরাবহীঁ॥
> কহা কহোঁ আলী খ্যালী দেত সব টালী হায়
> মেরে বনমালী কোন কালীতে ছুড়াবহীঁ॥[১৪৪]

—যশোদা নিজের সখীকে কালীয়-দমনের বর্ণনা দিয়ে বলছেন— হে সখি, আমরা [নন্দ ও যশোদা] দু'জনে সব গোপ বালকদের নিজের ছেলের মতো মনে করি এবং দু'জনে প্রতিদিন অন্যের প্রয়োজনে ছুটে যাই ; অর্থাৎ সর্বদাই অন্যের সহায়তায় তৎপর থাকি। অথচ তারাই আজ দূর থেকে তামাশা দেখছে। কেউ যমুনার কাছে পর্যন্ত যাচ্ছে না। আজ দুর্দিন তাই সবাই মমতাহীন। খারাপ সময় বলেই সবাই মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। কি বলব, সবাই তামাশা দেখছে, নিজেদের গা বাঁচাচ্ছে, কেউ আমার বনমালীকে কালীয় নাগের কাছ থেকে ছাড়িয়ে আনছে না।

শেষ পর্যন্ত কালীয়কে দমন করে কৃষ্ণ ফিরে এলেন। নন্দ ও যশোদা তাঁকে বিপদ-মুক্ত দেখে উৎফুল্ল হলেন।

বাংলার বৈষ্ণব কবিরা কালীয়-দমনকে কেন্দ্র করে এমন বাৎসল্যের পদ রচনা করেন নি। তবে, প্রসঙ্গটি বাঙালী বৈষ্ণব কবিদেরও উৎসাহিত করেছে। কৃষ্ণ কালীয়দমন করতে জলে নেমেছেন, এই ভয়াবহ সংবাদে সমস্ত ব্রজভূমি শোকাকুল :

ব্রজবাসীগণ কান্দে ধেনু বৎস শিশু।
কোকিল ময়ূর কান্দে যত মৃগ পশু ॥[১৪৫]

আর, যশোদা এই ভয়ংকর সংবাদে বারবার মূর্ছিত হয়ে পড়ছেন। "যশোদা রোহিণী দেহ ধরণে না যায়।"[১৪৬] বলরামদাস যশোদার যন্ত্রণার সঙ্গে পিতা নন্দের বেদনার কথাও ভোলেননি। পুত্রের শোচনীয় ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে স্বয়ং মৃত্যু বরণ করতেও ইচ্ছুক। তাই, "ধাইয়া চলয়ে বিষ করিতে ভক্ষণ ॥"[১৪৭]

এখানে ব্রজবাসীদের হৃদয়হীন আচরণের কোনো অভিযোগ নেই।

শিশু কৃষ্ণের চাঁদের জন্য বায়না হিন্দী ও বাংলা উভয় ভাষার কবিরাই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু বাঙালী বৈষ্ণব কবি মূলতঃ রাধাকৃষ্ণের যুগল-মূর্তির উপাসক। তাই, শেষ পর্যন্ত রাধাকে এনে ক্রন্দনরত শিশু-কৃষ্ণকে শান্ত করতে হয়েছে। কিন্তু হিন্দী ভাষার বৈষ্ণব কবিতায় যশোদাই স্বয়ং তাঁর অপত্য স্নেহে নানা ভাবে বুঝিয়ে কৃষ্ণের কান্না থামিয়েছেন।

কৃষ্ণের একটা কিছু নিয়ে বায়না করা চাই। হঠাৎ একদিন দিনের বেলাতেই চাঁদ চেয়ে বসলেন :

মা মোরে আনি দেহ শশী ॥[১৪৮]

যশোদা শুনে বলেন,—

রাণী কহে বাণী, শুন নীলমণি,
আমি চাঁদ পাব কোথা ॥[১৪৯] —শেখর রায়

কিন্তু কৃষ্ণ কিছুতেই তাঁর বায়না ছাড়েন না,—

এ বোল বলিয়া, ধূলাতে পড়িয়া,
লোটায় যাদব রায়।[১৫০] —শেখর রায়

কৃষ্ণের ক্রন্দনে অন্যান্য ব্রজ-নারীরা স্নেহে বেদনা বোধ করেন। তাঁরা যশোদাকে এসে বলেন :

কেন গো কান্দিছে নীলমণি।
আমরা পরের নারী, ক্রন্দন সহিতে নারি
কোন প্রাণে সহিছ গো তুমি ॥[১৫১] —যদুনাথ

নিরুপায় যশোদা বলেন,—

অবোধ শিশুর মতি, দিনে চাঁদ পাব কতি,
এ বড় বিষম হইল দায়।[১৫২] —যদুনাথ

কিন্তু শিশু-কৃষ্ণ কোনো কথাই বোঝেন না—

চাঁদ বলি ভ্রমে গড়ি যায় ॥[১৫৩] —যদুনাথ

যশোদা কৃষ্ণকে শান্ত করার জন্যে কত বোঝাচ্ছেন। দিনের শেষে রাত্রি হবে, চাঁদ যখন ধীরে ধীরে উঠে আসবে তখন তাঁকে পথেই ফাঁদ পেতে যশোদা ধরে আনবেন। কৃষ্ণের ক্রন্দন যশোদাকে কষ্ট দিচ্ছে—

চাঁদ মোর চাঁদের লাগিয়া কাঁদে।[১৫৪] —ঐ

অকস্মাৎ সেখানে রাধা এসে উপস্থিত হন। রাধার অপূর্ব সুন্দর মুখের দিকে চেয়ে যশোদা রাধাকে মুখ ঢেকে রাখতে বলেন, কারণ—

তোমার মুখের শ্রেণী, শরতের চন্দ্র জিনি,
তাহা দেখি যাদুয়া মাগিবে ॥[১৫৫] —ঐ

আশ্চর্যের বিষয়, রাধাকে দেখে কৃষ্ণের এত আবদার ও কান্না সব থেমে গেছে। তিনি বিস্ময়মুগ্ধ হয়ে রাধার দিকে চেয়ে আছেন। যশোদা পুত্রের কান্না থামতে দেখে রাধাকে অনুরোধ করেন কৃষ্ণকে নিজের কাছে ডেকে নিতে।

রাণী কহে রাধিকায় গোপাল তোমা পানে চায়,
ডাক দিয়া লহ নিজ কাছে।[১৫৬] —ঐ

কৃষ্ণ চাঁদের জন্যে বায়না ভুলেছেন। কান্না ভুলে রাধা ও অন্যান্য গোপ বালক-বালিকাদের সঙ্গে খেলছেন দেখে, যশোদা প্রসন্ন মনে নিজের কাজে গেলেন।

শিশু চৈতন্যেরও চাঁদের জন্য বায়না ছিল। যশোদার মতো পুত্র স্নেহাতুরা শচীমাকেও নিমাইকে ভোলাতে দেখি,—

পূর্ণিমা রজনী চাঁদ গগনে উদয়।
চাঁদ হেরি গোরাচাঁদের হরিষ হৃদয় ॥
চাঁদ দেমা বলি শিশু কাঁদে উভরায়।
হাত তুলি শচী ডাকে আয় চাঁদ আয় ॥
না আসে নিঠুর চাঁদ নিমাই ব্যাকুল।
কাঁদিয়া ধূলায় পড়ে হাতে ছিঁড়ে চুল ॥[১৫৭]

শেষ পর্যন্ত বাসু ঘোষ নিমাই যে ভাবী চৈতন্য সেই আভাস দিয়ে পদটি শেষ করেছেন :

রাধাকৃষ্ণ চিত্র এক মিশ্রগৃহে ছিল।
পুত্র শান্তাইতে শচী তাহা হাতে দিল ॥
চিত্র পাঞা গোরাচাঁদের মনে বড় সুখ।
বাসু কহে পটে পহু হের নিজ মুখ ॥[১৫৮]

হিন্দী বৈষ্ণব কবিরা কৃষ্ণের চাঁদ চাওয়া ও যশোদার তাঁকে নানাভাবে ভোলানোর বিষয় নিয়ে বহু পদ রচনা করেছেন। সুরদাস এঁদের মধ্যে সর্বপ্রধান। তিনি এই প্রসঙ্গটি অবলম্বন করে যশোদার মাতৃ-হৃদয়কে উদ্ভাসিত করে তুলেছেন।

একদিন যশোদা আঙিনায় কৃষ্ণকে চাঁদ দেখাচ্ছেন,— "ঠাঢ়ী অজির জসোদা অপনৈ', হরিহিঁ লিএ চন্দা দিখরাবত।"[১৫৯] আর তারপরই কৃষ্ণ বায়না ধরলেন, তাঁর চাঁদ চাই। যশোদা কৃষ্ণের কান্না দেখে নিজেকেই দোষারোপ করছেন,— "মৈঁ হী ভুলি চন্দ

দিখরায়ো"[১৬০]— আমিই ভুলে ওকে চাঁদ দেখিয়েছি। প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণের কান্না যশোদা কোন মতেই সহ্য করতে পারছেন না। তাই নানা কথা বলে ভোলাতে চাইছেন। কিন্তু কৃষ্ণ কিছুতেই ভুলছেন না। এবার নতুন আবদার— "তাহি কহত মৈঁ খৈহোঁ।"[১৬১] —কৃষ্ণ বলছেন, আমি চাদ খাব। তখন অনন্যোপায় যশোদা পাত্র ভরে জল এনে বললেন— "আউ চন্দ তোহি লাল বুলাবৈ।"[১৬২] —বাছা এসো চাঁদ তোমাকে ডাকছে। তাছাড়া তিনি কৃষ্ণকে বোঝাচ্ছেন, দেখ, চাঁদ খাবার জিনিস নয়, চাঁদ তো "খিলৌনা সবকৌ।" অর্থাৎ, সবার খেলনা। কৃষ্ণ জলের মধ্যে আঙুল ডুবিয়ে চাঁদ ধরার চেষ্টা করছেন, কিন্তু কিছুক্ষণ পর হতাশ হয়ে আবার কান্না জুড়েছেন :

মৈয়া, মৈঁ তৌ চন্দ-খিলৌনা লৈহোঁ।
জৈহোঁ লোটি ধরনি পর অবহীঁ, তেরী গোদন ঐ হোঁ॥
সুরভী কৌ পয় পান ন করি হোঁ বেণী সিরন গুহৈ হোঁ।
হ্বৈ হোঁ পুত নন্দ বাবা কৌ, তেরো সুত ন কহে হোঁ॥[১৬৩]

অর্থাৎ, আমি চাঁদ-খেলনা নেব। যদি না দাও, আমি এখনই মাটিতে গড়াগড়ি যাব। তোমার কোলে যাব না, সুরভির দুধ খাব না, বেণী বাঁধব না এবং নন্দ বাবার ছেলে হব, তোমার ছেলে হব না।

শিশু-কৃষ্ণ মাকে কিভাবে সবদিক থেকে জব্দ করা যায় তা জানেন। এমনকি, শেষ অস্ত্রটি তিনি মায়ের উপর প্রয়োগ করেছেন, তিনি নন্দের পুত্র হবেন, মা যশোদার নয়। তখন যশোদা কৃষ্ণকে শান্ত করার জন্য একটি নতুন উপায় উদ্ভব করলেন :

আগৈঁ আউ, বাত সুনি মেরী, বলদেবহিঁ ন জনৈ হোঁ।
হঁসি সমুঝাবতি, কহতি জসোমতি, নঈ দুলহিয়া দৈহোঁ॥
তেরী সৌঁ, মেরী সুনি মৈয়া, অবহিঁ বিয়াহন জে হোঁ।[১৬৪]

—কাছে এসো, আমার কথা শোন, বলদেবকে বলো না। হেসে যশোমতি বলছেন, তোমার জন্যে নতুন বৌ আনব। কৃষ্ণ একথা শুনে বললেন, তোমার শপথ, এখনই আমি বিয়ে করতে যাব। অপূর্ব বাস্তবাভিত্তিক ছবিটি। শিশুমাত্রেই খুশি হয় যখন বোঝে শুধুমাত্র তাকেই দেওয়া হবে একটি নতুন বস্তু, অন্যকে নয়। স্বভাবতঃই কৃষ্ণও খুশি হন যখন শোনেন তাঁর বিয়ে হবে এবং বলদেবকে সেকথা বলা হবে না। তিনি তখনই বিয়ে করতে যেতে চান। যশোদার তখন নতুন সমস্যা। তিনি আবার পাত্রে জল নিয়ে কৃষ্ণের কাছে এনে রাখলেন। বললেন "লৈ লৈ মোহন চন্দ লৈ।" যে চাঁদের জন্যে তুমি এত কাঁদছ তাঁকে আকাশে একটি পাখি পাঠিয়ে ধরে এনেছি : গগন-মণ্ডল তৈঁ গহি আন্যো হৈ, পঞ্ছী এক পঠৈ।"[১৬৫] বাংলার বৈষ্ণব কবি কিন্তু চাঁদ ধরার জন্যে ফাঁদের কথা চিন্তা করেছেন :

আকাশের পথে পাতিয়া ফাঁদ।
ধরিব আমরা গগন চাঁদ॥[১৬৬] —যদুনাথ

ফাঁদ পেতে চাঁদ ধরার মধ্যে বৈশিষ্ট্য এই যে চাঁদকে সজীব পদার্থ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাছাড়া "চাঁদ মোর চাঁদের লাগিয়া কাঁদে", এই উক্তির মধ্যে দেখানো হয়েছে যে চাঁদ ও কৃষ্ণের রূপ, গুণ ও মাধুর্য সমপর্যায়ের।

কিন্তু হিন্দী বৈষ্ণব পদে সুরদাস পাখি দিয়েই চাঁদকে ধরে এনেছেন। যশোদা কৃষ্ণকে বলছেন হাত দিয়ে তুমি এবার চাঁদকে ধর। কৃষ্ণ কিন্তু কিছুতেই চাঁদকে ধরতে পারছেন না তখন যশোদা তাঁকে বোঝাচ্ছেন, "তুব মুখ দেখি ডরত সসি ভারী।"[১৬৭] তোমার মুখ দেখে চাঁদ খুব ভয় পেয়েছে। তাই তুমি জলে হাত দিলেই সে ভয়ে পাতালে প্রবেশ করছে। চাঁদ তাঁকে দেখে ভয় পাচ্ছে, যশোদাব মুখে একথা শুনে কৃষ্ণ প্রসন্ন হলেন এবং শান্ত হলেন।

বাংলা বৈষ্ণব পদে গোচরণ নিয়ে বহু উৎকৃষ্ট পদ রচিত হযেছে। বাঙালী বৈষ্ণব কবি, যিনি বাৎসল্যরসের একটি-দুটি পদও বচনা করেছেন, তিনিও গোচাবণের পদ নিশ্চয়ই লিখেছেন। আর সেই জন্যই বৈষ্ণব পদাবলীতে বাৎসলোব পদে গোষ্ঠের পদই সর্বাধিক। কিন্তু গো-দোহনেব পদ একটিও নেই। হিন্দী কবি গো-দোহন সম্পর্কে অনেক সুন্দর পদ রচনা করেছেন। কৃষ্ণ নন্দের কাছে আবদার করছেন— "মৈঁ দুহিহোঁ মোহিঁ দুহন সিখবহু।"[১৬৮] আমি দুধ দুইব, আমাকে দুধ দুইতে শিখিয়ে দাও। নন্দ পুত্রকে হতাশ করতে চান না, যদিও তিনি জানেন একাজ শিশুর পক্ষে অসম্ভব। আর কৃষ্ণ নন্দের অনুমতি পেয়ে ছুটে আসেন যশোদার কাছে :

তনক কনক কী দোহনী দৈ দৈ রী মৈয়া।
তাত দুহন সিখৱনি কহ্যো মোহি ধৌরী গৈয়াঁ॥[১৬৯]

—মা, ছোট সোনার দোহন পাত্রটি দাও; বাবা আজ আমাকে ধবলী গোরু দুইতে শেখাবেন বলেছেন। তারপর দুধের পাত্রটি নিয়ে দুধ দুইতে বসলেন, কিন্তু ঠিকমতো দুইতে পারছেন না, দুধের ধারা এদিক ওদিক পাত্রের বাইরে পড়ে যাচ্ছে।

কৃষ্ণের অক্ষমতা দেখে ব্রজরাজ সস্নেহে হাসছেন,

ধার অটপটী দেখি কেঁ ব্রজপতি হঁসি দীনোঁ॥[১৭০]

আর, যশোদা কৃষ্ণের কাণ্ড দেখে হাসতে হাসতে তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেন—

আট বরষকে কুঁবর কনুহৈয়া, ইতনী বুদ্ধি কহাঁ তৈঁ পায়ো।

—আট বছরের বাছা কানাই, এত বুদ্ধি তুমি কোথা থেকে পেয়েছ?[১৭১]

কৃষ্ণ গোচারণে যেতে চাইছেন, যশোদা প্রথম একটু আপত্তি করছেন। কিন্তু বলভদ্র যশোদাকে আশ্বাস দেওয়াতে তিনি কৃষ্ণকে গোচারণে যেতে দিলেন। তবু কৃষ্ণের গোষ্ঠযাত্রা যশোদার স্বাভাবিক দুশ্চিন্তার কারণ হল। সন্তান প্রথম যখন মার সান্নিধ্য থেকে দূরে যায়, মা'র পক্ষে চিন্তা হওয়া তো স্বাভাবিক। কিন্তু হিন্দী পদে যশোদা কৃষ্ণকে গোষ্ঠে পাঠাতে উন্মাদিনী হন না, ঘনঘন মূর্ছিতও হয়ে পড়েন না। কৃষ্ণের গোষ্ঠ যাত্রায় তাঁর চিন্তার সংগে আনন্দ ও গর্ববোধ রয়েছে। কেননা, কৃষ্ণ কুলধর্ম পালন করবার উদ্দেশ্যেই গোষ্ঠে যাচ্ছেন। এটা বংশের কর্তব্য পালনের প্রথম পদক্ষেপ।

কিন্তু বাংলার বৈষ্ণব কবি যশোদাকে সৃষ্টি করেছেন সম্পূর্ণ 'বাঙালী মা' করে।

এক মুহূর্তের জন্যে তিনি কৃষ্ণকে কাছ-ছাড়া করতে পারেন না। তাই কৃষ্ণকে গোষ্ঠে যেতে দিতে যশোদা ব্যাকুল হন :

বলরাম, তুমি মোর গোপাল লৈয়া যাইছ

... ...

এ হেন দুধের বাছা বনেতে বিদায় দিয়া
কেমনে ধরিবে প্রাণ মায়।[১৭২]

তাই কৃষ্ণকে গোষ্ঠে যেতে দিতে যশোদার দু চোখে ধারা বইছে, কখনও বা তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়ছেন। কখনো তিনি স্পষ্টই পুত্রকে গোচারণে পাঠাতে অস্বীকার করেন :

রাণী বলে কি বলিলি না পাঠাইব ধনমালী
তোমরা সবাই যাও বনে।
বড় হইলে লালনে লইয়ে যেও কাননে
পাঠাইব তোমা সভা সনে॥[১৭৩]

মা'র কাছে সন্তান চিরদিনই শিশুমাত্র, 'দুধের বাছা।' এমন ছেলেকে কি গোষ্ঠে পাঠানো যায় ?

বসন ধরিয়া হাতে ফিরে গোপাল সাথে সাথে
দণ্ডে দণ্ডে দশবার খায়।[১৭৪]

তাছাড়া যশোদার তো কৃষ্ণকে নিয়ে আরো অনেক ভয়।

"দারুণ কংসের চর তারা ফিরে নিরন্তর"।[১৭৫]

তাই, কৃষ্ণের মত দামাল ছেলেকে গোষ্ঠে পাঠাতে তাঁর এত ভয়। তিনি স্পষ্টই কৃষ্ণের সখাদের বলেছেন,

দামালিয়া যাদু মোর না মানে আপন পর
ভালমন্দ নাহিক গেযান।[১৭৬]

কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং গোষ্ঠে যাবার জন্যে ব্যস্ত। মায়ের কাছে আবদার করে বলেন—

গোঠে আমি যাব মাগো গোঠে আমি যাব।
শ্রীদাম সুদাম সঙ্গে বাছুরি চরাব।[১৭৭]

কাজেই যশোদা কৃষ্ণকে গোচারণে পাঠাবার জন্যে সাজাতে বসেন। কিন্তু কিছুতেই তিনি কৃষ্ণকে গোষ্ঠ-সজ্জায় সজ্জিত করতে পারছেন না।

বান্ধিতে বিনোদ চূড়া নিরখিতে কেশ।
আঁখিযুগ ঝর ঝর না হইল বেশ॥[১৭৮] —ঘনরামদাস

শেষ পর্যন্ত যশোদা মনস্থির করে কৃষ্ণকে সাজিয়ে দিলেন :

জানিল গোঠরে আজি যাবে নীলমণি।
মনের সাধে করে বেশ যশোদা রোহিনী॥
কপালে রচিঞা দিল চন্দনের রেখা।
চূড়াটি বান্ধিঞা দিল ময়ূরের পাখা॥[১৭৯]

যশোদা কৃষ্ণকে গোষ্ঠ সজ্জায় সজ্জিত করেন, কিন্তু হাসিমুখে পুত্রকে যেতে দিতে পারেন না—

নারিলুঁ বিদায় দিতে কহে ঘন ঘন ॥

স্তন-ক্ষীরে ভিজিল রাণীর সব বাস ।[১৮০] —ঘনরামদাস

অবশেষে যশোদা কৃষ্ণের দায়িত্বভার বলরামকে সমর্পণ করলেন।

হের আরে বলরাম হাত দে মায়ের মাথে।

দেহ রাখিয়া প্রাণ দিলাম তোমার হাতে ॥[১৮১]

বারবার কৃষ্ণেব প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্যে অনুরোধ করে বললেন—

এই নিবেদন তোরে, না যাবে কালিন্দী তীরে

সাবধান মোর নীলমণি ॥[১৮২]

তিনি কৃষ্ণের হাত নিজের মাথায় রেখে শপথ করিয়ে নিলেন। এবং সাবধান করে বললেন—

আমার শপতি লাগে না ধাইও ধেনুর আগে,

পরাণেব পরাণ নীলমণি—

নিকটে রাখিহ ধেনু, পুরিহ মোহন বেনু,

ঘবে বসি আমি যেন শুনি ।[১৮৩] —যাদবেন্দ্র

কিন্তু এতেও যশোদা শান্তি পান না। তিনি কৃষ্ণের সমস্ত দেহে রক্ষামন্ত্র পড়ে দেন—

অক্ষয-বিজয-তনু হয় যেন রাম কানু

এমতি ঝাড়িয়া দেহ গায় ।[১৮৪]

যশোদা পুত্রের সঙ্গে নানা খাদ্য দিয়ে দেন। এবং বলরামকে বারংবার বলে দেন—

কানুব ধরাতে বাঁধি।

ক্ষীর ছেনা ননী চাঁছি ॥

যাদুরে করিয়া কোলে।

আপনি খাইবে বলে ॥

দুখিনী অভাগী আমি।

কেবল ভরসা তুমি ॥[১৮৫]

গোচারণে পাঠিয়ে মা যশোদার সারাদিন দুশ্চিন্তায় কাটে। সন্ধ্যায় সেই চিন্তার অবসান হয়। দূর থেকে কৃষ্ণের বাঁশী শুনে তিনি ছুটে যান—

ধাইয়া আইল নন্দরাণী কেশ নাহি ঢাকে।

বাছার মুখের বেণু তোরে কেন ডাকে ॥[১৮৬] —ঘনরামদাস

বলরামদাস শুধু বাৎসল্যের নয়, প্রতিবাৎসল্যের ছবিও নিপুণ ভাবে এঁকেছেন। সমস্ত দিন বন্ধুদের সঙ্গে নতুন অভিজ্ঞতার আনন্দে কেটে গিয়েছে, কিন্তু সন্ধ্যা হবার সঙ্গে সঙ্গে শিশু মায়ের কোলে আশ্রয় পেতে চায়। এই অনুভূতিটি কবি প্রকাশ করেছেন :

আজ মাঠে আমাদের বিলম্ব দেখিয়া।
হেন বুঝি কান্দে মা পথ পানে চাঞা॥
বেলি অবসান হৈল চল যাই ঘরে।
মায়ে না দেখিয়া প্রাণ কেমন যেন করে॥[১৮৭]

কৃষ্ণ যখন সখাদের কাছে বলেন, "মায়ে না দেখিয়া প্রাণ কেমন যেন করে" তখন মায়ের জন্যে কৃষ্ণের অন্তরের তীব্র ব্যাকুলতাই প্রকাশিত হয়।

গোচারণের পর গৃহে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। যশোদা এতক্ষণ ব্যগ্র হয়ে কৃষ্ণের ফেরার পথ চেয়ে ছিলেন। তাই কৃষ্ণ ফিরে আসতেই তিনি বলেন—

নন্দদুলাল বাছা যশোদা দুলাল।
এতক্ষণ মাঠে থাকে কাহার ছাওয়াল॥[১৮৮]

যশোদা পুত্রকে কোলে বসিয়ে বলেন, নবতৃণাঙ্কুর রাঙা চরণে বিঁধে না জানি কত কষ্ট পেয়েছেন পুত্র। সমস্ত দিনের রৌদ্রতাপে তাঁর মুখ মলিন হয়েছে, তবু দিনের শেষে পুত্রকে কোলে পেয়ে মা'র চিন্তা দূর হয়, তিনি এখন আনন্দিত :

সন্ধ্যা সময় গৃহে আওল যদুপতি
যশোমতি আনন্দ চীত।[১৮৯]

যশোদা ফিরতে দেরী হবার কারণ জানতে চান।

এতক্ষণ কোথা হিয়া দিয়া ব্যথা
গেছিলে কোন বা বনে।
এখানে এ ধড় গৃহ মাঝে ছিল
পরাণ তোমার সনে॥
আঁখির তারাটি গেছিল খসিয়া
এবে আঁখি আসি বসি।[১৯০]

যখন জানতে পারলেন হারিয়ে যাওয়া গোরু খোঁজার জন্যে কৃষ্ণ আজ সমস্ত দিন বনে বনে ঘুরে শ্রান্ত হয়েছেন তখন যশোদা পুত্রের কষ্টের কথা চিন্তা করে স্তব্ধ হয়ে যান।

কাষ্ঠের পুতলি রয়॥[১৯১]

নন্দের উপর যশোদা ক্রুদ্ধ হন, কারণ তিনিই কৃষ্ণকে গোচারণে পাঠিয়েছেন। আর কখনো কৃষ্ণকে গোচারণে যেতে দেবেন না যশোদা।

তোমারে লইয়া আন দেশে যাব
না রব নন্দের ঘরে।[১৯২]

তিনি নন্দকে গিয়ে বলেন—

চোরা ধেনু সনে বহু দুখ মেনে
পাইল যাদব মোর।
শুনিতে শুনিতে পরাণ বিদরে
দুখের নাহিক ওর॥[১৯৩]

সন্তান-অন্ত প্রাণ যশোদা কৃষ্ণের কষ্টের কথা শুনে নিজেই কষ্ট পেতে থাকেন। পৃথিবীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সব কিছুই তুচ্ছ ; সন্তানের কল্যাণ কামনায় যশোদা নন্দের ঘর পরিত্যাগ করতেও প্রস্তুত। গোষ্ঠের পদাবলীর মধ্যে বাঙালীর সন্তানবৎসল মাতৃ-হৃদয়ের পূর্ণতর পরিচয় পাওয়া যায়।

এরপরই আমরা দেখি পরিশ্রান্ত পুত্রদের সামনে নানা খাদ্য সাজিয়ে দিয়েছেন যশোদা। ক্ষুধাক্লিষ্ট সন্তানের মুখে খাদ্য দেওয়ার মধ্যে মাতৃহৃদয়ের একটি বিশেষ আনন্দ আছে :

ক্ষীর ননী ছেনা সর, আনিয়া সে ঘরে ঘর,
আগে দেই রামের বদনে।
পাছে কানাইয়ের মুখে দেয় রাণী মহাসুখে,[১৯৪]

খেতে দিতে দিতে যশোদা বলেন—

আহা মরি মরি পরাণ-পুথলি
বাছনি কালিয়া সোনা।
কত না পেয়েছ ক্ষুধায় পীড়িত
বনে যেতে করি মানা॥[১৯৫]

কৃষ্ণ খেয়ে দেয়ে তৃপ্ত হয়েছেন দেখে যশোদার অন্তরও শান্ত হয়। তিনি—

চিবাইতে দিল কর্পূর তাম্বুল
স্নেহে সে যশোদা মা।
ধরিয়া চরণ জাতিয়া দিছেন
শীতল পাখার বা॥[১৯৬]

হিন্দী বৈষ্ণব কবিতায় গোষ্ঠের পদে কৃষ্ণের জন্যে যশোদার উদ্বেগ থাকলেও বাংলা পদে তিনি অধিকতর ব্যাকুল। হিন্দী পদে যশোদার মনে আনন্দ ও গর্বের ভাবটি বড় হয়ে উঠেছে। কারণ পুত্রের জীবনে প্রবেশের এই প্রথম পদক্ষেপ।

গাই চরাবণ কো ছিনু আয়ো।
ফুলী ফিরতি জসোদা অংগ অংগ লালন উবটি ন্হবায়ো॥
ভূষণ বসন বিবিধ পহিরাত্র কুজুর তিলকু বনায়ো।
বিপ্র বুলাই বেদ-ধুনি কীনী মোতিনি চৌক পুরায়ো॥[১৯৭]

—কৃষ্ণের গোচারণে যাবার দিন এসেছে। যশোদা গর্বে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। উবটন দিয়ে ছেলেকে স্নান করাচ্ছেন, নানা বসন-ভূষণ পরাচ্ছেন। চোখে কাজল, কপালে তিলক দিচ্ছেন। ব্রাহ্মণ ডেকে বেদমন্ত্র পাঠ করাচ্ছেন।

পরমানন্দদাসের উপরোদ্ধৃত পদ থেকে বাংলা পদকর্তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করা যায়। বাঙালী কবির যশোদার মনে সর্বদা একটা হারাই-হারাই ভাব রয়েছে, এবং তাঁরা কৃষ্ণের গোচারণে যাবার পটভূমিকায় যশোদার সকরুণ মূর্তি আমাদের কাছে তুলে ধরছেন। হিন্দী পদে যশোদাকে সেই তুলনায় অনেকটা কঠিন মনে হয়।

তবে, উভয় ভাষার পদে কোথাও কোথাও মিলও পাওয়া যায়। কৃষ্ণ যশোদাকে বলছেন—

মৈয়া হোঁ গাই চরাবন জৈহোঁ।

তু কহি মহর নন্দ বাবা সোঁ, বড়ো ভয়ো ন ডরৈ হোঁ ॥[১৯৮]

—মা আমি গোরু চরাতে যাব ; তুমি নন্দবাবাকে বলবে, এখন আমি বড় হয়েছি, ভয় পাব না।

সকালবেলা গোপ-বালকদের হৈ-হৈ শুনেই কৃষ্ণ ছুটে চললেন তাদের সঙ্গে। কিন্তু তিনি ফিরে ফিরে দেখছেন, যশোদা পেছনে আসছেন কিনা। কারণ, কৃষ্ণের মনে ভয়, যশোদা তাঁকে গোচারণে যেতে দেবেন না।

যশোদা ছুটে এসে কৃষ্ণের দু'হাত ধরে ফেললেন। কিন্তু বলরাম তাঁকে আশ্বাস দেওয়ায় তিনি কৃষ্ণকে তাঁদের সঙ্গে যেতে দিলেন ; বলরামকে বললেন,— "বল সোঁ কহৈ জসুমতি দেখে রহিয়ো প্যারে।"[১৯৯] যশোদা বলরামকে বলছেন, বাছা ওর প্রতি লক্ষ্য রেখ।

এই পদটির সঙ্গে বাংলা গোষ্ঠের আলোচনা করলেই, উভয় ভাষার পদের মধ্যে পার্থক্য ও সাদৃশ্য স্পষ্ট হবে। বাংলা পদে আছে, গোষ্ঠযাত্রার প্রাক্কালে যশোদা বলরামকে অনুনয় করে বলছেন—

সবার অগ্রজ তুমি, তোরে কি শিখাব আমি,

বাপ মোর যাইয়ে নিছনি ॥[২০০]

অন্য একটি পদে আছে, "নয়নে গোচরে বাছায় সদাই রাখিবে ॥"[২০১] বাঙালী কবি যখন বলেন— "দেহ রাখিয়া প্রাণ দিলাম তোমার হাতে" তখন পুত্রের জন্যে মায়ের ভাবনা এবং বিচ্ছেদ বেদনা বড় বেশি তীব্র হয়ে ফুটে ওঠে। হিন্দী পদে যশোদার ব্যাকুলতা এত বেশি নয়।

গোষ্ঠে যাবার সময় যশোদা কৃষ্ণের সঙ্গে নানা খাদ্য দিয়ে দিয়েছেন এবং কৃষ্ণের অভ্যাস সম্বন্ধেও সতর্ক করে দিয়ে বলরামকে অনুরোধ করেছেন তিনি নিজে যেন কৃষ্ণকে যত্ন করে খাওয়ান :

দণ্ডে দশ বার খায় যাহা দেখে তাহা চায়

ছেনা দধি এ ক্ষীর নবনী।

রাখিও আপন কাছে ভুখ জানি লাগে পাছে

আমার সোনার যাদুমণি ॥[২০২]

হিন্দী পদাবলীতে যশোদা সাধারণত কৃষ্ণের সঙ্গে কোনো খাবার দেন না। দুপুরের খাবার কোনো গোপিনীকে দিয়ে গোচারণ ভূমিতে পাঠানো হয়। হিন্দীতে একে বলা হয় 'ছাক'। যশোদা গোপিনীকে বলছেন, "ছাক লৈ জাহরী মেরী মাঈ জঁহা রী মিলৈ মেরো কুঁবর কন্হাঈ।"[২০৩]

—সখী, দুপুরের খাবার নিয়ে যাও ; আমার আদরের কানাইকে যেখানে পাবে খাইয়ে এসো। আর কত বিচিত্র সুস্বাদু খাদ্যই না তিনি দিয়েছেন তাঁর আদরের

কানাইয়ের জন্যে, মিষ্টি, দই, ক্ষীর, পাঁপর ইত্যাদি।

কৃষ্ণ গোচারণ থেকে ফিরে আসছেন দেখে যশোদা ছুটে গেলেন—

জসুমতি দৌরি লিত্র হরি কনিয়াঁ।

আজু গয়ৌ মেরো গাই চরাবন, হোঁ বলি জাউঁ নিছনিয়া।[২০৪]

—যশোদা দৌড়ে গিয়ে কৃষ্ণকে কোলে তুলে নিলেন। আজ আমার বাছা গোরু চরাতে গিয়েছিল, আমি বলিহারি যাই।

আবার কৃষ্ণের ফিরতে দেরী হলে যশোদা দুশ্চিন্তায় থাকেন—

ললারে! আজু অবেরো আয়ো?

বড়ীয় বার রী মারগ জোরতি, তৈঁ কিত গহরু লগায়ো॥

অব কহুঁ বাহরি জাদ ন দৈহোঁ মেরো হিয়ো জুড়ায়ো।

ঘর হী বোহোত খিলৌনা তেরে কাহেকোঁ বাহরি ধায়ো॥[২০৫]

—বাছা আমার, আজ বড়ো দেরী করে এসেছ! কখন থেকে আমি তোমার পথ চেয়ে আছি! আর তোমাকে আমি বাইরে যেতে দেব না। এতক্ষণে তোমায় দেখে আমার বুক জুড়াল। ঘরে তো অনেক খেলনা, বাইরে কি এমন আছে!

এই পর্যায়টিতে হিন্দী কবির যশোদা ও বাঙালী কবির যশোদা বড় কাছাকাছি এসেছেন। বিলম্বে বাড়ী ফেরার জন্য বলরাম দাসের যশোদা পুত্রকে অনুযোগ দিয়ে বলছেন—

নন্দদুলাল বাছা যশোদা দুলাল।

এতক্ষণ মাঠে থাকে কাহার ছাওয়াল॥[২০৬]

হিন্দী পদে যশোদা পুত্রের জন্যে দুশ্চিন্তা করলেও তাতে খুশির একটি আমেজ আছে। তাই তিনি সবাইকে গর্বের সঙ্গে বলছেন— কৃষ্ণ তার জন্য বনের ফল নিয়ে এসেছে।[২০৭] যশোদা পুত্রের এই কৃতিত্বে মুগ্ধ।

এরপরই যশোদা কৃষ্ণকে আদর করে খাওয়াতে বসিয়েছেন, এবং কৃষ্ণকে বলছেন, গরম গরম মাখন রুটি খেয়ে নাও।[২০৮] ক্লান্তিতে কৃষ্ণ তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়েছেন; তা দেখে যশোদা বেদনা বোধ করছেন— "বহুতৈ দুখ হরি সোই গয়োরী" অর্থাৎ সমস্ত দিন অনেক কষ্ট পেয়ে হরি ঘুমিয়ে পড়েছে।

বাংলা বৈষ্ণব কবিতায় যশোদার মাতৃস্নেহের স্বরূপকে প্রকাশ করার জন্যে কবিরা কিছু কিছু নতুন বিষয়ও গ্রহণ করেছেন।

কৃষ্ণ রাধার সঙ্গে প্রমোদে মত্ত হয়ে রাত্রি যাপন করেছেন। প্রভাতে যশোদা এসেছেন নিদ্রাকাতর কৃষ্ণের ঘুম ভাঙ্গাতে। রাত্রির অন্ধকারে রাধাকৃষ্ণের পরিধেয় অদলবদল হয়ে গেছে। যশোদার মাতৃ-হৃদয় কিন্তু পুত্রের বিলাস-চিহ্নিত দেহের অন্য অর্থ করে। তিনি মা, তাঁর সব সময়ই ভয় পুত্রের বুঝি কোনো অমঙ্গল ঘটল। কিংবা কারো কু-দৃষ্টি পড়ল।

রামের বসন পরিলা কখন

কে নিলে বসন তোর।

রাতা উতপল　　　　নয়ন-যুগল
কি লাগি দেখিয়ে জোর॥
নীল-নলিন　　　　আতপে মলিন
কেন বা এমন দেহ।
উনমত হৈয়া　　　　বুলহ ধাইয়া
কুদিঠি দিলে বা কেহ॥
হিয়ার উপর　　　　কণ্টকে আঁচড়
গিয়াছিলা কোন বনে।
আমার কপালে　　　　না জানি কি ফলে
পরানে মরিব মেনে॥[২০৯]

এরপরই যশোদা দেবতার কাছে কৃষ্ণের কুশল কামনা করেছেন। বাংলার সহজ সরল মাতৃমূর্তি যশোদার মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে। তাছাড়া স্নেহে এমন অন্ধ হওয়া স্নেহকোমল নারীর পক্ষেই সম্ভব।

কৃষ্ণ বিলাসকুঞ্জে তাঁর বাঁশী (সোনার) ফেলে এসেছেন। যশোদা কৃষ্ণের হাতে বাঁশী না দেখে বিশেষ চিন্তিত। সোনা হারানো অমঙ্গলের চিহ্ন। যশোদাও এই সংস্কারে বিশ্বাসী। চিন্তান্বিত হয়ে যশোদা রোহিণীকে ডেকে বলছেন—.

মায়ের কপালে লেখা　　　　হেদে গো বামের মা
না জানি কি আছয়ে কপালে॥
সোনা যে হারাতে নাই　　　　কি করিলি কানাই
কান্দিয়া কান্দিয়া রাণী বলে।
হায় আমি কি করিব　　　　দেশান্তরি হয়ে যাব
তুমি বাস ঘুচালে গোকুলে॥[২১০]

রাধার জন্যে পুত্রের আগ্রহ যশোদা বুঝতে পারেন। কিন্তু রাধা পরস্ত্রী; যশোদা নিরুপায়, শুধু পুত্রের যন্ত্রণার সঙ্গে একাত্ম হওয়া ভিন্ন অন্য কোনো উপায় নেই। অথচ তাঁর মনেও আশা ছিল রাধার মতো পুত্রবধূ হবে। পুত্রের আনন্দে তিনিও আনন্দিত হবেন। তাই কৃষ্ণ গোচারণে গেলে পুত্র-বিরহে কাতর যশোদা রাধাকে দেখতে পেয়ে তাঁকে কোলে তুলে নেন, পুত্রের প্রিয়জনকে কোলে তুলে পুত্রের বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা প্রশমিত করতে চান।

কানুরে পাঠাইয়া বনে　　　　যশোদা বিষাদ-মনে
আসিয়া রাইরে করে কোরে।
দুখে আউলাইছে গা　　　　মুখে না নিঃসরে রা
বসন ভিজিয়া গেল লোরে॥[২১১]

যশোদার অন্তরের অব্যক্ত আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ হয়ে পড়ে—

কীর্ত্তিদা সমান হেন　　　　আমারে জানিবা তেন
সে ঘর এঘর সব তোরে।

কি আর করিব সাধ সকলে পড়িল বাদ
দিনেক রাখিতে নারি তোমা ॥[২১২]

যশোদা আরও উন্মুক্ত করেন তাঁর অন্তর —

আমার জীবন তোমরা দু'জন
দুখানি আঁখিব তারা।

* * *

আর বা বলিব কী ॥

আব কিবা কহু তোমা হেন বহু
নাহিক আমার ঘরে ॥[২১৩]

আর তাই রাধাকে বিদায় দিতে গিয়েও বিদায় দিতে পারছেন না : "বিদায় করিতে নাবে কান্দয়ে করুণে।"

পুত্রস্নেহাতুবা জননী শুধু মাত্র পুত্রেব আনন্দেব কথা ভেবে রাধাকে নানা ছলে গৃহে ডেকে পাঠান। তিনি জানেন, রাধার শ্বশুবা লয়ে অনেক বাধা, তাছাড়া জটিলা ও কুটিলা দুই ননদিনী রাধার প্রতি বিরূপ।

জটিলা কুপিলে আসিতে না দিবে
সে আর আপদ দড়।
কুটিলা কুমতি বিষের মূরতি
সেহ সে ধাউড় বড় ॥[২১৪] —শেখর

তাই তিনি জটিলা ও কুটিলাকে প্রসন্ন কবে নানা উপায়ে রাধাকে বাড়ী ডেকে আনেন—

কুন্দলতা আনি কথা কহে যশোমতী।
বাধাবে আনহ বাছা করিয়া যুকতি ॥[২১৫]

তারপর যশোদা বাধাকে কৃষ্ণেব জন্য রান্না কবতে পাঠান। কারণ, কৃষ্ণ তাহলে আগ্রহের সঙ্গে খাবেন। যশোদা কৃষ্ণকে বলেন—

তুমি না খাইলে রাই না আসিবে
স্বরূপে কহিলুঁ তোরে ॥[২১৬] —শেখব

আর এই কথা শুনে কৃষ্ণ,

আকণ্ঠ পুরিয়া
করিলা ভোজন পান ॥[২১৭] —শেখর

কৃষ্ণের পরিতৃপ্ত আহারে শুধু রাধা নয়, যশোদাব মনও তৃপ্তিতে ভরে যায়। তাই রাধার প্রতি তাঁর এত স্নেহ। শ্বশুর বাড়ী ফেবার আগে যশোদা রাধাকে বসন-ভূষণে সাজিয়ে কোলে বসিয়ে আদর কবেন—

সে যে যশোমতী পিরীতি মূরতি
রাইয়েরে করিয়া কোলে।
সে সব ভূষণ করিয়া যতন

দেয়ল তাহার গলে ॥[২১৮]

পুত্র-বাৎসল্য যশোদার কাছে পুত্র-প্রিয়তমাকে স্নেহের অধিকারিণী করেছেন।

বাঙালী কবিরা নতুন নতুন প্রসঙ্গের অবতারণা করে বিষয়-বস্তুতে অনেক বৈচিত্র্য এনেছেন।

অকস্মাৎ দুঃসংবাদ এল অক্রুর এসেছেন কংসের আমন্ত্রণে কৃষ্ণ ও বলরামকে মথুরা নিয়ে যেতে। একদিন তাঁরা মথুরা চলে গেলেন ; কৃষ্ণ বৃন্দাবনে আর ফিরে এলেন না। কৃষ্ণহীন ব্রজধামে চিব অন্ধকার নেমে এল। বিচ্ছেদের বেদনায় সমগ্র ব্রজভূমি ম্রিয়মাণ। আশ্চর্য, বাঙালী কবিরা পুত্র বিবহে কাতব যশোদার বেদনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ-নীরব। রাধার বিরহ যন্ত্রণা নিঃসন্দেহে মর্মান্তিক। কিন্তু বিচ্ছেদ-বেদনা বাৎসল্যেও কিছু কম কষ্টকর নয়। গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, শেখর প্রভৃতি পদকর্তারা মায়ের বেদনা সম্বন্ধে একটি কথাও বলেননি। বাংলা বৈষ্ণব সাহিত্যেব কেন্দ্রবিন্দু রাধা ; যশোদার অশ্রুজলে রাধার বিরহ বেদনার তীব্রতা যদি কিছু কমে যায় এই ভেবে হয়ত বাঙালী কবিবা যশোদার বেদনা সম্পর্কে নীরব।

একমাত্র দীন চণ্ডীদাস অক্রুরের আগমনে মা যশোদা ও পিতা নন্দের ভীতি ও বেদনা, কৃষ্ণের বিদায় মুহূর্তে যশোদার বিলাপ এবং নন্দ যখন মথুরা থেকে একা ফিবে এলেন, তখন পুত্রহারা যশোদার ক্রন্দন ইত্যাদি নিয়ে কিছু কিছু পদ রচনা করেছেন। যেমন, অক্রুর কৃষ্ণকে নিতে এসেছেন এই সংবাদ পেয়ে যশোদা ব্যাকুল হয়ে বলে উঠলেন :

কি বোল, কি বোল আব আব বল—
ঘন ঘন পুছে তায় ॥
কাঁদি কহে নন্দ— ঘুচিল আনন্দ
অক্রুর আইল নিতে।[২১৯]

যশোদা যে কৃষ্ণকে প্রতি মুহূর্তে "চক্ষে হারান", সেই, কৃষ্ণ আজ মথুরাপুরী চলেছেন। যশোদার পক্ষে চিন্তা করাই অসম্ভব।

মথুরা-গমন একথা শুনিতে
ফাটয়ে মায়ের প্রাণী ॥[২২০]

শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণকে যেতে দিতে হয়। নন্দ অবশ্য সঙ্গে যাচ্ছেন। যে কংসের ভয়ে পুত্রকে যশোদা সর্বদা দু'হাতে আগলে বেখেছেন, সেই কংসের দূত এসেছে কৃষ্ণ ও বলরামকে মথুরা নিয়ে যেতে। কৃষ্ণ-বলরাম সুসজ্জিত হয়ে অক্রুরের সঙ্গে রথে চলেছেন। যশোদা চিন্তামগ্ন, বুঝি তাঁর কোন বিশেষ অপরাধ স্মরণ করেই কৃষ্ণ তাঁকে পরিত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন। একবার চুরি করবার জন্য যশোদা কৃষ্ণকে উদূখলে বেঁধে রেখেছিলেন। আজ কি সেই কথা স্মরণ করেই কৃষ্ণ যশোদাকে পরিত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন ? তিনি যে মা—

তুমি কি ছাড়িবে মায়।
শুনহে যাদব রায় ॥

কি দোষ পাইয়া মোর।
কিছু না জানিল ওর॥
মায়ের কি দোষ ধরি।

*   *   *

অনেক তপের ফলে।
পাইলাম তোমারে কোলে॥
মুই অভাগিনী নারী।[২২১]

অক্রূর কৃষ্ণ ও বলরামকে নিয়ে মথুরা চলে গেলেন। পুত্রহারা যশোদার তাই —

সুখ গেল দূর   দুখ রহে পাশে
কেমনে বঞ্চিব নিশি।[২২২]

তিনি রোহিণীকে ডেকে বলেন, পুত্রহীন জীবনের চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়।

যশোদা বলেন—   শুনগো রোহিণী
আর কি দাঁড়ায়ে দেখ।
কৃষ্ণ বলরাম   ছাড়িয়ে চলিল
আর কি পরাণ রাখি॥[২২৩]

কৃষ্ণ বৃন্দাবন ত্যাগ করার আগেই পুত্র বিরহের আশংকায় যশোদা বারবার অচেতন হয়ে পড়েছেন—

পড়ে রাণী মূর্ছিত হয়ে।

যশোদার আর সযত্নে রান্না করতেও আগ্রহ নেই। কার জন্যই বা রাঁধবেন? এখন সব কিছুই তাঁর কাছে অর্থহীন।

নয়ন ছাড়িয়া গেলে   কি কাল জীবনে—[২২৪]

অবুঝ মায়ের প্রাণ; তাঁর সন্দেহ, কারো যুক্তিতে বুঝি কৃষ্ণ মথুরা যাচ্ছেন। কৃষ্ণকে তিনি তাই বলছেন—

একবার চাহ মায়ের পানে।
কে তোরে যুকতি দিল   নিশ্চয় আমারে বল
এই সে আছিল তোর মনে॥[২২৫]

যশোদা ভাবেন তাঁর অবোধ শিশুপুত্র অন্যের কথায় মথুরা চলেছেন। কিন্তু কৃষ্ণ চলে গেলে—

কে আর ডাকিবে 'মা' বলিয়ে।[২২৬]

যশোদার অন্তরের গভীর বেদনা এই একটি চরণে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

চৈতন্যের নবদ্বীপ ত্যাগ ও কৃষ্ণের বৃন্দাবন ত্যাগ অবলম্বনে যে সব পদ রচিত হয়েছে তাদের মধ্যে মিল লক্ষণীয়। শচীমাতার ও যশোদার বেদনা পদাবলীতে এক হয়ে গেছে। কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাস নিতে রাত্রির অন্ধকারে গৌরাঙ্গ নবদ্বীপ ছেড়ে গেছেন। সকালে গোরাকে কোথাও দেখতে না পেয়ে শচীমাতা চতুর্দিকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন:

আউদড়-কেশে ধায় বসন না রহে গায়
শুনিয়া বধূর মুখের কথা ॥
ত্বরিতে জ্বালিয়া বাতি খুঁজিলেন ইতি উতি
গোরাঙ্গে উদ্দেশ না পাইঞা।
বিষ্ণুপ্রিয়া বধূসাথে কান্দিতে কান্দিতে পথে
ডাকে শচী নিমাঞি বলিয়া ॥[২২৭]

শচী জেনেছেন গোরাঙ্গ সন্ন্যাস নিতে গিয়েছেন। এ সংবাদ তাঁর পক্ষে মর্মান্তিক; কারণ গোরাই তাঁর জীবনের শেষ সম্বল।

পড়িয়া ধরণীতলে শোকে শচী কাঁদি বলে
লাগিল দারুন বিধি বাদে।
অমূল্য রতন ছিল কোন বিধি হরি নিল
পরাণ পুতুলি গোরাচাঁদে ॥[২২৮]

শচী যশোদার মতোই বলেন,

শচী কহে, শুন মোর নিতাই গুণমণি।
কেবা আসি দিল মন্ত্র কে শিখাইল কোন তন্ত্র
কি হইল কিছুই না জানি ॥
গৃহমাঝে গিয়াছিনু ভালমন্দ না জানিনু
কিবা দোষে গেল রে ছাড়িয়া।
কেন বা নিঠুর হৈলা পাথারে ভাসায়ে গেলা
রহিব কাহার মুখ চায়া ॥[২২৯]

গৌরাঙ্গের সন্ন্যাসে শচী জীবন্মৃত হয়ে পড়লেন—

মরা হেন রহিল পড়িয়া।

বাংলা বৈষ্ণব পদে কংসের দূত হিসাবে অক্রূরের আগমন, কৃষ্ণের মথুরা গমন, কংস হত্যা, কৃষ্ণের বৃন্দাবনে ফিরে না আসা, এবং নন্দ-যশোদার বিষন্ন দিন যাপন ইত্যাদি প্রসঙ্গ দীন চন্ডীদাসের পদাবলীতেই বিশেষ করে পাওয়া যায়। পূর্বেই বলা হয়েছে তিনি ভাগবত অনুসারী কবি। তাই ভাগবতের এইসব বিষয় অবলম্বনে কিছু কিছু পদ রচনা করেছেন।

বৃন্দাবনে যশোদা বেদনার্ত। মথুরায় অন্য দৃশ্য। জন্ম মুহূর্তে যে পুত্রকে ত্যাগ করেছিলেন সেই পুত্রকে ফিরে পেয়ে দেবকী আনন্দে উৎফুল্ল:

ও মোর বাছুনি, চাঁদ মুখখানি
দেখিয়ে নয়ান ভরি।[২৩০]

কংসাসুর ধ্বংস হয়েছে, মথুরায় ফিরে এসেছে শান্তি। কৃষ্ণ ও বলরাম মথুরাতেই থাকবেন, —এই নির্মম কথাটি নন্দকে বলতে কৃষ্ণ বেদনা বোধ করছেন। বলরামকে ভার দিলেন এই কঠিন কর্তব্যটি করার জন্য। বলরামের মুখে একথা শোনা মাত্র নন্দ "মূর্ছিত হইয়া ধরণী পড়ল তবে।"[২৩১]

নন্দের নিজের বেদনা তো আছেই তার চেয়ে বড় ভাবনা যশোদাকে এ খবর কি ভাবে দেবেন।

কেমনে যাইব গোকুল নগরে
কৃষ্ণ বলরাম রাখি।
যশোদা রোহিণী কিসে প্রবোধিব
বড় পরমাদ দেখি॥[২৩২]

নন্দ ফিরে এসেছেন শুনে যশোদা ও রোহিণী ছুটে এলেন কৃষ্ণ-বলরামকে দেখার আশায়। কিন্তু নিরাশ হতে হল। যশোদা নন্দের উপর প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন—

তুমি নন্দ বড়ই নিদয়া।
কোথা না রাখিলা মোহ মায়া॥[২৩৩]

কৃষ্ণ-হারা যশোদা মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণায় মৃত্যু কামনা করেন। যশোদার মনে হয়, "বাঁচিব কাহার তরে"। কৃষ্ণচন্দ্র বৃন্দাবনে নেই, যশোদাব কাছে সমস্ত বৃন্দাবন অন্ধকার। নন্দকে ডেকে বলেন—

শুন, নন্দ ঘোষ, আমার বচন
জ্বালহ আনল ভালি।
তাতে প্রবেশিব যশোদা রোহিণী
দেহত অনল জ্বালি॥[২৩৪]

যশোদার জীবনে আজ শুধু সম্বল চোখের জল। পুত্র বিরহে যশোদার দিন যায় শুধু—

কানাই, কানাই— বলিয়া বলিয়া
নিরবধি রাণী কান্দে॥[২৩৫]

দীন চণ্ডীদাস যশোদা, নন্দ ও রোহিণীর পুত্রের বিচ্ছেদ বেদনা সম্পর্কে আর বিশেষ কিছু বলেননি। অন্যান্য কবিদের মত রাধার বেদনাই তাঁকে চঞ্চল করে তুলেছে।

বলা যেতে পারে যশোদার পুত্র বিরহেব বর্ণনায় দীন চণ্ডীদাস বাঙালী কবিদের মধ্যে ব্যতিক্রম।

কিন্তু হিন্দী কবিরা রাধার বিরহের সঙ্গে সঙ্গে মাতৃ-হৃদয়ের বিচ্ছেদ যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করেননি। বিশেষ করে সুরদাস পুত্র-হারা যশোদার বেদনার যে পরিচয় তুলে ধরেছেন তা অতুলনীয়। রাধার অনন্ত বিরহ বেদনাকে যেমন তিনি হৃদয়গ্রাহী করে বর্ণনা করেছেন, তেমনি করেই যশোদার মর্মজ্বালাকে রূপ দিয়েছেন।

হিন্দী পদাবলীতে অক্রুর আগমনের আগেই যশোদা ও নন্দ অমঙ্গলের পূর্বাভাস পেয়েছেন। নন্দ স্বপ্ন দেখেছেন, কৃষ্ণ-বলরাম কোথায় যেন হারিয়ে গেছেন ঃ

উত নন্দহিঁ সপনো ভয়ো, হরি কহুঁ হিরানে।
বলমোহন কোউ লৈ গয়ো সুনি কৈ বিলখানে॥[২৩৬]

এ স্বপ্নের কথা শুনে যশোদা মূর্ছিত হয়ে পড়লেন—

ধরণী মুরছি পরী অতি ব্যাকুল, বিবস জসোদা রাণী।[২৩৭]

আর যথার্থই যেদিন কংসের দূত হয়ে অক্রুর বলবাম ও কৃষ্ণকে নিতে এলেন যশোদা ব্যাকুল হয়ে ছুটে কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন,—

(গোপাল রাঈ) কিঁহি অবলম্বন রহিহৈঁ প্রাণ।

নিঠুর বচন কঠোর কুলিসহুঁতৈঁ, কহত মধুপুরী জান ॥[২৩৮]

—বাছা গোপাল, কাকে অবলম্বন কবে প্রাণ বাখব? নিষ্ঠুর কঠোর কথা শুনছি, তুমি নাকি মধুপুবী যাবে?

মাব স্নেহ কৃষ্ণকে ধরে রাখতে পাবল না। শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণকে যশোদার যেতে দিতেই হয়। তখন যশোদা ছেলেব কাছে ভিক্ষা কবে বারবার বলতে থাকেন, বাছা, আমাকে ত্যাগ করো না।[২৩৯] ভবিষ্যতের দুর্ভাগ্যেব দিনগুলির ইঙ্গিত বুঝি মাতৃ হৃদযে আগেই প্রতিভাত হয়। আব তাই যশোদা পুত্রকে অসহায় ভাবে বলছেন, "মোহিঁ তজি ন দুলারে"। মর্মান্তিক বেদনায় যশোদা কৃষ্ণকে বলেন—

কন্‌হৈয়া মেরী ছোহ বিসাবী।

ক্যোঁ বলবাম কহত তুম নাহীঁ, মেঁ তুম্‌হাবী মহতাবী।[২৪০]

—কানাই, আমার স্নেহ ভুলে গেলে। বলবাম বলছে, তুমি কেন বলছ না আমি তোমাব মা।

তাছাড়া যশোদার ভয়, কৃষ্ণ তাঁব চিবশত্রু কংসেব আমন্ত্রণে মথুরা যাচ্ছেন। যদিও কৃষ্ণ পুতনা, তৃণাবর্ত প্রভৃতি রাক্ষসদেব হত্যা কবেছেন তবু পুত্রের জন্য মায়ের দুর্ভাবনা তো খুবই স্বাভাবিক। সুবদাস যশোদাব বেদনার কথা বলতে গিয়ে রোহিণীর যন্ত্রণাব কথা বলতেও বিস্মৃত হননি। কাবণ বোহিণীর বেদনাও তো মর্মান্তিক।

য়ে দৌউ ভৈয়া জীবন হমবে কহতি বোহিণী রোই।

ধবণী গিরতি, উঠতি অতি ব্যাকুল, কহি বাখত নহিঁ কোঈ ॥[২৪১]

—রোহিণী বলছেন, এই দুই ভাই আমাব প্রাণ। ব্যাকুল হয়ে তিনি কখনও মাটিতে লুটিয়ে পড়ছেন, কখনও উঠছেন। কেউ তাঁকে ধবে বাখতে পাবছে না।

যাত্রার পূর্ব মুহূর্তে যশোদা কৃষ্ণকে বলছেন—

মোহন নৈঁকু বদন-তন হেবৌ।

বাখৌ মোহিঁ নাত জননী কৌ, মদন গুপাল লাল মুখ ফেরৌ ॥[২৪২]

—বাছা মোহন গোপাল, মুখ ফেবাও, একটু (ভাল করে) মুখ দেখি। আমার সংগে মায়েব সম্পর্ক রেখ।

যশোদার এই উক্তির মধ্যে একটি বিশেষ বিষন্ন সুর রয়েছে। কৃষ্ণ দেবকী ও বসুদেবের সন্তান। মথুরায় তাদের কোলে গিয়ে কৃষ্ণ যশোদার স্নেহ যদি ভুলে যান কিংবা আর যদি না ফিরে আসেন, সমস্ত সম্পর্ক যদি ছিন্ন করেন, এ ধরনের চিন্তা যশোদার মনে হওয়া তো স্বাভাবিক। কিন্তু জঠরজাত সন্তান না হয়েও কৃষ্ণ যশোদার সন্তানাধিক। বাংলা পদাবলীতে তাই বোধ হয় যশোদা প্রতি মুহূর্তে কৃষ্ণকে

হারাবার ভয়ে অধীর। বাংলা গোষ্ঠের পদগুলি তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। হিন্দী পদাবলীতে যশোদা কখনই কৃষ্ণকে গোচারণে পাঠিয়ে এমন ব্যাকুল হননি, কিন্তু যে মুহূর্ত থেকে অক্রূর এসেছেন বৃন্দাবনে, হিন্দী পদাবলীতে যশোদার মানসিক পরিবর্তনটি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে, পুত্রের প্রতি উক্তিগুলিতে তাঁর হৃদয়ের প্রচণ্ড কাতরতা অনুভূত হয়। অথচ হিন্দী কবির যশোদা পুত্রকে সকালে উঠিয়ে নিজেই হাসিমুখে গোষ্ঠে পাঠিয়েছেন :

গ্বাল-বাল সব টেরহীঁ, গৈয়া বন চারণ।

লাল উঠো মুখ ধোইঐ, লাগী বদন উঘারণ ॥[২৪৩]

—গোপ বালকেরা ডাকছে বনে গোরু চরাতে যাবে বলে, বাছা ওঠো, মুখ ধুয়ে নাও, বলে মুখের কাপড় সরিয়ে দিচ্ছেন।

সেই যশোদাকেই দেখা যায় কৃষ্ণ-বলরামকে নিয়ে অক্রূর মথুরার পথে যাত্রা করতেই তিনি "পুত্র" বলে চিৎকার করে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।

মহীরি, পুত্র কহি সোর লগায়ো,

তরু জ্যোঁ ধরনি লুটাই।[২৮৪]

—যশোদা "পুত্র" বলে চিৎকার কবে কাটা গাছের মত মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

কৃষ্ণ মথুরায় এসে কংসকে হত্যা করে বসুদেব ও দেবকীকে কারামুক্ত করলেন। নন্দকে বৃন্দাবনে ফিরে যেতে অনুরোধ কবে, কৃষ্ণ তাঁকে নিজের স্বরূপ বোঝালেন—

মৈঁ আয়ো সংসার মেঁ ভুব-ভার উতারণ।[২৪৫]

—আমি এসেছি পৃথিবীর ভার লাঘব করতে। তিনি স্বয়ং ঈশ্বর। তাঁর মাতাপিতা কেউ নেই, ইত্যাদি বলে নন্দকে বহু জ্ঞানের কথা শোনালেন। নন্দ কৃষ্ণের এই জ্ঞানের কথায় আরও কাতর হয়ে পড়লেন। কারণ এতদিন যাকে সন্তান স্নেহে পালন করেছেন সেই পুত্র, হোল না দেবতা, নন্দের পিতৃসত্ত্বাকে অস্বীকার করতে পারেন; কিন্তু পিতা যিনি, তিনি মুহূর্তে পুত্রকে ঈশ্বর জেনে হৃদয়কে পরিবর্তন করতে পারেন না। তাই কৃষ্ণের উপদেশে তিনি কোন সান্ত্বনা খুঁজে পাচ্ছেন না—

নিঠুর বচন জনি কহো কন্হাঈ। অতিহীঁ দুসহ সহোঁ নহিঁ জাঈ।

তুম হঁসি কৈ বোলত যে বাণী। মেরেঁ নৈন ভরত হৈ পানী ॥[২৪৬]

—কানাই, তোমার নিষ্ঠুর কথা দুঃসহ, তুমি হেসে যে কথা (তত্ত্বকথা) বলছ, শুনে আমার চোখে জল ভরে আসছে।

নন্দের কাছে এই জ্ঞানপূর্ণ কথার কোন মূল্য নেই কারণ তিনি স্নেহে অন্ধ, তাঁর কাছে যুক্তি অর্থহীন। কৃষ্ণ তাঁর পুত্র, এর বেশী তিনি ভাবতেই পারেন না। তাই স্পষ্ট তিনি বলেন,

(মেরে) মোহন তুমহিঁ বিনা নহিঁ জৈহোঁ।

মহরি দৌরি আগে জব ঐহৈ, কহা তাহি মৈঁ কৈহোঁ ॥[২৪৭]

—আমার মোহন, তোমাকে ছাড়া যাব না, যশোদা দৌড়ে আসবেন, তখন তাঁকে আমি কি বলব?

কৃষ্ণ তাঁকে বুঝিয়ে বললেন, নন্দ, ব্রজে ফিরে যান, মথুরা আর বৃন্দাবনের মধ্যে কতটুকুই বা দূরত্ব ! নন্দ বেদনাক্লিষ্ট অন্তরে গোকুলে ফিরে এলেন। নন্দের রথ আসছে, যশোদা ছুটে এলেন, কিন্তু কৃষ্ণ মথুরা থেকে ফিরে আসেননি। দুঃখে ব্যথায় যশোদার সহ্যের সীমা অতিক্রম করে যায়। বেদনার আধিক্যে তিনি নন্দ যে স্বয়ং বেদনার্ত সে কথাও ভুলে যান। যশোদা নন্দকে ধিক্কার দিতে বা কটুবাক্য বলতে দ্বিধা করেন না। স্বামীর প্রতি এই রূঢ়তার মধ্যে দিয়ে কবি যশোদার বেদনার তীব্রতাকেই বোঝাতে চেয়েছেন—

জসুদা কান্হ কান্হ কৈ বুঝৈ।
ফুটৈন গঈ তুম্হারী চারো, কৈসে মারগ সুঝৈ॥
ইক তো জরী জাত বিনু দেখেঁ, অব তুম দীন্হৌ ফুঁকি।
য়হ ছাঁতিয়া মেরে কান্হ কুঁবর বিনু ফাটিন ভঙ্গ দ্বৈ টূকি॥
ধিক তুম ধিক য়ে চরণ অহৌ পতি, অধ বোলত উঠি ধাএ।
'সূর' স্যাম বিছুরণ কী হম পে, দৈন, বধাঈ আএ॥[২৪৮]

—যশোদা কানু কানু করে কাঁদতে লাগলেন। নন্দকে বলছেন, তোমার দৃষ্টি কেন নষ্ট হয়ে গেল না, কি করে তোমার চোখ কৃষ্ণ ছাড়া পথ দেখলো। একে তো কৃষ্ণকে না দেখে বুক জ্বলে যাচ্ছে। তার উপর তুমি সে আগুন উসকে দিলে। কানুকে ছাড়া আমার হৃদয় কেন টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে না। ধিক্কার তোমাকে, ধিক্কার স্বামী তোমার চরণকে, যে চরণ নিয়ে ফিরে এসেছ,— বলতে বলতে উন্মাদিনী ছুটলেন।

মানসিক যন্ত্রণায় যশোদার প্রিয় বস্তুও অপ্রিয় মনে হয়; তাই নন্দের প্রতি এই কটু ভাষণ। এমনকি, শোকের উন্মাদনায় তিনি নন্দ কেন রাম বিরহে দশরথের মত প্রাণ ত্যাগ করেননি বলে স্বামীকে বাক্যযন্ত্রণা দিয়েছেন।[২৪৯] আবার স্বামীর কাছেই ব্যাকুল হয়ে বলছেন—

কহাঁ রহ্যৌ মেরো মন-মোহন।
ব্রহ মূরতি জিয় তেঁ নহিঁ বিসরতি, অঙ্গ অঙ্গ সব সোহন॥[২৫০]

—যশোদা নন্দকে বলছেন, আমার মনমোহনকে কোথায় রেখে এলে ! যার প্রত্যেকটি অঙ্গ সুন্দর, সেই অনুপম মূর্তি হৃদয় থেকে মুছে ফেলতে পারছি না।

আর খাবার তৈরী করতে গেলে, ননী, মাখন ইত্যাদি দেখলে পুত্র-হারা মায়ের যন্ত্রণা দ্বিগুণ হয়ে ওঠে :

জদ্যাপি মন সমুঝাবত লোগ,
সূল হোত নবনীত দেখি মেরে, মোহন কে মুখ জোগ॥[২৫১]

—যদিও লোকে অনেক বোঝাচ্ছে, তবু ননী দেখলেই আমার অন্তর শূলবিদ্ধ হচ্ছে, মোহনের খাবার জিনিস তো !

কৃষ্ণ এখন মথুরার রাজা, যশোদার সামান্য ননী বা মাখনে তাঁর প্রয়োজন নেই, ইত্যাদি বলে অনেকেই যশোদাকে বোঝাতে চেষ্টা করছেন। কিন্তু যশোদার কাছে

কৃষ্ণ যে তাঁর পুত্র ছাড়া আর কিছু নন। কৃষ্ণ শূন্য বৃন্দাবন তাঁর কাছে অন্ধকার। পুত্রকে শুধু দেখার জন্য বসুদেবও দেবকীর দাসী হয়ে থাকতেও তিনি প্রস্তুত :

হোঁ তৌ মাঈ মথুরা হী পৈ জৈহোঁ।

দাসী হৈব বসুদেব রাই কী, দরসন দেখত রৈহোঁ॥[২৫২]

—সখী, আমি মথুরা যাব। বসুদেবের দাসী হয়ে থাকব এবং আমার কৃষ্ণকে সব সময় দেখব।

পুত্র বিরহাতুরা যশোদা শুধু মথুরার দিকে চেয়ে থাকেন, আব মথুরাগামী কোন পথিক দেখলেই কৃষ্ণের কাছে খবর পাঠান। কখনও বলেন— "কৃষ্ণকে আসতে ব'লো, কৃষ্ণ বৃন্দাবন ছেড়ে যাবার পর থেকে এখানে নিত্য উৎপাত হচ্ছে।[২৫৩] আবার কখনও কৃষ্ণকে বলে পাঠান—

কহিয়ৌ স্যাম সোঁ সমুঝাই,

য়হ নাতৌ নহিঁ মানত মোহন, মনৌ তুম্হারী ধাই।[২৫৪]

—শ্যামকে বুঝিয়ে বলো, যদি অন্য কোন সম্বন্ধ মোহন স্বীকার না করেন তবে যেন অন্ততঃ আমাকে তাঁর ধাত্রী বলে। স্বীকার করে নেন।

শুধু কৃষ্ণ নয়, দেবকীর কাছেও তিনি নানা কথা বলে পাঠান

সন্দেসৌ দেবকী সোঁ কহিয়ৌ।

হোঁ তৌ ধাই তিহারে সুতকী, ময়া করত হী রহিয়ৌ।

জদপি টেৱ তুম জানতি উনকী তউ মোহিঁ কহি আৱৈ।

প্রাত হোত মেরে লাল লড়েতে, মাখন রোটী ভাৱৈ॥

তেল উবটনৌ অরু তাতৌ জল, তাহি দেখি ভজি জাতে।

জোই জোই মাঁগত সোই সোই দেতী, ক্রম ক্রম কবিকৈ ন্হাতে॥

'সুর' পথিক সুনি মোহিঁ রৈন দিন বঢ়য়ৌ রহত উর সোচ।

মেরৌ অলক লড়েতৌ মোহন হৈবহৈ করত সঁকোচ॥[২৫৫]

—পথিক দেবকীকে আমার সংবাদ দিও। তাঁকে ব'লো, আমি তার ছেলের ধাত্রী, আমার উপর যেন কৃপাদৃষ্টি রাখেন। অর্থাৎ, আমি যা বলছি তাতে ক্ষুণ্ণ হয়ো না। কৃষ্ণ উবটন আর গরম জল দেখা মাত্র পালিয়ে যায়। ও এখানে যা কিছু চাইত তাই দিতাম। তবেই ধীরে ধীরে ও স্নান করত। তুমি তো ওর অভ্যাসগুলি নিশ্চয়ই জান। তবু আমার মুখ থেকে এসব কথা মমতা বশে বেরিয়ে আসছে। সকালে উঠেই আমার আদরের বাছার মাখন-রুটি ভাল লাগে। সুরদাসের ভণিতায় যশোদা বলছেন, আমার মনে দিনরাত বড়ই চিন্তা, আমার চোখের মণি, আমার বাছা, ওখানে বোধ হয় সঙ্কোচ বোধ করছে।

কৃষ্ণ যশোদা, নন্দ ও অন্যান্য গোপ গোপিনীদের বিচ্ছেদ-ব্যাকুলতার সংবাদ পেলেন। তিনি তাঁর প্রিয় সুহৃদ উদ্ধবকে বৃন্দাবনে যাবার আদেশ দিয়ে বললেন, যশোদা, নন্দ ও গোপিনীদের সঙ্গে কথা বলতে। যশোদার কথা বলতে গিয়ে কৃষ্ণের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে, "সুনৌ ঊধৌ কহত বনত ন, নৈন ভরি ভরি লেত।"[২৫৬]

উদ্ধব শোন,— বলতে গিয়েও বলতে পারছেন না, চোখ জলে ভরে আসছে। শেষে কৃষ্ণ উদ্ধবের সঙ্গে সংবাদ পাঠালেন—

ঊধো ইতনী কহিয়ো জাই।

হম আবৈংগে দোউ ভৈয়া, মৈয়া জনি অকুলাই ॥[২৫৭]

—উদ্ধব, এই কথা গিয়ে বলো, আমরা দু-ভাই যাব, মা যেন ব্যাকুল না হন। তাঁর জন্য যশোদার ব্যাকুলতা কৃষ্ণ জানেন। যশোদার জন্য 'অকুলাই' শব্দটি প্রয়োগ করে কবি সুরদাস যশোদার যন্ত্রণাটি সুস্পষ্ট করে তুলেছেন। সুরদাস বাৎসল্যের মত প্রতি-বাৎসল্যের পদ রচনাতেও অদ্বিতীয়। সন্তানেরও যে মায়ের প্রতি সুগভীর মমতা থাকে সেটিও তিনি সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন। কৃষ্ণ উদ্ধবকে বলছেন যশোদাকে জানাতে—

নীকৈ রহিয়ো জসুমতি মৈয়া।

আবৈংগে দিন চারি পাঁচ মেঁ, হম হলধর দোউ ভৈয়া ॥

*　　　*　　　*

জা দিন তৈঁ হম তুমতেঁ বিছুরে, কোউ ন কহত কন্হৈয়া ॥[২৫৮]

—মা, তুমি ভাল থেকো। আমি ও বলরাম দাদা চারপাঁচদিনের মধ্যেই যাব। * * * * * যেদিন থেকে তোমাকে ছেড়ে এসেছি সেদিন থেকে কেউ আমাকে কানাই বলে ডাকে না।

"কানাই" ডাকটি যশোদার সমগ্র সত্ত্বার সরব প্রতীক। আজ মথুরার রাজা কৃষ্ণ সিংহাসনে বসেও যে ডাক শোনার জন্য ব্যাকুল।

যশোদা উদ্ধব মারফৎ কৃষ্ণের সংবাদ পেলেন; কিন্তু মায়ের মন তাতে ভরে না। তিনি পুত্রকে কাছে পেতে চান, চোখের সামনে দেখতে চান। তাই তিনি উদ্ধবকে বললেন—

ঊধো পা লাগতি হোঁ কহিয়ো, স্যামহিঁ ইতনী বাত।

ইতনী দূর বসত ক্যোঁ বিসরে, অপনে জননী-তাত ॥

জা দিন তৈঁ মধুপুরী সিধারে, স্যাম মনোহর গাত।

তা দিন তৈ মেরে নৈন পপীহা, দরস প্যাস অকুলাত ॥[২৫৯]

—উদ্ধব, পায়ে ধরি, শ্যামকে এই কথা ব'লো, নিজের মা-বাবাকে এত কাছে থেকেও কেন ভুলে আছে! যেদিন শ্যাম মনোহর মধুপুরী চলে গেছে, সেদিন থেকে আমার নয়ন-পাপিয়া তাকে দেখার জন্য পিপাসার্ত হয়ে আছে।

যশোদা বারবার উদ্ধবকে অনুরোধ করছেন কৃষ্ণকে একবার বৃন্দাবনে পাঠিয়ে দেবার জন্য। তাছাড়া যশোদা দেবকীর কাছেও অনুরোধ করে পাঠিয়েছেন যেন কৃষ্ণকে তিনি একবার পাঠিয়ে দেন। তিনি ও নন্দ তো দেবকীর কাছে কোন অপরাধ করেননি। বরং দেবকী-বসুদেবের পুত্রকে রক্ষার জন্য তিনি নিজের কন্যাকে কংসের বলি হিসাবে পাঠিয়েছেন।[২৬০] তিনি অনেক যত্নেই তাঁদের পুত্রকে লালন করেছেন। অবশেষে মাতৃ-হৃদয়ের চরম যন্ত্রনার কথাটি বলেছেন — "মৈয়া কৌন বুলাবৈ"। অর্থাৎ, মা বলে আর

কে আমাকে ডাকবে ?

উদ্ধব মথুরা ফিরে যাচ্ছেন, যশোদা তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ দান মায়ের আশীর্বাদ পাঠাচ্ছেন।

কহিয়ো জসুমতি কী আসীস।

জহা রহো তহ' নন্দ লাড়িলো, জীবো কোটি বরীস।[২৬১]

—উদ্ধব, যশোদার আশীর্বাদ দিও। নন্দ-নন্দন যেখানেই থাকুন, কোটি বৎসর তাঁর আয়ু হোক।

যশোদা কোথাও কৃষ্ণকে দেবকী-নন্দন বা রাজা কৃষ্ণ সম্বোধন করছেন না। কারণ, যশোদার কাছে কৃষ্ণ চিরদিনই নন্দ-নন্দন, অর্থাৎ যশোদার পুত্রই। পুত্রের জন্য সঙ্গে দিলেন,—

মুরলা দঈ, দোহনী ঘৃত ভরি, উধো ধরি লই সীস।

য়হ তো ঘৃত উনহী সুরভিনি কো, জে প্যারী জগদীস॥[২৬২]

—বাঁশী, দুধ দুইবার পাত্র ভরে ঘি দিলেন। উদ্ধব তা মাথায় তুলে নিলেন। কৃষ্ণকে বলতে বললেন যে, এ ঘি জগদীশের আদরের গোরু সুরভির দুধ থেকে তৈরী।

হিন্দী পদাবলীতে যশোদা ও নন্দের আশীর্বাদ পাঠানোর দৃশ্য পরিচিত। পরমানন্দদাসের রচনাতেও এই ধরনের পদ পাওয়া যায়। সুরদাসও পরমানন্দদাসের আশীর্বাদের ভঙ্গিমা অনেকটা একই রকম। শুধু পরমানন্দদাস তাঁর পদে মাতৃস্নেহের সঙ্গে পিতৃস্নেহও যুক্ত করায় বাৎসল্যের বিকাশ পূর্ণতর হয়েছে। পরমানন্দদাস পিতৃ হৃদয়ের মমতার কথা আরো একটু বেশী করে বলেছেন। কারণ, সন্তানের বিচ্ছেদ যন্ত্রণা শুধু মা'র নয়, পিতার অন্তরেও বর্তমান।

কহত নন্দ উধো কে আগে নেন নীর ভরি আবত।

মন্দভাগ হম ব্রজকে বাসী কৃষ্ণ-বিনা দুখ পাবত॥[২৬৩]

নন্দ চোখের জল ফেলতে ফেলতে উদ্ধবকে বলছেন, মন্দভাগ্য আমরা ব্রজবাসী কৃষ্ণ বিনা নিত্য দুঃখ পাচ্ছি।

ভাগবতে আছে সূর্যগ্রহণ উপলক্ষ্যে কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণের সঙ্গে গোপগণের সাক্ষাৎ হয়।[২৬৪] হিন্দী কাব্যে ভাগবতের সেই অংশটি গ্রহণ করা হয়েছে।

বৃন্দাবনের সমস্ত গোপ-গোপিনীরা কুরুক্ষেত্রে এসেছেন কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হতে। নন্দ-যশোদাও ছুটে এসেছেন পুত্রকে দেখতে।

নন্দ যশোদা সব ব্রজবাসী

অপনে অপনে সকট সাজিকৈ, মিলন চলে অবিনাসী।[২৬৫]

—নন্দ-যশোদা ও অন্যান্য সব ব্রজবাসী নিজেদের শকট সাজিয়ে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হবার আশায় দ্রুত চললেন।

কর্মব্যস্ত কৃষ্ণের সঙ্গে কুরুক্ষেত্রের প্রাঙ্গণে দেখা হল অল্প সময়ের জন্য—

আএ মেরে পাহুনে মিলনু।

নন্দ-জসোদা উঠি-উঠি ভেটত আপুনে' ললনু॥[২৬৬]

—অতিথি মিলনের সময় হয়। নন্দ-যশোদা নিজের পুত্রের সঙ্গে উঠে মিলিত হলেন।

বাৎসল্য পর্বের এই সমাপ্তি বড় বিবর্ণ মনে হয়। এক মর্মস্পর্শী নাটকীয় পরিবেশ রচনার সুযোগ পদকর্তারা গ্রহণ করেননি। কেন, তা বোঝা যায় না। এতদিন পরে পুত্রকে দেখে নন্দ-যশোদার নিরুদ্ধ বেদনা উৎসারিত হয়ে উঠতে পারত। এক চরম মুহূর্ত এল তাঁদের জীবনে। অথচ তা উপেক্ষিতই রয়ে গেল। রাজবেশী, কর্মব্যস্ত বয়স্ক কৃষ্ণকে দেখে নন্দ-যশোদা কি মুহূর্তের মধ্যে উপলব্ধি করলেন,— ইনি তাঁদের আদরের কানাই নন। যাঁকে কোলে করা যায়, আদর করা যায় আবার দরকার হলে শাস্তিও দেওয়া যায়। ইনি অলৌকিক শক্তিধর দেবতা। মানব-মানবীর লৌকিক স্নেহের অশ্রুজল দিয়ে তাঁকে নতুন করে আপন করবার প্রয়াস বৃথা।

রাধার প্রতি বাৎসল্য

বৈষ্ণব সাহিত্যে রাধা একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারিণী। রাধার পূর্বরাগ, অভিসার, মান ও বিরহ প্রভৃতি নিয়ে শত শত পদ যুগযুগ ধরে কবিরা রচনা করেছেন। অথচ রাধার শৈশবকে কেন্দ্র করে কীর্তিকা বা অন্য কোন নারীর বাৎসল্যের পদ বাংলা ও হিন্দী উভয় ভাষার পদাবলীতে বেশী পাওয়া যায় না।

রাধাকে কেন্দ্র করে বাৎসল্যের পদে বাংলা ও হিন্দীভাষী কবিদের মধ্যে একদিকে যেমন যথেষ্ট মিল রয়েছে, অন্যদিকে উভয় ভাষার কবিদের মধ্যে স্বকীয়া ও পরকীয়া মতবাদের পার্থক্য থাকায় মৌলিক ভিন্নতাও লক্ষণীয়।

বাঙালী কবিরা রাধাকে জন্ম মুহূর্ত থেকেই কৃষ্ণ অনুরাগিনী হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। রাধার জন্ম হয়েছে, বৃষভানুপুরী উৎসবে মত্ত। কিন্তু রানী কীর্তিকা কন্যাকে দেখে চিন্তায় আকুল হয়ে পড়েছেন, কারণ কন্যা চক্ষুহীনা।

নাহিক নয়ান দু'টি কীর্তিকা দেখিল॥
পায়াছিলাম সাধ পুরাব রতনের বিধি।
গোবিন্দ দাস কহে নিদারুণ বিধি।[২৬৭]

কন্যা হয়েছে শুনে প্রতিবেশিনীরা কীর্তিকার গৃহে এসেছেন। কিন্তু অন্ধ কন্যা পেয়ে কীর্তিকা বেদনায় কাতর।

কান্দয়ে কীর্তিকা রাণী দুনয়নে বহে পানি
ধূলে পড়ি গড়াগড়ি যায়।[২৬৮]

সকলের অনুরোধে এবং মমতাবশে কীর্তিকা চোখের জল মুছে কন্যাকে কোলে তুলে নেন। ইতিমধ্যে সংবাদ পেয়ে ব্রজরমণীদের সঙ্গে যশোদাও কৃষ্ণকে কোলে নিয়ে সেখানে এসেছেন। কোল থেকে পুত্রকে নামিয়ে তিনি কীর্তিকার পাশে গিয়ে বসলেন তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্য। আর এদিকে কৃষ্ণ হামা দিয়ে রাধার কাছে গিয়ে উপস্থিত এবং "রাই হিয়ায় হাত দিয়া রহিলেন হরি।"[২৬৯]

কীর্তিকা হঠাৎ দেখলেন কন্যা চোখ মেলে চেয়ে আছেন। তিনি বিস্ময়ে ও আনন্দে বিহ্বলা "নিরমল আঁখি দেখি, কীর্তিকা বিহ্বলা"।[২৭০] কীর্তিকার অন্তরের সমস্ত

দুঃখ মুহূর্তে অন্তর্হিত হয়ে যায়। কন্যার রূপে তিনি নিজেই মুগ্ধ:

কন্যার বদন দেখি কীর্তিকা জননী।
আনন্দে অবশ দেহ আপনা না জানি ॥[২৭২]

ব্রজাঙ্গনারাও কন্যার সৌন্দর্যে মুগ্ধ। তাঁরা সস্নেহে বলেন—

এ তোর বালিকা চান্দের কলিকা
দেখিয়া জুড়ায় আঁখি।
হেন মনে লয় সদাই হৃদয়ে
পসরা করিয়া রাখি ॥[২৭৩]

রাধা ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠছেন। এদিক ওদিক খেলতে চলে যান। একদিন নন্দ গৃহে গিয়েছেন। যশোদা তাঁকে যত্ন করে সাজিয়ে বাড়ী পাঠিয়ে দিলেন। কীর্তিকা মেয়ের সাজ-সজ্জা দেখে প্রশ্ন করেছেন—

প্রাণ-নন্দিনী রাধা বিনোদিনী
কোথা গিয়াছিলা তুমি।
এ গোপনগরে প্রতি ঘরে ঘরে
খুঁজিয়া ব্যাকুল আমি ॥[২৭৩]

তাছাড়া কীর্তিকা কন্যার আঁচলে নানা খাদ্য সামগ্রী দেখে আবার জানতে চাইলেন—

এ খীর মোদক চিনি কদলক
কে তোর আঁচরে দিল ॥
অগোর চন্দন কস্তুরী কুমকুম
কে রচিল তোর ভালে।[২৭৪]

রাধা বললেন, পথ থেকে যশোদা তাঁকে বাড়ী নিয়ে যান। যশোদার স্নেহ ও আদরের কথা তো বললেনই, সেই সঙ্গে কৃষ্ণের রূপে যে তিনি মুগ্ধ সে কথা বলতেও রাধা দ্বিধা করলেন না। রাধা বললেন—

তাহার বেটার রূপের ছটায়
জুড়াইল মোর প্রাণ ॥[২৭৫]

যশোদার আদর সম্বন্ধে আরও জানালেন—

কি হেন আকুতে তার বাম ভিতে
লয়ে বসাইল মোরে।
এক দিঠে রহি তাহার আমার
রূপ নিরীক্ষণ করে ॥[২৭৬]

সংসার অনভিজ্ঞা রাধা যশোদার এই একাগ্রভাবে উভয়কে একত্র দেখার অর্থ উপলব্ধি করতে পারেননি। জ্ঞানদাস রাধার শিশুসুলভ মানসিকতাকে তুলে ধরে বাস্তববোধের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু কীর্তিকা যশোদার এই বিশেষ সমাদরের অর্থ বোঝেন। আর তাই—

ঝিয়ের কাহিনী শুনি গোয়ালিনী
মুচকি মুচকি হাসে।[২৭৭]

কন্যার সারল্যে কীর্তিকার সস্নেহ হাস্য পরিবেশটি রমণীয় করে তুলেছে।

বাংলা বৈষ্ণব সাহিত্যে এরপর আর কন্যারূপে রাধাকে দেখতে পাওয়া যায় না। এরপর যে রাধার সঙ্গে আমাদের পরিচয় তিনি আয়ান-পত্নী হয়েও কৃষ্ণপ্রেমে পাগলিনী।

বাঙালী পদকর্তারা পরকীয়াতত্ত্বে বিশ্বাসী। রাধার পরকীয়া প্রেমের গাঢ়তা ও মাধুর্য বাংলা বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রাণবস্তু। তাই রাধার প্রতি বাৎসল্য সমগ্র পদাবলীতে অতি ক্ষুদ্র স্থান অধিকার করে আছে।

হিন্দী বৈষ্ণব কবিরা স্বকীয়াবাদে বিশ্বাসী; তাই পরমানন্দ দাস, নন্দ দাস প্রভৃতি কবিরা রাধা-কৃষ্ণের বিয়ে দিয়েছেন সমারোহের সঙ্গে। হিন্দী বৈষ্ণব সাহিত্যে রাধার হৃদয় জন্মকাল থেকে বাংলা পদাবলীর মতো কৃষ্ণানুরাগে রঞ্জিত নয়। সুরদাস অবশ্য শিশু রাধা ও কৃষ্ণের বিবাহের কথা বলেননি। তবে কবি দেখিয়েছেন শৈশবের সখ্য ক্রমে প্রেমে পরিণত হয়েছে এবং তিনি গন্ধর্বমতে রাধা-কৃষ্ণের বিবাহ দিয়েছেন। রাধার বিবাহ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে কীর্তিকা ও বৃষভানু, যশোদা কিংবা অন্য গোপিনীদের বাৎসল্যানুভূতির বিচিত্র প্রকাশ মনোরম হয়ে উঠেছে।

তবে হিন্দী কবিও রাধার কাহিনী আরম্ভ করেছেন জন্ম মুহূর্ত থেকে—

আঠৈ ভাদোঁ কী উঁজিয়ারী।
প্রগট ভঈ শ্রীকুবঁরি রাধিকা সকল-সিরোমণি প্যারী।[২৭৮]

ভাদ্রমাসের শুক্লা অষ্টমীতে সকলগুণের শিরোমণি সুন্দরী রাধিকা আবির্ভূত হলেন। আর রাধার জন্মের সংবাদ পাবার পর বৃষভানুপুরীতে আনন্দোৎসব শুরু হয়েছে।

কীর্তিকা স্নেহ-মুগ্ধ হয়ে কন্যার রূপ দেখছেন, "কীরতি চিগ নিরখী সুঠি কন্যা,"[২৭৯] অর্থাৎ, কীর্তিকা সুন্দরী কন্যাকে দেখে মুগ্ধ হচ্ছেন।

হিন্দী কবিরা কৃষ্ণের দৈনন্দিন জীবনের অনেক প্রসঙ্গ নিয়ে পদ রচনা করেছেন। তেমনি রাধার প্রাত্যাহিক জীবনের কিছু কিছু ঘটনাও হিন্দী পদাবলীতে পাওয়া যায়। এমনি একটি রাধার দোলনায় চড়া। দোলনায় দোল দিতে দিতে কীর্তিকা স্নেহাবেশে আনন্দ পাচ্ছেন:

রসিকিনী রাধা পলনা ঝুলৈ
দেখি দেখি গোপীজন ফুলৈ॥
রতন জটিত কো পলনা সোহৈ।
নিরখি নিরখি জননী মন মোহৈ॥[২৮০]

—সুরসিকা রাধা দোলনায় দুলছেন, আর তা দেখে গোপিনীদের গর্বের অন্ত নেই। রত্নখচিত দোলায় তিনি শোভা পাচ্ছেন, আর তা দেখে দেখে মা'র মন মোহিত হচ্ছে।

এর পরই রাধার এক বৎসর পূর্তি উৎসবের বর্ণনা। এই জন্মোৎসবের দিনে একজন গোপিনী শিশু রাধাকে দেখে স্নেহাবিষ্ট হয়ে অন্য এক গোপিনীকে বলছেন, রাধা কীর্তিকার অনেক ভাগ্যের ধন, আজ সেই ছোট্ট বাছার জন্মদিন, তাই তিনিও আজ আনন্দে উৎফুল্ল :

যহ সুখ দেখোরী তুম মাঈ !
বরস গাঁঠি বৃষভান— ললী কী বহুরী কুসল সাঁ আঈ ॥
আগম কে দিন নীকে' লাগত সবহিন মন সচু পাঈ ।
ধন বড ভাগ রানী কীরতিকে পুণ্য-পুঞ্জ-নিধি পাঈ ॥[২৮২]

হিন্দী কবির রাধা স্বকীয়া। একজন সমালোচক বলেছেন :

"গোড়ীয় বৈষ্ণব মত মে রাধা পরকীয়া হী হৈ ॥ হিন্দীকে ভক্তি সাহিত্য মে কুছ গোপিয়া তো পরকীয়া হৈ, পরন্তু রাধা স্বকীয়া হী হে।"[২৮২] অর্থাৎ, গোড়ীর বৈষ্ণব মতে রাধা পরকীয়া, হিন্দী ভক্তি সাহিত্যে কিছু গোপিনী পরকীয়া, কিন্তু রাধা স্বকীয়া।

সুরদাস ব্যতীত পরমানন্দ দাস, নন্দ দাস ও কুম্ভন দাস,— সকলেই শিশু-রাধা ও শিশু-কৃষ্ণের মধ্যে সমারোহের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছেন। কুম্ভনদাসের পদে আছে, রাধার জন্মের পর যশোদা প্রায় কীর্তিকার গৃহে যাতায়াত করছেন ; পরস্পর পরস্পরের পুত্র-কন্যাকে কোলে নিচ্ছেন, তেল মাখাচ্ছেন, আদর করছেন, ইত্যাদি। একদিন কথা প্রসঙ্গে কীর্তিকা বলছেন, সখী, এসো এই খোকা-খুকির বিয়ে দিই, তাহলে আমরা সর্বদা চোখ ভরে আনন্দের দৃশ্য দেখতে পাব :

কীর্তি কহী— মহরি ! যহ ললী ললা কী সগাঈ কীজে।
হিলিমিলিকে নেননি কো যহ সুখ সদা নিরন্তর লীজে ॥[২৮৩]

এর পরই উভয়ে বিবাহ স্থির করে ফেললেন।

নন্দদাস তো "স্যাম সগাই" (শ্যামের বিবাহ) নামক স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। নন্দদাসের পদাবলীতেও রাধাকৃষ্ণের বিবাহ সম্পর্কে পদ আছে। কিন্তু এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে যশোদা বা কীর্তিকার বাৎসল্যের পরিচয় পাওয়া যায় না।

সুরদাস সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পথ নিয়েছেন। তিনি শিশু রাধাকে প্রথম শিশু কৃষ্ণের খেলার সঙ্গিনী হিসাবেই বর্ণনা করেছেন। কৃষ্ণ বৃন্দাবনে নানা খেলায় মত্ত। হঠাৎ একদিন রাধাকে দেখতে পেলেন :

ঔচক হী দেখী তহ' রাধা...[২৮৪]

রাধা ও কৃষ্ণের পরিচয় হল, পরস্পরের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠতে লাগলো। কিন্তু রাধার চিন্তা রয়েছে ঘরে ফেরার। কারণ, মা তার জন্য চিন্তা করছেন। রাধা তাঁর সখীকে বলছেন যে, তাঁর মা তাঁকে নিশ্চয়ই খোঁজ করছেন। রাধার এই উক্তির মধ্যে প্রীতি-বাৎসল্য রসের সৃষ্টি হয়েছে :

মাতা কহতি কহাঁ হী প্যারী, কহাঁ অবের লগাঈ।[২৮৫]

—মা হয়ত বলছেন, বাছা কোথায় এত দেরী করছে,— রাধা বালিকা বয়সেই মা'র

প্রতি কত আকৃষ্ট তা এই উক্তি থেকে প্রমাণিত হয়।

কৃষ্ণের সঙ্গে খেলা করে রাধা বাড়ী ফিরছেন, কিন্তু মন পড়ে আছে কৃষ্ণের কাছে। মা কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করলে রাধা অসংলগ্ন উত্তর দেন। মেয়ের অবস্থা দেখে কীর্তিকা শঙ্কিত :

কুঁবঁরি কোঁ কহুঁ দীঠি লাগী, নিরখি কে পছিতাই।
সুর তব বৃষভানু-ঘরণী, রাধিকা উর লাই ॥[১৮৬]

—কীর্তিকা দেখে দেখে দুঃখ বোধ করছেন, আর ভাবছেন রাধার বুঝি কারো দৃষ্টি লেগেছে। সুরদাস বলেন, বৃষভানু ঘরণী তাই রাধাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

বাইরে ঘোরাঘুরি করাতেই কু-দৃষ্টি লাগে। তাই মা বলছেন :

কুঁবঁরি সোঁ কহতি বৃষভানু-ঘরণী।
নেকু নাহিঁ ঘর রহতি, তোহিঁ কিতনো কহতি,"...[১৮৭]

রাধাকে বৃষভানু ঘরণী বলছেন, তোমাকে কত বলি তবু ঘরে কিছুতেই থাকবে না...। তিনি কন্যাকে আরও বলেন, সবার ঘরে ছেলেমেয়ে আছে, কিন্তু তোমার মত ভয় ডরের বালাই নেই এমন কেউ নয়। কিন্তু মায়ের এইসব সস্নেহ উপদেশ বৃথা। রাধা যে কৃষ্ণের সঙ্গে খেলার জন্য আকুল। বাল্য প্রীতি ধীরে ধীরে প্রণয়ে পরিণত হচ্ছে।

রাধা একদিন নন্দের বাড়ী এসেছেন কৃষ্ণের সঙ্গে খেলা করতে। কৃষ্ণ তাঁর খেলার সাথীকে মা'র সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। যশোদা রাধার পরিচয় পেয়ে সস্নেহে তাঁকে বুকে টেনে নিলেন। এবং তারপর—

জসুমতি রাধা কুঁবরি সঁবারতি
বড়ে বার সীমন্ত সীসকে, প্রেম সহিত নিরুবারতি ॥
মাঁগ পারি বেণী জু সঁবারতি, গুঁথি সুন্দর ভাঁতি।
গোরেঁ ভাল বিন্দু বন্দন, মনু ইন্দু প্রাগ্ত-রবি কান্তি ॥[১৮৮]

—যশোদা রাধাকে সাজাচ্ছেন। সিঁথি করে সুন্দর বেণী বেঁধে দিয়েছেন, সস্নেহে তিনি রাধাকে দেখছেন। সুন্দর গৌর কপালে চন্দন বিন্দু যেন প্রভাত সূর্যের সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে। আর রাধার আঁচলে বেঁধে দিয়েছেন—

তিল চাঁবরী, বাতাসে, মেবা, দিয়ৌ কুঁবরি কী গোদ।[১৮৯]

রাধা গৃহে ফিরে এলেন। কীর্তিকা রাধার সাজসজ্জা ও আঁচলে নানা খাদ্য দেখে প্রশ্ন করছেন :

কিন তেরে ভাল তিলক রচি কীনৌ,
কিহিঁ কচ গুঁদি মাঁগ সির পারী।[১৯০]

—কে তোমার সিঁথি করে সুন্দর চুল বেঁধে দিয়েছে? কপালে তিলক এ কেছে কে?

কবি সুরদাসের এই পদ মনে করিয়ে দেয় জ্ঞানদাসের পদ—

অগোর চন্দন কস্তুরী কুম্কুম

কে রচিল তোর ভালে।[২৯১]

স্নেহ-প্রেমের ক্ষেত্রে ভাষা ও স্থান কালের ঊর্ধ্বে প্রায়ই মিল খুঁজে পাওয়া যায়। উপরোক্ত দু'টি পদ এই মিলের সুন্দর দৃষ্টান্ত।

রাধা বাড়ী ফিরে মাকে যশোদার কথা সব বললেন। তারপর নির্বিকার চিত্তে জানালেন— "মো-তন চিতৈ, চিতৈ ঢোটা-তন।"[২৯২]

রাধা বলছেন, যশোদা একবার আমাকে দেখেন আর একবার ছেলেকে দেখেন। একথা শুনে কীর্তিকা যশোদার অন্তরের আকাঙ্ক্ষা উপলব্ধি করে মৃদু মৃদু হাসতে থাকেন।

বৈষ্ণব পদাবলীতে রাধার প্রতি-বাৎসল্যের উজ্জ্বল প্রকাশ বেশী নেই। কৃষ্ণের লীলা-সহচরী বলেই রাধার সমাদর। পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে আমরা এ সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছি। অবশ্য রাধার প্রতি কীর্তিকার স্নেহ স্বাভাবিক ও সুন্দর। কিন্তু পদকর্তারা সেদিকে বিশেষ দৃষ্টিপাত করেননি। যশোদা রাধাকে স্নেহ করেন তিনি কৃষ্ণের ভালোবাসার পাত্রী বলে। বাৎসল্যরসের পদাবলীতে কৃষ্ণের সমুজ্জ্বল মূর্তির পাশে এক নগণ্য অনুজ্জ্বল স্থান অধিকার করে আছেন রাধা।

এই আলোচনা থেকে দুই ভাষার বাৎসল্যরসাশ্রিত পদাবলীর মধ্যে যে সাদৃশ্য প্রথমেই লক্ষ্য করা যায় তা হল কৃষ্ণের জীবন-কথার প্রসঙ্গ। উভয় ভাষার পদকর্তারাই ভাগবত থেকে কৃষ্ণ-কাহিনী গ্রহণ করবার ফলে এই সাদৃশ্য। কিন্তু হিন্দী ও বাংলা পদাবলীতে বৈসাদৃশ্য এবং নিজস্ব বৈশিষ্ট্যও লক্ষণীয়। এই সব পার্থক্য ও বিশিষ্টতার জন্য উভয় ভাষার বাৎসল্যের পদাবলী নিজস্ব চরিত্রে সমৃদ্ধ। নিজস্বতা আছে বলেই পদাবলী সাহিত্য নিছক ভাগবতের অনুবৃত্তি হয়নি।

বিষয় এক হলেও প্রতিভাবান কবিরা নিজস্ব রচনারীতির দ্বারা তাঁদের রচিত পদাবলী বিশিষ্টরূপে চিহ্নিত করেছেন। শব্দচয়ন, অলংকার ও উপমার প্রয়োগ এবং দৃষ্টিভঙ্গির নিজস্বতা একই কৃষ্ণ-প্রসঙ্গ মনোরম ভিন্নতায় সমুজ্জ্বল করেছে এবং ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তি থেকে রক্ষা করেছে পদাবলীর কাব্যপ্রাণকে।

তাছাড়া সামাজিক ও ভৌগোলিক ভিন্নতা হিন্দী ও বাংলা বাৎসল্যরসের পদাবলীতে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে। তাই হিন্দী কবির কৃষ্ণ প্রকৃতই গোপ-বালক; তিনি খেলা ছাড়াও দুধ দুইতে শেখার জন্য উৎসুক। কৃষ্ণ গোচারণে যান কারণ এটা তাঁর কুলধর্ম, সুতরাং কর্তব্য।

কিন্তু বাঙালী কবির কৃষ্ণ গোচারণে যান বন্ধুদের সঙ্গে খেলার সুযোগ পেতে। বৃন্দাবনের যশোদা পুত্রের গোষ্ঠ যাত্রায় চিন্তিত,— পাছে কোন বিপদ ঘটে! আবার আনন্দিতও, কারণ পুত্রের কুলধর্ম পালনের জন্য এই প্রথম সংসার-জীবনে প্রবেশ। কিন্তু নবদ্বীপের যশোদা পুত্রের বিচ্ছেদবেদনায় কাতর। অন্ততঃ হিন্দী কবির যশোদার চেয়ে অনেক বেশী ব্যাকুল। যতক্ষণ কৃষ্ণ গোষ্ঠে থাকেন ততক্ষণ বাঙালী পদকর্তার যশোদা পুত্র বিচ্ছেদের জন্য বিলাপ করেন; গোচারণে গিয়ে কৃষ্ণ যে কুলধর্ম পালন করছেন,— এ সম্বন্ধে যশোদার সচেতনতা লক্ষ্য করা যায় না।

হিন্দী পদাবলীতে শিশু কৃষ্ণের প্রধান আশ্রয় দোলনা। বাংলা পদাবলীতে দোলনা প্রায় অনুপস্থিত। পরিবর্তে আছে মায়ের কোল। সুতরাং মাতা-পুত্রের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ ও নিবিড়। মা'র স্নেহের আতিশয্য প্রতি ক্ষেত্রে দেখা যায়। মাতৃস্নেহপুষ্ট বাঙালী কবির কৃষ্ণ একটু দুষ্টু, জেদী এবং ভোজনরসিক। বৃন্দাবনের যশোদাও স্নেহশীলা, কিন্তু বাংলার যশোদার মতো স্নেহের দাবীর কাছে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করতে দেখা যায় না। বাঙালী কবির যশোদার অন্তরে স্নেহের এতই প্রাবল্য যে পুত্রের স্পর্শে বা চিন্তায় দেহে শিহরণ জেগে ওঠে এবং স্বতোৎসারিত স্তন্যধারায় তাঁর বসন সিক্ত হয়।

দুই অঞ্চলের ধর্ম সাধনার পার্থক্যও বৈসাদৃশ্য সৃষ্টির সহায়ক হয়েছে। হিন্দী বাৎসল্যরসের কবিরা প্রায় সকলেই পুষ্টিমার্গের ভক্ত। তাঁদের গুরু ছিলেন বালগোপালের উপাসক। তাই কবি-শিষ্যদের উপর এর প্রভাব পড়েছে। কবিরা বাৎসল্যরসের পদাবলী রচনায় উৎসাহিত হয়েছেন। হিন্দী বৈষ্ণব কাব্যে তাই বাৎসল্য রসের পদাবলীর উৎকর্ষ ও প্রাচুর্য দুই-ই দেখা যায়। হিন্দীতে কৃষ্ণের বাল্যজীবন বর্ণনায় ধারাবাহিকতা আছে এবং বর্ণনা বিশদ। বাঙালী পদকর্তারা ধারাবাহিকতা এবং বিশদ বর্ণনার প্রতি মনোযোগী ছিলেন না: তারা কৃষ্ণের কোনো কোনো জীবন-প্রসঙ্গ অবলম্বন করে লিরিকধর্মী পদ রচনা করেছেন। একমাত্র ব্যতিক্রম দীন চণ্ডীদাস। তিনি অনেকটা হিন্দী কবিদের রীতি অনুযায়ী পদ রচনা করেছেন।

হিন্দী কবিরা শুধু কৃষ্ণের প্রতি যশোদার বাৎসল্য অবলম্বনে পদ রচনার সুযোগ পেয়েছেন। বাঙালী পদকর্তারা কিন্তু গৌরাঙ্গের জন্য শচীমাতার স্নেহকে পদাবলীর বিষয় হিসাবে গ্রহণ করবার অতিরিক্ত সুযোগ পেয়েছেন। শচীমাতা ও গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদগুলি কাব্যগুণে সমৃদ্ধ এবং পাঠকচিত্তে তাদের আবেদনও গভীরতর।

গৌরাঙ্গ ছিলেন মধুর ভাবের উপাসক। তাই বাংলা পদাবলীতেও মধুর রসের প্রাধান্য। মধুররসের এই প্রাধান্য বাংলা বাৎসল্যরসের পদাবলীর উপরও পড়েছে। কৃষ্ণ মথুরা যাবার পর রাধার যে বিরহ বেদনা, তাকে অবলম্বন করে বহু বাংলা পদ রচিত হয়েছে। রাধার মতো যশোদা পুত্র বিরহে কাতর। কৃষ্ণ গোচারণে যান। সারাদিন বাড়ী থাকেন না। যশোদা পুত্রের বিচ্ছেদে কাতর। যশোদার পুত্র-বিরহকে গুরুত্ব দেবার জন্য বাংলা পদাবলীতে গোষ্ঠলীলার পদ প্রাধান্য পেয়েছে।

বাংলা মধুররসের পদাবলীতে রাধাই নায়িকা। হিন্দী পদাবলীতে রাধা গোপিনীদের একজন মাত্র,— নায়িকার বিশিষ্ট মর্যাদা তাঁকে দেওয়া হয়নি। তেমনি বাৎসল্যের ক্ষেত্রে বাংলা পদাবলীতে যশোদাই নায়িকা। একমাত্র দীন চণ্ডীদাস ব্যতীত অন্য পদকর্তারা কৃষ্ণের পরিজনদের পশ্চাদ্ভূমিতে রেখেছেন। অপরপক্ষে হিন্দী পদাবলীতে কৃষ্ণকে স্নেহ করবার দাবীদার শুধু যশোদা নন; আছেন নন্দ, রোহিণী, বলরাম এবং ব্রজভূমির গোপ-গোপিনীরা। প্রেমে গভীরতার সঙ্গে আছে কিছুটা সংকীর্ণতা। প্রণয়ী-প্রণয়িনী পরস্পরের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় তৎপর; আত্মীয়-পরিজনের অবস্থান তখন তাদের মনোজগতের বাইরে। এই প্রবণতা বাঙালী কবিরা

রূপায়িত করেছেন যশোদার মধ্যে। যেন কৃষ্ণের উপর স্নেহের দাবী যশোদার একার,—আর কারো নয়।

বাংলা ও হিন্দী বাৎসল্যরসের পদাবলী নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিকাশ লাভ করেছে। উভয়ের মধ্যে কোথায় সাদৃশ্য কোথায় বৈসাদৃশ্য তা ব্যাখ্যা করে দেখাবার প্রয়াস করা হয়েছে। কিছু ভিন্নতা থাকলেও মৌলিক ঐক্যটাই প্রধান কথা। কারণ উভয় ভাষার বাৎসল্যরসাশ্রিত পদাবলীর সৃষ্টি ও বিকাশের মূলে রয়েছে ভক্তিরস। যেন একটি বাৎসল্য ভক্তিরসবৃন্তে বাংলা ও হিন্দী বাৎসল্যরসের দু'টি প্রস্ফুটিত পদাবলী-কুসুম।

নির্দেশিকা

১ Donne, J. The Elegies and the Songs and Sonnets, P. 6.

২. Shakespeare, W. Much Ado About Nothing Act III. Sc. 5.

৩. নন্দদুলারে বাজপেয়ী, সম্পাদক। সুর সাগর, ১ম খণ্ড, পৃ ৭৩, পদ ২২৫

৪. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী সম্পাদিত। শ্রীমদ্‌ভাগবতম্‌, দশম স্কন্ধ, তৃতীয় অধ্যায়, শ্লোক-৯

৫. তদেব, দশম স্কন্ধ, তৃতীয় অধ্যায়, শ্লোক-১২

৬. গীতা চট্টোপাধ্যায়। ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য, পৃ ৩৮৯

৭. তদেব, পৃ ৩৮৩

৮. মণীন্দ্রমোহন বসু, সম্পাদক। দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ ২৮, পদ ১৬

৯ মণীন্দ্রমোহন বসু, সম্পাদক। দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ ৩২, পদ ১৮

১০. তদেব, ১ম খণ্ড, পৃ ৩২, পদ ১৮

১১. তদেব, পৃ ২৭, পদ ১৫

১২. বিমানবিহারী মজুমদার, সম্পাদক। গোবিন্দদাসের পদাবলী, পৃ ৬৬৯, পদ ৭৮৫

১৩. মণীন্দ্রমোহন বসু, সম্পাদক। দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ ৩৯, পদ ২৪

১৪. তদেব, ১ম খণ্ড, পৃ ৩৯, পদ ২৪

১৫. নন্দদুলারে বাজপেয়ী, সম্পাদক। সুর-সাগর, ১ম খণ্ড, পৃ ২৬১, পদ ১০।৬২৮

১৬. নন্দদুলারে বাজপেয়ী, সম্পাদক। সুর-সাগর, ১ম খণ্ড, পৃ ২৬০, পদ ৮।৬২৬

১৭. ব্রজভূষণ শর্মা, সম্পাদক। পরমানন্দ-সাগর, পৃ ৩, পদ ৭

১৮· তদেব, পৃ ৩, পদ ৭

১৯· নন্দদুলারে বাজপেয়ী, সম্পাদক। সুর-সাগর, ১ম খণ্ড, পৃ ২৬১, পদ ১৩।৬৩১

২০· ব্রহ্মচারী অমরচৈতন্য, সম্পাদক। বলরামদাসের পদাবলী, পৃ ৩৩

২১· মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, সম্পাদক। শ্রীমদ্ভাগবতম্, ১০ম স্কন্ধ, ৫ম অধ্যায়, শ্লোক ১৪

২২· সতীশচন্দ্র রায়, সম্পাদক। পদকল্পতরু, ২য় খণ্ড, ৩য় শাখা, পৃ ২৬৩-২৬৪, পদ ৪।১১৪৪

২৩· মহানামব্রত ব্রহ্মচারী। শ্রীমদ্ভাগতম্, ১০ম স্কন্ধ, ৮ম অধ্যায়, শ্লোক ৩৭-৩৮

২৪· মহানামব্রত ব্রহ্মচারী সম্পাদিত। শ্রীমদ্ভাগবতম, ১০ম স্কন্ধ, ৮ম অধ্যায় শ্লোক-৪০

২৫· নন্দদুলারে বাজপেয়ী, সম্পাদক। সুর-সাগর, ১ম খণ্ড, পৃ ৩৪৭, পদ ২৫৭।৮৭৫

২৬· সতীশচন্দ্র রায়, সম্পাদক। পদকল্পতরু ২য় খণ্ড, ৩য় শাখা, পৃ ২৬৪, পদ ৪।১১৪৪

২৭· গীতা চট্টোপাধ্যায়। ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য, পৃ ৩৯৬

২৮· সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ ২০০

২৯· চৈতন্যচরিতামৃত। ১।৩।৮৩

৩০· শশিভূষণ দাশগুপ্ত। শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ, ৪র্থ সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ, পৃ ৩১৫

৩১· ব্রজভূষণ শর্মা ও অন্যান্য, সম্পাদক। কুম্ভনদাস, পৃ ৩১, পদ ৫৯

৩২· রত্নকুমারী। ১৬ বী শতাব্দীকে হিন্দী ঔর বঙ্গালী বৈষ্ণব কবি, পৃ ১৭১

৩৩· মালবিকা চাকী, সম্পাদক। বাসু ঘোষের পদাবলী, পৃ ৮-৯, পদ ৯

৩৪· সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ। অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ ; পরিশিষ্ট, পৃ ৫০

৩৫· শশিভূষণ দাশগুপ্ত। শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ, ৪র্থ সং-এর পুনর্মুদ্রণ, পৃ ৩১৭

৩৬· শশিভূষণ দাশগুপ্ত। শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ, ৪র্থ সং এর পুনর্মুদ্রণ, পৃ ৩১৮

৩৭· নন্দদুলারে বাজপেয়ী সম্পাদক। সুর-সাগর, ১ম খণ্ড, পৃ ২৫৭, পদ ৪।৬২২

৩৮· নন্দদুলারে বাজপেয়ী, সম্পাদক। সুর-সাগর, ১ম খণ্ড, পৃ ২৬০, পদ ৯।৬২৭

৩৯· বিমানবিহারী মজুমদার, সম্পাদক। গোবিন্দদাসের পদাবলী, পৃ ৩৬৯, পদ ৭৮৫

৪০. মণীন্দ্রমোহন বসু, সম্পাদক। দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ ৩৮, পদ ২৩

৪১. নন্দদুলারে বাজপেয়ী, সম্পাদক। সুর-সাগর, ১ম খণ্ড, পৃ ২৬২, পদ ১৫।৬৩৩

৪২. ব্রহ্মচারী অমরচৈতন্য, সম্পাদক। বলরামদাসের পদাবলী, পৃ ৩৩

৪৩. মণীন্দ্রমোহন বসু, সম্পাদক। দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ ৪৯, পদ ৩৩

৪৪. নন্দদুলারে বাজপেয়ী, সম্পাদক। সুর-সাগর, ১ম খণ্ড, পৃ ২৭২, পদ ৩৫।৬৫৩

৪৫. মণীন্দ্রমোহন বসু, সম্পাদক দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ ৪৯, পদ ৩৩

৪৬ ব্রজভূষণ শর্মা, সম্পাদক। পরমানন্দ-সাগর, পৃ ২৬, পদ ৫৭।

৪৭. নন্দদুলারে বাজপেয়ী, সম্পাদক। সুর-সাগর, ১ম খণ্ড, পৃ ২৯১, পদ ৮৯।৭০৭

৪৮. তদেব, পৃ ২৯৩, পদ ৯৫।৭১৩

৪৯. ব্রজভূষণ শর্মা, সম্পাদক। পরমানন্দ-সাগর, পৃ ১২, পদ ২৯

৫০. তদেব, পৃ ৫৭৭, পদ ১২৮৮

৫১. নন্দদুলারে বাজপেয়ী, সম্পাদক। সুর-সাগর, ১ম খণ্ড, পৃ ২৭৫, পদ ৪১।৬৫৯

৫২. ব্রজভূষণ শর্মা, সম্পাদক। পরমানন্দ-সাগর, পৃ ২০, পদ ৪১

৫৩. মণীন্দ্রমোহন বসু, সম্পাদক। দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ ৫১, পদ ৩৬

৫৪. যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, সম্পাদক। রায়শেখরের পদাবলী, পৃ ১, পদ ১

৫৫. নন্দদুলারে বাজপেয়ী, সম্পাদক। সুর-সাগর, ১ম খণ্ড, পৃ ২৮৬, পদ ৭৬।৬৯৪

৫৬ নন্দদুলারে বাজপেয়ী, সম্পাদক। সুর-সাগর, ১ম খণ্ড, পৃ ২৮৩, পদ ৬৪।৬৮২

৫৭. ব্রজভূষণ শর্মা, সম্পাদক। পরমানন্দ-সাগর, পৃ ৫৮, পদ ১২৩

৫৮. নন্দদুলারে বাজপেয়ী, সম্পাদক। সুর-সাগর, ১ম খণ্ড, পৃ ২৮৪, পদ ৬৮।৬৮৬

৫৯. তদেব, ১ম খণ্ড, পৃ ২৯২, পদ ৯২।৭১০

৬০. যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, সম্পাদক রায়শেখরের পদাবলী, পৃ ১১৪

৬১. নন্দদুলারে বাজপেয়ী, সম্পাদক। সুর-সাগর, ১ম খণ্ড, পৃ ২৮৬, পদ ৭৪।৬৯২

৬২ তদেব ১ম খণ্ড, পৃ ২৯৪-২৯৫, পদ ৯৮।৭১৬

৬৩. সতীশচন্দ্র রায়, সম্পাদক। পদকল্পতরু, ২য় খণ্ড তৃতীয় শাখা পৃ ২৬৩ পদ ৩।১১৪৩

৬৪. তদেব, পৃ ২৬২ পদ ১।১১৪১

৬৫. তদেব, পৃ ২৬৭ পদ ১৪।১১৫৪

৬৬. নবদ্বীপ ব্রজবাসী, সম্পাদক। পদামৃত মাধুরী, ৩য় খণ্ড, পৃ ৮৮-৮৯

৬৭. ব্রজভূষণ শর্মা, সম্পাদক। পরমানন্দ-সাগর, পৃ ১৮ পদ ৩৬

৬৮. নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী, সম্পাদক। পদামৃত মাধুরী, ৩য় খণ্ড, পৃ ৮৯

৬৯. মালবিকা চাকী, সম্পাদক। বাসুঘোষের পদাবলী, পৃ ৭, পদ ৬

৭০. নন্দদুলারে বাজপেয়ী, সম্পাদক। সুর-সাগর, ১ম খণ্ড, পৃ ২৯৯, পদ ১১২।৭৩০

৭১. তদেব, পৃ ৩০২, পদ ১২২।৭৪০

৭২. তদেব, ১ম খণ্ড, পৃ ৩০৩, পদ ১২৬।৭৪৪

৭৩. সতীশচন্দ্র রায়, সম্পাদক। পদকল্পতরু ২য় খণ্ড, তৃতীয় শাখা পৃ ২৬৮, পদ ১৬।১১৫৬

৭৪. তদেব, পৃ ২৬৮, পদ ১৭।১১৫৭

৭৫. তদেব, পৃ ২৬৮, পদ ১৭।১১৫৭

৭৬. তদেব, পৃ ২৬৭, পদ ১৪।১১৫৪

৭৭. নন্দদুলারে বাজপেয়ী, সম্পাদক। সুর-সাগর, ১ম খণ্ড, পৃ ৩০৬, পদ ১৩৪।৭৫২

৭৮. ব্রজভূষণ শর্মা, সম্পাদক। পরমানন্দ-সাগর, পৃ ৫২, পদ ১১৩

৭৯. সতীশচন্দ্র রায়, সম্পাদক। পদকল্পতরু ২য় খণ্ড, ৩য় শাখা, পৃ ২৬৬, পদ ১১।১১৫১

৮০. ভবানীশংকর যাজ্ঞিক, সম্পাদক। রসখান-রত্নাবলী, পৃ ৮৩, পদ ৩০

৮১. নন্দদুলারে বাজপেয়ী, সম্পাদক। সুর-সাগর, ১ম খণ্ড, পৃ ৩১৩, পদ ১৫৫।৭৭৩

৮২. তদেব, পৃ ৩৩৬, পদ ২২২।৮৪০

৮৩. তদেব, পৃ ৩১৯, পদ ১৭৪।৭৯২

৮৪. তদেব, ১ম খণ্ড পৃ ৩১৯-৩২০, পদ ১৭৫।৭৯৩

৮৫. ব্রজরত্ন দাস সম্পাদক। নন্দদাস-গ্রন্থাবলী, পৃ ২৯১, পদ ৩১

৮৬. তদেব, পৃ ২৯১, পদ ৩১

৮৭. নন্দদুলারে বাজপেয়ী, সম্পাদক। সুর-সাগর, ১ম খণ্ড পৃ ২৩৫, পদ ২২১।৮৩৯

৮৮. সুকুমার ভট্টাচার্য, সম্পাদক। যশোদার বাৎসল্য লীলা, পৃ ২, পদ ২

৮৯. বিমানবিহারী মজুমদার ও সুখময় মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক। জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গল, পৃ ২২

৯০. তদেব, পৃ ২২

৯১ নন্দদুলারে বাজপেয়ী সম্পাদক। সুর-সাগর, ১ম খণ্ড, পৃ ৩৪১, পদ ২৩৯।৮৫৭

৯২. তদেব, পৃ ৩৪১, পদ ২৩৯।৮৫৭

৯৩. ব্রজভূষণ শর্মা, সম্পাদক। পরমানন্দ-সাগর, পৃ ৫৮, পদ ১২৫

৯৪. নন্দদুলারে বাজপেয়ী, সম্পাদক। সুর-সাগর, ১ম খণ্ড, পৃ ৩২৫, পদ ১৮৬।৮০৪

৯৫. ব্রজভূষণ শর্মা, সম্পাদক। পরমানন্দ-সাগর, পৃ ৩৬, পদ ৭৯

৯৬. নন্দদুলারে বাজপেয়ী, সম্পাদক। সুর-সাগর, ১ম খণ্ড, পৃ ৩৩৬, পদ ২২৩।৮৪১

৯৭. তদেব, পৃ ৩৩৬, পদ ২২৩।৮৪১

৯৮. তদেব, পৃ ৩৩৬, পদ ২২৩।৮৪১

৯৯. তদেব, পৃ ৩৪০, পদ ২৩৫।৮৫৩

১০০. তদেব, পৃ ৩৩৭, পদ ২২৪।৮৪২

১০১. ব্রহ্মচারী অমর চেতনা, সম্পাদক। বলরাম দাসের পদাবলী, পৃ ৩৪

১০২. যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, সম্পাদক। রাসশেখরের পদাবলী, পৃ ৩, পদ ৩

১০৩. সুকুমার ভট্টাচার্য, সম্পাদক। যশোদার বাৎসল্য লীলা, পৃ ১, পদ ১

১০৪. নবদ্বীপ ব্রজবাসী, সম্পাদক। পদামৃত মাধুরী, ৩য় খণ্ড, পৃ ৭৯

১০৫. ব্রহ্মচারী অমরচৈতন্য, সম্পাদক। বলরামদাসের পদাবলী, পৃ ৩৪-৩৫

১০৬. ব্রহ্মচারী অমর-চেতন্য, সম্পাদক। বলরামদাসের পদাবলী, পৃ ৩৫

১০৭ সতীশচন্দ্র রায়, সম্পাদক। পদকল্পতরু, ২য় খণ্ড, তৃতীয় শাখা, পৃ ২৭০, পদ ২।১১৬২

১০৮. তদেব, পৃ ২৭০, পদ ৪।১১৬৪

১০৯. নবদ্বীপ ব্রজবাসী, সম্পাদক। পদামৃতমাধুরী, তৃতীয় খণ্ড, পৃ ১০৮

১১০. পঞ্চানন চক্রবর্তী, সম্পাদক। রামেশ্বর রচনাবলী, পৃ ৩৭৬

১১১. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্বপতি চোধুরী, সম্পাদক। কবিকঙ্কণ' চণ্ডী, ১ম খণ্ড, পৃ ৩১

১১২. সতীশচন্দ্র রায়, সম্পাদক। পদকল্পতরু, ২য় খণ্ড, ৩য় শাখা, পৃ ২৭০,- পদ ৪।১১৬৪

১১৩. তদেব, পৃ ২৭১, পদ ৭।১১৬৭

১১৪. তদেব, পৃ ২৭২, পদ ৭।১১৬৭

১১৫. ভাগবত। দশম স্কন্ধ, নবমোহধ্যায়, পৃ ১৬৫ এবং ১৬৮, শ্লোক ১১-১৪

১১৬. ব্রহ্মচারী অমরচৈতন্য, সম্পাদক। বলরামদাসের পদাবলী পৃ ৩৬

১১৭. ব্রহ্মচারী অমরচৈতন্য, সম্পাদক। বলরামদাসের পদাবলী, পৃ ৩৬

১১৮. তদেব পৃ, ৩৬

১১৯. ব্রজভূষণ শর্মা, সম্পাদক। পরমানন্দ-সাগর, পৃ ৮৫, পদ ১৮৩

১২০. তদেব, পৃ ৯১, পদ ১৯৭

১২১. তদেব, পৃ ৮৮, পদ ১৯০

১২২. নন্দদুলারে বাজপেয়ী, সম্পাদক। সুর-সাগর, ১ম খণ্ড, পৃ ৩৫৯, পদ ২৯৩।৯১১

১২৩. তদেব, ১ম খণ্ড, পৃ ৩৬৯, পদ ৩২৬।৯৪৪

১২৪. ব্রজভূষণ শর্মা, সম্পাদক। পরমানন্দ-সাগর, পৃ ৯৬, পদ ২০৮

১২৫. নন্দদুলারে বাজপেয়ী, সম্পাদক। সুর-সাগর, ১ম খণ্ড, পৃ ৩৭০, পদ ৩২৯।৯৪৭

১২৬. তদেব, পৃ ৩৭১, পদ ৩৩৪।৯৫২

১২৭. তদেব, পৃ ৩৭৩, পদ ৩৪১।৯৫৯

১২৮. ব্রজভূষণ শর্মা, সম্পাদক। পরমানন্দ-সাগর, পৃ ৬৫, পদ ১৪০

১২৯. নন্দদুলারে বাজপেয়ী, সম্পাদক। সুর-সাগর, ১ম খণ্ড, পৃ ৩৭৬, পদ ৩৪৮।৯৬৬

১৩০. তদেব, পৃ ৩৭৮, পদ ৩৫৫।৯৭৩

১৩১. তদেব, ১ম খণ্ড পৃ ৩৮৮, পদ ৩৮৭।১০০৫

১৩২. তদেব, পৃ ৩৮৯, পদ ৩৮৭।১০০৫

১৩৩. তদেব, পৃ ৩৮৯, পদ ৩৮৭।১০০৫

১৩৪. তদেব, পৃ ৩৮৯, পদ ৩৮৮।১০০৬

১৩৫. মালবিকা চাকী, সম্পাদক। বাসুঘোষের পদাবলী, পৃ ১৮৯ পদ ২০৮

১৩৬. তদেব, পৃ ১৮৯-১৯০, পদ ২০৮

১৩৭. তদেব, পৃ ১৯০, পদ ২০৮

১৩৮. তদেব, পৃ ১৯১, পদ ২০৯

১৩৯. তদেব, পৃ ১৯০, পদ ২০৮

১৪০. তদেব, পৃ ১৯১, পদ ২০৯

১৪১. নন্দদুলারে বাজপেয়ী, সম্পাদক। সুর-সাগর, ১ম খণ্ড, পৃ ৪৪০, পদ ৫১৮।১১৩৬

১৪২. তদেব, পৃ ৪৪০, পদ ৫১৯।১১৩৭

১৪৩. তদেব, পৃ ৪৪০, পদ ৫১৮ ১১৩৬

১৪৪. ভবানী শংকর যাজ্ঞিক, সম্পাদক। রসখান-রত্নাবলী, পৃ ৮৪, পদ ৩৩

১৪৫. রমণীমোহন মল্লিক, সম্পাদক। বলরামদাসের পদাবলী, পৃ ৫৮

১৪৬. তদেব, পৃ ৫৮

১৪৭. তদেব পৃ ৫৮

১৪৮. নবদ্বীপ ব্রজবাসী সংকলক, পদামৃতমাধুরী, ৩য় খণ্ড, পৃ ১১৬

১৪৯. তদেব, পৃ ১১৬

১৫০. তদেব, পৃ. ১১৭

১৫১. তদেব, পৃ. ১১৭

১৫২. তদেব, পৃ. ১১৭

১৫৩ তদেব, পৃ. ১১৮

১৫৪. তদেব, পৃ. ১১৮

১৫৫. তদেব, পৃ. ১২১

১৫৬. তদেব, পৃ. ১২৩

১৫৭. মালবিকা চাকী, সম্পাদক। বাসুঘোষের পদাবলী, পৃ. ৮-৯, পদ ৯

১৫৮. তদেব, পৃ. ৯, পদ ৯

১৫৯. নন্দদুলারে বাজপেয়ী, সম্পাদক। সুর-সাগর, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২৫, পদ ১৮৮।৮০৬

১৬০. তদেব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২৫, পদ ১৮৯।৮০৭

১৬১. তদেব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২৫, পদ ১৮৯।৮০৭

১৬২. তদেব ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২৬, পদ ১৯১।৮০৯

১৬৩. তদেব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২৭, পদ ১৯৩।৮১১

১৬৪. তদেব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২৭, পদ ১৯৩।৮১১

১৬৫. তদেব, ১ম খণ্ড পৃ. ৩২৮, পদ ২৯৫।৮১৩

১৬৬. নবদ্বীপ ব্রজবাসী, সংকলক। পদামৃত মাধুরী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২০

১৬৭. নন্দদুলারে বাজপেয়ী, সম্পাদক। সুর-সাগর ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২৮, পদ ১৯৬।৮১৪

১৬৮ তদেব, পৃ. ৩৯৬, পদ ৪০১।১০১৯

১৬৯. ব্রজভূষণ শর্মা, সম্পাদক। পরমানন্দ-সাগর, পৃ. ১৬৯, পদ ৩৮১

১৭০. তদেব, পৃ. ১৬৯, পদ ৩৮১

১৭১. নন্দদুলারে বাজপেয়ী, সম্পাদক। সুর-সাগর, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯৫, পদ ৬৬৭।১২৮৫

১৭২. ব্রহ্মচারী অমরচৈতন্য, সম্পাদক। বলরামদাসের পদাবলী, পৃ. ৩৯-৪০

১৭৩. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদক। জ্ঞানদাসের পদাবলী, পৃ. ২৭, পদ ১

১৭৪. ব্রহ্মচারী অমর চৈতন্য, সম্পাদক। বলরামদাসের পদাবলী, পৃ. ৪০

১৭৫. মালবিকা চাকী, সম্পাদক। বাসুঘোষের পদাবলী, পৃ. ১৪৭, ১৬১

১৭৬. তদেব, পৃ. ১৪৭, ১৬১

১৭৭. ব্রহ্মচারী অমরচৈতন্য, সম্পাদক। বলরামদাসের পদাবলী, পৃ. ৩৮

১৭৮. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক। বৈষ্ণব পদাবলী, পৃ. ৯৯৫, পদ ৮

১৭৯. ব্রহ্মচারী অমরচৈতন্য সম্পাদক। বলরামদাসের পদাবলী, পৃ. ৪০

১৮০. সতীশচন্দ্র রায়, সম্পাদক। পদকল্পতরু, ২য় খণ্ড, ৩য় শাখা, পৃ. ২৭৭, পদ ২০।১১৮০

১৮১. ব্রহ্মচারী অমরচৈতন্য, সম্পাদক। বলরামদাসের পদাবলী, প. ৩৭

১৮২. যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, সম্পাদক। রায়শেখরের পদাবলী, প. ৯, পদ ১০

১৮৩ নবদ্বীপ ব্রজবাসী, সম্পাদক। পদামৃত মাধুরী ৩য় খণ্ড, প. ১৫৬

১৮৪. যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, সম্পাদক। রায়শেখরের পদাবলী, প. ১০, পদ ১১

১৮৫. মণীন্দ্রমোহন বসু, সম্পাদক। দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী, ১ম খণ্ড প. ১৮৪, পদ ১৯৭

১৮৬. সতীশচন্দ্র রায়, সম্পাদক। পদকল্পতরু, ২য় খণ্ড, ৩য় শাখা, প. ২৯৩, পদ ১১।১২২৬

১৮৭. রমণীমোহন মল্লিক, সম্পাদক। বলরামদাস, প. ৫৪-৫৫

১৮৮. তদেব, প. ৫৬

১৮৯. বিমান বিহারী মজুমদার, সম্পাদক। গোবিন্দদাসের পদাবলী, প. ৮১, পদ ১৫৫

১৯০ মণীন্দ্রমোহন বসু, সম্পাদক। দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী, ১ম খণ্ড, প. ১৭৪, পদ ১৮১

১৯১. তদেব, প. ১৭৬, পদ ১৮৪

১৯২. তদেব, প. ১৭৭, পদ ১৮৫

১৯৩. তদেব. প. ১৭৮, পদ ১৮৬

১৯৪. রমণীমোহন মল্লিক, সম্পাদক। বলরাম দাস প. ৫৭

১৯৫. মণীন্দ্রমোহন বসু, সম্পাদক। দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী, ১ম খঃ, প. ১৭৭ পদ ১৮৫

১৯৬. তদেব. প. ১৭৭ পদ ১৮৬

১৯৭. ব্রজভূষণ-শর্মা, সম্পাদক। পরমানন্দ-সাগর, প. ১২১, পদ ২৬৪

১৯৮. নন্দদুলারে বাজপেয়ী, সম্পাদক। সুর-সাগর, ১ম খঃ, প. ৩৯৯ পদ ৪১২ ১০৩০

১৯৯. তদেব প. ৪০০, পদ ৪১৩।১০৩১

২০০. যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, সম্পাদক। রায়শেখরের পদাবলী, প. ৯, পদ ১০

২০১. ব্রহ্মচারী অমরচৈতন্য, সম্পাদক। বলরামদাসের পদাবলী, প. ৩৭

২০২. মালবিকা চাকী, সম্পাদক। বাসুঘোষের পদাবলী, প. ১৪৭ পদ ১৬১

২০৩. ব্রজভূষণ শর্মা, সম্পাদক। পরমান্দ-সাগর, প. ১২৯, পদ ২৮৩

২০৪. নন্দদুলারে বাজপেয়ী, সম্পাদক। সুর-সাগর, ১ম খঃ প. ৪০১, পদ ৪১৮।১০৩৬

২০৫. ব্রজভূষণ শর্মাও অন্যান্য, সম্পাদক। কুম্ভনদাস, প. ৫৫-৫৬, পদ ১৩৪

২০৬. রমণীমোহন মল্লিক, সম্পাদক। বলরামদাস, প. ৫৬

২০৭. নন্দদুলারে বাজপেয়ী, সম্পাদক। সুর-সাগর, ১ম খণ্ড প. ৪০১ পদ ৪১৮।১০৩৬

২০৮· তদেব, পৃ. ৪০১ পদ ৪১৯।১০৩৭

২০৯· যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, সম্পাদক। রায়শেখরের পদাবলী, পৃ: ১১৪, পদ ৯৮

২১০· বিমানবিহারী মজুমদার, সম্পাদক। গোবিন্দ দাসের পদাবলী, পৃ: ৩৮৯, পদ ৮৪৮

২১১· যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, সম্পাদক। রায়শেখরের পদাবলী, পৃ: ১৫৩, পদ ১১৬

২১২· যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, সম্পাদক। রায়শেখরের পদাবলী, পৃ: ১৫৩, পদ ১১৬

২১৩· সতীশচন্দ্র রায়, সম্পাদক। পদকল্পতরু, চতুর্থ খণ্ড, চতুর্থ শাখা ২য় ভাগ পৃ: ৬৬ পদ, ৮৯।২৫৬২

২১৪· হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক। বৈষ্ণব পদাবলী পৃ: ৩৩৫, পদ ১১৯

২১৫· তদেব, পৃ. ৩২৭, পদ ৯৯

২১৬· তদেব, পৃ. ৩৩৩, পদ ১১৬

২১৭· হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক। বৈষ্ণব পদাবলী, পৃ: ৩৩৩, পদ ১১৬

২১৮· তদেব, পৃ: ৩৩৫, পদ ১১৮

২১৯· মণীন্দ্রমোহন বসু, সম্পাদক। দীনচণ্ডী দাসের পদাবলী, ১ম খঃ, পৃ: ১৯৩, পদ ২১২

২২০· তদেব, পৃ. ২০৩, পদ ২২৯

২২১· তদেব, পৃ. ২০১, পদ ২২৫

২২২· তদেব, পৃ. ২০২, পদ ২২৬

২২৩· তদেব, ১ম খঃ, পৃ. ২০২, পদ ২২৭

২২৪· তদেব, পৃ: ২০৪, পদ ২৩০

২২৫· তদেব, পৃ. ২০৪, পদ ২৩১

২২৬· তদেব, পৃ: ২০৪, পদ ২৩১

২২৭· মালবিকা চাকী, সম্পাদক। বাসু ঘোষের পদাবলী, পৃ. ৯১-৯২, পদ ১১২

২২৮· তদেব, পৃ: ৯৪, পদ ১১৩

২২৯· তদেব, পৃ: ৯৬, পদ ১১৬

২৩০· মনীন্দ্র মোহন বসু, সম্পাদক। দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী, ১ম খঃ, পৃ: ২৬৭, পদ ৩৩১

২৩১· তদেব, পৃ: ২৬৯, পদ ৩৩৪

২৩২· তদেব, পৃ: ২৭১, পদ ৩৩৮

২৩৩· তদেব, পৃ: ২৭৩, পদ ৩৪৩

২৩৪· তদেব, পৃ: ২৭৪, পদ ৩৪৫

২৩৫· তদেব, পৃ: ২৭৫, পদ ৩৪৬

২৩৬. নন্দদুলারে বাজপেয়ী, সম্পাদক। -সুর-সাগর, ২য় খণ্ড পৃ. ২৬৯, পদ ২৯৩৫।৩৫৫৩

২৩৭. তদেব, পৃ. ২৬৯, পদ ২৯৩৬।৩৫৫৪

২৩৮. তদেব, পৃ. ২৭৭, পদ ২৯৭৪।৩৫৯২

২৩৯. তদেব, পৃ. ২৭৮, পদ ২৯৭৬।৩৫৯৪

২৪০. তদেব, পৃ. ২৭৮, পদ ২৯৭৯।৩৫৯৭

২৪১. তদেব, পৃ. ২৭৮, পদ ২৯৭৮।৩৫৯৬

২৪২. তদেব, পৃ. ২৮০, পদ ২৯৯০।৩৬০৮

২৪৩. তদেব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১২, পদ ৪৩৯।১০৫৭

২৪৪ তদেব, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮১, পদ ২৯৯২।৩৬১০

২৪৫. তদেব, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১১, পদ ৩১১৪।৩৭৩২

২৪৬ তদেব, পৃ. ৩১১, পদ ৩১৫।৩৭৩৩

২৪৭. তদেব, পৃ. ৩১২, পদ ৩১২০।৩৭৩৮

২৪৮. তদেব, পৃ. ৩১৫, পদ ৩১৩৪।৩৭৫২

২৪৯. তদেব, পৃ. ৩১৫, পদ ৩১৩৫।৩৭৫৩

২৫০ তদেব, পৃ. ৩১৫, পদ ৩১৩৭।৩৭৫৫

২৫১. তদেব, পৃ. ৩২১, পদ ৩১৬৬।৩৭৮৪

২৫২. তদেব, পৃ. ৩২২, পদ ৩১৭০।৩৭৮৮

২৫৩. তদেব, পৃ. ৩২২, পদ ৩১৭১।৩৭৮৯

২৫৪. তদেব, পৃ. ৩২২ পদ ৩১৭২।৩৭৯০

২৫৫. তদেব, পৃ. ৩২৩, পদ ৩১৭৫।৩৭৯৩

২৫৬ তদেব, পৃ. ৩৭৪, পদ ৩৪৩৫।৪০৫৩

২৫৭. তদেব, পৃ. ৩৭৫, পদ ৩৪৩৮।৪০৫৬

২৫৮ তদেব, পৃ. ৩৭৫, পদ ৩৪৩৯।৪০৫৭

২৫৯. তদেব, পৃ. ৫০৯, পদ ৪০৮২।৪৬৯৯

২৬০. তদেব, পৃ. ৫১০, পদ ৪০৮৬।৪৭০৩

২৬১. তদেব, পৃ. ৫১১, পদ ৪০৯০।৪৭০৭

২৬২. তদেব, পৃ. ৫১১, পদ ৪০৯০।৪৭০৭

২৬৩. ব্রজভূষণ শর্মা সম্পাদক। পরমানন্দ-সাগর, পৃ. ৪৯৯, পদ ১১৪০

২৬৪. ভাগবত ১০।৮২ শ্লোক, ১, ২, ১০, ২১, ২২ ও ২৩

২৬৫. নন্দদুলাবে বাজপেয়ী সম্পাদক। সুর-সাগর, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৬৮, পদ ৪২৮২।৪৯০০

২৬৬. ব্রজভূষণ শর্মা, সম্পাদক। পরমানন্দ-সাগর, পৃ. ৫১০, পদ ১১৬৫

২৬৭. বিমানবিহারী মজুমদার, সম্পাদক। গোবিন্দ দাসের পদাবলী, পৃ. ৩৬৯, পদ ৭৮৬

২৬৮. বিমানবিহারী মজুমদার, সম্পাদক। গোবিন্দদাসের পদাবলী, পৃ ৩৬৯, পদ ৭৮৭

২৬৯. নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী, সম্পাদক। পদামৃত মাধুরী ৩য় খণ্ড, পৃ ৫৬

২৭০. তদেব, পৃ ৫৬

২৭১. তদেব, পৃ ৬১

২৭২. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদক : জ্ঞানদাসের পদাবলী, পৃ ৩৩, পদ ১

২৭৩. তদেব, পৃ ৩৩, পদ ২

২৭৪. তদেব, পৃ ৩৩ ৩৪, পদ ২

২৭৫. তদেব পৃ. ৩৪, পদ ৩

২৭৬. তদেব, পৃ ৩৪, পদ ৩

২৭৭. তদেব, পৃ ৩৪, পদ ৩

২৭৮. ব্রজভূষণ শর্মা, সম্পাদক। পরমানন্দ-সাগর, পৃ ২৩, পদ ৫০

২৭৯. ব্রজরত্ন দাস, সম্পাদক। নন্দদাস গ্রন্থাবলী, পৃ ২৯৭, পদ ৫২

২৮০. ব্রজভূষণ শর্মা, সম্পাদক। পরমানন্দ-সাগর, পৃ ২৪, পদ ৫৪

২৮১. ব্রজভূষণ শর্মা ও অন্যান্য, সম্পাদক। কুম্ভনদাস, পৃ ৪, পদ ৯

২৮২. ডঃ রত্নকুমারী। ১৬বী শতাকে হিন্দী ঔর বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবি, পৃ ২৭১

২৮৩. ব্রজভূষণ শর্মা ও অন্যান্য, সম্পাদক। কুম্ভনদাস, পৃ ৭, পদ ১০

২৮৪. নন্দদুলারে বাজপেয়ী, সম্পাদক। সুর-সাগর, ১ম খঃ, পৃ ৪৯৭, পদ ৬৭২।১২৯০

২৮৫. তদেব, পৃ ৪৯৮, পদ ৬৭৭।১২৯৫

২৮৬. তদেব, পৃ ৫০৪, পদ ৬৯৬।১৩১৪

২৮৭. তদেব, পৃ ৫০৪, পদ ৬৯৮।১৩১৬

২৮৮. তদেব, পৃ ৫০৭, পদ ৭০৪।১৩২২

২৮৯. তদেব, পৃ ৫০৭, পদ ৭০৪।১৩২২

২৯০. তদেব, পৃ ৫০৮, পদ ৭০৮।১৩২৬

২৯১. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদক। জ্ঞানদাসের পদাবলী, পৃ ৩৪, পদ ২

২৯২. নন্দদুলারে বাজপেয়ী, সম্পাদক। সুর-সাগর, ১ম খঃ, পৃ ৫০৮, ৭০৮।১৩২৬

নির্দেশিকা

শুদ্ধিপত্র

প্রথম অধ্যায়

পৃষ্ঠা। লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯।১	রামানজের	রামানুজের
৯।১৪	ময়া	মায়া
৯।২৭	ভেদভেদবাদ	ভেদাভেদবাদ
১৩।৮	পূর্বে	পূর্বে
১৩।১৬	বাংলা ও হিন্দী বৈষ্ণব পদাবলী	বাক্যটি থাকবে না
১৩।২৩	one-fifth one-third	one-fifth to one-third
১৫।৩৩	কংসবধোর	কংসবধের
১৬।৩৩	একটি	কয়েকটি
১৮।৩৪	ময়াম্বিষ্টোঃ	ময়াম্বিষ্টোঃ
২০।১৬	তোমারে	তোহ্মারে
২২।১৫	ব্যবহার	ব্যবহৃত
২৬।১৯	পর্ববর্তী	পূর্ববর্তী
৩০।২১	পূর্ববর্তী	পূর্ববর্তী
৩৩।৭	শ্রীনারায়ণা	শ্রীনারাইণা
৩৩।৮	মানন্দু	আনন্দু
৩৩।২৭	রহু	বহু
৩৩।৩৪	সুরদাস	সুরদাস
৩৪।১৮	অস্টছাপ	অষ্টছাপ
৩৫।১২	সরদাস	সুরদাস
৪৩।২৩	পুরাণ-বহির্ভূত	পুরাণ-বহির্ভূত
৪৬।৩৪	মধুসূদন	মধুসূদন
৪৭।১	মধুসূদন	মধুসূদন
৪৮।১৭	বৃন্দাবন	বৃন্দাবন
৫০।১৭	কয়লাছি	কয়লন্ হি
৫০।১৮	লেলাশ্বি	লেলন্ হি
৫১।১৯	একান্ত	একাত্ম

পৃষ্ঠা । লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫৫।৬৬নং (নির্দেশিকা)	সুরদাস	সূরদাস

দ্বিতীয় অধ্যায়

৭২।১৫	সন্তবেৎ	সম্ভবেৎ
৭৪।১৮	সুখানুভূতি	সুখানুভূতি
৭৪।১৯	স্ফাতি	স্ফূর্তি
৭৪।৩৩	অনুর ভাবে	অনুরূপভাবে
৭৯।১৯	অভে	অভেদ
৮৩।২৭	ভাবোস্ত্রী	ভাবোহএ
৮৩।৩৩	মুখ্যস্থ	মুখ্যস্তু
৮৬।১৫	মুখ্য	মুখ্য
৯০।৪	ব্যাস্বানো	ব্যাস্বনো
৯৩।৩	বড়গোস্বামী	ষড়গোস্বামী
৯৪।৭	একান্ত	একাত্ম
৯৪।২৩	ব্রহ্মভূমির	ব্রজভূমির
৯৪।২৮	ব্রজ	ব্রজ
৯৫।২৭	সহিত্যে	সাহিত্যে
৯৬।২০	নৃতিঃ	নৃভিঃ
৯৬।২২	হর্ষযক্ত	হর্ষযুক্ত
৯৮।২০	প্রবৃভীন্	প্রবৃত্তীন্
৯৯।১১	দৈব্য	দৈব
১০০।১৪	বাৎসল্যরূতি	বাৎসল্যরতি
১০১।৪	সুস্বর	সুন্দর
১০২।২	পশ্চিমণী	দাক্ষিণী
১০২।১০	সুরদাস	সূরদাস
১০২।১৭	বমোর	বক্ষের
১০২।২০	অ্যত্র	অন্যত্র
১০৩।১৬	নিয়	নিয়ে
১০৪।৩৩	বিষাণ	বিআণ
১০৫।১৯	গাইলেন	পাইলেন
১০৭।৯	কুয়েত	ফ্রয়েড
১০৭।২১	অলংকারিকদের	আলংকারিকদের
১০৮।৮	বাৎসল	বাৎসল্য
১১০।৫	সন্তারে	সন্তানের

পৃষ্ঠা। লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১১০।২৪	লাল	লালন
১১০।৩১	অলংকাবকৌস্তকে	অলংকারকৌস্তভে
১১১।১	মন্বাবমরন্দচম্পূর	মন্দারমবন্দচম্পূব
১১১।১৮	মাবি	মাবী
১১২।৬	বৎসল্যরসকে	বাৎসল্যবসকে
১১২।১৯	সুবদাসেব	সুবদাসেব
১১২।২২	।বধিহি'	বিধিহি
১১২।৩৪	ডীগল	ভীগল
১১৬।৭৯নং (নির্দেশিকা)	২৯৪৯	২৯৪১
১১৭।৯৫নং („)	Macnicol Hiciol	Macnicol, Nicol
১১৮।১৪৬নং („)	মহাভাবতম্,শল্যপর্ব ৩৬।৬৮	মহাভাবতম্, শল্যপর্ব, ৬৩।৬৮

তৃতীয় অধ্যায়

পৃষ্ঠা। লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১২০।৩	দাস	দাস্য
১৩১।৪	পূবিয়া	পূবিযা
১৩২।৭	হোঁবনৃং	হোঁবিলৃং
১৩২।১৯	চ ম্বন	চুম্ব
১৩৪।৪	স্বতিবাণী	স্তুতিবাণী
১৩৫।২০	তাল	ভাল
১৩৯।৬	বাখা	বাখ্য
১৩৯।৬	ডাকা	ডাক্য
১৩৯।১৯	একদিকে	একদিঠে
১৩৯।২৩	দেয	দেই
১৩৯।২৭	সুখে	সুখে
১৩৯।৩৩	জাহ্নবী	জাহ্নবা
১৪০।১০	জাহ্নবী	জাহ্নবা
১৪০।২৬	সঙে	সঞে
১৪৫।১২	পিঠে	দিঠে
১৪৮।১২	শব্দ	শবদ
১৪৮।২৪	ষুনইতে	শুনইতে
১৪৯।২৩	আণ্ডল	আশ্বল
১৫২।হিন্দী শব্দটিব পরেই	কৃষ্ণদাস	কুম্ভনদাস

পৃষ্ঠা । লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৫২।২৭	পন্থৈযা	পনহৈযা
১৫৪।৭	ব্রবষত	ব্রবখত
১৫৪।৩০	ফুলসাতি	হুলসাতি
১৫৭।২৫	প্রচালিত	প্রচলিত
১৫৯।১৭	দুবুহ	দুবুহ
১৫৯।২৫	সুব	সুব
১৬০।১০	সুব	সুব
১৬১।১১	দেহ	দেহু
১৬২।১৩	বুন্ধকণ্ঠ্য	বুন্ধকণ্ঠ
১৬২।৩২	কণ্ডুবিপট	কণ্ডুকিপট
১৬৫।১	মল্থাবে	মল হাবৈ
১৬৫।২৩	দেবসুধ	দেব দুধ
১৬৫।৩৫	নান্থাবিযা	নান হাবিযা
১৬৬।৩	কান্থুব	কান হব
১৬৭।১৩	ঐশ্বর্যস্তুপেব	ঐশ্বর্যবুপেব
১৬৭।১৪	নন্দ সুমতি	নন্দজসুমতি
১৬৭।১৫	ক ণ্ড	কান হ
১৬৭।১৯	সুব	সুব
১৬৭।৩০	জগমগাই	ডগমগাই
১৬৭।৩৪	মোনে	মোহন
১৬৮।১১	উৎসব	উৎফুল্ল
১৬৮।২১	ফেলত	মেলত
১৬৮।২৩	বসন	বদন
১৬৮।২৪	কৃষ্ণে	কীন হে
১৬৯।২৯	কীন্থী	কীন হী
১৬৯।৩০	কন্থেযা	কনহেযা
১৭০।১৫	স্বাবিনি	গ্বাবিনি
১৭০।১৫	থেবী	থোবী
১৭১।৬	থিঝাযো	খিঝাযো
১৭১।৭	লীন্থো	লীনহো
১৭১।৯	গুনি-গুনি	পুনি-পুনি
১৭১।১২	সীথী	সীখী
১৭২।৩১	তুন্থারী	তুমহাবী

পৃষ্ঠা। লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৭২।৩৫	সরদাস	সুরদাস
১৭৩।১৮	স্থাতে	নুহাতে
১৭৩।১৯	পুনি	সুনি
১৭৩।১৯	বচয়ে	বঢ়য়ো
১৭৩।২০	বালক	অলক
১৭৪।২	অরুত	অরু
১৭৪।৩	পারৈঁ	পাবৈঁ
১৭৪।৫	হাঁ	হীঁ
১৭৪।১১	তুমভৈঁ	তুমতৈঁ
১৭৪।১১	কন্বৈয়া	কানুহৈয়া
১৭৪।১৩	কীম্মো	কীনহো
১৭৪।১৪	লীম্মো	লীনহো
১৭৪।১৪	সুরদাস	সুরদাস
১৭৪।২২	বেদনর	বেদনার
১৭৪।৩১	ফেরে	ফিরে
১৭৪।৩৫	সুরদাস	সুরদাস
১৭৪।৩৫	কহুঙ্গা	কহুঙ্গা
১৭৫।১২	পুর্বেই	পূর্বেই
১৭৫।১৫	বাস্তবনুগ	বাস্তবানুগ
১৭৬।১৬	ঘৃণা	কৃপা
১৭৬।১৬	সুরদাস	সুবদাস
১৭৬।১৭	ঘৃণা	কৃপা
১৭৮।৯	পরমানস্দসাগর	পরমান্দসাগর
১৭৮।১৭	সম্পুর্ণ	সম্মূর্ণ
১৭৮।২১	দুরুন্ত	দুরন্ত
১৭৮।২৩	দর	লর
১৭৮।৩৫	উনোঁনে	উনহোঁনে
১৭৯।৭	নেঁকছ	নেঁকহু
১৭৯।২২	আজ	আত্ম
১৭৯।৩২	হুনা	হুআ
১৮০।২	উদ্ভবকে	উদ্ধবকে
১৮০।১১	জ্ঞাঁগন	আঁগন
১৮১।১	রচমায়	রচনায়

পৃষ্ঠা । লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৮১।৩৩	নুৰাই	নুহৰাই
১৮৩।২৪	দুতিয়া	দুতিযা
১৮৩।২৮	জী	জু
১৮৪।৩১	মখানী	মথানী
১৮৬।৮	লালম	লালন
১৮৬।৮	নুবাযো	নুহৰাযো
১৮৬।২২	চিত্তৰে	চিতৰৈ
১৮৭।৭	ভেবো	তেবো
১৮৭।৩৫	কহেয়া	কহেযা
১৯১।১২	পাবমানন্দদাসেব	পবমানন্দদাসেব
১৯৩।২	স্কন্দেব	স্কন্ধেব
১৯৩।২	অপূর্ব	অপূর্ব
১৯৪।১৪	সুনো	সুনো
১৯৫।৩৩	সুবক্ষ	সুক্ষ্ম
১৯৬।১৫	পর্ন	পূর্ণ
২০০।৩৩	কৰিত	কি ত্ত
২০১।২, ৩	কৰিত	কৰিত্ত
২০৩।৮	পরন্ত	পবন্তু
২০৫।১১	দুকুলৈ	দুকুলে
২০৫।১২	লটুলৈ	লটুলে
২০৫।২৮	মযেব	মাযেব
২০৫।৩৩	চোটা	ঢোটা
২০৬।২	হযে	ভযে
২০৬।৩	দবাৰহী	দুবাবহী
২০৭।৪ নং (নির্দেশিকা)	বিশ্বম্বল্লভ	বিম্বম্বল্লভ
২০৯।৭৯ নং (নির্দেশিকা)	সকুমার সেন	সুকুমাৰ সেন
২১১।১৪১ নং (নির্দেশিকা)	পদ ১২৫	পদ ২২৫
২১১।১৪৫ নং (নির্দেশিকা)	পৃ ৯০৮	পৃ ১০৮
২১৫।২৮৭ নং (নির্দেশিকা)	পৃ ১৮৯	পৃ ২৮৯

পৃষ্ঠা । লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
	চতুর্থ অধ্যায়	
২১৯।৫	স্কন্দে	স্কন্ধে
২১৯।১৮	বুন্দাবনে	বৃন্দাবনে
২২০।১২	হিবাব	হিযাব
২২২।২৫	স্থানু	স্হাস্নু
২২২।২৬	সবাম্বগ্নীন্দুতাবকম	সবাযগ্নীন্দুতাবকম্
২২৩।১৯	অস্থাত	অন হাত
২২৪।১	স্নেহোৎকণ্ঠই	স্নেহোৎকণ্ঠাই
২২৪।২১	সুরদাস	সূবদাস
২২৬।২২	পুবণ	পূবণ
২৩১।১	অন্নপ্রাসন	অনপ্রাসন
২৩২।৭	ডোবে	ভোবে
২৩৮।২৮	মৈব্রাব	কেব্রাব
২৩৮।২৮	লটুলে	লটুলেঁ